সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র

সম্পাদনা

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র আরো আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে সুবোধবাবু (মার্চ, ১৯৮০) আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। যাবার আগের দিনও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয় লেখা লিখে রেখে গেলেন : 'ওমর খৈয়াম স্মরণে'।

সুবোধবাবু সম্পর্কে আমি আমার বই 'সম্পাদকের বৈঠকে'—বেশ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, যা শুধু লেখক সুবোধ ঘোষকে নয়, ব্যক্তি সুবোধবাবুকেও হয়তো অনেকটা তুলে ধরতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম ঃ 'একসঙ্গে যোগ দিই, সেই যোগ'।

এ রচনাবলীতে প্রথম খণ্ডে সুবোধবাবুর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। এটা কেন জানি না বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে—এর কভার এঁকেছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সুবোধবাবু যে সময় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখনই পাঠকেরা বুঝে গিয়েছিল, শুধু 'ফসিল' বা 'অযান্ত্রিকে'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প নয়, একটি নতুন স্বাদের উপন্যাস রচয়িতা এক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র—যা তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন—তা পরবর্তীকালের পুস্তকাকারে বের হবার সময় একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকাশককে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছিলেন —এই বই প্রকাশ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সুবোধবাবু তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। তিনি প্রকাশককে আমার কাছে পাঠালেন। আমি বললাম—আপনি অনায়াসে প্রকাশক হিসেবে আমার নাম দিতে পারেন। আমি জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আপত্তি নেই।

তাই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে আমার নামই ছেপে বের হয়েছিল। অবশ্য আমাকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য জেল খাটতে হয়নি।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারি আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।.....তার আগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম যুগান্তর পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব-এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের তিনি ছিলেন সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সেই সময় বর্মন স্ট্রীটের পূর্ব দিকে দোতলায় একটি ঘরেই ছিল দেশ ও আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতর।

আমরা একই ঘরে বসে এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সুবোধবাবুকে সে সময় যেভাবে দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনও যেন যৌবনে পা দেননি। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, যাকে বলা যায় রোমান্টিক পুরুষ। কথা তিনি খুবই কম

বলতেন। সব সময় দেখতাম, ডাকে আসা পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দেশে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে নিমগ্ন থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত, এ মানুষটি বোধহয় খুবই অভিমানী ও গম্ভীর। কিন্তু দিনের পর দিন একঘরে বসে কাজ করতে করতে যখন মধুরভাষী মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ ঘটল, তখন দেখলাম যে, মানুষটি আসলে নীরব, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী। যাকে বলা যায় অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এক আড্ডাবাজ মানুষ।

আমাদের চাকুরী জীবন শুরু একই সঙ্গে। মারকাস স্কোয়ারের সংলগ্ন মারকাস বোর্ডিং-এ একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি ঘরে আমাদের প্রাকবিবাহ যুগের বেশ কয়েকটি বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশে কেটেছে। সেই সময় সুবোধবাবুকে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানবার নানা সুযোগ আমার ঘটেছিল।

ওঁর চরিত্রের একটি গুণ যা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাঙালী হয়েও 'বাঙালীয়ানা'র কোন ছাপ তাঁর মধ্যে সচরাচর দেখা যেত না। তার একটা কারণ তিনি বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তার প্রভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল।'...

সুবোধবাবু বাংলা সাহিত্যকে যে একটি উজ্জ্বলরত্ন দিয়েছেন, সেই 'ভারত প্রেমকথা' 'দেশ'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'শতকিয়া'। অন্য স্বাদের উপন্যাস। তাছাড়া ওঁর বহু গল্প--যা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে--তার মধ্যে অনেকগুলোই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত রচনাগুলিও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন মর্যাদা পাবে।

সুবোধবাবুর একটি গল্পসংকলন 'গল্প মণিঘর' শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ 'ভ্রাতৃপ্রতিম দুই বন্ধু—করকমলেষু...।'

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই প্রতিষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধুত্বের, প্রগাঢ় সহমর্মিতার। আমাদের দুজনের ভাগ্য ছিল এক সুতোতেই গাঁথা। তাঁর মৃত্যুতে সেই সুতো ছিঁড়ে গেল। গেল কি? সত্যি?

[signature]

সম্পাদকের কথা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকর লিখেছেন ঃ

'পঞ্চাশ দশকে যখন আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত প্রবেশ তখন সুবোধ ঘোষ খ্যাতির মধ্যগগনে। চল্লিশ দশকের যে বিস্ময় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্য গগনে তার উদয় তার রেশ কিছুটা কেটেছে, কিন্তু বিপুল পাঠক সমাজের কৌতূহলের অভাব নেই। সকলের মুখে তখন এক প্রশ্ন, তিনি আরও বেশি লেখেন না কেন? সুবোধ ঘোষ তার উত্তর দিতেন না, কিন্তু সাহিত্য কর্মের সঙ্গে যাঁরা কিছুটা যুক্ত তাঁরা সহজেই বুঝতে পারতেন, সুবোধ ঘোষ যে ধরনের গল্প লেখেন, তা বেশি লেখা যায় না, প্রতিটা গল্পের পেছনে থাকে গভীর চিন্তার অদৃশ্য ভিত্তিভূমি।'

সুবোধ ঘোষের রচনা সমগ্র সম্পাদনার সময় আমরা এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। সত্যি, বেশি লেখেন নি তিনি। তিরিশ-বত্রিশটি উপন্যাস, তার মধ্যে আয়তনে বৃহৎ মাত্র তিন-চারটি (ত্রিযামা, শতকিয়া ও জিয়াভরলি), আর বাকীগুলি মাঝারি, কতগুলি তো ছোট উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে--যেমন সুজাতা, বর্ণালী, সুক্তিপ্রিয়া, কান্তিধারা, ছায়াবৃতা প্রভৃতি।

গল্পের সংখ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সেই অযান্ত্রিক, ফসিল থেকে শুরু করে সিরিয়াস আলোড়নকারী গল্প থেকে জীবন বিচিত্রার বহু দিক, ব্যক্তি ও মানসিকতা নিয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে হাল্কা মিষ্টি প্রেমের গল্প--যার সংখ্যা প্রায় ১৬০।

(খ) ভারত প্রেমকথা—২০

(গ) কিংবদন্তীর দেশে--৩১

(ঘ) পুতুলের চিঠি—৮

(ঙ) ক্যাকটাস (জীবজগৎ পশু-পাখি-অরণ্য)--১৪

তাই যার মাত্র তিরিশটা উপন্যাস ও আড়াইশোর কম গল্প (পেশাগত সাহিত্যিক জীবন মধ্য চল্লিশ দশক থেকে সত্তর দশকে শেষ, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর। তাও একটানা নয়—হঠাৎ হঠাৎ কলম থেমে গেছে--বিশেষ করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে) তিনি অবশ্যই পরিমাণের দিক দিয়ে বেশি লেখেন নি (তাঁকে ঠিক prolific writer বলা যায় না সেই অর্থে)--যার জন্য গণিতের দিক থেকে বিচার করে তাঁর সমগ্র রচনা বর্তমান বিজ্ঞানের মুদ্রণ যন্ত্রে ৬০০০ পাতার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ করা সম্ভব। এবং এর মধ্যে অবশ্যই তাঁর বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং একটি গীতিনাট্যকেও ধরা হয়েছে।

তাই আমরা হয়তো দশটি খণ্ডের মধ্যে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক ফসলকে গোলায় ভরে ফেলতে পারব, যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেক কম--পূর্বসূরী তারাশংকর-বিভূতিভূষণ-সমসাময়িক বিমল মিত্র বা উত্তরসূরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়--যেই হোক না কেন।

সূচীপত্র

উপন্যাস

ভুবনবাবুর পেটে নবান্ন সয় না।

কথাটা কে যে প্রথম বলেছিল, তা কেউ জানে না। কথাটা ঠিক কবে থেকে আর কেমন করে রটে গেল, তাও কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এখানে, দুলালবাবুর এই বাড়িতে সন্ধ্যাবেলার তাসখেলার আসরে যাঁরা প্রায়ই আসেন আর বসেন, তাঁরা সবাই বোঝেন, প্রবাদের মত ওই কথাটার ঠিক অর্থটা কী।

দীনুবাবু, যিনি আজ আর বেঁচে নেই, তিনি অবশ্য একদিন আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—মিথ্যে কথা। আমি জানি ভুবনের বাড়িতে নবান্নের দিনে দু সের নতুন চালের পায়েস হয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি, ভুবন মস্ত বড় একটা বাটি ভরতি করে পায়েস নিয়ে খাচ্ছে।

দীনুবাবুর কথা শুনে সেদিন এঁরা সবাই হেসে ফেলেছিলেন। দীনুবাবু, বেচারা বুড়ো মানুষ, বয়সটাও যাঁর বাহাত্তরের কাছাকাছি ঃ যিনি শুধু কানে কম শোনেন না, মনেও কম শোনেন, তিনি কথাটার আসল অর্থটা বুঝতে পারেননি।

এখানকার আর এপাড়ার কেউ নন, এমন একজন মানুষের ঝকঝকে গাড়িটা মাঝে মাঝে, মাসের মধ্যে অন্তত দু-তিনটি দিন দুলালবাবুর বাড়ির কাছে এসে থামে আর হর্ন বাজায়। তিনিও কথাটা শুনেছেন, আর, আরও অনেক কথা শুনে কথাটার আসল অর্থটা সহজেই বুঝে ফেলেছেন। তিনিও হেসেছেন।

ইনি দুলালবাবুর বিশেষ শ্রদ্ধার মানুষ। এবং দুলালবাবু এঁর কাছে বিশেষ পছন্দের মানুষ। এঁরই সব চেয়ে প্রিয় জুনিয়র হলেন দুলালবাবু। উকিল দুলালবাবুর রোজগেরে ভাগ্যটা এঁরই উদার সাহায্যে ও অনুগ্রহে প্রসন্ন হয়েছে। দুলালবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যাবেলার তাসের আসরে যাঁরা আসেন ও বসেন, তাঁদের কাছেও ইনি বিশেষ সমাদর আর অভ্যর্থনার মানুষ। ইনি হলেন খাস কলকাতার শ্যামবাজারের সেই চমৎকার সাদা ধবধবে মিত্রনিবাসের কর্তা মানুষটি, যাঁর গায়ের শার্ট সাদা, ট্রাউজার সাদা, পায়ের জুতো জোড়াও সাদা। এখানকার ও এপাড়ার কেউ একজন না হয়েও ইনি এখানকার ক্লাব ও সমিতির অনেক ইচ্ছার কাজে টাকা দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। ইনি হলেন সেই অসাধারণ কৃতী অ্যাডভোকেট হরিনাথ মিত্র, যাঁর প্রতিষ্ঠার ও যশের ভাগ্যটা দুলালবাবুর খুড়শ্বশুর নবীনবাবুর মত একজন বড় উকীলের কাছেও একটা বড় বিস্ময়। মক্কেল স্যামুয়েল ব্রাদার্সের কাছে যিনি এইচ. এন. মিটার, শ্যামবাজারের সি. আই. টি. রোডে যিনি হরি মিত্র, তিনিই এখানে দমদমের এই রায়কুঠি পাড়ার দুলালবাবুর কাছে মিত্তির স্যার।

অনেকদিন আগে ডাক্তার বলেছিলেন, আপনার এখন থেকে ছোটখাট কোন শখের কাজ নিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে দেবার অভ্যেস করলে ভাল হয়। হরিনাথ তাই মাঝে মাঝে দুলালবাবুর বাড়ির পুকুরে মাছ ধরতে আসবার ও কিছু সময় কাটিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার অভ্যেস ধরেছেন। ডাক্তার সম্প্রতি আবার বলেছেন ঃ মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে গিয়ে এদিকে-সেদিকে একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসবেন।

কিন্তু কে এই ভুবনবাবু, যার পেটে নবান্ন সয় না? দুলালবাবুর মুখ থেকে সবই শুনেছেন হরিনাথ। খুব বেশি দূরে নয় ভুবনবাবুর বাড়ি। এই রায়কুঠি পাড়া থেকে সামান্য কিছু দূরে, বড় রাস্তা যেখানে ডাইনে ঘুরে এয়ারপোর্টের দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে বড় রাস্তারই পাশে গাছপালার আড়ালে যে বাড়িটা সহজে কারও চোখে পড়ে না, সেটাই হলো ভুবনবাবুর বাড়ি।

দুলালবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যার বৈঠকে যাঁরা তাস খেলতে আসেন, তাঁরা সবাই জানেন, কেন একদিন দিল্লীর এক কলেজের সাড়ে চারশো টাকার অধ্যাপনার কাজটা ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন ভুবন মজুমদার। কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপাল সাহেবের একটা নির্দেশ তিনি সহ্য

করতে পারেননি। প্রিন্সিপাল একটি হুকুমনামা জারি করেছিলেন, অধ্যাপকেরা সবাই যেন কোট-প্যাণ্ট পরে কলেজে আসেন। সব অধ্যাপক সেই নির্দেশ মেনে নিয়েছিলেন। মেনে নিতে পারেননি শুধু ওই একজন, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার। প্রায় কুড়ি বছর আগে, সেই যে দিল্লী থেকে চলে এসে বাড়িতে ঢুকলেন ভুবনবাবু, তারপর আর কোনদিনও নতুন করে কোন চাকরি করবার কোন চেষ্টাও করলেন না।

তবে এতদিন ধরে কী করে সংসার চালাচ্ছেন ভুবনবাবু? লোকে বলে, ভুবনবাবুর বাবা অনাদিবাবু নাকি চা-বাগানের প্রচুর শেয়ার কিনেছিলেন। সেই সব শেয়ারের বদান্য অনুগ্রহের যে ডিভিডেণ্ড প্রতি বছর ভুবনবাবুর হাতে এসে পৌঁছচ্ছে, তাই যথেষ্ট। তা না হলে ভদ্রলোক প্রতি বছরে এত ঘটা ক'রে জগদ্ধাত্রীর পুজো করতে পারতেন না। বড় ছেলে সুজিত তো এই তিন বছর হলো চাকরি করছে। চটকলের কেরানীর চাকরি। আর ছোট ছেলে অজিত এই সেদিন মাত্র দেড় বছর হলো কলকাতাতে রেলওয়ের অফিসে চাকরি ধরেছে।

দীনুবাবু, যিনি আজ বেঁচে নেই, তিনি অবশ্যি একবার বলেছিলেন ঃ না হে দুলালবাবু, তোমরা যা মনে করেছো সেটা ঠিক নয়। আমি জানি, চা-বাগানের কিছু শেয়ার ভুবনের আছে বটে, কিন্তু তা থেকে এমন কিছু আয় হয় না যে, এত বড় একটা সংসারের খাওয়া-পরার দায় সামলাতে পারা যায়। আমি জানি ভুবনকে খুব কষ্টে সংসার চালাতে হয়।

কিন্তু কষ্ট করে চালাবার মত টাকাটাই বা কোথা থেকে আসে?

দীনুবাবু বলেছিলেন, কাশীর কোন্ এক প্রকাশক কোম্পানীর জন্য কাব্য আর দর্শনের বই এডিট করে দেয় আমাদের ভুবন। তিনি নাকি সেসব বই-এর দু' তিনখানা নিজেও দেখেছিলেন। স্কুলের বাংলা মাস্টার হয়ে জীবন কাটিয়েছেন তিনি, কিন্তু তারই মাঝে মাঝে একটু-আধটু ভর্তৃহরি আর কালিদাস চর্চা করেছেন। দীনুবাবু একবার প্রফেসর শিশির দত্তের উপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তোমরা না জানতে পার, আমি জানি, আমাদের ভুবন শান্তিপর্বের খুব সুন্দর অনুবাদ অন্বয় আর ব্যাখ্যা করেছে।

আজ না হয় ভুবনবাবুর দুই ছেলে চাকরি করছে। কিন্তু আগেও ভুবনবাবুকে দেখে কারও মনে হয়নি যে, ইনি একজন কষ্টের মানুষ। নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। গায়ে সাদা কাপড়ের একটি ফতুয়া, বলিষ্ঠ চেহারার একটা মানুষ তাঁর বাড়ির বারান্দাতে একটা বেতের মোড়ার উপর বসে বই পড়েন, সামনে পথের উপর দিয়ে কে কী কথা বলে আর কেমন করে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, সে দৃশ্যটার দিকে একবার সামান্য একটু চোখ তুলেও তাকান না, তাঁকে একজন কষ্টের মানুষ বলে ধারণা করা তো সম্ভব নয়। বরং, এই ধারণা হয় যে, উনি বেশ একটু অহংকারের মানুষ। কিন্তু হায়, কিসের যে অহংকার!

অনেকে অনেক কল্পনা করেও ঠিক বুঝতে পারে না, বাইরের জগৎটার আলোছায়া চলা-বলা আর ভাব-ভঙ্গীর সব কিছু এত তুচ্ছ করবার সাহস কোথায় পেলেন ওই ভুবনবাবু, যদি টাকার জোর না থাকে?

কলকাতার মত শহরের এত কাছে যে দমদম, যার চেহারাতে সেকেলে গ্রাম্যতার সব কিছুই প্রায় মুছে গিয়েছে, যার প্রাণটাও দুরন্ত শহুরে আবেগে ভরে গিয়েছে, সেখানে ভুবনবাবুর এই বাড়ির চেহারাটা যেন পুরাকীর্তির একটা অবশেষের চেহারা। বিরাট আকারের বাড়ি, বাগান পুকুর আর দেউলও আছে। কিন্তু সবই যেন ভাঙা-ভাঙা ছেঁড়া-ফাটা একটা করুণ জীর্ণতার প্রলেপ গায়ে মেখে বড় সড়কের কাছেই পড়ে আছে। তিন পুরুষ আগের দয়াল মজুমদার, যিনি সরকারী কমিসারিয়েটে চাকরী করতেন, ইংরেজের রেজিমেণ্টের সঙ্গে থেকে যিনি কাবুলে গিয়ে যুদ্ধের শিবিরে পুরো একটি বছর ছিলেন, তিনিই তৈরি করেছিলেন এই বাড়ি। কিন্তু বাড়ির চেহারা দেখে মনে হবে, এ যেন বিশ শতকের সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি আঠারো শতকের ছবি। রটনার দোষ নেই। এমন ধারণা হওয়াই

স্বাভাবিক যে, এ বাড়ির ভুবন মজুমদারের পেটে নবান্ন সয় না।

এস ডি ও একদিন অনুরোধ করেছিলেন, আপনাদের এই দেউলের ভিতরে ও বাইরে অন্তত একটি করে ইলেকট্রিক বাতির ব্যবস্থা করে দিন ভুবনবাবু। সামান্য চল্লিশ ওয়াটের দুটো বাল্‌ব। আপনাদের দেউলে ঠাকুর দেখতে সন্ধ্যাবেলা লোকের ভিড় তো মন্দ হয় না। লোকে যাতে একটু ভাল করে দেখতে পায়, সেটুকু করে দেওয়া আপনার কর্তব্য।

ভুবনবাবু কিন্তু বেশ হেসে হেসে আপত্তি করলেন--না।

দেউলের ভিতরে আছেন যে মূর্তি, তাঁর নাম করুণাকালী। রোজ সন্ধ্যায় পিতলের পিলসুজে রেড়ির তেলের যে দীপ জ্বলে, ভুবনবাবু মনে করেন, ওই দীপের আলোই যথেষ্ট। করুণাকালীকে ভাল করে দেখবার জন্য ইলেকট্রিক আলোর কোন দরকার হয় না।

প্রতি বছর ঘটা করে জগদ্ধাত্রীর যে পুজো হয় এ বাড়িতে, সেই পুজোর মধ্যেও একটা আদ্যিকালে বিশ্বাসের ক্রিয়াকাণ্ড দেখা যায়। পুজো শেষ হবার পর কাঙালী-ভোজন হয়। কাঙালীর ভিড়টাও খুব সামান্য রকমের নয়। কোন বছর তিনশো', কোন বছর চার-পাঁচশো' কাঙালী এসে ভিড় করে। সবাইকে ভোগের খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। ভুবনবাবুর বাড়ির উঠানের পাশে একটি একচালার নীচে আজও বিরাট আকারের আট-দশটা কড়াই আছে, ভোগের খিচুড়ি রাঁধবার কড়াই। এগুলি সেই দয়াল মজুমদারের সাধ সংকল্প আর ব্রতের আসবাব।

যে দয়াল মজুমদার দেউল তৈরি করে করুণাকালীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন ঃ আমার নিত্যসেবা ছাড়াও জগদ্ধাত্রীর বাৎসরিক পুজোটি করতে ভুলে যেও না, দয়াল। পুজোর দিনে কাঙালীদের পেট ভরে খাইয়ে তুষ্ট করলে আমি তুষ্ট হব। সেই দয়াল মজুমদারের মনে অদ্ভুত একটা বিশ্বাস দেখা দিয়েছিল। জগদ্ধাত্রীর পুজোর দিনে তিনি কাঙালীভোজনের দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর কাঁদতেন। ডাগর চক্ষু আর মাথাতে এলোমেলো একরাশ ঘন কালো চুল, এইরকম রূপের কোন কাঙালিনী মেয়েকে দেখতে পেলে আরও আকুল হয়ে কাঁদতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দেবী নিশ্চয়ই ছদ্মরূপ ধরে এসেছেন, তা না হলে এরকম একটি স্বপ্ন দিতেন না।

দুলালবাবু একবার নয়, অন্তত তিনবার নিজের চোখে দেখেছেন, জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনে আজকের ভুবন মজুমদারও যেন তাঁর তিনপুরুষ আগের সেই দয়াল মজুমদারের মত দুটি উৎসুক চক্ষু নিয়ে কাঙালী-ভোজনের দৃশ্য দেখছেন। সন্দেহ হয়, কেঁদে আকুল না হলেও ভুবনবাবু যেন আকুল হয়ে দেখছেন, সত্যিই দুটো ডাগর চোখ নিয়ে আর মাথাতে একরাশ এলোমেলো ঘন কালো চুল নিয়ে কোন কাঙালিনী মেয়ে খিচুড়ি খাচ্ছে কিনা।

প্রফেসর শিশির দত্ত যে-কথাটা বলে, সেটা তো খুব ভুল কথা কিংবা নিতান্ত একটা মিথ্যে নিন্দের কথা নয়! ভুবনবাবু যদিও এ-যুগের সংস্কৃতের একজন এম্-এ, তবু মনেপ্রাণে ঠিক এ-যুগের মানুষ নন।

লোকে বলে, এটা হল সেই সড়ক, একদিন যে সড়ক ধরে ক্লাইভের পল্টন পলাশীতে গিয়েছিল। বাড়ির বারান্দাতে দাঁড়িয়ে সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভুবনবাবু, তখনও তাঁকে দেখলে মনে হবে যে, তিনি যেন সড়কের উপর এ-যুগের জীবনের উদ্দাম আনাগোনা আর ছুটোছুটির কোন দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন না। পাঁচ-দশ মিনিট পর-পর মোটর-বাস ছুটে যাচ্ছে, কারখানার মজুরদের মিছিল যাচ্ছে। ওগুলো যেন কোন দৃশ্যই নয়। প্রচণ্ড শব্দের শিহর জাগিয়ে, আকাশের সব বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে যে এরোপ্লেনটা এয়ারপোর্টের মাথার উপর চক্কর দিয়ে ঘুরছে, সেটাও ভুবনবাবুর চোখে পড়ে বলে মনে হয় না। এ যেন এক অদ্ভুত বৈরাগ্যের দৃষ্টি, শান্ত উদাস আর অচঞ্চল। হতে পারে, সংস্কৃতের এম-এ তখন মনে মনে পাণিনির কোন সূত্রের ব্যাখ্যা খুঁজছেন।

বৈকুণ্ঠ ডাক্তার ঠাট্টা করে বলেন—ভুবনবাবু বোধ হয় দেখছেন, ক্লাইভের পল্টন মার্চ করে পলাশীতে যাচ্ছে।

ঠিকই, ভদ্রলোকের সব কিছুই বেশ অদ্ভুত বলে মনে হয়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সড়ক ধরে মোটর-বাসের উদ্দাম ছুটোছুটির শব্দের সঙ্গে অনেক ধুলো ছিটকে এসে ভুবনবাবুর এই বাড়ির বাগানের গাছপালার সবুজ শোভাকে বেশ ময়লা করে দেয়। যেখানে করুণাকালীর মন্দির, সেখানে দু' সারি জবার গাছ। জবার ফুল আর পাতা সব সময়েই ধুলো খায়। কিন্তু কি আশ্চর্য, এহেন জবার গাছগুলির দিকে, বৎসরের বিশেষ একটি দিনে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য, একটি বিশেষ আকুলতার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকবেনই ভুবনবাবু। এটাও যেন তাঁর জীবনের একটা বাৎসরিক তৃপ্তির ব্রত।

কালীপুজোর দিনে করুণাকালীকে এক শত জবা দিয়ে পুজো করতে হয়। পুজোর বিধি হল, করুণাকালীর পায়ের কাছে যে শিব আছেন, তাঁকে একটি সাদা জবা দিতে হবে। সাদা জবার ব্যাপার নিয়ে একটা রহস্যের উপকথা শুনিয়েছিলেন সেই দিনুবাবু। অনেক অনেক বছর আগে, কালীপুজোর দিনে সকালবেলাতে রক্তজবা তুলতে এসে একজন ভক্ত দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, রক্তজবার গাছেই একটি সাদা জবা ফুটে রয়েছে। শুধু একটি। ভক্ত সেই সাদা জবা তুলে নিয়ে শিবের বুকের উপর রেখেছিলেন। এটা কতদিন আগের ঘটনা, তা কেউ জানে না। ভুবনবাবুও জানেন না। সেই ভক্তের নামই বা কী, তাও কেউ কখনও শোনেনি। গল্পের মধ্যে ওরকমের কোন হিসেবী তথ্য নেই। তবু গল্পটা যেন ঠিকানাহীন একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন।

কালীপুজোর দিনে ভোর থেকে ব্যস্ত হয়ে ভুবনবাবু যেভাবে তাঁর করুণাকালীর মন্দিরটার কাছে ঘুরে বেড়ান, তা দেখে মনে হতে পারে, ভুবনবাবু যেন তাঁর বুকের ভিতরে সেই বিস্ময়ের গুঞ্জন শুনতে পেয়ে ছটফট করছেন। সাদা জবা কিনে আনতেই হয়, বিনোদ ভট্চাযের ভাইপো যাদবকে সেজন্যে নৈহাটি যেতে হয়। তবু ভুবনবাবু বার বার রক্তজবা গাছগুলির দিকে তাকাবেন, এদিকে-সেদিকে ঘুরে-ফিরে আবার সেখানে আসবেন। নিশ্চয় বিশ্বাস করেন ভুবনবাবু ঃ না, অসম্ভব নয়, একটি অলৌকিক বিস্ময়ের সাদা ফুল সত্যিই রক্তজবার এই গাছেতেই ফুটে উঠতে পারে।

দেউলবাড়ির ফটকের দুটো থামের মধ্যে একটা থাম এখন আর নেই। যেটা আছে, সেটাও ফাটলধরা একটা অস্তিত্ব, তার মধ্যে চুনবালির পলেস্তারার কোন চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে বাইরে এসে আর এই থামেরই কাছে ধীর-স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ভুবনবাবু। যেন একটি আত্মস্থ আবেশের মূর্তি। সড়কের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থেকেও তিনি যেন যোগিপুরুষের মত এক হাত উঁচুতে বাতাসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সড়কের কাউকেই আর কোন কিছুকেই তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন না।

সারা বছরের মধ্যে মাত্র দু' তিনটি দিনে, বিশেষ করে জগদ্ধাত্রীর পুজো আর ওই করুণাকালীর পুজোর দিনে দেখা যায়, ভুবনবাবু তাঁর বাড়ির ওই ফাটলে থামের কাছে দাঁড়িয়ে আর খুব ব্যস্ত একটা ভাব নিয়ে সবারই দিকে তাকাচ্ছেন। রাস্তার মানুষ, যারা হেঁটে যেতে যেতে দেউলবাড়ির পুজোর সাড়া-শব্দ চিনতে ও বুঝতে পেরে বাড়িটার দিকে একবার তাকায়, তারই দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে ডাক দেন ভুবনবাবু—আসুন আসুন। এ যেন ভুবনবাবুর চরিত্রের নিয়ম-করা দু' তিনটি বাৎসরিক উদারতার অনুষ্ঠান।

ভুবনবাবুর এরকমের অনুরোধের সম্ভাষণ শুনতে ভাল না লাগলেও প্রফেসর শিশির দত্ত একবার দেউলবাড়ির ভিতর কাঙালী-ভোজন দেখেছেন, করুণাকালীর মন্দিরের কাছে এসে জবার গাছগুলির দিকেও তাকিয়েছেন। দেখেছেন, প্রায় দীঘির মত আকারের পুকুরটার কিনারাতে কেয়াঝোপের পাশে একটা পুরনো নৌকার ভাঙা ধড় উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

দীনুবাবু বলেছিলেন, এই বাড়ির তিনপুরুষ আগের সেই দয়াল মজুমদার তাঁর শেষজীবনে সংসারের মায়ামোহের ছোঁয়াচ থেকে একটু দূরে সরে থাকবার জন্য নৌকাতে থাকতেন আর জপতপ করতেন। ওটা কি তবে সেই নৌকাটার ভাঙা ধড়?

এই যে বছরের দু'-তিনটি দিন হঠাৎ উদার হয়ে বাইরের মানুষকে আসুন-বসুন বলে ডাকাডাকি করেন ভুবনবাবু, এটা কি মানুষের সম্পর্কে সহাস্য তুচ্ছতার একটা গর্বিত ভাব নয়? কিসের জোরে উনি এরকম একটা গর্বের ভাব দেখান? ওদিকে দেখা যায়, ক্লাবের ছেলেরা কোন অনুষ্ঠানে ওঁকে কখনও নেমন্তন্ন করে না।

আজ না হয় ওঁর দুই ছেলে চাকরি-বাকরি করছে। আজ ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটে থাকবারই কথা। কিন্তু পনেরো বছর আগেও কেউ কোনদিন দেখেনি যে, এই ভদ্রলোকের মুখে হাসি নেই।

বৈকুণ্ঠ ডাক্তার বলেন, ভুবনবাবুর চোখের গড়নটাই অদ্ভুত। দু'চোখের দুই কোণের চামড়া সব সময় কুঁচকে থাকে, তাই মনে হয়, উনি সব সময় হাসছেন।

ক্লাবের সেক্রেটারী নরেশ নিজের চোখে দেখেছে, ভুবনবাবুর বড় ছেলে সুজিত যেদিন ধর্মতলার রাস্তাতে মোটরগাড়ির ধাক্কা খেয়ে জখম হলো, পুলিশ যখন অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে সুজিতকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিল, তখনও সুজিতের গায়ের রক্তমাখা জামাটার দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু ওইরকম হাসছিলেন। যেন খাঁটি স্থিতপ্রজ্ঞটি ; সুখে হাসেন, দুঃখেও হাসেন।

আজ বিকালের যশোর রোডের সুদূর শেষের মাথার উপর জোড়া রামধনু, যেন আকাশের রঙীন খুশির একটি তোরণ দাঁড়িয়ে আছে। হরিনাথের গাড়ির ড্রাইভার সেই দিকে তাকিয়ে জোরে-চলা গাড়ির বেগ আরও বাড়িয়ে দিতেই দুলালবাবু বলে উঠলেন—ওই ওই ওই।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক দাবিয়ে গাড়িটাকে থামিয়ে দেয় ড্রাইভার। হরিনাথ জিজ্ঞেস করেন—কী ব্যাপার, দুলালবাবু?

দুলালবাবু—ওই যে স্যার, ওই দেখুন, উনিই হলেন ভুবনবাবু।

একটা ফটকের ভাঙা থামের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন যে ভদ্রলোক, গায়ে ফতুয়া আর চোখের কোণে কুঞ্চিত হাসি, তাঁর দিকে তাকিয়ে হরিনাথের চোখে যেন দুঃসহ একটা বিস্ময় ছটফটিয়ে ওঠে। চল্লিশ বছর আগের দেখা কোন মানুষকে হঠাৎ দেখতে পেলে সহজে চিনতে পারা যায় না। কিন্তু এ তো বেশ স্পষ্ট করে আর সহজেই চিনতে পারা যাচ্ছে, যদিও মাথাটা সাদা হয়ে গিয়েছে, এই ভুবনবাবু হলো সেই ভুবন মজুমদার, হরিনাথের সঙ্গে একই কলেজের একই বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিল যে, যাকে ক্লাসের প্রায় সবাই, এমন কী প্রফেসার আদিত্যবাবু পর্যন্ত বলতেন, মিস্টার নৈমিষারণ্য।

হরিনাথ বলেন—চিনেছি। এ আমার চেনা লোক। ওকে আমি তিন-তিনবার ডিবেটে হারিয়ে দিয়ে বেকুব করে দিয়েছিলাম।

দুলালবাবু—ভালই করেছিলেন স্যার।

হরিনাথ—যন্ত্র না মন্ত্র, কার জোর বেশী? এই ভুবন মজুমদার লোকটি মন্ত্রের পক্ষ নিয়ে আমার যন্ত্রের বিপক্ষে খুব গলাবাজি করেছিল। কিন্তু...।

হেসে ফেললেন হরিনাথ—ডিবেটে আমার যন্ত্রের কাছে বেচারা ভুবন মজুমদারের মন্ত্র সেদিন বড়ই মার খেয়েছিল। কিন্তু মিস্টার নৈমিষারণ্যের অদ্ভুত স্বভাব ঃ ভাঙে তো মচকায় না। হেরে গিয়েও লজ্জা পায়নি, ঠিক ওইরকম চোখ কুঁচকে হেসেছিল। যাই হোক, আমি ভাবছি, লোকটা এতদিন বেঁচে রইল কেমন করে? এরকম লোক টিকে থাকে কী করে? আশ্চর্য ব্যাপার।

দুলালবাবু—এটা কী রকমের ব্যাপার, বলবো স্যার? এটা হলো চুয়াডাঙ্গার ম্যালেরিয়া।

ভুগিয়ে ভুগিয়ে হাড়সার করে দেয়, রোগী তবু আশি বছর বেঁচে থাকে।

হরিনাথ—যা বলেছেন।...ড্রাইভার, গাড়িটাকে একটু এগিয়ে নিয়ে ওখানে থামাও, ওই ফতুয়া ভদ্রলোক যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভুবনবাবুর চোখের একেবারে সামনে এসে গাড়িটা থামে। গাড়ি থেকে নামলেন হরিনাথ, তাঁকে অনুসরণ করে দুলালবাবুও নামলেন। গাড়ির ফুটবোর্ডের উপর একটা পা রেখে, আর একহাতে গাড়ির দরজাটার গা ছুঁয়ে, আর-একটা হাত ভুবনবাবুর দিকে তুলে ও দুলিয়ে কথা বলেন হরিনাথ—চিনতে পারছেন?

হরিনাথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই হেসে ওঠেন ভুবনবাবু—চিনেছি। কেমন আছেন আপনি?

হরিনাথ—বেঁচে আছি। আপনি কেমন আছেন?

ভুবনবাবু—বেঁচে আছি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বেশ অদ্ভুতরকম বেঁচে আছেন।

—আপনি কী রকম বেঁচে আছেন?

—এই দুলালবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। যা-ই হোক, হ্যাঁ, শুনলাম, আপনার এই বাড়ির বাগানে রক্তজবার গাছে নাকি সাদা জবা ফুটেছিল?

—শুনেছি।

—আপনি বিশ্বাস করেন?

—অবিশ্বাস করি না।

—এরকম একটা গল্পকেও অবিশ্বাস করতে পারলেন না?

—না।

—কেন?

—এটা তো গল্প নয়।

—তবে কী?

—এটা একটা ঘটনা।

—সত্যিই যে এটা একটা ঘটনা, তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

—না।

—তবে?

—কিন্তু এমন কোন প্রমাণও পাইনি যে, ওরকম কোন ঘটনা ঘটেনি, কিংবা ঘটতে পারে না।

—কিন্তু আপনার বিশ্বাসের একটা যুক্তি থাকবে তো?

—না।

—কেন?

—যুক্তিকে বিশ্বাস করা যায় না।

—তার মানে?

—তার মানে, আজ যেটা যুক্তি, কাল সেটা যুক্তি নয়। আবার, আপনার নাতির কাছে যেটা যুক্তি সেটা আপনার কাছে যুক্তি নয়।

—বাঃ, তা হলে আর কী বলতে পারি? তা হলে আপনার রক্তজবার গাছে সাদা জবা ফুটুক।

ব্যস্ত হয়ে গাড়ির ভিতরে উঠে বসলেন হরিনাথ, সঙ্গে সঙ্গে দুলালবাবু। হরিনাথের দুই চোখের দুই ভ্রূকুটির পাশে দুটো রগ ফুলে উঠে কাঁপছে। মুখটা লালচে হয়ে গিয়েছে।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করতেই জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন হরিনাথ। দুলালবাবু বলেন—

ভুবনবাবুর মত মানুষের সঙ্গে আপনার যেচে কথা বলা উচিত হয়নি, স্যার।

হরিনাথ—তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু এরকম একজন অদ্ভুত ভুবনবাবুর তো বোঝা উচিত যে, তিনি ওরকম উদ্ধত হয়ে কার সঙ্গে কী কথা বললেন।

দুলালবাবু—নিজেই একদিন বুঝবেন।

হরিনাথ—আপনারা আমার জয়ন্তী অনুষ্ঠানের একটা ব্যবস্থা করেছেন বলে শুনেছি।

দুলালবাবু—হ্যাঁ স্যার। এই মঙ্গলবারই জয়ন্তী করা হবে।

হরিনাথ—আমাকে নিশ্চয় একটা মানপত্র দেবার ব্যবস্থা করেছেন?

দুলালবাবু—নিশ্চয়। ওটা তো জয়ন্তীর একটা সাধারণ নিয়ম।

হরিনাথ—আমার ইচ্ছে, জয়ন্তীতে আপনারা ভুবনবাবুকে নেমন্তন্ন করবেন। আর, মানপত্রটা ভুবনবাবুই পড়বেন।

দুলালবাবু—বেশ ; তাই হবে, স্যার।

দুই

ক্লাবের সেক্রেটারী নরেশ অনেক খেটেছে। দুলালবাবুর বাড়িতেই জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। নরেশ নিজেও ডেকরেটরের লোকের সঙ্গে সমান ব্যস্ত হয়ে আর হাত চালিয়ে, রঙীন কাপড়ের ঝালর দিয়ে মঞ্চ সাজিয়েছে।

সন্ধ্যা হতেই রায়কুঠি পাড়ার প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ নবীন প্রবীণ অনেক উৎসুক, আগন্তুকের ভিড়ে ভরে গেল জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের ঘর। বাতাসও সুগন্ধে ভরে গিয়ে আর নিবিড় হয়ে থমথম করছে। মঞ্জরী সমিতির ছোট-ছোট মেয়েরা দুই সারিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজালো। গাড়ি থেকে নেমে আর হেসে হেসে এগিয়ে এলেন হরিনাথ। জয়ন্তীর ঘরে ঢুকলেন।

হরিনাথ বলেন—এ কী কাণ্ড করেছেন, দুলালবাবু? ঘরের দরজা-জানালা চেয়ার-বেঞ্চি সবই কি সেন্ট দিয়ে ধুয়েছেন?

দুলালবাবু—আজ্ঞে, কী বললেন?

হরিনাথ—এত বেশি সুগন্ধ ছড়ালেন কেন? শ্রদ্ধা বেশি বলে কি সুগন্ধও বেশি ছড়াবেন?

নরেশ—আজ্ঞে, আজ বিকেলবেলা চমৎকার একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গিয়েছে। সুগন্ধ আরকের বড় বড় কাঁচের জার বয়ে নিয়ে একটা ঠেলা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলেদের একটা দল ঢিল মেরে সব কাঁচের জার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, সব আরক মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। তাই স্যার, তখন থেকে এত সুগন্ধ ভুরভুর করে উড়ছে।

হরিনাথ—তাই নাকি? তা বেশ।

অভ্যর্থনার ফুলের গুচ্ছ দিয়ে সাজানো চেয়ারটিতে বসে আগন্তুক অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে থাকেন হরিনাথ। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টিটা সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে যাকে খুঁজছে, তাকেই তিনি দেখতে পেলেন না।

দুলালবাবু কাছে এসে বলেন—ভুবনবাবু আসেননি।

হরিনাথ—নেমন্তন্ন করা হয়েছিল?

দুলালবাবু—হ্যাঁ স্যার, ভুবনবাবু শুভেচ্ছার একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।

হরিনাথ—কী লিখেছেন?

দুলালবাবু—এক লাইন সংস্কৃত লিখেছেন, জীবতু শারদং শত।

হরিনাথ—তা হলে মানপত্র কি আপনি পড়বেন?

দুলাল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরিনাথ—পড়ুন তবে।

দুলালবাবু মানপত্র পড়লেন ঃ হে যশস্বী কৃতী সুধী সংস্কারমুক্ত প্রগত প্রজ্ঞাযুক্ত সৌভাগ্যবান ষাট বৎসরের সমাদরে ধন্য আপনার জীবনের উদ্দেশে সম্মান নিবেদন করিয়া আমরা নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

হরিনাথ বলেন ঃ আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন, তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমি একজন সুখী মানুষ। কোন দেবতা যদি থাকেন, আর তিনি এসে আমাকে বলেন, কী চাও ঃ তবে আমি বলবো, কিছু চাই না। আমি সবই পেয়েছি। আমার সবই আছে। সেকেলে বিশ্বাসের কোন বোঝা আমার মাথার উপর নেই। তাই চলতে গিয়ে আমাকে কখনও ভেঙে পড়তে হয়নি, কখনও ভেঙে পড়বো না। গর্ব করি না, তবে অনুভব করি, আমি একটি সরল সহজ ও পরিচ্ছন্ন জীবনের মানুষ হতে পেরেছি। ধন্যবাদ।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে এসে ডাক দিলেন হরিনাথ—চলুন দুলালবাবু, একটু বেড়িয়ে আসি।

দুলালবাবু—চলুন স্যার, সুগন্ধটা খুব বেশি কড়া। বোধহয় আপনার বেশ অসহ্য বোধ হয়েছে।

হরিনাথ হাসতে চেষ্টা করেন।—তার চেয়ে বেশি অসহ্য বোধ হয়েছে, আপনাদের ভুবনবাবুর ওই অদ্ভুত এক লাইনের সংস্কৃত। ভদ্রতার রকমটা তো দেখলেন। নিজে না এসে চিঠি পাঠালেন—এ শুধু আমাকে তুচ্ছ করে একটা খোঁচা দেওয়া।

দুলালবাবু—আসলে এটা কিন্তু একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

হরিনাথ—যা-ই বলুন, এটা একটা স্পর্ধা নয় কি?

দুলালবাবু—তা বটে।

হরিনাথ—স্পর্ধাটার একটু শিক্ষা পাওয়া উচিত নয় কি?

দুলালবাবু—খুব উচিত।

গাড়ি চলতে থাকে। হরিনাথ বলেন—আমি ভাবছি, এই মিথ্যে স্পর্ধা যেদিন ভেঙে গিয়ে, মাথা নীচু করে আর কাঁচুমাচু হয়ে আপনাদের ভুবনবাবু আমার কাছে এসে সিমপ্যাথি চাইবেন, সেদিন আমিই বা কী বলে সান্ত্বনা দেব?

দুলালবাবু—শুনেছি, ছোট ছেলে অজিত নাকি বেশ ভাল একটা চাকরি পেয়েছে।

—কিসের চাকরি?

—রেলওয়ের অফিসার।

—কী রকমের অফিসার?

—সেটা ঠিক বলতে পারছি না। শুনেছি, মাইনেটা শুরুতেই ছ'-সাতশো টাকা। কী যেন একটা পরীক্ষাতে, খুব কঠিন কমপিটিটিভ একটা পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়েছিল অজিত।

—ভাল কথা। তবে, দেখা যাক্।

—কী বললেন?

—শেষ পর্যন্ত দেখা যাক। আমি কারও অশুভ কামনা করছি না, দুলালবাবু। কিন্তু ভুবনবাবুর এরকম একটা অদ্ভুত আদ্যিকেলে চরিত্রের একটা স্বাভাবিক পরিণাম তো আছে।

—ঠিক কথা।

—অহংকার করবার কোন সম্বল নেই। তবু অহংকার করবেন। একালের মানুষ হয়ে, সেকালের মধ্যে বসে থাকবেন। বাড়িটাকে যত রকমের যুক্তিহীন সংস্কার আর বিশ্বাসের ডিপো করে নিয়ে মনে করবেন, খুব চমৎকার একটা জীবন যাপন করছেন। কী ভেবেছেন উনি, জীবনটা একটা ম্যাজিক?

—যেতে দিন, যেতে দিন। আপনার মত মানুষের পক্ষে ভুবনবাবুর ভাল-মন্দ নিয়ে এত চিন্তা করবার কোন দরকার নেই।

—আমিও তাই মনে করি। তবে আসল কথাটা কি জানেন? আমি ভুবনবাবুর ভালটাই কামনা করি। উনি যেমনটি হয়ে রয়েছেন, তাতে ওঁরই ক্ষতি বাড়ছে।

—বাড়বেই তো। সময় বুঝে আর দরকার বুঝে যে মানুষ নিজেকে সামান্য একটু বদলে নিতেও পারে না, তাকে আজ না হোক কাল, একদিন ভুগতে আর ভেঙে পড়তে হবে।

—আমার বিশ্বাস, এই ছেলেকে পুরনো গোঁড়ামির ভেড়া করে রাখবার সাধ্যি হবে না ভুবনবাবুর।

—অজিত ছেলেটি কিন্তু খুবই ভাল ছেলে। দেখতে যেমন ভাল, স্বভাবও তেমনই ভাল। শুনলাম, এ বছর সারা ভারত রেলওয়ের সেরা হকি টীমের ক্যাপ্টেন হয়ে খেলেছে। ভাগ্নে দীপেন বলছিল, ওর বন্ধু অজিত স্কুলের ক্লাসের পরীক্ষা থেকে শুরু করে এম-এ পরীক্ষা পর্যন্ত বরাবর অঙ্কেতে ফার্স্ট হয়ে এসেছে।

—আমার সন্দেহ, এই ছেলেই বাপকে ভাল শিক্ষা পাইয়ে দেবে।

—আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন, এই ছেলের বিয়েটাই ভুবনবাবুকে শিক্ষা পাইয়ে দেবে।

—সমস্যা একটা দেখা দেবেই, ছেলেটা যদি মানুষ হয়ে থাকে, একালের মানুষ।

—বড়ছেলের বিয়েতে অবশ্য তেমন কোন বাধা দেখা দেয়নি। শুধু একটু...।

—শুধু একটু বরপণ কিংবা একটু দানসামগ্রীর সমস্যা, তাই না?

—না।

—তবে কী? কুল গোত্র পর্যায় রাশি নক্ষত্র লগ্ন নিয়ে একটু বাদ-বিবাদ?

—না।

হাসতে থাকেন হরিনাথ।—প্রণামীর কাপড়, অধিবাসের থালা-বাটি কিংবা কী যেন বলে, ননদ-পুঁটলি আর পিঁড়ি তোলার দাবি-দাওয়া ও দান নিয়ে একটু তর্কাতর্কি?

—না।

—কী আশ্চর্য, খাঁটি আদ্যিকেলে প্রাণের মানুষটি মনুসংহিতা হাতে নিয়ে মেয়ের বাপকে একবার একটু তাড়াও করেননি?

দুলালবাবুও হাসতে থাকেন।—জানি না, শুনিনি। শুনেছিলাম, মেয়ে দেখতে গিয়ে মেয়ের গান শুনে একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ভুবনবাবু, তাই বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি করেছিলেন।

—ভুবনবাবুর বাগানের পাখিগুলোও তো গান গায়।

—মেয়ে শুধু থিয়েটার আর সিনেমার গান গেয়েছিল।

—তাই বলুন।

—মেয়ের মা সে-কথা জানতে পেরে, সাতদিনের মধ্যে মেয়েকে আট-দশটা ঠাকুরের গান শিখিয়ে নিয়ে আবার ভুবনবাবুকে মেয়ে দেখতে ডাকলেন। মেয়ের গান শুনে খুব খুশি হলেন ভুবনবাবু, তারপর সাতদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল।

—এই মেয়ের বাপ-মা বোধ হয় নবান্ন পছন্দ করেন না। কিংবা বুড়ো বটের পুজো করেন।

—তা জানি না। তবে নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন, মনে হয়। এঁরা হলেন আপনারই দেশের গ্রাম জগৎপুরের গুহরায়।

—হ্যাঁ, চিনেছি। তাঁরা তো সর্বস্ব খুইয়ে এখন ক'বিঘে ধানজমি আর দু'চারটে আমবাগান সম্বল করে কোনমতে টিঁকে আছেন। ভুবনবাবুর এই পুত্রবধূটি কি পরমেশ গুহরায়ের মেয়ে?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। পরমেশবাবু আমার ভাগ্নে দীপেনের অফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক।

—স্নানের পর কপালে গোবরতিলক কাটেন।

—জানি না।

—আমি জানি, পরমেশবাবু একজন বিশুদ্ধ সেকেলে রুচির মানুষ।

—কিন্তু আমার ভাগ্নে দীপেন বললে, অজিত যে-মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সে মনে-প্রাণে ও চেহারাতে একেবারে একেলে কালচারের একটি মেয়ে।

—কোথাকার মেয়ে?

—আপনি বেহালাতে কখনও গিয়েছেন?

—অনেকবার।

—অ্যাটর্নি প্রতুল মুখুজ্জের বাড়িটা দেখেছেন?

—দেখেছি।

—সেই বাড়ির ঠিক মুখোমুখি বাড়িটাকেও দেখেছেন কী?

—দেখেছি। সুহৃদ সেনের বাড়ি, চমৎকার স্টাইলের বাড়ি।

—সুহৃদ সেনকেও চেনেন নাকি?

—চিনি বৈকি। মহিম কোল কোম্পানীর সুহৃদ সেন। দশ বছর আগে ওই কোম্পানীর একটা মামলাতে আমিই বিবাদী পক্ষের সাক্ষীগুলোকে জেরা করেছিলাম।

—অজিত যাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সে হলো এই সুহৃদ সেনের ভাইঝি।

তিক্ত তীব্র উগ্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন হরিনাথ—কিন্তু সুহৃদ সেনের ভাইঝি কি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে? ভাগ্নে দীপেন কী বলে?

—দীপেন বলে, সেরকম কোন খবর সে শোনেনি।

—দু'জনের মধ্যে কি কোন রোমান্স হয়েছে?

—না। সে খবর জানে না দীপেন।

—তাহলে বলুন, নিতান্ত একটা একতরফা ব্যস্ততা।

—তাই। দীপেন বললে, অজিত ওই মেয়েকে একবার শুধু চোখের দেখা দেখেছে।

হেসে ফেলেন হরিনাথ—বয়সের ধর্ম। এরকম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে ধর্মটা একতরফা হলে যে কোন ফল হয় না, সেটা স্বীকার করবেন তো?

—স্বীকার করতেই হয়।

—এই যুগটা তো আর সে যুগ নয়, দুলালবাবু। উঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে বললেই মেয়েটি সুড়সুড় করে উঠে এসে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়বে না।

—আমিও দীপেনকে এই কথা বলেছি। ভুল করেছে অজিত, ছেলেটার জন্য দুঃখ হয়।

—কিন্তু আসল ভুলটা যে কী, সেটা বোধ হয় বুঝতে পারেনি। দমদমের দেউলবাড়ির ছেলে বেহালার সুহৃদ সেনের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছেটা যে একটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

—শুনেছি, অজিতের মা বেহালাতে মেয়ের মা'র কাছে অনেক চিঠি দিয়েছেন।

—কিন্তু কোন জবাব পেয়েছেন কি?

—দীপেন বললে, এখনও কোন জবাব পাননি।

—কোনদিনও পাবেন না।

—অজিতের মা চক্রবর্তীকে ডাকিয়ে এনে আর পঞ্জিকা ঘেঁটে ভাল দিনক্ষণ খুঁজতে শুরু করে দিয়েছেন। মহিলা কেন যে কোন্ সাহসে এরকম একটা আশা ও চেষ্টা করছেন, বুঝতে পারি না।

—কিন্তু মহল ভদ্রলোক কী করছেন?

—তিনি নির্বিকার।

—উনি কি হ্যাঁ বা না কিছুই বলছেন না?

—না। দীপেন বললে, অজিতের বাবা বোধহয় কিছুই জানেন না। তার মানে, নির্বিকার, একজন রাজ-মাকড়সা। জাল পেতে বসে আছেন, নড়াচড়া করেন না, মাছিটি উড়ে এসে জালের মধ্যে পড়ে ফেঁসে গেলেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন আর শক্ত করে গুটি বুনে দিয়ে মাছিটাকে আটক করে ধরবেন।

—কিন্তু পৃথিবীতে দুর্ঘটনা কিছু কম হয় না, স্যার। আমার ভয় হয় এ বিয়ে হয়তো হয়েই যাবে।

—কখ্‌খনো হবে না, হতে পারে না। সুহৃদ সেনের ভাইঝিকে আমি একটু চিনি। সে মেয়ে ও-বাড়িতে আসবেই না। পিয়ানো বাজিয়ে খুশি হয় যে-মেয়ে, ও-বাড়িতে আসবেই না। পিয়ানো বাজিয়ে খুশি হয় যে-মেয়ে, সে-মেয়ে ভুবনবাবুর ওই দেউলবাড়িতে আসবে কেন? চেঁচিয়ে উলু দেবার জন্যে?

আমারও তো এই প্রশ্ন?

আবার চেঁচিয়ে উঠলেন হরিনাথ—আমি আপনাকে এখনই বলে রাখছি, শিগগিরই দেখতে পাবেন, রাজমাকড়সার মতলবটা মার খেয়ে কেমন কেন্নোটি হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, লোকটা চল্লিশ বছর আগে আমাকে চ্যালেঞ্জ করতো, এখনও সেইরকম চ্যালেঞ্জ করছে। দুঃসাহস বটে।

দুলালবাবু—আজ্ঞে।

হরিনাথ—বলছি, এবার ফেরা যাক্।

তিন

শ্যামবাজারে হরিনাথের এই বাড়িটা তাঁর নিজেরই কৃতিত্বের আর রোজগারের একটি রূপের পরিচয়। এই বাড়ির নক্সা তৈরী করেছিল লণ্ডনের এক বিখ্যাত কোম্পানী অব আর্কিটেক্টস্। হরিনাথ আজ আর জানেন না, কোন খবরও রাখেন না, হুগলী জেলার জগৎপুর নামে একটি গ্রামে তাঁর সেই পৈতৃক বাড়িটা এখন কী দশায় আছে। কিন্তু স্মরণ করতে অবশ্য পারেন যে, সেই পুরনো গ্রাম্য দালানটার সামনের দিকের দুটো ঘরের ছাদ ধসে পড়েছিল। বোশেখ মাস পড়তেই হনুমানের দল এসে আমবাগানের সব কচি আম ছিঁড়ে ও কামড়ে একেবারে তছনছ করে দিয়ে চলে যেত। ঠাকুমা তাঁর জপের মালা হাতে নিয়ে তুলসী-চাতালের এক কোণে বসে হনুমানের দলের সেই উপদ্রবের দৃশ্যটা দেখতেন, কিন্তু তাঁর চোখে সামান্য একটু ক্ষোভও ছটফট করে উঠতো না। কী গভীর দৃষ্টি ; ঠাকুমা যেন টাপুর-টুপুর একটা বৃষ্টির দৃশ্য দেখছেন। রামনাম করলেই কিংবা রামায়ণ বইটার একটা পাতার দিকে তাকালেই যাঁর দুই চোখ জলে ভরে যেত, তিনি যে রামের অনুচরদের এরকমের দৌরাত্ম্যের কাণ্ড দেখেও ভাবাবেশে আপ্লুত হবেন, এটা স্বাভাবিক। সেই ঠাকুমার কথা আজও মনে পড়ে হরিনাথের। বয়স যখন বারো বছর, যখন বেশ জটিল রকমের টাইফয়েডে ভুগে চেহারা হাড়সার হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুমা তখন রোজই দু'বেলা হরিনাথের কপালে জপমালা ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে জপ করতেন। সেই ঠাকুমার কথা মনে পড়লে হেসে ফেলেন হরিনাথ। স্ত্রী মনোময়ীকে অনেকবার বলেছেন—আমার সেই ঠাকুমা খুবই অদ্ভুত মানুষ ছিলেন।

জগৎপুরের সেই বাড়িটাকে খুঁজে দেখবার জন্যে হরিনাথের প্রাণে ইচ্ছা-আকুলতার সামান্য একটু ছায়াও নেই। জগৎপুরের সেই বাড়ি যদি ভেঙ্গে দশটুকরো হয়ে গিয়ে থাকে তো গিয়েছে, ভালই হয়েছে। সেই বাড়িতে পড়ে থাকলে হরিনাথ আজ বড়োজোর স্কুলের একজন হেডমাস্টার হতেন। আর সন্ধ্যা হতেই কীর্তনবাড়িতে গিয়ে গান শুনে মূর্ছা যেতেন। মনে আছে হরিনাথের, জগৎপুরের স্কুলের হেডমাস্টার সেই কীর্তন শুনতে বসে একঘণ্টার

মধ্যে অন্তত দু'বার মূর্ছা যেতেন।

শ্যামবাজারে হরিনাথের এই বাড়ির মেজেতে মোজেয়িকের হীরের দানাগুলি সত্যিকারের হীরের কুচির মত জ্বলজ্বল করে। ঝলমল করে দরজা-জানালার যত রূপালী সিল্কের পর্দা। তিন বছর হল আদালতে আর যান না হরিনাথ। মক্কেলরা এই বাড়িতে তাঁর কাছে এসে ফী দিয়ে আর পরামর্শ নিয়ে চলে যান। বাড়িতে বসা এই রোজগারের অঙ্কটাও সামান্য নয়। বরং বলতে হয়, দুলালবাবু যেমন বলেন, বেশ অসামান্য।

মা'র কথা কিছুই মনে পড়ে না। হরিনাথ শুধু শুনেছেন, যখন তাঁর বয়স এক বছর, তখন মা মরে গিয়েছেন। শুনেছেন মা'ও অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। লক্ষ্মীপুজোর দিনে আমবাগানেও আলপনা দিতেন। হরিনাথের বাবা জীবনধন মিত্রের জেদ ছিল, কলকাতাতে কোনদিনও বাড়ি করবেন না, যদিও বাড়ি করবার মত টাকা ছিল। কলকাতাতে শুধু একবার এসেছিলেন হরিনাথের বাবা, একদিন থেকেই চলে গিয়েছিলেন। হরিনাথকে তাই মেসে হোস্টেলে আর হোটেলের মানুষ হয়ে লেখাপড়ার জীবনটা দিতে হয়েছে।

রোজগারের জীবন শুরু হবার পরেও জগৎপুরে কোনদিন আর যাননি হরিনাথ। কিন্তু রোজগারের পাঁচ বছরের মধ্যে কম করেও দশ হাজার টাকা জগৎপুরের জীবনধন মিত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকবার স্ত্রী মনোময়ীর কাছে জীবনের একটা দায়মুক্ত তৃপ্তির কথা বলেছেন হরিনাথ—শুনছো মনো, কেউ কখনও হরি মিত্রের নামে ভুলেও এই নিন্দে করতে পারবে না, সে তার বাবাকে তুচ্ছ করেছে। বাবার সাহায্যের সব টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি।

হরিনাথের বিয়ের ঘটনাও নিতান্ত হরিনাথেরই ইচ্ছার একটি ঘটনা। সে বিয়ের সঙ্গে জগৎপুরের জীবনধন মিত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন সম্পর্ক ছিল না।

জীবনধন মিত্রের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর কী আশ্চর্য হরিনাথের স্ত্রী এই মনোময়ী খুব কেঁদেছিলেন। জীবনে কোনদিনও শ্বশুরকে দেখেননি, জগৎপুরকেও দেখেননি সিভিল সার্জন রায়সাহেব চিরঞ্জীব ঘোষের মেয়ে এই মনোময়ী সেদিন হরিনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি কি এ সময়ে জগৎপুরে একবার যাবে না।

হরিনাথ—না।

মনোময়ী—কেন?

হরিনাথ—কী দরকার? খবর পেয়েছি, ক্ষিতুকাকার ছেলে মনু বাবার শ্রাদ্ধ করবে। করুক।

মনোময়ী—তুমি করবে না?

হরিনাথ—বাবার কথা স্মরণ করা যদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তবে করবো। কিন্তু মাথা নেড়া করে শ্রাদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা আমার যুক্তিতে বুদ্ধিতে ও রুচিতে বাধে।

এই বাড়ি তৈরী করবার সময়েও একটা প্রশ্ন করেছিলেন—এ কী রকমের বাড়ি হলো।

হরিনাথ—কেন? কী হলো?

—কীরকম যেন লাগছে।

—কী আবার লাগতে পারে?

—হোটেল-হোটেল লাগছে।

—যদি তাই হয়, তবে অসুবিধের তো কিছুই নেই।

দমদমের দুলালবাবুর বাড়ি থেকে ফিরতে আজ বেশ সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বেশ ক্লান্তও হয়েছেন হরিনাথ। তবু দোতলায় উঠে কোন একটি বিশ্রামের ঘরে বসতে পারলেন না। নীচের তলার ড্রইং রুমের ভিতরে গিয়ে সোফার উপরে বসে একটা হাই তোলবারও সুযোগ পেলেন না। পাশের ঘর, যে-ঘরের নাম হয়েছে চেম্বার, সেই ঘরের ভিতরে আগন্তুক অনেকজনের কলরব শোনা যাচ্ছে ; কাজেই সেই ঘরে এখন একবার না ঢুকে চলে যাবার

কোন উপায় নেই। কিন্তু সেজন্য একটুও দুঃখিত নন হরিনাথ, কাজ তো করতেই হবে। কাজ ছাড়া জীবন তো জীবনই নয়। দুলালবাবুকে একদিন একটু বুঝিয়ে বলবার জন্যেই কথাটা বলেছিলেন হরিনাথ—আপনারা বলেন, পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে। ওটা বাজে কথা। আমি বুঝেছি, পলাইতে পথ নাই কাজ আছে পিছে।

চেম্বারে ঢুকে এক এক করে এক-একটি কাজের দাবিকে খুশি করতে করতে রাত প্রায় দশটা হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু একটু অখুশি হয়ে চলে গেলেন, তাঁদের পার্টির নমিনেশন নিয়ে পার্লামেন্টের একটা আসনের জন্য ইলেকশনে দাঁড়াতে রাজি হলেন না হরিনাথ। তিনটে সোসাইটির তিনজন সেক্রেটারী অনেক কাগজপত্র নিয়ে বসেছিলেন। সব কাগজপত্র পড়ে পড়ে সই করলেন ট্রাস্টি হরিনাথ। মহিলা আশ্রমের সাহায্যের জন্য ব্রজবাবুর হাতে পঁচিশ টাকার একটি চেক দিলেন। রেলওয়ের বিরুদ্ধে খেসারত আদায়ের মামলা করবেন হাজারীলাল আগরওয়ালা। তাঁকে পরামর্শ দিতে একটি ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে।

ঘর যখন শূন্য তখন টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে দোতলার একটি ঘরের সঙ্গে কথা বললেন হরিনাথ—মনো, তুমি একবার এখানে এসো, হ্যাঁ, চেম্বারে...তাতে হয়েছে কী? এখানে কেউ এখন নেই।

হরিনাথবাবুর স্ত্রী মনোময়ী, খুব ফর্সা আর রোগা মানুষটি, গলার ভিতরে সব সময় একটা অদ্ভুত ব্যথা টনটন করে বলে যিনি গলাতে সব সময় ওষুধ-মাখানো একটুকরো ফ্লানেল জড়িয়ে রাখেন, তবু যাঁর মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে, তিনি একটু গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকলেন। হরিনাথবাবু টেবিলের উপর একটা ফাইলের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—ডেকেছি, একটি কথা জানবার জন্যে।

—বল।

—সিতুর কি বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে?

—একথা জিজ্ঞেস করবার জন্য তুমি আমাকে নীচে ডেকে আনলে?

—তাতে কী হয়েছে?

—জানই তো, একটু পরিশ্রম হলেই আমার বুক ঢিপঢিপ করে ; মাথাও ঘোরে। ডাক্তার বলেছেন...।

—জানি, কিন্তু তুমি এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়েই হেসে ফেলেন মনোময়ী—না কিছু না বল।

হরিনাথ—সিতু কি আজও বেহালাতে সুহৃদের বাড়িতে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—রোজই যায়?

—আজকাল প্রায়ই যায়।

—সুহৃদের স্ত্রী তোমার কী যেন হয়?

—রমা হলো আমার সেজ বউদি মঙ্গলার বোন।

—তুমি কি মনে কর যে, তোমার ছেলে সিতু তার ওই রমা মাসীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রায়ই বেহালাতে যায়?

—না।

—তবে?

—যাকে বিয়ে করতে চায় সিতু, তারই সঙ্গে দেখা করতে যায়।

—আমি অনুমান করছি, সুহৃদের ভাইঝি সেই মেয়েটি কী যেন নাম?

—বীথি।

আমার ধারণা, এক বছরেরও বেশি হবে, বীথির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছে সিতু।

—আমি তাই শুনেছি।

—দেখা-সাক্ষাতের প্রথম ব্যাপারটা হলো কোথায়, কেমন করে?

—তুমিই একদিন সিতুকে সে বাড়িতে পাঠিয়েছিলে।

—কবে?

—গত বছর পুজোর সময় সুহৃদবাবু তোমার কাছে তাঁদের কোলিয়ারীর কী-একটা মামলার পরামর্শের জন্য যখন এসেছিলেন, তখন তুমি তাঁকে কী বলেছিলে, মনে নেই?

—ঠিক মনে পড়ছে না।

—তুমি নিজেই সুহৃদবাবুকে বললে, আমার জন্য অন্য কোন জুনিয়ারের চেয়ে সিতু আপনার মামলা ভাল চালাতে পারবে।

—মনে পড়েছে।

—তুমিই সিতুকে বললে, যাও, বেহালাতে সুহৃদবাবুর বাড়িতে গিয়ে মামলার সব দলিল আর কাগজপত্র বুঝে নিয়ে এস।

—মনে পড়েছে। কিন্তু কথাটা হলো, উকীল তার মক্কেলের বাড়িতে যাচ্ছে, তাতেই তুমি এরকম একটা ধারণা করে ফেলেছো কেন যে, এর মধ্যে অন্য কোন আকর্ষণ আছে?

—মামলা তো কবেই, সাত-আট মাস আগে আপোষে মিটে গিয়েছে। কিন্তু সিতু, তবু তো বেহালার ওবাড়িতে যাওয়া ছেড়ে দেয়নি, যাওয়া বরং বেড়েছে।

—কে বললে?

—মঙ্গলা বললে।

—কোথায় কবে মঙ্গলার সঙ্গে তোমার দেখা হলো?

—এবাড়িতেই দেখা হয়েছে। মঙ্গলা কালও একবার এসেছিল।

—বীথির তো বাপ নেই!

—না।

—বিধবা মা আছেন!

—হ্যাঁ।

—বীথি মেয়েটি তো দেখতে খুবই ভাল। আমি অবিশ্যি শুধু একবারই দেখেছি।

—মেয়ে লেখাপড়াতেও বেশ ভাল।

—গ্র্যাজুয়েট?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া গান-টান ভাল জানে। মেয়ের মামারা তো বলতে গেলে একরকমের সাহেব মানুষ। বোম্বাইয়ে মামাদের কাছে দুটো বছর ছিল বীথি। মামাতো বোনদের কাছ থেকে পিয়ানো বাজাতে শিখেছে।

হেসে ফেলেন হরিনাথ—জানি। মেয়ের মামা এই সেদিন হঠাৎ এসে আমাকে সবই বলেছে। যাক্..., তা হ'লে একটা পিয়ানো কিনে ফেলি, কী বল?

মনোময়ীও হাসেন—সে জন্যে তোমাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। তোমার ছেলে একটা পিয়ানো কিনে ফেলেছে।

—তাই নাকি।

—কিন্তু সিতু নিজের থেকে এখনও আমাকে কিছু বলছে না। আমি শুধু পরের মুখ থেকে শুনছি।

—কেন বলছে না?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—সুহৃদের মত নেই নাকি?

—তাই বা মনে করি কী করে? মঙ্গলা বললে, সুহৃদ তো সিতুর প্রশংসায় একেবারে

পঞ্চমুখ।

—কী বলে সুহৃদ?

—বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় সবাই যা বলে। ইয়ং অ্যাডভোকেট সিতাংশু মিত্রের পশার একদিন তার বাবার পশারকেও ছাড়িয়ে যাবে।

—সুহৃদের স্ত্রী রমা কী বলে?

—রমা বলে, সিতাংশুর কথা শুনলেই বোঝা যায়, এ ছেলে কত শিক্ষিত।

—মেয়ের মা কী বলেন?

—জয়াদি বললেন, সিতাংশু ওর বাপের মুখটি আর মায়ের রংটি পেয়েছে।

—ইনিই তো বছরে একবার করে তীর্থ করতে বের হন?

—হ্যাঁ।

—যাক, তাতে এমন কিছু আসে যায় না, মেয়ে যদি সেকেলে স্বভাবের একজন তীর্থচারিণী না হয়।

—না, মেয়ের স্বভাবে কিংবা রুচিতে সেকেলেপনার কিছুই নেই।

—সুতরাং মেয়ের পক্ষে আমাদের সিতুকে পছন্দ না করবারও কিছু নেই।

—না। মঙ্গলাদি বললেন, বীথি যদিও এখনও মুখ খুলে কিছু বলছে না, তবু খুব বোঝা যায়, সিতুকে ভালবাসে বীথি।

—তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই।

—নেই।

—তাহলে সিতুকে বল যে, মিছিমিছি আর দেরি করে লাভ নেই।

—আমার তো কিছু বলবার দরকার নেই।

—কেন?

—আমার কাজ হলো শুধু শুনে যাওয়া। শুধু শুনছি, সিতুর গাড়ির হর্নের শব্দ শুনলেই বীথি দোতলা থেকে নেমে আর হেসে হেসে এগিয়ে আসে, সিতুকে অন্তত এক কাপ চা না খাইয়ে ছাড়ে না। সিতুকে মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজিয়ে শোনায়।

—কোথায় শুনলে এসব কথা? বোধ করি, মঙ্গলা বলেছে।

—হ্যাঁ। মঙ্গলাদি বললেন, তোমাদের ছেলে যেমন, ওদের মেয়েও তেমন, দুজনেই যখন মনে মনে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখন আর দেরি করো না, একটি শুভদিন দেখে নিয়ে দুজনকে মিলিয়ে দাও।

—না না ; পাঁজি হাতড়ে শুভদিন খুঁজতে হবে না, মনো। সিতু শুধু বলে দিক, অমুক দিনে বিয়ে হবে, বাস্। আমি ধরে নেব, সেই দিনটিই শুভদিন।

মনোময়ীর চোখ দুটো হঠাৎ অপলক হয়ে জ্বলজ্বল করে।—সিতু তোমাকে কেন বলতে যাবে? এরকম কি কোন নিয়ম আছে?

হরিনাথ—বেশ তো, আমাকে বলুক বা না বলুক, বীথিকে বিয়ে করে ফেলুক।

মনোময়ী—বীথির সঙ্গে সিতুর বিয়ের জন্য তুমি আজ হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?

হরিনাথ—কারণ আছে। আমি দেখতে চাই।...

কথা বন্ধ করে আনমনার মত তাকিয়ে থাকেন হরিনাথ। দৃষ্টিটাও বেশ শক্ত হয়ে যায়। হরিনাথ বলেন—লোকটার স্পর্ধাটা যেন সাপের মত আমাকে ছোবল দেবার জন্য আজও চেষ্টা করছে।...আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

মনোময়ী—যাচ্ছি। কিন্তু কে তোমাকে ছোবল দেবার চেষ্টা করছে?

হরিনাথ—আর বলো না। চল্লিশ বছর আগের চেনা ; একটা নিতান্ত সাধারণ অথচ ভয়ানক সেকেলে স্বভাবের লোক। নাম হলো, ভুবন মজুমদার।

চার

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হয়েছে। বেহালার রাস্তাটা যেন পাঁকাল জলের একটা খাল, তারই উপর দিয়ে মোটর লরি বাস আর ছোট গাড়ি ঘাই দিয়ে দিয়ে জলজন্তুর মত ছুটে চলে যাচ্ছে, এপাশে ওপাশে ছিটকে পড়ছে কাদাটে জলের ছন্নছাড়া ফোয়ারা। সুহৃদ সেনের বাড়ির সবুজ ঘাসের যে লন ফুটপাতের লেভেল থেকে এক ফুট উঁচু, সেই লনও জলে ভেসে গিয়েছে। বাড়ির দোতলার বারান্দাতে বসে আর লনের দিকে তাকিয়ে বীথির চোখে যেন একটা ভীরু ও করুণ কষ্টের ছায়া ছমছম করে। ইস, কাকার এত যত্নের আর এত সুন্দর কসমসের কেয়ারিটা জলে ডুবেই যাবে বলে মনে হয়। কিন্তু ফটকের দিকে চোখ পড়তেই সেই ছায়াচ্ছন্ন করুণ চোখের দৃষ্টিটা দীপ্ত হয়ে হেসে ওঠে। লাল শালুক ফুলের একটা গাদা জলে ভেসে এসে গেটের গ্রীলের গায়ে লেগে রয়েছে। মাঝে মাঝে টলমল করে দুলে উঠছে। যেন গেটের গ্রীল ঠেলে দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে চাইছে। কাছাকাছি তো কোন বড় পুকুর কিংবা ঝিল নেই ; কে জানে কতদূরের কোন ঝিলের শালুক এরই মধ্যে ভেসে এসে বেহালার এই রাস্তার জলের উপর পড়েছে।

বৃষ্টি যদিও থেমেছে, আর, দিনটা যদিও রবিবার, তবু বিশ্বাস হয়নি বীথির, আজ বিকেলে সিতাংশু এখানে আসতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে চমকে ওঠে আর আশ্চর্য হয় বীথি, সিতাংশু সত্যিই এসেছে।

আর এখানে একটি মুহূর্তও চুপ করে বসে থাকবার তো কোন মানে হয় না। এখনই নীচে নেমে গিয়ে সিতাংশুর কাছে গিয়ে আশ্চর্যের কথাটা বলে দিতে হবে ঃ আমি ভাবতে পারিনি যে, আপনি আজ আসবেন।

উঠে গিয়ে ঘরের ভিতরে আয়নাটার সামনে দাঁড়ায় বীথিকা। তারপর, দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই থেমে যায়। কাকিমা ঘরে ঢুকেছেন, আর বীথিকার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। কিন্তু কোন কথা বলছেন না। এটাও একটু আশ্চর্যের ঘটনা বলতে হবে। সিতাংশু যে এসেছে, সেটা তো বুঝতেই পেরেছে কাকিমা। এসময়ে কোনদিনও কখনও তিনি এভাবে বীথির কাছে এসে দাঁড়াননি, ওভাবে চুপ করে বীথির মুখের দিকেও তাকাননি।

বীথি—কী, কাকিমা?

রমা বলেন—না, কিছু না।

—কিন্তু কী যেন ভাবছো বলে মনে হচ্ছে?

—কিছু ভাবছি না ; কিন্তু বুঝতে পারছি না, আজ হঠাৎ কেন...।

—কিসের হঠাৎ কেন? কী হলো?

—আজ হঠাৎ সাদা গরদের শাড়িটা পরলে কেন?

লাল পেড়ে সাদা গরদের শাড়ি পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ের গায়ে ভাল সাজে না, একথা সবাই বলবে। কিন্তু বীথিকে লালপেড়ে সাদা গরদের শাড়িতে কেমন মানায়, সেটা কাকিমা খুব ভালই জানেন। ওই সাদা গরদের শাড়িতে সেজে নিয়ে একবার মেয়েদের ইস্কুলের সরস্বতী পুজো দেখতে গিয়েছিল বীথি। মেয়েরা সবাই বীথিকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর পাড়ার মেয়েদের মধ্যে লালপেড়ে সাদা গরদ পরবার শখটা কীরকম বেড়ে গেল, সেটা কাকিমা অনেক দেখেছেন আর খুশি হয়ে অনেক হেসেছেন। কাকিমার এই হঠাৎ কেন কথাটার তো কোন মানে হয় না।

বীথি বলে—বুঝলাম না, তুমিই বা আজ হঠাৎ কেন একথা জিজ্ঞেস করছো?

রমা বলেন—একটা কথার কথা ; মনে এল তাই বলে ফেললাম।

চলে গেলেন রমা। বীথি নীচের তলার ঘরে এসে আর সিতাংশুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে—আজ কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করতে পারিনি যে, আপনি আজ আসবেন।

সিতাংশু—আমি কিন্তু আগে থেকেই মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা এঁটে রেখেছিলাম যে, বৃষ্টি বন্যা ভূমিকম্প যা-ই হোক না কেন, আজ আমি এখানে আসবোই আসবো।

বীথি—আপনাদের শ্যামবাজারও বোধ হয় ডুবেছে।

সিতাংশু—সামান্য। বাচ্চা ছেলেরা রাস্তার জলে সাঁতার কাটছে।

হেসে ফেলে বীথি। সিতাংশুও হাসে। তোমাদের বেহালার রাস্তাতে এখন বোধ হয়, ডুবসাঁতারও সম্ভব।

বীথি—আমি যাই, চা নিয়ে আসি।

সিতাংশু—চা একটু পরে আনলেও চলবে। আগে আমার একটা ইচ্ছের কথা শুনে নাও।

বীথি—বলুন।

সিতাংশু—এইবার আমাদের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই কবে যাবে বল?

সেই মুহূর্তে কাকিমার ডাক শুনে চমকে ওঠে বীথি। কাকিমা ডাকছেন—বীথি, একবার এদিকে এস।

দূর থেকে নয়, পাশের ঘরের ভিতর থেকেও নয়, কাকিমা এই ঘরেরই দরজার পর্দাটার ওদিক থেকে ডাক দিয়েছেন। কাকিমা কি এতক্ষণ দরজার পর্দাটার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন?

বীথি ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতেই রমা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আবার ডাক দিলেন—শোন।

বীথি—বল।

রমা—সিতাংশু যে-কথা জিজ্ঞেস করছে, সে কথার কোন জবাব দিও না।

বীথি—তার মানে? ভদ্রলোক একটা কথা জিজ্ঞেস করছেন, সে কথার কোন জবাবই দেব না বলছো?

রমা—হ্যাঁ। জবাব দিলেও স্পষ্ট করে কিছু বলো না। লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কথাটা অগ্রাহ্যি করো না। ওসব কথার জবাব এখুনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে নেই। একটু ভাবতে হয়।

অবাক হয়ে রমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বীথি। বুঝতে পারে না বীথি, কাকিমা কেন আজ এরকম একটি রহস্যের ছায়া হয়ে বীথির পিছু পিছু ঘুরছেন।

রাঁধুনী চারুর মা চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। বীথি বলে—সিতাংশুবাবুকে এই চা-টা স্পষ্ট করে দিতে বলছো তো, কাকিমা? না, তা'ও দেওয়া চলবে না?

রমা—এ কী কথা বলছো, ছি। চা দিয়ে এস। কিন্তু।

চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে চলে যায় বীথি। ঘরের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আর পর্দার এক পাশে চোখ দুটোকে খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখে রমা আবার উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে থাকেন, বীথিকার হাতের চায়ের ট্রে-টা কাত হয়ে গিয়েছে। হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, আবার গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলছে বীথি। ও কী? চায়ের ট্রে কোথায় রাখতে চাইছে মেয়েটা, আখরোট কাঠের ছোট হরিণটার শিঙের উপরে?

হেসে ফেলে সিতাংশু—ওখানে নয়, এখানে, এই টেবিলে রাখ।

বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সিতাংশু, বীথির হাত থেকে ট্রে-টা তুলে নিয়ে টেবিলের উপরে রাখে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দিয়ে কথা বলে—বল, কবে যাবে?

বীথি—যেতে কী আর এমন অসুবিধে, আপনাদের বাড়িতে কত লোকই তো যায়।

সিতাংশু—আমি জিজ্ঞেস করছি, কবে যাবে?

বীথি—যে কোন একদিন গেলেই হলো।

সিতাংশু—তবে কালই চল। আমি কোর্ট থেকে সোজা এখানে চলে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

বীথি—না না, আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। যেতে হলে আমি নিজেই যাব।

সিতাংশু—আচ্ছা। চলি।

সিতাংশু চলে যাবার পর দেখতে পায় বীথি, কাপের অর্ধেক চা'ও খায়নি সিতাংশু। আর, আখরোট কাঠের হরিণটার চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে ঘরে ঢুকলেন রমা, আর হেসে উঠলেন—এ কী? মেয়ে যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে!

বীথি—কী হলো?

রমা—বৃষ্টির ছাট লেগে সোফাটা যে ভিজে যাচ্ছে! জানালাটা বন্ধ করে দিতে ভুলে গেলে কেন?

ঠিকই, বুঝতে পারিনি বীথি, কখন আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশটা কালো মেঘে ভরাট হয়েছে আবার ; বিকেলবেলার চেহারাটাও কালো হয়ে ঘোর সন্ধ্যার চেহারা ধরেছে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে, আর আলোর সুইচ টিপে দিয়ে রমা হাসতে থাকেন।—দিদি আজ খুব খুশি।

বীথি—কেন?

—তোমার কাকা বলেছে, এ বছর শীতের সময় দিদিকে কন্যাকুমারী দেখিয়ে আনবার সব ব্যবস্থা করে দেবে।

—কাকাকে বল, আমাকেও শীতের সময়ে বোম্বেতে বড় মামার কাছে পাঠিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে।

—আমি বলতে যাব কোন্ সাহসে? বললে তোমার কাকা কি আমাকে আস্ত রাখবে?

কথাটা খুব বাড়িয়ে বলেননি রমা। ওই এক অদ্ভুত কাকা, সুহৃদ সেন, ভাইঝি যেন তাঁর চোখের মণি। অফিসের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে বীথিকে দেখতে না পেলে যেন অন্ধ হয়ে যান। চেঁচিয়ে ওঠেন—কই কই, কে কথা বলছে ওখানে? আমাকে চা দিয়ে যাবে কে?

রমা কাছে এসে আর আশ্চর্য হয়ে কথা বলেন—এই তো চা, তোমার চোখের সামনে টেবিলের উপর রয়েছে।

—কে দিয়ে গেল চা?

—আমি।

—কিন্তু বীথি কোথায়?

—জ্ঞানবাবুর দুই মেয়ে এসে বীথিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু কোথায় গিয়েছে? ওরা এসে যখন-তখন বীথিকে ডাকে কেন?

—জ্ঞানবাবুর বাড়িতে গিয়েছে বীথি। জ্ঞানবাবুর নাতির আজ অন্নপ্রাশন।

—জ্ঞানবাবুর নাতির অন্নপ্রাশন হবে কেন? নাতি তো পোর্ট কমিশনারের অফিসে কাজ করে।

—সে নাতি নয়। এটি হলো ছোট মেয়ে উৎপলার ছেলে।

—যা-ই হোক, অনন্তকে এখুনি পাঠিয়ে দাও, বীথিকে ডেকে নিয়ে আসুক।

এহেন কাকা যে বীথিকে শীতের সময়ে বোম্বেতে বড় মামার কাছে পাঠিয়ে দিতে কখনই রাজি হবেন না, এই সত্যটা বীথিও জানে। কাকাকে একটা দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে ছটফট করবার জন্য রেখে দিয়ে বীথি যে বোম্বে যেতে পারবে না, সে সত্যটাও বীথি জানে। বীথির বাবা মহিমবাবু যখন হঠাৎ একদিন হার্ট-স্ট্রোকে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন আর মরে গেলেন, তখন বীথির বয়স চার বছর। বাবার কথা বীথির আজ কিছুই মনে পড়ে না। বীথি শুধু কল্পনা করতে পারে, বাবা ছিলেন এই কাকার মতই একটি মানুষ, যিনি সব সময় বীথিকে আদর করবার জন্য খুঁজে বেড়াতেন আর ডাকতেন।

সুহৃদ সেন আর রমা সেন, বীথিকার কাকা ও কাকিমার প্রাণের ভিতরে যে ভয়ানক

একটা শূন্যতার দুঃখ আছে, তা'ও জানে বীথিকা। কাকার ছেলে সমুদা, সুহৃদ সেনের ছেলে সমীর সেন, দশ বছর আগে সেই যে বিলেত চলে গেল তো গেলই। আর ফিরে এল না। কাকা টাকা পাঠিয়েছেন, গ্লাসগোতে থেকে পুরো ছ'টা বছর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছে সমুদা। পাস করেছে, আর বিলেতেই একটা চাকরি পেয়েছে। বাস্, তারপর আর সমুদার কাছ থেকে কোন চিঠি আসেনি। কিন্তু খবরটা অন্য অনেকের চিঠি থেকে পেয়ে গিয়েছেন কাকা আর কাকিমা। সমুদা বিলেতেই একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছে। এখন বিলেতের কোথায় আছে সমুদা, সে খবর কাকা জানে না, চেষ্টা করেও জানতে পারেনি, এখন আর জানতে চেষ্টাও করে না। মনে আছে বীথির, কী চমৎকার ইংরেজী বলতো সমুদা। আর, খুব অদ্ভুত একটা কথাও বলতো—তুই বাংলা ছবি দেখে কী বুঝিস বল তো বীথি? আমি তো কিছুই বুঝি না।

কাজেই, কাকিমা'র কথাটা শুনে আশ্চর্য হয় না বীথি। কিন্তু কাকিমা ঠিক বুঝতে পারেননি যে, ওটা কাকার উপর কোন অভিমানের কথা নয়, বীথির নিজেরই উপর একটা রাগের কথা। ঠিক রাগও নয়, মনের ভিতরে যেন একটা লজ্জার বিশ্রী কষ্ট জমাট হয়ে রয়েছে। সিতাংশুবাবু কাপের অর্ধেক চা না খেয়েই চলে গিয়েছেন।

রমা বলেন—দিদি বলছেন, কন্যাকুমারীতে যাবার সময় দিদি এবার অজিতের মা'কে সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন।

বীথি—অজিত কে?

রমা—রেলওয়ের বেশ ভাল একজন অফিসার, অজিত।

বীথি—চিনি না।

—চেন বইকি। সেই যে, যে ছেলেটি তোমার কাকাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।

মনে পড়েছে বীথির। সেদিন কী-একটা কাজের দরকারে কয়লাঘাটে রেলওয়ের অফিসে গিয়েছিল কাকা। কাকা সেখানেই হঠাৎ খুব অসুস্থ বোধ করে মেঝের উপর বসে পড়েছিল। সমুদার বিয়ের খবর জানবার পর কাকার নিঃশ্বাসের যে রোগটা দেখা দিয়েছিল, সেই রোগ আজও একেবারে সেরে যায়নি। হঠাৎ হাঁসফাঁস করে হাঁফাতে থাকেন, আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসে পড়েন। রেলওয়ের অফিসেরই এক ভদ্রলোক সেদিন ডাক্তার ডাকিয়ে আর কাকাকে একটু সুস্থ করিয়ে নিয়ে, নিজেও কাকার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিলেন। হাত ধরে কাকাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে এই ঘরের এই সোফাতে কাকাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্রলোকের নামটা যে অজিত, সেটা কী করে বুঝতে পারবে বীথি? কেউ তো বলেনি।

রমা—তুমি তো অজিতের সঙ্গে একটু আলাপও করলে না, শুধু একটা ধন্যবাদের কথা বলে দিয়ে চলে গেলে।

মা কাকিমা আর কাকা, সবাই যখন খুশি হয়ে আর ব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক কথা বলে বলে আলাপ করে চলেছেন, তখন বীথির আবার ভিন্ন করে আলাপ করবার তো কোন দরকার ছিল না। মা তো ভদ্রলোকের মাথার কাছে হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলেই ফেললেন—ভগবান তোমার ভাল করুন, তুমি আমাদের বড় উপকার করলে!

রমা—দিদি তো তখন জানতেন না যে, রেলের অফিসার এই অজিত হলো দিদির অনেককাল আগের চেনা নন্দাদির ছেলে। নন্দাদির কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে তবেই জেনেছেন।

বীথি—আমি তো মা'র মুখে কোনদিনও নন্দাদি নামে কারও কথা শুনিনি।

রমা—আমিও শুনিনি। দিদি বলছেন ঃ আমিও ভুলেই গিয়েছিলাম ; কিন্তু ভগবান মনে পড়িয়ে দিলেন।

হেসে ফেলে বীথি—বুঝতে পারছি, কন্যাকুমারী যাবার সময় মা তাঁর এই নন্দাদিকে সঙ্গে না নিয়ে ছাড়বেন না।

ঘরে ঢুকলেন বীথির মা, জয়া। হাতে একটা কম্বলের আসন। কারও দিকে না তাকিয়ে, যেন নিজেরই মনের আবেগে বলে ওঠেন—নন্দাদি আমার তিন কুলের কোন সম্পর্কেই দিদি নয়। বলতে হয়, মাত্র একটা দিনের জন্য, শুধু একটু প্রাণের সম্পর্কে দিদি।

বলতে বলতে সোফার উপর কম্বলের আসন পেতে নিয়ে বসলেন জয়া। আর, বলেই চললেন—গিয়েছিলাম বিন্ধ্যাচল। বীথির বয়স তখন দেড় বছর। ট্রেনে দেখা হলো, ট্রেনেই আলাপ হলো তাঁদের সঙ্গে, ভুবন মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী। ভুবনবাবু খুব বিদ্বান মানুষ, শাস্ত্রের কথা নিয়ে তার সঙ্গে কত আলোচনাই না করলেন। আর, দু'জনার মধ্যে ভাব যা হলো তা আর বলবার নয়। সে বললে, দাদা, অনেক আশা নিয়ে কয়লার কারবার শুরু করেছি ; কামনা করবেন, যেন উন্নতি হয়। ভুবনবাবু বললেন, হবে ভাই হবে, চিন্তা করবেন না।

রমা—নন্দাদি কিছু বলেননি?

জয়া—শোনই না, সব বলছি, সবই যখন মনে পড়েছে। বীথির তখন জ্বর, ঘামে গা ছেয়ে গিয়েছে। বীথিকে কোলে তুলে নিয়ে ভুবনবাবুর স্ত্রী বললেন, আমার নাম নন্দা, আপনার নামটি কি? আমি বললাম, আমার নাম জয়া। ভুবনবাবুর স্ত্রী তখুনি বলে উঠলেন, জয়া তুমি একটুও কাজের মানুষ নও। আমিও বললাম ; কেন নন্দাদি? কী হলো? নন্দাদি বললেন, মেয়েটা জ্বরের জ্বালায় এত ছটফট করছে, অথচ তুমি মেয়েটাকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দিতেও পারলে না।

বীথি হাসতে থাকে।—কেন পারনি? ঘুমপাড়ানী ছড়াটা তো তুমি জান। আয়রে টিয়ে আয়, রাঙা ডুমুর খাবি যদি...।

রমা—টুকুর্ টুকুর্ আয়।

জয়া—কিন্তু কী আশ্চর্য, নন্দাদির কোলে গিয়েই মেয়ে আমার ঘুমিয়ে পড়লো। আমিও স্বস্তি পেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বীথি—তার মানে, সুযোগ পেয়ে ঘুমিয়ে নিলে।

জয়া—তাই বটে। ভোর হতে ট্রেন যখন হাওড়াতে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে, তখন আমার ঘুম ভাঙলো। দেখলাম, মেয়ে আমার তখনও নন্দাদির কোলে পড়ে ঘুমোচ্ছে। মেয়ের গায়ে হাত বোলাচ্ছেন নন্দাদি। সারা রাত জেগে বসে মেয়ের গায়ে হাত বুলিয়েছিলেন নন্দাদি, তাই ওই মেয়ে শান্ত হয়ে ঘুমোতে পেরেছিল।

বীথির দিকে তাকিয়ে রমা মুখ টিপে হাসেন—মেয়ের সেই অভ্যেস আজও আছে।

বীথি—খুব বলে নিচ্ছে কাকিমা। খুব মিথ্যে কথা।

জয়া—কেন? কী হয়েছে?

বীথি—ক'দিন হলো দেখছি, কাকিমার অভ্যাসে একটি নতুন দোষ দেখা দিয়েছে। রাত্রিবেলা নিজেই ব্যস্ত হয়ে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াবে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে, আবার মিছিমিছি জিজ্ঞাসাও করবে, ছটফট করছো কেন বীথি।

জয়া—অনেক ভাগ্যিতে এরকম কাকিমা পেয়েছো, বুঝেছো মেয়ে?..হাওড়া পৌঁছবার পর স্টেশনে নেমেই নন্দাদির সে কী কান্না! কান্না থামিয়ে আবার হাসেন। মেয়ের গাল টিপে ধরে বার বার বলেন, কী সুলক্ষণা মেয়ে, কী চমৎকার দুটি চোখ। এ মেয়েকে তোমার হাতে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না, জয়া। আমি বললাম, আজ ছেড়ে দিন নন্দাদি, বড় হোক মেয়ে, তারপর, যদি আপনারা চান, তবে আপনাদের হাতে মেয়েকে দিয়ে দেব।

রমা—নন্দাদির সঙ্গে কী আর কোন দিন আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি?

জয়া—না রমা। এত ভাব আর এত গল্প হলো যাদের সঙ্গে, তাদের ঠিকানাটুকু জেনে

নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। কী ভয়ানক ভুল। বীথির বাবা সেজন্যে খুব আক্ষেপ করতো। বার বার বলতো, দেখছো তো জয়া, সেই ভুবনবাবুর কথাটা কেমন ফলে গেল। সত্যি কথা, এক বছরের মধ্যে কোল কোম্পানীর ভাগ্য ফিরে গিয়েছিল। তুমি কী মনে কর রমা, জানি না, তবে অনেকেই বলবে, এসব হলো সাধারণ ভাব-ভদ্রতার একটা কথার কথা। কিন্তু কথা তো ফলে গেল। আমিও খুব ভেবেচিন্তে নন্দাদিকে কথাটা বলিনি। কিন্তু ফলে তো গেল।

চমকে ওঠে বীথি। এতক্ষণ ধরে একটা নিরীহ আষাঢ়ে গল্পের যত মজার মজার কথা শুনছিল বীথি, তাই চোখে-মুখে একটা মজার হাসিও ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সব হাসি যেন এক মুহূর্তের মধ্যে শুকনো ধুলো হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে। নিরীহ আষাঢ়ে গল্প তো নয়, ভয়ানক আষাঢ়ে রাতের একটা কালো ভয়ের কুহক। কী ফলে গেল? এত খুশি হয়ে আর এত স্পষ্ট করে কোন্ সফলতার কথা বলে দিল মা?

কাকিমা রমা একবার বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেও যেন কিছু দেখলেন না। যেন আষাঢ়ে গল্পের আনন্দটাকে হাসিয়ে রাখবার চেষ্টায় হেসে হেসে জিজ্ঞেস করেন—কিন্তু নন্দাদি আপনার ঠিকানা পেলেন কি করে? কেমন করে বুঝলেন নন্দাদি যে, এই বাড়িই হলো তাঁর অনেককাল আগে দেখা সেই জয়ার বাড়ি?

ঘরে ঢুকলেন সুহৃদ সেন। সোফার উপর বীথির পাশে বসে নিয়ে হাসতে থাকেন সুহৃদ...আমিও তো অজিতকে কোন ঠিকানা-টিকানা দিইনি। আমি শুধু বলেছিলাম, আমার দাদা মহিম সেন এই কারবার শুরু করেছিলেন, তাই কারবারের নাম মহিম কোল কোম্পানী। আর, এই বীথি হলো আমার দাদার মেয়ে।

রমা—শুনলেন তো দিদি, ইনি কী বলছেন।

জয়া—হ্যাঁ, ওই তো স্পষ্ট বলা হয়েছে, ওতেই ঠিকানা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ওইটুকু জানতে পেরে নন্দাদি সব জেনে ফেলেছেন।

সুহৃদ বলেন—আমার বিশ্বাস ছিল, অজিত আবার একদিন আসবে। কিন্তু দেখছি, দশ-বারো দিন হয়ে গেল, তবু এলো না। কিন্তু এলে খুবই ভাল হতো।

রমা—কী বললে?

সুহৃদ—বলছি, ভালো হতো। আমি বলতে চাই, অজিত যদি আরও কয়েকটা দিন এখানে আসতো, তবে শুধু আমার একা নয়, তোমাদের সবারই খুব ভাল লাগত। বড় ভাল ছেলে অজিত।

সুহৃদ সেনের দুই চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে, ঘরের বন্ধ জানালার সব কাঁচ। আকাশের কালো মেঘের বুকের ভিতর থেকে হঠাৎ যে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়েছে, জানালার কাঁচে তারই আলোর চমক লেগেছে। কিন্তু বীথির মুখের উপরে বোধহয় সেই বিদ্যুতের শুধু জ্বালার চমকটা লেগেছে। কালো হয়ে যাচ্ছে বীথির মুখটা। সুহৃদ সেন বলেন—সংসারে এমন মানুষ আছে, যাকে এক বছর ধরে দেখলেও তার কিছুই চেনা যায় না। মানুষের জীবনে এটা একটা দুর্ভাগ্য। আবার, এমন মানুষ আছে, যাকে একদিন দেখলে তার সবই চেনা যায়। মানুষের জীবনে এটা একটা সৌভাগ্য।

বীথির পিঠে হাত বুলিয়ে আদুরে স্বরে কবিতা করে কথা বলেন সুহৃদ সেন—আমাদের একটি মেয়ে আছে, নাম তার বীথি। শৈশবে বড়ই দুরন্ত ছিল আজ শিষ্টমতি। আমরা সকলে তাই বিশ্বাস করি অতি ; মেয়েই বুঝবে ভাল কিসে তার লাভ, কিসে তার ক্ষতি।

জয়া বলেন—আমি যাই, নাম করবার সময় হলো।

সুহৃদ সেন বলেন—আমি উঠি, এখুনি ধানবাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

রমাও বোধহয় উঠে পড়তেন আর চলে যেতেন, কিন্তু বাধা দেয় বীথি—কাকিমা বসো। তুমি এখন যাবে না।

রমা—আমি তো বসেই আছি।

বীথি—তা তো দেখছি। কিন্তু মা আর কাকা যেমন যা মুখে এলো তাই বলে নিয়ে সরে পড়লো, তুমিও তেমনি...

—না, আমি সরে পড়ছি না।

—তবে শোন।

—বল।

—কাকা তো ঘুমপাড়ানী গান শুনিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু কাকা বোধহয় জানে না যে, তাতে পঁচিশ বছর বয়সের একটা মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে না।

—তোমার কথার মানে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—খুব বুঝতে পারছো। ওই ভদ্রলোক, যার নাম অজিত, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না, হবে না।

—তবে কার সঙ্গে হতে পারে?

—জানই তো, মিছে আর জিজ্ঞাসা করছো কেন?

—সিতাংশুর সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—কেন সিতাংশুর সঙ্গে বিয়ে হবে?

—কেন আবার কী? হওয়া উচিত।

—উচিত বলো না, বীথি। বল তোমার ইচ্ছে।

—হ্যাঁ তাই। কিন্তু অনুচিত ইচ্ছে তো নয়।

—সেটা কেমন করে বুঝলে?

—যেমন করে সবাই বুঝে থাকে।

—না বীথি, অনেকেই বুঝতে ভুল করে।

—বলতে চাও, আমিও ভুল করেছি?

—আমাদের তো তাই মনে হয়।

—তবে এতদিন পরে আজ হঠাৎ একথা বলছো কেন? আগেই বাধা দিলে না কেন? সিতাংশুকে এবাড়িতে আসতে মানা করে দিলে না কেন?

—আমাদের মনে হয়েছিল, সিতাংশু বার বার এলেও কিছু আসে যায় না।

—কেন এরকম মনে হলো?

—আমরা ভেবেছিলাম, তুমি মনে মনে সাবধান আছ, হঠাৎ একটা ইচ্ছেটিচ্ছে-করে ফেলবে না।

—কিন্তু তোমরা যে ইচ্ছেটা ধরেছো, তার চেয়ে হঠাৎ আর কী হতে পারে, বলতে পার?

—হ্যাঁ, হঠাৎই বটে। কিন্তু আমাদের সবারই মনে হয়েছে, অজিতের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে ভাল হবে।

—কেন? সিতাংশু কী নিতান্ত একটা বাজে মানুষ?

—মোটেই না।

—অজিত নামে সেই ভদ্রলোক কি একজন দেবতা ধরনের মানুষ?

—মোটেই না।

—তবে?

—আমি তর্ক করতে জানি না, বীথি। তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

—তার মানে, তোমাদের ইচ্ছেটাই হলো ইচ্ছে, আমার ইচ্ছেটা কিছুই নয়।

—যদি তাই মনে কর, তবে।...

—তবে কী?

—তবে দিদিকে বলে দিই, নন্দাদির চিঠির জবাবে স্পষ্ট করে যেন লিখে দেন—না, মেয়ে রাজি নয়।

—তারপর কাকার কাছেও গিয়ে বলে দাও, বীথি তোমাদের ইচ্ছের কথা মেনে নিতে রাজি নয়।

—বলবো।

রমা উঠে দাঁড়াতেই রমার শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে খিমচে ধরে বীথি। দুই চোখ জলে ভরে যায়, মাথাটাও যেন ক্লান্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ে।

রমার গলার স্বর করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে—ও কী?

বীথি—তুমি বসো। কাউকে কিছু বলতে হবে না। তোমরা সবাই যা চাইছো, তাই হবে।

বীথির গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরেন রমা। হেসে ফেলে বীথি—এ কী রকম হলো, জান? গল্পে যেমন শোনা যায়, তেমনই। মেয়ের জন্ম হলেই দেবতাভক্ত বাপ আর মা, দেবতার নামে মেয়েকে উৎসর্গ করে দিতেন, বড় হয়ে দেবদাসী হবে মেয়ে।

রমার দুই চোখ ভিজে যায়—ওরকম করে বলো না, বলতে নেই বীথি।

বীথি তবু হাসে—না বলে পারছি না, কাকিমা। মা তো সেই রকমই একটা কাণ্ড করছেন। কবে কোন্ কালে ট্রেনেতে তাঁর এক পাতানো দিদি নন্দাদির কাছে কী একটা কথা বলে দিয়েছিলেন, সেটা যেন সত্যিই একটা উৎসর্গের কথা। এছাড়া মা'র ইচ্ছের মধ্যে তো আর-কোন যুক্তিই নেই।

রমা—কিন্তু তোমার কাকার ইচ্ছেটা সেরকম কিছু নয়।

বীথি—তবে কীরকম?

রমা—অজিতকে তার খুব ভাল লেগেছে, তাই ইচ্ছে হয়েছে অজিতের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক, হলে ভাল হয়।

বীথি—কাকার কেন যে কাউকে খুব ভাল লেগে যায়, আবার কাউকে একটুও ভাল লাগে না, কিছুই বুঝতে পারি না।

রমা—আমি অবিশ্যি একটু বুঝি, কেন অজিতকে তার খুব ভাল লেগেছে।

—কেন?

—অজিতের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছে তোমার কাকা, বিলেতে একটা ভাল চাকরি পেয়েও বিলেতে যায়নি অজিত। অজিত বলেছে, বাপ-মা আর দেশ ছেড়ে দিয়ে বিদেশে পড়ে থাকতে হবে, ভাবতেই ভয় করে।

—বাঃ, শুধু এইজন্যেই অজিত একজন ভাল ছেলে? শুধু একটা সেকেলেপনার জন্যে? তবে কোলিয়ারীর জন্যে জার্মানী থেকে সবচেয়ে নতুন রকমের কল কেনবার এত চেষ্টা করছে কেন কাকা?

ঘরে ঢুকলেন সুহৃদ সেন। সোনার ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। উসকো-খুসকো চুল। বীথির পাশে বসে আর দু'হাত তুলে চোখ দুটো ঘষে নিলেন সুহৃদ সেন।—না সেকেলেপনার জন্যে নয়।

রমা—তবে স্পষ্ট করে বলে দিলেই তো পার, কিসের জন্যে?

সুহৃদ সেন—স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না বলেই তো স্পষ্ট করে বলতে পারি না, কিসের জন্যে। তবে এইটুকু বলতে পারি ; অজিতকে একটি খাঁটি প্রাণের মানুষ বলে আমার মনে হয়েছে, খাঁটি কল বলে মনে হয়নি।...তবে বীথির যদি অনিচ্ছা থাকে তবে।

রমা—না, বীথির অনিচ্ছা নেই।

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিতে গিয়েই বাধা পায় বীথি। সুহৃদ সেন বীথির একটা হাত ধরে

টান দিলেন—ওঠো তো মেয়ে, সোনার বরণী রাণী মেয়ে ; চল আমরা দু'জনে এখন বারান্দাতে ঘুরে ঘুরে গল্প করি।

পাঁচ

দুলাল চৌধুরীর বাড়ির দক্ষিণে জলজ জঙ্গলে ভরা সে পুকুরটার নাম ছিল শীতলাপুকুর, সেটার আজ আর কোন নাম নেই। পাড়ার বুড়োরা জানেন, সেই পুকুরের পুব কোণে ছিল কাঁচা ইটের একটা ঘর শীতলাতলা। পাঁচ বছর আগে অনুপম হোসিয়ারীর মালিক ছানু দত্ত ঐ পুকুরের মালিক ছিলেন। দুলাল চৌধুরী ওই পুকুরের স্বত্ব দাবি করে যে মামলা করেছিলেন, সে মামলা লড়ে দুলাল চৌধুরীকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাডভোকেট শ্রীহরিনাথ মিত্র। পুকুরের কোণে শীতলাতলাতে সেদিন কোন শীতলা আর ছিল না, শুধু কাঁচা ইঁটের ঘরটাই ছিল। হরিনাথ বলেছিলেন, জায়গাটাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলুন দুলালবাবু। তাই করা হয়েছিল। আর, ঠিক সেখানেই কংক্রীটের একটা প্রকাণ্ড ছাতা তৈরী করা হয়েছিল, ছাতার তলায় কংক্রীটের একটি বেঞ্চ। সবই হরিনাথের খরচ।

হরিনাথ যখন আসেন, তখন তিনি এই কংক্রীটের ছাতার তলায় দু'চার মিনিট বসেন। দুলালবাবুর চাকর মস্ত বড় একটি ছিপ আর গদিওয়ালা একটা মোড়া নিয়ে এসে পুকুরের কিনারাতে রাখে। পুকুর ও পুকুরের মাছ লালন-পালনের কাজ করে এই চাকর। চাকরের মাইনে সমেত সব খরচ হরিনাথই দিয়ে আসছেন।

ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসেন হরিনাথ। যারা দেখেছে তারাই জানে, আর তারাই বলে, একেই বলে মাছধরার শখ। ঠিক কথা, শখের মাছধরা নয়, কোনদিনও মাছ ধরেননি হরিনাথবাবু। মাছ ধরবার জন্যে তাঁর সামান্য একটুকু ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। ছিপ ফেলে বড় জোর চার পাঁচ মিনিট বসে থাকেন হরিনাথ, তারপরেই উঠে পড়েন—চলি দুলালবাবু, বাড়ি যাই। চন্দননগরের মক্কেলরা হয়তো এসে পড়েছেন আর অপেক্ষা করছেন।

আজ এখন কংক্রীটের ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে আছেন দুলালবাবু। জানেন দুলালবাবু, তাঁর মিত্তির স্যারের আসবার সময় হয়েছে। দেখতে পেলেন দুলালবাবু, পুকুরের পাঁচিলের যে দরজার কাছে এসে হরিনাথের গাড়িটা থামবে, সেখানে মাটির উপর হলদে ফুল আর পাতা ছড়িয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য, এবছরে দমদমের এদিকে সব গুলমোর ফুলে ভরে গিয়েছে, যদিও মরশুমের এখনও প্রায় একটা মাস বাকি। ভয় হয়, মিত্তির স্যার দেখতে পেলেই বিরক্ত হবেন। গত বছর যেমন হয়েছিলেন।—চাকরটাকে একটু বলে দেবেন দুলালবাবু, এসব আবর্জনা যেন সরিয়ে দেয়।

কিন্তু বিকেল যে শেষ হতে চললো। কখন আসবেন হরিনাথ? দুলালবাবুর চিন্তার প্রশ্নটা তখনই জবাব পেয়ে গেল। হরিনাথের গাড়ির হর্ণ বেজেছে।

হরিনাথ বললেন—না, আজ আর ছিপ ধরবো না, দুলালবাবু। চলুন বেড়িয়ে আসি।

হরিনাথের গাড়িটা ভুবনবাবুর দেউলবাড়ির কাছে এসে পড়তেই হেসে ফেলেন হরিনাথ। —উটের অবস্থা!

—আজ্ঞে?

—জিভ কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, তবু উট যেমন কাঁটা না চিবিয়ে পারে না, আমার অভ্যাসটাও প্রায় সেইরকম দাঁড়িয়েছে। আপনাদের ভুবনবাবুর এই বাড়িটাকে দেখতে, কিংবা ভুবনবাবুর জীবনটার যত অদ্ভুত ভুল-ভ্রান্তি আর দুঃখের কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তবু, যেন তাই না দেখে আর না শুনে পারি না।

—এটা কিন্তু খুবই একটা ভুল কথা বললেন, স্যার। আপনার মনের ধাঁচ তো ওরকমের

য়, ওরকমের হতেও পারে না। আপনার মন হলো, সিমপ্যাথির মন।

—আসল কথাটা, তাই। সেটা আপনি বোঝেন, আরও অনেকে বোঝে, কিন্তু কেউ কউ...।

—তাতে কী আসে যায় স্যার, যেমন ধরুন, আমার ভাগ্নে দীপেন আর হয়তো এইরকমের মারও দু'চার জন আপনাকে ঠিক বুঝতে না পেরে যে-সব ভুল কথা বলে, তার কোন ানেই হয় না।

—কী বলে আপনার ভাগ্নে দীপেন?

দুলালবাবু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন।—ভাগ্নে দীপেন বলে, মাছ-ধরবার মন নেই, তবু মাছ রতে বসেন, হরিনাথবাবুকে একটা কল বলে মনে হয়।

—যাকে বলে শিক্ষিত মানুষ, আপনার ভাগ্নে ঠিক তা নয় বোধহয়।

—একটুও নয়। কিন্তু আমি ওকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি যে হরিনাথবাবুর মন লো নির্লিপ্ত মন। সে মনে কোন মোহ নেই। তিনি শুধু কর্তব্য করেন ; ফল কী হলো বা না লো, সেটা তাঁর ধর্তব্যই নয়।

হেসে ফেলেন হরিনাথ—আপনি আমার একটু বেশি প্রশংসা করে ফেলেছেন, দুলালবাবু।

—আপনি তা মনে করতে পারেন, আমি তা মনে করি না। মিছিমিছি আপনার প্রশংসা করবো, কিংবা বাড়িয়ে প্রশংসা করবো, সে মানুষ যে আমি নই, সেটা আপনিও জানেন।

—বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অন্য কথা বলুন।

—পি সি নাগের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

—চিনলাম না।

—আই ই এস প্রকাশচন্দ্র নাগ, রিটায়ার করার পর দমদমে আমাদেরই পাড়ার কাছে নাহিড়ীদের পুরনো বাগানবাড়ি কিনে নিয়ে নতুন বাড়ি করেছেন। তাঁরই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বেছে বেছে আমাদের পাড়ার সাত-আটজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। আমিও নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের ভুবনবাবুর নেমন্তন্ন হয়নি।

—হবে কী করে? যা-ই হোক, শুনে দুঃখ হয়, আবার হাসিও পায়।

—আমাদের পাড়ার লাইব্রেরী কমিটির নতুন প্রেসিডেন্ট কে হবেন, এই নিয়ে অনেক হল্লা ও বাগবিতণ্ডার একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। কে যেন ভুবনবাবুর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব কেউ সমর্থনই করলে না। শেষে নয়নবাবু আর প্রমথবাবুর নাম নিয়ে ভোটাভুটি হবার পর নয়নবাবু প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

—শুনলে দুঃখ হয়, আবার হাসিও পায়। কিন্তু ভুবনবাবুর নামটা যে কারও সহ্য হবে না, এটা খুবই স্বাভাবিক। বলতে পারেন, শুধু সেকেলেপনা ছাড়া ভুবনবাবুর আর কী সম্বল আছে?

—কিছুই নেই।

—কাজেই তিনি হেরে যাবেনই, তাঁকে হারতেই হবে।...চলুন, এবার ফিরে যাই।

হরিনাথের মোটর গাড়ি ফিরে এসে দুলালবাবুর বাড়ির কাছে যখন থামে, ঠিক তখন পিছন থেকে দুরন্ত বেগে ছুটে এসে একটা স্কুটারও থামে। স্কুটারের সীটের উপরে বসে দুরন্ত একটা উল্লাসের ডাক ছাড়ে দীপেন।

—শুনেছো মামা?

দুলালবাবু—কী ব্যাপার?

দীপেন—কাল আমার বন্ধুটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

দুলালবাবু—তার মানে ভুবনবাবুর ছেলে অজিতের বিয়ে?

দীপেন—হ্যাঁ।

দুলালবাবু—কোথায় বিয়ে? কার সঙ্গে বিয়ে?

দীপেন—সেই যে, আপনাকে যার কথা বলেছিলাম, বেহালার সুহৃদ সেনের ভাইঝির সঙ্গে।

দুলালবাবু—তুমি তাহলে বরযাত্রী হয়েছিলে?

দীপেন—নিশ্চয়।

আবার তেমনই দুরন্ত উল্লাসের মূর্তির মত স্কুটার ছুটিয়ে চলে গেল দীপেন। হরিনাথের দিকে তাকিয়ে দুলালবাবুর মুখের হাসিটা যেন বিড়-বিড় করে—এ কেমন হলো। এ যে বেশ অদ্ভুত ব্যাপার হলো। দুঃখ হয়, হাসিও পায়।

হরিনাথের পরিচ্ছন্ন সাজের চেহারাটাকে কেউ যেন ধুলোমাখা করে নিয়ে একটা পাথরের দেয়ালের উপর আছড়ে দিয়েছে, ঠুকে দিয়েছে মাথাটা। সারা মুখে দুঃসহ একটা যন্ত্রণার লালচে জ্বালা থরথর করে কাঁপছে। টাই-এর ফাঁসটা গলার সঙ্গে শক্ত হয়ে এঁটে গিয়ে যেন দম বন্ধ করে দিয়েছে। চোখ দুটো ছোট হতে হতে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর মাথাটাকে আস্তে একটা ঝাড়া দিয়ে আর চোখ খুলে দুলালবাবুর মুখের দিকে তাকান।—আমি জানতে চাই দুলালবাবু, লোকটা কি ব্ল্যাক-আর্ট জানে?

দুলালবাবু—জানে বোধহয়, নইলে বেহালার সুহৃদবাবুর মত একজন সম্ভ্রান্ত মানুষকে কুটুম্ব করে ফেলে কেমন করে?

টিমটিম করে জ্বলছে সন্ধ্যাবেলার দমদমের ছোট রাস্তার আলো। তারই দিকে তাকিয়ে হরিনাথের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। বিড়বিড় করে যেন নিজের মনের সঙ্গে কথা বলেন হরিনাথ—আমি জানতে চাই, কিসের জোরে? কী আছে ওর?

দুলালবাবু—আপনি ঘরের ভিতরে এসে একটু বসুন, একটু রেস্ট নিন।

হরিনাথ—না, আমি বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছি ; আমি চলি কিন্তু জানবেন দুলালবাবু, এটাই শেষ নয়। আপনাদের ভুবনবাবু একদিন বুঝবেন, মনে হয় খুব শিগগিরিই বুঝবেন।

দমদম থেকে শ্যামবাজার, গাড়ির ভিতরে নিঝুম হয়ে বসে রইলেন হরিনাথ। সাইরেন বাজিয়ে ছুটে গেল একজন পুলিশ সার্জেণ্টের মোটর সাইকেল। তারপর অনেক মোটরগাড়ির একটা চলন্ত কাতার। বোধহয় কোন গণ্যমান্য সরকারী মহোদয় যাচ্ছেন। কিন্তু হরিনাথ দেখতে ভুলে যান, কে চলে গেলেন।

বাড়িতে পৌঁছে আর চেম্বারে ঢুকে যখন চেয়ারের উপর শ্রান্ত দেহটাকে একটু এলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন হরিনাথ, তখন বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন, সত্যিই গায়ে অনেক ধুলো লেগেছে। সে ধুলো ছুঁড়েছে ওই ভুবন মজুমদার, আর কেউ নয়।

উপরতলায় উঠে ডাক দিলেন হরিনাথ—মনো, তুমি কোথায়?

—এখানে।

—যাব তোমার ঘরে?

—এস।

—খবরটা কি তুমি শুনেছ? সিতু কি জানে?

—কিসের খবর?

—সুহৃদের ভাইঝির সঙ্গে দমদমের সেই ভুবনবাবুর ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

—জানি, মঙ্গলাদি আজই বলে গেলেন।

—কিন্তু কই, আমাকে তো বলনি।

—কী এমন একটা জরুরী কথা যে, বলতে হবে।

—তা ঠিক, কিন্তু জেনে রাখবার মত কথা তো বটে?

মনোময়ীর মুখে যেন গভীর হাসির একটা হালকা ছায়া ভেসে ওঠে—তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, তোমার ছেলে যেমন তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছে। আর, তুমি নিজেও

একদিন যেমন...।

—সিতুকে তুমি বোধহয় যেচে আর কিছু জিজ্ঞেস করনি?

—করেছি।

—কি বলে সিতু?

—সিতু সবই জানে।

—কিন্তু সিতু কি জানে, কী কারণে সিতুর সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে দমদমের একজন অজিতের সঙ্গে ভাইঝির বিয়ে দিল সুহৃদ?

—সিতু বললে, মেয়ের অনিচ্ছা আর ইচ্ছা।

—বলতে পার, তোমার ছেলে কেন মেয়েটির কাছে একটা অনিচ্ছা আর ভুবনবাবুর ছেলের কাছে একটা ইচ্ছা হয়ে গেল?

—মেয়েটি জানে।

—সিতু বোধহয় একটু আশ্চর্য হয়েছে।

—একটুও না।

—সিতু বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

—একটুও না।

—এটাই উচিত। আমিও তাই চাই। কোথাও মন বিকিয়ে দিতে নেই।

—মন থাকলে তো বিকিয়ে দেবে?

—কী বললে?

—তোমার ছেলেরও দেখেছি ঠিক তোমারই মত, মনের বালাই বলে কিছু নেই।

—তার মানে?

হাত তুলে, যেন মুখের উপর সেই অদ্ভুত গভীর হালকা ছায়াটাকে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেন মনোময়ী, কিন্তু চোখের তারা দুটো চিকচিক করে জ্বলে ; গায়ে জড়ানো তসরের চাদরটাকেও বোধহয় ভয়ানক ভারী একটা বোঝা বলে বোধ হচ্ছে ঃ চাদরটাকে গা থেকে নামিয়ে রাখেন আর হাসতে চেষ্টা করেন মনোময়ী।—তার মানে, মঙ্গলাদি যে-কথা বলেন, তোমরা পিতা ও পুত্র দুজনেই স্বভাবে আর চরিত্রে সমান পরিচ্ছন্ন।

—তাই বল।

হাতের কাছের ছোট টেবিলটার উপর থেকে একটা বই তুলে দেয়ালের ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন মনোময়ী। বইটা নতুন কেনা হয়েছে, একটি চকচকে কোনান ডয়েল। বইটাকে কোলের উপর রেখে দিয়ে খুব মৃদু স্বরে কথা বলেন।—রাত আটটা, তুমি এস এখন।

—ও, হ্যাঁ, বুঝেছি। তোমার এখন বই না পড়লে ঘুম আসবে না। বলতে বলতে চলে গেলেন হরিনাথ।

এইবার নিজের ঘর, খুব পরিচ্ছন্ন একটি একলা ঘর। সিঙ্গাপুরী বেতের ছোট্ট একটি খাট, তার উপর স্পঞ্জের একটি গদি, তার উপর একটি সাদা চাদর, তার উপর রবারের একটি ফাঁপা বালিশ।

বিছানার উপর বসে আর বালিশটাকে কোলের উপর তুলে নিতেই হরিনাথের ক্লান্ত শরীরটা স্বস্তিতে ভরে যায়।

কাঁচের টেবিলের উপর একটি জলভরা কাঁচের গেলাস। এক চুমুক জল খেয়ে নিয়েই বেশ অস্বস্তি বোধ করেন হরিনাথ। মনে মনে দুলালবাবুর সঙ্গে কথা বলেন—আপাতত আমার কিছু করবার নেই, বলবারও নেই, দুলালবাবু। কিন্তু আপনাদের ভুবন মজুমদারকে একদিন কি তার পুরনো পুকুরের পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে না? আরও একটা কথা। এই সুহৃদ

সেন আর তার ভাইঝি, যারা বুদ্ধির ভুলে মানুষ চিনতে পারলো না, তারাও একদিন কপাল চাপড়ে কেঁদে ফেলবে না, হায় কী হলো? যাক্, আপনি তো জানেন, আমি কারও অমঙ্গল কামনা করি না। কিন্তু যা হওয়া উচিত, যা না হয়ে পারে না, তা'তো হবেই, দুলালবাবু।

গেলাস তুলে নিয়ে আবার এক চুমুক জল খান হরিনাথ।

ছয়

সেকালের কথা আর কাহিনীতে শোনা যায়, সহমরণের জন্য মরা স্বামীর চিতার কাঠের উপর উঠে বসেছেন সতী। গায়ে লালপেড়ে শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা। ঢাক ঢোল বাজছে, পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, লোকজন নেচে চেঁচিয়ে সতীর নামে জয়ধ্বনি আর হরিবোল দিচ্ছে। সেই উল্লাসের ডামাডোলের মধ্যে বন্দিনী হয়েও বেশ শান্ত হয়ে বসে আছেন সতী। চোখের দৃষ্টিও শান্ত। কেউ জিজ্ঞেস করে না, ওই শান্ত দৃষ্টি কি সত্যিই একটা ইচ্ছা? না, কঠোর একটা অনিচ্ছা? সবাই বিশ্বাস করে, ওটা হলো খুব সুন্দর একটা ইচ্ছা।

রাজা এসেছেন মন্দিরের আরতি দেখতে। আর পুরোহিত আদেশ করতেই নাচতে গাইতে শুরু করে দিল দেবদাসী। আরতির বাতির আলো মেখে দেবদাসীর চোখ চিকমিক করে হাসে। কেউ জিজ্ঞেস করে না, ওই হাসিটা কি সত্যিই একটা ইচ্ছা? না, নিতান্ত একটা অনিচ্ছা? সবাই বিশ্বাস করে, এটা খুব চমৎকার একটা ইচ্ছা।

ভাবতে গিয়ে মনে মনে অনেকবার হেসে ফেলেছে বীথি। বিয়ের উৎসব আর অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বীথিকে যে-ক'টা দিন আর যতক্ষণ ব্যস্ত হতে হয়েছে, তার মধ্যে কোনদিন কোনক্ষণেও বীথির মুখে বিষাদের সামান্য একটুকু ছায়াও দেখতে পাননি মা কাকিমা আর কাকা। সব সময় হেসেছে বীথি। শান্ত মুখে, শান্ত হাসি। না বিশ্বাস করে পারবেন কেন কাকীমা আর কাকা, ওটা বীথির প্রাণেরই একটা সহজ ইচ্ছের হাসি। কেউই সন্দেহ করতে পারেননি যে, তাঁদের মেয়েটি বেশ জোর করে আর চেষ্টা করে হাসছে, ভয়ানক কঠোর একটা অনিচ্ছার হাসি।

বিয়ের আগের দিন কাকীমা'কে আড়ালে ডেকে নিয়ে খুব স্পষ্ট করে একটা সত্য কথা বলে দেবার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েছিল বীথি। বলে দিলেই তো হয়, তোমরা যখন জোর করে আমাকে তোমাদেরই ইচ্ছার কাছে বলি দিতে চাইছো, তখন জেনে রাখ, আমিই শুধু বলি হব, আমার ইচ্ছেটা বলি হবে না। সিতাংশুকে ভুলে যেতে পারবো না।

কিন্তু বলতে পারেনি বীথি। সে কথা বলে দিলে, বেহালার এই বাড়ির সব আনন্দ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মেয়ের সুখের জন্য তপস্যা করা যাদের জীবনের একমাত্র সুখ, এ বিয়েতে মেয়ে খুব খুশী হবে বলে বিশ্বাস করে যাদের মন-প্রাণ ধন্য হয়ে গিয়েছে, তাদের ওকথা বলার অর্থ তাদের শান্তির ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। কাকা হয়তো চোখ ঘষে ঘষে অন্ধই হয়ে যাবে, না বোবা হয়ে গিয়ে ছটফট করবে, আর কাকীমা ভাত মুখে দিতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠবে। তার চেয়ে ভাল, একটা নিখুঁত নকল হাসি মুখে নিয়ে, খুব খুশি একটা ইচ্ছুক মূর্তি হয়ে, দুর্ভাগ্যের আলপনা দিয়ে চিত্রিত একটা রঙীন পিঁড়ির উপর বসে পড়া। কেউ যেন টের না পায়, কাকিমা যেন দুই চোখ অপলক করে একটি ঘণ্টা বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেও বুঝতে না পারে যে, বীথি একটা থিয়েটারের জীবন স্বীকার করে নিল, এই মাত্র। যার সঙ্গে বিয়ে হতে চলেছে, তাকে কখনও ভালবাসতে পারবে না, তাকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারবে না বীথি।

মন্ত্র পড়া বিয়ের অনুষ্ঠান যখন শুরু হয়ে গেল, কাকিমা কাছে থেকে যা করতে বলেছে, কোন কুণ্ঠা না করে তাই করেছে বীথি। কাকিমা বলা মাত্র, বরের হাতের কাছে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, মালাবদল করবার সময় মাথা ঝুঁকিয়েছে। শুভদৃষ্টির সময় চোখ খুলে

কাকিমার সন্দেহ করবার সাধ্যি হয়নি যে, বীথি সমস্তক্ষণ সিতাংশুর কথা ভেবেছে। বীথির অবাধ্য প্রাণটা কী দুঃখ আর কী লজ্জায় ছটফট করেছে, বুঝতে পারেনি কাকিমা, কারণ বরের হাতের কাছে হাত এগিয়ে দিতে গিয়ে বীথির হাতটা একটুও কাঁপেনি।

সেদিন আর আজকের এই দিন, মাঝখানে পুরো একটি মাসের দিন ও রাত এসেছে আর ফুরিয়েছে। সেদিন যে মেয়ে ছিল বেহালার সুহৃদ সেনের বাড়ির মেয়ে, সে আজ দমদমের এই দেউলবাড়ির বধূ। দেউলবাড়ির বাগানের কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপর বিকেলের রোদ ঝলমল করে, তারই মধ্যে নেচে নেচে কিচকিচ করে সাত-ভাই ছাতার বুলবুলের একটা দল। ঘরের ভিতর একটা মোড়ার উপর বসে আর নীরব হয়ে এখন লেস বুনছে যে বীথি, তাকে দেখে রমা কাকিমাও বোধহয় বিশ্বাস করতে পারবেন না যে এ সময়ে এই মেয়ে বেহালার বাড়িতে উপরতলার ঘরে বসে পিয়ানো বাজাতো। বদলে গিয়েছে বীথির সাজ আর খোঁপার ছাঁদ। ফিকে নীল মিহি সিল্কের শাড়ি, আঁচলে লালচে আঙুরলতা, না, সে শাড়ি নয়। সাদাটে একটা টাঙ্গাইল পরে বসে আছে বীথি। খোঁপার মধ্যে কোন কারুকলা নেই, ওটা একটা গোটানো বেণী ছাড়া আর কিছু নয়। বীথির এই চোখ দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এই সেদিনও এই চোখের কোলে কাজলের পেন্সিল বুলিয়ে দেওয়া হতো। ঠোঁটে কোন রঙীন প্রলেপ নেই, গলাতে পাউডারের একটা ছিটেও নেই।

রমা কাকিমা মাঝে একদিন এইরকমই একটি বিকেলবেলাতে হঠাৎ এসেছিলেন, আর, বীথিকে এইরকমই সাদাটে টাঙ্গাইল পরে ও নীরব হয়ে বসে থাকতে দেখেছিলেন। ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিলেন রমা। কিন্তু বীথির শান্ত মুখের হাসি আর কথা রমার সেই ভয় এক নিমেষে ভেঙে দিয়েছিল।—এরা এইরকম সাজ ভালবাসে, আমারও ভাল লাগে, কাকিমা। এরা লোক ভাল।

রমা বেশ খুশি হয়ে চলে গিয়েছিলেন। বুঝবার সাধ্যি হয়নি রমার, বীথির মনের মধ্যে এই বিকেলবেলাটা হলো বেহালার বাড়ির বিকেলবেলা, যখন পাঁচ মিনিট পিয়ানো বাজিয়ে নিয়েই একবার থামতে হয়। তারপর কান পেতে শুনতে হয়, গেটের কাছে সিতাংশুর গাড়ির হর্ন বেজে উঠেছে।

ভাবনাটা যেন লোহার কাঁটার মত বীথির মনটাকে বিঁধে বিঁধে কষ্ট দিতে থাকে। ছি ছি, কী ভাবছে সিতাংশু? সে বীথিকে নিশ্চয় একটা প্রাণশূন্য কাঠের পুতুল কিংবা একটা ঠগিনী বলে মনে করছে। কেমন করে বিশ্বাস করবে সিতাংশু যে, বীথি মনে-প্রাণে আজও সিতাংশুর বীথি? সিতাংশুর আশার দাবিটাকে অকারণে অপমান করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে; বেহালার বাড়িটার সেই খামখেয়ালের নিষ্ঠুরতা বাধ্য হয়ে হাসিমুখে শুধু সহ্য করেছে বীথি, ক্ষমা করতে পারেনি। নিজেকেও কি ক্ষমা করতে পেরেছে বীথি? না।

এই বাড়িতে হাজারটা শাঁখ আছে বলে মনে হয়। উঃ, বাড়ির গেটের কাছে এসে পৌঁছতেই শাঁখের শব্দে আর উলু-উলু উল্লাস পাগলের হল্লার চেয়েও ভয়ানক হয়ে বেজে উঠেছিল। ধূপ দীপ কুলো পান ধান ফুল দূর্বা দই ক্ষীর নিয়ে আর বীথিকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে কতরকমেরই না আচার-বিচার করলেন কতরকমের মাসী মামী দিদি আর বউদি। চুপ করে সবই দেখেছে আর শুনেছে বীথি। কেউ বুঝতে পারেনি যে, বীথির মনের ভিতর এখন নিঃশ্বাসের বাতাসটা বিরক্ত হয়ে ছটফট করছে।

সব সহ্য করেও শেষ পর্যন্ত যে ভয়ানক একটা শুভবিধান সহ্য করতে পারেনি বীথি, সেটা হলো ফুলশয্যা। শয্যাতে অনেক ফুল ছিল বটে, কিন্তু চোখে পড়তেই বীথির প্রাণের আতঙ্কটা যেন আগুনের ফুলকি হয়ে ভিতরে জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ও শাস্তি সহ্য করা সম্ভব নয়। ওটা তো কিলখানার একটা শক্ত পাথরের চাতাল, ওটার ধারে-কাছেও যেতে পারবে না বীথি।

বেহালার বাড়িতে বাসরঘরে শুধু একবার একটি কথা বলেছিল অজিত—তুমি সারা রাত জেগে ওই চেয়ারের উপর বসে থাকবে কেন? তার চেয়ে ভাল, তুমি শুয়ে পড়, আমি চেয়ারে বসে থাকি।

সেদিন অজিতের সেই কথার কোন জবাব না দিয়ে সারা রাত চেয়ারেই বসে কাটিয়ে দিয়েছিল বীথি। ফুলশয্যার রাতেও বীথিকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে অজিত বিছানা থেকে তোষক চাদর বালিস তুলে নিয়ে মেঝের উপর পেতে দিল—তুমি আর বসে থেকো না, এই বিছানাতে শুয়ে পড়। আমি না হয়..।

বলতে বলতে জানালার কাছে এগিয়ে যেয়ে রাতের আকাশের চেহারাটার দিকে একবার তাকিয়ে নেয় অজিত, তারপর খাটের বিছানাতে উঠে বসে। ছড়ানো ফুলগুলিকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে হেসে ফেলে—আমি এক ঘুমেই রাত পার করে দেব। রাত আর কতটুকুই বা আছে?

ঠিকই, এক ঘুমে রাত পার করে দিয়েছিল অজিত। মেঝের বিছানাতে শুয়ে পড়ে থেকে, আর একটুও না ঘুমিয়ে ভোর করে দিয়েছিল বীথি। দেখতে পায়নি বীথি, ভদ্রলোক কখন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন আর খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের কুয়াশা দেখছেন।

বীথি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেই এগিয়ে আসে অজিত। হাসতে থাকে অজিত—এইবার মেঝের বিছানাটা তুলে নিয়ে খাটের উপর সাজিয়ে পেতে দিই, কেমন?

বীথি কোন কথা বলে না। অজিতই আবার হেসে কথা বলে—বাড়ির কেউ যেন টের না পায় যে, তুমি সারা রাত মেঝেতে ভিন্ন বিছানাতে শুয়ে রাত কাটিয়েছ।

বীথির চোখের দুই ভুরু হঠাৎ শিউরে ওঠে আর কুঁচকে যায়। বলে ফেলে বীথি—কেন? টের পেলে কী হবে?

অজিত—বউদি তোমাকে মিছিমিছি অনেক কথা জিজ্ঞেস করবে।

বীথি—কৈফিয়ত চাইবে?

অজিত—না, কৈফিয়ত কেউ চাইবে না।

বীথি—কিন্তু আপনিও কি কৈফিয়ত চাইবেন না?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অজিত—আমি তোমার কাছে কোনদিনও কৈফিয়ত চাইব না।

বীথি—কেন? বলবেন?

অজিত—হ্যাঁ ; বলতে পারি।

বীথি—বলুন।

অজিত—কৈফিয়ত চাইবার কিছু নেই।

বীথি—কেন?

অজিত—একজন অচেনা মানুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। শুধু বিয়ে হয়েছে বলেই যে তার সম্পর্কে তোমার একটুও ভয়-সঙ্কোচ থাকবে না, তা তো সম্ভব নয়। থাকবে, খুব থাকবে। সেটা আমি বুঝি। কিন্তু বউদি হয়তো এই সহজ কথাটা বুঝতেই পারবে না, কিংবা বুঝতে চাইবে না।

বীথি—তাহলে তো আপনার বউদিকে আমার সব সময় ভয় করে চলতে হবে।

অজিত—না না, ভয় করে চলতে হবে না। তুমি একটুও ভেব না। কিন্তু, তুমি আমাকে এত আপনি-আপনি করছো কেন? আমার ভয় হয়, তুমি বোধহয় আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভয় করছো।

কথা বলে না বীথি। মিথ্যা কথা বলতে হলে অনেক কিছুই বলে দেওয়া যায়। কিন্তু সত্য কথা বলতে হলে বলতেই হবে, হ্যাঁ তোমাকেই সব চেয়ে বেশী ভয় করে।

কিন্তু সত্য কথাটা স্পষ্ট করে বলে দিলে তো কোন লাভ হবে না। তাতে শুধু বীথির

প্রাণের লুকানো কান্নাটা ধরা পড়ে যাবে। সে কান্নার শব্দটা যতই করুণ হোক না কেন, কেউ তা ক্ষমা করবে না। এবাড়ির কেউ তো নয়ই, বেহালার বাড়িরও কেউ না।

কোন কথা না বলাই ভাল। কথা বললেই কথা বাড়বে। কথা বলতে ভালই লাগে না। বলতে ভয়ও করে।

দেখে খুশী হয় বীথি, ভদ্রলোকও বীথির কথা শোনবার আশায় আর দাঁড়িয়ে না থেকে, মেঝের বিছানাটাকে খাটের উপর তুলে আর সাজিয়ে দিয়ে তারপর ঘরের একটা টেবিলের দেরাজ টেনে দুটো বই বের করে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। স্বস্তি পায় বীথি। সারা রাত বুকের ভিতরে জমাট হয়ে ছিল যে ভয়, সেই ভয়ের ভারটা এতক্ষণে হালকা হলো।

রাতজাগা দুটো ক্লান্ত চোখ নিয়ে ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে ছিল বীথি। কিন্তু আবার ভয় পেয়ে চমকে উঠতে হয়েছিল। সারা বাড়িটা হঠাৎ যেন ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে, হেসে চেঁচিয়ে আর মাতামাতি করে কথা বলতে শুরু করেছে। কেন? কিসের জন্য? অজিত কি এরই মধ্যে বাড়িটার কাছে ফিসফিস করে কোন কথা বলে দিয়েছে? তাই বীথির কাছ থেকে কৈফিয়ত চাইবার জন্যে দুরন্ত দাবির এই হল্লা।

কান পেতে শুনতে থাকে বীথি, বেশ চেঁচিয়ে কথা বলছেন অজিতের দাদা সুজিত—চা তৈরী করতে তোমাদের কত সময় লাগে? কী করছো তোমরা?

জবাব দিল আর-একটা ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—হয়ে এসেছে, হয়ে এসেছে।

বুঝতে পারে বীথি, এটা হলো অজিতের বউদির গলার স্বর। এবাড়ির বড় বউ, যার নাম নিরুপমা, তার গলার স্বর বেশ মিষ্টি হলেও তার মধ্যে কেমন-যেন একটা ছটফটে ভাব আছে। একটা কথা বলতে গিয়ে তিনটে কথা জিজ্ঞেস করে ফেলে। বুঝতে পেরেছে বীথি, এরকম একটি বড় বউয়ের বয়সটা বিশেষ কিছু বড় নয়। বীথির চেয়ে দু-এক বছরের ছোট না হলেও অন্তত সমান সমান তো হবেই।

চা হলো? হলো চা? বারবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেই চলেছেন সুজিত। বারবার ছটফটে স্বরে, যেন ব্যাকুল ব্যস্ততার একটা ঝংকার তুলে জবাব দিয়ে চলেছে নিরুপমা—হয়ে এসেছে, আর দেরী নেই, এই তো বড়জোর আর একটা মিনিট।

কথা বলছেন অজিতের মা—চায়েতে এ শিশির চিনি দিও না, নিরু।

—তবে কোন্ চিনি দেব?

—ওই যে, তোমার শ্বশুর যে চিনি বীথির জন্যে কাল কিনে আনলেন, যেটা মোটা দানার পরিষ্কার চিনি।

—এই শিশিটা?

—হ্যাঁ। একটু তাড়াতাড়ি কর।

ধীর স্থির ও শান্ত গলার স্বরের মানুষটিও ব্যস্ত হয়ে কথা বলছেন, অজিতের বাবা।—তুমি নিরুকে একটু সাহায্য করলেই তো পার।

সুজিত—না না, মা চা করতে পারবে না। মা বরং আনারসটা কেটে ফেলুক। আনারসটা কিন্তু মিষ্টি নয় বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাবা। কোন্ বাজারে কিনেছিলে?

—হাতিবাগানের বাজারে।

—ভুল করেছো। আমাকে বললেই তো পারতে। আমার অফিস থেকে নিউ মার্কেট কতটুকুই বা দূরে: আমাকে একবার বলে দিলেই নিউমার্কেট থেকে শিলচরের আনারস নিয়ে আসতে পারতাম।

অজিতের বাবার শান্ত কণ্ঠস্বর আবার ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করে—একটু তাড়াতাড়ি কর, নন্দা। তুমি বরং বিম্বিসারকে আমার কোলে দিয়ে যাও। ওকে কোলে নিয়ে কাজ করতে তোমার অসুবিধে হবে।

হ্যাঁ, নিরুপমার ছ'মাস বয়সের বাচ্ছা ছেলেটির নাম বিম্বিসার।

হেসে ফেলে বীথি। যাক্, তবু ভাল, এটা শুধু চা তৈরী করবার একটা হল্লা, কৈফিয়ত চাইবার কোন হল্লা নয়। কিন্তু এবাড়ির প্রাণের স্বভাবটাকে বেশ অদ্ভুতই বলতে হবে। শুধু চা তৈরী করবার জন্যেই এরকম একটা ছুটোছুটি ব্যস্ততা আর হল্লা! ভদ্রলোকের যেন এখুনি চা আর আনারস না খেতে পেলে বুক শুকিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

আবার চমকে উঠতে আর ভয় পেতে হয়। বীথির চোখের তারা দুটো কেঁপে ওঠে। এ কী? চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছে নিরুপমা।—সত্যি, বেশ দেরী হয়ে গেল, ভাই।

বীথিকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে নিরুপমা আবার সেই মিষ্টি গলার ছটফটে স্বরে কথা বলে—চটপট মুখটা আর চোখ দুটো একটু ধুয়ে নাও বীথিদি। চা খাও, আনারস না হয় একটু পরে খাবে। কিন্তু চোখ দুটো ওরকম কাহিল কেন? খুব রাত জেগেছো বুঝি? যাক্, ভালই করেছো।

কথা বলতে গিয়ে বীথির গলার স্বরের সঙ্গে এই ভয়ের একটা বিস্ময়ও জড়িয়ে পড়ে বিড়বিড়ি করে।—আমার চায়ের জন্যে এত ব্যস্ত হবার কোন মানে হয় না।

দেখতে ও ভাবতে সেদিন যেরকম আশ্চর্য বোধ করতে হয়েছিল, আজ একমাস পরেও তেমনই আশ্চর্য বোধ করতে হচ্ছে। বীথিকে খুশি করবার জন্যে এবাড়ির অন্তরাত্মা যেন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে থাকে।

না, এবাড়ির এই তিনটি মানুষকে আর ওই ক্ষুদ্র বিম্বিসারকে ভয় করবার কিছুই নেই। কিন্তু সত্যি কথা, বীথিকে খুশি করবার এই ব্যস্ত-ব্যাকুল চেষ্টাটাকে ভয় করে। ভালও লাগে না। বরং, খুব দুঃসহ একটা অস্বস্তি বোধ করতে হয়। এ যেন গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে তেতো ওষুধ গিলিয়ে দেওয়া। বীথির অসুখী প্রাণের খবর এরা রাখে না। এরা কিছুই জানে না, বোঝেও না ; তবু মনে হয়, এরা যেন বীথির দুর্ভাগ্যকে ঘুষ দিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাইছে।

কোন সন্দেহ নেই, বীথি এবাড়িতে না এসে যদি অন্য কোন মেয়ে আসতো তবে এবাড়ির এরকমের আদর আর যত্নকে মণি আর রত্ন বলে বোধ করতো। কিন্তু বীথির কাছে এসব আদর আর যত্ন তো সৌভাগ্যের মূল্যবান উপহার বলে মনে হতে পারে না। দরকার নেই, বীথিকে খুশি করবার জন্য এবাড়ির চেষ্টাতে আর ব্যস্ততায় এত বাড়াবাড়ি না থাকলেই ভাল হয়। সব সময় কিংবা যখন-তখন যদি কারও গলাতে ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটা একটা জঞ্জালের উপদ্রবই হয়।

এরই মধ্যে সুজিত আর নিরুপমা একদিন কলকাতার দশটা দোকান ঘুরে আর খুব পছন্দ করে একটা কমলা রঙের বিষ্ণুপুরী কিনে নিয়ে এসেছে। নিরুপমা সেই শাড়ির একটা ভাঁজ খুলে শাড়িটাকে বীথির গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়ে দেখেছে, আর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে—খুব ভাল মানাবে। শুনছো?

বীথি—হ্যাঁ।

নিরুপমা—তোমাকে বলছি না।...শুনছো, কোথায় তুমি?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুজিত জবাব দেয়—এইতো, আমি এখানে।

নিরুপমা—দেখছো?

সুজিত—হ্যাঁ।

নিরুপমা—বীথিকে চমৎকার দেখাবে।

সুজিত—একথা তো আমি আগেই বলেছি। আমিই তো শাড়িটা পছন্দ করেছি।

এরা জানে না, এর চেয়ে কত ভাল কত শাড়ি বেহালার বাড়িতে বীথির আলমারির ভিতরে পড়ে আছে। কমলা রঙের বিষ্ণুপুরী পরবার কোন শখ নেই বীথির মনে। বিষ্ণুপুরী পছন্দই করে না বীথি।

নিরুপমা বলে—বাবা বলেছেন, তুমি আজ বিকেলে এই শাড়ি পরবে।
—কেন?
—আজ বিকেলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাবা বেড়াতে বের হবেন।
—কোথায়?
—বাইরে কোথাও নয়। আমাদের এই বাড়ির বাগানে।
—কেন?
—এটা একটা নিয়ম। এবাড়িতে বউ হয়ে যে আসবে, তাকে এক মাসের মধ্যে যে-কোন একটি মঙ্গলবারে কমলা রঙের নতুন বিষ্ণুপুরী পরতে হবে আর বাগানে বেড়াতে হবে, তারপর করুণাকালীকে প্রণাম করে আবার ঘরে ঢুকতে হবে। তিনপুরুষ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।
—তুমি পরেছিলে?
—হ্যাঁ।
—আর, উনি?
—কার কথা বলছো? মা?
—হ্যাঁ।
—নিশ্চয়।
—বেশ, খুব ভাল কথা।
বলতে গিয়ে হেসে ফেলে বীথি। নিরুপমার বুঝবার সাধ্যি হয়নি যে, বীথির প্রাণটা দুর্ভাগ্যের একটা কিম্ভুত চেহারাটাকে ঠাট্টা করে হাসছে।
কিন্তু বিকাল হতেই ভুবনবাবু যখন ডাক দিলেন, কই নিরু, তুমি এবার বীথিকে সাজিয়ে নিয়ে এস, তখন দুই চোখে দুটো কঠোর ভ্রূকুটিকে কোন মতে সামলে নিয়ে, আর কমলা রঙের বিষ্ণুপুরীতে সেজে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। অভিনয় যখন করতেই হবে, তখন অভিনয়ে কোন খুঁত না থাকাই ভাল। কাকিমা শুনতে পেয়ে আহ্লাদে একেবারে গলে পড়বে, বীথি খুব খুশি হয়ে বিষ্ণুপুরী শাড়ি পরে শ্বশুরের সঙ্গে বেড়িয়েছে, হেসেছে, গল্প করেছে।
গাছের বাগান তো নয়, গল্পের বাগান। ভুবনবাবু বললেন—এই যে আম গাছটা দেখতে পাচ্ছ, এই গাছের একটা ডালে একদিন একটা ঘুড়ি আটকে গিয়েছিল। সেটা হলো আমার বাবার ঘুড়ি। বাবা তখন দশ বছর বয়েসের একটা ছোট্ট দুরন্ত ছেলে। কিন্তু দুরন্ত হলে হবে কি? গাছে চড়বার আর ঘুড়িটাকে পেড়ে আনবার সাধ্যি হয়নি। বাবার বয়স যখন প্রায় আশি বছর, যখন চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না, তখনও এই গাছটার দিকে তাকিয়ে আমাকে গল্প বলতেন—জানিস ভুবন, আমি সেদিন ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে আর ছটফট করতে করতে কেঁদেই ফেলেছিলাম।
গল্প বলতে গিয়ে ভুবনবাবুর চোখের হাসিটাও ছলছল করে—এখনও, যখন কোনদিন এই গাছের ডালে কোন ঘুড়ি আটকে আছে দেখতে পাই, তখন আমার কী মনে হয় জান, বীথি? মনে হয়, বাবা বোধহয় ছোট্ট ছেলেটি হয়ে এখানে আসেন, ঘুড়িটাকে দেখে ছটফট করেন আর কেঁদে ফেলেন।
পুকুরের কাছে জীর্ণ চেহারার দোলমঞ্চটার কাছে এসে ভুবনবাবু আবার গল্প করেন—আমি তখন ছেলেমানুষ, বয়স বড়জোর ষোল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। তুমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছ বীথি, ঠিক সেখানে আমার মা সেদিন দাঁড়িয়েছিল। সেদিন কমলা রঙের বিষ্ণুপুরী শাড়ি পড়েছিল মা। এই দোলমঞ্চে আবীর ছড়াতে এসেছিল। মা'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজ তো দোল নয় মা, তবে তুমি এখানে এসে আবীর ছড়াচ্ছো কেন? মা

বললে, তাতে কী হয়েছে। আজ আমার বিয়ের দিন।

পুকুরের কিনারার কাছে এগিয়ে এসে হাসতে থাকেন ভুবনবাবু—এখানে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা কর, বীথি ; তা হলে একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাবে।

ঠিকই, দেখতে পায় বীথি, পুকুরের জলের কাছে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ভুবনবাবু আর বীথি, সেখানে জলের মধ্যে খুব বড় একটা মাছ এসে দুলতে থাকে। ভুবনবাবু হাসেন।—এটার নাম জয়। তারপরেই আর একটা মাছ। ভুবনবাবু বলেন—এটার নাম বিজয়। জলেতে আমাদের বাড়ির কারও ছায়া পড়লে এই রুই দুটো ছুটে আসে। দুলালবাবু কিন্তু একদিন একটু রাগ করে বলেছিলেন—কই, আমার ছায়া দেখতে পেয়ে তো আপনার জয়-বিজয় ছুটে এল না, এর মানে কী? আমিও ঠাট্টা করে বলেছিলাম—আমি কী করে বলবো, বলুন। জয়-বিজয় বলতে পারে।

ছোট ছেলের মত আকুল হয়ে আর হেলেদুলে হাসতে থাকেন ভুবনবাবু। বীথিই বা না হেসে থাকতে পারবে কেন? বীথিও হেসেছিল।

বাগানের কনকচাঁপার গাছটাও একটা গল্প। ভুবনবাবু বললেন—প্রত্যেক বছর আশ্বিন মাসে কোথা থেকে দুটো নীলকণ্ঠ উড়ে এসে এই কনকচাঁপার একটা ডালের উপর বসে। বিকেলে আসে আর সন্ধ্যা হতেই চলে যায়। ঠিক তার পরের দিন থেকে কনকচাঁপার কুঁড়ি ধরতে শুরু করে। ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছিলাম ঃ কোথা থেকে একজন সাধু একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ এসে বললেন, আমাকে আজ একটু আশ্রয় দিন। আজ রাতটুকু আপনাদের বাগানের একটা গাছতলায় থাকবো, আর ভোর হতেই কেদারজীর কাছে চলে যাব। ঠাকুরমা বুঝলেন, এই সাধু কেদার তীর্থে যাবেন। কিন্তু সাধুর পায়ে খুব ব্যথা, হাঁটতে পারছেন না। সাধু তাই রাতটুকু বিশ্রাম করে পায়ের ব্যথা সারিয়ে নিয়ে ভোরবেলাতে আবার রওনা হবেন। কিন্তু ভোরবেলাতে দেখা গেল, সাধু সত্যিই কেদারজীর কাছে চলে গিয়েছেন। প্রাণ নেই সাধুর, শুধু তাঁর দেহটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। এই যে, এই সেই পাকুড় গাছ। আর, ওই দেখ, গাছের গায়ে সেই সাধুর চিমটে আর কমণ্ডলু এখনও ঝুলছে!

বাগানে বেড়িয়ে আর করুণাকালীকে দর্শন করে যখন আবার এই ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ায় বীথি, তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে বীথি, কপালটা ঘামে ভেসে গিয়েছে। আর, কমলা রঙের বিষ্ণুপুরীটা যেন এই সব অদ্ভুত গল্পের ধুলো লেগে ভয়ানক ভারী হয়ে গিয়েছে। আঁচলটা গা থেকে নামিয়ে নিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে বীথি।

সন্দেহ হয় বীথির ; মা আর কাকা বোধ হয় এইসব গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। অসম্ভব নয়, গল্পগুলিকে দেউলবাড়ির মস্ত বড় একটা ঐশ্বর্য বলে তাঁদের মনে হয়েছে। মা আর কাকার মনে সেকেলে বিশ্বাসের অনেক বাতিক আছে। তা না হলে এবাড়ির ছেলে অজিত মজুমদারকে একজন খুব ভাল ছেলে বলে এত নিরেট একটা বিশ্বাস তাঁদের হবে কেন?

কিন্তু বেহালার বাড়িটা কি আজ কল্পনা করতে পারবে যে, এসব গল্প বীথির কাছে ভুতুড়ে আনন্দের একটা সোরগোল বলে মনে হয়েছে? পারবে না। কাকিমা এখন এসে এ ঘরে একটু উঁকি দিলেই দেখতে পেত আর বুঝতে পারতো, গল্পগুলি শুনে বীথিকে শুধু হয়রান হতে হয়েছে। হাঁপাতে হয়েছে, ক্লান্ত হতে হয়েছে। এসব গল্প বীথির দুর্ভাগ্যটার ভার একটুও হালকা করে দিতে পারবে না।

যাই হোক, ভাল না লাগুক আর যত দুঃসহ বোধ হোক্ তবু এবাড়ির অদ্ভুত বাগানের বুড়ো বুড়ো গাছের ছায়া, সাদা জবা আর রাঙা জবার গল্প, আর অকারণ যত্ন-আদরের যত ব্যস্ত-ব্যাকুল সোরগোলের সঙ্গে চলতে পারা যাবে, জোর করে হেসে থাকতেও পারা যাবে।

এই একটা মাস যেমন করে চলে গেল, তেমন করে জীবনের বাকি সব মাস চলে গেলেই হলো।

কিন্তু আজ লেস বুনতে গিয়ে বার বার ভুল করছে বীথি। সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে, হাতে বার বার কাঁটার খোঁচা লাগছে। এ যেন মিথ্যে হয়রানির লেস বোনা। শত চেষ্টা করলেও আজ এক ইঞ্চি লেসও বুনতে পারা যাবে না। বীথির চোখের তারা দুটো বার-বার যেন জ্বলে উঠছে।

লেস আর লেসের কাঁটা দুটোকে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আর হাত তুলে কপালকে যেন খিমচে ধরে বীথি। না, তার চেয়ে ভাল এক শিশি ঘুমের বড়ি খেয়ে একেবারে শেষ হয়েই যাওয়া।

এবাড়িতে যাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে, এই একটা মাস যাকে দূরে দূরে রেখে এবাড়িতে থাকতে আর চলতে পেরেছে বীথি, সে আজ বেশ স্পষ্ট করে বলেছে ঃ এভাবে চলবে কি করে?

হেসে হেসে কথাটা বলেছে অজিত। কিন্তু অজিতের মুখের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পেরেছে বীথি, ভদ্রলোকের মনের ভয়ানক একটা ইচ্ছের জেদ স্পষ্ট হয়ে আর কটমট করে হাসছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না ভদ্রলোক, বীথির শরীরটা কী ভয়ানক ঘেন্না পেয়ে শিউরে উঠেছে।

অজিতের বন্ধু, যার নাম দীপেন, সে আজ হঠাৎ বাড়ির ভিতরে ঢুকে এই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি আর চেঁচামেচি করে যে-কথা বলেছে, সেকথা শুনে নিরুদি খিলখিল করে হেসেছে, কিন্তু বীথির গা ঘিনঘিন করেছে।

—বলুন বড় বউদি, আমাদের এই নতুন বউদির মুখের সঙ্গে কি ভেনাসের মুখের বেশ একটা মিল আছে বলে মনে হয় না?

নিরুপমা—ভেনাস কে?

—তিনি একজন বিখ্যাত রূপসী।

নিরুপমা—আমি কখনও দেখিনি।

—তা বেশ করেছেন। কিন্তু বীথি বউদিকে দেখে বুঝতে পারছেন তো, কেন এই মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য আমার বন্ধুটি অমন হন্যে হয়ে উঠেছিলেন। ওঃ, আমার কাছে বার বার সে কী আবেদন! তুমি মাকে একবার ভাল করে বুঝিয়ে বল, দীপেন। তুমি একবার দাদাকে বল, দীপেন!

হাতের ঝোলার ভিতর থেকে একগাদা গন্ধরাজ ফুল, একগাদা আঙুর আর আমসত্ত্বের একটা প্যাকেট বের করে চেঁচিয়ে ওঠে দীপেন—আমাদের জিয়াগঞ্জের আমসত্ত্ব। খেয়ে দেখবেন বীথি বউদি, তবেই বুঝবেন যে, জীবনে এমন জিনিস খাননি।

নিজেকে শিক্ষিত বলে মনে করে এই ভদ্রলোক, রেলওয়ের একজন বড় অফিসার হয়েছেন, কিন্তু প্রাণটাকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেননি। এ তো জংলী যুগের মানুষের মত একটা ভোঁতা অবুঝ মনের স্বভাব ; যেন হন্যে হওয়াই একটা অধিকার। ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে এলেই হলো। অদ্ভুত! জঘন্য!

খুব বুঝতে পারা যায়, আজ ওরকম কটমট করে হেসে যে-কথা বলেছে অজিত, সেটা হন্যে হওয়া একটা ইচ্ছেরই কথা।

না, যা হবার হবে। সেই নির্বোধ ইচ্ছের হাত দুটোকে একেবারে স্পষ্ট ঘেন্নার একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে হবে। দরকার হলে ঘর ছেড়ে একেবারে বাইরের বারান্দায় এক কোণে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ না ভোর হয়। কিংবা এবাড়ির আলো অন্ধকারের ছোঁয়া থেকেই ছুটে সরে গিয়ে একেবারে বেহালা চলে যেতে হবে। ট্যাক্সি

পাওয়া যায় ট্যাক্সি, বাস পাওয়া যায় বাস।

ঘরের ভিতরে চেয়ারের উপর আর নিথর হয়ে বসে থাকতে পারে না বীথি। জ্বলছে মাথাটা, জ্বলছে নিঃশ্বাস। ঘরের ভিতরে বাইরের নারকেল গাছের ছায়াটা যেমন ছটফট করে একবার এই দেয়ালে আর একবার ওই দেয়ালের গায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে, বীথির মূর্তিটা প্রায় সেই রকমই ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়। একবার ঘরের এ-দিকের দেয়ালের গায়ে, একবার ও-দিকের দেয়ালের গায়ে হাতের ভর এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে। বার বার দরজার দিকে তাকায়। এখুনি চলে গেলেই তো হয়। বেহালার বাড়িতে ঢুকে, মা কাকা আর কাকিমার চোখের সামনেই টেলিফোনে ডাক দিয়ে সিতাংশুকে একবার বলে দিলেই হলো—তুমি এস, এখুনি এস, শিগগির এস।

সেই মুহূর্তে বীথির এই ছটফটে মূর্তির দুরন্ত জ্বালার চোখ দুটো স্তব্ধ হয়ে গিয়ে পাথরের দুটো চোখের মত তাকিয়ে থাকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কাকিমা আর নিরুদি। নিরুদির কোলে বিম্বিসার হাত-পা ছুঁড়ছে আর কাঁদছে।

নিরুপমা হাসে—ওই দেখুন কাকিমা, ওই যে আপনাদের মেয়ে। সারা বিকেলটা এই ঘরেই থাকে আপনাদের মেয়ে। লেস বোনে আর উসখুস করে, যতক্ষণ না ছোড়দা অফিস থেকে ফিরে আসে। আপনি এঘরে বসুন, কাকিমা। আমি যাই, এটাকে খাইয়ে আসি, এটার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

নিরুপমা চলে যেতেই রমা আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে বীথির একটা হাত ধরেন।—এ কী? এরকম একটা পাগল-পাগল চেহারা ধরে কী করছো এখানে? কী ভাবছো?

বীথি—তুমি কী ভেবে হঠাৎ এখানে চলে এলে?

রমা—শখ করে তো আসিনি, বাধ্য হয়ে এসেছি।

বীথি—তার মানে?

রমা—তোমার মা আর কাকা আমাকে না পাঠিয়ে ছাড়লেন না।

বীথি—কেন?

রমা—দিদি স্বপ্ন দেখেছেন, তুমি একটা নদীর শূন্য ঘাটে তুফানের মধ্যে একা বসে আছো আর কাঁদছো। দিদির স্বপ্নের কথা শুনে তোমার কাকা সেই সকাল থেকে মুখ শুকনো করে ঘরে বসে আছে, অফিসে যায়নি।

বীথি—স্বপ্নের তো কোন মানে হয় না।

রমা—সেটা আমি না হয় বুঝলাম, কিন্তু তোমার মা আর কাকাকে তো চেন, তারা কী সহজে বুঝতে চাইবে?

বীথি—তা হলে কে আর কী করতে পারে বল?

রমা—তুমি এরকম রুক্ষসুক্ষ একটা মূর্তি না হয়ে বেশ হাসিখুশি হয়ে থাকলেই তো পার।

চমকে ওঠে বীথি—কী বললে? রুক্ষসুক্ষ?

রমা—তাই তো দেখছি।

হেসে ফেলে বীথি—নাকে মুখে দু-চারটে বিউটি গ্রেন ঘসে দিইনি বলে একেবারে রুক্ষসুক্ষ হয়ে গেলাম? ধন্যি তোমার চোখ।

রমা হাসতে থাকেন।—অজিতের অফিসে ফোন করে অজিতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম. কেমন আছে বীথি?

বীথি—অ্যাঁ?

রমা—অজিত বললে ঃ ভাল আছে বীথি। বাড়ির কথা ভেবে মাঝে-মাঝে মনমরা হয়ে যায়, এই মাত্র। আপনারা চিন্তা করবেন না।

বীথি—উনি যা বুঝেছেন তাই বলেছেন। কিন্তু ঠিক কথা, তোমরা এত চিন্তা করবে কেন?

এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন-টপ্ন দেখবে কেন?

রমা—তুমি এখানে মনমরা হয়ে থাকলে ওরকম অদ্ভুত স্বপ্ন-টপ্ন আমাদের দেখতেই হবে। আর, আমাকেও ছুটে-ছুটে আসতে হবে।

খুশী ফোয়ারার মত কলকল করে হেসে ওঠে বীথি—না গো মাই ডিয়ার কাকিমামণি, না। একটুও চিন্তে করবে না।

নিরুপমা হেসে ঘরের ভিতরে ঢোকে।—চলুন কাকিমা, করুণাকালীকে যদি দেখতে চান।

হাত বাড়িয়ে বিম্বিসারকে নিরুপমার কোল থেকে তুলে নিয়ে রমা বলেন—চল।

বীথির দিকে তাকিয়ে নিরুপমা মুখ টিপে হাসে।—তোমাকে যেতে হবে না। তুমি থাক। তুমি ভালো করে সাজো। এখুনিই সাজো, আর দেরী করো না।...হ্যাঁ কাকিমা, আজকাল ছোড়দা অফিস থেকে যখন-তখন চলে আসে।

রমা কাকিমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে এইবার ছটফটিয়ে হাসতে থাকে নিরুপমা।—আপনাকে দেখতে একেবারে অবিকল আমার টুলি পিসিমার মত, যিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন। সে বলে, মানুষ তো করেনি, একটা ফানুষ করেছে। বলুন তো কাকিমা, শুনলে কার না রাগ হয়।

রমা কাকিমা'র প্রাণটা যেন খুশিতে গলে গিয়ে আর আকুল হয়ে হাসতে থাকে।—না, কখ্‌খনো রাগ করবে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আর দুই ঠোঁট দিয়ে হাসিটাকে শক্ত করে ধরে রাখে বীথি।

চলে গেলেন রমা কাকিমা। ঠিক কথা, যখন থাকতেই হবে, তখন হাসতেই হবে। ওই ভদ্রলোকের কাছেও হাসতে হবে। সাপুড়েরা মন্ত্রপড়া চুবড়ি দিয়ে দুরন্ত কেউটে সাপকে ঢাকা দিয়ে রাখে। তবে, বীথিই বা ওর প্রাণের দুরন্ত একটা ঘৃণাকে মিথ্যে হাসির চুবড়ি দিয়ে ঢেকে রাখতে পারবে না কেন?

সন্ধ্যা হতে এখনও দেরী আছে। পড়ন্ত বিকেলের আকাশে এক টুকরো লাল মেঘ থমকে ভেসে রয়েছে। আয়নাটার বুকের উপর তারই আভা পড়েছে, যেন অনেক দূরের আগুনের এক টুকরো ঠাণ্ডা হাসি।

লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে বীথি। ঘাড়েতে গলাতে পাউডার ছড়ায়। হ্যাঁ, জানাই আছে, সিতাংশুর গাড়ির হর্ন আজ আর বেজে উঠবে না। কিন্তু এখন কী করছে, কোথায় আছে সিতাংশু?

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর বুঝতে পারে বীথি, সন্ধ্যা হয়েছে ; চোখে বোধ হয় একটা ধোঁয়াটে ঘুমের আবেশ লেগেছিল, তাই ভাল করে তাকাতে গেলেই চোখ দুটো কটকট করে।

আলো জ্বালে বীথি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপাতে পিন গুঁজে দিয়ে দেখতে থাকে, জ্বলজ্বল করছে পিনের মাথার পোখরাজ পাথর। অনেক দিন আগে একদিন ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার পর্দাতে খোঁপার এই হেয়ার পিন আটকে গিয়েছিল, পর্দাটা বীথির গলায় জড়িয়ে গিয়েছিল। দেখতে পেয়ে হেসে ফেলেছিল সিতাংশু।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে বীথি। বাগানটা অন্ধকারে ভরে গিয়েছে। তবু দেখতে আর বুঝতে পারা যায়, পুকুরের বুকের মাঝখানে জলটা যেন আয়না হয়ে ভাসছে। তার উপর দু' তিনটে বড় বড় তারা আস্তে আস্তে নড়ছে আর গলছে। অনেক দূরে ওটা বোধ হয় ক্যান্টনমেণ্টের সেই ঝাপসা আকাশবাতিটা দুলছে। কে যেন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয়, তার চোখের আলোকটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। না, এখন আর চোখ ঝাপসা করবার কোন মানে হয় না। একটা চড়ুই ছোট্ট বলের মত গোল হয়ে ঘরের আলমারীর মাথাটার উপর বসে ঘুমোচ্ছে। হেসে ফেলে বীথি। মা এখন একটা স্বপ্ন দেখলেই পারেন, তাঁর মেয়ে নদীর শূন্য ঘাটে একা বসে এখন কাঁদছে, না হাসছে।

কিন্তু আর কতক্ষণ এই প্রতীক্ষার হাসিটাকে ধরে রাখতে হবে? ভদ্রলোক ক'দিন হলো যখন-তখন বাড়ি ফিবে আসে, বাড়িয়ে বলেনি নিরুদি। কিন্তু রাত তো কম হলো না। আজ তিনি কি তবে মাঝরাতে বাড়ি ফিরবেন? রাগ হয়েছে? বীথিকে মাঝরাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখে রাগের ঝাল মেটাবার সাধ হয়েছে?

নিরুপমা ঘরে ঢুকে ডাক দেয়—তুমি এখন খাবে চল, বীথি।

বীথি হাসে—না।

নিরুপমা—ছোড়দার বাড়ি ফিরতে আজ দেরী হবে।

বীথি—বেশ তো। আমিও তাহলে দেরী করি।

নিরুপমা—না. তুমি খেয়ে নাও।

বীথি—সে কী? একজন এখনও বাইরে, এদিকে আমি আগেই খেয়ে নেব? না নিরুদি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন নন্দা—তুমি খেয়ে নাও, বীথি। ওতে তোমার লজ্জা করবার কিছু নেই।

ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে এসে কথা বলেন ভুবনমোহন।—অজিতকে আজ খুব দরকারী একটা কাজে চন্দননগর যেতে হয়েছে।

ভুবনমোহনের পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন সুজিত।—রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে একটা তদন্ত করতে গিয়েছে অজিত। যেমন কঠিন দায়িত্বের কাজ, তেমনই ঝঞ্ঝাটের কাজ। বড় বড় কন্ট্রাক্টরকে জেরা করতে হবে। কাজেই...।

ভুবনমোহন—কাজেই. অজিতের ফিরতে দেরী হবে মনে হয়। তুমি আর দেরী না করে খেয়ে নাও, বীথি।

যখন অনেক রাত, যশোর রোডের বাতাস যখন নিঝুম, মাঝে মাঝে এক-একটা একলা রিক্‌সার টুংটাং শব্দ শোনা যায়, তখন।

খাটের উপর বসে আছে অজিত, যেন ধন্য আশার একটি সুস্ন মূর্তি। খুবই বুঝতে পেরেছে অজিত, ঘরের আলোটা আজ কেন এত উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে।

চেয়ারের উপর বসে আছে বীথি। খোঁপাতে হেয়ার পিনের পোখরাজ ঝিকমিক করছে।

অজিত হাসে—আমি গান গাইতে জানি না। জানলে, একটা গান এখনই গেয়ে ফেলতাম।

বীথি—কি গান?

অজিত—আজু মুঝে শুভদিন ভেলা।

বীথি—এটা কোন্ যুগের গান?

অজিত—সব যুগের।

বীথি হাসে—তোমার কপালে ওটা কিসের কাটা দাগ?

—এ যুগের।

—তার মানে?

—গত বছর কানপুরে হকি টুর্নামেন্টে সেমিফাইন্যালের খেলাতে খুব জোরে বল হিট করতে গিয়ে পা পিছলে গিয়েছিল, পড়ে গিয়েছিলাম, কপালে চোট লেগেছিল।

—ভাল খবর নয়।

—ভাল খবর আছে। শুনবে?...বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি বয়সে আমার চেয়ে কম করেও কুড়ি বছর বড়, তিনি আজ আমাকে কী বললেন, বলবো?

—বল!

—তিনি বললেন, আজ রাতে আর বাড়ি নাই-বা ফিরে গেলে মজুমদার। আমার সঙ্গে আমার সেলুনে থেকে যাও আর পঞ্চাশ বছরের পুরনো এক গেলাস পোর্ট খাও। কিন্তু আমি কী বললাম, বলবো?

—বল।

—আমি বললাম ঃ সম্ভব নয়, স্যার। আমার জন্য এখন একজন অপেক্ষা করে রাত জাগছে। উনি বললেন ঃ কে অপেক্ষা করছে? প্রেমিকা নাকি? আমি বলে দিলাম ঃ হ্যাঁ স্যার ; প্রেমিকা স্ত্রী।

—কথাটা বোধ হয় খুব ভেবে-চিন্তে বলনি।

—না। ভেবে-চিন্তে বলতে হবে কেন? সহজ কথাটা, সত্য কথাটা মুখে চলে এল, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম।

—ভাল।

—সত্যি আমার ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগে! তোমার সঙ্গে কোনদিনও আমার চেনাশোনা ছিল না। এই তো সেদিন বিয়ে হল বলেই একটু চেনাশুনো হলো, কিন্তু কই, আমাকে ভালবাসতে তোমার তো একটুও দেরী হ'ল না।

—কিন্তু তার তো কোন প্রমাণ পাওনি।

—পেয়েছি বৈকি। অনেক প্রমাণ পেয়েছি।

—অন্তত একটা প্রমাণের কথা বল।

—এই এক মাসের মধ্যে তুমি তো বেহালার বাড়িতে যাবার জন্য একবারও অস্থির হয়ে উঠলে না।

হাত তুলে মুখের ভিতর থেকে উথলে ওটা হাসিটাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করে বীথি—খুব ভাল প্রমাণ।

অজিত—হাসলে হবে কি? আমাকে ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে হয়নি তোমার। আমি জোর করে একথা বলতে পারি।

বীথি—হ্যাঁ, জোর করে বললেই কথাটা সত্য হয়ে যায়, এরকম বিশ্বাস অনেকেরই আছে।

—তা নয়, সত্য না হলে কেউ ঠিক জোর করে সেটা বলতে পারে না।

—তবে তাই।

—কিন্তু.. রাত ফুরোতে আর খুব বেশি বাকি নেই।

চমকে ওঠে বীথির বুকটা। আতঙ্কটাও যেন ছুঁচের মুখের মত তীক্ষ্ণ একগাদা নখ দিয়ে বীথির রক্তমাংসের শরীরটাকে খিমচে ধরেছে। আজ আর মেঝের উপর দ্বিতীয় বিছানাটা নেই।

—বীথি। আবার ডাকে অজিত।

শুনতে পায় না বীথি। বীথির মন-প্রাণ আত্মা সবই যেন এক মুহূর্তে বধির হয়ে গিয়ে শুধু একটা মুমূর্ষু নিঃশ্বাস হয়ে ধুকপুক করে।

বীথির কাছে এসে দাঁড়ায় অজিত। বীথির মাথাটা দু হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নেয়। অজিতের নিঃশ্বাসের বাতাস যেন বিহ্বল হয়ে বীথির খোঁপার উপর ঝরে পড়ে কথা বলতে থাকে—বিশ্বাস হয় না যে, তুমি একমাস আগে এই ঘরে ছিলে না। মনে হচ্ছে, তুমি চিরকালই এখানে ছিলে। তুমি আমার কতকালের চেনা বন্ধু, কী মিষ্টি বন্ধু!

বীথির মাথার উপর মাথা রেখে আর এভাবে দু' হাতে গলা জড়িয়ে ধরে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে অজিত, স্বপ্নও দেখছে বোধ হয়। বুঝতে পারে না যে, বাগানের গাছে খরকুটোর বাসাতে পাখির শেষরাতের ঘুম উসখুস করে ভাঙতে শুরু করেছে। দূরের একটা কারখানাতে ঘুম-ভাঙানো সাইরেন বাজছে।

চোখ দুটো বন্ধ করেই রাখে বীথি। দুঃসহ দৃশ্যটাকে চোখে দেখলে সহ্য করতে পারা যাবে না। এক হাতে বীথির গলা জড়িয়ে ধরে, আর-এক হাতে বীথির খোঁপার পিন খুলে চেয়ারের হাতলটার উপর রাখছে অজিত।

রাত ফুরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু বুঝতে পারে বীথি, নিশির ডাক ফুরোয়নি। কিছুক্ষণের মত মরে যেতে হবে, কিংবা দাঁতে দাঁত চেপে সব ঘেন্না আটকে রাখতে হবে, একটা দুঃস্বপ্নের বিছানাতে অসাড় বোবা আর্তনাদের শরীর হয়ে পড়ে থাকতে হবে। তবে ফুরোবে নিশির ডাক।

খাটের বিছানা থেকে নেমে যখন চেয়ারের উপর বসে বীথি, আর শাড়ির আঁচল দিয়ে পাগলের আক্রোশের মত কপালটাকে ঠুকে ঠুকে কপালের ঘাম মুচতে থাকে, তখন বাইরের বাগানের অন্ধকার ফিকে হয়ে গিয়েছে। মনে হয়, কপালটা বুঝি ঘেন্না সহ্য করতে না পেরে রক্তে পিছল হয়ে গিয়েছে। ছি ছি, এ কী হলো? কার আশার তৃপ্তিটাকে কার কাছে এনে বলি দেওয়া হলো? বীথির চোখ দুটো বার বার জ্বলে ওঠে, আবার ঝাপসা হয়ে যায়!

অজিতের ঘুম-জড়ানো চোখ দুটো হঠাৎ চমকে ওঠে। পাশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কী যেন খোঁজে। তারপরেই বিছানা থেকে উঠে এসে বীথির কাছে দাঁড়ায়—তুমি কখন উঠে এলে, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু...কী হলো বীথি?

হেসে ফেলে বীথি—কী আবার হলো?

অজিত—তাই বল? ইচ্ছে করে আমাকে মিথ্যে একটা ভয় দেখানো হচ্ছিল। কী ভয়ানক দুষ্টু চোখ তোমার।

বীথি—কী বললে?

অজিত—চল বাগানে বেড়িয়ে আসি।

বীথির দুই চোখ কাঁপিয়ে দিয়ে তীব্র একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে, কিন্তু হেসে ফেলে বীথি—চল।

পুকুরের দক্ষিণে অনেক কামরাঙা গাছ। তার পিছনে ঘন আলোকলতার ঝোপ। ঝোপের ভিতরে এখনও কালো-কালো অন্ধকার যেন গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। অজিত বলে—না, ওদিকে যাব না।

পুরনো দোলমঞ্চের গায়ে ভোরের আকাশের একছিটে আভার আবীর পড়েছে। বীথির একটা হাত ধরে অজিত বলে—এগিয়ে চল।

অজিতের হাতটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়েই থমকে যায় বীথির ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হাতটা। বীথির মুখের দিকে তাকায় অজিত। হেসে ফেলে বীথি। সে হাসিতে ভোরের আকাশের একছিটে আভার আবীর নেই। ঝকঝকে হাসি। বীথি বলে—চল।

সাত

সকালবেলা বের হয়েছিল অজিত, ফিরে এল এই সন্ধ্যাবেলা।

বীথি তখন বিম্বিসারকে নিয়ে ব্যস্ত। বীথি হাত তুলে চকচকে এক টুকরো সোনালী রাংতা ধরে রেখেছে ; বোধ হয় একটা শিশির ছিপির মোড়ক ছিল ওটা। বিম্বিসার বীথির কোলের উপর দাঁড়িয়ে আর বীথির হাতটাকে টানাটানি করে সোনালী রাংতা ধরবার চেষ্টা করছে। বীথি ইচ্ছে করে এক-একবার নামায়, সঙ্গে সঙ্গে সোনালী রাংতার টুকরোটাকে মুঠ করে ধরে ফেলে নাচতে থাকে আর হাসতে থাকে বিম্বিসার।

কিন্তু এই ফূর্তিচঞ্চল বিম্বিসার আর একটু পরেই খেলা থামিয়ে দিয়ে বীথির কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়বে। একটু পরে নিরুপমা এসে বিম্বিসারকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারপর? তারপর আর যে কী নিয়ে ব্যস্ত হওয়া সম্ভব হবে, বুঝতে পারে না বীথি।

সাড়া শুনে মনে হয়, অজিত বোধ হয় বাড়িতে ফিরেছে। তা না হলে ওদিকের বারান্দাটা এসময়ে গুনগুন করে গান গাইতো না। ভদ্রলোকও বেশ ফূর্তিতে আছে। বাড়িতে ফিরে

এসেই এইরকম গুঞ্জন করে এদিকে-ওদিকে কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে। এ যেন বীথিকে জানিয়ে দেওয়া—আমি এসেছি। তারপর বীথির কাছে এসে বিচিত্র এক মিনতির গুঞ্জন—কিছু মনে করো না বীথি, ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল।

এই গুঞ্জন বাড়ির ভিতরে ঢুকলেই ব্যস্ত হয়ে বীথির কাছে ছুটে আসে নিরুপমা। বিম্বিসার বীথির কোলে ঘুমিয়ে থাকুক বা খেলা করুক, নিরুপমার কাছে সেটা কোন প্রশ্ন নয়। বিম্বিসারকে নিয়ে চলে যায় নিরুপমা। আজও নিরুপমা যথারীতি ব্যস্তভাবে ছুটে এল, আর ছটফটিয়ে একটু হেসে নিয়েই বিম্বিসারকে নিয়ে চলে গেল।

ঘরের ভিতরে বীথির কাছে এসে কথা বলে অজিত।—আজ একটা মজার দৃশ্য দেখে এলাম। শুনছো বীথি?

হ্যাঁ।

—গিয়েছিলাম বারাসাত। একজন যোগী মানুষের খেলা দেখে এলাম। পুকুরের জালের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে যোগী, এই বলে স্কুলের ছেলেদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করেছিল, তারপর ছুতো করে সরে পড়বার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্কুলের ছেলেরা বুঝতে পেরে যোগীকে আটক করে পুকুরের জলের উপর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করেছে! বেচারা যোগী মশাই ঝুপ করে জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে আর চুবুনি খেয়ে, তারপর চেঁচিয়ে ক্ষমা চেয়ে পার পেয়েছে, ছুটে পালিয়ে গিয়েছে।

হাসতে চেষ্টা করে বীথি, কিন্তু হাসতে পারে না। কথাও বলে না। চোখ ফিরিয়ে আনার মত তাকিয়ে দেখতে থাকে, মেঝের উপরে বিম্বিসারের খেলার সোনালী রাংতার টুকরোটা পড়ে আছে।

সুজিত ডাক দিলেন—এখানে এসে একবার দেখে যাও অফিসার। আজ তোমার টেলিফোন বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

বুঝতে পারা যায়, বারান্দার শেষ প্রান্তের বড় ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন সুজিত। অজিত সাড়া দেয়।—ওতে দেখবার কী আছে?

সুজিত—আছে। সেটা তুমিই ভাল জান। বেহালার বাড়িতে বীথি যখন পিয়ানো বাজাবে, তুমি তখন এখানে বসে শুনবে। আর, তুমি এখানে যখন গুনগুন করবে, তখন বীথি বেহালার বাড়িতে বসে শুনবে। এদিকে এস, একবার দেখে যাও।

অজিত বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে—আর, অফিস থেকে আয়েঙ্গার সাহেব যে যখন-তখন হাঁকডাক করবেন ও হাজার রকম ঝঞ্ঝাটের কথা বলবেন, সেটাও সহ্য করতে হবে। আমি এই জন্যেই এই এক বছর ধরে টেলিফোন না পাওয়ার চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু...

অজিতের মুখের হাসিটা দীপ্ত হয়ে ওঠে।—কিন্তু দাদা যা বলছে, সেটা তো কখনও ভেবে দেখেনি।

বীথির দুই কাঁধের উপর দুই হাত রেখে অজিত যেন দমদমের আকাশের রঙীন রামধনুর মত একটা মিষ্টি কল্পনার ছবির সঙ্গে কথা বলে।—বীথি সেখানে আর আমি এখানে, তবু মনে হবে যে, আমরা দুজন ঠিক এইরকমই কাছাকাছি আছি। তাই না? আমি কিন্তু টেলিফোনে তোমাকে যা-খুশি-তাই বলবো, আগেই বলে রাখছি।...আচ্ছা, একবার দেখে আসি।

—কই অজিত? আবার ডাক দিলেন সুজিত।

অজিত চলে যেতেই বীথির আনমনা ভাবনাটা ছটফট করে। কিন্তু নিঃশ্বাসটা বড় ক্লান্ত। বুঝতে পারে বীথি, তিন মাস ধরে মিথ্যে হাসির ভার বইতে গিয়ে প্রাণটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে আর কতদিন চলতে পারা যাবে? থিয়েটার নিখুঁত হলেও এ যে ভয়ানক দুর্বহ একটা পরিশ্রমের থিয়েটার। ক্লান্ত না হয়ে উপায় কি?

এভাবে চলতে পারা যায় না। বারাসাতের যোগী মশাইও পুকুরে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে পারেনি, জলে ডুবে যেতে হয়েছে। শোনা যায়, থিয়েটারের নকল কান্নাও মাঝে-মাঝে ভুল করে সত্যিকারের কান্না হয়ে যায়। উৎপলা বলেছিল, ওর স্বামী অরুণ একবার থিয়েটারের মজনু হয়ে লায়লার সামনে এসে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবার অভিনয় করতে গিয়ে সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ডুবে গেলে কিংবা অজ্ঞান হয়ে গেলে তো সব ল্যাঠাই চুকে যায়। তখন কানের কাছে চেঁচিয়ে সিতাংশুর কথা কেউ বললেও বুঝতে পারা যাবে না, কে এই সিতাংশু।

এই দেউলবাড়ির স্বভাবটাও বলিহারি। যেন একটা ঘোর কুয়াশা। নরম বটে, গায়ে লাগলে একটুও বাধে না, বাজেও না। কিন্তু সবকিছু ঢেকে ফেলতে চায়। এবাড়ির চাকর শম্ভু বলে, দমদমের শীতের কুয়াশা ভয়ানক সর্বনেশে জিনিস। কুয়াশার ঘোরে অচল হয়ে গরুগুলো রেল লাইনের উপর শুয়ে পড়ে থাকে আর কাটা পড়ে।

এই ভদ্রলোকের স্বভাব তো আরও বলিহারি। প্রায় বিম্বিসারের মত। সোনালী রাংতার একটা টুকরো হাতে পেয়েই খুশি। কী যে কী দেখেছে ভদ্রলোক, চোখে দেখেছে না স্বপ্নে দেখেছে, বীথিকে যে-জন্যে একেবারে তিন জন্মের প্রেমিকা স্ত্রী বলে বিশ্বাস করে বসে আছে।

কিন্তু এই তো চেয়েছিল বীথি! নিখুঁত থিয়েটার সফল হয়েছে। তবে এতদিন পরে নতুন করে আবার কিসের ভয়ে ভীরু হয়ে যাচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডা হাসিটা? এত ক্লান্তিই বা বোধ করতে হচ্ছে কেন?

অজিতের বিশ্বাসটা যেন আহ্লাদে ফুলে-ফেঁপে নতুন নতুন বায়না ধরতে শুরু করছে। দাবি বেড়ে চলেছে। আমার রুমালের রেশমী সুতো দিয়ে তোমার আর আমার নাম এঁকে দাও ; আমার এই বাক্সের চাবিটা তোমার কাছে থাকুক ; আমার পেনে কালি ভরে দাও ; হেন-তেন কতরকমের দাবি! বলতে বাধ্য হয়েছে বীথি—না। আমার এসব ভাল লাগে না। আমি পারি না।

অজিত—বেশ তো। কিন্তু সেজন্যে তুমি এত দুঃখ করে কথা বলছো কেন?

আজই সকালবেলা বীথির পাশের চেয়ারে চুপ করে বসে আর বই পড়তে পড়তে হঠাৎ বীথির হাতের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আবার একটা দাবির কথা বলেছে অজিত।—কপালটা একটু টিপে দেবে? বাঁদিকে একটু কম জোরে, ডানদিকে যত জোরে পার তত জোরে।

সাড়া দেয়নি বীথি, যেন শুনতেই পায়নি। দু'হাত চালিয়ে যেমন একমনে লেস বুনছিল বীথি, তেমনই বুনতেই থাকে। একটু পরে উঠে দাঁড়ায়, চলে গিয়ে একেবারে রান্নাঘরে নিরুপমার কাছে এসে দাঁড়ায়।

নিরুপমা—কী বিম্বিসারকে খুঁজছো বোধ হয়!

বীথি—হ্যাঁ, কোথায় বিম্বিসার?

নিরুপমা—ঘুমিয়ে আছে।

বীথি—তুমি এত রকমের রান্না আর এত ভাল রান্না কোথায় কেমন করে শিখলে, নিরুদি?

নিরুপমা—এখানে! বিয়ের আগে আমি কোনদিন একটু জলও গরম করিনি। বাবা মাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ; খবরদার, নিরুকে দিয়ে কখনও রান্নাবান্নার কাজ করাবে না, আমার মেয়ের নরম হাত শক্ত হয়ে যাবে।

বীথি—আমার কাকারও ওই এক কথা।

একটা হাত তুলে বীথিকে দেখায় নিরুপমা—কই, দেখে বল তো, আমার হাত শক্ত?

বীথি হাসে—কোন মিথ্যেবাদীও একথা বলবে না। কী চমৎকার ফুলের মত নরম হাত।

নিরুপমা—কিন্তু তোমার সত্যবাদী বড়দা কী বলে জান?

বীথি—কী বলেন?

নিরুপমা—যখন মাথা টিপে দিই, তখন কী বিশ্রী চেঁচিয়ে ওঠে, উঃ, তোমার হাত যে একেবারে কাঠের খড়মের মত শক্ত।

বীথি—ওটা একটা কথার কথা।

নিরুপমা—আমাকে রাগাবার জন্যে ঠাট্টা করে, তাই না?

বীথি—তাই তো, তা ছাড়া আর কী?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় বীথি। ফিরে এসে আবার ঘরের ভিতরে ঢোকে। দেখতে পায়, এক হাতে বই ধরে রেখে আর দুই চোখ বন্ধ করে চেয়ারের উপর বসে আছে অজিত। ঘুমিয়ে পড়েছে।

অজিতের কাছে এগিয়ে যায় না বীথি। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারা যাবে কি? ঘুমন্ত অজিতের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে বীথির চোখের তারা দুটো যেন নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিঃশ্বাসের বাতাসের মধ্যে একটা কাঁকর ঢুকে ছটফট করছে মনে হয়। খুব কপাল করেছিল এই ভদ্রলোক।

চমকে ওঠে বীথি। যেন ভয়ানক কালো একটা ভয়ের মুখ হঠাৎ বীথির চোখে পড়েছে। সরে যায় বীথি। ঘরের দরজা পার হয়ে, বারান্দা পার হয়ে, উঠোনে নেমে, মালতীলতার ছায়াটার কাছে এসে দাঁড়ায়। নন্দা জিজ্ঞেস করে—ওষুধটা খেয়েছিলে তো বীথি?

বীথি—ওষুধ?

নন্দা—হ্যাঁ, তোমার কাশির ওষুধ ; তোমার শ্বশুর নাগের বাজার থেকে যেটা কিনে নিয়ে এলেন।

বীথি—হ্যাঁ, ওগুলো কাশির চকোলেট। খেয়েছি।

কান্না শোনা যায়। বিম্বিসার জেগেছে। নিরুপমার ঘরে ঢুকে, বিছানা থেকে বিম্বিসারকে তুলে নিয়ে উঠানের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে বীথি। কিন্তু ভয়টা যেন বীথির পাঁজর কামড়ে ধরেছে, ছাড়তেই চায় না।

অনেকক্ষণ পরে, বিম্বিসার যখন আবার ঘুমিয়ে পড়ে তখন ফটকের কাছে দীপেনের স্কুটারের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। দেখতে পায় বীথি, চলে যাচ্ছে অজিত। নিশ্চয় দীপেনের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। বোধহয় বারাসাত যাচ্ছে।

বিম্বিসারকে শুইয়ে দিয়ে আবার যখন নিজের ঘরে ফিরে এসে আয়নার কাছে দাঁড়িয়েছিল বীথি, তখন আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিল ভয়টা এতক্ষণ ধরে যেন বীথির চোখ দুটোকেও খুঁচিয়ে লাল করে দিয়েছে। এ কী হলো? কুয়াশার ঘোরে পড়ে রেল লাইনের গরু কি সত্যিই কাটা পড়বে? অজিতের কপালটাকে একটু ঠাট্টা করেও টিপে দিতে পারেনি বীথি, কিন্তু সেজন্যে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল কেন?

আজ সারাদিন ধরে এই খারাপ মনটাকেই ভয় করে করে ছটফট করেছে বীথি। এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। বীথির হয়রান প্রাণটা রেহাই পেতে চায়, অন্তত একটু বিশ্রাম পেতে চায়।

বেহালার বাড়িটাও আশ্চর্য রকমের নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। বীথির ঠোঁট-দুটো কেঁপে কেঁপে বিড়বিড় করে, যেন দুঃসহ একটা অভিমান ডুকরে উঠতে চাইছে। আদুরে সোনার বরণী রাণী মেয়েকে এই চার মাসের মধ্যে একবারও নিয়ে যাবার সেরকম কোন চেষ্টাও করলো না। বিয়ের পর প্রথম তিনটে মাসে নাকি দিন ছিল না। মা'র হাতের পাঁজিতে ক'টাই বা দিন থাকে? কিন্তু কাকিমা তো লিখেছেন, এই মাসের সব দিনই হলো ভাল দিন। তবু কই ;

বীথিকে নিয়ে যাবার জন্য বেহালার বাড়ির কোন ইচ্ছা বা চেষ্টার সাড়া এখনও জাগে না কেন? এই মাসও তো শেষ হতে চলেছে। হিমালয়ের বরফও বোধহয় গলতে শুরু করেছে; কিন্তু বেহালার বাড়ীর বরফ-মনটা বুঝি এখনও গলতে পারছে না।

ঘরে ঢুকলো অজিত। মুখ গম্ভীর, চোখ দুটো করুণ। অজিত বলে—যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো।

বীথি—কী?

অজিত—আয়েঙ্গার সাহেব ফোনে ডাক দিয়ে কথা বললেন, আমাকে লখনউ যেতে হবে। এখনই রওনা হতে হবে, রাত্রির ট্রেন ধরতে হবে। তার উপর...।

বীথির কাছে এগিয়ে এসে হাসতে চেষ্টা করে অজিত, হাসিটাও করুণ হয়ে অজিতের গলার স্বরে ছলছল করে।—তুমি দুঃখ করো না, বীথি। আমাকে প্রায় পুরো একটি মাস লখনউয়ে থাকতে হবে। খুব কঠিন আর জটিল একটা তদন্তের কাজ।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে অজিত। কিন্তু বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে অজিতের চোখ দুটো আরও অলস ও আরও নিবিড় হয়ে যায়। অজিত বলে—তুমি আমার জন্যে একটুও চিন্তা করবে না!

ব্যস্ত হয়ে ওঠে অজিত। দরজার কাছে এগিয়ে যেয়ে ডাক দেয়—শম্ভু, এখানে এস একবার।

শম্ভু এসে অজিতের বিছানা বাঁধতে থাকে। অজিত ব্যাগের ভিতরে জামাকাপড় ভরতে থাকে। নিরুপমা ছোট একটা বেতের বাস্কেট নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে—এরই ভিতরে খাবার-টাবার ভরে দিই, কেমন? জলের মস্ত বড় একটা ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন সুজিত, চেঁচিয়ে ওঠেন—ওইটুকু বাস্কেটে কতটুকু খাবার ধরবে? নন্দা এক মুঠো তুলসীপাতা নিয়ে এসে অজিতের ব্যাগের ভিতরে ছড়িয়ে দিলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভুবনবাবু বলেন—লখনউ পৌঁছেই টেলিগ্রাম করবে। আর, বীথিকে সেদিনই একটা চিঠি দেবে। ভুলে যেও না কিন্তু!

চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আর স্তব্ধ হয়ে ঘরের এই ব্যস্ততার দৃশ্যটাকে দেখতে থাকে বীথি। বীথির প্রাণের ভয়টা নিজেই পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে নিয়ে সরে যাচ্ছে। ভাগ্যটা অন্তত এক মাসের জন্য বীথিকে রেহাই পাইয়ে দিচ্ছে।

ঘর কখন শূন্য হয়ে গেল, বুঝতে পারেনি বীথি। কিন্তু বুঝতে পারে, এই শূন্য ঘরের দরজার কাছে কে-একজন এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বীথি চোখ তুলে তাকাতেই অজিত বলে—আসি।

অজিতের পায়ের শব্দ, সেই সঙ্গে আরও অনেক পায়ের শব্দ আর বিম্বিসারের আবোল-তাবোল ভাষার শব্দ বারান্দা পার হয়ে চলে গেল, শুনতে পায় বীথি। কিছুক্ষণ পরে একটা ট্যাক্সির শব্দও বাড়ির ফটকের কাছে গরগর করে বেজে উঠলো আর ছুটে চলে গেল। শুনতে পায়, বুঝতেও পারে বীথি।

বীথির নীরব স্তব্ধ ও অচল মূর্তিটা এইবার ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়—নিরুদি?

নিরুপমা—অ্যাঁ? কে? বীথিদি!

বীথি—হ্যাঁ। আমি এখন বেহালা চলে যাই।

নিরুপমা—সে কী? যাবেই তো, তবে আজই যাবে কেন?

বীথি—না, আজই এখনই চলে যাব। আমার একটুও ভাল লাগছে না। কাকিমাকে টেলিফোনে বল, যেন গাড়িটা এখনই পাঠিয়ে দেয়।

রান্নাঘরের বাইরে এসে ডাক দেয় নিরুপমা—শুনছো।

ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন সুজিত। তারপর নন্দা, তারপর ভুবনবাবু।—কী নিরু? কী হলো?

নিরুপমা—বীথির এখন একটুও ভাল লাগছে না।

নন্দা—ঠিকই তো। ভাল লাগবে কেমন করে?

সুজিত—মা, আজ থেকে বীথি তোমার ঘরে শোবে।

ভুবনবাবু—নিরু, তুমি বীথিকে সঙ্গে নিয়ে রোজ বিকেলে একটু বেড়িয়ে আসবে।

নিরুপমা—বীথিদি এখুনি বেহালা চলে যেতে চায়। বেহালার বাড়িতে টেলিফোন করে বলুন ; যেন এখুনি গাড়ি পাঠিয়ে দেন।

—এখুনি! চমকে ওঠে ভুবনবাবুর গলার স্বর।—বেশ তো, এখনই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বলতে গিয়ে ভুবনবাবুর গলার স্বর ভেঙ্গে পড়ে।

তারপর আর কতক্ষণ? মাত্র একটি ঘণ্টা বীথিকে ঘরের ভিতরে একটি নীরব নিথর একলা ছায়ার মত জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বাগানের গাছের মাথায় অনেক জোনাকী। নিরুপমা এসে বলে—গাড়ি এসেছে।

তারপর আর মাত্র পাঁচ মিনিট। বিম্বিসারকে কোলে নিয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে ফটকের দিকে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায় বীথি, সঙ্গে নিরুপমা, সুজিত নন্দা ভুবনবাবুও এসে গাড়ির কাছে দাঁড়ালেন। বিম্বিসারকে নিরুপমার কোলে তুলে দিয়ে ভুবনবাবু নন্দা আর সুজিতকে প্রণাম করে নিয়ে গাড়ির ভিতর উঠে বসে বীথি। বেহালার গাড়ি দেউলবাড়ির ফটকের কাছে যে-ধুলো উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল, সে-ধুলো এক মিনিটের মধ্যে থিতিয়ে গেল।

আট

বেহালার বাড়ির লনে এখন ফোটাফুলের মেলা। গেট পার হয়ে গাড়িটা লনের পাশে এসে দাঁড়াতেই গাড়ির ভিতর থেকে যেন লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বীথি। ইস্, নতুন কসমসে ভরে গিয়ে কী সুন্দর রঙীন হয়ে উঠেছে লনের এক-একটা কেয়ারি। কত নতুন ডালিয়া ফুটেছে। দেখতে পেয়ে বীথির উচ্ছলিত হাসির শব্দটা নিবিড় হয়ে খুশি মৌমাছির গুঞ্জনের মত গুনগুন করে।

বারান্দাতে আলোর ঝাড়ের নীচে তিন চেয়ারে বসে আছেন বেহালার এই বাড়ির তিনজন, মা কাকা ও কাকিমা। বারান্দাতে উঠেই সুহৃদ সেনের গায়ের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বীথি। সুহৃদ সেনের গায়ের চাদরটা শক্ত করে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে।—তুমি কিন্তু খুব দেখালে, কাকা।

সুহৃদ সেনের দুই চোখ খুশির হাসিতে জ্বলজ্বল করে। মেয়ে রাগ করেছে মনে হচ্ছে!

বীথি—খুব বুঝতে পারছি, কসমস আর ডালিয়াতে তোমার প্রাণ আছে, তাই বীথির আর দরকার কী?

সুহৃদ—সে কী সম্ভব?

বীথি—তবে এতদিনের মধ্যে আমাকে একবার নিয়ে আসবার একটু চেষ্টাও করলে না কেন?

রমা—অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, বীথি!

বীথি—তবে কিসের অসুবিধা হলো? ওরা বোধহয় আপত্তি করেছিল?

রমা—না ; শুধু অজিত বলেছে ঃ আরও ক'টা দিন থাকুক বীথি, তারপর আমি নিজেই একদিন নিয়ে যাব।

বীথি—ওই একজনের ইচ্ছের কথা শুনেই তোমরা থমকে গেলে, বাঃ।

জয়া বলেন—ওই একজনই তো সব। আমার বিয়ে হয়েছিল পনেরো বছর বয়সে। তোমার বাবা আমাকে তিন বছরের মধ্যে একটি দিনও বাপের বাড়ি যেতে দেয়নি।

বীথি—তা'তে তোমার খুব আনন্দ হয়েছিল নিশ্চয়?

জয়া—ওই দুটো-একটা দিন রাগ করে ভাত খাইনি, এই মাত্র। তিনটি বছর হেসেখেলে দিন কাটিয়ে দিয়েছি।

বীথি—আমার কিন্তু পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়নি।

জয়া—পঁচিশ বছর বয়েসের মেয়েই তো স্বামীকে ছেড়ে একটি দিনও থাকতে চায় না। জ্ঞানবাবুর মেয়ে উৎপলাকে তো দেখছো। বাপের বাড়ি আসবে বরকে সঙ্গে নিয়ে, আবার শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাবে বরকে সঙ্গে নিয়ে। এটা তোমাদের একালের নিয়ম। তুমিও তাই করলে না কেন?

বীথি—তোমার সবই অদ্ভুত কথা।

রমা—আমার কথাটা শুনবে, বীথি?

বীথি—বল।

রমা—হঠাৎ চলে এলে কেন?

বীথি—দমদমের হোস্টেল থেকে হঠাৎ এক মাসের ছুটি পাওয়া গেল।

রমা হাসেন—কে দিল ছুটি?

বীথি—আমি নিজেই ছুটি নিয়েছি।

জয়া—তুমি নিজেই ছুটি নেবার কে?

বীথি—ওরা কেউ আপত্তি করেনি।

জয়া—ওরা লোক ভাল, তাই আপত্তি করেনি। নিজের ইচ্ছেতে চলে আসা তোমার একটুও উচিত হয়নি।

রমা—অজিত বুঝি এখন লখনউয়ে এক মাস থাকবে?

বীথি—হ্যাঁ ; সেইজন্যেই তো চলে এলাম।

জয়া—এটা কী একটা কথা হলো। তুমিও অজিতের সঙ্গে যেতে, লখনউয়ে একটা মাস থাকতে। এটাই উচিত ছিল না কী?

বীথি—হঠাৎ খবর এল, তাই হঠাৎ চলে গেল। এত তাড়াহুড়োর মধ্যে সে-ই বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইবে কেন?

জয়া—তুমি একবার বলে দেখেছিলে?

বীথি—না।

জয়া—বলা উচিত ছিল।

বীথি—বলে কোন লাভ হতো না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। থাকলে, নিজেই বলতো।

জয়া—ইচ্ছে না থাকলেই বা কী? তুমি জোর করলেই ইচ্ছে হয়ে যেত।

বীথি—তার মানে?

জয়া—তোমার বাবা আমাকে না বলে-কয়ে মাহেশের রথ দেখতে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। আমাকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমি ছাড়বো কেন? আমি দুই হাত ছড়িয়ে দরজা আটক করে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্পষ্ট বলে দিলাম ঃ আমাকে সঙ্গে নেবে বল, তবে দরজা ছাড়বো। অগত্যা, সঙ্গে নিল। না নিয়ে পার পাবে কেন?

রমা হাসি চাপতে চেষ্টা করেন।—সেটা কিন্তু একরকম ভালই হতো, বীথি। তুমি শুধু ফোনে আমাকে একটু জানিয়ে দিতে যে, এখুনি লখনউ রওনা হচ্ছো। আমিও এদিকে

লখনউয়ে ডাক্তার বর্ধনকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে খবর দিয়ে দিতাম। ডাক্তার বর্ধন তোমাদের দুজনকে খুব আদর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন। তোমাদের একটুও অসুবিধেয় পড়তে হতো না।

বীথি—তাহলে বল, এখানে এসে আমি ভয়ানক একটা দোষ করে ফেলেছি।

বীথির গায়ে হাত বুলিয়ে রমা হাসতে থাকেন।—না গো মেয়ে, না। তবে এখুনি চলে না এলে ভাল করতে। দোষ কিছু নয় ; তবে দেখতে একটু খারাপ দেখায়।

বীথি—তাহলে এখনই দমদমে ফিরে গেলেই তো পারি। দোষ কেটে যাবে, আর খুব ভালও দেখাবে।

বীথির চোখের পাতা ভিজে গিয়ে চিকচিক করছে। সুহৃদ উঠে এসে, বীথির একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে, নিজের চেয়ারের উপর বসিয়ে দিলেন। বেশ রাগ করে আর চেঁচিয়ে কথা বলেন সুহৃদ—এখন আমি ছাড়া আর-কেউ বীথির সঙ্গে কথা বলবে না।

জয়া বলেন—দেখ তো রমা, আমার ঘরে ছোট পাথর-বাটিতে বোধ হয় চারটে নলেন গুড়ের সন্দেশ আছে।

রমা—দেখছি।...বীথি এখন একটু চা খেলে পারে।

সুহৃদ—আশ্চর্য, মেয়েটা চার মাস পরে বাড়িতে ফিরেছে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে মেয়েটাকে জেরা করতে শুরু করেছে। এখন আবার সন্দেশ আর চা দিয়ে দোষ ঢাকবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হেসে ফেলে বীথি—তুমি মিথ্যে রাগ করছো, কাকা। আমি রাগ করিনি।

সুহৃদ—বিয়ের পর একটানা চারটে মাস শ্বশুরবাড়িতে থাকা, কোন মেয়ের পক্ষে এটা কী সামান্য সহ্যের ব্যাপার? কিন্তু বীথি থেকেছে। কেউ এদিকটা দেখছে না, শুধু সোরগোল করা হচ্ছে, এখুনি চলে এলে কেন, এখুনি চলে এলে কেন?

বীথি—তুমি এসব কথা না বলে তোমার ডালিয়ার গল্প বল, কাকা।

সুহৃদ—কী আর বলবো। নতুন ডালিয়া ফুটেছে দেখলেই আমার মন খারাপ হতো।

বীথি—কেন?

সুহৃদ—দেখা মাত্র মনে হতো, বীথি এখানে নেই।

বীথি এবার মুখ টিপে হাসে—মা'কে আর কাকিমাকে দেখছি, বেশ একটু বদলে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, এরা ঠিক সেই মা আর কাকিমা নয়। কিন্তু তুমি বদলে যাওনি কাকা, একটুও না।

সুহৃদ সেন এইবার মাথা দুলিয়ে হাসতে থাকেন।—কেন বদলাবো? কোন্ দুঃখে?

বীথি—আমিই বা বদলাবো কেন? কোন্ সুখে?

সুহৃদ—আমি যা ছিলাম, তাই আছি।

বীথি—আমিও যা ছিলাম, তাই আছি।

চেয়ার ছেড়ে, যেন খুশি হরিণীর মত একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় বীথি। বারান্দার এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। সেই কার্পেট, সেই টব, ঘরের দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে সেই চকচকে পেতলের নেমপ্লেট, এস. সেন। বীথির চোখের তারা দুটো দীপ্ত হয়ে যেন নাচতে থাকে।

দুই চোখ টান করে আর হেসে হেসে একবার জয়ার, আর একবার রমার মুখের দিকে তাকায় বীথি।—আমি তোমাদের উপর রাগ করেছি, কিন্তু তোমাদের সন্দেশ আর চায়ের উপর রাগ করিনি, কাকিমা।

বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে উপরতলায় উঠে যায় বীথি, এঘর-ওঘর করে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই তো সেই মিরর, সেই খাট, সেই পিয়ানো, সেই আয়না আর সেই বুক-শেল্ফ্। খুশি হরিণীর কাছে এই সবই তার চেনা জগতে এসে ফিরে-পাওয়া যত ঝর্না, শাল-পিয়াল,

সবুজ ঘাস আর মহুয়া ফুলের কুঁড়ি। বিশ্বাস হয় না বীথির, এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হয়েছিল। আর, পুরো চারটে মাস সেখানে থাকতেও হয়েছিল। চারটে মাসের মিথ্যে হয়রানির জীবনটা যেন এখানেই ঘুমিয়ে-পড়া বীথির একটা দুঃস্বপ্নের ছবি।

রাত যখন গভীর হয়, প্রথম ঘুমের আবেশ শেষ হয়ে যাবার পর বীথি যখন জেগে ওঠে, চোখ মেলে তাকায়, তখনও বুঝতে পারে বীথি, চার মাস পরে ফিরে-পাওয়া এই রাত্রিটাও সেই আগের রাত্রিগুলির মত বীথির বিছানার শিয়রের কাছে সেই রকমই ছোট্ট একটা সবুজ আলো জ্বেলে রেখে দিয়েছে। জানালার দিকে তাকালে আকাশের দুটো বড় তারা দেখা যায়। শোনা যায়, নীচের তলার ঘরে ছোট্ট স্প্যানিয়েল ডাকছে।

বেহালার বাড়ির সকাল-সন্ধ্যা ও দিন-রাতের আলোছায়ার সঙ্গে ঠিক সেই আগের মতই মিলে-মিশে আর ছুটোছুটি করে এক-একটা দিন কাটিয়ে দিচ্ছে বীথি, দেখে খুশি হন সুহৃদ সেন। রমাকে বার বার ডাক দিয়ে বলেন—এটা হলো বীথির মনের একটা রিলিফ।

রমা—কিন্তু দমদমের বাড়িতে একদিন ফোন করে নিরুপমার সঙ্গে বীথি একটু কথা বললে কি ওর রিলিফ নষ্ট হয়ে যেত?

সুহৃদ—দমদমের বাড়ি থেকে ফোন আসে?

রমা—আসে বইকি। এই দশদিনের মধ্যে সুজিত আমাকে দু'বার ফোন করে জিজ্ঞেস করেছে, বীথি কেমন আছে?

সুহৃদ—তুমি বীথিকে একটু বুঝিয়ে বলে দিলেই পার যেন মাঝে মাঝে দমদমের বাড়ির সঙ্গে কথা বলে।

রমা—আমি তো বলতেই পারি। কিন্তু বলবো কেন? মেয়ের নিজের কোন চাড় নেই কেন?

সুহৃদ—যেতে দাও ওসব কথা। আর তো, বড় জোর কুড়ি-একুশটা দিন। আবার ওদেরই কাছে চলে যাবে মেয়েটা।

রমা—কিন্তু কথাটার মানে কী?

সুহৃদ—কোন্ কথা?

রমা—ওই যে মেয়ে সেদিন তোমার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে দিল ; আমিও বদলাইনি ; আমি যা ছিলাম তাই আছি।

সুহৃদ—এটা একটা সামান্য কথা। একথার কোন মানে-টানে নেই।

রমা—অজিতের চিঠিটা সাত দিন হলো এসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে চিঠির কোন জবাব দিল না বীথি! এটাও কি সামান্য কথা?

সুহৃদ সেন হাসতে চেষ্টা করেন।—অজিতকে চিঠি দিতে বীথির বোধ হয় খুব লজ্জা করছে।

রমা—খুব অদ্ভুত লজ্জা বলতে হবে, নয় তো এটা লজ্জাই নয়। জানতে পেরে, দিদিও খুব রাগ করছেন।

—রাগ করবো না কেন, বল? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন জয়া।—আমি বাপের বাড়ি থেকে যেদিন বীথির বাবাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম, সে চিঠির অনেক কথা আর বানান আমার সেজ খুড়ি বলে দিয়েছিল। চিঠি লিখতে আমি দেরি করিনি, লজ্জাও করিনি। স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে লজ্জা আবার কিসের?

সুহৃদ—কারও যদি সত্যিই লজ্জা হয়, তবে কী আর করবেন, বলুন?

জয়া—কী আর করবো? কিন্তু বলবো, এ লজ্জা ভাল নয়।

আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে যাবার পর রমা শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস না করে আর থাকতে পারলেন না—বীথি, অজিতের চিঠির উত্তর দিয়েছো?

বীথি—হ্যাঁ।

রমা—কবে?

বীথি—আজ।

রমার মুখটা স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে যায়। বীথি দমদম থেকে এ বাড়িতে আসবার পর রমার মুখে কোনদিন এরকম একটি স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠেনি। কী বিশ্রী একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে বিঁধে রমার মনটাকে কষ্ট দিয়েছে। কী দুর্ভাগ্য, বীথিকে সেই আগের মত গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারেনি রমা। কেন সন্দেহ করবে না মেয়ে, মা-কাকিমা বেশ বদলে গিয়েছে?

এক হাতে বীথির গলা জড়িয়ে ধরে, আর-এক হাত বীথির দুই গালে বুলিয়ে দিতে থাকেন রমা—লক্ষ্মী মেয়ে।

কিন্তু শুধু এই একটি দিন। রমার মুখের স্নিগ্ধ হাসিটা আবার মেঘে ঢাকা পড়ে কালো হয়ে যায়।

উৎপলা বেড়াতে এসে আর বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—বাঃ, আমাদের বীথি দেখছি ঠিক সেই বীথিই আছে। একটুও বদলায়নি।

উৎপলার মা একদিন বেড়াতে এসে বসে উঠলেন—বীথিকে দেখে কে বলবে যে, এ মেয়ের চার মাস হলো বিয়ে হয়েছে! একটি কুমারী মেয়ে বলে মনে হয়।

যেমন উৎপলার চোখ, তেমনই উৎপলার মা'র চোখ, বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে আকুল হয়েছে। কিন্তু খুব বিরক্ত বোধ করেছেন রমা। যেমন ওদের হাসি, তেমনই ওদের মন্তব্য, দুই হলো দুটো নির্মম টিটকারী। ওরা বুঝতে পারে না, একথা শুনলে বীথির রমা কাকিমার বুক কত দুরদুর করে। মনের শান্তি কত নষ্ট হয়ে যায়।

সব চেয়ে বেশি বুক দুরদুর করে, যখন দেখতে পান রমা, উৎপলা আর উৎপলার মা'র কথা শুনে বীথির সারা মুখে খুশির হাসি উথলে ওঠে। দুই চোখ অপলক করে আর কান পেতে বীথি যেন ওর ভাগ্যের একটা মস্ত বড় প্রশস্তির গান শুনছে।

একদিন হঠাৎ হাজির হলেন বীথির মামা অবিনাশ, বোম্বাইয়ের যে অবিনাশকে দেখে কেউ সহজে বাঙালী বলে মনে করতে পারে না ; মনে করে, ইনি বুঝি একজন অ্যাংলো সাহেব। অবিনাশ বীথিকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—কেমন আছ বীথি?

বীথি—ভাল।

অবিনাশ—এখানে তো ভাল থাকবেই, ওখানে ভাল ছিলে কি?

জবাব না দিয়ে, দুই ঠোঁট টিপে একটা হালকা হাসি ধরে রেখে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে থাকে বীথি।

অবিনাশ—শুনলাম, তোমার শ্বশুর নাকি একজন খাঁটি নৈমিষারণ্য। শুনলাম, তোমার শ্বশুরবাড়িতে দৈনিক একমণ গোবর দরকার হয়। রাত্রিবেলা বাগানের ভূতেরা চিমটে বাজিয়ে গান গায়।

রমা বলেন—তুমি এখন একটু চা খাও, অবিনাশ।

—না, ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ান অবিনাশ।

—আমি চলি। দিদিকে বলবেন, আমি এসেছিলাম।

অবিনাশ চলে যেতেই রমা তাঁর বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টিটা একেবারে তীব্র করে নিয়ে বীথির দিকে তাকান আর প্রশ্ন করেন—তুমি এ কী করলে বীথি?

বীথি—আমি আবার কী করলাম!

রমা—অবিনাশের মিথ্যে কথাগুলো চুপ করে শুনলে আর হাসলে। একটু আপত্তিও করলে না।

বীথি—আমি আপত্তি করবো কেন?

রমা—তুমিই তো আপত্তি করবে, ওটা তোমারই শ্বশুরবাড়ির মিথ্যে নিন্দে।

বীথি—না, আমি আপত্তি করতে পারি না।

রমা—কেন?

বীথি—লজ্জা করে।

রমা—এ লজ্জা ভাল নয় ; একটুও ভাল নয়।

রোজই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে খুব বিমর্ষ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকেন সুহৃদ সেন। রমাকে ডাক দিয়ে বলেন—বীথির মুখে হাসি দেখলে তোমার মুখের হাসি শুকিয়ে যায়, এ যে অদ্ভুত একটা দুর্ভাগ্য।

রমা—লোকে দু ঘণ্টার একটা সিনেমা-ছবি দেখে বাড়ি ফিরে আসে আর ছবির কথা নিয়ে কত গল্প করে। এই মেয়ে চারটি মাস শ্বশুরবাড়িতে থেকে এল, কিন্তু একদিন ভুলেও শ্বশুরবাড়ির কোন কথা বললো না।

সুহৃদ—আমারও ভাল লাগছে না।

রমা—আজ আবার এক নতুন উপসর্গ এসে জুটেছে।

সুহৃদ—কী?

রমা—মঙ্গলাদি এসেছিলেন।

সুহৃদ হাসেন—তিনি তো পুরনো উপসর্গ।

রমা—কিন্তু আর কেন? বীথির শ্বশুরবাড়ির কথা জানবার জন্যে বীথিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এত কথা জিজ্ঞেস করা কেন?

সুহৃদ—বীথি কী বললে?

রমা—মেয়ের যা স্বভাব, কিছুই বললে না। তাই দেখে মঙ্গলাদির মুখে সে কী হাসি।

সুহৃদ—তুমি সামনেই ছিলে তো?

রমা—হ্যাঁ, সমস্তক্ষণ আমি বীথির পাশে পাশে থেকেছি। বীথিকে আড়ালে কোন কথা বলবার সুযোগ পাননি মঙ্গলাদি।

সুহৃদ—যাক, শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় তাঁকে বিদায় করে দিতে পেরেছো।

রমা—পেরেছি। কিন্তু বড় ভয় করছে।

সুহৃদ—কেন?

রমা—আমারই সামনে মঙ্গলাদি বীথির প্রশংসা করে কত কথাই না বললেন। ভয়ানক অদ্ভুত প্রশংসার কথা।

সুহৃদ—সেটা আবার কী রকম কথা?

রমা—মঙ্গলাদি বললেন : আমি বুঝতে পেরেছি রমা, বীথির প্রাণ পড়ে আছে দমদমের বাড়িতে। শ্বশুরবাড়িকে ওর মনেপ্রাণে ভাল লেগে গিয়েছে। মুখ দেখেই বোঝা যায় ; এ মেয়ে এখন আনমনা হয়ে শ্বশুরবাড়ির কথাই ভাবছে। তাই না, বীথি? বল না, লজ্জা কিসের?

সুহৃদ—বীথি কী বললে?

রমা—কিছু না। মেয়ের চোখ দুটো শুকনো খটখটে হয়ে মঙ্গলাদির দিকে তাকিয়ে রইল। তাই দেখে মঙ্গলাদির চোখে সে কী হাসি। আমার সত্যিই বড় ভয় করছে।

কেঁদে ফেললেন রমা—আমি আর পারি না। অজিত লখনউ থেকে ফিরে এলেই বীথিকে আমি দমদমে পাঠিয়ে দেব। তুমি যেন আবার বাধা দিয়ে বলো না ; আরও কয়েকটা দিন থাকুক।

সুহৃদ—আর তো মাত্র চারটে দিন বাকি, অজিতের লখনউয়ের এক মাস শেষ হয়ে যাবে।

রমা বলেন—এই চারদিনের মধ্যে ওই উপসর্গ যেন আর না আসে। ভালয় ভালয় চারটে

দিন কেটে যাক্।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বীথির ঘরে এসে ডাক দিলেন রমা—বীথি।

তারপর সারাদিন ধরে বীথিকে যখন-তখন ডাকতে থাকেন রমা। বীথি নীচের তলায় যখন নেমে যায়, তখন রমাও ব্যস্ত হয়ে নামেন। রমা যেন মরিয়া হয়ে বীথিকে সব সময় চোখের উপরে রাখছেন, কোন উপসর্গ হঠাৎ এসে পড়লেও বীথিকে যেন একলা পেতে না পারে, বীথিকে কোন অদ্ভুত কথা বলে দিয়ে সরে পড়তে না পারে। সেদিন মঙ্গলাদির হাসির রকমটা দেখেই সন্দেহ হয়েছে রমার, উনি আবার আসবেন। মঙ্গলাদির পায়ে ভেলভেটের চটি ; শব্দ হয় না। কখন এসে বীথির ঘরে ঢুকে পড়বেন, রমা হয়তো টেরই পাবেন না। তাই রমাকে সব সময় সজাগ আর সাবধান হয়ে থাকতে হচ্ছে।

যখন বিকেল হয়, লনের ডালিয়ার কাছে ফড়িং উড়তে থাকে, তখন নিজের ঘরে বসে রমার ক্ষণিক তন্দ্রাটা যেন ভয়ানক একটা আর্তনাদের শব্দ শুনে ভেঙে যায়। পিয়ানো বাজাচ্ছে বীথি। ছুটে এসে বীথির ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখতে পান রমা, মঙ্গলাদি বসে আছেন আর হাসছেন।

—আপনি কখন এলেন মঙ্গলাদি? চেঁচিয়ে ওঠেন রমা। রমার আতঙ্কভরা চোখ দুটো ছটফট করে, যেন এখনই ফেটে পড়বে।

মঙ্গলাদি—এই তো, এখুনি এলাম। আমি আসতেই বীথি খুশী হয়ে পিয়ানো বাজাতে শুরু করে দিল।

রমা—আমার মনে হয়, আপনি ওকে পিয়ানো বাজাতে বলেছেন।

মঙ্গলাদি—তাই হলো : একই কথা।

রমা—আপনি এখন দিদির ঘরে গিয়ে বসবেন, চলুন।

মঙ্গলাদি—চল। কিন্তু বাস্তবিক, অনেকদিন পরে বীথির বাজনা শুনে কী যে ভাল লাগলো, তা আর কী বলবো!

সন্ধ্যা পর্যন্ত জয়ার ঘরের ভিতরে বসে রইলেন মঙ্গলা। রমা তিনবার চা এনে দিলেন। জয়া বলেন—অম্বরীষের গল্প শুনবেন?

মঙ্গলাদি—বলুন।

পুরো একটি ঘণ্টা দুই চোখ বন্ধ করে অম্বরীষের গল্প শুনলেন মঙ্গলা। তারপর ধড়ফড় করে নড়ে বসলেন। বললেন : প্রহ্লাদের গল্প আমি আগেও শুনেছি।

জয়া—কী বললেন?

মঙ্গলা—আমি এখন যাই জয়াদি।

মঙ্গলা চলে যাবার পর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আর অনেকক্ষণ ধরে নীচের তলার ছোট ঘরে কোচের উপর বসে থাকেন রমা। আখরোট কাঠের হরিণটার শিঙের সঙ্গে ফুলের একটা মালা জড়িয়ে রয়েছে। কে করলো এই কাণ্ডটা? বীথি?

টেলিফোন বাজে। রমা পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরেন।—কে আপনি? ও, সুজিত কথা বলছো?

—হ্যাঁ।

—কী ব্যাপার, তোমরা সবাই কেমন আছ?

—ভাল। আজ বিকেলবেলা অজিত এসেছে।

—ভাল খবর। অজিতের শরীর ভাল আছে?

—না। অজিত জ্বর নিয়ে ফিরেছে।

—কী রকম জ্বর?

—ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বীথিকে এখুনি পাঠিয়ে দিতে পারেন?

—এখুনই?

—হ্যাঁ।

—অজিত কী বলে?

—অজিতের কথা ছেড়ে দিন। অজিত বলছে, বীথির এখুনই ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবার দরকার নেই।

—আজ বীথি ওর বন্ধু উৎপলাকে রাত্রিতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে। কাল সকালে কিংবা বিকেলে বীথিকে পাঠিয়ে দিলে হয় না?

—তা হয়। তবে তাই করবেন।

খবরটা শুনলেন সুহৃদ সেন। রমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেই আবার বসে পড়লেন। চোখ বন্ধ করে আর বুকের উপর হাত রেখে হাঁপাতে থাকেন সুহৃদ। বিড় বিড় করে কথা বলেন—শিগগির বীথিকে পাঠিয়ে দাও।

উদ্বিগ্ন হয়ে বীথির কাছে এসে কথা বলেন রমা।—তোমার এখুনই দমদমে চলে যাওয়া ভাল।

বীথি—কেন?

রমা—অজিত আজ এসেছে। অজিতের জ্বর হয়েছে। কিসের জন্য জ্বর, সেটা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

বীথি—আমি দমদম থেকে তখুনি চলে এসেছিলাম বলে আমার দোষ হয়েছিল। এখন তোমাদের দোষ হচ্ছে না, এখুনই চলে যেতে বলছো?

রমা—তবে কাল সকালে যেও।

বীথি—এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন! আমি কি একটা মানুষ, না অন্য কিছু? না যুদ্ধের সোলজার? মার্চ বলে হাঁক দিলে তখুনি ছুটতে হবে!

অনেক রাত্রে বেহালার ঘুমন্ত বাড়িটার স্তব্ধতা চমকে দিয়ে টেলিফোনের শব্দ বাজতে থাকে। ধড়মড় করে জেগে ওঠেন রমা। বুকটা ধড়ফড় করে। দৌড়ে এসে টেলিফোন ধরেন।—কে?

—আমি সুজিত।

—কী ব্যাপার?

—বীথিকে এখুনি পাঠিয়ে দিতে পারেন?

—কেন? অজিতের অসুখের কী খুব বাড়াবাড়ি?

—হ্যাঁ।

—বীথি তো এখন ঘুমিয়ে আছে।

—বীথিকে একবার বলুন, জাগিয়ে তুলুন।

—শোন সুজিত, ভোর হতে আর মাত্র দুটো ঘণ্টা বাকি আছে।

—হ্যাঁ।

—ভোর হতেই যদি বীথিকে পাঠিয়ে দিই, তাহলে হয় না?

—হয়।

খবর শুনে থরথর করে কাঁপতে থাকেন সুহৃদ। সুহৃদের একটা হাত শক্ত করে ধরে রাখেন রমা। কিন্তু ছটফট করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুহৃদ চীৎকার করে ওঠেন—শিগগির কর, দেরি নয়, বীথি এখুনি চলে যাক, এখুনি যেতে হবে। বীথির ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত বীথির মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন রমা। সবুজ বাতির আলো বীথির মুখের উপর যেন সবুজ শান্তির প্রলেপের মত মাখা রয়েছে। বীথিকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারলেন না রমা। ঘুমোক বীথি। ভোর হোক।

ভোর হতেই দমদমের বাড়িতে ফোন করলেন রমা। কী আশ্চর্য, ভোর হয়ে গেলেও দমদমের বাড়িটা কি ঘুমে অসাড় হয়ে রয়েছে? কেউ কোন সাড়া দেয় না। কেন? টেলিফোন কেউ ধরছে না কেন? বোবা টেলিফোন শুধু করর্‌ করর্‌ করে একটানা একঘেয়ে বেজেই চলেছে।

দমদমের বাড়িতে জানিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছে রমার, বীথিকে যদি সকালবেলাতে পাঠিয়ে দিতে না পারি, তবে অন্তত বিকেল হবার আগেই পাঠিয়ে দেব। আর, এখন কেমন আছে অজিত? কিন্তু সাড়াহীন দমদমের কানের কাছে রমার ইচ্ছার কথাটা পৌঁছতে পারলো না।

রমা ছুটোছুটি করছেন বটে। কিন্তু বুঝতে পারছেন, তাঁর উদ্বিগ্ন ও ক্লান্ত হৃদ্‌পিণ্ডটা বোধহয় ছিঁড়ে পড়ে যাবে। সকালের রোদ লনের উপর পড়েছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে বীথি। কিন্তু বীথিকে এখুনি কী করে বোঝাবেন রমা, এখুনি তোমার দমদমে চলে যাওয়া উচিত। বীথির হাত ধরে, বীথিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, বীথির কপালের উপর দুই চোখ ঘষে দিয়ে বলতে হবে, যাও বীথি। তাহলে বোধহয় যেতে রাজী না হয়ে পারবে না বীথি।

কিন্তু টেলিফোন বেজে ওঠে। রমা বলেন—কে, সুজিত!

—না, আমি দীপেন।

—ও হ্যাঁ, চিনেছি।

—খুব কাণ্ড করলেন আপনারা!

—অ্যাঁ? তুমি রাগ করে কথা বলছো, মনে হচ্ছে।

—কাল সন্ধ্যা থেকে আপনাদের বার বার টেলিফোনে বলা হয়েছে মেয়েকে এখুনি পাঠিযে দিন! তবু পাঠালেন না।

—যাবেই তো, একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে, এই যা।

—না, আর পাঠাবেন না। পাঠিয়ে লাভ নেই।

—কেন কেন? তুমি এ কী অদ্ভুত কথা বলছো, দীপেন? অজিতের খবর কি?

—অজিতের ঘর ধোওয়া হয়ে গিয়েছে। অজিতের ঘরে ধূপ পুড়ছে।

—দীপেন! দীপেন! স্পষ্ট করে বল। অজিত কোথায়?

—অজিত নেই।

টেলিফোনের রিসিভার হাতে ধরে সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে মেঝের উপর পড়ে গেলেন রমা।

নয়

হরিনাথের গাড়িটা দুলালবাবুর বাড়ির গেটের সামনে যেদিন সবেগে মুখ ঘুরিয়ে পিছু হটতে গিয়ে বারো মেসে শিউলিটাকে এক ধাক্কায় উপড়ে দিয়ে চলে গেল, সেদিনের পর থেকে আর এখানে শখের মাছ ধরবার কিংবা শখের বেড়াবার দরকারে আসেননি হরিনাথ। কিন্তু মনে হয়েছে দুলালবাবুর, আজ নিশ্চয়ই আসবেন মিত্তির স্যার।

বিকেল হয়েছে। রায়কুঠি পাড়ার স্কুলের ময়দানে ফুটবলের শব্দ তাল খেয়ে বেজে উঠছে। সাদা পদ্মের সাজ পরে রাজহংসের মত চেহারা ধরে একটা মোটরগাড়ি আস্তে-আস্তে, যেন ভেসে-ভেসে নন্দীবাবুর বাড়ির দিকে চলে গেল। যে-বাড়িতে এখন শানাই বাজছে।

কিন্তু দুলালবাবুর মুখটা বেশ বিষণ্ণ। হরিনাথের গাড়ির হর্নের শব্দ শোনবার জন্য প্রতীক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। দুলালবাবু বোধ হয় নিজেই বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর এতদিনের বশম্বদ বিনীত আত্মাটার সব ব্যস্ততা হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে

পড়েছে। আজ ভয় করছেন দুলালবাবু, হরিনাথ আজ এসেই ভয়ানক একটা তুফানী হাসি হেসে চেঁচিয়ে উঠবেন—চলুন দুলালবাবু।

ভুল ভয় করেননি দুলালবাবু। হরিনাথের গাড়িটা তখুনি এসে থামে, কিন্তু স্টার্ট বন্ধ করে না। গাড়ির ইঞ্জিনের চাপা উল্লাসের গরগর শব্দের সঙ্গে মিশে হরিনাথের মুখের কথাটাও গরগর করে হেসে ওঠে।—চলুন দুলালবাবু। আজকের বিকেলের হাওয়াটা সত্যিই খুব ভাল লাগছে।

দেউলবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে দুরন্ত বেগে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল হরিনাথের গাড়ি। হরিনাথ আর দুলালবাবু দু'জনেই দেখতে পেলেন, বাড়ির ফটকের থামের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন ভুবন মজুমদার। দুই চোখের কোণে সেইরকমই হাসি কুঁচকে রয়েছে, কিন্তু গায়ের ফতুয়ার বুকটা ছেঁড়া।

হরিনাথ বলেন—খবরটা আমি আজ শুনতে পেলাম। আপনারা নিশ্চয় আগেই শুনেছেন?

দুলালবাবু—হ্যাঁ স্যার।

হরিনাথ—দুঃখের ঘটনা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যে যা-ই হোক না কেন, লোকে তাকে যতই অপছন্দ করুক না কেন, তার ছেলের মৃত্যু কেউ কখনও কামনা করতে পারে না।

—অসম্ভব, কেউ এত নীচ হতে পারে না।

—কী বললেন? কী হতে পারে না?

—কেউ এত নীচ হতে পারে না।

—কিন্তু তারা নিশ্চয়ই নীচ নয়, যারা বলবে যে, আপনাদের ভুবনবাবুর একটা শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল।

—শিক্ষা পাওয়া তো উচিত। কিন্তু স্যার, এরকম ভয়ানক একটা আঘাত না পেয়েও তো শিক্ষা পাওয়া যায়।

—আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারছেন না। আমি বলতে চাই, এরকম একটা আঘাত ভুবনবাবুর না পেলেও চলতো, কিন্তু এরকম একটা শিক্ষা পাওয়া দরকার ছিল।

—ঠিক বুঝলাম না, স্যার।

—আমি সেদিন আপনাকে যে-কথাটা বলেছিলাম, সেটা আপনার মনে আছে কি, নেই?

—আপনি কথাগুলি একটু মনে করিয়ে দিন।

—আমি বলেছিলাম, এখানেই শেষ নয়। ভুবনবাবু মনে করেছিলেন, নিজের ছেলেটির সঙ্গে সুহৃদ সেনের ভাইঝির বিয়ে করিয়ে দিয়ে তিনি মস্ত বড় একটা জয়লাভ করে ফেললেন।

—হ্যাঁ মনে পড়ছে, আপনি একথা বলেছিলেন।

—ভুবনবাবু মনে করেছিলেন হরিনাথ মিত্রকে জব্দ করে একেবারে একটি পিঁপড়ে ক'রে দিয়ে তিনি নিজে একটা হাতী হয়ে গেলেন।

—এরকম কোন কথা তো আপনি বলেননি।

—তা বলিনি। মনের অবস্থাটা সেদিন খুব খারাপ ছিল, তাই বলিনি। আপনি বোধহয় জানেন না যে, আমারই সিতাংশুর সঙ্গে ওই মেয়ের বিয়ে হবার কথা ছিল। সব ঠিক ছিল। যেমন সিতাংশু, তেমনই ওই মেয়েটি, দু'জনেই দু'জনকে পছন্দ করেছিল। হঠাৎ দেখলাম, আপনাদের এই ভুবনবাবু সুহৃদ সেনকে কুটুম করে ফেলেছেন।

—আমার মনে হয় স্যার, এর জন্যে সুহৃদ সেনের উপর, আর, ওই মেয়েটির উপর আপনার রাগ করা উচিত। ভুবনবাবুর উপর নয়।

—রাগ আমি কারও উপর করিনি, করিও না। আমি শুধু বুঝতে চেয়েছি, সুহৃদ সেন আর তার ভাইঝি দমদমের এই দেউলবাড়ির মধ্যে কোন্ কোহিনূর দেখতে পেল যে, একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল? আর, শ্যামবাজারের সি. আই. টি. রোডে হরি মিত্রের বাড়িটাকে একটা বাড়ি বলেই মনে করতে পারলে না?

—ঠিক বুঝতে পারা যায় না, স্যার।

—একদিকে হরিনাথ মিত্র, তার ছেলে সিতাংশু, আর পোস্ট-ওয়ার মডার্নিস্ট ডিজাইনের মিত্রনিবাসকে রাখুন; আর একদিকে ভুবন মজুমদার, তার ছেলে অজিত আর সেকেলে জবুথবু চেহারার দেউলবাড়িকে রাখুন। তারপর বলুন, মানুষের চোখে এই দুয়ের কোন্‌টা বেশি বড় আর বেশি সুখের।

—এ কী আর বলতে হবে? আপনিও জানেন, সবাই কী বলবে।

—জানি। সেই জন্যেই ঘটনাটা আমাকে খুবই পীড়া দিয়েছিল, দুলালবাবু। আজ কিন্তু আমার মনে কোন পীড়া আর নেই।

—না থাকাই উচিত।

—ভুবনবাবুর ছেলেটির মৃত্যু দুঃখজনক বটে। কিন্তু সুখজনক এই যে, সবাই শিক্ষা পেয়ে গেল। এদিকে আপনাদের ভুবনবাবু, আর ওদিকে সুহৃদ সেন ও তার ভাইঝি।

—তাই তো মনে হয়।

—শিক্ষা কিন্তু পেতেই হতো, দুলালবাবু।

—আজ্ঞে?

—ধরুন, ভুবনবাবুর ছেলেটির যদি হঠাৎ মৃত্যু না হতো, তবু কি ভুবনবাবুর মিথ্যে গর্বটার কোন সমস্যা দেখা দিত না? আপনি কি মনে করেন যে, সুহৃদ সেনের ভাইঝি নিজেই একদিন ওর ভুল বুঝতে পেরে আর ভয় পেয়ে এই দেউলবাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে যেত না? ক'দিন ক'মাস টিকে থাকতো ওই বিয়ে?

—এই সবই নিতান্ত অনুমানের ব্যাপার, স্যার।

—না, অনুমান নয়। সুহৃদ সেনের ভাইঝি তার শ্বশুরবাড়ি এই দেউলবাড়িকে একটুও পছন্দ করতে পারেনি।

—কোথায় শুনলেন একথা?

—একথা শুনেছি তাঁরই মুখ থেকে, যিনি হলেন সুহৃদেরই স্ত্রীর বড় বোন, খুবই শিক্ষিতা আর সবারই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী এক মহিলা, তাঁর নামও মঙ্গলা।

—এটাও কিন্তু খুব দুঃখজনক ব্যাপার।

—একটুও না। এটা সহজ ব্যাপার, উচিত ব্যাপার। এটা না হলে বিশ্বাস করতে হতো যে, দু'য়ে দু'য়ে চার হয় না। আর, রাঙাজবার গাছে সাদা জবা ফোটে। কোন্ যুক্তিতে বিশ্বাস করতে পারেন আপনি, একটি আধুনিক স্বভাবের মেয়ে একজন সেকেলে স্বভাবের ছেলেকে ভালবাসতে পারবে, কিংবা বিয়ে করে সুখী হতে পারবে?

—অজিতকে দেখে কিন্তু আমাদের কখনও সেকেলে বা একেলে বলে মনে হতো না। মনে হতো, ছেলেটি বড় ভাল ছেলে।

—বেশ তো, কিন্তু সেই ভাল ছেলে তো মেয়েটির কাছে ভাল বলে বোধ হলো না।... যা-ই হোক...। এবার ফেরা যাক্। ধানক্ষেতের স্যাঁতসেঁতে হাওয়াটা ভাল লাগছে না।

হরিনাথের গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ছুটতে শুরু করতেই হরিনাথ হেসে ওঠেন—আজ আপনার কথার মধ্যেও কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া বইছে বলে মনে হচ্ছে।

দুলালবাবু কুণ্ঠিত হয়ে হাসেন—আপনি ঠিকই ধরেছেন। ভুবনবাবুর দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়লে মনটা একটু দুর্বল হয়ে যায়।

—তাই বলুন। কিন্তু উনি তো একটি জন্ম-দুর্ভাগ্য।

—আপনার মন্তব্যটা একটু বেশি কড়া হয়ে গেল, স্যার।

—আপনাকে আজ অদ্ভুত একটা তর্কে পেয়েছে, দুলালবাবু।

—তর্ক করতে চাই না, আপনি একটু বুঝিয়ে দিন।

—বুঝিয়ে দেবারই বা কী আছে? ভুবনবাবু যদি জন্ম-দুর্ভাগ্য না হন, তবে আমিই নিশ্চয় জন্ম-দুর্ভাগ্য। তাই প্রমাণিত হয়ে যায় না কি?

চমকে উঠলেন দুলালবাবু। বোধহয় তাঁর মনের ভিতরে অনেকদিনের পুরনো একটা অবুঝ বিস্ময় হঠাৎ একটা নতুন শব্দ শুনে চমকে উঠেছে। বুঝতে চেষ্টা করেও কোনদিন বুঝতে পারেননি দুলালবাবু, ঝড় নেই, তবু প্রকাণ্ড গাছটা এত মড়মড় করে কেন? আজ বুঝতে পারছেন, কেন!

হরিনাথ বলেন—আপনাদের ভুবনবাবু যদি খাঁটি হন, তবে আমিই ভুয়ো। ভুবন মজুমদার যদি ওয়াটার্লুর একজন জয়ী ওয়েলিংটন হন, তবে আমি একটি হারুয়া বোনাপার্ট। উনি নির্ভুল হলে আমি নিশ্চয় একটা ভুল। তাই নয় কি?

—বুঝতে পেরেছি, স্যার।

—কী বুঝলেন?

—আপনি কোন্ লাইনে চিন্তা করেন, সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল।

হরিনাথ হেসে ওঠেন।—আমার বিশ্বাস, কিছুদিন পরে আরও পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

দেউলবাড়ির কাছে এসে পড়েছে গাড়ি। সড়কের বাতি জ্বলছে। বাতির আলো ছেয়ে ফেলেছে হাজার-হাজার পোকা, তবু বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, দাঁড়িয়ে আছেন ভুবনবাবু, ফতুয়ার বুকটা ছেঁড়া। চোখ তুলে বোধহয় সড়কের বাতির আলোর উপর হাজার-হাজার পোকার খেলা দেখছেন।

দুলালবাবু—আমি এখানেই একটু থামতে চাই, স্যার।

হরিনাথ—কেন?

—ভুবনবাবুর ওই ভয়ানক শোকাঘাতের পরে আমি একবারও এসে একটু দেখা করে যেতে পারিনি। উনি তো আমাকে চেনেন, আমি ওঁর কাছেরই পাড়ার একজন। দেখা করে দু'চারটে সহানুভূতির কথা না বললে ভাল দেখায় না।

—কী বলছেন আপনি!

—মাত্র দু'তিন মিনিট, ওখানে একটু থামুন, স্যার। আমি ভুবনবাবুকে দু'চারটে সান্ত্বনার কথা বলে দিয়ে চলে আসি।

—আমি ভুবনবাবুর বাড়ির সামনে কাঙালের মত দাঁড়িয়ে থাকবো, আর আপনি ভুবনবাবুর কাছে সৌজন্যের কাজ সারবেন, তা হয় না।

—তা হয় না?...হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথা বলেছেন স্যার। আমি না হয় কাল এসে দেখা করে যাব।

দুলালবাবুর বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামতেই ছটফট করে হাত বাড়িয়ে দরজা খোলেন আর নেমে পড়েন দুলালবাবু। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করতেই হাত তুলে ইঙ্গিত করেন—সবুর!

হরিনাথ—কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে?

দুলালবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বলুন।

—সুহৃদ সেনের বিধবা ভাইঝি কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ি ওই দেউলবাড়িতে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

—কে বললে?

—ভাগ্নে দীপেন বললে। দীপেন বেহালাতে সুহৃদ সেনের বাড়িতে গিয়েছিল। দীপেনই অনেক বলে-কয়ে আর সান্ত্বনা দিয়ে মেয়েটিকে বুঝিয়ে এসেছে, একটা দুটো মাস যাক্, তারপর তো যাওয়া আছেই, যেতে হবেই।

—আপনি যেন আপনার গোপন তূণীর থেকে একটা বাণ বের করে আর আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ছেন। কথাটা এতক্ষণ বলেননি কেন?

—আপনি আমাকে খুব ভুল বুঝেছেন, স্যার। গোপন তূণীর নয়, কথাটা এতক্ষণ মনে পড়েনি, এখন মনে পড়ে গেল, আর মনে হলো, আপনাকে বলা উচিত।

—কিন্তু অসম্ভব। আপনার ভাগ্নের বানানো গল্প আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না।

—সুহৃদ সেন নিজে, সেই সঙ্গে মেয়েটির মা আর কাকিমা দেউলবাড়িতে এসে কান্নাকাটি করেছেন, আর জানিয়ে দিয়েও গিয়েছেন যে, তাঁদের মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসবার জন্য কান্নাকাটি করছে। ভুবনবাবু বলেছেন, আসবেই তো, দুটো-তিনটে মাস যাক্।

—এ গল্পটি কে বললে?

—বললেন আমারই মেজদি, দীপেনের মা, যিনি গল্প বলতে জানেন না। তিনি তখন সেখানে ছিলেন, তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তাই বলেছেন।

—তবে তো বুঝতে হয় যে, কারও কোন শিক্ষা হয়নি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শিক্ষা হবারও তো কিছু নেই।

—তবে তো বুঝতে হয় যে, এরা কেউ ভুলটাও বুঝতে পারেনি।

—সেটা আমি কী করে বুঝবো স্যার।

—তাহলে বলুন, সুহৃদ সেনের ভাইঝি থান পরে আর নিরম্বু একাদশী করে দেউলবাড়ির একটি খাঁটি বিধবা পুত্রবধূ হয়ে জীবন কাটাবে।

—বলতে পারি না, স্যার।

—কিন্তু এটা তো বলতে পারবেন যে, এরকম একটি চিরস্থায়ী বিধবা পুত্রবধূকে বাগিয়ে ভুবন মজুমদার অতঃপর সুহৃদ সেনের সব সম্পত্তি বাগিয়ে ফেলবেন আর সুখে থাকবেন।

—কখনই বলতে পারি না, স্যার।

—কিছুই যখন বলতে পারবেন না, বুঝতেও পারবেন না, তখন শুধু দেখতে থাকুন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেখা যাক্ শেষ কোথায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরিনাথের গাড়ি আবার চলতে শুরু করতেই দুলালবাবু হাত তুলে ড্রাইভারকে থামতে বলেন—সবুর।

হরিনাথ—আরও কথা আছে নাকি?

দুলালবাবু—একটা কথা স্যার। সুহৃদ সেনের ভাইঝির সব অলংকার, যার দাম বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা তো হবেই, আর তিন বাক্স-ভরতি শাড়ি, ভুবনবাবু কিছুই বাগিয়ে ফেলেননি। বেহালাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই সব জিনিস পৌঁছে দেবার জন্যেই দীপেন সেদিন সুহৃদ সেনের বাড়িতে গিয়েছিল।

হরিনাথ হেসে ফেলেন—ভাল কথা। খুব ভাল কথা শোনালেন। কিন্তু...।

হরিনাথ যেন তাঁর গলার স্বরটাকে দাঁত দিয়ে পিষে কথা বলেন—কিন্তু ভাল কথা মানেই তো শেষ কথা নয়। দেখা যাক।

ছুটে চলে গেল হরিনাথের গাড়ি। হেড লাইটের গায়ের বাদলা পোকা ছিটকে পড়তে থাকে।

দশ

কে যেন আত্মহত্যা করবার জন্যে তিনতলা বাড়ির ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে মরেনি। হাত ভেঙ্গে গেল, পা ভেঙ্গে গেল, আর বেঁচে রইল। এটাও একরকমের ভাগ্য। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আর ঘরের ভিতরে একা বসে, ভিজে চোখ দুটোকে ঘষে ঘষে যখন হাঁপিয়ে পড়ে বীথি, তখন বীথির মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুঁপিয়ে ওঠে যেন আগুন ঝলসানো একটা ঠাট্টার হাসি। হ্যাঁ, এটাও একটা ভাগ্য।

তখুনি দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে ডাক দেয় বীথি—কাকিমা।

ছুটে আসেন রমা—এই যে আমি।

বীথি চেঁচিয়ে ওঠে—আমি এখুনি যাব, আমাকে এখুনি পাঠিয়ে দাও।

বীথির হাত শক্ত করে ধরে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন রমা।

সেদিন টেলিফোনের খবর শুনে মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন রমা, কিন্তু আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। আজ বেহালার এই বাড়িতে তিনিই একটি মাত্র মানুষ, যিনি অনেকটা সচল হয়ে উঠতে পেরেছেন। জয়া অচল, সুহৃদ সেনও অচল। ঘরের মেঝেতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জপের মালাটিকে মাথায় ঠেকিয়ে কুশের একটা আসনের উপর শুয়ে পড়ে থাকেন জয়া। তার পর হঠাৎ চমকে ওঠেন আর চোখ মেলে তাকান। একটা মাস পার হয়ে গিয়েছে, তবু জয়ার মূর্চ্ছার ঘোর যেন এখনও কাটেনি। সুহৃদ সেনও সারা দিনটা ঘরের কোণে একটা চেয়ারের উপর কাত হয়ে পড়ে থাকেন, যেন তাঁর অস্তিত্বটাই তিন টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছে। দুই চোখ বন্ধ করে শুধু ঘড়ির শব্দ শোনেন। বুকটা হঠাৎ এক একবার হাপরের মত ফুলে ওঠে আর শ্বাস ছাড়ে।

বীথিও একটা নিদারুণ অচলতার করুণ ছবি। দিনরাতের প্রায় সারাক্ষণ ঘরের ভিতরে সোফার এক কোণে চুপ করে বসে, আর দুই চোখ অপলক করে পাখাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই চোখে যেন তারা নেই। চকচকে সাদাটে চোখের উপর শুধু পাখার ছায়াটা ঘুরতে থাকে। হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে, দু হাতে মুখ ঢাকে, আর ছটফট করে। ঝড়ের হাওয়া লাগলে বেহালার এই বাড়ির গ্যারেজের কাছে পুরনো শিরীষটার ফুল আর পাতা ঠিক এইরকমই ছটফট করে। ঝড় বইছে বীথিরও বুকের ভিতরে।

যেদিন সকালবেলাতে টেলিফোনে ভয়ানক খবরটা এসে বাড়িটাকে গলা টিপে ধরে বোবা করে দিয়েছিল, সেদিন বিকেল হলে এক-একটা ঘরের ভিতরে চাপা কান্নার শব্দ গুমরে উঠেছিল, কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই শোনা যায়নি। উৎপলার মা এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গিয়ে ভয় পেয়েছিলেন, এত শব্দহীন হয়ে গেল কেন বাড়িটা?

বীথির ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখতে পেয়েছিলেন উৎপলার মা, হাঁটুর উপর মাথাটাকে কাত করে রেখে দিয়ে আর দুই চোখ বন্ধ করে বিছানায় বসে আছে বীথি, আর বীথির মাথার উপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন রমা।

বীথির মাথাটা বার বার কেঁপে উঠছে। বুঝতে পারে বীথি, মনের ভিতরে কাঁটার খোঁচার একটা জ্বালা যেন কথা বলছে। ভদ্রলোকের কপালটাকে সেদিন খুব অনিচ্ছা করেও একটু টিপে দিলে কী এমন দোষ হতো? কী এমন ভুল হতো?

মাথার উপর থেকে রমার হাতটাকে হঠাৎ ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয় আর উঠে দাঁড়ায় বীথি। বীথির মাথার উপর রমার হাতটাকে যেন দুঃসহ একটা ভার বলে বীথির মনে হয়েছে। বীথি বলে—আমি যাব, এখুনি যাব।

রমা শুধু দেখতে থাকেন বীথির দু' চোখ জলে ভরে গিয়েও ছটফট করছে। পাথরটা ফেটে গিয়েছে, তারই কান্নাজলের ঝর্ণাটা ছটফট করছে। রমা কথা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে

ওঠেন—যাবেই তো, কিন্তু এখনি নয়।

উৎপলার মা বলেন—এখুনি গিয়ে তো কোন লাভ নেই বীথি। শান্ত হও।

ঠিক এইরকম করুণ ব্যস্ততার সাড়া ছটফট করে উঠেছিল আবার একটি দিন, যেদিন অজিতের বন্ধু দীপেন এসেছিল। দেখতে পেয়েছিল বীথি উপরতলার বারান্দাতে, যেখানে টেবিলের উপর বসানো কাঁচের নকল সাগরজলের রঙীন মাছ সাঁতার দিয়ে খেলছে, সেখানে দীপেনের সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনজন, এই বাড়ির মা কাকা আর কাকিমা। কী কথা বলাবলি করছেন ওঁরা, আর কেনই বা এরকম নিথর হয়ে রয়েছেন কে জানে? কিন্তু দৃশ্যটা বীথির চোখের উপর যেন আগুন ছুঁড়ছে। বীথির চোখের ক্লান্ত করুণ দৃষ্টিটা ছটফট করে পুড়তে থাকে।

এগিয়ে যায় বীথি। কাঁচের ঘরের গায়ে হাত রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেঁপে ওঠে, পিছলে পড়ে যায় হাতটা। নকল সাগরজলের সব রঙীন মাছ একসঙ্গে শিউরে ওঠে আর এক নিমেষে নকল প্রবালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

হাঁপাতে থাকে বীথি। গলার স্বরে যেন নিঃশ্বাসের জ্বালাটাও উথলে ওঠে ; বীথি বলে—আমি এখুনই যাব।

বিচলিত ও বিব্রত দীপেনের গলার স্বর করুণ হয়ে ছলছল করে।—নিশ্চয় যাবেন। যাবেনই তো। কিন্তু আজ এখুনি না গেলেও চলবে। আপনি শান্ত হোন।

সেদিনের পর প্রায় একটা মাস পার হয়ে গিয়েছে। একদিন বীথিকে চুপ করে বসে বই পড়তেও দেখেছেন রমা। তারপর, এই আজ আবার দেখলেন, বীথির অশান্ত প্রাণের কষ্টটা উতলা হয়ে উঠেছে। ধৈর্য ধরে একটা শান্ত দিনের জন্য অপেক্ষা করতে চায় না বীথি, এখুনি দমদমে চলে যেতে চায়। বুঝতে পারেন রমা, এ যেন স্বপ্নের কাছে ফিরে যাবার স্বপ্ন, বার বার উতলা হয়ে উঠছে। নইলে আর কিসের জন্য যাওয়া? যার কাছে যাওয়ার কথা ছিল, এখুনি গেলে কিংবা কখনও গেলে তাকে তো আর দেখতে পাবে না বীথি! দমদমের যে বাড়িটা এই মেয়ের প্রাণের প্রিয় হওয়া দূরে থাকুক, মনের একটা সামান্য মায়াও হয়ে উঠতে পারেনি, সেই বাড়ির আলোছায়ার ছবিটা আজ স্বপ্ন হয়ে তার প্রাণটাকে টানছে। এইরকমই হয় ; মিছিমিছি তুচ্ছ করে আর জোর করে মালা ছিঁড়ে দিতে পারা যায়, কিন্তু মালার সুতোতে হাত কেটে যেতে পারে।

বীথির ভাগ্যের কথা ভাবলে রমার কষ্টের দীর্ঘনিশ্বাসটা তপ্ত হয়ে যেন বুকের পাঁজরগুলিকে পুড়িয়ে দিতে থাকে। মনে হয় রমার, চোখের সামনের আকাশটার গায়ে আগুন লেগেছে। কিন্তু তারই মধ্যে অদ্ভুত এক-টুকরো মেঘের ছায়াও যেন আছে। দমদমের জন্য বীথির মনের একটা উদাস ভাব, একটা বিশ্রী অমায়া দেখে যে দুঃখ পেয়েছিলেন রমা, সে দুঃখ আর নেই। অজিত আজ নেই, তবু অজিতের জন্য বীথির প্রাণটা আরও ব্যাকুলতায় ভরাট হয়ে গিয়েছে। সুহৃদও বোধ হয় তাঁর ভয়ানক শুকনো দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একটি শিশিরবিন্দুর স্পর্শ অনুভব করেন। বুঝতে পারেন সুহৃদ, অজিতের কথা বার বার মনে পড়ছে বীথির, তাই বীথির প্রাণটা শূন্যতার দুঃখে ছটফট করে উঠছে। এখুনি যাব, কথাটা যেন বীথির স্বপ্নেরই একটা আর্তনাদ। একদিন রমার কাছে বলেই ফেলেছেন সুহৃদ—তুমি ভুল ধারণা করেছিলে রমা, আমিও ভাবতে ভুল করেছিলাম। বীথির মনটাকে খুবই ভুল সন্দেহ করা হয়েছিল।

রমা—হ্যাঁ।

সুহৃদ—তাই বলছি, তুমি বীথিকে খুব আদর করে আর মিষ্টি করে বলে বুঝিয়ে দাও যে, এখুনি যাবার কোন দরকার হয় না। এই ভয়ানক জ্বালার বাতাসটা একটু ঠাণ্ডা হোক, বীথি আবার আমার সঙ্গে লনের উপর ঘুরে বেড়িয়ে দুটো দিন গল্প করুক, তারপর যাবে।

সবই মনে আছে রমার, সবই বুঝেছেন। বীথিকে ঠিক ওই কথা বলে আর বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করেছেন। তবু, আজ আবার সেই দৃশ্যই দেখতে হলো, বীথি চলে যাবার জন্যে ছটফট করছে।

রমার হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ডাক দেয় বীথি--হরেনবাবু, গাড়ি বের করুন।

রমা--হরেনবাবুকে ডাকাডাকি করো না, বীথি। লক্ষ্মী মেয়ে, সোনামণি মেয়ে, আমার কথা শোন।

বীথি--তোমার কথা আবার কী শুনবো? তোমার আবার কথা বলবার কী আছে?

চমকে ওঠে রমার বুক--আমি বলছি, আজই যাবার তো কোন দরকার হয় না।

বীথি--কিন্তু মানে তো হয়।

রমা--কী বললে?

বীথি--একদিন যখন যেতেই হবে, তখন আজই চলে যাওয়া ভাল। দেরি করবার কোন মানে হয় না।

রমা--দেরি মানে, বড় জোর আর তিন-চারটে মাস। তোমার কাকার মনটা একটু শান্ত হোক, তুমিও...।

হেসে ফেলে বীথি--আমিও আবার হাসবো সাজবো খেলবো আর লনের ডালিয়ার কাছে ঘুরে বেড়াবো, তারপর দমদমে যাব ; তাই না?

--তুমি একটু শান্ত না হলে তোমাকে কী করে যেতে দিই বল?

বীথি--সেদিন যেমন করে যেতে দিতে পেরেছিলে।

রমার চোখ দুটো ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে--তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে, তোমার জন্যে আমাদের মনে কোন মায়া নেই?

বীথি--আমি তো বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি বল তো, মেয়ের জন্য এত মায়া থাকতে মেয়েকে সেদিন জোর করে জলে ভাসিয়ে দিলে কেন?

--জলে ভাসিয়ে দিলাম? এ কী ভয়ানক কথা বলছো বীথি?

--মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম আছে বলে মনে করলে না, শুধু নিজেদের ইচ্ছার জেদটাকেই খুশি করে নিলে।

--তোমার ভাল হবে, এই বিশ্বাসের জেদ ছাড়া আর-কোন জেদ আমাদের ছিল না।

--এখন দেখছো তো, মেয়ের কী চমৎকার ভালটা হয়ে গেল। তবু বোধ হয় ভুলটা বুঝতে পারছো না।

চোখ মুছে নিয়ে জোরে একটা হাঁপ ছাড়েন রমা--বুঝতে পারছি না।

বীথি--বেশ তো ; তবে আর আমাকে বলবার কী আছে?

রমা--কিছু বলবার নেই।

বীথি--তবে চলে যাই!

রমা--না, কখ্‌খনো না।

বীথি--আবার একথা বলছো কেন?

রমা--জিজ্ঞেস করছি, কেন যেতে চাও?

বীথি--অবিনাশ মামার শিকারের গল্প শোননি? জঙ্গলের তিন দিক ঘিরে লোকেরা হল্লা করে, শুধু একটি দিক খোলা থাকে, যেদিকে গাছের উপর মাচান করে আর বন্দুক হাতে নিয়ে অবিনাশ মামা বসে থাকেন। জন্তুগুলোর ভাগ্যের রকমটা বুঝতে পারছো তো? অবিনাশ মামার বন্দুকের সামনে পড়া আর গুলি খেয়ে মরে যাওয়া ছাড়া পালিয়ে যাবার অন্য কোন দিক খোলা নেই। যেদিকের পথ খোলা আছে, সেই দিকের পথেই তো চলে যেতে হবে।

বীথির হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেন রমা।--না।

বীথি--কী?

রমা--যেতে পারবে না। যেতে হবে না।

উপরতলা থেকে নেমে এসেছেন সুহৃদ। রমা আর বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন।--হঠাৎ ভয় পেয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কী ব্যাপার? তোমরা এখানে কী করছো?

রমা--এই মেয়ে আমাদের উপর রাগ করে দমদমে চলে যেতে চাইছে।

সুহৃদ--নিশ্চয় আমাদের উপর রাগ করবে বীথি। আমাদের উপর রাগ না করলে কার উপর করবে? তুমি ওর হাতটা এত শক্ত করে ধরবে না, ছেড়ে দাও।

বীথির মাথায় হাত বুলিয়ে ভাঙা ঢেউয়ের জলের মত ছলছল স্বরে কথা বলেন সুহৃদ--কিন্তু আমাদের উপর রাগ হয়েছে বলে ওখানে যেতে হবে কেন? কখখনো না । ওখানে যাবার ইচ্ছে হলে যাবে, না ইচ্ছে হয় যাবে না। সবই বীথির ইচ্ছে। এখন আমার ইচ্ছে এই যে...।

বীথির হাত ধরে কথা বলেন সুহৃদ--এখন আমরা দুজনে ছাদের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বসবো। চুপ করে দুজনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবো যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয়। আজকের আকাশের স্টার-চার্ট দেখে আমি হিসেব করে বুঝে নিয়েছি। কালপুরুষ থাকবে ঠিক মাথার উপর, তার পশ্চিমে অনেকটা দূরে সরে থাকবে মৃগশিরা। বীথিকে সব তারা চিনিয়ে দেব।

এগার

জয়া ডাক দিয়ে বলেন--রমা, শুনছো?

রমা--বলুন।

--দমদম থেকে নন্দাদির চিঠি এসেছে। জান তো?

--হ্যাঁ।

--কী লিখেছেন, সেটা জান না বোধ হয়।

--না, আপনি তো কিছুই বলেননি।

--নন্দাদি লিখেছেন, তোমাদের মেয়ের জীবনের যে ক্ষতি হলো, সে জন্য আমাদের দোষ নিও না, আমাদের ক্ষমা করো।

--এঁদেরও কি কিছু কম ক্ষতি হয়েছে?

--বরং ক্ষতিটা ওঁদেরই তো বেশি। আমাদের মেয়ে বেঁচে আছে, কিন্তু ওদের ছেলে যে চিরকালের মত চলেই গেল।

--ঠিক কথা।

নন্দাদি জানতে চেয়েছেন, বীথি কবে যাবে? কী জবাব দেব, বলে দাও।

--কী করে বলি?

--বীথিকে জিজ্ঞেস কর।

--জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, জিজ্ঞেস করা উচিতও নয়।

--কেন!

--যেদিন যেতে ইচ্ছে হবে, সেদিন নিজেই বলবে।

--পুরো আটটা মাস পার হয়ে গেল, তবু বলে না কেন?

--ইচ্ছে হয় না, তাই বলে না।

--ইচ্ছেই বা হবে না কেন?

--আপনি এসব কথা তুলবেন না দিদি, ঘরের মেয়ে ঘরে আছে, ভাল আছে। থাকতে

দিন।

—তোমরা তা হলে ঠিক করেছো যে, বীথির ইচ্ছেতেই বীথি চলবে?

—হ্যাঁ।

—ভাল কথা। ভগবান আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন, নইলে দু-একটা কথা বলতাম। যা-ই হোক, নন্দাদিকে তাহলে জানিয়ে দিই যে, বীথির যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন যাবে, আপনি মিথ্যে এত ব্যস্ত হবেন না।

—লিখে দিন। এছাড়া কীই বা আর লিখবেন?

ঠিক কথা। ঘরের মেয়ে ঘরে আছে, ভালই আছে। চিরকাল বেহালার এই বাড়ির আদর পাওয়াই যে-মেয়ের জীবনের নিয়ম হয়ে উঠেছিল, সেই মেয়ে এখন এই বাড়িকে সারাক্ষণ আদর করছে। ঘরের কার্পেটের উপর নিজের হাতে স্পঞ্জ বুলিয়ে ধুলো পরিষ্কার করে বীথি। চাকর অনন্ত কাজে ফাঁকি দেবার কোনও সুযোগ পায় না। বীথি সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেয়, অনন্ত বারবার দুবার ঝাড়ন আর পালক চালিয়ে ঘরের আসবাব ঘষা-মোছা করে চকচকে করে তোলে। বীথি চেয়েছে, তাই সুহৃদ প্রায়ই অফিস থেকে অনেক জরুরী দলিলের কাগজপত্র নিয়ে আসেন, যেগুলির টাইপ-কপি দরকার। এক-একদিন মাঝরাত পর্যন্ত জেগে দলিলের কপি টাইপ করে বীথি। বীথি এখন প্রতি মিনিটে পঞ্চান্নটি অক্ষর টাইপ করতে পারে। লনের মরশুমী ফুলের কেয়ারিতে একটিও আগাছা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বীথি রোজই ঘুরে ঘুরে ফুলের কেয়ারির অবস্থাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যায়। নতুন মালী কাজ ভাল জানে না, কাজে ভুল করে। বীথি তাই নিজেই খড়ির দাগ টেনে ফুলের কেয়ারির নক্সা এঁকে দেয়। দু বেলা সুহৃদের চা বীথিই তৈরি করে। ড্রাইভার হরেনবাবু বুড়ো মানুষ, তাঁকেও ব্যস্ত করে তুলেছে বীথি। গ্যারেজের মেঝেতে এক ইঞ্চি পুরু তেলকাদা জমেছিল। বীথি নিজের হাতে মেঝের উপর সোডা-গরমজল ঢেলেছে, হরেনবাবু শক্ত বুরুশ দিয়ে ঘষে ঘষে সেই তেলকাদা ধুয়েছেন। জয়ার ঘরে ঢুকে একরকম জোর করে তিনটে কম্বলের আসন নিয়ে গিয়েছে বীথি। আসনের উপর সাদা সুতো দিয়ে লতাপাতার নক্সা তুলে আবার জয়ার ঘরে রেখে দিয়েছে। কাদামাটি দিয়ে ছোট্ট একটা সাঁচীর গেট তৈরি করেছে। তিন দিন ধরে যত্ন করে কাদামাটির সাঁচীগেটের গায়ে এমন চমৎকার চন্দন-রঙ ধরাতে পেরেছে যে, সত্যি লাল বেলে পাথরের সাঁচী-গেট বলে মনে হয়। বীথির হাতের এই ছোট্ট সাঁচী-গেট এখন সুহৃদের টেবিলের মাঝখানের একটি শোভা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এক-একটা মাস পার হয়, ক্যালেণ্ডারের এক-একটা পাতা নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বীথি একবার ভুলেও তারিখের কোন পয়লা-দোসরা কিংবা তিরিশে-একত্রিশের চেহারার দিকে তাকায় না। কোন তারিখটি কোন উৎসবের রঙে লাল হয়ে রয়েছে, তার কোন হিসেবের ধারও ধারে না বীথি। জানে না বীথি, বেহালার পুজোর উৎসবের মাইক শানাই আর ঢাকঢোল কবে বেজে উঠলো, আর কবে থেমে গেল। বাইরের পৃথিবীটার কোন সাড়াশব্দ বীথির কানের কিংবা প্রাণের কাছে পৌঁছতেই পারে না। বাড়ির বাইরে কোনদিনও বেড়াতে বের হয়নি বীথি, বেড়াবার জন্য মনের কোন তাগিদ নেই। টেলিফোনে ডেকে কথা বলেছিল উৎপলা, কিন্তু উৎপলার সঙ্গে কথা বলতে বেশ বিরক্ত বোধ করেছিল বীথি।

চারদিকে যেন কালাপানি, মাঝখানে শুধু এই বাড়িটাই একটা দ্বীপ, যেখানে বীথির প্রাণের সব আশার আর হাসিখুশির সবুজ ঘাস, রঙীন ফুল আর ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটুও ভুল কথা বলেননি রমা ; ঘরের মেয়ে ঘরে আছে, ভাল আছে।

সুহৃদ অবশ্য মাঝে-মাঝে রমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজেরই মনের একটা করুণ বিস্ময়ের সঙ্গে কথা বলে ফেলেন—কিন্তু দমদমের বাড়িটার কথা বীথি কি সত্যিই ভুলেই

গেল?

রমা—ভুলে থাকতে চেষ্টা করছে।

সুহৃদ—এটা কি ভাল চেষ্টা?

রমা—জানি না। কিন্তু তুমি মিছিমিছি আর কথা বাড়িও না।

সুহৃদ--চেষ্টা করলেই কি সব ভুলে যেতে পারবে বীথি?

রমা—এটাও একটা বাড়তি কথা হয়ে গেল। নিজের মন আর নিজের ইচ্ছে নিয়ে পড়ে আছে মেয়েটা, থাকতে দাও।

কিন্তু উৎপলার মা এসে একদিন আবার সেই কথাটা বললেন—সত্যি বীথিকে দেখলে একটি কুমারী মেয়ে বলে মনে হয়।

দু জনের দুই চোখ হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে উৎপলার মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুহৃদ ও রমা দুজনের বুকের ভিতরে যেন ভয়ানক একটা শব্দ হঠাৎ গুমরে উঠেছে। বিয়ে হবার পর যে-মেয়েকে দেখতে কুমারী মেয়ের মত বলে মনে হয়েছিল যাঁর, বিধবা হবার পরেও সে মেয়েকে দেখতে তাঁর চোখে কুমারী মেয়ের মত লাগছে। শাঁখ বাজিয়ে বীথির আঁচলে ধানদূর্বা বেঁধে দিল যে উৎসবটা, আর টেলিফোনে যে ভয়ানক খবরটা এল, দুটোই তবে দুটো ভুয়ো ঘটনার ভুয়ো ছায়া।

উৎপলার মা তার সরল মনের সরল কথাটা খুব সরল করে বলে দিয়েছেন। কিন্তু রমার চোখে পড়েছে ঃ উৎপলার মার চোখের দৃষ্টিটা বেশ জটিল হয়ে দেখছে, বারান্দার কাঁচের চৌবাচ্চার ঢাকা খুলে জলের উপর রঙীন মাছের খাবার ছড়িয়ে দিচ্ছে আর হাসছে বীথি।

উৎপলার মা চলে যাবার পর সুহৃদ সেন আর রমা সেন একেবারে নীরব হয়ে বসে থাকেন। ভয়ানক সত্য একটা বাড়তি কথা শুনিয়ে দিয়েছেন উৎপলার মা। বুঝতে আর অসুবিধে নেই, খুব পরিষ্কার করে তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, এই শান্ত সুন্দর আর চমৎকার-সাজানো বাড়িটা হলো একটা কন্যাদায়গ্রস্ত বাড়ি।

সুহৃদের বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাস যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর ভেঙ্গে যায়। আমি কী করতে পারি, বল।

রমা—তোমার কি কিছু করবার আর সাহস আছে?

সুহৃদ—না। ভগবান আমার সব সাহস ভেঙে দিয়েছেন।

রমা—তবে চুপ করে থাক।

সুহৃদ--তুমি কী করবে?

রমা—কিচ্ছু না।

সুহৃদ—বীথিকে জিজ্ঞেস করে একটু বুঝতেও চেষ্টা করবে না।

রমা—কী বুঝতে চেষ্টা করবো?

সুহৃদ--দমদমের বাড়িটাকে বীথি সত্যিই ভুলে গিয়েছে কি না?

রমা—ধরে নাও, ভুলেই গিয়েছে।

সুহৃদ—তবে তো, আমাদের কর্তব্যের কথাটা ভাবতে হবে!

রমা—কিসের কর্তব্য? বীথির আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করবে?

সুহৃদ—হ্যাঁ।

রমা—তুমি চেষ্টা করলে কী ফল হয়, দেখতে পাচ্ছ না?

সেই মুহূর্তে সুহৃদের শরীরটা পক্ষাঘাত রোগীর মত কুঁকড়ে গেল। রমার কথার আঘাতটা যেন সুহৃদের মাথার সব স্নায়ুশিরা ছিঁড়ে উপড়ে দিয়েছে। শাস্তি, কী দুঃসহ শাস্তি! সুহৃদের ইচ্ছা আশা আর বিশ্বাস যেন ভয়ানক এক নেশার ঘোরে পড়ে বীথির ভাগ্যটাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। সে যেন পাঠকপাড়ার সেই পশ্চিমা মহিলার দুর্ভাগ্যের মত একটা

নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য। আদরের ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে চোখে কাজল পরিয়ে দিলেন মহিলা। ছেলেটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো আর এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ধ হয়ে গেল। কাজলে বিষ ছিল? না, মহিলার আঙুলে বিষ ছিল?

হাঁসফাঁস করছেন সুহৃদ। রমা হাত চালিয়ে পাখাটার বেগ বাড়িয়ে দেয়। অনেক চেষ্টা করে আস্তে আস্তে কথা বলেন সুহৃদ—এ কী হলো রমা? বীথির ভালর জন্য আমি কোন চেষ্টাও করতে পারবো না? আমি কি এতই অপয়া? আমার আঙুলে কি বিষ আছে?

জবাব দেবার চেষ্টা করেন না রমা। বোধ হয় ভয় করছেন রমা, কথা বললে কথা বাড়বে। আর, এই মানুষটার শ্বাসকষ্ট আরও করুণ হয়ে উঠবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, সুহৃদ যেন তাঁর শরীরটার এই কুঁকড়ে-পড়া ক্ষণ-পক্ষাঘাত দশাটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। শরীরটা টান করে, শক্ত করে আর সোজা করে নিয়ে বসলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন সুহৃদ।...না, আমি কোন ভুল করিনি। অজিতকে ভাল ছেলে বলে মনে করে আমি কোন ভুল করিনি। অজিতের সঙ্গে বীথির বিয়ে দিতে ইচ্ছে করে আমি কোন পাপ করিনি।

রমা—থাম তুমি। এসব কথা তোমার না বললেও চলে। বলে লাভ নেই।

সুহৃদ—জানি ; তাই শেষবারের মত বলে নিচ্ছি। তোমাদের মেয়ে নিশ্চয় জানে না যে, অজিতের কথা মনে করে আমাকে অনেক বেশি কাঁদতে হয়েছে। ভুবনবাবুকে আমি লিখেছি ঃ আমাদের কী আর এমন ক্ষতি হয়েছে? যা'কে বলে সর্বনেশে ক্ষতি, সে ক্ষতি আপনারই হয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুহৃদ। আনমনার মত এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর কোথায় যেন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে দিলেন। রমা বলেন—বসো তুমি।

চেয়ারের উপর বসে পড়েই সুহৃদ আবার বলে ওঠেন—বলে দিও বীথিকে, অজিতকে আমি ভুলিনি। ভুলে যাওয়া এত সহজ নয়।

এইবার রাগ করে কথা বলেন রমা।—তুমি কি তবে এই চাও যে, বীথি চিরকাল দমদমের দেউলবাড়ির বিধবা পুত্রবধূ হয়ে বেঁচে থাকবে?

সুহৃদ-না, কখ্‌খনো তা চাই না।

রমা—বীথির যদি ইচ্ছে হয়, তবু কি বীথি আর বিয়ে করবে না?

সুহৃদ—নিশ্চয় করবে।

রমা—তবে আর মিথ্যে এত সোরগোল করছো কেন?

সুহৃদের গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়।—না, আমার আর কিছু বলবার নেই।

বার

দরজার পর্দার উপর একটা ছায়া পড়েছে। চমকে ওঠে রমার চোখ। যাঁর ছায়া, তাঁর পায়ে ভেলভেটের চটি। তাই তাঁর আসা-যাওয়ার কোন শব্দ বাজে না। পর্দা না সরিয়ে তিনি ডাক দিলেন—এ ঘরে কে? রমা নাকি?

রমা—হ্যাঁ, আসুন।

ঘরে ঢুকলেন মঙ্গলা।—সুহৃদদাও আছেন দেখছি।

সুহৃদ—আপনি কেমন আছেন?

মঙ্গলা—আমি তো ভালই ছিলাম, কিন্তু সন্তু আমাকে ভাল থাকতে দিলে না। তিনটে মাস দুশ্চিন্তা করে বড়ই কষ্ট পেতে হয়েছে।

সুহৃদ—সন্তু কে?

রমা—মঙ্গলাদির ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটি, আর্মি মেডিক্যালের মেজর। বড় সুন্দর ছেলে।

মঙ্গলা—শখের জকি হয়ে বাঙ্গালোরের রেসে ঘোড়া ছুটিয়েছিল সন্তু। পড়ে গিয়ে একটা পা খুব জখম হয়েছিল। তিন মাস হাসপাতালে থেকে তারপর ছাড়া পেয়েছে।

রমা—এখন কোথায় আছে সন্তু?

মঙ্গলা—এখন মানে এই দশদিন হলো কলকাতাতে এসেছে, আমারই কাছে আছে। কিন্তু কেন এসেছে জান? বউ দেখাতে এসেছে। বলা নেই, কওয়া নেই, কোন খবর দেওয়া নেই, হঠাৎ বিয়ে করে আর বউ নিয়ে কলকাতাতে এসেছে, কাল আবার বউকে সঙ্গে নিয়ে পুণাতে ফিরে যাবে।

রমা—সে কী কথা? বিয়ের আগে আপনাকে কিছুই জানায়নি?

মঙ্গলা—না। তবে আর বলছি কী? হাসপাতালে থাকতে একটি মারাঠী মেয়ের সঙ্গে সন্তুর ভাব হলো। তারপর, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সাতদিনের মধ্যেই মেয়েটির সঙ্গে সন্তুর বিয়ে হয়ে গেল। সন্তু বললেঃ তুমি রাগ করনি তো মা? আমি বললামঃ একটুও না। তোমার যেখানে ইচ্ছে হয়েছে, যাকে ভাল লেগেছে, তাকেই বিয়ে করেছো। এর মধ্যে আমার ইচ্ছের বা অনিচ্ছের তো কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। বলুন না সুহৃদদা, আমি কি ভুল কিছু বলেছি?

সুহৃদ—আপনি যদি ভুল বলে মনে না করেন, তবে ঠিকই বলেছেন।

মঙ্গলা—একটু স্পষ্ট করে বলুন, সুহৃদদা। একটু বুঝে বলুন, ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মা'র ইচ্ছা-অনিচ্ছার জোর খাটানো কি উচিত? ওটা কি একটা নিষ্ঠুরতা নয়? সভ্য মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, কাণ্ডজ্ঞানের মানুষ কি তা কখনও করতে পারে? আমার কথাই ধরুন না কেন। সন্তুর এই বিয়ে আমার ইচ্ছেতে হয়নি, কিন্তু আমি তো হেসে হেসে সন্তুর মারাঠী বউয়ের কপালে বাংলা খয়েরের টিপ এঁকে দিয়েছি।

রমা—মঙ্গলাদি, এবার একটু চা খান।

মঙ্গলা—তা খাব। তোমাদের দুর্ঘটনার কথা শুনে মনটা এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, তোমাদের এখানে আর আসতেই ইচ্ছে হয়নি। তবে উৎপলার মা'র কাছ থেকে তোমাদের সব খবরই পেতাম। যত কষ্টের আর অশান্তির খবর। আজ হঠাৎ দেখা হতে উৎপলার মা বললেন, না, বীথি এখন খুব শান্ত। তাই ইচ্ছে হলো, একবার দেখে আসি। বীথি কোথায়?

রমা—বোধ হয় শুয়ে আছে, নয়তো বইটই পড়ছে।

বারান্দাতে একটা উচ্ছল হাসির শব্দ বেজে ওঠে। দরজার পর্দা সরিয়ে বারান্দার দিকে তাকালেন মঙ্গলা। চেঁচিয়ে উঠলেন—ওই তো আমাদের বীথি।

ছোট্ট স্প্যানিয়েলের চোখের কাছে একটা রঙীন বল নাচিয়ে নাচিয়ে হাসছে আর বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে বীথি। দেখতে পেয়ে মঙ্গলার উৎসুক চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে স্নিগ্ধ হয়ে গেল।—বীথি দেখছি খুব শান্ত হয়ে গিয়েছে।...না রমা, এখন আর চা খাব না। আমি এখন যাই।...আপনার শরীরের যত্ন করবেন সুহৃদদা।

রমা—গাড়ি আনেননি?

মঙ্গলা—এনেছি। গাড়ি রাস্তার উপরেই আছে।

মঙ্গলার সঙ্গে কথা বলে বলে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে আসেন রমা। গাড়িতে উঠেই মঙ্গলা বিহ্বল স্বরে কথা বলেন—তোমাদের শান্ত দেখে, বিশেষ করে বীথিকে শান্ত দেখে বড়ই ভাল লাগলো, রমা।

আবার ঘরে ঢুকে আর সুহৃদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারেন রমা, মঙ্গলাদি তাঁর শানানো কথার ছুরিটা যার বুকে ভাল করে বসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার বুকে ছুরিটা ভাল

করেই বসেছে। সুহৃদ সেনের সাদা রক্তহীন মুখটা যেন স্মৃতিহারানো মানুষের মুখ। দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা ছবির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। অনেক-দেখা অনেক দিনের পুরনো একটা ছবি, তবু ছবিটাকে যেন হঠাৎ-দেখা একটা নতুন-কিছু বলে মনে হয়েছে।

রমা বলেন—তুমি কি এখন চা খাবে?

সুহৃদ বলেন—আর্টিস্ট ভদ্রলোক বোধ হয় ভুল করেছেন। সূর্য ডুবছে, সমুদ্রের জল লালচে হয়ে গিয়েছে, দ্বীপের নারকেল গাছের মাথার উপরেও লাল আভা পড়েছে, কিন্তু আকাশের গায়ে লাল আভা নেই কেন?

রমা—সন্ধ্যা হতে এখনও দেরি আছে।

সুহৃদ—তাহলে আমি যাই, ছাদে গিয়ে বেড়াই।

সন্ধ্যা হবার পর ছাদের পায়রা যখন উড়ে চলে যায়, তখন নেমে এসে আর চা খেয়ে ঘরের ভিতরে ডেকচেয়ারের উপর গা এলিয়ে বসে থাকেন শান্ত সুহৃদ সেন। আর, রমা নীচের তলায় নেমে ছোট ঘরের ছোট কোচের উপর শান্ত হয়ে বসে থাকেন। দেখতে পেয়েছেন রমা, পাশের ঘরে বসে আছে বীথি। বীথির সামনে টেবিলের উপর সুহৃদের কারবারের কাগজপত্রের কয়েকটা ফাইল আর একটা টাইপ-রাইটার। বীথির কালো চোখ দুটো কত শান্ত আর কত স্নিগ্ধ হয়ে খোলা ফাইলের একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে আছে। টাইপ করছে বীথি, সারা বাড়ির স্তব্ধতার মধ্যে যেন শান্ত ছন্দের শব্দ বাজছে।

কিন্তু শান্তি না শ্রান্তি? খগেনবাবুর একজন সন্ন্যাসী গুরু আছেন। মনে পড়ে রমার, বেশ অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলেন খগেনবাবুর এই সন্ন্যাসী গুরু। সংসারীর জীবন হলো একটা ঘড়ি, একদিন দম ফুরিয়ে যাবেই যাবে। এটা হলো শ্রান্তি। কিন্তু এই শ্রান্তিই হলো শান্তি। এ ছাড়া শান্তি বলে অন্য কিছু নেই।

চমকে উঠলেন রমা। টেলিফোনের শব্দ বেজে উঠেছে। বীথি বলছে—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

ব্যস্তভাবে উঠে আর এগিয়ে যেয়ে দরজার কাছে এসেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন রমা। ঘরের ভিতরে আর ঢুকলেন না। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছেন রমা, যেন এক ঝলক রক্তের আভা উথলে উঠে বীথির মুখটাকে লাল করে রাঙিয়ে দিয়েছে। কাঁপছে বীথির হাতটা। বীথির হাতের কাগজটা থরথর করে কাঁপছে। বীথির কপালে কুচিকুচি ঘামের ফোঁটা চিকচিক করে জ্বলছে।

বীথি বলে—হ্যাঁ, আমি বীথি।...হ্যাঁ, সে কী কথা? চিনতে পারবো না কেন? হ্যাঁ, স্প্যানিয়েলটা রঙীন বল পেলে খুব খুশি হয়ে খেলা করে। কিন্তু আপনি কখন দেখলেন?...কে বললে?...বলবেন না? বেশ। কী বললেন, পলাতকা? তা আপনি বলতে পারেন। হ্যাঁ, আখরোট কাঠের হরিণটা ভাল আছে। না, ওটা আপনার ভুল ধারণা।...আসবেন বৈকি। সত্যি আসবেন তো?

তের

বেহালার এই বাড়ির ছাদের পায়রা আজকাল সন্ধ্যা হবার আগেই উড়ে চলে যায়। সিতাংশুর গাড়িটা যখন গেটের কাছে এসে হর্ন বাজায়, তখন ছাদের পায়রার দল চমকে ওঠে। গাড়িটা যখন ভিতরে ঢুকে লনের পাশে দাঁড়িয়ে আরও জোরে হর্ন বাজায়, তখন পত্‌পত্‌ করে একসঙ্গে পাখা ঝাপটিয়ে পায়রার দল উড়ে উড়ে একটা চক্কর দেয়, তারপর উধাও হয়ে যায়।

নীচের তলায় সেই ছোট ঘরটি, যেখানে সোফার পাশে আখরোট কাঠের ছোট হরিণ শিং তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ দুটো আজকাল আর ফ্যালফ্যাল করে না। বীথির মনে হয়, খুব খুশি হয়ে তাকিয়ে সব কিছু দেখছে আর শুনছে এই কাঠের হরিণ। কিন্তু যারা কাঠের মানুষ নয় ; এই বাড়ির মা কাকা আর কাকিমা, তারা যেন কিছুই দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে না। দুই মাসের ষাটটি দিনের মধ্যে একটি দিনও এ বাড়ির কেউ একবার ঘরের বাইরে এসে উঁকি দিয়ে দেখবারও চেষ্টা করলো না, কে এলো, চা খেলো আর চলে গেল।

ওই একটি দিন, প্রথম দিন, বিকেলবেলা সিতাংশুর গাড়িটা যখন গেট পার হয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো, তখন গাড়ির হর্নের শব্দ শুনতে পেয়েও ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে পারেনি বীথি। দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিতেও পারেনি। বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন ঝড় হয়ে শব্দ করছে। ঘরেরই ভিতরে সরে গিয়ে ভীরু পাখির মত থরথর একটা শরীর নিয়ে মিররের এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বীথি। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে রমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।—কাকিমা, সিতাংশুবাবু এসেছেন।

রমা—তাই নাকি?

বীথি—আমি যাব?

রমা—তোমার ইচ্ছে।

বীথি—তোমাদের ইচ্ছে নয়?

রমা—তোমার ইচ্ছেই আমাদের ইচ্ছে।

বীথি—সিতাংশুবাবু যদি চা খেতে চান?

রমা—চা দেবে।

তারপর আর কোনদিন বীথির মনে হয়নি যে, এ বাড়ির কাউকে আর-কোন কথা জিজ্ঞেস করবার আছে। মাঝে মাঝে, সিতাংশু আসবার আগে, কিংবা সিতাংশু চলে যাবার পর বীথির হাতের ছোঁয়া পেয়ে পিয়ানোতে মিষ্টি সুরের যে ঝংকার বেজে ওঠে, সেটা বীথিরই ইচ্ছার ঝংকার। সুহৃদ আর সেই আগের মত হঠাৎ এসে বলে ওঠেন নাঃ শুনতে আমাদের গৌড় সারঙ্গের মত, সেই বিলিতী সুরটা একবার বাজাও তো, বীথি।

বীথির ইচ্ছেটাকে খোলা রাজপথে ছেড়ে দিয়ে এ বাড়ির মা কাকা আর কাকিমা যেন এক-একটা অন্ধ গুহার ভিতরে ঢুকে চোখমুখ লুকিয়ে ফেলেছেন। কারও আর কিছু দেখবার নেই, বলবারও নেই।

দুঃখ হয় কিন্তু ক্ষোভ নেই বীথির মনে। মা কাকা কাকিমা'র মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে পারে বীথি। এরা সবাই জানে, এদের আর কিছু বলবার মুখ নেই। সিতাংশুকে তুচ্ছ করবার ভুল আর লজ্জাটা এদের সবারই প্রাণের সাড়া কেড়ে নিয়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, সিতাংশুর মনে সেই তুচ্ছতার কোন স্মৃতিও নেই, কোন ক্ষোভ নেই, কোন অভিযোগ নেই। ধোওয়া আকাশের মত পরিষ্কার একটি মন। সিতাংশু বলেঃ ওঁরা আমাকে কী মনে করেন বা না করেন, সেজন্য আমার কোন চিন্তা নেই, বীথি। আমি শুধু এইটুকু জেনেই খুশি যে, তুমি আমাকে তুচ্ছ করনি, তুচ্ছ করতে পারনি। আমি শুধু এক তোমাকেই বুঝি।

চায়ের অর্ধেকটা না খেয়েই ব্যস্ত হয়ে চলে গিয়েছিল যে সিতাংশু, সে আজ স্মরণ করতেও পারে না যে, বীথি সেদিন কী ভয়ানক ভুল করে সিতাংশুর আশার দাবিটাকে অপমানিত করেছিল। সিতাংশু বলে—না বীথি, বিশ্বাস কর, সেদিন আমি একটুও বিরক্ত বোধ করিনি। দেখলাম, তুমি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছো না। বুঝলাম, স্পষ্ট করে বলতে তোমার নিশ্চয় কোন অসুবিধে আছে। বাস্, আর তা আমার জানবার কিছু রইল না।

বীথি—সত্যি বলছেন? আমার উপর একটুও রাগ হয়নি?

সিতাংশু—একটুও না।

বীথি—তবে অর্ধেক চা না খেয়ে চলে গিয়েছিলেন কেন?

সিতাংশু হাসে—তাই নাকি? সত্যি বীথি, আমার একটুও মনে পড়ছে না।

সিতাংশুর প্রাণটা যেন আয়নার মত মসৃণ ; তার উপর ধুলো পড়লেও সে ধুলো বসে থাকতে পারে না, ঝরে পড়ে যায়। সিতাংশুর আশার উপর যত আঘাত আর যে আঘাত পড়ুক না কেন, তার কোন ব্যথা মনের মধ্যে পুষে রাখে না সিতাংশু। যার আশার স্বপ্নটা ব্যস্ত হয়ে বীথির হাত ধরবার জন্য প্রায় বুকেরই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তুচ্ছ করে সরিয়ে দেবার আগে সামান্য একটা মুখের কথা বলে ক্ষমা চায়নি বীথি। বীথি সেজন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি। কিন্তু সিতাংশু আশ্চর্য হয়ে বলেছে—ক্ষমা? তুমি কী দোষ করেছো যে, তোমার ক্ষমা চাইবার দরকার হতে পারে?

বীথি—না বলে-কয়ে হঠাৎ যে সরে গেলাম, সেটা কী আমার দোষ নয়?

সিতাংশু—না, দোষ কেন হবে?

বীথি—যাকে সবচেয়ে বেশি আপন বলে মনে হয়েছিল, তাকেই পর করে দিলাম।

সিতাংশু হাসে—বেশ করেছিলে।

বীথি—তবে আমাকে পলাতকা বললেন কেন?

সিতাংশু—পালিয়েছিলে, তাই। কিন্তু সেজন্য আমি মনে করি না যে, তুমি ভয়ানক একটা দোষ করে ফেলেছিলে।

বীথির চোখ হঠাৎ ছলছল করে ওঠে।—আপনি একথা বলবেন, এতটা আমি আশা করতে পারিনি।

সিতাংশু—আমি তো বুঝি না বীথি, এ ছাড়া অন্য কথা কী আর বলতে পারা যায়। আমি শুধু বুঝি, তুমি এখানে ছিলে, মাঝে একটা বছর কোথায় যেন চলে গিয়েছিলে, আবার এখানে ফিরে এসেছো। আমারই তাই মনে হয়েছে, আমি এখন নিশ্চয় সেই আগের মত বীথির কাছে গিয়ে কথা বলতে আর চা খেতে পারি।

এক বছর অদেখার পর সিতাংশু আবার সেই ব্যাকুলতার প্রাণটি সঙ্গে নিয়ে বীথির চোখের কাছে এসে পৌঁছেছে। সিতাংশুর ভালবাসা কি সোনার মত একটা ধাতু? তাই এক বছরেও মরচে ধরলো না? এই বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে বীথির প্রাণ বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। এক বছর আগে শুধু আভাস পেয়েছিল বীথি, সিতাংশুর মুখের হাসিটা একটা আলোর আভা বলে মনে হয়েছিল, আজ বুঝতে পারা গেল, সে আলো পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না।

শুনে চমকে উঠেছে বীথি ; আর-একটা অজানা বিস্ময়ের কথা শুনতে হয়েছে। সিতাংশু বলেছে—সে পিয়ানো আজও বোবা হয়ে পড়ে রয়েছে।

বীথি—কোন্ পিয়ানো?

সিতাংশু হাসে—প্রায় এক বছর হলো, আমি সেই পিয়ানো কিনে নিয়ে ঘরে তুলেছি।

বীথির মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। ঠোঁট দুটো লালচে হয়ে কাঁপতে থাকে। অদ্ভুত একটা ব্যথা উতলা হয়ে বুকের ভিতরে ছুটোছুটি করে। বীথির জীবনটাকে অভ্যর্থনা করে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে, সিতাংশুর স্বপ্নটা স্তব্ধ হয়ে আর একটা বোবা পিয়ানো হয়ে আজও সিতাংশুর ঘরে পড়ে আছে। পলাতকার জন্য সিতাংশুর মনে কোন আক্ষেপ ছিল না, কিন্তু বীথিকে হারিয়ে ফেলবার দুঃখটাকে ছাড়তে পারেনি সিতাংশু। বোবা পিয়ানো নয়, সেটা সিতাংশুর প্রাণের একটা হতবাক্ দুঃখ।

কিন্তু সিতাংশু এখন একদিন স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করে ফেললেই তো পারে—কবে যাবে বল? আজ আর বীথির মনে কোন কুণ্ঠা নেই, স্পষ্ট করে উত্তরটা দিয়ে দিতে পারবে বীথি। পিছন থেকে কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা আজ আর বীথির আঁচল ধরে টানবে না, সরিয়ে নিয়ে যাবে

না।

লালপাড় গরদের শাড়ি, ঘাড়ের উপর এলিয়ে-পড়া ঢিলে খোঁপা, নীচের তলার ছোট ঘরে কোচের উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বীথি। কিন্তু বাড়িটার এই স্তব্ধতা সহ্য করতে আর একটুও ভাল লাগে না, ইচ্ছেও করে না। কান পাতলে দূরের গঙ্গার ভাঙা ঢেউয়ের ক্ষীণ শব্দটা এখানে বসে শোনা যায়, খিদিরপুর ডক থেকে ছাড়া পেয়ে একটা জাহাজ বোধ হয় চলে যাচ্ছে। কিন্তু বেহালার বাড়ির কোন মানুষের সাড়া শুনতে পাওয়া যায় না। বুঝতে পারে না বীথি, আর কতদিন এভাবে এই দুঃসহ স্তব্ধতার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

ছটফট করে নড়ে বসে বীথি, দরজার পর্দাটার দিকে তাকায়। বীথির গলার হারটা দুলে ওঠে, লকেটের পাথরও ছটফট করে দুলে ওঠে। কখন আসবে সিতাংশু? একটু নিয়মভঙ্গ করলে দোষ কী? রোজই বিকেল বেলাতে না এসে, হঠাৎ একদিন এই রকম একটি স্তব্ধ দুপুরবেলাতেও আসতে পারে না কেন?

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এইভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আর মাঝে মাঝে ছটফট করে বীথির অপেক্ষার প্রাণটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্তিটা যেন একটা ভীরু অভিমান। সিতাংশুকে আজ স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করতে হবে—আপনি কি জানেন না যে, একটা কথা আপনার এখন আমাকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া উচিত?

সিতাংশুর গাড়ি হর্ন বাজিয়ে ছুটে এসে এই ছোট ঘরের একেবারে গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকেই হেসে ওঠে সিতাংশু—এ কী? অপেক্ষা বোধ হয়?

বীথি—বুঝতে পারেন না?

বীথির হাত ধরে সিতাংশু—বুঝেছি, কিন্তু আর অপেক্ষা করবার কি কোন দরকার আছে?

বীথির মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। ঢিলে খোঁপাটা ভেঙ্গে ছড়িয়ে যায়। বীথি বলে—না।

সিতাংশু—তাহলে বল, কবে যাবে?

বীথি—তুমি যেদিন যেতে বলবে।

সিতাংশু—আমি বলছি, এই মাসটা শেষ হবার আগেই কোন একটা দিন।

বীথি—বেশ।

সিতাংশু—আমি তবে এখন আসি। কেমন?

বীথি—চা খাবে না?

সিতাংশু হাসে—না, আজ চা না খেলেও চলবে।

সিতাংশু চলে যায়। বীথিও উপরতলায় উঠে গিয়ে ঘরের ভিতরে মিররের কাছে দাঁড়িয়ে খোঁপা বাঁধতে থাকে। কিন্তু খোঁপার পিন দুটো কোথায়? পড়ে গেল কখন? পিন দুটো কি নীচের তলার ঘরে কাঠের হরিণের পায়ের কাছে পড়ে আছে?

গাড়ির শব্দ শুনে চমকে ওঠে বীথি। এগিয়ে যেয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়. একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঝড়ের পাখির মত ছিটকে এসে আবার ঘরের ভিতরে মিররের কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজা বন্ধ করে দেয় বীথি, যেন সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে এসে এইসব ছায়া বীথির ঘরে ঢুকতে না পারে। ট্যাক্সি থেকে নেমে যারা বারান্দার দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে, তারা একটা মিথ্যে পৃথিবীর কয়েকটা ছায়া-মানুষ।

দমদমের দেউলবাড়ির মানুষগুলি এসেছে। ভুবনবাবু আর নন্দা, সুজিত আর নিরুপমা, নিরুপমার কোলের সেই বিম্বিসারও এসেছে।

অনন্ত ব্যস্ত হয়ে উপরতলায় উঠে এসে আর চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে খবর শুনিয়ে দিল—দমদমের কুটুমবাবুরা এসেছেন, মা।

সুহৃদবাবু জয়া আর রমা, তিনজনের প্রাণ চমকে ওঠে আর ধড়ফড় করে। এ যেন একটা

নিশির ডাক, সত্যিই কেউ আসেনি। কিন্তু তিনজনেই নেমে এসে যখন নীচের তলার ঘরের ভিতরে ঢুকলেন, তখনও তাঁদের সাদা চোখের জাগা দৃষ্টিতে একটা ভয়ের আবেশ থমথম করে। সত্যিই, দেউলবাড়ির মানুষগুলি এসেছে।

ভুবনবাবু বলেন—আপনাদের চিঠিপত্র পাই না। তাই চিন্তায় থাকি ; জানতে পারি না, বীথি কেমন আছে।

নন্দা ব্যাকুল হয়ে জয়ার হাত ধরেন—তুমি জয়া, তুমি সেই জয়া!

বিম্বিসার নিরুপমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আর গুটিগুটি হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বারান্দার স্প্যানিয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিরুপমা—বীথিদিকে একটু খবর দিন, কাকিমা।

রমা—খবর দিতে পারি। কিন্তু বীথি কি আসবে? আসতে পারবে না মনে হয়।

সুজিত—এটা স্বাভাবিক। সঙ্কোচ তো হবেই। তবে...।

নিরুপমা—কতদিন দেখিনি, বীথিদিকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে, কাকিমা।

রমা—ঠিক কথা। কিন্তু...।

সুহৃদ—আমি একটি অনুরোধ করছি...।

কথা বলতে গিয়ে সুহৃদের গলার স্বর যেন শুকনো ছাই ছাই হয়ে উড়তে থাকে।—আমার অনুরোধ আপনারা বীথিকে এখন দেখতে চাইবেন না।

ভুবনবাবু—ঠিক আছে ; আপনারা বিব্রত হবেন না। বীথির যদি আসতে ইচ্ছে না হয়, তবে থাকুক। ওকে বিরক্ত করবার কোন মানে হয় না।

নন্দা তাঁর আঁচলে বাঁধা একটা কাগজের মোড়ক বের করে জয়ার হাতের দিকে এগিয়ে দিলেন—নাও জয়া। এটা হলো, আমরা একে বলি, বাসনাপঞ্চমীর তিল। মোড়কের মধ্যে তিল আছে।

জয়া—কি হবে এই তিল দিয়ে?

ভুবনবাবু হাসেন।—এটা হলো দেউলবাড়ির মজুমদারদের একটা পুরনো সংস্কার। স্বামীর মৃত্যুর এক বছর পরে একটি পঞ্চমী তিথিতে এক মুঠো তিল চন্দনের জলে ভিজিয়ে নিয়ে রাত্রিবেলা ঘরের ভিতরে একটা ডাবের উপর রেখে দিতে হয়। বিশ্বাস এই যে, মৃত স্বামীর আত্মাটি এসে সেই তিল ছুঁয়ে দিয়ে চলে যায়। বিধবা স্ত্রী সেই তিল তার শিয়রের কাছে অন্তত তিন রাত্রি রেখে দিয়ে ঘুমোবে। ফল এই যে, স্বামীর সঙ্গে এই জন্মে কিংবা পরজন্মে আবার দেখা হবে।

সুজিত—এটা একটা প্রথার প্রথা। শুনেছি, বাবার ঠাকুমা বিধবা হবার এক বছর পরে অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর ঘরের ভিতরে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। আর, সকাল হতেই দেখেছিলেন, শিয়রের কাছে এক মুঠো তিল পড়ে আছে ; তিলে চন্দনের গন্ধ।

সুহৃদের মুখে একটা করুণ হাসি ছলছল করে।—হ্যাঁ, একটা সংস্কার, একটা প্রথার প্রথা।

নন্দা—বীথি তো এল না। এলে, আমিই বলতাম। কাজেই জয়া তুমি বীথিকে বাসনাপঞ্চমী করতে বলে দিও। আমরা সবই করে রেখেছি, ডাব আর তিল ঘরের ভিতরে এক রাত রাখা হয়েছিল। বীথি যেন ঘুমোবার আগে এই তিল অন্তত তিন রাত্রি শিয়রে রেখে দেয়।

রমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন জয়া।—নন্দাদিকে তুমিই বলে দাও রমা, যা বলতে হবে।

রমা—কিছু মনে করবেন না, নন্দাদি ; আপনি কষ্ট করে এত দূর থেকে এসেছেন, কিন্তু এই তিল আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

নন্দা—অ্যাঁ! ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

সুহৃদ বলেন—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কিছু মনে করবেন না।

নীরব হয়ে গেল ঘরটা। ঘরের বাতাসও যেন স্তব্ধ। দেউলবাড়ির মানুষগুলি সত্যিই ছায়া, আর একটিও কথা বলতে পারে না।

ভুবনবাবু বলেন—আমরা তাহলে এখন উঠি, সুহৃদবাবু।

সুহৃদ উঠে দাঁড়ান।—হ্যাঁ, নমস্কার।

ভুবনবাবু—নমস্কার।

রমার চোখের পাতা ভিজে গিয়ে ভারি হয়ে যায়। ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না, ছায়ার মিছিলটা কত উদাস হয়ে আর কী রকমের শুকনো মুখ নিয়ে, আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

রমার মনের সব হিসাব হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল। উপরতলায় উঠে বীথির ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে ব্যাকুলভাবে ডাকতে থাকেন রমা—বীথি, ওরা সবাই চলে যাচ্ছে। তুমি অন্তত কাছে এসে একটা দেখা দিয়ে চলে যাও।

বীথি—না। অসম্ভব। তুমি ভয়ানক বাজে কথা বলছো, কাকিমা।

চোদ্দ

পর পর দু'দিন বেহালার এই বাড়িতে এসেছিলেন মঙ্গলা। বীথির সঙ্গে গল্প করে চলে গিয়েছেন। সুহৃদ আর রমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলবার সময় পাননি। মঙ্গলা খুব ব্যস্ত।

তারপর একদিন এসে বীথির কোন খোঁজ করলেন না। সোজা সুহৃদ আর রমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। রমা তাঁর মঙ্গলাদিকে জীবনে কখনও এত শক্ত হয়ে দাঁড়াতে দেখেননি। সর্বদা একটু কুঁজো হয়ে ঝুঁকে থাকে যাঁর শরীরটা, তিনি আজ কত সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। যে ভেলভেটের নরম চটি কোন শব্দ করে না, সেই চটিও যেন শক্ত হয়ে বেহালার এই বাড়ির সিঁড়িতে ঘষে ঘষে শব্দ করেছে।

মঙ্গলা বলেন—বীথি যে-কথাটা তোমাদের বলতে সাহস পাচ্ছে না, আর তোমরাও বীথিকে যে-কথা বলবার সাহস দাওনি, আমি আজ সেই কথাটাই বলতে এলাম সুহৃদদা।

সুহৃদ—বলুন।

মঙ্গলা—বীথির ইচ্ছে, সিতাংশুর সঙ্গে বীথির বিয়ে হোক।

সুহৃদ—হোক।

মঙ্গলা—সিতাংশুরও তাই ইচ্ছে।

সুহৃদ—বেশ।

মঙ্গলা—আজ আপনি বলছেন, বেশ ; কিন্তু একটা বছর আগে যদি একথা বলতেন, তবে বীথির ভাগ্যটাকে মিথ্যে ক'দিনের জন্য একটা নোংরা হয়রানি সহ্য করতে হতো না।

রমা—এসব কথা কেন আর তুলছেন, মঙ্গলাদি?

মঙ্গলা—চুপ কর। ভুল করলে দুটো কথা শুনতে হয়।

সুহৃদ হেসে ফেলেন—আপনার আর কী কথা শোনাবার আছে, বলুন।

মঙ্গলা—হাসবেন না সুহৃদদা। ভাল দেখায় না। দেখতেই তো পাচ্ছেন, মেয়ে হলো আপনাদের, আর আমি কোথাকার কোন্ এক মঙ্গলা, আপনাদের মেয়ের মঙ্গলের জন্য এখন আমাকেই সব কাজের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।

সুহৃদ যেন হঠাৎ বধির হয়ে গিয়েছেন। চেঁচিয়ে ওঠেন—কী বললেন?

মঙ্গলা—আমি দায়িত্ব নিয়েছি। আমিই শ্যামবাজারে গিয়ে মনোর সঙ্গে কথা বলেছি।

জানেন তো, আমার মনো ননদ হলেন সিতাংশুর মা।

সুহৃদ—জানি।

মঙ্গলা—আমিই গায়ে পড়ে সিতাংশুর সঙ্গে কথা বলেছি। যা জানবার সবই জেনেছি। যা বুঝবার ছিল সবই বুঝে নিয়েছি। এখন যা করবার আছে, তাই করে যাচ্ছি।

সুহৃদ—করুন।

মঙ্গলা—বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছি। এই বুধবার।

রমা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন। মঙ্গলা বলেন—তোমাদের তো কিছু করবার নেই। শুধু শুনে রাখ। বলবার ছিল, বিয়ে কিন্তু এবাড়িতে হবে না।

রমা—কেন?

মঙ্গলা—হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।

রমা—কেন?

মঙ্গলা—বীথির বিয়ের ভাগ্যের কথাটা যদি ধর, তবে এটা অপয়া বাড়ি।

সুহৃদের বুকের উপর যেন হাতুড়ির আঘাত পড়েছে। চেঁচিয়ে ওঠেন সুহৃদ—তবে পয়া বাড়ি কোনটা, বলতে পারেন?

মঙ্গলা—আমার বাড়ি। আমার চেষ্টাতে আমারই বাড়িতে দশটি বিয়ে হয়েছে। প্রত্যেকটি সুখের বিয়ে।

রমা—বেশ তো, না হয় আপনারই বাড়িতে বিয়েটা হবে। কিন্তু সেজন্য ওরকম ভয়ানক একটা শক্ত কথা কেন বলবেন?

মঙ্গলা—আমি বলছি বলেই কথাটা বোধ হয় তোমাদের কাছে খুব শক্ত বোধ হয়েছে। কিন্তু তোমাদের মেয়ে বীথি কী বলেছে, সেটা নিশ্চয়ই জান না।

রমা—কী বলেছে বীথি?

মঙ্গলা—বীথিরও ইচ্ছে নয় যে, এবাড়িতে বিয়ে হোক।

রমা—কেন ইচ্ছে নয়, সেকথা কি বীথি বলেছে?

মঙ্গলা—হ্যাঁ, বীথি বলেছে ভাল দেখায় না।

রমা—তাহলে তো ঠিকই, আর কোন কথাই নেই।

মঙ্গলা—কিন্তু তুমি বল তো রমা, তোমরাও কি সত্যি করে চাও যে, এবাড়িতে বিয়ে হোক? তোমরা কি খুব খুশি হয়ে বিয়ের দৃশ্যটা দেখতে পারবে? কিংবা বিয়ের দৃশ্যটা দেখে খুব খুশি হতে পারবে?

রমা—ওসব কথা থাক, মঙ্গলাদি।

চলে গেলেন মঙ্গলা। বীথির জীবনের সুখ আর মঙ্গলের জন্য যাঁর শুভ ইচ্ছাটা এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তিনি বুঝতে পারলেন না, তাঁর বুঝবার দরকারও নেই, এ-বাড়ির প্রাণটাকে তিনি কী ভয়ানক এক-একটা কথার নখ আর দাঁত দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন।— শুনছো রমা? ডাকতে গিয়ে হাঁসফাঁস করেন সুহৃদ।

রমা—কী বলছো?

সুহৃদ—বিশ্বাস করতে পারছো তো, বীথি আমাদের কেউ নয় ; আর, আমরাও বীথির কেউ নই?

রমা কোন কথা বলেন না। সুহৃদও কোন কথা জিজ্ঞেস করেন না। দুজনেই বুঝতে পেরেছেন, বীথির কথা ভেবে কোন কথা বলবার আর দরকার নেই। বললে, কথাগুলি হয়তো মিথ্যে কষ্টের চিৎকারের মত একটা ঠাট্টা হয়ে বেজে উঠবে।

এক-একটি দিন আসে আর চলে যায়। সকালে আর সন্ধ্যায় সুহৃদের সঙ্গে একই টেবিলের দু দিকে মুখোমুখি বসে চা খায় বীথি। কিন্তু বীথি কোন কথা বলে না, সুহৃদও না।

বেহালার বাড়িটা যেন এক-একটি নির্বাক দিবস পালন করে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

হিসেব রাখেন না সুহৃদ, রমাও, এইরকমের ক'টা নির্বাক দিন এল আর চলে গেল। একদিন সকালবেলা খবরের কাগজ হাতে তুলে নিয়েই বুঝলেন সুহৃদ, আজ বুধবার। খবরের কাগজটাকে তখুনি টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

দুপুরবেলা খাবার টেবিলের কাছে গিয়ে বসলেন সুহৃদ কিন্তু তখুনি উঠে পড়লেন। শরীর ভাল লাগে না, খেতে ইচ্ছে করে না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন সুহৃদ। ঘুমোতে চেষ্টা করেন; ইচ্ছে এই যে, ঘুমটা যেন এই বুধবারের রাতটা পার করে দিয়ে একেবারে সকালবেলাতে ভাঙে।

দিন শেষ হয়ে এল আঁধারিল ধরণী, ঠিক সেই সময় মঙ্গলার গাড়ির শব্দটা হন্তদন্ত হয়ে একেবারে বারান্দার কাছে এসে আছড়ে পড়ে।

উপরতলায় উঠেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন মঙ্গলা—কই রমা, তুমি কোথায়। জয়াদি, এদিকে একবার আসুন। সুহৃদদা, বাড়িতে আছেন তো।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন সুহৃদ আর রমা। জয়াও কম্বলের আসনটি হাতে তুলে নিয়ে চলে আসেন। মঙ্গলা বলে—রেজিস্ট্রার দত্তবাবু ঠিক সাতটার সময় আসবেন। বীথি জানে, বীথিকে আগেই ফোন করে বলে দিয়েছি। আমি এখন বীথিকে নিয়ে যাব।

ব্যস্তভাবে বীথির ঘরের ভিতরে ঢুকলো মঙ্গলা। বীথির একটা ব্যাগ নিজেই হাতে তুলে নিয়ে বের হয়ে এলেন। মঙ্গলার সঙ্গে বীথিও এসে বারান্দাতে দাঁড়ায়। হাত তুলে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে বীথি, হাতটা ভিজে গিয়েছে। জয়া সুহৃদ আর রমা, এক-একটি নিস্পন্দ মূর্তির কাছে এগিয়ে যায় আর প্রণাম করে বীথি।

মঙ্গলা ডাকেন—এস বীথি।

মঙ্গলা আর বীথির পায়ের শব্দ সিঁড়ি ধরে নেমে নেমে শেষে মিলিয়ে গেল। মঙ্গলার গাড়ির শব্দটাও গেট পার হয়ে চলে গেল। জয়া তাঁর কম্বলের আসনটি হাতে নিয়ে আবার নিজের ঘরে চলে গেলেন। শুধু সুহৃদ আর রমা বারান্দার উপর তেমনি নিস্পন্দ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর দুই চেয়ারে বসে রইলেন।

দেয়াল ঘড়ির শব্দটা বড় জোরে টিকটিক করে বাজছে বলে মনে হয়, কারণ এই সন্ধ্যাটাও একেবারে নির্বাক। দুজনে যেন শব্দহীন সমাধির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। ঘড়িটা মাঝে-মাঝে টুং-টাং মিষ্টি শব্দ শিউরে দিয়ে সময়ের হিসাবটা শুনিয়ে দিচ্ছে—সাতটা আটটা ন'টা। কিন্তু সুহৃদ আর রমা বোধ হয় শুনতেই পান না।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একবার চমকে উঠে ঘড়ির দিকে তাকালেন সুহৃদ। ঘড়ির কাঁটা তখন দশটার ঘরের কাছে এগিয়ে এসেছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুহৃদ। টলে টলে হাঁটতে থাকেন। বীথির ঘরের ভিতরে ঢুকে বীথির বিছানাটার উপর চুপ করে বসে থাকেন। রমা কাছেই দাঁড়িয়ে থাকেন। উঠে গিয়ে বীথির আলমারিটা খোলেন সুহৃদ। ভাঁজকরা শাড়ির উপর থাকের একটা শাড়ি তুলে নিয়ে পাড়টাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। বীথির টেবিলের দেরাজ টেনে চকোলেটের একটা প্যাকেট বের করে দেখতে থাকেন সুহৃদ, এগুলো বীথির কাশির চকোলেট। রমা এসে সুহৃদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

বীথির শেলফ থেকে একটা বই তুলে নিলেন সুহৃদ। বইটার শেষদিকের পাতার ভাঁজের মধ্যে রঙীন রেশমী সুতোর একটা ঝালর কুঁকড়ে রয়েছে। বোধ হয় বইয়ের শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারেনি বীথি।

বইটাকে হাতে তুলে নিয়ে আর নিজের ঘরে গিয়ে ডেকচেয়ারের উপর শুয়ে পড়েন সুহৃদ। বইয়ের শেষদিকের পাতাগুলিকে পড়ে পড়ে শেষ করে দিতে থাকেন।

পনের

হেসে উঠলেন হরিনাথ--ওদিকে অমন করে কী দেখছেন, দুলালবাবু? এদিকে দেখতে পাচ্ছেন না, আমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছি।

ঠিকই, গাড়ি থেকে নেমে দুলালবাবুর বাড়ির সামনের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন হরিনাথ। কী আশ্চর্য, হরিনাথের গাড়ির শব্দটা আজ কেন শুনতে পেলেন না দুলালবাবু!

দুলালবাবু—বুঝতে পারিনি স্যার, আপনি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

হরিনাথ—আমি কিন্তু আজ মাছ ধরতে আসিনি, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হবার কোন ইচ্ছেও আজ নেই।

দুলালবাবু—আপনি বোধ হয় আমার উপর একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

হরিনাথ—একথা আপনার মনে হচ্ছে কেন?

—আপনি অনেকদিন এদিকে আসেননি। তাই মনে হলো, হয়তো...।

—আমি ইচ্ছে করেই আসিনি। কিন্তু আজ আসতে হলো।

—এসে ভাল করেছেন, স্যার।

—তাহলে আপনি এখন দু চারটে ভাল খবর শুনিয়ে দিন।

—বলবার মত ভাল খবর তো কিছুই নেই, স্যার।

--কেন? আপনাদের ভুবনবাবুর দিগ্বিজয়ের কোন নতুন খবর নেই?

—আপনি দেখছি ভুবনবাবুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না।

—কী করে ভুলবো? আপনারা ভুবনবাবুকে মস্ত বড় একটা ব্যক্তিত্বের ম্যাজিশিয়ান বলে মনে করেন কেন? আমাকে তাই আপনাদের ভুল ভেঙে দেবার জন্য ভুবনবাবুর ভুয়ো গর্বটার অ্যানালিসিস করতে হয়।

—যেতে দিন ওসব কথা।

—আজ তো বলছেন, যেতে দিন ওসব কথা। কিন্তু সেদিন বিশ্রী রকমের তর্ক না করে আপনি আমাকে যেতে দেননি। মনে আছে, আপনি কী বলেছিলেন?

—ঠিক মনে নেই, স্যার।

—মনে আছে, আমি কি বলেছিলাম?

—না।

—আমি বলেছিলাম, দেখা যাক। এর মানে ; শেষটা কী দাঁড়ায়, সেটা দেখা যাক।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি একথা বলেছিলেন।

—এবার বলুন, শেষটা কী দাঁড়ালো? আপনাদের ওই ভুবনবাবু যাঁর পেটে নবান্ন সয় না, আপনারাই একথা বলতেন, যাঁর জীবন হলো সেকেলে একটা অপরিচ্ছন্নতা, আজ তাঁর মাথায় যে মস্ত একটা জয়মুকুট ঝকঝক করছে। খবরটা কি শোনেননি?

—আজ্ঞে?

—আপনার সবজান্তা ভাগ্নে দীপেন কি কিছু বলেনি?

—হ্যাঁ, বলেছে।

—কী বলেছে?

—সুহৃদ সেনের ভাইঝির সঙ্গে আপনারই ছেলে সিতাংশুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

—আর-একটা খবর শোনেননি?

—কী খবর?

—ভুবনবাবু গিয়েছিলেন সুহৃদ সেনের ভাইঝিকে দেখতে। সে মেয়ে আপনাদের পূজ্যপাদ ভুবন মজুমদারের সঙ্গে দেখা করেনি, তাড়িয়ে দিয়েছে।

—এখবর কিন্তু শুনিনি, স্যার।

—আমার কাছে এটা সত্যিই একটা বিস্ময়, দুলালবাবু। এধরনের মানুষ, যাদের সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কোন মেরুদণ্ড নেই, তারা হরিনাথ মিত্রের মত মানুষকে চ্যালেঞ্জ করে কিসের জোরে?

—আমি কিন্তু কোনদিনই বুঝতে পারিনি স্যার, ভুবনবাবু আপনাকে কখন চ্যালেঞ্জ করলেন।

—আমাকে মানে ঠিক আমাকে নয়। আপনি বুঝতে ভুল করছেন। ভুবনবাবু একালের মনুষ্যত্বটাকেই চ্যালেঞ্জ করে চলতে চেষ্টা করছেন। এটাই আমার আসল বক্তব্য।

—এসব খুবই জটিল তত্ত্বের কথা, স্যার। আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

—কিন্তু সেদিন তো খুব তর্ক করেছিলেন।

হাসতে চেষ্টা করেন দুলালবাবু।—ওটা ঠিক তর্ক নয় স্যার, খোলাখুলি দুটো কথা বলা, এই মাত্র।

—নাটকের শেষ অঙ্কের পর যবনিকা পতন হয়, জানেন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কিন্তু শেষ অঙ্কে কী দেখতে পাওয়া গেল? বলুন।

—আপনিই বলুন।

—বেচারা ভুবন মজুমদার নিজের মিথ্যের চাপে গুঁড়ো হয়ে গেলেন। এ যুগে ওরকম জীবন চলে না, ওরকম চরিত্রও চলে না। সুহৃদ সেনের ভাইঝিকে পুত্রবধূ করতে হলে অন্তত একটা হরিনাথ মিত্র হতেই হয়। আমার কথাগুলি শুনতে আপনার ভাল লাগছে না বলে মনে হচ্ছে?

—আপনি বলছেন, আমি শুনছি।

হেসে উঠলেন হরিনাথ ; মুক্ত ও দীপ্ত একটি বিপুল তৃপ্তির হাসি।—যাক, এবার যবনিকা পতন।

—আজ্ঞে?

—আমি আর আপনাদের এদিকে আসবো না। এটাই হলো যবনিকা পতন। যা দেখবার ছিল তার সবই শেষ পর্যন্ত দেখা হয়ে গেল।

গাড়িতে উঠে বসেন হরিনাথ। গাড়িও সেই মুহূর্তে ছুটে চলে যায়। অনুভব করতে পারেন হরিনাথ, এতদিনের একটা বিশ্রী অস্বস্তির ভার থেকে মনটা মুক্ত হয়ে গেল। শ্যামবাজারের সি-আই-টি রোডে মিত্র নিবাসের ফটকের কাছে এসে যখন গাড়িটা থামে, তখন ফটকের আলোটাকে বেশ উজ্জ্বল বলে মনে হয়। কল্পনা করলে ভুল হবে না, ওই আলোটাও যেন হরিনাথের অস্বস্তির ধুলোতে ঢাকা পড়ে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। আজ আর ধুলো নেই, তাই আলোটা স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে।

দোতলায় উঠে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ালেন হরিনাথ। তারপর মনোময়ীর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। দরজা বন্ধ। দরজার গায়ে দুটো টোকা দিয়ে নিয়ে ডাক দিলেন—আমি আসবো, মনো?

—হ্যাঁ।

ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করেন হরিনাথ—ওঘরের দরজাটা অর্ধেক খোলা কেন?

মনোময়ী—কোন্ ঘর?

—সিতুর ঘরের পাশের ঘর।

—সে ঘরে তো বীথি থাকে।

—থাকুক, কিন্তু দরজাটা অর্ধেক খোলা কেন?

—জানি না।
—ঘরের মেঝের উপর কে বসে আছে?
—বোধ হয় বীথি বসে আছে।
—কেন?
—তা কি করে বলবো?
—এসব কিন্তু খুব অপরিচ্ছন্ন অভ্যেস। পুত্রবধূকে একটু বুঝিয়ে বলে দিও, এরকম অভ্যেস ভাল নয়। এটা তো দমদমের দেউলবাড়ি নয় যে, মেঝের উপর বসবার কোন দরকার হবে।
—বসুক না ; তোমার বাড়ির মেঝেতে তো এক ছিটেও ধুলো নেই।
—কিন্তু ওরকমের অভ্যেসে ধুলো আছে।
—তাতে তোমার বাড়ির মেঝে কি ময়লা হয়ে যাবে?
—আঃ, মেঝেটা যে সত্যি ময়লা হবে না, সেটা তুমিও জান। কিন্তু মনের রুচিটা ময়লা হয়ে যেতে পারে।
—এটা কিন্তু আমি জানি না।
—সিতু কোথায়?
—হয়তো নিজের ঘরে আছে, হয়তো নেই। আমি জানি না।
—তাহলে বীথিকে কথাটা কে বুঝিয়ে বলবে?
—আমি বলতে পারবো না।
—তবে আমিই বলে দিই।
—পুত্রবধূর সঙ্গে এটাই বোধ হয় তোমার প্রথম কথা বলা হবে?
—না, আগে একবার বলেছি। কথা বলবার দরকার না থাকলেও কি কথা বলতে হবে?
—হ্যাঁ। কথা বলাটাই তো একটা দরকার।
—আমি তো দরকার ছাড়া তোমার সঙ্গে কোন কথা বলিনি।
হেসে ফেলেন মনোময়ী—তাতে আমার ভাগ্যটা যেমন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তোমার পুত্রবধূর ভাগ্যটা সেরকম পরিষ্কার না হলেই ভাল।
হরিনাথও হাসেন।—জানি না, ঠাট্টা করে বলছো, না খোঁটা দিয়ে বলছো। এসব তো তোমার পুরনো বাতিকের কথা ; নতুন কোন কথা নয়।...আচ্ছা, আমি যাই।
—কোথায়?
—আমার ঘরে।
—যাও, কিন্তু বীথিকে কিছু বলবে না।
—দরকার হলে বলবো। নইলে বলবো না।
চলে গেলেন হরিনাথ। বিছানা থেকে আস্তে আস্তে নামলেন মনোময়ী, গলাতে ওষুধ মাখানো মাফলারটা জড়িয়ে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে বীথির ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালেন।—বীথি, তুমি মেঝের উপর বসে আছো, দেখছি।
চমকে ওঠে বীথি। উঠে দাঁড়ায়। মনোময়ী বীথির চমকে-ওঠা মুখটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন।—মনে হয়, তুমি রোজই এরকম করে মেঝের উপর বসে থাক।
বীথি মাথা নাড়ে—না।
মনোময়ী—আজই এই প্রথম বসলে?
বীথি—হ্যাঁ।
মনোময়ী—পুরো একটা মাসও হয়নি, তুমি এখানে এসেছো। এরই মধ্যে মেঝের উপর বসে পড়লে!

আবার চমকে ওঠে বীথি। দুই চোখ টান করে মনোময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনোময়ী—মেঝের উপর বসে পড়তে আমার লেগেছিল পুরো তিনটি বছর, তোমার দেখছি পুরো একটা মাসও লাগলো না।

বীথি হাসতে চেষ্টা করে।—মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা।

মনোময়ীও হাসেন—বেশ ঠাণ্ডা আর বেশ পরিষ্কার, তাই না?

বীথি—হ্যাঁ।

মনোময়ী—আমার মনে হয়, তুমি রাত্রিতেও মেঝের উপর বসেছিলে।

বীথির দু চোখে ভীরু বিস্ময়ের একটা ছায়া ছমছম করে। উত্তর দেয় না বীথি। মনোময়ী তাঁর গলার স্বরে যেন একটা আদুরে আবেগ ঢেলে দিয়ে কথা বলেন—বল, আমাকে বললে দোষ হবে না।

বীথি বলে—হ্যাঁ।

মনোময়ী—এইতো! আমি এই ভয়ই করছিলাম যে, তুমি এই কথা বলবে। যাক, আমি কিন্তু তোমাকে আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করবো না। জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। আমার কিছুই করবার নেই। আমি একটি আধমরা মানুষ।

চলে যাচ্ছিলেন মনোময়ী। হঠাৎ ফিরে এসে আবার দরজার কাছে দাঁড়ালেন।—তবু বলছি, মেঝের উপর বসে কিংবা শুয়ে থাকবে না। এরকম বিশ্রী অভ্যেস করলে হয়তো বিশ্রী একটা অসুখে পড়ে যাবে। দেখছো না, আমার গলাতে ওষুধ-মাখানো কী চমৎকার একটা মাফলার?...হ্যাঁ, দরজাটা বন্ধ করে রাখবে।

মনোময়ী নিজেই হাত দিয়ে আধখোলা দরজার একটা কপাট আস্তে টেনে দিয়ে চলে গেলেন। আর ঘরের ভিতরে মেঝের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করে বীথি, এ কেমন হেঁয়ালি?

শুধু এইটুকু বোঝা যায়, মেঝের উপর বসে পড়লে এবাড়ির পরিচ্ছন্ন জীবনের নিয়মটা ব্যথিত হয়। দৃশ্যটা বাড়ির মানুষের সবারই চোখে বাধবে। সিতাংশুও দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছে—এ কী বীথি, ছি, লজ্জার কথা, তুমি মেঝেটার উপর বসে রয়েছো দেখছি।

কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলো না, কেন মেঝের উপর বসে আছে বীথি। খুবই পরিষ্কার এক-একটি সাদা প্রাণ বলতে হবে, জিজ্ঞাসা করে জানতে কিংবা খোঁজখবর করতে জানে না। এরা খুব কম কথা বলে, যেটুকু শুধু দরকারের কথা, শুধু তাই বলে। বাজে কথার সামান্য মুখরতা এখানে নেই। অযথাসময়ে কেউ এখানে বীথিকে ডাকে না, কিংবা বীথির ঘরের ভিতরে কেউ ঢোকে না। এবাড়ির কেউই ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে কারও জন্য ডাকাডাকি করে না। বাবুর্চি মধুসূদন ঠিক ঘড়ি-ধরা সময়ের সঙ্গে নিয়মরক্ষা করে ঘরের ভিতরে খাবার পৌঁছে দিয়ে যায়। কোর্ট থেকে ফিরে আসবার পর, চা-খাওয়া সেরে নিয়ে, সিতাংশু বীথির ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়েই বের হয়ে যায়। মঙ্গলবারে আর রবিবারে বীথিকে সঙ্গে নিয়ে ঠিক সন্ধ্যা ছটায় বেড়াতে বের হয় সিতাংশু। গাড়িটা ময়দানের সড়ক ধরে ছুটে গিয়ে একবার ইডেন বাগানের কাছে, একবার ভিক্টোরিয়া-স্মৃতির তাজমহলে বাড়িটার কাছে থামে। এক ঘণ্টা, তার বেশি নয়, সাড়ে সাতটার মধ্যে গাড়িটা ফিরে এসে মিত্র নিবাসের গ্যারেজের ভিতরে ঢুকে পড়ে।

এই এক মাসের মধ্যে বীথিও এবাড়ির পরিচ্ছন্ন জীবনের কোন নিয়ম ভাঙেনি। মঙ্গলা মাসিমা একদিন এসে মনোময়ীকে বলেছেন, দেখছেন তো মনোদি, বীথিকে এবাড়িতে কী সুন্দর মানিয়েছে।

কিন্তু আজ হঠাৎ এ কী হয়ে গেল! তখন অনেক রাত, সিতাংশুর চোখে তখন গভীর ঘুম, বীথি হঠাৎ ভয় পেয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো ; তারপর বিছানা থেকে নেমে এসে

মেঝের উপর চুপ করে বসে রইল।

কালকের রাতটার পর আজ আবার এই সন্ধ্যাবেলাতে সাড়ে ছটা বাজতেই সিতাংশু যখন বাইরে বের হয়ে গেল, তখন আবার, আনমনার মত নয়, ইচ্ছে করেই মেঝের উপর বসে পড়েছে বীথি।

এখন ভাবতে গিয়ে বীথির প্রাণটা যেন অবুঝ বিস্ময়ের একটা জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করে—কেন এমন ইচ্ছেটা হলো।

খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় বীথি। আগে দেখেছে, আজও আবার দেখছে বীথি, এ-বাড়ির গা-ঘেঁষে কোন গাছের বাগান নেই, বুড়ো-বুড়ো জারুল আর পাকুড়ের ভিড় নেই, কাজেই কোন বাজে গল্পের ভূতুড়ে হল্লা এবাড়ির গা-ঘেঁষে ছুটোছুটি করে না।

মঙ্গলা মাসিমার বাড়িতে বিয়ের খাতা সই করবার পর বিয়ে যখন হয়ে গেল, রেজিস্ট্রার দত্তবাবু চা-মিষ্টি খেয়ে চলে গেলেন, তখন সিতাংশু আর বীথিও চা-মিষ্টি খেয়ে সোজা এই বাড়িতে চলে এসে দোতলার এই ঘরেই ঢুকেছিল। শাঁখের চিৎকার ছিল না, ধানদূর্বার দুরন্ত ছড়াছড়ির উপদ্রব ছিল না, পিদিম নিয়ে কোন রঙীন কুলো এসে বীথির কপালে ঠোকর দেয়নি।

সেদিন মঙ্গলা মাসিমা সঙ্গে এসেছিলেন। দোতলার এই করিডরের উপর দাঁড়িয়ে মঙ্গলা মাসিমা ডাক দিয়েছিলেন—কই হরিনাথদা? কই মনোদি? আপনারা একবার বের হয়ে আসুন, দেখুন।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে সিতাংশু ও বীথির মুখের দিকে তাকালেন হরিনাথ। হাসলেন হরিনাথ, স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ একটি তৃপ্তির হাসি। বীথিকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাল আছ?

বীথির লাজুক হাসির মুখটা লালচে হয়ে ওঠে।—হ্যাঁ।

হরিনাথ—আরে না না, প্রণাম করতে হবে না। ওসব পুরনো প্রথার ঝঞ্ঝাট আমার এখানে নেই।

মঙ্গলা বলেন—করুকই না, এই একটি দিনই তো।

হরিনাথ হাসেন—করুক তাহলে। কিন্তু এধরনের শিরদাঁড়া নুইয়ে ব্যক্তিপূজার কোন মানে হয় না। আমি পছন্দ করি না।

মনোময়ীকে বীথি প্রণাম করতেই তিনি একবার চোখ মুছে নিলেন, তারপর হাসলেন। তারপর বীথির মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, বললেন—ভাল থাক।

সেদিন তো বীথির মুখেও একটি নিবিড় হাসির আরক্ত স্নিগ্ধতা ছিল। এই ঘরের ভিতরে ঢুকে আর সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে বীথির মুখের সেই নিবিড় হাসির স্নিগ্ধতা আরও আরক্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তারপর একটি দিন পার হতেই চমকে উঠেছিল বীথি। ভাষা নেই, যেন কলের মত একটা হাত বীথির হাত চেপে ধরেছিল। ভাষা না হয় নেই, কিন্তু প্রাণও নেই নাকি?

তবু এক মাস ধরে বীথির প্রাণটা যেন সব নিঃশ্বাসের জোর দিয়ে এই হাসিটাকে চোখের ও মুখের উপর ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ কী হলো? কাল রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে এই এক মাসের পোষমানানো হাসিটা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরে শুকনো ধুলোর ভয়ানক একটা ঝড়ের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। কী আশ্চর্য, ধুলো এত শুকনো হতে পারে, আর পৃথিবীতে এত শুকনো ধুলোও থাকতে পারে!

তাই বোধ হয় বীথি হঠাৎ ভয় পেয়ে আর ছটফট করে বিছানা থেকে নেমে মেঝের উপর বসে পড়েছে। এই শুকনো ধুলোর ঝড়টা থামুক, তারপর না হয়...।

না, আর বিছানাতে উঠতে পারেনি বীথি। ঝড় থামেনি। থামছেও না। আজ এখন এই সন্ধ্যাবেলাতে ঘরের জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেও বুঝতে পারে বীথি, বুকের

ভিতরে ধুলো উড়ছে। এর মানে কি?

আজ সিতাংশুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হাসতে পারেনি বীথি। কিন্তু না হাসতে পারলে চলবে কি করে? এই তো মাত্র একটা মাস, বাকি জীবনটা পড়েই আছে।

ওদিকের ঘরে বোবা পিয়ানোটা বোবা হয়েই পড়ে আছে। ওটাকে বাজিয়ে সুরের সোর মাতিয়ে তুললে নিশ্চয় বীথির মুখের মরা হাসিটা আবার বেঁচে উঠবে।

পিয়ানোর কাছে এগিয়ে যেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বীথি। বুঝতে পারে, ভুল আশা করা হয়েছে। হাসতে না পারলে এই পিয়ানোকে বাজাতে পারা যাবে না। কিন্তু না, ভয় পেলে চলবে না। জোর করে এই ভয়ানক শুকনো ধুলোকে সরিয়ে দিতে হবে। হাসতেই হবে। দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়, তারপর করিডর পাব হয়ে একেবারে কিচেনের কাঁচের দরজাটার কাছে গিয়ে ডাক দেয়—মধুসূদন।

কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে এসেই চমকে ওঠে মধুসূদন। চমকে ওঠবারই কথা। বউদি কিচেনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, দৃশ্যটা এবাড়িতে ভয়ানক একটা নিয়মভঙ্গ ভুলের দৃশ্য বৈকি।

মধুসূদন বলে—আজ্ঞে?

বীথি—আজ থেকে আমার খাবার আমার ঘরে দেবে না।

মধুসূদন—আজ্ঞে, কী বললেন?

বীথি—তোমার দাদাবাবুর ঘরে যখন খাবার নিয়ে যাবে, তখন আমারও খাবার নিয়ে গিয়ে দাদাবাবুর ঘরে টেবিলে রাখবে।

মধুসূদন আশ্চর্য হয়ে আর দুই চোখ বড় করে নিয়ে বিড়বিড় করে।—আজ্ঞে, তাই করবো।

ষোল

সোজা ভাষায় হিসেব করলে বলা যায়, মাত্র দুটি মাস। কিন্তু সেটা তো কয়েক লক্ষ মুহূর্ত। আরও দুটো মাসের কয়েক লক্ষ মুহূর্ত ফুরিয়ে গেল, কিন্তু বোবা পিয়ানো আর মুখর হয়ে উঠলো না। বীথির মুখের মরা হাসিটাও আর বেঁচে উঠলো না। কিন্তু সেজন্য সিতাংশুর মুখে কোন জিজ্ঞাসা নেই, চোখেও কোন জিজ্ঞাসা নেই। সিতাংশু বরং শান্ত হাসি দিয়ে জড়ানো একটা কথা এই দু মাসে অন্তত তিনবার বলেছে।—মঙ্গলা মাসি ঠিক বলেছে বীথি। আমি যা চেয়েছিলাম ঠিক তাই পেয়েছি, আর তুমি যা চেয়েছিলে, ঠিক তাই পেয়েছো।

সেদিন সিতাংশুর ঘরের ভিতরে একই টেবিলে বীথির আর সিতাংশুর খাবার রেখে দিতে ভুলে যায়নি বাবুর্চি মধুসূদন। বীথিও হেসে হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকে খাবার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে উঠলো সিতাংশু—একী? মধুসূদনের মাথায় পোকা ঢুকেছে মনে হয়।

বীথি—কী বললে!

সিতাংশু—মধুসূদন ভুল করে তোমার খাবার আমার ঘরের টেবিলে দিয়ে গিয়েছে।

বীথি তখুনি ঘরের বাইরে এসে বাবুর্চি মধুসূদনকে ডাক দিয়ে বলে দিয়েছিল—আমার খাবার আমার ঘরের টেবিলে রেখে দাও।

সে-রাতের সে-খাবার হাত দিয়ে একটু ছোঁয়ওনি বীথি। পুড়ে গিয়েছে মুখের হাসিটা। সেই সঙ্গে মুখটাও যেন পুড়ে গিয়েছে। চেষ্টা করলেও খেতে পারা যাবে না।

একদিন অবশ্য নিজের মনে হেসে উঠতে হয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত চেহারার একজন বীথিকে দেখতে হয়েছিল। চোখ দুটো খটখটে হাড়ের দুটো কোটরের

ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। গলাটা চুপসে গিয়েছে। চোয়ালের কোণদুটো ঠেলে উঠেছে।

একদিন আনমনার মত আস্তে আস্তে সিতাংশুর ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো আর দাঁড়িয়ে রইল বীথি।

সিতাংশু হাসে।—কী ব্যাপার? অসময়ে? কী মনে করে?

প্রাণের সব শক্তি নিয়ে হাসতে চেষ্টা করে বীথি—মঙ্গলা মাসিমা বলছিলেন, আমি নাকি বেশ রোগা হয়ে গিয়েছি।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় সিতাংশু।—সেজন্য চিন্তা করবার কি আছে? ডাক্তার চক্রবর্তীকে একবার ফোন করে খবর দাও।

আর কোন কথা বলেনি বীথি। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের একটি স্বচ্ছ হাসির মূর্তি ব্যস্ত হয়ে একগাদা দরকারী কাগজের ফাইল বাঁধা-ছাঁদা করছে। একটি পরিচ্ছন্ন সাদা প্রাণ, কাঁচের মত মসৃণ, তার উপর কোন আঁচড় পড়তে পারে না।

বিয়ের আগে বেহালার বাড়ির নীচের তলার ছোট ঘরে, কাঠের হরিণটার পাশে বসে এই ভদ্রলোক যে-কথা বলেছিল, সেটা ঠিক কথা, একটু মিথ্যে কথা নয়। বীথিকে পেলেই ভদ্রলোকের সব পাওয়া হয়ে গেল। ভদ্রলোক শুধু এক বীথিকেই বুঝেছে। বীথিকে তার খুবই দরকার। নিয়মমত দিনে সময়মত দরকার। দরকারের দাবিটাও খুব পরিচ্ছন্ন, একটি পরিষ্কার ইসারা। তার মধ্যে কোন গল্প নেই, কথা নেই। সে দাবিটা কানের কাছে গুঞ্জন করে না, এক হাতে গলা জড়িয়ে ধরে আর এক হাতে খোঁপার পিন তুলে নামিয়ে রাখে না।

ঘেন্না পেয়ে দম বন্ধ করে রেখেছে বীথি। কপালটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। মনে হয়েছে, বুঝি এই দুঃসহ যন্ত্রণার রক্তটাই ঘাম হয়ে বীথির কপালটাকে পিছল করে দিয়েছে। বীথির দু চোখে চাপা আগুনের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। বিছানা থেকে নেমে মেঝের উপর বসে পড়েছে বীথি।

এই দু মাসের মধ্যে বার বার কতবারই তো এভাবে এক-একটা রাতের ঘেন্নার ভয়ে আর যন্ত্রণায় মেঝের উপর বসে থাকতে হলো। বড় শক্ত আর বড় ঠাণ্ডা মেঝে, শুধু বসে থাকতেই পারা যায়, শুয়ে পড়তে পারা যায় না।

এখানে কেউ তো এখন কাছে এসে, চমকে উঠে, লজ্জা পেয়ে আর মায়া করে, নিজের হাতে মেঝের উপর একটা বিছানা পেতে দিয়ে সাধবে না, শুয়ে পড় বীথি।

বেহালার বাড়িতে মা এখন নিশ্চয় কোন স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠছে না। কোন স্বপ্নেও দেখতে পাচ্ছে না যে, বীথি এখন সাদা বালুর একটা মরুভূমির মধ্যে একা বসে রয়েছে।

বীথি কিন্তু নিঝুম হয়ে বসে আর জাগা চোখেই স্বপ্ন দেখতে পারে। লতা পাতা ও ছায়াতে ভরাট একটা বাগান। সকালবেলার ঘন কুয়াশাতে ভিজে গিয়ে সে বাগানের চেহারা আরও সবুজ হয়ে যায়। গাছের ডালে অতিথি নীলকণ্ঠ বসে থাকে। পুরনো দোলমঞ্চের গায়ে একশো বছর আগের আবীরের দাগ এখনও লাল হয়ে রয়েছে। বীথিকে আদর করে পাগল করে দেবার জন্য সে বাগানের সব পাখি ডাকছে—বীথি বীথি বীথি।

মাথার ভার দু'হাতে ধরে রেখে হাঁপাতে থাকে বীথি। রূপকথার ছবির মত এরকম একটা স্বপ্নের ছবি দেখেও বুকটা এরকম করে হাঁপাচ্ছে কেন? এটা আবার কোন্ শূন্যতার শাস্তি? সহ্য হয় না যে! শাস্তিটা যেন এক রাক্ষুসী ঠগিনীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চাইছে। ভালই করছে। তাই তো করা উচিত।

সহ্য করতে আর সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারা যাবে কি? না, শেষ পর্যন্ত ঘুমের বড়ি যোগাড় করতে হবে? যে সেখানে সোনালী রাংতা হয়ে পড়ে থাকতে পারেনি, সে কি এখানে একটু শুকনো কাঠের টুকরো হয়ে পড়ে থাকতে পারবে?

আজ সকালবেলা ঘরের ভিতরে চেয়ারের উপর বসে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার পর যখন

চোখ খোলে বীথি, তখন শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে। বীথিরই ঘরের বাইরে দরজার কাছে করিডরের উপর পায়ের শব্দ ছুটোছুটি করছে। কে যেন খুব আস্তে একটা কথা বলে উঠলো --ও কী হচ্ছে? ছিঃ। মনোময়ীর গলার স্বর বলেই তো মনে হয়।

দরজা খুলেই দেখতে পায় বীথি, দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ির কর্তা মানুষটি, হরিনাথ। সাদা ফ্লানেলের পায়জামা আর ঢিলে গাউন, সাদা সিল্ক-দড়ির কোমরবন্ধ। খবরের কাগজটাকে পাকিয়ে ছোট একটা লাঠির মত করে নিয়ে দেয়ালের মাথার দিকে তাক করে হাতে ধরে রেখেছেন, কী যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন হরিনাথ। চাকর বীরবাহাদুরের হাতে একটা বাঁশ আর বাবুর্চি মধুসূদনের হাতে একটা ঝাঁটা।

দেয়ালের মাথার দিকে বেশ উঁচুতে মস্ত একটা প্রজাপতি পাখা ছড়িয়ে বসে আছে। খয়েরী রঙের পাখা, তার উপর হলুদের ছিটে। বীরবাহাদুর বাঁশ তুলে প্রজাপতিটাকে বারবার খোঁচা দিচ্ছে, কিন্তু উড়ে পালিয়ে যায় না প্রজাপতি। দেয়ালের গায়ে এখান থেকে সরে গিয়ে আবার ওখানে বসছে।

হরিনাথ বললেন--সাফ ক'রে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চি মধুসূদন ঝাঁটা ছুঁড়ে প্রজাপতিটাকে নামিয়ে দিল। ঝাঁটার সঙ্গে জড়িয়ে ভাঙা-পাখা তিন-টুকরো প্রজাপতিটা ঝুপ করে মেঝের উপব পড়লো। দেয়ালের পরিষ্কার ডিসটেম্পার, যেন মসৃণ আইভরিফিনিশ। দেয়ালের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হরিনাথ এইবার বীথির মুখের দিকে তাকালেন ও হাসলেন।--একটা প্রজাপতি, বড়-রকমের কোন আবর্জনা নয় বটে, কিন্তু তবু আজ যদি একটা ছোট আবর্জনাকে কিছু-নয় বলে মনে কর আর ছেড়ে দাও, কাল একটা মস্ত-বড় কদর্য আবর্জনাকে কিছু-নয় বলে মনে করবার আর ছেড়ে দেবার অভ্যেস দাঁড়িয়ে যাবে। অভ্যেসটাই কদর্য হয়ে যাবে।

চলে গেলেন হরিনাথ। চলে গেল চাকর বীরবাহাদুর আর বাবুর্চি মধুসূদন। ওদিকের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মনোময়ী এইবার বীথিব মুখের দিকে তাকালেন আর হাসলেন--কাঁকড়াবিছে নয়, একটা প্রজাপতি। কিন্তু এদের কাছে দুই-ই সমান।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, আর একটা চেয়ারের কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে বীথি। চোখে যেন কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বরফের সাদা দেখে দেখে মানুষের চোখ নাকি অন্ধ হয়ে যায়। এ বাড়ির পরিষ্কার সাদা প্রাণের চেহারা দেখে দেখে বীথির চোখও বুঝি অন্ধ হয়ে যেতে চলেছে।

না, আর সহ্য করতে পারা যায় না। সহ্য করতে একটুও ইচ্ছে করে না। জ্বলে জ্বলে পুড়তে থাকে বীথির চোখ দুটো। তবু হঠাৎ চোখে পড়ে, এই ঘরের দেয়ালের গায়ে আইভরি ফ্রেমের মধ্যে একটা ফটো, বীথিরই ফটো। ওটা একটা আবর্জনা। এবাড়ির মানুষ একদিন অনায়াসে ঝাঁটা ছুঁড়ে এই আবর্জনাকে নামিয়ে আর সরিয়ে দিতে পারবে। আরও অনায়াসে হেসে উঠতে পারবে। ফটোটাকে নামিয়ে নিয়ে টেবিলের দেরাজের ভিতরে ফেলে দেয় বীথি।

তারপর চেয়ারের উপর নিথর হয়ে বসে থাকে বীথি। কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত আর খুব শান্ত এই শরীরটার যেন কোন ভার নেই। চোখ দুটো অপলক হয়ে তাকিয়ে আছে। এ যেন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন আবেশ। বেলা একটার শব্দ বাজে, আর বাবুর্চি মধুসূদন খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে।

বীথি বলে--খাব না।

সে আবেশ আর-একবার ভাঙে সন্ধ্যা হতেই যখন অন্ধকারে ভরা ঘরে বীথির মুখের উপর জানালার লোহার গ্রিলের ছায়াটা লোহার আলপনার মত শক্ত হয়ে বসেছে, তখন ঘরে ঢুকে আর আলো জ্বেলে হেসে ফেলে সিতাংশু।--ধ্যান করছো মনে হচ্ছে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বীথি।--হ্যাঁ।

সিতাংশু—বেশ। আমি এখন যাচ্ছি, সাড়ে ছ'টার আগেই আসবো।

বীথি—কেন?

সিতাংশু—ভুলে গেলে নাকি? আজ মঙ্গলবার। বেড়াতে যেতে হবে না?

বীথি—না।

সিতাংশু—কেন?

বীথি—জিজ্ঞেস করো না। জিজ্ঞেস করা তোমাদের বাড়ির নিয়ম নয়।

বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সিতাংশু।—তুমি খুব অদ্ভুত কথা বলছো।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে সিতাংশু ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—আমি আসি। এখন আমার সময় নেই। কিন্তু ফিরে এসে জিজ্ঞেস করবো। খুব স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন দরকার নেই।

চলে গেল সিতাংশু। কিন্তু বীথির চোখে কোন আতঙ্ক নেই। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বীথি। পা টলে না। সাড়ে ছ'টা হতে আর কতক্ষণ? বোধহয় আর মাত্র একটি ঘণ্টা। খুব স্পষ্ট একটা জিজ্ঞাসা এসে বীথির ভাগ্যটার কাছে কৈফিয়ত চাইবে।

মনে পড়ে বীথির, কাকিমা'র কাছে একদিন বেশ অদ্ভুত একটা কথা বলছিল মা ঃ সব নদীর জলে নয়, এক-একটা নদীর জলে সত্যিই পুণ্যি আছে। স্নান করলে শুধু শরীরের জ্বালা নয়, মনের জ্বালাও জুড়িয়ে যায়।

ঘরের ভিতরে একঠাই দাঁড়িয়ে থেকেও ছটফট করে বীথি। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সময়ের ভুল করা সিতাংশুর অভ্যেস নয়। যখন সাড়ে ছ'টা সন্ধ্যাবেলার আলো-ঝলমল মিত্রনিবাস খুবই শব্দহীন, তখন সিতাংশুর পায়ের শব্দটা সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠে বীথির ঘরের দরজার কাছে থেমে যায়। ঘরে ঢুকেই কথা বলে সিতাংশু—আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই...।

সিতাংশুর জিজ্ঞাসার ভাষাটা হঠাৎ নীরব হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ঘরের চেয়ারে চুপ করে বসে থাকবার পর উঠে দাঁড়ায় সিতাংশু। ঘর থেকে বের হয়ে মনোময়ীর ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে দরজাতে হাত ঠুকে শব্দ করে আর কথা বলে—মা, শুনছো?

—বল।

—বীথি কোথায়?

—আমি কী ক'রে বলি?

—তবে কে বলবে?

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন মনোময়ী—কী হয়েছে?

সিতাংশু—বীথিকে দেখছি না।

মনোময়ী—এরকম কেন হলো?

—হোক, সেজন্যে কিছু আসে-যায় না। আমার শুধু স্পষ্ট করে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল। একটু জেনে নেবার দরকার ছিল। কোন গোলমাল পুষে রাখবার তো কোন মানে হয় না। পরিষ্কার করে চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।

—বুঝলাম না।

—বীথির যদি এখানে থাকা পছন্দ না হয়, তবে থাকবে না। আমার কোনই আপত্তি নেই। আমিও তাই চাই।

—বিয়ে বাতিল করে দিতে চাও?

—চাই বৈকি।

—বেশ তো, কিন্তু বীথির খোঁজ নেবে তো।

—না। কী দরকার?

—তাহলে আমিই খোঁজ করি।

—তোমার ইচ্ছে।

—মনোময়ীর বুকটা ধুঁকছে, হাঁটতে গিয়ে বারবার কুঁজো হয়ে যাচ্ছেন। চশমাটা খুলে গিয়ে একটা কানের সঙ্গে লেগে ঝুলতে থাকে। তবু টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিলেন। হাত কাঁপে, গলার স্বর কাঁপে। একবার মঙ্গলাদিকে, একবার বেহালার বাড়িতে রমাকে ডেকে কথা বলেন মনোময়ী। কিন্তু না, বীথি ওই দুই বাড়ির কোন বাড়িতেই যায়নি।

সিতাংশু—ঠিক আছে।

মনোময়ী—না, ঠিক নেই।

—কী ঠিক নেই?

—বীথির খোঁজ নিতে হবে।

—কে খোঁজ করবে?

—তুমি।

—কোথায় খোঁজ করবো? বলতে পার?

—পারি।

—বল।

—দমদমের ভুবনবাবুর বাড়িতে।

—বীথি যদি ওখানে গিয়ে থাকে, তবে তো বোঝাই গেল, বীথি এ বাড়ির কেউ নয়। পরিষ্কার হয়েই গেল। খোঁজ করবার কোন মানে হয় না।

—তবু তুমি একবার যাও।

—তুমি ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলছো।

—আমি তো জীবনে তোমাকে কোন ভাল কথা বলতে পারিনি। আজ বলছি। তুমি একবার সেখানে যাও।

—গিয়ে কি হবে?

—ওই যে, তুমিই বললে, বীথিকে স্পষ্ট ক'রে কী কথা জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করে এস।

নীরব হয়ে দাঁতে-দাঁত চেপে আর দুই চোয়াল শক্ত করে নিয়ে, খুব হিসেব করে কী যেন ভাবতে থাকে সিতাংশু। মনোময়ী বলেন—দমদমের দেউলবাড়ি, রায়কুঠি পাড়া।

সিতাংশু—তা হ'লে যাই, পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আসি।

মনোময়ী—হ্যাঁ।

সতের

দমদম দেউলবাড়ির ফটকের ভাঙ্গা থামের কাছে একটা ট্যাক্সির শব্দ এসে থেমে গেল, আবার চলে গেল। তার একটু পরেই হাতের বইটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ডাক দিলেন ভুবনবাবু—দেখ তো সুজিত, কে যেন ভিতরে চলে গেল।

সুজিত চমকে উঠে ডাক দেয়—দেখ তো নিরু, কে যেন ভিতরে গেল।

নন্দা বলে উঠলেন—কে? কে এলো? ও ঘরে ঢুকছে, কে এই মেয়ে?

বীথি ততক্ষণে ঘরের ভিতরে ঢুকে খাটের উপর পাতা মাদুরটার উপর লুটিয়ে পড়েছে।

ভুবনবাবু, তাঁর সঙ্গে নন্দা সুজিত আর নিরুপমা ছুটে এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকেই

একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

যেন ঘরের বাতাসটাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে আর মাথাটাকে মাদুরের উপর ঝুঁকিয়ে দিয়ে বীথির শরীরটা কাঁপছে। বীথির নিঃশ্বাসটা ফুঁপিয়ে উঠে কথা বলছে।—এই তো আমি এসেছি।

দেউলবাড়ির স্তব্ধ মানুষগুলির চোখগুলো ঝাপসা হয়ে ছটফট করে। কিন্তু সব চেয়ে শক্ত মানুষ যিনি, ভুবন মজুমদার, তাঁর দু'চোখের জল একেবারে দুটো ধারা হয়ে ঝরে পড়ে তাঁর ফতুয়ার বুকটাকে ভিজিয়ে দিতে থাকে। সুজিত ডাক দেয়—নিরু, চুপ করে দেখছো কি? বীথিকে দেখ।

নিরুপমা এগিয়ে যেয়ে বীথির হাত ধরতেই ঘরের বাইরে চলে গেলেন ভুবনবাবু, নন্দা আর সুজিত।

দেউলবাড়ির বাতাসে আবার সেই ব্যস্ত-ব্যাকুল কলরব ছুটোছুটি করে। সুজিত চেঁচিয়ে ডাক দেয়—মা, নিরুকে বীথির চোখমুখ ধুয়ে দিতে বল।

ভুবনবাবু বলেন—উঠোনে একটা মাদুর পেতে দেবে কে?

সুজিত—আমি।

ভুবনবাবু—দাও ; বাইরে কী সুন্দর জ্যোৎস্না। এখন আর ঘরের ভিতরে নয়। নিরুকে বল, বীথিকে নিয়ে উঠোনে বসে গল্প-সল্প করুক।

নন্দা—তাহলে চায়ের জল আমিই চড়িয়ে দিই।

সুজিত—না। আমি চা করে দিচ্ছি। তুমি দেখ, ঘরে খাবার-টাবার কী আছে।

উঠোনে মাদুরের উপর বসেও নিরুপমার হাতটা ধরে থাকে বীথি। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। বিম্বিসার এসে বীথির কাছে দাঁড়িয়েছে! হাত বাড়িয়ে বিম্বিসারকে কাছে টেনে নিয়ে হাসতে থাকে বীথি—কী আশ্চর্য, বিম্বিসার কত বড় হয়ে গিয়েছে।

ভুবনবাবু ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে, উঠোনের মাদুরের কাছে দাঁড়িয়ে, বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—তুমি তো এলে, কিন্তু আমাদের ছেলে কোথায়?

চমকে ওঠে বীথি ; ভুবনবাবুর কথার শব্দটা যেন বাজের শব্দের মত বীথির বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে দিয়েছে। সব জ্যোৎস্না এক মুহূর্তে নিবে গিয়েছে।

ভুবনবাবু বলেন—তোমার সঙ্গে আমাদের ছেলেটি এলে আরও ভাল হতো। আমরা সবাই আরও খুশি হতাম।

বারান্দাতে দাঁড়িয়ে কথা বলে সুজিত—এখানে আসতে সিতাংশুর সঙ্কোচ বোধ করবার তো কোন মানে হয় না।

বীথির চোখের উপর সব জ্যোৎস্না এক মুহূর্তেই আবার ভেসে ওঠে। দেখতে পায় বীথি, ভুবনবাবুর চোখ-মুখ হাসছে।

নিরুপমা—সত্যি বীথিদি, সিতাংশুবাবুকে নিয়ে এলে না কেন?

কথা বলে না বীথি। ভুবনবাবু হাসেন—থাক, তাতে কী হয়েছে? বীথি আবার যেদিন আসবে, সেদিন সিতাংশু-ও আসবে।

বীথি—আমি এখানেই থাকবো।

ভুবনবাবুর হাস্যোচ্ছল মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। সুজিত এগিয়ে এসে হাসতে থাকে।—আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাবা ; বীথি নিশ্চয় সিতাংশুকে না বলে চলে এসেছে।

ভুবনবাবু—সে কী কথা?

সুজিত—নিশ্চয় সিতাংশুর সঙ্গে বীথির কথা কাটাকাটি হয়েছে।

নিরুপমা ছটফটিয়ে হাসতে থাকে।—অভিমান হয়েছে।

সুজিত—আঃ, তুমি ওরকম ভাষায় কথা বলো না, নিরু।

হেসে ফেলেন ভুবনবাবু—না না, ওসব কোন কথাই নয়। কিন্তু সিতাংশুকে না বলে এখানে চলে এসে তুমি খুব অন্যায় করেছো, বীথি।

সুজিত—আমি সিতাংশুকে ফোন করে বলে দিচ্ছি, বীথি এখানে আছে ; চিন্তা করবার কিছু নেই।

বীথি—না, বলবেন না।

সুজিত—বীথি খুব বেশি রাগ করেছে, মনে হচ্ছে।

ভুবনবাবু আবার হাসেন—না না, বীথি রাগ করতে পারে না। বীথিকে তোমরা ভুল বুঝবে না। বীথি খুব শান্ত মেয়ে।

সুজিত—বেশ তো, বীথি এখন গল্পসল্প করুক। তারপর রাত হবার আগেই আমি বীথিকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

ভুবনবাবু—হ্যাঁ।

বীথি—আমি কোথাও যাব না।

মুড়ির মোয়া আর চা নিয়ে আসেন নন্দা।—তোমরা এখন একটু ওদিকে সরে যাও।

ফটকের কাছে রাস্তার উপর একটা গাড়ির হর্নের শব্দ ক্ষিপ্ত হয়ে বেজে ওঠে। বাইরের বারান্দার দিকে তাকায় সুজিত—কেউ এল নাকি?

বীথি—আমি কিন্তু বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলবো না।

সুজিত—অ্যাঁ? বাইরের লোক মানে?

সুজিত চলে যায়। বাইরের বারান্দায় এসে যাকে দেখতে পায় সুজিত, তার মুখ গম্ভীর, চোখে শক্ত ভ্রূকুটি. কপাল কুঁচকে রয়েছে। সুজিত বলে—আপনাকে কখনও দেখিনি, তবু বুঝতে পারছি, আপনি সিতাংশুবাবু।

সিতাংশু—হ্যাঁ। বীথি এখানে আছে?

সুজিত—হ্যাঁ।

সিতাংশু—ডেকে দিন।

সুজিত—আপনি এই ঘরের ভিতরে একটু বসুন। বীথি এখুনি আসবে।

ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে সিতাংশু। চোখের কঠোর দৃষ্টিটা দরজার বাইরে বারান্দার উপর পড়ে থাকে। কিন্তু বারান্দাতে ছড়ানো জ্যোৎস্নাটা বড় নরম।

একবার ভিতরে গিয়ে আবার বাইরে আসে সুজিত। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবার বলে—একটু বসুন ভাই, বীথি এখুনি আসবে।

বাইরের বারান্দার কাছে একটা লেবু গাছে ফুলের কুঁড়ি ধরেছে। তারই গন্ধটা ঘরের ভিতরে এসে আর বাতাস ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। জোনাকী উড়ে আসছে, সিতাংশুর জামার বুকেব উপর আর হাতের উপর বসছে ; শিউরে শিউরে জ্বলছে। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকায় সিতাংশু, তাই দেখতে পায় না, চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সিতাংশুর চেয়ারের ছায়াটার কত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নিরুপমা।

নিরুপমা ডাকে—ছোড়দা, চা খান।

চমকে ওঠে সিতাংশু ; চোখ ফিরিয়ে নিরুপমার মুখের দিকে তাকায়।—ছোড়দা কে? কা'কে বলছেন?

নিরুপমা—আপনাকে।

সিতাংশু—কেন?

নিরুপমার দুই চোখের কোণে বড়-বড় দুটো জলের ফোঁটা টলমল করে।—সে ছোড়দাকে আর কোথায় পাব? এখন আপনিই তো ছোড়দা।

সিতাংশু—আপনি কে?

নিরুপমা—আমি এ বাড়ির বড় বউ, নিরুপমা।

দুই চোখ অপলক ক'রে নিরুপমার দিকে তাকিয়ে থাকে সিতাংশু, দুই চোখ যেন ছোট ছেলের চোখের মত আশ্চর্য হয়ে একটা রূপকথার আলো-ছায়ার ছবি দেখছে।

নিরুপমা বলে—চা খেয়ে নিন, ছোড়দা। বীথিদি এসেছে, আপনিও এসেছেন, আমাদের যে কী ভাল লাগছে, কী বলবো!

ভুবনবাবু ঘরে ঢুকতেই নিরুপমা চলে যায়।—চা খাও সিতাংশু। তুমি বীথির স্বামী, তুমি আমাদের পর নও। তুমি এখন আমাদেরও ছেলে।

চা খায় সিতাংশু। ঘরে ঢুকে হাসতে থাকে সুজিত।—তুমি ভাই বীথির উপর একটুও রাগ করবে না! বীথি বড় ভাল মেয়ে।

সিতাংশু—আপনি কে?

ভুবনবাবু—আমার বড় ছেলে, সুজিত।

সিতাংশু—আমি বীথির উপর রাগ করিনি, আপনাদের বীথিই আমার উপর রাগ করেছে।

সুজিত—না না, বীথি রাগ করতে পারে না। হতে পারে, তোমার কোন কথায় একটু দুঃখ বোধ করেছে। এই মাত্র। ওরকম হয়েই থাকে। কিন্তু...।

ভুবনবাবু—কিন্তু তুমিই তো সেটা বুঝবে, বীথি কোন দুঃখ পেল কিনা।

চোখ তুলে, চোখ টান ক'রে ভুবনবাবুর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই সিতাংশুর চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ নরম হয়ে যায়, বারান্দার মেঝেতে জ্যোৎস্নাটা যেন নরম হয়ে রয়েছে। চুপ করে হাতের ঘড়িটার উপর আস্তে আস্তে হাত বুলোতে থাকে। আস্তে আস্তে, যেন আনমনার মত কথা বলে সিতাংশু।—বীথি বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে। আপনারাও তো বীথিকে দেখলেন, কী মনে হয় আপনাদের?

ভুবনবাবু—হ্যাঁ। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে বীথি।

সিতাংশু—বীথিকে সঙ্গে নিয়ে একটা-দুটো মাস কোন হিল-স্টেশনে গিয়ে থাকলে ভাল হয়; আপনারা কী বলেন?

ভুবনবাবু—ভালই তো।

সুজিত—আমার মনে হয়, পাহাড়ের হাওয়ার চেয়ে সমুদ্রের হাওয়া বেশি ভাল।

হেসে ফেলে সিতাংশু।—আমার মনে হয় আপনাদের এই বাড়ির হাওয়া আরও বেশি ভাল।...হাওয়াতে এটা কী ফুলের গন্ধ?

সুজিত—এটা লেবুফুলের কুঁড়ির গন্ধ। আমাদের এবাড়িতে অনেক গাছপালা।

ভুবনবাবু—সিতাংশুকে শুধু ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে কথা বলছো কেন, সুজিত। একটু ঘুরেফিরে সিতাংশুকে সব দেখিয়ে দিলেই তো পার। চাঁদের আলো আছে, দেখতে ভালই লাগবে সিতাংশুর।

—এস সিতাংশু। ডাক দেয় সুজিত।—না না, ওদিকে নয়। বাইরে দিয়ে নয়। তুমি বাইরের মানুষ নও।

বাড়ির ভিতরে বারান্দাতে এসেই থমকে দাঁড়ায় সিতাংশু। উঠোনের দিকে তাকায়।—বাঃ, বীথি দেখছি সব চেয়ে চমৎকার জায়গাটি বেছে নিয়েছে।

উঠোনে নেমে বীথির কাছে এগিয়ে এসে হাসতে থাকে সিতাংশু।—তুমি চটেমটে আমাকে একটা কথাও না বলে চলে এলে কেন? আমি কি আপত্তি করতাম?

সুজিত নেই, নিরুপমা নেই, কেউ নেই, দেউলবাড়ির উঠোনটাকে বীথি আর সিতাংশুর কাছে ছেড়ে দিয়ে সবাই কোথায় যেন সরে পড়েছে। বীথি উঠে দাঁড়ায়, সিতাংশুর মুখের দিকে তাকায়।—তুমি আমাকে খুব স্পষ্ট করে কী কথা যেন জিজ্ঞেস করবে বলেছিলে?

সিতাংশু—বাজে কথা। বাজে রাগের কথা। কিন্তু তুমি না বুঝে-সুঝে হঠাৎ আমার উপর

এত রাগ করে ফেললে কেন?

বীথি হেসে ফেলে—বাজে রাগ।...তুমি এখন যাও।

সিতাংশু—কোথায়?

বীথি—দেখতে পাচ্ছ না, বড়দা দাঁড়িয়ে আছেন।

সিতাংশু—কোথায়?

বীথি—ওই তো।

বারান্দার শেষ মুখের কাছে, যেখানে করুণাকালীর মন্দিরের ছায়া পড়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুজিত। সিতাংশু বলে—সত্যি বীথি, আমাদের বাড়িতে আর এবাড়িতে অনেক তফাৎ। এখানে সবই ভরাট, আমাদের ওখানে সবই ফাঁকা ফাঁকা।

বীথি—বড়দা ওখানে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।

সিতাংশু—তাই তো। ঘুরে ফিরে আমাকে কী-সব যেন দেখাবেন, বড়দা।

বীথি—দেখে এসো, পুকুরের জলে তোমার ছায়া দেখতে পেলে জয় আর বিজয় ছুটে আসবে।

সিতাংশু—সেটা আবার কী ব্যাপার?

সিতাংশু চলে যেতেই রান্নাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বীথির কাছে এসে দাঁড়ায় নিরুপমা।—বীথিদি, একটা কথা।

বীথি—বল।

নিরুপমা—মা বলছেন, তোমরা দুজনে আজ এখানেই থাকবে।

বীথি—না নিরুদি, এত লোভ দেখিও না।

নিরুপমা—বাবা বলছেন, তোমরা এখনই চলে গেলে বাবার খুব ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে।

বীথি—কিন্তু তোমার ছোড়দা কি থাকতে রাজি হবে?

নিরুপমা—খুব হবে। রাজি করাবার ভার আমার।

ভুবনবাবু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন—বীথি, শুনছো?

—বলুন।

—বেহালার বাড়িতে ফোন করে বলে দিলাম, বীথি আর সিতাংশু এখন আমার এখানে আছে।

আঠার

শ্যামবাজারের সি আই টি রোডের মিত্র-নিবাস যখন সকালবেলার রোদে ঝকঝক করে, তখন মনোময়ীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে হরিনাথের ধবধবে সাদা সাজের চেহারাটা ক্ষিপ্ত সিংহের মত ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকে।—কী আশ্চর্য, আবার সেই ভুবন মজুমদার, সেই ক্যান্সার, সেই নাইটমেয়ার, সেই আদ্যিকেলে জঞ্জালটার নাম শুনতে হলো।

মনোময়ী—ওসব কথা ছেড়ে দাও।

হরিনাথ—অসম্ভব। আমাকে জানতেই হবে। এর মানে কী?

—কী জানতে চাও তুমি?

—এই যে, কোথাকার কে এক ভুবন মজুমজার, বলতে গেলে শুধু কতগুলো সেকেলে গালগল্পের জঞ্জাল ছাড়া আর কোন সম্বল যার নেই, সেই লোকটা দূরে বসে আমার সব সম্মান লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারছে কেমন করে, কেন? মেঘের আড়ালে থেকে দানবেরা

যেমন যুদ্ধ করতো, এ যেন সেইরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

--তুমি ঘরে যাও, চুপ করে বসে থাক।

—অসম্ভব। এবাড়ির ছেলের বউ হয়েও কাউকে না বলে কয়ে পালিয়ে গিয়ে সুহৃদ সেনের ভাইঝি ভুবন মজুমদারের বাড়িতে বসে থাকে কেন? ম্যাজিকও এরকম কাজ করতে পারে না। এটা ভুবন মজুমদারের মিসচিফের কাজ।

--আমি বিশ্বাস করি না।

—তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না। বীথি চলে গিয়েছে, তাতেও কিছু আসে যায় না। প্রজাপতির মত একটা পোকা পালিয়ে গিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু ভুবন মজুমদারের বাড়িতে গেল কেন?

--জানি না।

--বীথি গিয়েছে তো গিয়েছে, সিতু গেল কেন?

--গিয়েছে শেষ কথা জিজ্ঞেস করতে।

--বেশ তো! কিন্তু ফিরে এল না কেন?

—আমি কী করে বলি।

—ওরা কোন্ মরফিয়া দিয়ে, কোন্ মদ খাইয়ে সিতুকে বেহুঁস করে দিল?

--তুমি মিথ্যে দুশ্চিন্তা করো না।

—দুশ্চিন্তা আমি করি না। আমি আমার মান-সম্মানের কথাটাই চিন্তা করি।

—কিন্তু তুমি আর ওখানে যেও না।

--যেতে হবে।

—যেও না।

--অবশ্যই যেতে হবে। বলতে বলতে চলে গেলেন হরিনাথ।

তারপর আর আধঘণ্টাও সময় লাগে না। হরিনাথের গাড়িটাও মত্ত আবেগ নিয়ে ছুটে এসে দমদমের রায়কুঠি পাড়ার দুলালবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। হরিনাথ ডাকেন--দুলালবাবু আছেন?

দুলালবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে এসে আশ্চর্য হয়ে যান।--আপনি অনেকদিন পরে এলেন, স্যার। আমরা তো আর আশা করতে পারিনি যে...।

হরিনাথ--আপনি এখন কী করছেন?

—আজ আদালতের ছুটির দিন। বুঝতেই তো পারছেন স্যার।

-বুঝতে পারছি না।

—দু'চারজন এসেছেন, সবাই মিলে একটু সময় নষ্ট করছি।

--বুঝলাম না।

—তাস খেলছি।

—আজ ভুবন মজুমদারের সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে। চলুন, দেখবেন।

--আর ভাল দেখায় না স্যার। অনেক হয়েছে। আপনিই তো বলেছিলেন, যবনিকা পতন হয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু হলো না। আপনাদের ভুবন মজুমদার আবার খলতা করেছে।

--ওরকম করে বলবেন না। ভদ্রলোক নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে নিজের মনে আছেন।

—আপনাদের ভুবনবাবু নিশ্চয় আমার ছেলে সিতাংশুর ভয়ানক কোন ক্ষতি করেছে।

--সিতাংশু কোথায়?

--ভুবনবাবুর বাড়িতে।

—আপনার পুত্রবধূ?

—সেও ওখানে।

—না, স্যার, এর মধ্যে আশঙ্কার কিছু নেই, থাকতে পারে না। এ তো একটা সুন্দর সুখের ব্যাপার।

—কেন?

—বোঝা যাচ্ছে, আপনার ছেলে আর ছেলের-বউয়ের মন যেমন উদার, তেমনই ভুবনবাবুর মনও উদার।

—নবান্ন পেটে সয় না যার, সেই মানুষটা উদার হয় কেমন করে? কিসের জোরে?

—তা জানি না। কিন্তু আমরা তো জানি, ভুবনবাবু তাঁর বিধবা পুত্রবধূর বিয়েতে আশীর্বাদী শাড়ি পাঠিয়েছিলেন।

—ওটা হলো, যাকে বলে বুদ্ধিযুক্ত একটা উদ্দেশ্য, কিংবা উদ্দেশ্যযুক্ত একটা বুদ্ধি। ওটা লোকদেখানো একেলেপনা। মনের উদারতা নয়। ভুবনবাবুর সাধ্যি কি আছে যে তিনি উদার হবেন? লেখাপড়া শিখে একজন রেড-ইণ্ডিয়ান সায়েন্সের প্রফেসর হয়েছিল। যতদিন কলেজে, ততদিন একেবারে একটি খাঁটি একেলে সুসভ্য। কিন্তু কলেজের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলেই মাথায় পালক গুঁজে, আর গলায় সাপ জড়িয়ে ধেই ধেই করে নাচতো।

—যা-ই হোক। আমার অনুরোধ স্যার, আপনি আর ওখানে যাবেন না। আজ হোক কাল হোক, আপনার ছেলে নিজেই বাড়ি ফিরে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না।

—না, আমিই ডেকে নিয়ে যাব। আমারই ছেলে সিতাংশু। আমি তাকে এখুনি আমার সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে যাব। নইলে আমি আছি কী করতে? নইলে আমি কী?

চুপ করে হরিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন দুলালবাবু। হরিনাথের দৃপ্ত মুখটাকে বিকার রোগীর উগ্র মুখের মত দেখাচ্ছে। দুলালবাবুর চোখেও একটা কঠিন বিস্ময়ের প্রশ্ন ছটফট করে। এত বিদ্বান আর কৃতি, এত বড় টাকার মানুষটা কোন্ অদ্ভুত অসুখে এরকম অবুঝ হয়ে গেল?

হরিনাথ—তাড়াতাড়ি করুন।

দুলালবাবুর চোখের দৃষ্টিটা যেন চকিত বিদ্যুতের মত একটা ঝিলিক দিয়ে হরিনাথের মুখটাকে দেখে নেয়। তারপর ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে ডাক দেন দুলালবাবু—শুনছেন প্রমথবাবু, নয়নবাবু? আমি মিত্তির স্যারের সঙ্গে ভুবনবাবুর বাড়িতে চললাম।

ঘরের ভিতরের তাসের আসর থেকে বের হয়ে এলেন প্রমথবাবু নয়নবাবু আর আরও সাত-আটজন উৎসুক জিজ্ঞাসার মানুষ।—কী ব্যাপার, দুলালবাবু?

দুলালবাবু—আমাদের মিত্তির স্যার বলছেন, তাঁর ছেলে সিতাংশুকে আটক করে রেখেছেন আমাদের ভুবনবাবু।

প্রমথবাবু—অ্যাঁ? সে কী! এরকম অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেন ভুবনবাবু, কিসের জোরে?

নয়নবাবু—কোন্ সাহসে? ভুবনবাবুর কী এমন সম্বল আছে যা মিত্তির স্যারের নেই?

দুলালবাবু—চলুন স্যার।

দেউলবাড়ির ফটকের ভাঙা থামের ছায়ার কাছে এসে হরিনাথের গাড়িটা থামতেই গাড়ি থেকে নামলেন হরিনাথ।

—দুলালবাবু, আপনি সিতাংশুকে ডেকে নিয়ে এখুনি চলে আসুন।

আসতে বেশ দেরি করছে সিতাংশু। কী আশ্চর্য, দুলালবাবু কি সিতাংশুকে বলতে ভুলে গিয়েছে যে, তারই বাবা তারই জন্যে এখন এই কদর্য বাড়ির ফটকের ভাঙা থামের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন?

যাঁদের ডাক দিয়েছিলেন দুলালবাবু, তাসের আসরের প্রমথবাবুরা, তাঁরা সবাই হন্তদন্ত

হয়ে ছুটে এসেছেন! হাঁপাচ্ছেন, বারবার হরিনাথেরই মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছেন, কী ব্যাপার, মিত্তির স্যারের ছেলেকে আটক করে রাখলেন কেন ভুবনবাবু?

বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে, দুলালবাবুর সঙ্গে খুব আস্তে আস্তে হেঁটে সিতাংশু এগিয়ে আসে।—আপনি কেন এলেন?

হরিনাথ—বাড়ি চল। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

সিতাংশু—আপনি মিথ্যে চিন্তা করছেন। আপনি বাড়ি যান।

হরিনাথের সাদা সাজের দৃপ্ত চেহারার উপর যেন ভয়ানক একটা হাতুড়ির আঘাত পড়েছে। ঝিরঝির করে কাঁপতে থাকেন হরিনাথ।

—কবে যাবে? চেঁচিয়ে ওঠেন হরিনাথ।

সিতাংশু—এঁরা যেদিন ছেড়ে দেবেন।

—সেটা কবে? এ জন্মে?

হেসে ফেলে সিতাংশু।—মনে হয়, কাল কিংবা পরশু। মা-কে বলবেন, একটা দিন বেহালার বাড়িতে থেকে তারপর আমরা ফিরবো।

সিতাংশু চলে যায়। হরিনাথ তবু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। ঘাড়টা কুঁকড়ে গিয়েছে, মাথা ঝুঁকিয়ে সড়কের ধুলোর উপর নিজেরই ছায়াটাকে দেখতে থাকেন হরিনাথ।

দুলালবাবু ডাকেন—বাড়ি চলে যান, স্যার। রোদের মধ্যে আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

গাড়ির কাছে এগিয়ে যেয়ে, আবার থমকে দাঁড়ান হরিনাথ। দেখে ফেলেছেন হরিনাথ, ওইসব নয়নবাবু আর প্রমথবাবু, যারা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, তারা সোজাসুজি তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

—দুলালবাবু, আপনি কোথায়? ডাক দিলেন হরিনাথ।

—আজ্ঞে। কাছে এসে দাঁড়ালেন দুলালবাবু।

—ওরা হাসছে কেন?

—দীপেন একটা বাজে ঠাট্টার কথা বলেছে ; তাই শুনে ওঁরা হাসছেন।

—কোথায় দীপেন? চেঁচিয়ে ওঠেন হরিনাথ।

—এই যে আমি। কাছে এসে দাঁড়ায় দীপেন।

—কী বলছো তুমি?

—আমি বলেছি, ভুবনবাবুর আত্মা আছে, হরিনাথবাবুর আত্মা নেই।

—তাতে কী হলো?

—আপনি বুঝে দেখুন, কী হলো।

গাড়ির ভিতরে উঠে বসলেন হরিনাথ। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়ে শব্দ করে উঠতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হরিনাথ ডাক দিলেন—মশাইরা শুনছেন? আমি জিজ্ঞেস করছি ; আপনারা ভুবনবাবুর জয়ন্তী না করে আমার জয়ন্তী কেন করেছিলেন? আশ্চর্য!

শতভিষা

পুঁটি মাসীমার গল্প তখন দূর পূর্ব্ব বাংলার রাজপাটপুর নামে একটি গাঁয়ে, এক জমিদার বাড়ির আঙিনায়, এক কালিপুজোর রাতে, একশো গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে যাত্রাগানের আসর পেতে বসেছে। বেহালার সুরের কাঁদুনির সঙ্গে অজবিলাপ মাত্র করুণ হয়ে জমে উঠেছে, হঠাৎ একটা বোমা ফাটার আওয়াজ! সাজঘরের পাশে কদমতলায় কতগুলি ধোঁয়ার কুণ্ডলী দুলছে। দু'হাজার লোক যে-যেখানে বসেছিল, সে সেইখানেই বসে রইল চুপ করে। মুখোস পরে স্বদেশী ডাকাতেরা এসেছে, হাতে বন্দুক কোমরে ভোজালি—দশ বারটি জোয়ান ছেলে। একজন বললে—দেশমায়ের নামে...।

—শুভা! ও শুভা!

বাগানের কৎবেল গাছের ভীড় ভেদ করে পাঁচিলের ওপার থেকে নশুবাবুর বাড়ির একটি জানালা থেকে আপ্লুত আহ্বানের স্বর শোনা গেল। শুভার মা ডাকছেন।

শুভা মিনতি করে বললো—এইখানে থেমে থাকুন মাসীমা। এর মধ্যে সবটা বলে ফেলবেন না। আমি এখুনি আসছি। সত্যি বলছি, একটুও দেরী করবো না!

শুভা ব্যস্ত হয়ে আঁচলটা নিমেষের মধ্যে কোমরে একপাক জড়িয়ে নিয়ে প্রায় দৌড় দিয়ে চলে গেল। বাগানের শেষে এসে একটা লাফ দিয়ে বেঁটে পাঁচিলটার ওপর উঠলো! তারপর ধড়াস্ করে ওপারে নেমে পড়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলো।

গল্পের আসরে শুধু বসে রইল মঞ্জু আর মীনু। পুঁটি মাসীমা শুভারই উদ্দেশে বললেন।—গল্পটা না হয় শুনেই যেতিস। দৌড়ে গেলে আর কী হবে? তোর পরীক্ষার ফল জানাই আছে।

জানা আছে সবারই। এক মেয়েদেখার দল নিশ্চয় শুভাদের বাড়িতে এসেছে। তাই এই আহ্বান। আজ চার বছর ধরে টিয়ার ঝাঁকের মত প্রতি সপ্তাহে একটি দুটিবার দেখা দেয়—যেন বাগানের একটা আধপাকা ফল ঠুক্‌রে চলে যায়। তারপরেই তাদের আপত্তির কারণ চিঠির মারফৎ শোনা যায়—মেয়ে পছন্দসই নয়।

শুভার চেয়ে শুভার মা বেশী স্তম্ভিত হয়ে গেছেন উদ্বাহতত্ত্বের এই বাজারী স্বরূপ দেখে। প্রথম প্রথম বিমুখ পাত্রপক্ষের নামে কটূক্তি করতেন—যারা নিজেরাই রূপগুণের ধোপে টিকতে পারে না, তাদের মনে এত বাছবিচারের বাতিক কেন? টাঙ্গাইলের পাটের আফিসে মুহুরীগিরি করে, সেই ট্যারা চোখ পাত্রের বাপও যখন রাজী হয়েও আর হলো না, তখন একদিন হঠাৎ সন্দেহ জাগলো—দোষ কার? কেন প্রজাপতি এত বাম? শিবের মাথায় এত ঢালা-জল কেন শুকিয়ে গেল?

না হয় দেখতে কালোই হয়েছিলি—সেটা তোর বাপের গায়ের রং। কিন্তু বেঁটে হলি কেন? শুভার চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট ভুলু—এরই মধ্যে পেঁপে গাছের মত ফন্‌ফন্ করে পাঁচিল ছাড়িয়ে উঠেছে। চৌকাটে মাথা ঠেকে! এইটুকু ছেলের এতটা শালপ্রাংশুতা না হ'লেও চলতো। শুভার এই বেঁটেত্বই ওর বিয়ের পথে সব চেয়ে উঁচু বাধা—যেটা ডিঙ্গিয়ে কেউ আর কাছে আসতে পারছে না! শুভার মা বুঝলেন—দোষটা শুভার।

মেয়ে দেখার পালা শেষ হলে শুভা ঘরের ভেতর যখন চলে আসে, শুভার মা দরজার আড়ালে কান পেতে সব আলোচনা শোনেন। ফাঁক দিয়ে পাত্রপক্ষের, কখনো বা স্বয়ং পাত্রের, মুখের চেহারা থেকে পছন্দের আভাষ বুঝবার চেষ্টা করেন। নিঃসংশয় হন, সম্মতির লক্ষণ নেই। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে—রান্নাঘরের দিকে চলে যান, উঠোন পার হয়ে। উঠোনে তখন মেয়েদেখা অভিযাত্রীদের মিষ্টিমুখের এঁটো করা যত কাপ রেকাবি আর গেলাসের স্তূপ। আড়চোখে একবার মাঝের বড় ঘরটার দিকে তাকান। শুভা নিঃশব্দে আঁচলের পিন খুলছে।

—যা, শিকেয় ঝুঁটি বেঁধে ঝুলে ঝুলে দোল খেগে যা।

শুভার মা রাগ করে কথাগুলি বলেই আবার হেঁসেলের কাজে হাত দেন। তার পরেই হয়তো দেখেন কালজিরে নেই। ঝিকে ডাক দিয়ে বলেন,—একবার বাজারে যা, কালজিরে নিয়ে আয় চার পয়সার। তার পরেই সব ভুলে যান। শুভার ওপর সব রাগও নিঃশেষে উপে যায়।

ভুলু সন্ধ্যা বেলা ঘরে ফিরে এক একদিন শোনে।—মেয়েদেখার দল এসেছিল। খুব ভাল সম্বন্ধ। ছেলে আইন পড়ছে—বাপের পয়সা আছে। দেখতেও খুব ভাল। কিন্তু তাদের আনা মাত্র সার হয়েছে। মুখের ওপর ভদ্রভাবে জানিয়ে দিয়ে গেছে—মেয়ে পছন্দ হলো না, মাপ করবেন।

ভুলু চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে।—দিদিভাই শুনে যা, আমার পলিসি শোন, শুভা কাছে আসতেই বলে—আমার ঠ্যাং দুটো কেটে তুই লাগিয়ে নে, তোর ঠ্যাং দুটো আমায় দে।

শুভা হেসে ফেলে। শুভার মা হাসতে হাসতে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে শুভাকে বলেন,—আজ বৃষ্টি নেই ; যা সিনেমা দেখে আয়। গুম হয়ে বসে থাকিস্ না। পিসীমা জন্মদিনে যে-শাড়িটা দিয়ে ছিল, সেইটে পর ; যা, আমি বলছি। তাড়াতাড়ি কর।

শুভার মার গলার স্বর অনুনয়ের সুরে কোমল হয়ে আসে বোঝা যায়, যেন নিজের মনের অভিমানের জ্বালা তিনি ঢাকছেন।

মায়ের অনুরোধে আপত্তি জানিয়েও শুভা শাড়িটা তবু পরলো। কিন্তু স্নো-পাউডার আজকাল একেবারেই ছুঁতে চায় না। শুভার মা ধমক দিয়ে বলেন,—তোর এই বেয়াড়াপনার জন্যেই আমি তোকে দেখতে পারি না।

যাই হোক, মায়ের কথা শেষাশেষি মানতেই হয়, সাজগোছ করে ভুলুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়। যাবার সময় মায়ের সঙ্গে চকিতে চোখাচোখি হয়। শুভার মা যেভাবে তাকিয়ে দেখেন তাতে শুভার মুখ লজ্জায় করুণ হয়ে ওঠে। মা নিশ্চয় ভাবছিলেন,—মানুষের রাজ্যে কী এমন বেমানান দেখাচ্ছে এই মেয়েকে? হেঁট মুখের এত শান্ত হাসি।

পুঁটি মাসীমার গল্প সত্যিই থেমেছিল ; যতক্ষণ শুভা ফিরে না আসে। মঞ্জু বললো—আমার কিন্তু শুভাকে বড় ভাল লাগে। তাছাড়া সত্যি সত্যি আমি বুঝতে পারি না, ওকে কুৎসিত বলে কেন?

মীনু—নশুবাবু যদি টাকার থলে হাতে নিয়ে পাত্র খুঁজতে বের হতেন, তা হলে ওসব কোন কথাই উঠতো না।

কথার মাঝখানে শুভা এসে পৌঁছে গেল। বড় জোর পনের মিনিট সময় লেগেছে। তখনো গলার কাছে এক-আধটু পাউডারের ছিটে লেগে আছে। খয়েরের টিপটা একেবারে মুছে ফেলেছে। আটপৌরে সাজের মধ্যে এখন শুধু শুধু ঘসামাজা মুখখানা আরও বেশী জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে।—বলুন মাসীমা। শুভা গল্প শোনার জন্য বসলো।

পুঁটি মাসীমা আরম্ভ করলেন—এদিকে জমিদার মশাইয়ের বড় পুত্তুর, চুপিচুপি আসর থেকে কখন উঠে গেছে কেউ টের পায়নি। উঠে গিয়ে সোজা বাড়ির ভেতর থেকে একটা বন্দুক নিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক থেকে একটা গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ—বাবুদের বড়খোকা বুকে হাত দিয়ে চীৎকার করে পড়ে গেল। স্বদেশীওয়ালারা মেরে দিয়েছে। তারপর...।

শুভা—এ কী রকমের স্বদেশী রে বাবা! স্বদেশী লোককেই গুলি করে মারলে, স্বদেশীদের গয়নাপত্তর লুঠ করে নিলে...।

মীনু—থাম শুভা। আগে গল্পটা শুনে নে।

পুঁটি মাসী—জমিদারবাবু তখনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একজন স্বদেশী ডাকাত তাঁকে

রুমাল দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। আর সবাই সকলের কাছ থেকে টাকা পয়সা অলঙ্কার নিয়ে থলি ভরতে লাগল। এমন সময়...

মঞ্জু—আপনিও তো যাত্রা শুনছিলেন। আপনি কি দিলেন?

পুঁটি মাসী--সত্যি কথা বলবো?

শুভা—তাই বলুন, এতক্ষণ মিছিমিছি বানিয়ে বলছিলেন। এরকম নিষ্ঠুর ভাবে খুন করে দিলে, অথচ বলছে দেশের নামে...।

মীনু—থামলি শুভা। বলে যান মাসীমা।

পুঁটি মাসী--আমার গলায় একটা মটরমালা ছিল। তোর মেসোমশায়ের প্রথম চাকরির উপহার। ব্যাপার দেখে আমি আগেভাগেই টপ্ করে সেমিজের গলার ফাঁকে সেটাকে ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। একটা স্বদেশী আমার সামনে এসে থলি ধরলে—দেশের কাজে কিছু দান চাই। আমি বললাম,—কী দেব! আমার কিছু নেই। হাতে এই কাচের চুড়ি, এ নিয়ে কি হবে, কতই বা দাম? স্বদেশীটা বললে—কিছু নেই? তা কখনই হতে পারে না।

শুভা--মাগো! গায়ে হাত দিল শেষে।

পুঁটি মাসী--স্বদেশী লোকটা বললে—আশীর্বাদ দিন, তা হলেই যথেষ্ট। বলেই অন্য দিকে এগিয়ে গেল। এমন সময় ভযানক হল্লা আরম্ভ হলো, লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে। বন্দুকের ঘন ঘন শব্দ হতে লাগলো। একটা পুলিশের দল সময় মত পৌঁছে গেল, ওদের গোয়েন্দারা আগেই খবর দিয়েছিল—সে রাত্রে স্বদেশী দল এই রকম একটা কাণ্ড করবে। সেই থলেধরা স্বদেশী ছেলেটা কিছুক্ষণ থম্‌কে সেই হল্লার দিকে তাকিয়ে রইল, কোমর হাতড়ে একটা পিস্তল বার করলো। আমি সেই ফাঁকে মটর মালাটা সেমিজের ভেতর থেকে বার করে আলগোছে থলির ভেতর ফেলে দিলাম।

শুভা পুঁটি মাসীর গা ঘেঁসে বসলো। বললো—সত্যি, না দিলে বড় খারাপ হতো মাসীমা।

মঞ্জু ও মিনু এক সঙ্গে হেসে উঠলো। শুভা মেয়েটির রকমসকম এই। ওর মনে কোন চাবি নেই, ভাবের আয়না মাত্র। শোনামাত্র শিউরে ওঠে, যেই বুঝলো অমনি বলে ফেললো। বিচার করে দেখবে, চিত্তের ওর খোলা মাঠে এমন কোন বেড়া বাঁধা নেই।

পুঁটি মাসীমা।--ভাল হতো কি না হতো, তা জানি না, মোটকথা দিয়েই দিলাম। কিন্তু।

শুভা।—এই ছেলেটার গায়ে গুলিটুলি লাগেনি তো মাসীমা?

পুঁটি মাসীমা।--এরই গায়ে লাগলো। স্বদেশীদের দলের নেতা হুইসিল বাজালো--অর্থাৎ এবার সরে পড়তে হবে। এই ছেলেটিও থলে কাঁধে নিয়ে দৌড়ে সবার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালো, পুলিসের দল তখন প্রায় ঘিরে ফেলেছে। ডাকাত ছোঁড়ারা মাঠের অন্ধকারের দিকে ছুটে পালালো। কিন্তু পুলিসের দল দ্রুম দ্রাম গুলি চালিয়েই যাচ্ছে। আমরা তখনো চিকের আড়ালে চুপটি হয়ে বসে আছি। খালের দিক থেকে একটা চীৎকার শুনলাম--বন্দেমাতরম্। অনেক লোক সেদিকে দৌড়ে গেল। ডাকাতদের একজন ঘায়েল হয়ে পড়ে গেছে—সেই থলেওয়ালা স্বদেশী ছেলেটি।

শুভা।—সবাই পালিয়ে বাঁচলো, শুধু এই বেচারীকে গুলি মেরে...ধেৎ...এ বড় অন্যায়।

পুঁটি মাসী।--তারপর মোকদ্দমা হলো। ছেলেটিকে কত লোভ দেখিয়েছে, মেরে গায়ের মাংস পচিয়ে দিয়েছে, তবু সঙ্গীদের নাম ফাঁস করেনি। শেষে এরই নামে নরহত্যা আর ডাকাতির অভিযোগ এল, বিচার হলো। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার...।

মীনু। শুভা শুনে যা চুপ করে, ফোড়ন দিস্ না।

পুঁটি মাসী।--বিচারের সময় বড় খোকা বাবুর বউ থান কাপড় পরে নিজেই আদালতে সাক্ষী দিতে এসেছিল। আদালতভরা জজ উকীল জুরি আর লোকের ভীড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে গেল--উনি ঘরের ভেতর থেকে বন্দুক নিয়ে এসে আত্মহত্যা করেছেন, আমি নিজে

দেখেছি। তাঁকে স্বদেশীদের কেউ গুলি করে মারেনি।

পুঁটি মাসীমার রূপকথা যেন শুভাকে হাত ধরে পথে পথে ইন্দ্রজালের বিস্ময় দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কী দুর্ধর প্রেরণায়, কত জীবনের নিশ্বাস বায়ুর উৎসর্গে একদিন সারা জাতির কামনা রুষ্ট ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল। সেই ঝড় আজও কত মহীরুহে শান্ত প্রতিজ্ঞায়, নির্বাক প্রতীক্ষায়, বাসা বেঁধে আছে। কারা যেন সেই মহীরুহের কয়েকটি ডালপালা। শুভা তার কিছুই জানে না, বোঝে না। শুভা শুধু গল্প শুনে চলেছে। কিন্তু এ গল্প বড় অদ্ভুত। শুনেই শেষ হয়ে যায় না। মনের ভেতর গিয়ে গল্পটা আবার বেঁচে ওঠে। মনের স্বস্তি নষ্ট করে।

শুভা।—ছেলেটি রেহাই পেল তো মাসীমা?

পুঁটি মাসীমা।—চার বছরের জন্য জেল হলো ডাকাতির দায়ে। তারপর...সেই বিধবা বৌটিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। সবাই বললো, বৌটি নাকি স্বদেশীদেরই দলের লোক ছিল। কিন্তু বৌটি কোথায় যে গেল তার আর কোন খবর পাওয়া গেল না।

শুভা।—শেষটা বড় খারাপ হলো। ছেলেটিরও জেল হলো—বৌটিও কোথায় চলে গেল। কিছুই হলো না।

পুঁটি মাসীমা।—দুঃখ করছিস্ কেন? কেউ তো আর মরে গেল না ; যেখানে হোক্ রয়ে গেল—বেঁচে গেল। আজও তারা বেঁচেই আছে।

শুভা।—ছেলেটি কোথায় মাসীমা?

পুঁটি মাসীমা।—মীনু, মঞ্জু—তোরা এবার শুভাকে থামাতে পারিস্ তো দেখ। ছেলেটির খবর পেলে একটা কিছু কাণ্ড করার মতলবে আছে শুভা।

শুভা অপ্রস্তুত হয়ে খানিকটা রাগ করে আপত্তি করলো। আপত্তির রীতিও তেমনই অদ্ভুত। যার বিরুদ্ধে শুভার অভিযোগ থাকে, তারই গায়ের ওপর ঢলে পড়ে একটা গা-ভরা আবদারের ভার যেন ছেড়ে দেয়। মীনুর দিকে একটু হেলে পড়তেই, মীনু দুহাত দিয়ে ঠেলে ধরলো।—না ভাই, মাপ করো, এখানে জায়গা নাই। একবার কাত হতে পারলে তুমি আর উঠতে চাইবে না। ঐ যে বড়দি রয়েছে, সাক্ষাৎ সহ্যাদ্রি—ওর গায়ে একেবারে কাবেরী হয়ে গড়িয়ে পড়।

মঞ্জু ডাকলো।—আয়রে শুভা।

পুঁটি মাসীমা বলেন,—শুভা ভাবছে, ঐ ছেলেটির কি বিয়ে হয়ে গেছে। এত ভালবাসতে পারে, প্রাণ দিতে পারে, প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে—এমন নির্ভীক ও সুন্দর ছেলে যদি আজ থাকতো তাহলে...তাহলে কি ব্যাপার হতো, তুই বলে ফেল শুভা।

শুভা এবার সত্যিই রাগ করলো—কী আর হতো! যা শুনতে চাইছেন, তাই বলছি ; আর একটা মেয়েদেখার দল আসতো ; আর একবার সং সেজে সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম ; তারপর একদিন চিঠি আসতো—পছন্দ হলো না।

পুঁটি মাসীমা।—ওরে রাগ করিস্ না। সে তোর সঙ্গে ওরকম ব্যাভার করতো না। কিন্তু উপায় নেই, বেচারা বুড়ো হয়ে গেছে, চুল দাড়ি পেকে গেছে, বিয়ে তো হয়ে গেছে কবেই। তার ওপর নিজেরই দুম্বো দুম্বো মেয়ে রয়েছে—তাদের বিয়ের ভাবনা করবার সময় হয় না, ভদ্রলোকের—এত কাজ। যেমন ধর, তোর রজনী জেঠাবাবু এখন যেমনটি হয়ে গেছেন।

শুভা।—জেঠাবাবু! শুভার বিস্ময়ধ্বনির মধ্যে জেঠাবাবু যেন নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন। বুদ্ধির দিক দিয়ে শুভা যতই বোকা হোক্, অন্তরের চোখ দুটো ওর অন্ধ নয়।

মীনুদি মঞ্জুদির বাবা রজনীবাবুকে শুভা জেঠাবাবু বলেই এতদিন জানতো, রজনীবাবু যে ওদের প্রতিবেশী এ তত্ত্ব কোনদিনও মনে থাকে না শুভার।

জেঠাবাবুর গায়ে সেই রিপুকরা চিরকেলে তসরের চাদরটি নিয়ে কত ঠাট্টা করে শুভা।

একবার মেতে উঠলে কথার কোন লাগাম থাকে না। বলে ফেলে—তুমি নিশ্চয় কোন পাপ করেছিলে জেঠাবাবু ; নইলে এত বই পড়েছ—তবু একটা ভাল চাকরী পেলে না।

মীনু মঞ্জু দুজনে চমকে ওঠে ; বিরক্তও হয়। মেয়েটার কথা বলার রকম নেই। কিন্তু রজনীবাবুই আস্কারা দিতেন বেশী। শুভার সঙ্গে সমানে আবোল তাবোল বকেন। হে শুভা, শুভাঢ্যা, পতিতপাবনী—এই বুড়্ঢা বাঙালীকে একঠো নোকরী মিলা দে মাঈ!

শুভা হলো ভোরের পাখীর মত ; ও কি জানে যে দেবদারুর পায়ের কাছে শুধু প্রণাম করতে হয়। ও জানে একেবারে ডালপালা ছড়ানো ছায়াভরা কোলের ওপর গিয়ে উড়ে পড়তে।

শুভার আশ্চর্য লাগতো, ওর বাবা নশুবাবু কেন জেঠাবাবুকে এত ভয় করেন অথচ মান্য করে চলেন। নশুবাবু বার বার বলতেন—মস্ত লোক। কিন্তু শুভার কাছে এটা রহস্য ছিল। জেঠাবাবুকে সে একটু ভয় করতো না।

এক একদিন সন্ধ্যা বেলা বেড়াতে এসে দেখে যায় শুভা—জেঠাবাবু বাড়িতে নেই। থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল—সেইখানেই গেছেন। কখন ফিরবেন বলা যায় না, বুড়ো মানুষ প্রায়ই সন্ধ্যার সময় একটু দুধ রুটি খেয়ে শুয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন কখন্ ছাড়া পাবেন কে জানে!

মঞ্জুদি ও মীনুদির সঙ্গে সেদিন কোন গল্প আলাপ ভাল করে জমে না। গুমোট মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে শোনে, বারান্দা থেকে শুধু নশুবাবুর হুঁকোর আওয়াজ কানে আসে। ধড়ফড় করে উঠে বসে শুভা। বলে—একবার খোঁজ নাও না বাবা, জেঠাবাবু ফিরলেন কি না!

একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে জেগে ঘুমিয়ে শুভার রাত কেটে যায়। জানালাটা খুলে বিছানার উপর বসে থাকে। বসে বসে ভাবে—জেঠাবাবু ফিরলেন কি না।

জেঠাবাবুদের বাড়িটা অদ্ভুত। একটা জীর্ণ কেল্লার মত। চারিদিকের পাঁচিলের গায়ে শেওলা বার মাসে ছাড়ে না। মাঝে মাঝে একেবারে ধসে গেছে, পাঁচিলের পাশে এখনো যে কটা লিচু গাছ দেখা যায়, তাদের বড়টা শুধু বাগানের ভেতর ; ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকে পথচারীদের লোলুপ হাত গাছগুলিকে ঝুঁটি ধরে রাস্তার ধারে নামিয়ে দিয়েছে। লোনাধরা বাড়িটা শুধু দেখতেই প্রকাণ্ড। জানালা কপাটের রঙ চটে গিয়েছে। বারমেসে ফলের গাছগুলি একে একে মরে গেছে। বাগানটা শুধু ঘাসের বনে ঢাকা—মাঝে মাঝে রোগা লম্বা এক একটা তাল আর কৎবেল। এই বন্য অবহেলার মধ্যে এখনো এখানে-ওখানে দুচারটে দোপাটি ফোটে, ঝুমকো দোলে—হঠাৎ কোন সন্ধ্যায় হাস্নু-হানার কড়া গন্ধে বাগানের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

রাত্রি ফর্সা হয়ে গেছে। জেঠাবাবু ফিরেছেন কি না? উত্তরের মাঠের ঢালুর শেষে ইঁটের পাঁজাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উশ্রীর বালিতে জলস্রোত দেখা যায় না—একটা সাদাটে বাষ্পের ঘেরাটোপে নদীর খাত ঢাকা পড়ে আছে। লোহার তারের ঝোলানো ব্রিজটার মরচেপড়া কঙ্কালের উপর ফোঁটা ফোঁটা শিশির চিক্‌চিক্ করছে।

মীনুদি এখন ওঠেনি বুঝতে পারা যাচ্ছে। নইলে বারান্দায় বই নিয়ে পড়তে বসতো নিশ্চয়। শুধু বুঝতে পারা যায় মঞ্জুদি জেগেছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যায়—চায়ের কাপ ডিস কেট্‌লির শব্দ। মঞ্জুদি চা তৈরী করছে। কিন্তু কার জন্য? জেঠাবাবু কি ফিরেছেন?

এতক্ষণে দেখা গেল—বারান্দার ওপর একটা বেঞ্চ টেনে নিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বসে আছেন জেঠাবাবু। মঞ্জুদি চা এনে দিচ্ছে।

শুভা শুনতে পায় ঃ রজনীবাবু বললেন।—তোর মা উঠেছে মঞ্জু?

প্রমীলাবালা অনেকক্ষণ আগেই উঠেছেন। মঞ্জুদি বললো—হাঁ।

—কি করছে?

—পূজোর ঘরে আছেন।

—ও, আজ তো তার বোবামির ব্রত, আজ মঙ্গলবার।

প্রতি মঙ্গলবারে প্রমীলাবালা একবেলা উপোষ থাকেন। সারাদিন মৌন থাকেন। প্রমীলাবালা এইভাবে নিজেকে সংসার ধর্মের তাড়না থেকে অনেকটা মুক্ত করে ফেলেছেন। একবার পুজোর ঘরে ঢুকলে বের হতে চান না—জপ সারাই হয় না। কোন কোন দিন যদি কাজ নিয়ে বসলেন তো সেটাও জপ করার মত ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়। কুয়োতলায় সকালবেলা একরাশ কাপড় কাচতে বসলেন—কেচেই চললেন। উঠলেন বিকেল চারটেয়। সব কাজের মধ্যে হৃদয়ের আগ্রহ ক্রমেই মুছে আসছে।

তাই মঞ্জুকে এগিয়ে এসে এই দায় তুলে নিতে হয়েছে। আশ্রমপালিকার মত এই সংসারতরুর আলবালে মঞ্জু যেন ক্লান্তিহীন মমতায় জলসেচন করে চলেছে—আজ দশ বছর ধরে, যেদিন থেকে প্রমীলাবালা পূজোর ঘরে ঢুকেছেন।

রজনীবাবু বললেন,—মঞ্জু।

—কি বাবা?

—অমিয় কোথায় গেল বুঝতে পারছি না কোন খোঁজ পেলাম না।

পূজোর ঘরে বসেই প্রমীলাবালার কানে কথাগুলি গেল। ধ্যান ছুটে গেল। কোশাকুশি, গীতা-চণ্ডী, মালা তুলসী, চন্দনের বাটি আর ঘিয়ের প্রদীপ সব পড়ে রইল! সশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে এলেন, পাথরের মত চোখ দুটো স্তব্ধ হয়ে রইল।

মীনু পড়া বন্ধ করে একটা পাখা হাতে এগিয়ে এসে প্রমীলাবালার হাত ধরলো,—তুমি চুপ করে বসো মা।

প্রমীলাবালা।—না, আমি সইবো না। সইতে পারবো না। কী ভেবেছে সব? একে একে সরে পড়বে? বড় সেয়ানা হয়ে উঠেছে? ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া করে দেব।

প্রমীলাবালার কথাগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া, খাপছাড়া। মনের ভেতর কিসের যেন একটা বেদনা ফুটছে—তারই আলোড়নে এক একটি বিলাপের বুদ্বুদ ফুটে উঠেছে।

—তার চেয়ে চোখের সামনে মরুক! সাজিয়ে শ্মশানে পাঠিয়ে দেব—কিছু বলবো না।

মীনু প্রমীলাবালার মুখ চেপে ধরলো।—এসব কী বলছো মা। তুমি দিন দিন কী হচ্ছো?

—যতী! যতী! যতী!

প্রমীলাবালা এর বেশী আর বলতে পারলেন না। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে মেঝের ওপরেই শুয়ে পড়লেন। মীনু একটা বালিশ এনে মাথার নীচে গুঁজে দিল। হাতপাখা দিয়ে একটানা বাতাস করে চললো।

তেমনি একটানা কেঁদে চললেন প্রমীলাবালা। চেঁচিয়ে কাঁদতে পারেন না। একটা অসহায় আর্তস্বর ভাঙা দেউলের নির্জনতায় ফুঁপিয়ে যেন গান করতে থাকে।

শুভা যেন এতক্ষণ একটা নাটক দেখছিল। এ-রহস্য তার কাছে দুর্বোধ্য। জেঠাবাবুর বাড়ির সব ব্যাপার যেন কি রকম! জেঠাবাবুকে কেনই বা থানায় ডেকে নিয়ে যায়! যতীদার জন্য জেঠিমা কাঁদেন কেন? কেন যতীদা বাড়ি আসে না? মঞ্জুদি এত সুন্দর দেখতে বয়স হয়েছে—তবু তার বিয়ে হয় না। মীনুদির চোখ খারাপ হতে চলেছে—চশমা দিয়েও ভাল দেখতে পায় না। তবু দিন রাত পড়ে। কেন?

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে, মাথায় একবার চিরুণী বুলিয়ে, বাগানের পথে জেঠাবাবুর বাড়ির দিকে চললো শুভা। আজ ভোর থেকেই জেঠাবাবুর বাড়ির বহুদিনের একটা ঘুমন্ত রহস্য হঠাৎ জেগে মুখর হয়ে উঠেছে। কি ব্যাপার, জানতেই হবে। শুভা তাকিয়েছিল রজনী

জেঠাবাবু ও মঞ্জুদির দিকে। শুভা জানতে এসেছে কী সেই রহস্য? কেন আজ ভোর থেকেই জেঠাবাবুর বাড়িটার নিরেট মৌনতা হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করতে সুরু করেছে? এক এক সময় আচম্‌কা সারা শরীর শিউরে ওঠে—শুনতে ভয় লাগে। পর মুহূর্তে এই আব্ছা আতঙ্ক একেবারে মিথ্যে মনে হয়। জেঠাবাবুর বাড়িটার হৃদয়ে হয়তো অকারণেই আজ ভোরের বাতাসে দোলা লেগেছে—সেই চিরকেলে শান্ত স্নিগ্ধ প্রীতির নীড়ে কোন নতুন আনন্দের কলরব হয়তো জেগে উঠেছে। শুভা তাকিয়ে রইল।

মঞ্জু ও রজনীবাবু তাকিয়ে রইলেন শুভার দিকে। তাঁদের কাছে শুভাই যেন আজকের নতুন রহস্য। রজনীবাবুর চেহারাটা পোড়া মানুষের মত কালিমাচ্ছন্ন। ভয়ানক রকমের বুড়ো দেখাচ্ছে রজনীবাবুকে। শুধু দু'চোখে দুটো তীব্র দৃষ্টি শিখায়িত হয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে নিলেন রজনীবাবু। মনের ভেতর একটা যন্ত্রণার সঙ্গে যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়ছিলেন তিনি। ছট্‌ফট্ করছিলেন—বহু আয়াসে পাঁয়তাড়া করে একটা প্রজ্জ্বলন্ত হিংসার আক্রমণ থেকে যেন আত্মরক্ষা করছিলেন। বোধ হয় তাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নিরীহ খরগোসের মত ক্ষীণপ্রাণ পাশের বাড়ির যে-মেয়েটা সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে, এই সর্বনাশা আঁচ লাগতে পারে তার গায়ে। তাহ'লে আর সইতে পারবে না। মুখ ঘুরিয়ে রজনীবাবু যেন একটা আগুনের নিশ্বাস অন্য পথে সরিয়ে দিলেন।

শুভার দৃষ্টিতে হাজারো প্রশ্ন চক্‌চক্ করে ভাসছিল। তবু মুখে তার কোন প্রশ্ন ছিল না। শুভার পক্ষে এই সংযম খুবই অস্বাভাবিক। হঠাৎ এত ভোরে সূর্যালোকের ঘুম ভাল করে ভাঙার আগেই শুভা একটা অশরীরী আবির্ভাবের মত এসে দাঁড়িয়েছে। এটাও একান্ত অস্বাভাবিক। এল যদি, তবে চুপ করে তাকিয়ে থাকারও কোন অর্থ হয় না। রজনী জেঠাবাবুর সামনে চায়ের পেয়ালার ধোঁয়া উঠছে, অথচ শুভা চুপ করে থাকবে, কথা বলবে না, চায়ে ভাগ বসাবার জন্য উপদ্রব করবে না—এসবই বলতে গেলে পার্থিব নিয়মের ব্যতিক্রম। এরকম কোন দিনও হয়নি।

মঞ্জু একটু দূরে সরে গিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে রইল শুভার দিকে। একটা ক্ষমাহীন কঠোর দৃষ্টি শুভার সমস্ত সত্তাকে যেন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল। না, এই মেয়ে সে-শুভা নয়। সে-শুভা যেন আজ ভোর হতে হতে বরফের পুতুলের মত গলে গেছে। একটা হেঁয়ালির ছায়া দুটো বড় বড় টানা চোখের মমতা নিয়ে আরও অদ্ভুত হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জু দেখছিল শুভার মাথাটা আস্তে আস্তে নুয়ে আসছে। রজনীবাবুর পায়ের দিকে একজোড়া চোখের আর্তদৃষ্টি নিঃসহায় ভাবে লুটিয়ে পড়ছে। নিজেরই মনের উত্তেজনা চাপতে গিয়ে মঞ্জু ঠোটে দাঁত চেপে বার কয়েক থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠলো।

শুভা ডাকলো।—মঞ্জুদি!

মঞ্জু এগিয়ে এসে বললো।—কি?

শুভার কথার ভাণ্ডার যেন সেই মুহূর্তে নিঃস্ব হয়ে গেল। কেন? কেন আজ শুভা চেঁচিয়ে বলতে পারে না—আমার চা কই মঞ্জুদি?

মঞ্জু বললো।—কি বলছিলে বল?

শুভা।—কি হয়েছে, আমাকে কিছু বলছো না কেন মঞ্জুদি? বল শীগ্‌গির, আমার ভয় করছে।

মঞ্জু।—তুমিই বল। অমিদা কোথায়?

শুভা।—আমাকে এ প্রশ্ন কেন মঞ্জুদি?

শুভা নির্ভরহীনের মত দু'হাত বাড়িয়ে মঞ্জুকে ধরবার জন্য এগিয়ে এল। বাধা দিল মঞ্জু। একটু দূরে সরে থেকে আলগোছে শুভার হাতটা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আজ এই ব্যবধান ঘুচতে দিতে সে চায় না। মঞ্জু আজ বিশ্বাস করতে পারে না, এই শুভা গত সন্ধ্যের

গল্পের আড্ডায় কথায় কথায় তারই গায়ে ঢলে পড়েছে।

মঞ্জু বললো।—হ্যাঁ, তোমাকেই বলতে হবে, অমিদা কোথায়?

মঞ্জু দেখলো, রজনীবাবু তেমনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাত তুলে একটা ইঙ্গিত করছেন —যেন স্থানান্তরে সরে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন। মঞ্জু ডাকলো।—এস শুভা।

শাড়ির আঁচলের একটা প্রান্ত দলা পাকিয়ে মুখের ভেতর পুরো শক্ত করে দাঁতে চেপে ছিল শুভা। যেন একটা স্বীকৃতির চাঞ্চল্যকে মনের ভেতরেই চেপে রাখতে চায়। মঞ্জুর নির্দেশ মত আস্তে আস্তে একটা ক্লান্ত অন্তরাত্মাকে জোর করে ঠেলে নিয়ে চললো। কোথায় মঞ্জুদি তাকে নিয়ে চলেছে, কেন নিয়ে চলেছে, আর বুঝতে বাকী নেই। সেই বধ্যভূমির আঘ্রাণ তার সারা অন্তরের পলাতক দুরন্তপনা ধীরে ধীরে অবশ করে আনছে। না গিয়ে উপায় নেই।

প্রমীলাবালা আবার শান্ত হয়ে পুজোর ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। রজনীবাবু বাগানে পায়চারী করছেন। মীনু এসে দরজার কড়া নাড়লো।—তোমরা কী করছো বড়দি, এতক্ষণ ধরে?

মঞ্জু দরজা খুলে দিয়েই বললো।—পুঁটিমাসীমাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় মীনু। তাড়াতাড়ি যা।

মীনু।—কি ব্যাপার? সকাল থেকেই আবার সেলাই নিয়ে পড়েছ দেখছি। শুভা ঘুমোচ্ছে কেন?

একটা বালিশ আঁকড়ে বিছানার ওপর অসাড়ভাবে ঘুমোচ্ছিল শুভা। মঞ্জু একটা আলোয়ান দিয়ে শুভাকে ঢেকে দিয়ে মীনুকে আবার তাগাদা দিল,—পুঁটিমাসীমাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মঞ্জু নিঃশব্দে আবার তার সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসলো। মীনু কিছু ঠাহর করতে না পেরে আপত্তি করলো। ধমক দিল মঞ্জু—যা বলছি, শোন। দেরী করো না।

মীনু চলে যেতে শুভা ধড়ফড় করে উঠে বসলো।—মঞ্জুদি, তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে একবার জেঠাবাবুর কাছে নিয়ে চল।

মঞ্জু।—না, চুপ করে শুয়ে থাক।

শুভা।—আচ্ছা, আমি চুপ করলাম। কিন্তু তুমি এবার রান্নাঘরে যাও। জেঠাবাবুর স্নানের সময় হয়েছে। তুমি যাও, রান্না চাপিয়ে দাও।

মঞ্জু।—তুমি চুপ করে শোও।

শুভা।—কেন মঞ্জুদি?

মঞ্জু।—তোমার অসুখ করেছে।

শুভা।—সত্যি আমার কোন অসুখ করেনি।

মঞ্জু।—তুমি বুঝতে পারছো না।

শুভা।—বার বার আমাকে তুমি তুমি করছো কেন মঞ্জুদি। আর একবার ওভাবে বললে আমার হার্টফেল করবে। সত্যি বলছি মঞ্জুদি। তুমি বুঝতে পারছো না, কী ভয়ঙ্কর ভয় করছে আমার।

মঞ্জু।—আচ্ছা, আর তুই বক্‌বক্‌ করিস্‌ না। চুপ করে শুয়ে থাক্‌।

শুভা।—ঐ জানালাটা খুলে দাও।

জানালা খুলে দিয়ে বসতে না বসতেই দরজায় কড়া নড়লো।

—খুলে দাও বড়দি। পুঁটিমাসীমা এসেছেন।

পুঁটিমাসীমা, মঞ্জু, মীনু আর শুভা। ঘরটা যেন ল্যাবরেটরীর মত—এক গোপন গবেষণার রহস্য বন্দী হয়ে রয়েছে। খুব সাবধানে, খুব আস্তে, থেমে থেমে, কেঁপে কেঁপে কথাগুলি ঘরের ভেতর ছট্‌ফট্‌ করছে—যেন কোন শব্দ বাইরে না যায়।

পুঁটিমাসীমা শুভার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।—অমিয় তোকে ভালবাসে, তুই প্রথম কবে জানতে পারলি শুভা?

শুভা।—পূজোর সময়।

পুঁটিমাসীমা।—তারপর?

শুভা বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগলো।—আমায় ছেড়ে দাও মঞ্জুদি। পুঁটিমাসীমা আপনি দয়া করে চলে যান, আমায় ছেড়ে দিন। আমি জেঠাবাবুর কাছে যাই। আপনারা ভয়ানক খারাপ কথা বলছেন। আমি আর সইতে পারবো না।

পুঁটীমাসীমা বললেন।—তোরা আর একটু অপেক্ষা কর মঞ্জু। আমি এখনি আসছি। শুভা শুয়ে থাক চুপ করে।

পুঁটিমাসীমা চলে যেতে মঞ্জু বললো।—মীনু, তুই যা এখন। আজ আমি রান্নাঘরে ঢুকতে পারবো না।

কাঁদছিল মীনু, তাই উত্তর দিতে পারলো না। মঞ্জু ইসারায় ধমক্ দিল। শুভা একবার পাশ ফিরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।—জেঠাবাবুকে থানায় কেন ডেকেছিল মঞ্জুদি?

মঞ্জু।—পরে বল্‌বো।

শুভা।—যতীদা বাড়ি আসে না কেন?

মঞ্জু।—পরে বলবো।

শুভা।—মঞ্জুদি, তুমি এত সুন্দর দেখতে, তবু...!

মঞ্জু।—চুপ কর শুভা।

শুভা।—নীহারবাবু আজকাল আসেন না কেন মঞ্জুদি?

মঞ্জু।—বড় বাজে কথা বলছিস শুভা।

পুঁটিমাসীমা ফিরে এলেন, সঙ্গে ডাক্তার প্রিয়ম্বদা সেন। মঞ্জু বললো।—চল মীনু।

পুঁটিমাসীমা বললেন।—হ্যাঁ, তোমরা বাইরে যাও। পরে ডাকবো।

মঞ্জু।—কোতোয়ালী অফিসার কাল বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলেছে।

কথাগুলি বলতে গিয়ে অস্বাভাবিক রকমের একটা ভয়ে মাঝে মাঝে থম্‌কে যাচ্ছিল মঞ্জু। উনুনের ওপর কয়লা গোছাতেই পনর মিনিটের ওপর সময় লাগলো। মীনু তরকারীর ডালাটা টেনে নিয়ে বসলো। মঞ্জুর কথাগুলির ভেতর দিয়ে একটা শঙ্কার সঞ্চার ধীরে ধীরে সব কাজের প্রেরণা শিথিল করে আনছিল। অকস্মাৎ যেন একটা অগ্নিপরীক্ষার শিখা জ্বলে উঠলো চারদিকে। সব গোপনতার আবরণ নির্মম ভাবে পুড়ে যাবে আজ। শুভার ভেতর আজ সেই পরিণামের সঙ্কেত চরম হয়ে দেখা দিয়েছে। আর কেউ নয় শুভা। এই দুরন্ত বোকা হাবা মনখোলা মেয়ে, এতটুকু মেয়ে শুভা!

অপরাধীর মত সঙ্কোচে একবার মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল মীনু।

মঞ্জু বললো।—কোতোয়ালী অফিসার বাবাকে ঠাট্টা করেছে।

বলতে গিয়ে মঞ্জুর মুখ কালো হয়ে গেল। মীনু কেঁপে উঠলো। কয়েকটা মুহূর্তের মত আবার দুজনারই মাথা একসঙ্গে ঝুঁকে রইল। একই ধরণের একটা অপরাধের লজ্জা যেন দুজনকেই খর্ব করে দিয়েছে।

মঞ্জু।—থানার লোকেরা নাকি এখানে সিডিশন খুঁজতে উঁকি দিতে এসে লজ্জা পেয়ে ফিরে গেছে। বাবাকে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছে এবার আমাদের পাহারা দেবার পালা শেষ হলো, এখন আপনি নিজেই সেটা করলে ভাল হয়।

শুভার ওপর একটা নির্মম আক্রোশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে রাখলো মীনুকে। পৃথিবীর আলো বাতাসকেও ঘৃণায় ভরে দিল মেয়েটা। নিজের মূঢ়তার দোষে জলে ডুবলো শুভা,

কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত জলস্রোতটাকেই যেন পঙ্কিল করে দিল। এখন স্রোতের কাছে যেই দাঁড়াক না কেন, পৃথিবী বলবে, ডুবে মরার জন্যেই সে দাঁড়িয়েছে।

মঞ্জু।--বাবা সব কথা স্পষ্ট জানতে চেয়েছেন।

ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না মঞ্জু। মনের ভেতর একটা নির্লজ্জ সমালোচনা মুখর হয়ে শতভাবে তার সব সংযম ও শুচিতার প্রত্যয়গুলিকে বিদ্রূপ করছিল। ভালবাসা? ভালবাসা বোধ হয় সাঁতার দেওয়ার মতই একটা আর্ট মাত্র। ভেসে থাকতে পারার আর্ট। শুভা তা জানে না। তাই ডুবে গেছে। সেই মুহূর্তে ওর জীবনের স্রোত পাঁকে ভরে গিয়েছে। এ জীবনের মত মিথ্যে হয়ে গেল শুভা।

—কিন্তু, অমিদা...।

এতক্ষণে অনেক চেষ্টা করে কথা বলতে পারলো মীনু। চশমার কাঁচ দুটো বাষ্পে ঝাপসা হয়ে এল। আজকের ঘটনাটা একটা কশাঘাতের মত যেন শাসিয়ে সব ভালো মন্দ, শ্রদ্ধা প্রীতি বিশ্বাস, সুন্দর ও অসুন্দরকে--সব কিছুকে শুধু নতুন করে নয়, উল্টো করে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

মঞ্জু।—আমার কিন্তু এখানো বিশ্বাস হয় না। অমিদার মত মানুষ...।

যেন এই কথাটারই চূড়ান্ত উত্তর দেবার জন্য রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ালেন পুঁটিমাসীমা। বললেন--প্রিয়ম্বদা চলে গেল।

মঞ্জু ও মীনু একসঙ্গে শেষ উত্তরটার আশায় নিষ্পলক ভাবে পুঁটিমাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে লাগলো।

পুঁটিমাসী বললেন।—প্রিয়ম্বদা বলে গেল...।

মঞ্জু।—কি?

পুঁটিমাসী।—হাঁ, তাই হয়েছে।

পুঁটিমাসীমা নিথর ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। আঁচলে চোখমুখ গুঁজে মীনু ও মঞ্জু সেই স্তব্ধতার সঙ্গে মিশে যাবার চেষ্টা করছিল। মাঝে মাঝে কান্নায় ভেজা এক একটা নিশ্বাস সশব্দে ছটফট করে উঠছিল।

বারান্দায় পায়ের শব্দে এই মৌনতা চোরের মত চমকে উঠলো। রজনীবাবু এসে দাঁড়ালেন, পাশে শুভা। শুভার মুখে সেই ভয়ার্ত বিহ্বলতার তিল মাত্র ছাপ নেই। রজনীবাবু শুভার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোচ্ছিলেন। একটা পরম প্রশ্রয়ের তৃপ্তিতে রজনীবাবুর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল শুভা। বরং বেশ হাসিখুশী দেখাচ্ছে শুভাকে।

রজনীবাবু বললেন।—যে যত খুশী পলিটিক্স কর, আমি বাধা দেব না। আমি বাধা দিতে পারি না, একথা সবাই জান।

পুঁটিমাসী একটা জলচৌকী টেনে রজনীবাবুর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো।—আপনি বসুন।

রজনীবাবু তবু দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন।--কিন্তু পলিটিক্সের নামে যদি অন্য ব্যাপার ঘটতে থাকে তবে আমার পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব।

প্রতিজ্ঞা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ রজনীবাবুর মুখের চেহারা আরও কঠোর হয়ে উঠলো।

--যতী বিদায় হয়েছে। আমিই তাকে বিদায় দিয়েছি। এখানে ফিরে আসার তার আর কোন পথ নেই, অধিকার নেই। আমি ধরে নিয়েছি, ওর মৃত্যু হয়েছে। পলিটিক্স করে যদি ফাঁসী যেত যতী, তবুও আমি মনে করতাম সে বেঁচে আছে। কিন্তু...কিন্তু পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়? মানুষ হয়ে, দেশের কাজের কর্মী হয়ে, যে ও-কাজ করতে পারে--হোক্ সে আমার ছেলে, হোক্ সে তোমাদের আদরের দাদা, আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না।

উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন রজনীবাবু। শুভা শক্ত করে রজনীবাবুর হাতটা ধরেছিল।

—আমি বোধ হয় কাউকেও ক্ষমা করতে পারবো না। তোমাকেও না মঞ্জু।

উঠে গিয়ে একটু আড়ালে সরে যেতে পারলে মঞ্জু বোধ হয় ভাল করতো। কিন্তু যেতে পারলো না। রজনীবাবুর ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সামনে সম্মোহিত জীবের মত বিবশ হয়ে বসে রইল।

—নীহার চরকা তাঁত নিয়ে দেশোদ্ধার করে, ভাল কথা। নীহারের পলিটিক্স তোমার যদি সত্যি পছন্দ হয়, তা'ও ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য নীহারকেই পছন্দ করার কোন কারণ হতে পারে না। যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে, তবে অন্তত এইটুকু স্বীকার করার সাহস তোমার থাকা চাই যে, আসলে নীহারের পলিটিক্সের জন্য তোমার কোন আন্তরিকতা নেই।

পুঁটিমাসী রজনীবাবুকে আর একবার অনুরোধ করলেন।—আপনি বসুন। বসে কথা বলুন।

—মীনু, তুমিও আমায় দুঃখ দিলে। শরদিন্দু তোমার টিউটর, শরদিন্দু ইকনমিক্স ভাল বোঝে, শরদিন্দু সোস্যালিস্ট বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। এ সবই দোষের কিছু নয়। সেই সঙ্গে তুমিও যদি সোস্যালিস্ট বিপ্লবের স্বপ্নে বিশ্বাস করতে আরম্ভ কর, তাতেও আমি দোষ দেখি না। কিন্তু, সেইজন্য তোমার ভবিষ্যৎ শরদিন্দুর নামে উৎসর্গ করে দিয়ে বসে থাক্‌বে—এ কেমন কথা? একবার তো যাচাই করে দেখতে হয়, সত্যি সত্যি তোমার জীবনের কাম্য কোন্ বস্তুটি? সোস্যালিস্ট বিপ্লব না শরদিন্দু?

একে চোখ খারাপ, তার ওপর স্তরে স্তরে বাষ্পের পর্দা নেমে আসছে। মীনুর কাছে সবই ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে। রজনীবাবুর কথাগুলি একে একে ফুঁ দিয়ে যেন অতি নিভৃতের গোপনকরা এক একটা বাতি নিভিয়ে দিচ্ছে। একটা অপমানের ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য মীনু যেন হাত-পা গুটিয়ে মাথাগুঁজে বসেছিল।

যেন একটা চার্জশীট পড়ছিলেন রজনীবাবু। পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন গুছিয়ে একটা রায় দেবার চেষ্টা করছেন।

—একে পলিটিক্স বলে না, একে আদর্শনিষ্ঠা বলে না। পলিটিক্স তোমাদের কাছে সুন্দর একটি অছিলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতী যে ভুল করেছে, তোমরা তারই পুনরাবৃত্তি করতে চলেছ। তারপর অমিয়, অমিয় যদি...।

রজনীবাবু থেমে গেলেন। তাঁর নিজেরই যুক্তির আঘাতে থিওরীটা এখানে এসে যেন ভেঙে পড়লো। তাঁর সিদ্ধান্তের সূত্রগুলি হঠাৎ একটা উল্টো টানে ছিঁড়ে গেল। অমিয়র পলিটিক্স নেই। সে কোন আদর্শের ধার ধারে না। অমিয় ভালছেলের মত শুধু পরীক্ষায় পাস করে, কিছুদিন ছবি আঁকে, তার পরে গানের স্কুলে ভর্তি হয়। তার পর সব ছেড়ে দিয়ে বসে বসে দিন গোনে--আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে—মুন্সেফী চাকরীর জন্য সুপারিশ যোগাড় করতে ঘোরাঘুরি করে।

অমিয়র পলিটিক্স নেই। ভাবতে গিয়ে রজনীবাবুর আর একটা বহুকালের প্রত্যয় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সারা মকতপুর রজনীবাবুকে শ্রদ্ধা করে, রজনীবাবু যেন স্বয়ং একটি পলিটিক্সের মহীরুহ। আদর্শের সেবায়, দেশের কাজে সংগ্রামের আহ্বানে কোন নির্যাতনের আঘাত তাঁকে নুইয়ে দিতে পারেনি। তাঁর জীবন, তাঁর জীবিকা, তাঁর সংসার—সবই সেই এক সত্যের দীক্ষাকে সার্থক করে চলেছে। যতী, মঞ্জু, মীনু পলিটিক্স করবে—নিশ্চয় করবে। চিরকালের সংগ্রামী রজনীবাবুর দুর্গের অন্তরে এক একটি নতুন প্রতিধ্বনির মত এরা জেগে উঠেছে। এই বিশ্বাসের সম্পদ রজনীবাবুর পিতৃত্বের সংস্কারে একটা অনড় স্পর্ধা এনে দেয়। কিন্তু অমিয়? অমিয় একটি ব্যতিক্রম, রজনীবাবুর গর্বের জলুস মুছে যায়, সারা অন্তঃকরণ একটা রিক্ততায় উদাস হয়ে পড়ে।

পুঁটিমাসী এইবার একটু জোর গলায় অনুরোধ করেন।—আপনি বসে কথা বলুন। তারপর শুভাকে লক্ষ্য করে বললেন।—তুই এবার বাড়ি যা শুভা।

শুভার আচরণে চলে যাবার মত কোন উৎসাহ ছিল না। রজনীবাবু শুভার হাত ছেড়ে দিয়ে চৌকির ওপর বসলেন। শুভা কিছুক্ষণ রজনীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি ভাবলো তা সেই জানে। তার পর আর দ্বিধা করলো না। সুদীর্ঘ বারান্দাটা নিমেষের মধ্যে তর্‌তর্‌ করে পার হয়ে ফুলবাগানের ভেতর দিকে এঁকে বেঁকে পাঁচিলটা এক লাফে ডিঙিয়ে চলে গেল শুভা। শুভা খুশী হয়েছে। এ-বাড়ীর ঘুমন্ত রহস্য তোলপাড় করে দিয়ে, তারই হাওয়া গায়ে মেখে, একটা সার্থক কৌতূহলের আনন্দ নিয়ে চলে গেল শুভা।

কিন্তু রজনীবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেছে। অসহায় পীড়িতের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। যতী, মঞ্জু ও মীনু যদি মিথ্যে হয়, তবে অমিয়ই সত্য হয়ে ওঠে। অমিয় সত্য হলে তিনি নিজেই মিথ্যে হয়ে যান।

এতক্ষণ যেন নিজের ছায়াকেই ভুল করে ধমক দিচ্ছিলেন রজনীবাবু। যতী, মঞ্জু ও মীনুর পলিটিক্স যদি অলীক হয়, তাহ'লে তিনি নিজেই যে অলীক হয়ে যান।

রজনীবাবু যেন আবেদন করলেন।—মঞ্জু, মীনু, আমার সামনে এসে বসো। দুঃখ করার কিছু নেই। আমি বলছি, সব ভাল হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঞ্জু ও মীনু সাড়া দিল না। পুঁটিমাসীই হাঁক দিলেন—আয় তোরা। সামনে এসে বস।

রজনীবাবু।—দেশের কাজ, পলিটিক্স, আদর্শ। হাঁ, নিশ্চয় চাই। আমার ছেলে, আমার মেয়ে কি তা ছাড়তে পারে? কিন্তু অমিয়? অমিয় এ-বাড়ির দুঃস্বপ্ন। ও আমার জীবনের আতঙ্ক। এই আতঙ্কের সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া চাই। কিন্তু কোথায় গেছে সে? হ্যাঁ, শুভা কিছু বল্‌তে পারলো, অমিয়র খবর?

রজনীবাবু মুখের ওপর এই প্রশ্নের উত্তর শুনিয়ে দেবে কে? সত্য কথা বলার অর্থ এই ধৈর্যের পাহাড়ের গায়ে একটা দাবানলের ফুল্‌কি ছেড়ে দেওয়া। আজ সকাল থেকেই এ-বাড়ির চিরশান্ত সত্তা হঠাৎ প্রহত গ্রহের মত দুলতে আরম্ভ করেছে। এখনো কক্ষপথে আছে, কিন্তু এর পর? এর পর চরম বিপর্যয়কে ঠেকিয়ে রাখার আর কোন পথ নেই।

মঞ্জু মীনু পর পর উঠে রজনীবাবুর পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। পুঁটিমাসী একটু শক্ত হলেন, গলা ঝাড়া দিয়ে নিলেন। তারপর উত্তর দিলেন,—অমিয় কোথায় গেছে, শুভা কিছু বলতে পারলো না।

রজনীবাবু।—শুভার সঙ্গে অমিয়র কবে এতটা অন্তরঙ্গতা হলো?

পুঁটিমাসী।—তা'তো আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। মঞ্জু মীনু—ওরাও কিছু জানে না।

রজনীবাবু।—কিন্তু হতভাগা পালায় কেন? আপনাদের কাছে এসে মনের ইচ্ছা খুলে বলুক। তারপর যা হয় একটা...।

পুঁটিমাসী।—শুভার কথায় যা বুঝলাম, আর ডাক্তার প্রিয়ম্বদা যা বলে গেল, তাতে ব্যাপারটা খুবই লজ্জাকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রজনীবাবু।—ডাক্তার প্রিয়ম্বদা? কেন?

পুঁটিমাসী।—তাকে আমিই ডেকে এনেছিলাম। শুভা এখনো কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

রজনীবাবু টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালেন।—বুঝলাম, আর আমার কানে বিষ ঢালবেন না। সরে যান আপনি, সবাই সরে যাক্‌ আমার সামনে থেকে। বলেছিলাম, ও একটা দুঃস্বপ্ন। ও একটা আতঙ্ক। যতীর ভাই অমিয়। যতী নিজেকে নষ্ট করেছে—নিজের মনুষ্যত্বকে খুন করেছে—দূর হয়েছে। কিন্তু এই দুঃস্বপ্ন আমাকে খুন করে গেল। কিন্তু...।

রজনীবাবু যেন থেকে থেকে একটা হিংস্র গর্জন করছিলেন। সেইভাবে টলতে টলতে সবেগে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলেন। আলনা থেকে একটা চাদর নামিয়ে কাঁধে ফেললেন। হাতছড়িটা তুলে নিয়ে দরজার বাইরে পা এগিয়ে দিতেই তিনটি সন্ত্রস্ত মূর্তি পথের মাঝে

বাধার মত এসে দাঁড়ালো—মঞ্জু, মীনু ও পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু।—তোমরা আবার এর মধ্যে আস কেন?

পুঁটিমাসী।—কোথায় চললেন আপনি?

রজনীবাবু।—ঐ দুঃস্বপ্নকে পেনাল কোডের হেপাজতে সঁপে দিতে যাচ্ছি।

পুঁটিমাসী।—কোথায়?

রজনীবাবু।—থানায়, ডায়েরী করিয়ে আসি।

পুঁটিমাসী।—আপনি ভেবে দেখছেন না, তাতে কার শাস্তি হবে।

রজনীবাবু।—শাস্তি যার হবার তার হয়ে গেল। এই শাস্তিটুকু পাওয়া ছিল বলেই বোধ হয় রজনী মিত্র আজও বেঁচে আছে। আমাকে কেউ বাধা দিতে আসবেন না। এ সংসারের ভাগ্য আর আমার হাতে নেই। বুড়ো হয়েছি, এইবার সংসার থেকে পেন্সন নিতে হবে। পাঁচটি ষড়যন্ত্র মামলা আর পনেরটি বে-আইনী আন্দোলনের আসামী রজনী মিত্তির—বহু জেরার উত্তর দিয়েছে, বহু স্টেটমেণ্টে সই করেছে। সেই রজনী মিত্তির যে নিজেই কত বড় একটা ব্যর্থতা—আজ শেষবারের মত সেই স্টেটমেণ্ট দিয়ে আসি।

পুঁটিমাসী।—না, থানায় যেতে পারবেন না আপনি।

রজনীবাবু।—না গিয়ে উপায় নেই। আমি এবার পেন্সন নেব। তারপর যার যা ইচ্ছে করুক্।

রজনীবাবু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। মঞ্জু ডাকলো।—বাবা!

মীনু রজনীবাবুর কাঁধ থেকে চাদরটা তুলে নেবার জন্য এগিয়ে এল।—তুমি বসো বাবা।

রজনীবাবু সরে গিয়ে দাঁড়ালেন।—বাধা দিও না, ভুল হবে।

নেপথ্য থেকে হঠাৎ-আবির্ভাবের মত সবার পেছনে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন প্রমীলাবালা। পূজার ঘর থেকে উঠে আসছেন—একটা ফিকে চন্দনের গন্ধ যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

পুঁটিমাসী সরে দাঁড়ালেন।—তুমি এখানে কেন মা? বলতে বলতে মঞ্জু ও মীনু একটু বিস্মিত হয়ে সরে দাঁড়ালো।

কোন তপস্বিনীর যেন শান্তিভঙ্গ হয়েছে। একটি শীর্ণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মূর্তি রজনীবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো—কি হয়েছে?

সেই মুহূর্তে রজনীবাবু যেন সমাধিস্তম্ভের মত স্থির হয়ে গেলেন। সেই ঝঞ্ঝার রেশমাত্র নেই।

প্রমীলাবালা বললেন—সব শুনেছি, কিন্তু তাতে হয়েছে কি?

সমুখের গরদপরা মূর্তিটির দুই চোখ থেকে এই ছোট একটি জিজ্ঞাসা শাণিত আভার মতো ঠিকরে পড়ছিল।

রজনীবাবুর মধ্যে ধীরে ধীরে একটু চাঞ্চল্য জাগলো—তুমি যাও।

প্রমীলাবালা বললেন—তুমি বসো।

রজনীবাবু—তুমি পূজোর ঘরে থাক, তোমার কোন দায় নেই। আমি সংসারে থাকি, আমার দায় আছে। কাজেই আমাকে বসতে বলো না, বাধা দিও না।

প্রমীলাবালার চোখের দীপ্তি আরও প্রখর হয়ে উঠলো।—কি করতে চাও?

রজনীবাবু—দুঃস্বপ্নের প্রশ্রয় দিতে পারব না। পাপ ঢুকতে দেব না সংসারে।

প্রমীলাবালা—কিসের পাপ?

রজনীবাবু—যখন সবই শুনেছ, তখন আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?

প্রমীলাবালা—আজ একে পাপ বলছো কেন? নতুন করে শিখেছ, না নতুন করে ভুলে গেছ?

রজনীবাবু—তুমি যাও।

প্রমীলাবালা—উত্তর দাও।

পুঁটিমাসীর মাথায় ভিতর বোধহয় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। নইলে ততক্ষণে মঞ্জু ও মীনুকে নিশ্চয় সরে যেতে বলতেন। সমুখের দৃশ্যটা বর্তমানের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চকিতে পঁয়ত্রিশ বছরের বিস্মৃতি ভেদ করে অতীতের এক রূপকথার মধ্যে এসে পৌঁছে গেছে। অতি পুরাতন রূপকথা—বলবার মত নয়, শোনবার মত নয়। স্বদেশী স্বাধীনতা সংগ্রাম বিপ্লব—জীবন ও মরণের আহ্বান। ঝড় আসে—শত্রু মিত্র হয়ে যায়, মিত্র শত্রু হয়ে পড়ে। বুক ছাপিয়ে সঙ্কল্পের বান ডাকে—ভেসে যেতে হয়। রাজপাটপুরের জমিদার বাড়ির তরুণী বধূ ভেসে যায়। দুঃসাহসিক দেশব্রতী যুবকের বলিদানের মধ্যে নতুন পৃথিবীর জ্যোৎস্না ঝরে। পরম আশ্বাসে চিরদিনের মত আশ্রয় বেঁধে নেয়। রজনী মিত্তিরের সংসার গড়ে ওঠে। পুঁটিমাসী সব জানেন—সব জানেন।

রজনীবাবু বললেন—আমার কাছে উত্তর দাবী করার সময় পার হয়ে গেছে। পঁয়ত্রিশ বছর আগেই এ প্রশ্ন করা উচিত ছিল।

প্রমীলাবালা—সময় পার হয়ে যায় নি। এতদিনে সময় হয়ে এসেছে।

রজনীবাবু—আমার সারাজীবনের সাধনাকে ব্যর্থ করে কোন পাপের ফাঁকিকে বড় হতে দেব না।

প্রমীলাবালা—কিন্তু সেই পাপের ফাঁকিই যে সত্যি বড় হয়ে উঠছে, আর তার মূল তুমি নিজেই।

প্রমীলাবালার মুখের দিকে তাকিয়ে পুঁটিমাসীর বুক দুর্‌দুর্‌ করে উঠলো। প্রমীলাবালার এ কেমন নির্লজ্জ নিঃশঙ্ক ও নিষ্ঠুর মূর্তি! এই ধিক্কারকেই কি প্রমীলাবালা এতদিন পুজোর ঘরে ধূপের ধোঁয়ায় চেপে রেখেছিলেন? এ বাড়ির সুখ শান্তি সেবাধর্ম শুধু কি একটা ছদ্মবেশ? রাজপাটপুরের গ্লানিটাই কি শুধু গোপনে গোপনে সজীব হয়ে আছে?

প্রমীলাবালা যেন শেষ সাবধানবাণী শুনিয়ে দিলেন—আজ পাপকে এত ভয় কেন তোমার? তোমার নিঃশ্বাসে যে ফাঁকির বীজ ছিল, আজ সংসারে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এত রাগ কেন? কিসের অহঙ্কার? কিসের এত বাড়াবাড়ি? যতী গেছে—আমি বেঁচে থাকবো যতদিন যতী না ফিরে আসে, কেউ যাবে না। অমিয় থাকবে, মঞ্জু থাকবে, মীনু থাকবে। আমি সবাইকে নিয়ে থাকবো, কাউকে সরিয়ে দেবার অধিকার তোমার নেই। রাজপাটপুরের বড় বাড়ির যে-শান্তি লুঠ করে নিয়ে পালিয়েছিলে, আজ তা ফিরিয়ে দিতে পারবে?

পুঁটিমাসীর যেন হুঁস ফিরে এল। ব্যস্তভাবে মঞ্জু ও মীনুকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন—যা, যা, তোরা এখান থেকে যা। তোদের এখানে কোন কাজ নেই।

কিন্তু সকল মৌনতার ঝাঁপ ঠেলে পুরনো ইতিহাসের কাহিনীটা সাপের মত হিসহিস করে ফণা তুলে উঠেছে। মঞ্জু শুনলো, মীনু শুনলো—বাড়ির থামগুলো শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল। পুঁটিমাসী যা ভয় করছিলেন, তাই হয়ে গেল।

প্রমীলাবালা—পরের ঘরের ধর্মের জন্য যার এতটুকু ব্যথা মনে বাজে নি, নিজের ঘরের ধর্মের জন্য তার এত দরদ আসে কোথা থেকে?

পুঁটিমাসী প্রমীলার মুখ চেপে ধরলেন—ছি ছি প্রমীলা। কি সব সৃষ্টিছাড়া কথা বলছ তুমি।

প্রমীলাবালা—না দিদি, ওকে বুঝতে দিন যে ওর সারা জীবনের আদর্শটা কত বড় ভড়ং, আর ঐ পাপের ফাঁকিটা কত বড় সত্য। নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখুন উনি—কোনটা সত্য।

বলতে বলতে কাঁদতে লাগলেন প্রমীলাবালা। চোখের দৃষ্টি লক্ষ্যহীন হয়ে এল। আস্তে আস্তে মেঝের ওপর বসে পড়লেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। রুদ্ধ গুঞ্জনের মত করুণভাবে

কাঁদতে লাগলেন প্রমীলাবালা—যতী, যতী, যতী।

যেন কেউ পুরাকীর্তির একটা স্তূপ খনন করে চলে গেছে। সারা বাড়ির মনের হাওয়াটা সেই রকম—এলোমেলো, গম্ভীর, বিষণ্ণ, বিপর্যস্ত। নতুন আর পুরাতন দিনের মাটি আর পাথরে, আনাচে কানাচে আর অভ্যন্তরে, নানা ইতিহাস গোপন হয়েছিল। আজকের ঘটনাটা প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদালের মত সব ওলটপালট করে দিয়ে গেছে। আজ আর কোন অন্ধকার নেই, কোন আড়াল নেই—সব খোলাখুলি দেখা গিয়েছে। যা জানবার মত ছিল না, তা সবই জানা হয়ে গেছে।

এতদিন ধরে ভুল করে জানার মধ্যেই সংসারের গতিটা তবু তাল-মান-ছন্দ রেখে একরকম চলছিল। কিন্তু আজ সত্যি করে জানাজানির আলোকে সংসারের চক্ষু ধাঁধিয়ে গেছে—চলবার যেন আর শক্তি নেই। এভাবে চলবার রীতিও জানা নেই।

প্রমীলাবালা পুজোর ঘরে ঢুকেছেন। আজকের মত আর বের হবেন না নিশ্চয়। পুঁটিমাসী আজ আর স্কুলে যেতে পারলেন না। হেড মিস্ট্রেসকে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। পড়ার বইগুলো বাঁধাছাঁদা করে আলমারিতে তুলে বন্ধ করেছে মীনু। রান্না একরকম শেষ করেছে মঞ্জু, ব্যস, ঐ পর্যন্ত! আজ আর খাওয়া দাওয়ার পাট নেই। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে নিজের ঘরে এসে বসেছে—বন্দী হয়ে আছে।

রজনীবাবু শুয়ে পড়েছেন—একটা সত্তাহীন শরীর যেন ভস্মশয্যার ভেতর লুপ্ত হতে চাইছে। প্রতিমিনিটে তিনি বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন—নামতার অঙ্কের মত। আজ আর কোন দ্বন্দ্ব নেই। প্রমীলাবালার ধিক্কার সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দিয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত আদর্শের চক্ষু বৃথাই এতদিন খবরদারী করেছে। চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাঁর প্রতি নিঃশ্বাসের অহঙ্কারকে ব্যর্থ করে জীবনের কষ্টটাই শুধু গোপনে জীবাণু ছড়িয়েছে। গোপন বলেই এত দূষিত, এত দুর্মর।

রজনীবাবু থানায় যেতে চাইছিলেন ; যেতে হয়নি। তিনি হাল ছেড়ে দিতে চাইছিলেন। প্রমীলাবালা এগিয়ে এসে হাল ভেঙে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন, ভালই হয়েছে। সব উদ্বেগ চুকে গেছে। এবার থেকে কখন সূর্য উঠবে আর ডুববে—সে খবর রাখতেও তিনি আর চান না।

পুঁটিমাসীমা তবু জীবনের স্পন্দনচিত্তের মত বাড়িভরা গুমোটের মধ্যে একটু নড়ে চড়ে ফিরছিলেন। সন্ধ্যে হলে তিনিই আলো জ্বাললেন। তারপর রজনীবাবুর বিছানার কাছে সাহস করে তিনিই এগিয়ে গেলেন।

পুঁটিমাসী—আপনি এভাবে মুষড়ে পড়বেন না।

রজনীবাবু চমকে তাকালেন। কানে আঙুল দিলেন। তারপর হাত নেড়ে আপত্তি করলেন —কোন কথা শুনতে তিনি নারাজ।

পুঁটিমাসী তবু বিচলিত হলেন না—সুনাম দুর্নামের জন্য বলছি না। এতগুলি ছেলেমানুষের জীবনের শান্তিকে একটা আপদের মুখে ছেড়ে দিলে তো চলবে না। আপনি অবুঝ হলে সব যে নষ্ট হবে!

রজনীবাবু—যা করার প্রমীলা করবে। আমার আর শক্তি নেই।

পুঁটিমাসী—ছাই করবে প্রমীলা। সে পুজোর ঘরে টুংটাং করুক, তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে নিচ্ছেন কেন আপনি?

রজনীবাবু—প্রমীলা খাঁটি কথা বলেছে। অতি সত্য কথা। বিষবৃক্ষে বিষ ফলবে, এর মধ্যে মিথ্যে নেই।

পুঁটিমাসী।—এসব বিকার রোগীর কথা। আপনার মুখে একথা শোভা পায় না।

রজনীবাবু।—কিন্তু আমার আর কিছু করবার নেই। যার যা ইচ্ছে হয় করুক। আমার

আপত্তি নেই, সমর্থনও নেই। আমি অভিশাপ দেব না, আশীর্বাদও করতে পারবো না।

পুঁটিমাসী।—মঞ্জু ও মীনুর বিয়ে হয়ে যাক।

রজনীবাবু কোন সাড়া দিলেন না।

পুঁটিমাসী।—নশুবাবুর সঙ্গে কথা বলি। শুভাও আপনার কাছে নিজের মেয়েদের চেয়ে কিছু কম নয়।

রজনীবাবু তেমনি নিরুত্তর ভাবে পড়ে রইলেন।

পুঁটিমাসী।—খোঁজ করছি, যে'করে হোক্ অমিয়কে ঘরে ফিরিয়ে আনতেই হবে। শুভাকে যখন ওর ভাল লেগেছে তখন তাড়াতাড়ি দুজনকে এক করে দেওয়াই ভাল। আর অপেক্ষা করারও বেশী সময় নেই।

রজনীবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

পুঁটিমাসী জুতো জোড়া পায়ে দিলেন। ছাতাটা হাতে তুলে নিলেন। একটা টুলের ওপর ক্লান্ত ভাবে বসে নিয়ে ডাক দিলেন।—মঞ্জু, মীনু, কোথায় তোরা?

পুঁটিমাসী ডাক দিলেন, তাই দুটো অর্গলবদ্ধ ঘরের কপাট শব্দ করে নড়ে উঠলো, দুটি জীবনের অস্তিত্ব সাড়া দিল। নইলে, বাড়িটা এতক্ষণ ধরে একটা মূর্ছার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল—গভীর থেকে গভীরে, যেন আর জেগে উঠতে না হয়।

মঞ্জুকে দেখে পুঁটিমাসী বলেন।—যা, একটু চা করে নিয়ে আয়। এবার আমি উঠবো।

মীনুকে বললেন।—একটু হাওয়া কর আমাকে। মাথাটা সেই যে ধরে উঠেছে, আর ছাড়ছে না।

অকস্মাৎ তিনজনেই একসঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে দূরায়াত বিলাপের মত একটা আর্তনাদের ভাষা বুঝবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। তিনজনে একসঙ্গে বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারের ভেতর নশুবাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। মীনু বললো।—কাকিমা বোধ হয় শুভাকে মারধোর করছেন।

মঞ্জু বললো।—এক পাত্রপক্ষ এসেছে আজ বিকালে মেয়ে দেখতে।

কাঁদছিল শুভা। নশুবাবুর খিড়কির দরজা ভেদ করে কৎবেল গাছের ভীড় ঠেলে কান্নার শব্দটা স্পষ্ট ভেসে আসছিল। শোনা যায়, শুভার মায়ের সক্রোধ আস্ফালন থেকে থেকে সরব হয়ে উঠছে। অনুরোধ করছেন, শাসাচ্ছেন, তার পর ধৈর্য হারিয়ে বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ছেন।

পুঁটিমাসী অসহায় ভাবে খেদোক্তি করলেন।—নাঃ, সব গেল! আর সাধ্যি নেই আমার। আর কত সামলাবো! তবু চল একবার দেখে আসি।

মঞ্জু ও মীনু আপত্তি করলো। পুঁটিমাসী অনুযোগের সুরে যেন ধমক দিলেন।—ভাবছো, আলগোছে সরে থাকলেই সব নিষ্পত্তি হয়ে যাবে? ওসব চল্‌বে না—সবাই এগিয়ে এস, সাহস কর। আপদ যখন বেধেছে, তখন পালিয়ে থেকে লাভ কি? সবাই মিলে ব্যবস্থা করতে হবে। সব দিক দেখতে হবে।

তিনজনে এগিয়ে গেল, কিন্তু পাঁচিলটা পর্যন্ত এসে থেমে যেতে হলো। এখান থেকেই সব দেখা যায়—সব শোনা যায়। বৈঠকখানা ঘরে পেট্রোম্যাক্স বাতির উজ্জ্বলতার মধ্যে সাত আটটি ভদ্রলোকের মূর্তি নড়ছে। ছায়ার মত ঘুরে ঘুরে ভুলু পানের থালা আর সিগারেটের ডিবে ধরছে সমাগত সজ্জনদের সামনে। নশুবাবু সৌজন্যের ভারে একেবারে বেঁকে কুঁকড়ে অমানুষের মত হয়ে গেছেন। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখবার জন্য বার বার তাগিদ দিচ্ছিলো।

এদিকে ভাঁড়ার ঘরটায় একটা আলো জ্বলছে। শুভার মা দাঁড়িয়ে আছে—হতাশায় ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ একটা মূর্তি। মেঝের উপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে শুভা। একটা পাট-ভাঙা ঢাকাই শাড়ি ও ব্লাউজ হাতে নিয়ে চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়ছেন শুভার মা।—ওঠ্ বলছি।

এখনো ভালয় ভালয় ওঠ্।

শুভা।—আমি পারবো না। ওসব অনেক পরেছি, আর আমায় পরতে বলো না।

শুভার মা হঠাৎ শরীরটা ঝাঁকিয়ে শুভার একটা কান ধরলেন।—কি বললি? এতগুলি ভদ্রলোককে অপমান করার জন্য ডেকে নিয়ে এসেছি?

শুভা।—আমাকে চার বছর ধরে অপমান করেছে, আমি না হয় একদিন করলাম।

শুভার মা চড় তুললেন।—এসব কথা তোকে কে শিখিয়েছে মুখপুড়ী? বল শীগগির।

শুভা।—এতদিন ধরে শিখেছি। আজ বলছি।

শাড়ি আর ব্লাউজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুভার মা ধিক্কার দিলেন।—ভগবান এত মুখ্যু জীবও সৃষ্টি করেছিলেন! নিজের ভাল মন্দ বুঝলি না! তোর আর বেঁচে থেকে লাভ কি?

কিছুক্ষণ স্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে থেকে শুভার মা চোখে আঁচল দিলেন। তারপর সস্নেহে ডাকলেন—ওঠ্ লক্ষ্মী মেয়ে। এরকম করতে নেই।

শুভা।—মাপ কর মা। আমি পারবো না।

শুভা ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। শুভার মায়ের মুখের ভাব আবার নির্মম হয়ে উঠছিল। পুঁটিমাসী ঢুকলেন ঘরের ভেতর।—কি হলো ভুলুর মা?

শুভার মা একটু অপ্রস্তুত হলেন।—দেখুন বেয়াড়া মেয়ের কাণ্ড।

পুঁটিমাসী।—কিন্তু মারধর করে কোন লাভ নেই ভুলুর মা। ভদ্রলোকেরা আজ চলে যাক।

শুভার মা বিস্মিত হলেন।—কি বলছেন দিদি?

পুঁটিমাসী।—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। জোর করার দিন আর নেই, ছেলেমেয়ের বাপমা'কে এখন এই কথাটা বুঝতে হবে। ওঠ্ শুভা।

মঞ্জু ও মীনু মনে মনে আশ্চর্য না হয়ে পারছিল না। এই শুভা কি সত্যই সে শুভা? এ কি অবুঝ মেয়ের চেহারা? ওর বড় বড় চোখের মধ্যে কী একটা তীব্র দৃষ্টি লুকিয়ে আছে। এই চাউনিটাই ওর সব চেয়ে বড় সম্বল তারই জোরে যেন শুভা সব দেখতে পাচ্ছে। দেখা মাত্র বুঝে ফেলছে। আগে শুভাকে দেখে কার না মায়া হতো? এত বোকা অসহায় মেয়ে। মনে হতো, ওর ভেতর কোন প্রতিবাদ নেই—পছন্দ অপছন্দ, কাম্য অকাম্য, ঘৃণ্য বরেণ্য কোন বিচারের বালাই নেই। শিমুল তুলোর আঁশের মত লঘু একটা সত্তা—ঝড়ে উড়িয়ে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই পড়ে থাকবে। শুভাব মুখের দিকে তাকিয়ে মঞ্জু ও মীনুর ভাবনাগুলি একে একে সেই পুরাতন ধারণার ধার ভেঙে দিচ্ছিলো। শুভা যেন হঠাৎ কোথা থেকে এক দুঃসাহসের কোহিনুর কুড়িয়ে পেয়েছে। খুবই গোপনে পুষে রেখেছে। তাই ওকে চিনতে এত ভুল হয়।

শুভার মা আর কোন কথা বললেন না। মূক দর্শকের মত চুপ করে বসে রইলেন। পুঁটিমাসী এগিয়ে গেলেন বৈঠকখানা ঘরে। ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে পুঁটিমাসী অপরাধীর মত বললেন।—মেয়ের যে হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়লো।

পাত্রপক্ষের ভদ্রলোকেরা চমকে উঠলেন। ভুলু এক দৌড়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। নশুবাবু পুঁটিমাসীর মুখের দিকে একবার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বৈঠকখানা ছেড়ে অন্দরের দিকে চলে এলেন।

পাত্রপক্ষের কর্তাগোছের ভদ্রলোক বললেন।—তা হলে...

পুঁটিমাসী—তা হলে আজকের মত আপনাদের উঠতে হয়। খুবই কষ্ট হলো আপনাদের।

কর্তাগোছের ভদ্রলোক রুক্ষভাবে উত্তর দিলেন।—আজকের মত বলছেন কেন? আশা করছেন যে আবার আর একদিনের মত আসবার গরজ আছে আমাদের?

কি জানি কেন, পুঁটিমাসীর হঠাৎ শুভার মুখটা মনে পড়ে গেল। চার বছরের অপমানে দগ্ধ একটা কান্নাভরা মুখ এই অপমানের জবাব দিতে চেয়েছে। কিন্তু শুভার সেই ইচ্ছাকে

যেন তিনিই ব্যর্থ করে দিচ্ছেন মিথ্যে কথা বলে। পাত্রপক্ষ রুক্ষ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে সগর্বে সরে পড়ছে। শুভার জীবনের একটা তৃপ্তিকে মিথ্যা লৌকিকতার অজুহাতে চূর্ণ করে দিচ্ছেন তিনি।

পুঁটিমাসীর গলার স্বর হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ হয়ে পাত্রপক্ষকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিল।—গরজ হলেও আসবেন না। মেয়ের ইচ্ছে মতই আপনাদের বিদায় করে দিতে হলো। মেয়ের অসুখ করে নি—ভদ্রভোবে বলতে গেলে ওরকম একটা মিথ্যে বলতেই হয়, বুঝতেই পারছেন।

পুঁটিমাসীমা সব উৎক্ষিপ্ত সমস্যাগুলিকে একরকম গুছিয়ে এনেছেন। ভাগ্যিস পুঁটিমাসী ছিলেন, নইলে এবাড়ির সুখ দুঃখের গ্রহটি এই আকস্মিক পথভ্রান্তির বিপাকে বোধ হয় এইখানেই চূর্ণ হয়ে ছন্নছাড়া বাষ্পের মত উড়ে যেত। সব গুছিয়ে আনছেন পুঁটিমাসী। পুঁটিমাসীর হৃদয়টার মধ্যেও যেন অদ্ভুত এক বনৌষধির ধর্ম লুকিয়ে আছে। যেখানে ক্ষয় ক্ষতি ক্লেশ, যেখানে শোক তাপ জ্বালা, সেইখানে তিনি নিজের আবেগে ছুটে আসেন।

রজনীবাবুর বাড়ির ব্যাপার নিয়ে পুঁটিমাসী যে-উদ্বেগ সহ্য করছেন, যে-দুর্ভোগ ভুগছেন, তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা না থাক, অসাধারণত্ব একটু যেন রয়ে গেছে। পুঁটিমাসীর নিজের সংসার নেই ; না থাক. কিন্তু নিজে তো রয়েছেন! তাঁর হার্টের অসুখটাও ঠিক অটুট আছে। কিন্তু তার জন্য বড় বেশী ভাবনা করতে কখনো দেখা যায় না পুঁটিমাসীকে। মকতপুর শহরে আরও দশটা বাড়ির অন্তরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, তবুও ঠিক অন্তরঙ্গ তো হয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু রজনীবাবুর বাড়ি—যতী অমি মঞ্জু মীনু প্রমীলা—এখানে অন্তরঙ্গ হবার কোন প্রশ্ন আসে না। তাঁর অন্তরটাই যেন ছড়িয়ে আছে এদের মধ্যে। রজনীবাবুর বাড়ি পুঁটিমাসীর কাছে একটা মোহ। তাঁর জীবিকা তাঁর চাকরী, তাঁর বাসা—সবই এ বাড়ির বাইরে। শুধু কাজের জীবনের একটা ভেদ তাঁকে এ বাড়ির সীমা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু মন পড়ে আছে এখানে। এ বাড়ির হৃদয়ের আনাচে কানাচে তাঁর মন যেন কাজ খুঁজে বেড়ায়। মনের মত কাজ পেতে হলে, এইখানেই আসেন।

প্রমীলাবালা তো সংসারে থেকেও অবসর নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ঠাকুর ঘরে। আজ রজনীবাবু একেবারে একা। যতী কবেই চলে গেছে। মঞ্জু মীনুও চলে যাবার জন্যই যেন গোপনে খেয়া ডেকে বসে আছে। আর অমিয়? অমিয় যে-কাজ করলো তার নির্মমতার তুলনা নেই। এক অন্ধকারের খরস্রোতে ঝাঁপ দিয়েছে অমিয়, কিন্তু তার আগে যেন রজনীবাবুর সাধের নৌকাটির বৈঠা ভেঙে দিয়ে গেছে। তাই রজনীবাবু শুধু একা নন, একেবারে অচল হয়ে পড়েছেন। প্রতি মিনিটে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন—বিছানা নিয়েছেন।

এই অচলতার মধ্যে একটু চঞ্চলতার ছোঁয়ার মত, এই একাকীত্বের মধ্যে একটু সাথীত্বের পূর্ণতার মত যেন পুঁটিমাসী শুধু সজীব হয়ে আছেন। এইভাবে আগলে রেখে এ বাড়ির হৃদয়কে অবসাদে নেতিয়ে পড়তে দেবেন না তিনি। মীনু মঞ্জুর মুখের হাসি শুকিয়ে যেতে দেবেন না। রজনীবাবুকে বুড়ো হতে দেবেন না। পুঁটিমাসী তাই সব গুছিয়ে আনছেন। তাই অমিয় ফিরে এসেছে। তিনিই ফিরিয়ে আনিয়েছেন অমিয়কে।

অমিয়র সঙ্গে শুভার বিয়ে হয়ে গেল। এই অনাড়ম্বর হাস্যকোলাহলহীন বিবাহরাত্রির বাতিটাও যেন অপরাধীর মত সঙ্কোচে টিম্ টিম্ করে জ্বললো। সারা মকতপুর গোপন সংশয়ে বিড়ম্বিত হলেও রজনীবাবুর মহত্ত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। বিয়ের শেষে শুভার মা একবার আড়ালে গিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে নিলেন। নশুবাবু হুঁকো নিয়ে দূরে সরে রইলেন। মঞ্জু মীনু শুধু কলের মত কাজ করে গেল। এক পুরুতের মন্ত্র ছাড়া আর কোন শব্দ সুর বা সাড়া শোনা গেল না। শুধু সব দিক সামলাতে, খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন পুঁটিমাসী।

পরের দিন ভোরেই শুভা আর অমিয় চলে গেল। মকতপুর ছেড়েই চলে গেল ওরা। কোথায় গেল, সে খবরও কেউ জানলো না, জানতে চাইল না, জানবার আগ্রহও বোধ হয় কারও নেই। হয়তো শুধু পুঁটিমাসী জানেন।

যাবার আগে বিদায় নেবার পালাটা বড় বিচিত্ররূপে দেখা দিল। নশুবাবু তাঁর মেয়ে জামাইয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালেন না, তবু হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করলেন। শুভার মা সজল চোখে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু আশীর্বাদ করতে ভুলে গেলেন। হতভম্ব ভুলু শুধু শুভাকে নিভৃতে পেয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলো।—দিদিভাই, তুই কি লভ্ করে বিয়ে করলি?

তারপর এ-বাড়ি। মঞ্জু ও মীনু চুপ করে থাকলেও, তাদের কর্তব্যের ভুল হয়নি। ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়েছে, একটি একটি করে জিনিসপত্র দেখে শুনে গাড়ীতে তুলে দিয়েছে। অমিয়-র বই আর ছবি আঁকার সব সরঞ্জামও বেঁধেছেদে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

অমিয় কারও দিকে তাকিয়ে দেখেনি। তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে পারলেই যেন সে বেঁচে যায়। একটা অস্বস্তিতে ছটফট করছিল অমিয়। এই মূক অভিনয়ের দুঃসহ গ্লানি থেকে ছুটে একবার পালাতে পারলেই যেন সে শান্তি পাবে।

আশ্চর্য করলো শুভা। মঞ্জু ও মীনু আজ মনে মনে শুভাকে কেন জানি ক্ষমা করতে পারছিল না। শুভার আচরণে কোন আড়ষ্টতা নেই, তেমনি কোন চাঞ্চল্যও নেই। সমস্ত বর্তমানের দিকে যেমন শান্তভাবে তাকিয়ে আছে, ভবিষ্যৎকে যেন তেমনি একেবারে উপেক্ষা করে রয়েছে শুভা। ওর জীবনের মুহূর্তগুলি যে কী প্রবল বিপ্লবে ভেসে গেল, সেই বোধটুকুও ওর আছে কি না সন্দেহ। মঞ্জু ও মীনু আশ্চর্য হয়ে ভাবে—শুভাকে বুঝতে কী ভুল হয়েছিল তাদের। মাটির ঢেলা নয় শুভা, যে এই স্রোতের আবর্তে গলে মিলিয়ে যাবে। শিলাতলের মত নিজের কঠিনতায় কেমন স্থির হয়ে আছে শুভা, এই স্রোতের আঘাত একটু নড়াতে পারছে না তাকে।

পুঁটিমাসীর নির্দেশ মত পুজোর ঘরের বন্ধ দরজার কাছে বিদায় নিতে এসে দাঁড়ালো শুভা আর অমিয়। পুঁটিমাসী বার বার প্রমীলাবালাকে ডাকলেন। তবু প্রমীলাবালার কোন সাড়া শোনা গেল না। শুধু বন্ধ দরজাটা একবার সামান্য একটু ফাঁক হলো। দুটো ফুল শুধু দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে ছিটকে এসে পড়লো। আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পুঁটিমাসীর মুখটা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

পুঁটিমাসীর শত অনুরোধেও একবার বিছানা ছেড়ে উঠলেন না রজনীবাবু।

—উঠুন, ওরা চলে যাচ্ছে, আশীর্বাদ করুন ওদের।

পুঁটিমাসীর তাগিদে বিরক্ত হয়ে রজনীবাবু বললেন।—আশীর্বাদ করার ক্ষমতা নেই আমার।

পুঁটিমাসী।—উঠুন উঠুন, খুব আছে।

রজনীবাবু।—থাকলেও, এক্ষেত্রে আমি অসমর্থ।

পুঁটিমাসী।—কেন?

রজনীবাবু উত্তর দিলেন না। তিনি হয়তো বলতে চান যে, তাঁর জীবনে যারা অভিশাপকেই বড় করে তুলেছে, তাদের তিনি আশীর্বাদ করবেন কোন আনন্দে? কাঁটা গাছে ফুল ধরে, কিন্তু এরা যে শুধু কাঁটাকেই সত্য করে তুললো।

—এ বিয়ে বিয়েই নয়। যে যাই ভাবুক, আমি প্রাণ থাকতে এ বিয়েকে স্বীকার করতে পারি না।

কথাগুলি নেহাৎ অজ্ঞাতসারে একটু স্পষ্ট করেই বলে ফেলেছিলেন রজনীবাবু। পুঁটিমাসী একটু রাগ করেই অনুযোগ করলেন।—ছি ছি, কি সব কথা আজকের দিনে বলছেন আপনি?

রজনীবাবু আবার চুপ করে গেলেন। তিনি যা বলতে চান, পুঁটিমাসী ঠিক তা' বুঝতে

পারলেন না। রজনীবাবু হয়তো তার মনের বিকার কখনো স্পষ্ট করে বলতে পারবেন না। মুখে বাধবে সঙ্কোচ হবে। তাই তাঁর দুঃখটুকুও কেউ বুঝতে পারবে না। অমিয় আর শুভা। কে এরা? একজন রজনী মিত্রের ছেলে আর একজন নশু রায়ের মেয়ে। এ-ছাড়া এদের কোন পরিচয় নেই। এদের জীবনে কোন আদর্শ নেই। কোন সাধনা নেই। এরা শুধু বিয়ের জন্যই বিয়ে করলো। এ বিয়ে না হলে জগতের কতটুকু ক্ষতি হতো? বিয়ের পর পৃথিবীর কাছে এদের কোন কর্তব্য নেই। কোন কর্তব্যের দাবীতে এরা তো জীবনে এক হলো না। পৃথিবীর কোন কল্যাণ সত্য করে তুলবে এদের মিলন? এ নিতান্তই ত্বগস্থিমাংসের মিলন। শুধু অসামাজিক নয়, অমানুষিক। পশু পক্ষীও ঠিক এই ভাবেই...।

রজনীবাবু হাত তুলে ইসারায় পুঁটিমাসীকে চলে যেতে বললেন। অমিয় ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েই রইল। মঞ্জু ও মীনুকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে শুভা ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। রজনীবাবুর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো।—জেঠাবাবু!

রজনীবাবু পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন।

সমস্ত ঘটনাটা এতক্ষণ চুপচাপ থেকে ঠিক বিদায় নেবার সময় যেন আবার উপদ্রবের মত দুরন্ত হয়ে উঠছে। মঞ্জু ও মীনু বিরক্ত হয়ে শুভার ব্যবহার লক্ষ্য করছিল। এতটুকু মেয়ের এই ঔদ্ধত্য বড় বিসদৃশ মনে হচ্ছে। বিছানা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কি দুঃসাহসে সে আবার জেঠাবাবুকে ডাকছে? জেঠাবাবুর সব বিদ্রোহ ভেঙে দেবাব জন্যই যেন শুভা নির্ভীক আনন্দে চ্যালেঞ্জ করছে। তা করতে পারে শুভা, ও সব পারে। ওর চোখে মুখে কত প্রশ্ন, কত উত্তর চিক্‌চিক্ করছে। মঞ্জু ও মীনুকে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত করলেন পুঁটিমাসী। পুঁটিমাসী ডাকলেন—এস শুভা। গাড়ির সময় হয়েছে।

মঞ্জু ও নীহারের বিয়ে হয়ে যেতে বেশী দেরী হলো না। এ বিয়েতে কোন অতি-সংশয়ীর মনেও আপত্তি করার মত কোন যুক্তি ছিল না। কোন অতি-নিন্দুকেও নিন্দে করার মত কিছু খুঁজে পায়নি। চরকা আর সেবাশ্রমের সেবা নিয়ে বিভোর হয়ে আছে নীহার। তার খদ্দরের দোকানটিও তার কাছে শুধু জীবিকা নয়, ঐ তার জীবন। অকুণ্ঠ নিষ্ঠায় নীহার তার খদ্দরবাদকে আদর্শরূপে বরণ করে নিয়েছে। নীহার বিশ্বাস করে, এই পথেই জাতির মুক্তি আসবে। সকলে জানে, আইনের পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়েও, একটা মুন্সেফী পদ পায়ের কাছে পেয়েও নীহারের নিষ্ঠা কখনো বিচলিত হয়নি। নিজের মনের সাধের দাবীতেই সে খদ্দরসেবার ব্রত গ্রহণ করেছে। এর মধ্যেই সে নিশ্বাসবায়ুর মত সহজ আনন্দ পায়। সে প্রীত তুষ্ট কৃতার্থ।

পুঁটিমাসী জানেন মঞ্জুও বর্ণে বর্ণে এই আদর্শে বিশ্বাস করে। আজ চার বছর ধরে মঞ্জু চরকা কাটে। মঞ্জুর গায়ের শাড়ি-জামার প্রতিটি সুতো তার নিজেরই শ্রমের সৃষ্টি। এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। নীহারের আদর্শ মঞ্জুকে যেন আজ চার বছর ধরে মনে প্রাণে জড়িয়ে আছে।

মঞ্জু যদি নীহারের জীবনের দোসর হয়ে আসে, তবে ওদের জীবনের পূর্ণতা পূর্ণতর হয়ে উঠবে। একই ছন্দের দুটি কবিতার মত ওরা দুজন। এ মিলন আদর্শের মিলন। এ যেন জীবনে জীবনে কাঞ্চনসন্ধি। জীবনের একটি নিখুঁত দৃশ্য। এ বিয়েতে ওরা দু'জনে এক হয়ে যাবে, দুজনের জীবনের উপহারে আদর্শটাই বড় হয়ে উঠবে। নীহারের সাধনা মঞ্জুর মধ্যে পাবে এক নতুন প্রেরণা, মঞ্জুর সাধনা পাবে নতুন এক স্থিতি।

বিয়েটা নিরাড়ম্বর ভাবেই সমাধা হলো। তবু বিয়ের রাতটা একেবারে উদাস হয়ে ছিল না। চারদিকে একটা সুস্মিত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে, কলরব জাগিয়ে, আনন্দের গুঞ্জনের মধ্যেই বিয়ের পাট শেষ হলো।

সবচেয়ে আশ্চর্য, রজনীবাবু তাঁর ভস্মশয্যা ছেড়ে হঠাৎ উঠে এলেন। বিয়ের আয়োজন

তদারক করলেন। ঘুরে ফিরে দেখলেন।

হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছেন রজনীবাবু, তিনি ব্যর্থ হয়ে যান নি। মঞ্জু আর নীহারের মধ্যে যেন তাঁর মূক মন্ত্র আবার সরব হয়ে উঠেছে। তাঁর আজীবন পরীক্ষার তিমিরক্লিন্ন দুঃখের পথ আজ সফল আলোকে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—মঞ্জু ও নীহার যেন তারই ইঙ্গিত।

অমিয় চলে গেছে, সে-আঘাতের ক্ষত হয়তো আজও রয়ে গেছে। কিন্তু আজ যেন সেই জ্বালা একেবারে ভুলে গেছেন রজনীবাবু। নইলে আজ সকাল থেকে এত ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারতেন না। এই কটা দিন যেন তার জীবনের পরাভবকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে আড়ালে সরে পড়েছিলেন। আজ মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভুল তাঁর নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। তাঁরই মেয়ে মঞ্জু।

বিদায় নেবার সময়ও রজনীবাবু প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। এই আশীর্বাদের মধ্যে তাঁর জীবনের চিরকেলে গর্ব যেন প্রতিধ্বনি করে উঠলো।—তোমাদের জীবনের আদর্শ অটুট থাকুক।

প্রমীলাবালা অবশ্য তাঁর পুজোর ঘরের নিভৃতে অবিচল ছিলেন। মঞ্জু ও নীহার বিদায় নিতে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রমীলাবালা কপাটটা ততটুকুই খুললেন, যতটুকু খুললে দুটো ফুল ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া যায়। অমিয় আর শুভা যে-আশীর্বাদ নিয়ে গেছে, মঞ্জু ও নীহারের বেলায়ও তার পরিমাণের কোন কমবেশী হলো না। সংসার থেকে কোন সুদূরে সরে গেছেন প্রমীলাবালা! বোধ হয় তিনি একে সংসার বলেই স্বীকার করতে চান না। তিনি জানেন, কাঁটার বনে কাঁটা ফলবে শুধু, ফুল ফুটবে না কখনো। তাঁর কাছে অমিয় যা, মঞ্জুও বোধ হয় তাই। ওরা সবাই কাঁটা। প্রমীলাবালার কাছে কোন ভেদাভেদ নেই। যতীর জন্য আজকাল কাঁদতেও ভুলে গেছেন প্রমীলাবালা। সেই বেদনার মূর্চ্ছা আর হয় না। যতী গেছে, অমিয় গেছে, মঞ্জুও চললো—একে একে সবাই যাবে। এভাবে চলে যাবার জন্যই এরা জন্ম নিয়েছে এ সংসারের মাটিতে। এক অন্তর্ধানের অভিশাপ এ-সংসারের বাতাসে ছড়িয়ে আছে। যতী, অমিয়, মঞ্জু, মীনু—নতুন পৃথিবীর জ্যোৎস্নায় গড়া পুতুলের মত এক একটি আবির্ভাব প্রমীলাবালার জীবনে কী সমারোহ সৃষ্টি করেছিল! কিন্তু আজ তিনি জানেন, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। আজ ওরা বড় হয়েছে, আজ ওদের চেনা যাচ্ছে—ওরা সবাই রজনী মিত্রের ছেলেমেয়ে, সেই পুরনো অভিশাপের আলেয়া। পিতৃগুণের উত্তরাধিকার পেয়েছে ওরা।

রজনীবাবু আজও যে-বস্তুকে আদর্শ বলে চীৎকার করেন, প্রমীলাবালা সে-বস্তুকেই পাপ বলে জানেন। আদর্শ ঐ—এক ছুতো। রক্তে যার মরণ ডাকে, একটি সুন্দর মুখ দেখে সব সংসারের নিয়ম ভুলে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভেসে যায়—ঐ আদর্শের কপট বচন তাদেরই সান্ত্বনা। প্রমীলাবালা তাঁর জীবন দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। তবু তিনি তাঁর জীবনের সব অপসৃষ্টিকে, এই কাঁটার বনকেই আপন করে নিয়ে, সব মেনে নিয়ে, সুখী হতে চেয়েছিলেন। তাঁব সে-সাধ ব্যর্থ করে দিয়েছেন রজনীবাবু, যিনি স্বয়ং সব আদর্শের উৎস, পঁয়ত্রিশ বছর আগে যাঁর আদর্শ রাজপাটপুরের এক তরুণী বধূকে রাহুর মত লুটে নিয়ে চলে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর পুরনো সংসার, পুরনো সম্ভ্রম, পুরনো হাসিকান্না, সুখ আর শান্তি।

সব বঞ্চনার বিনিময়ে তবু যদি তিনি যতীকে ধরে রাখতে পারতেন, তবে হয়তো এই পূজোর ঘরের বন্দীত্ব তিনি নিজের থেকেই সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু তিনি পারেন নি। রজনী মিত্রের আদর্শ আবার নির্লজ্জ গর্জন করে উঠলো, যতীকে তাড়িয়ে দিল।

মঞ্জু ও নীহার চলে গেল। মীনুর চোখ ছলছল করলো। পুঁটিমাসী ক্লান্ত হয়ে বসে রইলেন। রজনীবাবু বাগানে পায়চারী করে বেড়ালেন। বাতাসে যেন একটা সফলতার গুঞ্জন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তারই আবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রজনীবাবু।

পুঁটিমাসীর ক্লান্ত ও বিষণ্ণ মুখে শুধু অদ্ভুত এক জোড়া চোখের প্রভাময় দৃষ্টি ঝকঝক করছিল। তিনি দেখছিলেন রজনীবাবুকে। রজনীবাবু আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সেই পুরাতন মনুষ্যত্বের শিখা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সব ধোঁয়ার সমাধি মিথ্যে হয়ে গেছে।

শুধু পুজোর ঘরে পুজো করছিলেন প্রমীলাবালা।

খুব খুশী দেখাচ্ছিল রজনীবাবুকে। পুঁটিমাসীকে সামনে পেয়েই বললেন।—যতীকে একটা চিঠি দিতে পারেন?

পুঁটিমাসী বিস্মিত হয়ে বললেন।—যতীকে?

রজনীবাবু।—হ্যাঁ। যতী একবার এসে দেখা করে যাক। আমি যতীকে আজ মাপ করতে পারছি। অন্যদিকে যত জঘন্য ভুল করুক না কেন, একটা ভুল তার হয় নি। সে আদর্শ ছাড়ে নি। তার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। তার পলিটিক্স আছে। একদিকে সে অন্তত ঠিক আছে। না, তার ওপর রাগ করার কিছু নেই।

রজনীবাবুর কথার উচ্ছ্বাস হঠাৎ ধীরে ধীরে এক আন্তরিক ক্ষমার সুরে গভীর হয়ে এল। —নরেন মাস্টারের বউকে বিয়ে করেছে যতী, লোকের চোখে এ ঘটনা সহ্য হবে না জানি। কিন্তু সেই মেয়েটির ওপরেও রাগ করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

রজনীবাবুর প্রিয় থিয়োরীটা আজ সব সংশয় ভেদ করে আরও স্পষ্ট এবং আরও সত্য হয়ে উঠেছে। এতদিন রাগের মাথায় বুঝতে পারেন নি রজনীবাবু। যতীর দোষ নেই, নরেন মাস্টারের বউটিরও দোষ নেই—এক আদর্শে কাজ করতে গিয়ে ওরা এক হয়ে গেছে। জীবনে এক দুরূহ বিপ্লবী রাজনীতির ব্রতে ওরা আপন হয়েছিল, তাই জীবনেও ওরা আপন হতে বাধ্য হলো।

রজনীবাবু বললেন।—বিয়ের জন্যই বিয়ে করা, পশুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। শত হোক্, যতীর গায়ে এ পাপ লাগেনি।

পুঁটিমাসী।—যখন বলছেন, তখন যতীকে চিঠি দেব। আর যদি বলেন, অমিয়কেও একটা...।

রজনীবাবু গর্জন করে উঠলেন।—এতক্ষণ আপনাকে বৃথাই বোঝালাম! কিছুই বুঝলেন না আপনি। আমার সংসারে অমিয় এই পশুত্বের পাপটাকেই সত্য করেছে। আজ আমি এই ধিক্কার নিয়েই মরে যেতাম, যদি না দেখতাম যে যতী মঞ্জু মীনু...।

পুঁটিমাসী যেন রজনীবাবুর এই থিয়োরীর উল্লাসকে আঘাত দেবার জন্যই রূঢ়ভাবে বলে ফেললেন।—শরদিন্দুর সঙ্গে মীনুর বিয়ে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে রজনীবাবুর মূর্তিটা সঙ্কোচে করুণ হয়ে উঠলো। ভয়ার্তের মত বললেন।—কেন?

পুঁটিমাসী।—শরদিন্দু রাজী নয়।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—মীনু রাজী নয়।

রজনীবাবু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।—কেন কেন? হঠাৎ আবার এই অনাচার ঢুকলো কোথা থেকে।

পুঁটিমাসী।—সাধনের সঙ্গে মীনুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—সাধন রাজী হয়েছে।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—মীনু রাজী হয়েছে?

রজনীবাবুর চোখ দু'টো জ্বলছিল।—এ কী ভয়ানক ব্যভিচারের কাহিনী শোনাচ্ছেন? আর কত শোনাবেন?

পুঁটিমাসী বিরক্ত হয়ে উঠলেন।—আপনি এত আবোলতাবোল বকেন কেন?

রজনীবাবু।—এ বিয়ে হতে পারে না। যদি হয় তবে জানবেন আমি এর মধ্যে নেই। অমিয় যেভাবে বিদায় নিয়েছে, মীনুকেও সেই ভাবে...।

হঠাৎ চীৎকার করে ডাকলেন রজনীবাবু।—মীনু মীনু।

মীনুর সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়েও রজনীবাবুর গলার স্বরে কোন মমতা দেখা দিল না। সোজাসুজি প্রশ্ন করে ফেললেন।—তুমি না সোস্যালিস্ট?

মীনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রজনীবাবু।—শুনেছি শরদিন্দু সোস্যালিস্ট। তবে, হলো কি? এ মতিচ্ছন্নতা কেন তোমাদের?

মীনু।—তিনি সোস্যালিস্ট কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?

রজনীবাবু একটু সন্দিগ্ধ ভাবেই প্রশ্ন করলেন।—কবে জেল থেকে ছাড়া পেল সাধন? সাধনও কি সোস্যালিস্ট?

মীনু।—হ্যাঁ।

রজনীবাবু ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলেন।—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মীনু। শরদিন্দুর মধ্যে কোন ফাঁকি দেখতে পেয়েই কি তুমি...।

আপত্তি করলেন পুঁটিমাসী।—আপনি কেন এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার কাছে মীনু যা মুখ খুলে বলতে পারে না, আপনি তবু সেই কথা নিয়ে বার বার...। মীনু তুই যা।

রজনীবাবুও একটু বিব্রত হয়ে বললেন।—আচ্ছা, যাও।

অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তার মধ্যে ডুবে থেকে আবার যেন একটা সার্থক তৃপ্তির সিক্ততা নিয়ে ভেসে উঠলেন রজনীবাবু। মীনুর কোন দোষ নেই। কোন ভুল হয়নি মীনুর। এটাই হওয়া উচিত ছিল। শরদিন্দুর আদর্শে নিশ্চয় ফাঁকি আছে, মীনু সাবধান হয়ে গেছে। ঠিক করেছে। মীনু আমার সবচেয়ে জেদী মেয়ে।

কোন আগ্রহ নেই, তবু চুপ করে নিস্পৃহ ভাবে রজনীবাবুর তত্ত্বকথা শুনছিলেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু।—আমি শুধু বলতে চাই পুঁটুদি...।

চমকে উঠলেন পুঁটিমাসী। স্থান কাল ভুল হয়ে গেছে রজনী মিত্তিরের। চল্লিশ বছর আগের এই গেঁয়ো আত্মীয়তার ডাক কবে বাতিল হয়ে গিয়েছে! আজ হঠাৎ আবার...।

রজনীবাবু।—আপনি তো সবই জানেন পুঁটুদি। জীবনে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তো আদর্শের জন্যই করেছি। আপনি আমার দুঃখের ইতিহাস জানেন। একটা প্রতিজ্ঞার জন্য সব ক্ষতি সহ্য করেছি। যতী মঞ্জু মীনু মানুষ হয়ে উঠেছে ; তারা দেশের কাজ করবে, পলিটিক্স করবে—এই তো আমার শেষ জীবনের ভরসা। কিন্তু আজ যদি ওরা ভুল করে ফেলে, আমার কী গতি হবে পুঁটুদি? আমার তো পূজোর ঘর নেই, আমি বাঁচবো কি করে?

পুঁটিমাসী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে যেন হালকা হয়ে নিলেন।

রজনীবাবু।—এরা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়...।

পুঁটিমাসী একটু জোর গলায় ধমকের সুরে যেন সান্ত্বনা দিলেন।—না না, কেউ ব্যর্থ হবে না। আপনি মিছামিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন।

রজনীবাবু।—কিন্তু অমিয়? অমিয় যে অহরহ আমার সব ভরসায় কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল।

পুঁটিমাসী।—ছেড়ে দিন অমিয়র কথা। আপনার যতী মঞ্জু মীনু রয়েছে। তারা আপনার নাম রেখেছে এবং রাখবে। সারা মকতপুরের কে না ওদের ভালবাসে?

মীনু আর সাধনের বিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই হয়ে গেল। রজনীবাবু তেমনি খুসী হয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিলেন। পুঁটিমাসী একটু অবসন্ন হয়ে পড়লেন। প্রমীলাবালা তেমনি পূজোর ঘরের দরজার ফাঁকে দুটো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

রজনীবাবুকে দেখলে মনে হয় এক প্রত্যুষের শান্তি তাঁর সকল ভাবনাকে ছেয়ে রয়েছে। শান্ত অথচ সজীব। এই শান্তির পেছনে যেন প্রচুর আলো, পাখির ডাকের সাড়া আর বাতাসের দোলা অদৃশ্য ও অশ্রুত হয়ে রয়েছে। সংশয় ও প্রত্যয়ের দীর্ঘ দ্বন্দ্বের আঁধিয়ারা মিটে গিয়ে এক নতুন দিনের অধ্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেন এক কঠিন পরীক্ষার সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, সফল হয়েছেন, পরাভবের বিভীষিকা সরে গেছে। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বাইরে চলে আসেন। বারান্দায় বেঞ্চটার ওপর বেশীক্ষণ বসেন না। ফুলবাগানে পাইচারী করে বেড়ান অনেকক্ষণ, যেন নতুন করে নিশ্বাস নিচ্ছেন রজনীবাবু।

কিন্তু প্রমীলাবালাকে খোঁজ করলেও সহজে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে না। পূজোর ঘরেই বন্দী হয়ে আছেন। পূজোর ঘরের কপাটটা আজকাল বেশীক্ষণই খিল-বন্ধ থাকে। সারাদিনের মধ্যে আচমকা হয়তো একবার বাইরে আসেন প্রমীলাবালা, ভেতর-বারান্দার এক কোণে একটা তোলা উনুনে পেতলের মালসায় দু'মুঠো চাল-ডাল যা হয় সেদ্ধ করে নেন। কখন খান, কখন স্নান করেন, কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কোন কোন দিন তা'ও হয় না। এক এক দিন রান্না করেও খেতে ভুলে যান। পূজোর ঘরের খিল-আঁটা কপাট স্তব্ধ হয়ে থাকে। প্রমীলাবালার ঘরের দিকে তাকালে এই কথাই মনে হবে, এখানে এসে যেন তাঁর শেষ অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। বাইরে ভোরই হোক বা দুপুরই হোক, এর ভেতরে যেন রাত্রি ফুরোয় না।

রজনীবাবুর প্রাত্যহিক সংসার ঠাকুর আর চাকরের হাতে কোন মতে কর্কশ ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। সপ্তাহান্তে আসেন পুঁটিমাসী, প্রতি রবিবার। বাড়ির আবহাওয়া সেদিনের মত সত্যিই স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ঘর গোছানো হয়, সিঁড়ি বারান্দা মেঝে ধোয়ানো হয়। ধোপা আসে, ধোয়া কাপড়-চোপড় দিয়ে যায়, ময়লা কাপড়-চোপড় নিয়ে যায়। পুঁটিমাসীই হিসেব নেন, হিসেব লিখে রাখেন। ধোয়া চাদরে আর ওয়াড়ে রজনীবাবুর বিছানা সেদিন সুশ্রী ও কমনীয় হয়ে ওঠে। পুঁটিমাসী নিজের হাতেই চা তৈরী করেন। স্বাচ্ছন্দ্যের আবেগে রজনীবাবু এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়ান, পুঁটিমাসীর সঙ্গে গল্প করেন।

কিন্তু প্রমীলাবালার পূজোর ঘরের কপাট স্তব্ধ হয়েই থাকে। পুঁটিমাসী মাঝে মাঝে গিয়ে পরিত্রাহি ডাকতে থাকেন—প্রমীলা প্রমীলা। সাড়া না পেয়ে কড়া নাড়েন, প্রবল ভাবে ধাক্কা দিতে থাকেন। দরজার চৌকাঠ কাঁপতে থাকে, তবু কপাট খোলে না। পুঁটিমাসী রাগ করে, হতাশ হয়ে এবং ভয়ানক রকম বিরক্ত হয়ে ফিরে আসেন।

রজনীবাবু বলেন—'ওকে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই পুঁটুদি। ও যেমন আছে তেমনি থাক।'

পুঁটিমাসীর মুখটা হঠাৎ বড় করুণ ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। অবসন্নের মত নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে থাকেন, রজনীবাবুর কথার উত্তর দেন না। রজনীবাবু তখনো সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনের আবেগে কথা বলে যান। কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন পুঁটিমাসী। অস্বস্তি হতে থাকে। এসময় কিছুক্ষণের জন্য যদি অন্য ঘরে চলে যান রজনীবাবু, তবেই যেন পুঁটিমাসী আবার সহজ হয়ে নিতে পারেন।

মঞ্জু আর নীহার একবার মাত্র এসেছিল। তারপর আজ পর্যন্ত আসার আর সুযোগ হয়নি। মঞ্জু তাই মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে সংসারে সব কাজ মঞ্জু নিজেই করে। নীহার কৃপণ নয়, তবু চাকর-বাকর দিয়ে কাজ করানো নীতি হিসাবেই পছন্দ করে না নীহার। একটু প্লেন লিভিং ও হাই থিংকিং গোছের লোক।

মীনু ও সাধন আসে মাঝে মাঝে। রতনডিহি কোলিয়ারী মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছে মীনু। ইউনিয়নের কাজ নিয়ে এরই মধ্যে সে মেতে উঠেছে।

বেচারা শরদিন্দু ভিন্ন একটি ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে। দু'ইউনিয়নে জোর রেষারেষি চলে। কিন্তু মীনু ও সাধনের মিলিত প্রতিভা উৎসাহ আর উদ্যোগের সঙ্গে শরদিন্দু টেক্কা দিতে পারে না। রতনডিহি কোলিয়ারীর মজদুর ইউনিয়ন যেমন দিন দিন ফেঁপে উঠছে, তেমনি দিন দিন দীনতর হয়ে আসছে শরদিন্দুর মজদুর ইউনিয়ন।

সব কথা শুনে আহ্লাদের উচ্ছ্বাসকে কোনমতে চেপে রাখেন রজনীবাবু, পুঁটিমাসী যতদিন না আসেন। রবিবারের সকালে পুঁটিমাসীকে সম্মুখে পাওয়া মাত্র ছেলেমানুষের মত চঞ্চল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন রজনীবাবু—'মীনু ও সাধন এসেছিল পুঁটুদি। যেমন দেবা তেমনি দেবী! কেউ কম যায় না। এরই মধ্যে যা-সব কাণ্ড করতে আরম্ভ করেছে যদি শোনেন তো...।'

পুঁটিমাসী নিরুত্তর থাকেন। রজনীবাবু বলেন—'ডোবালে, মেয়েটা আমার নাম ডুবিয়ে ছাড়লে।'

পুঁটিমাসী বুঝতে পারেন, রজনী মিত্রের মেয়ে মীনু নিশ্চয় একটা বড় রকম আদর্শ নিয়ে পলিটিক্স করতে আরম্ভ করেছে। হয়তো বাপকেও ছাড়িয়ে উঠছে। সেই উপলব্ধির গর্বে নিজেকে ইচ্ছে করেই ডুবিয়ে দিয়ে কথাগুলি উল্টো করে বলছেন রজনীবাবু।

দিনের পর দিন ফুরিয়ে যায়। অনেক দিন পরে আবার মঞ্জুর চিঠি আসে। সাগ্রহে চিঠি নিয়ে পড়তে বসেন রজনীবাবু। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টির আগ্রহ শিথিল হয়ে আসে। কুঞ্চিত ভুরু দুটো যেন নেহাৎ অবহেলার তাড়ায় তর্‌তর্ করে লেখাগুলিকে দূর থেকে লক্ষ্য করে সরে যেতে থাকে। পড়বার মত কিছুই নেই, জানবার মত কিছু নেই। অতি-সাধারণ সাংসারিকতার এক বিস্তৃত ইতিবৃত্ত।—দুটো নতুন ঘর উঠছে। নীহার তাই খুব ব্যস্ত, খুব খাটুনি পড়েছে। মঞ্জুরও অবসর খুব কম। সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়। যদি বা কিছু অবসর পাওয়া যেত, কিন্তু নতুন একটা গরু কেনা হয়েছে সম্প্রতি। গো-সেবার ভার মঞ্জুর ওপর। নিজের হাতে খড় কুচোতে হয় মঞ্জুকে। তা ছাড়া, এখন বাগানের যত কাপাসের সুঁটি পেকেছে, সেই জন্য...।

দম ধরে চিঠিটাকে পড়ে প্রায় শেষ করে আনেন রজনীবাবু। পড়া শেষ হলেই যেন ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, সেই রকম ভঙ্গীতে চিঠিটা তুলে ধরেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ আবার কুঞ্চিত ভুরু টান হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বার বার শেষের সেই লাইনটা পড়েন—'এরই মধ্যে সময় করে গীতা পড়তে হয়, চরকা চালাতে হয়। তোমার জন্য একটি নতুন ডিজাইনের খদ্দরের চাদর তৈরী করছি বাবা।'

পুঁটিমাসী আসা মাত্র রজনীবাবুর রুদ্ধ আনন্দ বাচালতায় ফেটে পড়ে—'মঞ্জুটা ভয়ানক কাটখোট্টা মেয়ে পুঁটুদি! কী সাংঘাতিক টেনাসিটি! এত কাজ, এত দায়িত্ব, এত খাটুনি--তবু চরকাটি তার ঠিক আছে। এই হয় পুঁটুদি। জীবনে যারা আদর্শ খুঁজে পায়, জীবনে যারা একটা বিশ্বাসকে মনপ্রাণ দিয়ে ধরতে পেরেছে, তাদের দমিয়ে দিতে পারে এমন কোন বাধা পৃথিবীতে নেই। বেশ মিলেছে দু'জন। আমাদের নীহারও বড় আদর্শবাদী।

পুঁটিমাসী নিরুত্তর থাকেন। তিনি শুধু নীরবে রজনীবাবুর পরিপূর্ণ বিশ্বাসে টলমল, সজীব ও চঞ্চল মূর্তিটাকে লক্ষ্য করতে থাকেন। কোন ভিন্ন মত বা ভিন্ন প্রশ্ন তুলতে তিনি চান না। চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে পায়চারী করে বেড়ান রজনীবাবু, মাঝে মাঝে চুমুক দেন। লঘু স্ফূর্তির আবেশে রজনীবাবুর বয়সের ভার যেন হালকা হয়ে আসতে থাকে। তারপরেই অতিরিক্ত রকম চঞ্চল হয়ে পড়েন। চাদরটা কাঁধে ফেলে বাইরে রওনা হন। পুঁটিমাসী একটু বিমর্ষ হয়েই জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় চললেন এসময়? আজ তো আপনার শরীর তেমন...।

—না না, আমার শরীর আজ খুব ভাল আছে।

রজনীবাবুর উদ্‌ভ্রান্ত উত্তরটাকে যেন এক পাশে ঠেলে সরিয়ে পুঁটিমাসী তবু জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় চললেন?

—গান্ধী জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। একশো চুয়াল্লিশ জারি করেছে। তা করুক, অনুষ্ঠান হবেই।

রজনীবাবু চলে যান। অল্পক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন পুঁটিমাসী। একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। কখন ফিরবেন রজনীবাবু কে জানে? আদৌ ফিরবেন কি না বলা যায় না। হয়তো গ্রেপ্তার হবেন।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করারও উপায় নেই পুঁটিমাসীর। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, স্কুলের বোর্ডিংয়ে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। হার্টের কষ্টটা আজ যেন দমিত অভিমানের মত মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন পুঁটিমাসী। হ্যাঁ, উঠতেই হবে তাঁকে—এই ক্লান্তির ভার নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন এমন কোন ঠাঁই কোথাও নেই, এখানেও নয়।

ধীরে ধীরে উঠে পড়েন পুঁটিমাসী। ছাতাটা হাতে তুলে নিয়ে রওনা হন। চাকরটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ফটক পর্যন্ত পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে আসে।

পুঁটিমাসী একটু বিরক্ত ভাবেই চাকরকে বলেন—খুব হয়েছে, তুই যা এবার. তোকে আর পথ দেখাতে হবে না।

দিন যায়, মাস শেষ হয়, বছর ঘুরে আসে। আকাশের তারাগুলিরও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়, শুধু বদলান না রজনীবাবু। অন্তত রজনীবাবুর তাই বিশ্বাস। তিনি এক আদর্শে অবিচল আছেন। রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী, শিবাজী উৎসব, স্বদেশী মেলা, স্বাধীনতাদিবস—জাতীয় জীবনের মুক্তির যত স্বপ্ন স্মৃতি ও ব্রতের ভীড়ে তিনি বিভোর হয়ে যেতে আছেন।

পুঁটিমাসী আসেন। তিনিও বিশ্বাস করেন, তাঁর স্বগ্রামবাসী কুটুম্ব, কৈশোরের পরিচিত রজনী মিত্রকেই তিনি দেখতে আসেন, কর্তব্য হিসাবে।

মীনু ও সাধন আসে না। তারা দু'জনে এখন আর মকতপুর নেই, কানপুর চলে গিয়েছে। মীনুর চিঠি আসে মাঝে মাঝে। একটা স্ট্রাইকের ব্যাপারে মাঝে তিন মাস জেল হয়েছিল মীনুর। সাধনের চিঠিতে এই খবরটা প্রথম পড়লেন রজনীবাবু। তার পর আরও দশবার পড়লেন। তার পর চিঠিটা ফাইল করে রাখলেন, সার্থক আদর্শবাদের গর্বে ভরা একটা কুলপঞ্জী যেন তিনি তৈরী করে রাখছেন। অনেক দিন পর মীনুর চিঠি আজ এসেছে। মীনু লিখেছে—শরীর খারাপ, মন ভাল নয়।

মকতপুর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে নীহারের খাদি-আশ্রম, গোশালা আর বাসা। তবু মঞ্জুর পক্ষে বাপের বাড়ি আসা সব চেয়ে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার এসেছিল মঞ্জু। রজনীবাবুর জন্য মঞ্জুর হাতের তৈরী খদ্দরের চাদর আজও এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু রজনীবাবুর সংশয়হীন সেই আশা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

—যতীর খবর কি? মাঝে মাঝে পুঁটিমাসীকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করে তোলেন রজনীবাবু।

পুঁটিমাসী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দেন।—হ্যাঁ, যতীর চিঠি পেয়েছি। আসবে বোধ হয়। তবে শিগগির আসতে পারবে না।

—কেন?

রজনীবাবুর প্রশ্নে মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু বলেন—লিখে দিন, সস্ত্রীক এসে একবার দেখা করে যাক।

পুঁটিমাসী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জবাব দেন—সস্ত্রীক আসতে পারবে না।

—কেন?

আবার কেন। পুঁটিমাসী বিরক্ত হলেও, রজনীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তখুনি শান্ত হয়ে যান। মমতা হয়।

রজনীবাবু তাঁর নিজের ধারণার নেশায় যেন মাতাল হয়ে আছেন।—লিখে দিন পুঁটুদি, ওরা দু'জনেই একবার দেখা করে যাক। যতীটা ভয়ানক দুঃসাহসী। মেয়েটিও শুনেছি সেই রকম। বেশ মিলেছে দুজনে। কি কাজ জানি ওরা করছে পুঁটুদি? কৃষক সংগঠন?

পুঁটুদি—হ্যাঁ।

রজনীবাবু—করুক করুক, যার যেমন অভিরুচি একটা আদর্শ নিয়ে থাকলেই হলো। যতীর ব্যবহারে প্রথমে বড় অপমানিত বোধ করেছিলাম পুঁটুদি। কিন্তু আমি বোধ হয় একটু বেশী রেগে গিয়েছিলাম। একটু ভুল হয়েছিল আমার। শত হোক যতী, আমার যতী, অন্তত একটা আদর্শ ছাড়া কখনো কোন কাজ করতে পারে না। আজ আর যতীর ওপর আমার কোন রাগ নেই পুঁটুদি।

সন্ধ্যের আলো জ্বলেছে। চা তৈরী করতে চলে গেলেন পুঁটিমাসী। আধ দিস্তা কাগজ খরচ করে মঞ্জু ও মীনুকে চিঠি লিখলেন রজনীবাবু।

বোর্ডিংয়ে ফিরবার সময় হয়ে এসেছে পুঁটিমাসীর। রজনীবাবু পরিতৃপ্তির সঙ্গে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। রজনীবাবুর চেয়ারের কাছেই একটা বেতের মোড়ার ওপর বসেছিলেন পুঁটিমাসী।

বিনা কারণে নয়, রজনীবাবুর কপালটা ঘেমে উঠেছিল তাই পুঁটিমাসী নেহাৎই তাঁর সেবাপরায়ণ অভ্যাসের বশে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিচ্ছিলেন রজনীবাবুকে।

হঠাৎ পুজোর ঘরের ভেতর শাঁখের শব্দ বেজে উঠল। চমকে উঠে পাখা নামিয়ে নিলেন পুঁটিমাসী।—ও কি!

রজনীবাবু দুঃখ করলেন।—আজকাল বোধ হয় মাথা খারাপ হতে আরম্ভ করেছে। শাঁখ বাজাবার ব্যাধিতে ধরেছে, যখন তখন বাজাচ্ছে।

—আমি উঠি। পুঁটিমাসী সন্ত্রস্তের মত যেন ছটফট্ করে উঠে দাঁড়ালেন।

রজনীবাবু—এখনি উঠবেন?

পুঁটিমাসী—হ্যাঁ, আজ আমার শরীরটাও বিশেষ সুবিধার নয়।

অনেকদিন পরে এলেন পুঁটিমাসী। রজনীবাবু হয়তো একটু রাগ করেছিলেন। কিন্তু এই রাগের হেতু তিনি নিশ্চয় জানেন না। রাগটা যেন মনের অগোচরের পথে নিয়মিত চলে এসেছে। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হলো, রজনীবাবুর বিছানার ওপর খবরের কাগজের স্তূপ জমে উঠেছে ; কাপড় চাদর ওয়াড় সবই নোংরা। তিন সপ্তাহের মধ্যে মাত্র দশটি দিন সময়মত চা পেয়েছিলেন। বিশেষ করে রবিবারগুলি বিনা চায়েই শুকিয়ে গেছে। পর পর তিন রবিবার পুঁটিমাসী আসেন নি। না এসে তিনি খুবই গর্হিত কাজ করেছেন। প্রতি সপ্তাহশেষের পর পর তিনটি নিরপরাধ উৎসবের আবির্ভাবকে পুঁটুদি যেন নেহাৎ অবহেলায় নিষ্প্রদীপ করে দিয়েছেন। রজনীবাবুর পক্ষে তাই রাগ হবারই কথা।

পুঁটিমাসী শান্তভাবেই রজনীবাবুর ঘরে ঢুকছিলেন। রজনীবাবুর চোখ দুটি যেন এতদিন গ্রীষ্মের কষ্টে পীড়িত হয়েছিল। দেরী হলেও বর্ষা আসবেই এবং এসেছে, রজনীবাবুর দৃষ্টিটা তাই যেন খানিকটা অভিমান-পীড়িত ও খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে ঘটনাটাকে নীরবে গ্রহণ করছিল। কোন চাঞ্চল্য ছিল না।

কিন্তু পুঁটিমাসীর ঠিক পেছনে আর একটি মূর্তিকে দেখেতে পেলেন রজনীবাবু। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর স্তব্ধতা চূর্ণ হয়ে গেল। ব্যস্ত ও উত্তেজিতভাবে এলোমেলো আবেগের উৎপাতে হঠাৎ বিব্রত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—কে? যতী এসেছিস?

রজনীবাবুর আকস্মিক চীৎকারে যতীর বিমর্ষ মুখের গুমোট কেটে গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে রজনীবাবুর পায়ে হাত রাখলো যতী। হাত দুটো যেন নিজের

ক্লান্তিতে ভারী হয়ে রজনীবাবুর পায়ের ওপর অনেকক্ষণ ধরে পড়ে রইল। স্থির হয়ে অস্বাভাবিক রকম আনন্দের আবেশে দাঁড়িয়েছিলেন রজনীবাবু। যতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। ছ'বছরের নির্বাসিত বাৎসল্যকে আবার হাতের কাছে পেয়ে যেন আশ্বাস ও সান্ত্বনায় আপন করে নিচ্ছিলেন।

যতী হয়তো কয়টি মুগ্ধ মুহূর্তের আস্বাদে নিঝুম হয়ে শুধু বুঝতে পারছিল যে রজনীবাবু তার সব অপরাধকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রজনীবাবুও মনে মনে জানেন যে ক্ষমা তিনি ঠিকই করেছেন, কিন্তু যতীকে নয়, তাঁরই নিজের গোঁড়ামি অন্ধতা ও অনুদারতাকে। সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করছেন রজনীবাবু। যতী যে তাঁরই আত্মার ছায়া, তাঁরই শাখায়িত আদর্শের একটি ভিন্ন রঙের ফুল, সে-সত্য ছ'বছর আগে তিনি বুঝতে পারেন নি। যতীর পক্ষে নরেন মাস্টারের বৌকে বিয়ে করার অপরাধকেই তিনি বড় করে দেখেছিলেন। তাই না তাঁর বিচার এত হৃদয়হীন ও কঠোর হয়েছিল। যতীর জীবনের আদর্শের দিকটা তিনি সেদিন দেখেন নি। দেখতে পেলে যতীকে সেদিনও ঠিক আজকের মত করেই তিনি চিনতে পারতেন। সত্যি করে চিনতে পারতেন কৃষক সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী যতীকে, যশ স্বার্থ সুখ ও কেরিয়ারের মোহ যাকে ঘরকুনো করে রাখতে পারেনি, পান্তা ভাত খেয়ে যে-যুবক চাষার বাড়ির আঙিনায় খড়ের বিছানায় শুয়েছে, ম্যালেরিয়ায় ভুগেছে, পুলিসের হাতে অকারণ শত লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। জীবনের সম্মুখ কাজের পথে মাত্র একবার পাশে উঁকি দিয়ে দেখেছিল যতী। দেখতে পেয়েছিল কৃষক সংগঠনের এক কর্মিণী নারীকে, নরেন মাস্টারের বৌকে, সুলেখাকে। শিক্ষায় প্রতিভায় গুণে কাজে ও দুঃসাহসে উজ্জ্বল সুলেখা নামে মেয়েটি। রজনীবাবুও তো তাকে কতদিন থেকেই চেনেন। কত উপদেশ দিয়েছেন, উৎসাহ জানিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন। অপদার্থ নরেন মাস্টারের ওপর মনে মনে কত রাগ করেছেন। সুলেখার মুখের দিকে কতবার স্নেহবিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে কত কি ভেবেছেন। সুলেখা চলে গেলে মঞ্জুকে ডেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছেন রজনীবাবু—নরেনটার সঙ্গে সুলেখার বিয়ে হলো কেন রে মঞ্জু? কী অন্যায় কথা।

রজনীবাবুর অভিযোগের মর্ম অবশ্য খুবই স্পষ্ট করে বোঝা যেত। কিন্তু মঞ্জু কোন উত্তর দিত না। এই ক্ষোভের পেছনে হয়তো একটি ছবি খুবই গোপনে লুকিয়ে থাকতো। এই বেমানানকে মানানসই করে নিয়ে ছবিটিকে নূতন রঙে রাঙিয়ে তিনি একবার হয়তো মনে মনে দেখতেন, সত্যিকারের সুশোভন মিলনের ও দাম্পত্যের একটি ছবি—পাশাপাশি দুটি মূর্তি—যতী ও সুলেখা। তা চিরদিন ছবি হয়েই থেকে যাবে। রজনীবাবুর ক্ষোভ শুধু ক্ষোভেই সারা হয়ে যেত।

কিন্তু যা হবার নয় তাই যখন হলো, কি আশ্চর্য, রজনীবাবু সেই খবর শুনেই উন্মত্তের মত চীৎকার করে উঠেছিলেন—ব্যভিচার! ব্যভিচার!

যতীর মাথায় হাত রেখে চকিত কতগুলি মুহূর্তের মালাকে যেন মনে মনে জপ করে নিঃশেষ করছিলেন রজনীবাবু। ঘটনার ছবিগুলি জপের গুটির মত তর্ তর্ করে মনের ভেতর এক পাক পার হয়ে গেল। আজ তিনি তাঁর রাগের ভুল বুঝতে পারছিলেন, লজ্জিত হচ্ছিলেন। যতী আর সুলেখাকে আজ তিনি স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অনিয়মের রূপে নয়, তারা দু'জন যেন খুবই সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মের সূত্রে এক আদর্শের দাবীতে বাঁধা পড়ে গেছে।

সুলেখাকে খুঁজছিলেন রজনীবাবু। বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তৃতীয় একটি সহাস্য ও সপ্রতিভ তরুণীমূর্তির প্রতীক্ষায় তাঁর দৃষ্টিটা আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তিনি আশা করছিলেন যতীর পেছু পেছু সে-ও আসছে। কুণ্ঠাহীন সান্ত্বনা আশ্বাস ও আদর নিয়ে তিনি আজ তাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে তুলে নেবেন।

যতী উঠে দাঁড়ালো। রজনীবাবু সাগ্রহে বললেন—সুলেখা কই? মুহূর্তের মধ্যে যতীর দৃষ্টিটা সন্ত্রস্ত হয়ে যেন আবার পুঁটিমাসীর দিকে বিড়ম্বিত আবেদনের মত করুণ হয়ে কাঁপতে লাগলো।

পুঁটিমাসী বললেন—সুলেখার কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তার তো আসবার কথা ছিল না।

রজনীবাবু।—কেন? আপনি আসতে লেখেননি?

পুঁটিমাসী।—না, লিখিনি।

রজনীবাবু।—কেন?

পুঁটিমাসী।—আপনার কেন'র উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই।

যতীর নিষ্প্রভ চেহারার দিকে তাকিয়ে রজনীবাবুও যেন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে লাগলেন। পুঁটিমাসী বললেন—আমি তো অনেকদিন আগেই আপনাকে সে খবর জানিয়েছি।

রজনীবাবু—কোন খবর?

পুঁটিমাসী—আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম যে যতী সস্ত্রীক আসতে পারে না।

একটু চুপ করে থেকে পুঁটিমাসীর গলার স্বর যেন বিরক্তিতে তীব্রতর হয়ে উঠলো—আপনি স্পষ্ট কথা বুঝতে পারেন না, স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেও দেখতে পারেন না! কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্ট করেই বলেছিলাম...।

রজনীবাবুর দৃষ্টিটা লক্ষ্যহীন হয়ে যেন বাতাসে ভাসতে লাগলো।

পুঁটিমাসী বললেন—এতদিন পরে যতী এল, কিন্তু আপনি বেচারাকে বড় অপ্রস্তুত করে দিলেন। যা বলার নয়, সেই সব কথা টেনে এনে মিছামিছি...।

রজনীবাবু যেন ভয় পেয়ে উঠলেন—কি কথা? আমাকে স্পষ্ট করে শিগগির বলুন।

পুঁটিমাসী কিছুক্ষণ একটা মমতার সঙ্কোচে যেন ইতস্তত করে নিয়ে তারপর বললেন—আপনি ব্যাপারটাকে বেশী বড় করে ভাববেন না, তেমন ভয়ানক কিছু হয়নি। সুলেখার সঙ্গে যতীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

চোখের দৃষ্টি নামিয়ে অলসভাবে রজনীবাবু হাতপাখাটা তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে যেন নিরাবেগ ভাবেই বললেন—সুলেখা কোথায়?

পুঁটিমাসী—আছে কোথাও, সংগঠনের কাজ নিয়েই আছে।

রজনীবাবু—তবে ছাড়াছাড়ি হলো কেন?

পুঁটিমাসী—আপনার কেন'র উত্তর আমি জানি না। কোন নিয়মে ছাড়াছাড়ি হয়, আর কোন নিয়মে গলাগলি হয়, সে-তত্ত্ব আমি জানি না।

রজনীবাবু—কিন্তু আমি তো জানি ।

পুঁটিমাসী হেসে ফেললেন—হয়তো পৃথিবীতে আপনিই শুধু জানেন।

রজনীবাবুর মুখের ভঙ্গী নির্বোধের মত আরও অসহায় হয়ে উঠলো—দু'জনেই তো একই আদর্শে ও কাজে ঠিক ঠিক লেগে রয়েছে, তবে আবার এসব গণ্ডগোল হয় কেন? হবার তো কথা নয়।

পুঁটিমাসী—জানি না, কেন?

রজনীবাবু আর কারও দিকে তাকালেন না। মাথার বালিশটাকে একবার গুছিয়ে নিলেন। পায়ের কাছে চাদরটাকে টানলেন।

পুঁটিমাসীর মুখটা করুণ হয়ে উঠলো। রজনীবাবুর কাছে এগিয়ে এলেন, গলার স্বরটা যেন সান্ত্বনার আবেগে কোমল হয়ে নেমে এল। অনুরোধ করলেন—শুয়ে পড়ছেন কেন? অসময়ে শোবেন না। এরকম করতে নেই।

রজনীবাবু তবু টান হয়ে শুয়ে পড়লেন।

—আয় যতী।

যতীকে ডেকে নিয়ে রজনীবাবুর সান্নিধ্য ছেড়ে অন্য দিকে চললেন পুঁটিমাসী। রজনীবাবুর কাছে এসে ঘটনাটা যে এই রকম বিসদৃশ ভাবে নাজেহাল হবে, পুঁটিমাসী আগে থেকেই কতকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে মনে একটা গর্ব তবু সজীব ছিল যে তিনিই যতীকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। তাই তাঁর মনে মনে একটা ভয়ও ছিল, যতী আবার অপ্রস্তুত হয়ে চলে না যায়। পরের সংসার সাজিয়ে দিতে তাঁর এত গর্ব, এত সফলতার লোভ আর এত বিফলতার ভয়, সব মিলে মিশে তাঁর দায়টাকেই শুধু গুরুভার করে তুলেছে। রজনীবাবুর ঘর ছেড়ে পুঁটিমাসী চললেন প্রমীলাবালার ঘরের দিকে। যতীকে অপ্রস্তুত হতে দেওয়া চলবে না কোনমতেই। আবার ঘরের ছেলে হতে হবে যতীকে। নীতি কর্তব্য ও আদর্শ নামে কতগুলি ব্যারামে এত ভাল একটা সংসার উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। পুঁটিমাসী যে আজ এসব কথা নতুন করে ভাবছেন, তা নয়। তিনি বিস্মিত হন, বিরক্ত হন, মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়েন। রজনীবাবু আর প্রমীলাবালা—এরা দুজন সংসারের নিয়মে চলতে চায় না। কতগুলি নিয়মকে এনে সংসারে এরা চালাতে চায়। পদে পদে এত ব্যর্থতা, তবু এদের শিক্ষা হয় না। নিজের নিজের গর্বে দু'জনেই আত্মহারা হয়ে আছে। একজন ভস্মশয্যায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন, আর একজন বদ্ধদুয়ার পুজোর ঘরে বসে ঠুং ঠাং করছেন।

আর একটা কথা। কেন জানি মনে হয়, পুঁটিমাসীর এত অন্তরঙ্গতা, এত যেচে-দায়-নেবার নেশা আর এত উৎসাহ ও শ্রমের পেছনে যেন একটা প্রতিজ্ঞা লুকিয়ে আছে। রজনীবাবুর থিয়োরীটা নিজের মিথ্যায় একদিন চূর্ণ হবে, পুঁটিমাসীর প্রতিজ্ঞা যেন সকল আয়োজনকে এই একটি লক্ষ্যে গুছিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে! এই প্রতিজ্ঞা তাঁর হার্টের কষ্টেরই প্রায় সমবয়সী, প্রায় তেত্রিশ বছর।

—আয় যতী।

পুঁটিমাসী আবার ডাকলেন যতীকে। রজনীবাবুর কাছে আর কোন ভালমন্দ সাড়া পাবার আশা নেই! তাঁর থিয়োরী সুলেখাকে ধরে আনতে পারেনি। অন্তত সাতটা দিন ধরে তাঁর স্বপ্নে তন্দ্রায় ও জাগ্রত চিন্তায় একটা অভিমানের বিপ্লব চলবে। কিন্তু তবু চৈতন্য হবে কিনা কে জানে? রজনীবাবু এখনও হয়তো সেই একরোখা বিশ্বাসের মোহে অন্ধ হয়ে আছেন। শুধু হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, সুলেখা ও যতীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হলো কেন? এক আদর্শে ও এক কাজের পথে ওদের হৃদয় একদিন এক হয়েছিল, তবে এই অঘটন হয় কেন?

ভাবতে থাকুন রজনীবাবু। তাঁর কাছে কোন ভরসা নেই। ভরসা শুধু প্রমীলা। যতী ঘড়ছাড়া হবার পর থেকেই প্রমীলা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সব স্পৃহা মমতা ও আবেগের বেড়া ভেঙে প্রমীলার মন আজ আলগোছে দূরে সরে গেছে। সংসারের কোন ক্ষতি আজ আর প্রমীলার ক্ষতি নয়, কোন বিদায় অপচয় বিসর্জন আজ আর প্রমীলাকে ব্যথিত করে না। সংসারের নিয়মকেই ভালবেসে দু'হাতে যেন বুকে জড়িয়েছিল প্রমীলাবালা। নিয়মের সংসারকে সে চায়নি; রাজপাটপুরের বিধবা তরুণীকে তাই একদিন নিঃসঙ্কোচে তরুণ রজনী মিত্রের পাশে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। কেন? রজনী মিত্র আজও বলেন—আদর্শের দাবী, এক প্রেরণা, এক সাধনা ইত্যাদি ইত্যাদি। পুঁটিমাসী মনে প্রাণে রজনীবাবুর এই তত্ত্বটাকে ঘৃণা করেন। পৃথিবীর সকল হেয় বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী করে ঘৃণা করেন।

এই তত্ত্ব যেদিন ভুয়ো প্রমাণিত হবে, বোধ হয় একমাত্র সেইদিন পুঁটিমাসী তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় তৃপ্তির আস্বাদ পাবেন। তাই কি পুঁটিমাসী তাঁর হার্টের কষ্টের বোঝা নিয়েও এই প্রতিশোধের অভিযানে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছেন?

প্রমীলাকে পুজোর ঘর থেকে বার করতে হবে। যতীকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর ঘরের দিকে

এগিয়ে চললেন পুঁটিমাসী। যতীকে একবার দু'চোখ চেয়ে ভাল করে দেখুক প্রমীলা, তার নিস্পৃহ তপস্যার খোলস ভাঙুক।

আজ প্রমীলাবালার ছ'বছরের সমাধির অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতে হবে। যতীকে যেন প্রদীপের মত সঙ্গে ক'রে এগিয়ে গেলেন পুঁটিমাসী, পূজোর ঘরের দিকে। নিরেট কঠিন যবনিকার মত দরজাটা তখনো বন্ধ ছিল। আজ এই দরজা খুলে যাবে। যতীর অন্তর্ধানের সঙ্গে প্রমীলাবালা যেন তাঁর হৃদয়কেও বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই বনবাসের বন্যতা দূর হয়ে যাবে। আবার সজনতা ও সহৃদয়তার সংসারকে হাতের কাছে ফিরে পাবে প্রমীলাবালা।

অদ্ভুত রকমের একটা আনন্দের আবেগে পুঁটিমাসীর চোখ দু'টো ক্ষণে ক্ষণে সজল হয়ে উঠছিল।

পূজোর ঘরের কপাটে ধাক্কা দিলেন পুঁটিমাসী। আস্তে আস্তে ডাকলেন—একবার বাইরে এস প্রমীলা। যতী এসেছে।

ঘরের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য যেন কোশাকুশী ও ধূপ দীপ শাঁখ আর চামরের শান্তি ভঙ্গ হলো। ঠুং ঠাং করে এলোমেলো কতগুলি শব্দ হলো। স্তব্ধ পূজোর ঘরের ভেতর যেন একটা নিশ্বাস হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছে।

পুঁটিমাসীর সারা মুখে একটা কৃতার্থতার হাসি ছাপিয়ে উঠছিল। আবার ডাকলেন—শীগগির এস প্রমীলা।

প্রমীলাবালার উত্তর শোনা গেল। দরজাটার ফাঁকে যেন একটা সুকঠিন ও শান্ত কৌতূহল সশব্দে উঁকি দিল—আর কে এসেছে?

হঠাৎ চমকে উঠে পুঁটিমাসী ভীতভাবে উত্তর দিলেন—আর কেউ নয়।

—কেন?

পুঁটিমাসী আরও অসহায় হয়ে পড়লেন। এ-প্রশ্ন আশা করেননি পুঁটিমাসী। এই বেয়াড়া কেন'র জবাব দেবার মত সামর্থ্য তাঁর নেই। পুঁটিমাসী তাই খানিকটা আবদারের সুরে মিনতি করে বললেন—তুমি একবার বাইরে এস প্রমীলা। তারপর সব কথা শোন।

—সুলেখা এল না কেন?

—সে আর আসবে না প্রমীলা। যতীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

—কেন?

আবার কেন? প্রমীলাবালার এই কেন, রজনীবাবুর কেন'র মতই নির্বোধ আর অন্ধ। পুঁটিমাসী মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। তবু তাঁর বুঝতে ভুল হয়নি, এই দুই প্রচণ্ড কেন'র মধ্যে কী আকাশ পাতাল তফাৎ! রজনীবাবুর প্রশ্নগুলি আকাশের মতই, অনেক ওপরে উঠে একেবারে নীল হয়ে গেছে। সংসারের সবুজের দিকে বিরক্ত ও আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রমীলাবালা তার উল্টো। প্রমীলাবালার প্রশ্নগুলি পাতালের মত, গভীর মোহে একেবারে নীচে নেমে রয়েছে। সুখদুঃখের একান্তে, কামনা বাসনা ও ভালো-লাগায় একেবারে গলাগলি হয়ে আছে। তাই সংসারে বিচ্ছেদ বিরহ ও ছাড়াছাড়ির নিরর্থক হৃদয়হীনতার দিকে তাকিয়ে ধিক্কার দিয়ে ওঠে—কেন?

প্রমীলাবালার আর কোন উত্তর শোনা গেল না। পূজোর ঘরের দরজা তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ ধরে পুঁটিমাসী ও যতী পূজোর ঘরের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বন্ধ দরজার ফাঁকে শুধু ফুরফুরে আলপনার মত ধূপের ধোঁয়া বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পুঁটিমাসী অবসন্নের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—না, আমি আগেই জানতাম প্রমীলাও এই কাণ্ড করবে। দরজা খুলবে না।

—কেন মাসীমা?

এতক্ষণে কথা বললো যতী। আবার এক অন্তর্ধানের নাটকের শেষ অঙ্কে চরম একটা

দৃশ্যের মধ্যে যেন যতী দাঁড়িয়ে আছে। বিবর্ণ ও নিষ্প্রভ চেহারার মধ্যে যতীর চোখের দৃষ্টিটাই শুধু প্রখর অভিমানে তীব্র হয়ে জ্বলছিল।

যতীর মুখে আবার সেই 'কেন' শুনে মনে মনে হেসে ফেললেন পুঁটিমাসী। উত্তর দিলেন—সুলেখা এল না, তাই চটে গেছে প্রমীলা।

—কার ওপর চটেছে?

যতীর প্রশ্নে মুহূর্তের মধ্যে পুঁটিমাসীর মনের হাসি উবে গেল। যতীর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা মমতার সঙ্কটে পড়ে পুঁটিমাসী কিছুক্ষণ নিরুত্তর হয়ে রইলেন। সত্যিই তো, কী দুরূহ প্রশ্ন! কার ওপরে চটেছে প্রমীলা? সুলেখার ওপর রাগ করতে পারলে আজ প্রমীলার পূজোর ঘরের দরজা খুলে যেত। পুঁটিমাসী চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারলেন না।

যতী একটু সপ্রতিভ হয়ে এগিয়ে এসে পুঁটিমাসীকে প্রণাম করলো—আমি এবার চলি মাসীমা।

পুঁটিমাসী বিপদে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—খবরদার বলছি যতী, যেতে পারবি না।

—আমি বুঝেছি, মা আমার ওপর চটেছে।

—তাতে কি হয়েছে? তোর বাবা তোর ওপর একটুও রাগ করেনি।

—বাবাকে রাগ করার আমি কোন সুযোগ দিইনি মাসীমা। বাবা বলতে পারেন না যে, আমি সংগঠনের কাজ ছেড়ে দিয়েছি বা আদর্শ হারিয়েছি।

—আমিও তো তাই বলছি। তবে তুই এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন?

—কিন্তু মার কাছে যে আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি মাসীমা!

পুঁটিমাসী সান্ত্বনা দিলেন—না না, তুই ওসব কথা ভাবিস না। প্রমীলার কথা ছেড়ে দে।

—তা হয় না মাসীমা।

পুঁটিমাসীকে প্রণাম করে যতী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। শুকনো মুখ আর বিব্রত চোখের দৃষ্টি দিয়ে জোর করে একটা কৃত্রিম হাসি ধ'রে রাখার চেষ্টা করছিল। প্রমীলাবালার কথাটাই সে আজ ছাড়তে পারে না। এই তো সবচেয়ে বড় কথা, যে-কথার আড়ালে চরম একটা বিদ্রূপ আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রমীলার কাছে সে আজ একেবারে অপদার্থ। পেটের ছেলে বলে মাপ করতে পারেনি প্রমীলা, দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আজ যদি একটা জহ্লাদের চাকরী নিয়ে ঘরে ফিরে আসতো যতী, তবে প্রমীলা কখনো দরজা বন্ধ করে দিত না। সেটা করতেন রজনীবাবু। কিন্তু যতী আজ ফিরে এসেছে শুধু তার পরাভূত পৌরুষের একটা ব্যর্থ কাহিনীর রিক্ততা নিয়ে। এর সঙ্গে প্রমীলাবালার কোন আপোষ নেই।

পুঁটিমাসীও চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। যতীকে সান্ত্বনা দেবার মত মিথ্যে কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পুঁটিমাসী ভাল করেই চেনেন প্রমীলাকে। প্রমীলার ঘৃণা ও ভালবাসার তত্ত্ব ও স্বরূপকে ভাল করেই জানেন। শুধু একদিন দু'চোখের দেখার নেশায় জীবনে যাকে যার ভাল লাগলো, সব তেয়াগিয়া ঐ ভাল লাগাটুকুই তাদের জীবনের করমে ভরমে অটুট বন্ধন হয়ে বেঁচে থাকবে। এর মধ্যে ভাঙাভাঙি ছাড়াছাড়ির কথাই আসতে পারে না। যদি আসে তবে সেই প্রবঞ্চিত জীবনকে মৃত্যু রূপেই মেনে নেওয়া উচিত। এবং সেই জীবন্ত মৃত্যুকে ঘৃণা করে প্রমীলা।

পুঁটিমাসী একটু দ্বিধা করে আস্তে আস্তে বললেন—সুলেখাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না যতী?

যতী—না মাসীমা, আমাদের বেহার কমিটির সেক্রেটারী ভরদ্বাজের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারটাও বোধ হয় এতদিনে চুকে গেছে।

পুঁটিমাসী—ছি ছি!

যতী—কা'কে ছি-ছি করলেন মাসীমা? আমাকেই বোধ হয়?

পুঁটিমাসী বিচলিত হ'য়ে কাঁদ-কাঁদ চোখে যতীর কাছে এগিয়ে এলেন, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—কি বলছিস পাগল ছেলে! তোকে ছি-ছি করবো কেন?

যতী—তা হ'লে সত্যি করে বলুন কা'কে ছি-ছি করলেন? সুলেখাকে?

নিরুত্তর হয়ে রইলেন পুঁটিমাসী। যতী আবার হেসে হেসে বললো—বলুন।

পুঁটিমাসী—না, সুলেখাকেই বা দোষ দেব কেন? আমি কাউকেই ছি-ছি করছি না।

যতী—বুঝলাম, আপনি পৃথিবীর সবাইকে ছি-ছি করছেন। যাক, আমি এইবার যাই মাসীমা।

পুঁটিমাসী অনেকক্ষণ ধরে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। কী ভয়ঙ্কর সত্য কথা ব'লে চলে গেল যতী! তাঁর হার্টের কষ্টকে সারা জীবন ধরে এত গুরুভার করে রেখেছে বোধ হয় এই একটি অস্ফুট ধিক্কার। পৃথিবীর প্রণয়-মিলনের নির্বোধ রীতিনীতির দিকে তাকিয়ে তাঁর অন্তর যেন সারাক্ষণ ছি-ছি করছে। নরেন মাস্টার ও যতীর ভাঙাঘরের করুণতার দিকে তাকিয়ে তাঁর মন ছি-ছি করে ওঠে। সুলেখা, মঞ্জু ও মীনুর ঘর বাঁধার ছুতো আর ছলনার দিকে তাকিয়ে ছি-ছি করে ওঠে। সবচেয়ে বেশী ছি-ছি করে ওঠে রজনীবাবু প্রকাণ্ড আদর্শবাদের মূঢ়তার দিকে তাকিয়ে। আদর্শের খাতিরে নাকি মিলন হয়? মিলনের নাকি একটা আদর্শ আছে? ছি-ছি!

উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন পুঁটিমাসী। বুকের ভেতরে অস্বাভাবিক রকমের একটা বদ্ধ বেদনা টিপ্ টিপ্ করে তাঁর নিশ্বাসের ছন্দ নষ্ট করছিল।

পরমুহূর্তে ব্যস্তভাবে রজনীবাবুর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন পুঁটিমাসী। রজনীবাবু শান্তভাবেই তাকিয়ে দেখলেন।

পুঁটিমাসী বললেন—একটা কথা বলতে এলাম।

—বলুন।

—যতী চলে গেল, প্রমীলা দরজা খোলেনি। আমিও যাচ্ছি, আর কখনো আসবো বলেও আশা করি না।

ধড়ফর করে উঠে বসলেন রজনীবাবু—যতী চলে গেল কেন?

—একদিন যতীকে আপনি তাড়িয়েছিলেন, এবার আর একজনের পালা। প্রমীলাই যতীকে তাড়ালো।

—কি অধিকার আছে প্রমীলার?

—তা জানি না। আপনি বুঝে দেখুন।

—আমি সব বুঝেছি। প্রমীলা পাগল হয়ে গেছে, কোন আদর্শের জন্য, কারও আদর্শের জন্য আজ ওর কোন দরদ নেই।

—আদর্শের দোহাই আর দেবেন না।

—কেন?

—বলুন দেখি, এত দুঃসাহস করে, নিজের ঘরবাড়ি বাপ-মায়ের মায়া উপেক্ষা করে প্রমীলাকেই বিয়ে করেছিলেন কেন?

—সে কি আপনি জানেন না? আদর্শের জন্য।

—ঠিক প্রমীলার মতই আর একটি মেয়ে সেদিন আপনার আদর্শের দলে ছিল। কই, তা'কে তো বিয়ে করেন নি! নিশ্চয় একটা কারণ ছিল, আজ বলুন দেখি, কি সেই কারণ?

নির্বোধ বিস্ময়ে শুধু চোখ দু'টি নিষ্পলক করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়লেন রজনীবাবু—আজ আপনি এসব কি কথা বলছেন পুটুদি? আজ যে এ সব কথার কোন অর্থ হয় না।

—কোন কালেই এর কোন অর্থ ছিল না।

কথা কয়টি শেষ করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন পুঁটিমাসী।

রজনীবাবু বিমূঢ়ের মত জনহীন দ্বারপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে বিব্রতভাবে যেন আবেদন করলেন—আপনি কি সত্যিই বুঝতে পারছেন না পুঁটুদি, আজ আর এ সব কথার কোন অর্থ নেই?

পুঁটিমাসী আর আসছেন না। এই রকম অনেকবার পুঁটিমাসী এক একটি দীর্ঘ অদেখার আড়ালে সরে পড়েছেন, আবার দেখা দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয়, এবার তিনি সত্যিই অদৃশ্য হয়েছেন। রজনীবাবুর সংসারে ছোট ছোট আকস্মিক প্লাবন লেগেই আছে। পুঁটিমাসী যেন চরের মাটির সবুজের মত মাঝে মাঝে নিজের অসহায়তায় অভিমানে জলের আড়ালে ডুবে থাকতেন, আবার ভেসে উঠতেন। কিন্তু এবার মনে হয়, আর ভেসে উঠবেন না। নিজের মুখে তাঁর জীবনের চরম ক্ষোভ তিনি ব্যক্ত করে দিয়েছেন। এইবার বাঁধ ভেঙে গেছে। দুঃসহ লজ্জার গভীরে তিনি একেবারে তলিয়ে গেছেন, মিলিয়ে গেছেন। আর দেখা দিতে পারেন না। দীর্ঘকালের স্রোত শুধু দীর্ঘতর হয়ে চলেছে, সেই অবিরল প্রবাহের ক্ষান্তি নেই। চরের সবুজ শুধু চিরকাল তটভূমির দিকে তাকিয়ে থাকবে, এই বিচ্ছিন্নতা কখনো ঘুচতে পারে না। তাই আর লাভ কি? হার্টের কষ্টের বোঝা বুকে পুষে নিয়ে, ঝাপসা চোখের দৃষ্টি নিয়ে, মিছামিছি শীতরাত্রির জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু রজনীবাবু কি বুঝলেন? তিনি যাই বুঝে থাকুন না কেন, একটু যেন সাবধান হয়েছেন। পুঁটিমাসী আসেন না, এই অভাবটাই দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। হঠাৎ এক একদিন জানালা দিয়ে বাইরের বাগানে প্রভাত রৌদ্রের উজ্জ্বলতার মেলা তাঁর চোখে চমক লাগায় ; হঠাৎ ভেবে বসেন, পুঁটুদির আসবার সময় হলো। পর মুহূর্তে ভয় পেয়ে একেবারে স্থির হয়ে থাকেন। একটা বিমর্ষতার কালো কুয়াসা যেন সারা মন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। সমস্ত দিবালোকের রূপ ধুলোয় ঢাকা পড়ে মলিন হয়ে ওঠে, তারি মধ্যে বদ্ধ পূজোর ঘরে ঠুং-ঠুং করে ঘণ্টা বাজে, এক তপস্বিনীর গোপন ব্রতের ভয়াবহতার প্রতিধ্বনি যেন তার মধ্যে ইসারা দিয়ে বাজতে থাকে। রজনীবাবু আস্তে আস্তে ঘরের জানালা বন্ধ করেন। ঐ শব্দ যেন আর কানে শুনতে না পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তাঁর মনের ভীরুতা যেন চুপে চুপে পথ বন্ধ করতে থাকে, যেন পুঁটি-দি হঠাৎ না এসে পড়েন। আজ আর রজনীবাবু প্রস্তুত ন'ন, পুঁটিমাসীকে অভ্যর্থনা করার রীতিনীতি আজ আর তাঁর সাধ্যে ও ক্ষমতায় নেই। পুঁটিমাসী যেন অকারণে জীবনের যত অদ্ভুত ও উৎকট প্রশ্নগুলিকে তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সরে পড়েছেন। যেকথা নিতান্ত অবান্তর হয়ে একপাশে বোবা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পুঁটিমাসীর প্রতিহিংসার ইঙ্গিতে আজ তা সরব হয়ে উঠেছে। রজনীবাবুর প্রত্যেক চিন্তার আনাগোনার পথের চারপাশে দাঁড়িয়ে একটা অস্পষ্ট বিদ্রূপ আর ধিক্কার যেন ফিসফাস করে। আদর্শের জীবন, সাধনার জীবন, প্রতিজ্ঞার জীবন—কথাগুলি যেন নিজের মিথ্যার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে লুটিয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণের জন্য রজনীবাবু ছটফট করেন। প্রমীলাবালার পূজোর ঘরের ঘণ্টাধ্বনি মুমূর্ষু পাখীর আর্তনাদের মত শিউরে উঠছে শোনা যায়। যেন এই মুহূর্তে পাখী বুঝতে পেরেছে তার জীবনের আকাশে প্রথম চঞ্চলতার ভুল। প্রমীলার জীবনে আর কোন কাজ নেই। সে শুধু দেখছে তার জীবনের ভুল। কি ভয়ানক অভিশাপ!

কিন্তু রজনীবাবু নিজেকেই প্রশ্ন করেন, প্রমীলার চেয়ে তিনি কোন তুলনায় সুখী? সারা জীবন ধরে আদর্শ খুঁজছেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য! এই খোঁজাও যে অভিশাপের মতই মনে হয়।

রজনীবাবুর বার বার মনে পড়ে, যতী চলে গেছে। মীনুর চিঠি অনেকদিন হয় আসে না।

মঞ্জু এখনো তার নিজের হাতে বোনা খদ্দরের চাদরটা পাঠালো না। এক এক করে ছন্দ পতন হচ্ছে। অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এক আদর্শের সূত্রে বাঁধা আর থাকছে না। বিনা কারণে ব্যতিক্রম ঘটছে। কেন, কেন এরকম হয়? সংসারে কি নিয়ম বলে কোন জিনিস নেই? হাঁ, জীবনে উৎপাত আছে, বিশৃঙ্খলা আছে, আঘাত প্রত্যাঘাত আছে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করার শত আয়োজন ছদ্মবেশে ঘুরছে। কিন্তু মানুষ সবই অতিক্রম করে, শুধু আদর্শের জোরে। আদর্শের সাধনা মানেই মনুষ্যত্ব।

যতী মঞ্জু মীনু, সকলকেই মনে মনে আশীর্বাদ করেন রজনীবাবু। সবাই অবিচল থাকুক নিজের আদর্শের পথে। জীবনে সকল ভুলের দোষ আপনা হতেই মাপ হয়ে যায়, যদি আদর্শ নামে একটি পরম অবলম্বনকে হাতছাড়া না করা হয়। আজ রজনীবাবু তাঁর শান্ত মনের ধ্যানের মধ্যেই যেন অনুভব করেন, বৈচিত্র্যে আকীর্ণ জীবনের অর্থানর্থের চঞ্চলতাকে, আজ যা আছে কাল তা নেই। সারা আকাশ ছড়িয়ে এত বড় মহিমার পথে চলতে চলতে চন্দ্র-সূর্যেরও দশান্তর ঘটে। কখনো ধূলিজাল, কখনো মেঘ, কখনো তুষার ও কুয়াসায় তারা ঢাকা পড়ে। কিন্তু তাদের লক্ষ্যভ্রান্তি হয় না। তারা চলতে চায়, তাই তাদের মৃত্যু নেই। সব আঁধি অন্ধকার আবছায়ার আবিলতা উত্তীর্ণ হয়ে তারা চলতেই থাকে। যতী মঞ্জু মীনু, চলুক সবাই। পথের ভুল হতে পারে, কিন্তু পথচলার ভুল তাদের নেই। যতীও চলেছে, হয়তো এক পথের বাঁকে এসে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছে। তার পথের সাথী সরে গেছে। এইবার মোড় ফিরে গিয়ে নতুন পথে যাত্রা শুরু করুক যতী। রজনীবাবু তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবেন। যতীর নতুন চলার পথে নতুন সাথীর আবির্ভাব হোক। যেই হোক না কেন সে, তাকে হযতো জীবনে দেখতে পাবেন না রজনীবাবু, তবু দূর থেকেই তিনি তাঁর হৃদয়েব সকল আগ্রহের মাঙ্গলিক পাঠিয়ে দেবেন।

ঘর্ ঘর্ শব্দ করে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফটকের সামনে। রজনীবাবু কৌতূহলী হয়ে বাইরে বেব হয়ে এলেন। গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল মীনু, পেছনে গাড়োয়ান, তাঁর কাঁধে ছোট একটা বাক্স। রজনীবাবু কোন প্রশ্ন করার আগেই মীনু প্রণাম করলো।

গাড়োয়ান চলে যেতে অনেকক্ষণ ধরে মীনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন রজনীবাবু। মনের ভেতর নানান প্রশ্নের ভীড় সরিয়ে একটা ছোটখাট কুশল প্রশ্ন করার কথাও তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন।

শুধু মীনুর চেহারাটা নয়, মীনুর অন্তঃকরণও যেন নিবাভরণ হয়ে গেছে, রজনীবাবুর চোখের দৃষ্টি যেন সেই গোপন রিক্ততাটুকু আবিষ্কার করতে পারছিল। রজনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ চলে এলি? সাধন কোথায়? কেমন আছে সাধন?

মীনু—ভাল আছে।

আশ্বস্ত হতে পারতেন রজনীবাবু কিন্তু মীনুর গলার স্বরে যেন ভাঙা সেতারের বেদনার মত রেশ লেগেছিল।

রজনীবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—সাধন এল না কেন?

মীনু কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। রজনীবাবুব মুখের ওপর যেন একটা শঙ্কার ছায়া নেমে এল। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রজনীবাবু। এই তো কয়েকটি মুহূর্ত আগেই তিনি তাঁর মনের পৃথিবীর সকল অনর্থের হেঁয়ালী দূরে সরিয়ে এক অবিচল অর্থকে ধরতে পেরেছিলেন। যতীকে আশীর্বাদ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এসে মীনু আবার দাঁড়ালো? রজনীবাবুর জীবনে একটি মাত্র প্রশ্ন, কিন্তু তার উত্তরের যেন সমাপ্তি নেই। রজনীবাবুর জীবনে একটি মাত্র বিশ্বাস, কিন্তু তার বিরুদ্ধে যুক্তি সংশয় ও ঘটনার অবিরল আয়োজন চলেছে। তাঁর উপলব্ধির শান্তিকে কশাঘাত করার জন্য যেন আড়ালে আড়ালে এক দৈবের

ষড়যন্ত্র চলেছে। নইলে, আজ হঠাৎ মীনু আবার ফিরে আসে কেন? কী ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে মীনু। চশমাটা যেন আলগা হয়ে নাকের ওপর ঝুলছে, মুখটা চুপসে গেছে মনে হয়।

রজনীবাবু বললেন—কিছু বলছিস না যে মীনু? হঠাৎ এই ভাবে...।

মীনু—আমি তো সবই জানিয়েছি।

রজনীবাবু—কই না, আমি কোন খবর পাইনি।

মীনু—পুঁটিমাসীকে সব জানিয়েছি।

রজনীবাবু উত্যক্ত হয়ে উঠলেন—কি ছাই আর জানিয়েছ পুঁটিমাসীকে? পুঁটিমাসীই বা জানবার কে? তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

রজনীবাবু কথা বলতে বলতে অন্য দিকে সরে গেলেন। মীনু সন্ত্রস্তভাবে রজনীবাবুর দিকে তাকালো। রজনীবাবুর মূর্তিটার মতই তাঁর কথাগুলিও যেন একটা যন্ত্রণায় ক্ষোভে ও অভিমানে ছটফট করছিল। এভাবে রজনীবাবুকে কোনদিন কথা বলতে শোনেনি মীনু। পুঁটিমাসীমার সম্বন্ধে এই রকম তুচ্ছতার আঘাত তুলে কোন দিন কোন উক্তি করেননি রজনীবাবু।

রজনীবাবু বললেন—সে আর এখানে আসে না, আসবেও না মনে হয়, তার আসবার দরকারও নেই।

কথা শেষ করেই বারান্দার সিঁড়িতে একটা ছায়া দেখে যেন চমকে উঠলেন রজনীবাবু। পুঁটিমাসীর ছায়া। হাতের ছাতার ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে উঠছিলেন পুঁটিমাসী। মীনুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—কখন এলি? আমার শরীরটা একেবারেই ভাল নয় রে মীনু। যাই হোক...।

পুঁটিমাসীর কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। আর কিছু বলবার নেই। আর কিছু করবারও নেই। আর সেই উৎসাহ নেই। এই পরের সংসারের ভালমন্দ নিয়ে ভাবনা করার যে প্রেরণা তাঁর নিত্যদিনের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে চঞ্চল হয়েছিল, আজ যেন সেই ছন্দ ভেঙে গেছে। আজ নিতান্ত অভ্যাগতের মত, নিছক পরোপকারী প্রতিবেশীর মতই পুঁটিমাসী এসেছেন। নিশ্চয় আসতেন না, যদি মীনুর চিঠি না পেতেন।

মীনু ও পুঁটিমাসী এক জায়গায় এবং রজনীবাবু অন্য জায়গায়—একই নাটমঞ্চের ওপর যেন তিন অভিনেতার মূর্তি দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সবাই যেন পার্ট ভুলে গেছে।

পুঁটিমাসী একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ছাড়লেন—মিছামিছি দাঁড়িয়ে আছিস কেন মীনু, ঘরের ভেতর যা।

মীনু চলে গেলে, পুঁটিমাসী আবার বিব্রত বোধ করলেন। কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ করে রইলেন। কয়েকটা মাত্র কথা বলতে তিনি এসেছেন। সেই কথা সোজা স্পষ্ট করে বলে দিয়ে তিনি চলে যাবেন। মীনু নিজে মুখ ফুটে বলতে পারবে না, তাই বাধ্য হয়েই তিনি এসেছেন। এছাড়া আর কোন কাজ নেই। শুধু খবর শুনিয়ে যাবার কাজ। এই খবর শোনার পর রজনী মিত্তিরের বিশ্বাসের জগৎ যদি উল্টেপাল্টে যায়, তবুও কিছু আসে যায় না পুঁটিমাসীর। আহত রজনী মিত্তিরের সত্তাকে আবার সান্ত্বনা দিতে, মীনুর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করতে, একটা বেয়াড়া সংসারের মুক্তির কথা নিয়ে তপস্যা করতে তিনি আর প্রস্তুত নন।

রজনীবাবুই আগে কথা বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা অসহায়তার আমেজ ফুটে উঠছিল।—কেমন আছেন পুঁটুদি?

পুঁটিমাসী—মীনুকে আপনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

রজনীবাবু—কেন?

পুঁটিমাসী—এর মধ্যে আর কোন কেন নেই। মেয়ের জীবনের যদি কোন মঙ্গল চান, তবে মেয়েকে নিজের মনে থাকতে দিন।

রজনীবাবু—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

পুঁটিমাসী—আপনি কোনদিনই...।

রজনীবাবু—সাধন কোথায়?

পুঁটিমাসী—সাধন ভালই আছে। কানপুরে খুব জোর মজুর আন্দোলন করছে, খুব নাম হাঁক ডাক হচ্ছে। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। মস্ত বড় আদর্শ নিয়ে মেতে আছে সাধন।

যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠবার চেষ্টা করছিলেন রজনীবাবু। আবেগের সঙ্গে বললেন—তবে মীনু কেন এত ভাল কাজের আনন্দ ছেড়ে দিয়ে...।

পুঁটিমাসী—আপনার আদর্শবাদী জামাই সাধন আপনার আদর্শবাদিনী মেয়েকে চাবুক তুলে...।

রজনীবাবু জড় স্তম্ভের মত স্থির হয়ে গেলেন। পুঁটিমাসীর কথাগুলি যেন নিজের বিষে পুড়ে পুড়ে রজনীবাবুর চোখের সামনে এক দুঃসহ ধোঁয়ার ঝড় সৃষ্টি করছিল। তার মধ্যে এক বিধ্বস্ত সংসারের জ্বালা টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর আদর্শে গড়া সংসারের নিয়মকে, মহৎ মিলনের অহংকারকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছেন। মনের অন্তস্তলে এক একটা ধিক্কারের শব্দ শুনে চমকে উঠছেন মাঝে মাঝে।

পুঁটিমাসী বড় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। চলে যাবার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারছিলেন না। রজনী মিত্তিরের আদর্শবাদের দম্ভ ভুয়ো হয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্যের মধ্যে পুঁটিমাসী ইচ্ছে করলেই একটা প্রতিশোধের আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু আজ আর সে-সব কোন স্পৃহা তাঁকে লুব্ধ করতে পারে না। রজনী মিত্তিরের নিরেট মূঢ়তা স্বচ্ছ হোক বা না হোক, তার জন্যও কোন উৎকণ্ঠা নেই পুঁটিমাসীর। তিনি খুশি হতে চান না। আজ শুধু দূরে সরে থাকার শান্তিটুকু তিনি অটুট রাখতে চান।

রজনীবাবু যেন দমবন্ধ স্বরে বললেন—এ কি করে সম্ভব হয় পুঁটুদি?

আবার সেই অতি পুরাতন প্রতিধ্বনি, সেই চির-অন্ধের আক্ষেপ। পুঁটিমাসী বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন।

রজনীবাবু—মীনু কি দোষ করেছিল যে...।

পুঁটিমাসী—কোন নতুন দোষ করেনি মীনু। তার যে দোষ বরাবর ছিল, তারই জন্যে...।

রজনীবাবু আশ্চর্য হচ্ছিলেন—বরাবর আবার কি দোষ ছিল?

পুঁটিমাসী—ছিল বৈকি? মীনু রোগা, মীনু চোখে ভাল দেখতে পায় না, চশমা পরে। মীনু একটু বেশী ঘুমোয়, বেশী বেড়াতে ভালবাসে।

রজনীবাবু—এই সবই তো সাধন জানতো। জেনেশুনেই তো সে...।

পুঁটিমাসী—হ্যাঁ, সেদিন এই দোষগুলিকেও সাধনের ভাল লাগতো, আজ আর ভাল লাগছে না, সহ্যও হচ্ছে না।

রজনীবাবু—মানুষের পক্ষে এরকম মতিভ্রম কি করে হয়?

পুঁটিমাসী—মতিভ্রম মোটেই নয়। মতি বদলে গেছে।

রজনীবাবু—মতি বদলে যাবে, কি আশ্চর্য?

পুঁটিমাসী—আপনি বড় মিথ্যে মিথ্যে আশ্চর্য হতে পারেন।

রজনীবাবু চুপ করে গেলেন। পুঁটিমাসী লজ্জিত হলেন। তাঁর সকল সাবধানতা ভুল হয়ে গেছে, আবার রজনী মিত্তিরের ভালমন্দের তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে তিনি তাঁর এক অজানা জেদের ভুলে জড়িয়ে পড়ছেন।

পূজোর ঘরের দিক থেকে মীনুর কান্নার মত আওয়াজ শুনতে পেলেন পুঁটিমাসী।—মাসীমা আপনি আসুন একবার। মা দরজা খুলছে না। শীগগির আসুন।

পুঁটিমাসী ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন। মনে মনে পুঁটিমাসীই ভাল করে জানেন, প্রমীলা

দরজা খুলবে না। প্রমীলা কি করে জানতে পেরেছে, সাধন আসেনি! আজ যদি সাধন ও মীনু একসঙ্গে এসে প্রমীলার পূজোর ঘরের বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে ডাক দিত—আমরা দু'জনে এসেছি, নিশ্চয় প্রমীলা বাইরে আসতো। কিন্তু যার জীবনে মিলনের গৌরব মুছে গেছে, কাছাকাছি হয়েও যাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাদের কাউকে আমল দেবে না প্রমীলা।

ঠিকই করেছে প্রমীলা। প্রমীলা যদি বাইরে এসে মীনুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—কি গো বাপের আদর্শবাদিনী মেয়ে? আদর্শমিলনের আদর্শ রয়েছে, কিন্তু মিলন কই? ছাড়াছাড়ি হয় কেন? তোমরা তো দেবতাদের ধরনে বিয়ে করেছ। তবে এই ব্যর্থতা কেন?

পুঁটিমাসী যেন মনে মনে প্রমীলার হৃদয়ের সবচেয়ে বড় ক্ষোভটাকে বুঝতে পারেন। কিন্তু কি উপায় আছে? প্রমীলাকে বুঝিয়ে বলার কোন উপায় নেই। সে কোনদিন বুঝবে না—তার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য যেখানে অপমানিত, সেখানে অন্য কিছুরই মর্যাদা দিতে প্রমীলা রাজী নয়। যেখানে আদর্শ দিয়ে ভালবাসার রীতিকে বাঁধবার চেষ্টা, সেখানে প্রমীলা থাকবে না। কোন সম্পর্ক রাখবে না। মীনু কেঁদে কেঁদে শতবার ডাকলেও আজ প্রমীলা দরজা খুলবে না।

মীনুর চোখ ছলছল করছিল। পুঁটিমাসী এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলছে প্রমীলা?

মীনু—আমি একা এসেছি কেন, সেই জন্যে দরজা খুলবেন না।

পুঁটিমাসী—আমি জানতাম। যতীকেও এই কথা শুনতে হয়েছে।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে, পুঁটিমাসী বিমর্ষ হয়ে পড়তে লাগলেন। একটু অনুযোগের সুরেই বললেন—তোমারই বা আর কি উত্তর দেবার আছে বল? নিজের ইচ্ছেয় ভাল বুঝে যা করেছ, কেউ বাধা দেয়নি। এখন যদি উল্টো ফল হয় তাহ'লে...।

—তাহ'লে সেটা আমারই দোষ মাসীমা, এই কথাই আপনি বলতে চাইছেন, কেমন?

ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিল মীনু। এটা ওর চিরকালের স্বভাব। সামান্য কারণেই অভিমান করে, অল্পেতে রাগ করে, আর রাগ করলেই চটপট কড়া কড়া উত্তর দেয়।

পুঁটিমাসী উত্তর দিলেন—দোষ না হোক দায়িত্ব অস্বীকার করো না মীনু। নিজের পছন্দেই তোমাদের বিয়ে হয়েছিল।

মীনু—আপনি তাহ'লে এ বিয়ে পছন্দ করেননি?

পুঁটিমাসী—পছন্দ করিনি, অপছন্দও করিনি।

মীনু—এ-কথাটা আমি আগে জানতাম না। যাক...।

পুঁটিমাসী—আমাকে আর কোন কথার মধ্যে জড়াসনি মীনু। আমি অনেক ভুগেছি, শুধু ভুগবার জন্যেই পড়ে রয়েছি। জীবন ভরে শুধু ঠকতেই রইলাম। বিনা কারণে বিনা দোষে ঠকছি।

মীনু অবাক হয়ে পুঁটিমাসীর দিকে তাকিয়ে রইল। পুঁটিমাসী যেন মনের ভুলে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে কতগুলি অবান্তর অভিমানের ভীড়ের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললেন।

পুঁটিমাসী নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন। মাথাটা ঝুঁকে ছিল। আঙ্গিনায় মাটির ওপর যেন বড় বেদনার এক ইতিহাসের লেখা অস্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। পুঁটিমাসীর বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি তারই পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। কিন্তু আর সামর্থ নেই তাঁর। ছাতাটাও দূরে বারান্দার কোণে পড়ে রয়েছে, ভর দিয়ে দাঁড়াবার মত আর কোন অবলম্বন হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর ক্লান্ত মূর্তির মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে এক উদাস বেলাশেষের বিদায়ী আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে। এতদিন ধরে পথ চলতে চলতে যেন থেমে গেছেন পুঁটিমাসী। এই শূন্য মাঠের সীমাও নেই মনে হয়। আর উৎসাহ নিয়ে সম্মুখে তাকিয়ে দেখবারও ইচ্ছে নেই। দাঁড়িয়ে থাকাও বৃথা। এর পরেই গভীর সন্ধ্যার অন্ধকার দশদিকের রূপ ঢেকে ফেলবে। পুঁটিমাসী এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখানে কোন পান্থশালার আলোকও

আর পৌঁছাতে পারে না।

তাই ফিরে চলে যাওয়াই উচিত। পুঁটিমাসী আস্তে আস্তে বললেন--আমি এবার চলি মীনু।

মীনু এতক্ষণ পুঁটিমাসীর দিকেই তাকিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে পুঁটিমাসীকে দেখে আসছে মীনু, কিন্তু এভাবে দেখবার সুযোগ কখনো হয়নি। এই ক্ষণিক মৌনতার মধ্যে পুঁটিমাসী যেন সকল ঘটনার আবরণ ভেদ করে এক উপকথার রূপে ফুটে উঠেছেন। মীনুর দু'চোখের দৃষ্টি এক প্রবল কৌতূহলের আবেগে স্বচ্ছ হয়ে চিকচিক করছে, যেন পুঁটিমাসীর অতীত জীবনের একখানি গোপন ফটো প্রায় ধরে ফেলতে পেরেছে মীনু।

পুঁটিমাসী আবার বললেন—আমি চললাম।

গভীর অন্ধকারের গোপনে এক ভাঙা ঘাটের সিঁড়িতে আঘাত পেয়ে যেন দীঘির জলের ছোট একটা ঢেউ ছলছল করে উঠছে। পুঁটিমাসীর গলার স্বর সেই রকমের। চলে যাবার জন্যই তিনি এখানে আসেন, এটা তিনিও ভাল করে জানেন। তবু এত বার সেকথা বলেন কেন? মীনু আজ পুঁটিমাসীর প্রত্যেকটা কথার অর্থ নতুন করে বুঝতে পারে।

মীনু বললো--আপনি যেতে পারবেন না।

পুঁটিমাসী—না, আর আমায় কোন অনুরোধ করিস না মীনু।

মীনু--বোর্ডিংয়ে থাকতে আপনার একটুকুও ভালো লাগে না, তবু জোর করেই তো সেখানে আছেন।

পুঁটিমাসী—কে বললে তোকে?

মীনু—আমি বুঝতে পারি।

পুঁটিমাসী হেসে ফেললেন—জোর করে সেখানে থাকবো কেন? চাকরীটা এখনো আছে, তাই থাকি।

মীনু—আপনি আমাদের এখানে কেন থাকেন না মাসীমা?

পুঁটিমাসী আরো আশ্চর্য হয়ে হাসতে লাগলেন—এখানে কি করে থাকবো রে পাগলা মেয়ে?

মীনু—এখানে জোর করে থাকবেন।

পুঁটিমাসী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—যত নভেল-পড়া বাক্যি শিখেছিস, কাজের কথা কিছুই শিখলি না।

মীনু--না মাসীমা, আপনি এখানে থাকুন। নইলে আমি একা একা টিঁকতে পারবো না।

মীনুর অনুরোধ পুঁটিমাসীকে যেন দু'হাতে গলা জড়িয়ে আবদারের দাবীতে আটক করে রাখতে চাইছে। পুঁটিমাসী ভয় পেয়ে ছটফট করে উঠলেন—না রে মীনু, ওরকম করে আমায় বলিস না! আমি কিছুতেই এখানে থাকতে পারি না।

মীনু—তবে আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমিও বোর্ডিংয়ে থাকবো।

পুঁটিমাসী—তোর আবার বোর্ডিংয়ে থাকবার কি এমন দশা হলো?

মীনু--আপনার যে দশা আমারও তাই।

চমকে উঠলেন পুঁটিমাসী—এসব কি আবোলতাবোল বলছিস মীনু! আমার দশা তোর কেন হতে যাবে? ষাট, কারও যেন না হয়!

এত দুঃখ ও বিষণ্ণতার মধ্যেই মীনু হেসে ফেললো। পুঁটিমাসীকে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। যতখানি বলা উচিত হয়তো তার চেয়ে অনেক বেশী বলে ফেলবেন। অতটা জানতে চায় না মীনু। রাজপাটপুরের ঘটনাকে যতই গল্প করে চুকিয়ে দিতে চেষ্টা করুন না কেন পুঁটিমাসী, তাঁর কাছে সেটা আজও ইতিহাস হয়ে আছে। গল্পের ছলেও যে-বেদনার একটি ছোট অধ্যায়কে সাবধানে এড়িয়ে গেছেন, সেই গোপনতাই আজ সামান্য অসাবধানতায়

ভেঙে যাচ্ছে। গোপন বলেই চাপা দিতে গিয়ে এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সামান্য একটু সান্ত্বনার মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে নিজের অভিমানকে নিজেই ধরা পড়িয়ে দেন।

পুঁটিমাসী তেমনি ভুলের বশেই যেন বলতে লাগলেন—আমার দশা হলে কি আর সইতে পারবি? তোরা হলি আধুনিক কালের মেয়ে, যা মন চায় তাই করতে পারিস। আমাদের সে-সাধ্যি নেই। আমরা নিজের মনের ভয়েই চিরকাল ভীতু হয়ে থাকতে পারি, তার বেশী পারি না। আমার দশা আর তোর দশা অনেক তফাৎ।

মীনু আবার হাসলো—কিন্তু আপনার দশাটা যে কি, তা আমি সত্যিই কিছুই জানি না।

পুঁটিমাসী বিরক্ত হয়ে উঠলেন—তুই আবার জানবি কোত্থেকে? তোর বাপই জানে না তো তুই!

কেমন একটা সমবেদনার ছোঁয়ায় মীনুর গলার স্বর কোমল হয়ে আসে—যাক গে, আপনি বোর্ডিংয়ে যেতে পারবেন না।

পুঁটিমাসী—আবার সেই কথা। এখানে থেকে আমি তোদের কোন মঙ্গল করবো?

মীনু—আপনি বাবাকে দেখবেন?

পুঁটিমাসী—তুই কি করতে আছিস?

মীনু—আমি আপনাকে দেখবো।

পুঁটিমাসী—আবার সেই নভেল-পড়া কথা!

মীনু—আপনি সবই বুঝতে পারছেন মাসীমা, বাবা আবার বিছানা নেবেন। বাবাকে শান্ত করার ক্ষমতা আমার নেই।

পুঁটিমাসী কয়েক পা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। মীনুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ ভাবে তাকালেন, তার পরেই পুঁটিমাসীর মুখটা কঠোর হয়ে উঠলো। মনের মধ্যে একটা ক্ষমাহীন ক্ষোভকে অতিকষ্টে সংযত করে যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন—কিন্তু তাঁকে এত শান্ত করার কি দরকার? তিনিই বা কি এমন শুদ্ধ গঙ্গাজল?

মীনু চেঁচিয়ে উঠলো—থাক মাসীমা, আমি শুনতে চাই না, আপনি আর বলবেন না।

পুঁটিমাসী যেন শুনতে না পেয়েই এই বাধা গ্রাহ্য করলেন না। মনের আগল ভেঙে, সব চক্ষুলজ্জার সীমা ছাড়িয়ে, তাঁর প্রতিশোধের সাধ পথের মাঝখানে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে—শান্তি তিনি পেতে পারেন না। তাতে কোন লাভ হবে না। তাঁর দরকার শিক্ষা। আগে ওঁর শিক্ষা হোক, তারপর আমি আসবো।

রজনীবাবু ডাকছিলেন—মীনু, এদিকে এস।

পুঁটিমাসী তখুনি ছাতাটা হাতে তুলে নিয়ে বারান্দা পার হয়ে চলে গেলেন। মীনু আর তাঁকে দ্বিতীয় বার অনুরোধ করার সাহস পেল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে রজনীবাবুর সামনে দাঁড়লো।

রজনীবাবু বললেন—লজ্জা করে কোন কথা চাপা দিও না। যা জিজ্ঞেস করছি, তার উত্তর দাও।

মীনু প্রস্তুত হয়েই ছিল। রজনীবাবু বললেন—সাধন তোর সঙ্গে হঠাৎ এরকম ব্যবহার করলো কেন?

মীনু—হঠাৎ নয়।

রজনীবাবু—তবে কি অনেকদিন থেকেই...।

মীনু—হ্যাঁ, আমি জেল থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি, উনি অন্যরকম হয়ে গেছেন।

রজনীবাবু—কি রকম?

মীনু—তুচ্ছ কারণে অপমান করতে লাগলেন।

রজনীবাবু—সেই তুচ্ছ কারণটা কি?

মীনু—আমার চেহারা, আমার আচরণ, আমার চরিত্র। আমার সবই তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে
।।
রজনীবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন—তবে কে তার কাছে সহ্য?
মীনু—তাও জানতে পেরেছি। অবশ্য তাঁর মুখ থেকে নয়।
রজনীবাবু—সব খুলে বল মীনু, কিছু চাপা দিও না।
মীনু—এক মহিলা, তিনি সেখানকার এক মেয়ে স্কুলের টীচার...।
রজনীবাবু—সে কি করেছে?
মীনু—এই মহিলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।
রজনীবাবু—মহিলাটি লেবার ওয়েলফেয়ারে কাজ করে বুঝি?
মীনু—না, তিনি এক উকীলের একমাত্র মেয়ে, অনেক সম্পত্তি আছে।
রজনীবাবু—মাত্র এই তার গুণ?
মীনু—তা জানি না।
রজনীবাবু—মাত্র সম্পত্তি আছে, আর কোন গুণ নেই, কোন আদর্শ নেই—এ তো পশুব অবস্থা। তারপর?
মীনু—উনি স্পষ্ট করে বলে দিলেন, আমার সঙ্গে বনিবনা করে চলতে পারবেন না তিনি।
রজনীবাবু—তুই কি বললি? এক চোট খুব কেঁদেছিস নিশ্চয়। ঐ তো তোদের দোষ। পায়ের চটি খুলে রাস্কেলটার মুখের ওপর...।
মীনুর রোগা নিষ্প্রভ মুখটা হঠাৎ রক্তিম হয়ে উঠলো—ওঁকে আর গালাগালি দিয়ে লাভ নেই বাবা।
রজনীবাবু—কাকে দেব?
মীনু—আমাকে দিন।
রজনীবাবু সান্ত্বনার সুরে বললেন—না না, তুই তো কোন অপরাধ করিসনি।
মীনু—তুমি শরদিন্দুবাবুর কথা ভুলে গেছ?
ক্ষণিকের মত কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে মীনু। একটা অনুতাপের জ্বালা যেন মীনুর মুখের ভাষার মাত্রা লজ্জা ও ভয় পুড়িয়ে দিয়েছে।
রজনীবাবু যেন তাঁর স্মৃতির ভেতর সন্ধান করে ফিরতে লাগলেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শরদিন্দু।
মীনু—আজ তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে, আমিও শরদিন্দুবাবুকে ঠিক এই ভাবেই অপমান করেছিলাম।
রজনীবাবু যেন জলভারনত মেঘের মত দুর্বল, এখুনি চোখের জলে ভেঙে পড়বেন—ঠিক তাই কি? আমি বুঝে উঠতে পারছি না মীনু।
বলতে বলতে রজনীবাবু একেবারে চুপ করে গেলেন। তাঁর চেতনার নেপথ্যে যেন এক দুরূহ প্রশ্নের স্রোত হু হু করে ছুটে চলেছে। ঠিক তাই কি? শরদিন্দু যেভাবে বঞ্চিত হয়েছে, ঠিক সেই বঞ্চনা ফিরে এসেছে মীনুর জীবনে? তাই তো, আজ আর সাধনকে গালাগালি দিয়ে লাভ কি! শরদিন্দুকে যে-নিয়মে বিচার করে একদিন অকাতরে বিমুখ করতে পেরেছিলেন, সাধনের কাছে সেই নিয়মের ব্যবহার পেয়ে আজ হঠাৎ এত রাগ আর দুঃখ হয় কেন?
কোন সদুত্তর খুঁজে পান না রজনীবাবু। কিছুক্ষণ ছটফট করেন। বাইরের বারান্দার দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখেন। একটু বিব্রত ভাবেই জিজ্ঞেসা করেন—পুঁটুদি চলে গেছেন বুঝি?
মীনু—হ্যাঁ।
জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত রজনীবাবুর মুখটা ধীরে ধীরে শুকনো ও করুণ হয়ে ওঠে। তাঁর

চিন্তার জগৎটা যেন হঠাৎ হেঁয়ালি হয়ে গেছে। মানুষের মনও বুঝি এই রকমের, একটা প্রকৃতিহীন রাজ্য। একটা মেঘাবৃত শূন্যতা জীবনের চারিদিকে স্থির হয়ে আছে। সেখানে ঝড় বিদ্যুৎ বৃষ্টির খেলা কোন নিয়মের বাঁধনে বাঁধা নেই। সবই আকস্মিক, অকারণ, অভাবিত, অযথা। তবু কি আশ্চর্য, এরই মধ্যে মানুষ হিসেব করে চলতে চায়। তৌল করে ভালবাসে। বিচার করে প্রেমাস্পদ খোঁজে। পঞ্জিকা দেখে মিলনের সুলগ্ন ঠিক করে। রাশিগণের গবেষণা ক'রে রাজযোটক আবিষ্কার করে। পূর্বরাগের কাঁচা ও সস্তা চোখের জল দিয়ে অনুরাগের ওজন নির্ণয় করে।

নিয়ম নেই, নিয়ম নেই। এই সবই মানুষের অজ্ঞতা ঢাকবার অজুহাত। জীবনে বড় বড় ভুল করার জন্য মানুষ এই সব ছোট ছোট ভুল তৈরী করে নিয়েছে!

রজনীবাবু হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করেন—শরদিন্দুর ওপর অন্যায় করা হয়েছে, তুই সত্যিই একথা বিশ্বাস করিস?

যেন ভয় পেয়েছেন, এমনিভাবে কথাগুলি বললেন রজনীবাবু।

মীনু—এসব কথা নিয়ে তুমি আর ভাবনা করো না বাবা। যা হবার তা হয়েছে।

রজনীবাবু—কিন্তু অন্যায় করবো কেন?

মীনু—অন্যায় হয়নি! আমার ভুল হয়েছিল।

রজনীবাবু—শরদিন্দুর সঙ্গে তোর তো মতভেদ হয়েছিল।

মীনু—হয়েছিল।

রজনীবাবু—তবু ভুল হলো কোথায়?

মীনু যেন আজ ভয়ানক নির্লজ্জের মত তর্ক করতে পারছে—ভুল করেছিলাম আগেই, তারপর মতভেদ হয়েছিল।

রজনীবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—এতদিনে বুঝি সেটা বুঝতে পারছো?

রজনীবাবু আবার বিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। সেই চিরদিনের লালিত বিশ্বাসেরই ওপর ভর দিয়ে তাঁর অবসন্ন সত্তা যেন আবার চাড়া দিয়ে উঠলো। তাই স্বীকার করুক মীনু, সে ভুল করেছিল। ওর আদর্শবাদে ফাঁকি ছিল। তাই জীবনও ওকে ফাঁকি দিয়েছে।

রজনীবাবু বললেন—সত্যিই বড় ভুল করেছিলে মীনু। জীবনের পথে যোগ্য সহচর এমনিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কোন ফরমূলা নেই। জীবনের পথটি বুঝে নেওয়াই সবার আগের কাজ। পথ যদি ঠিক হলো, তোমার সহচর ঠিক এসে যাবে। কিন্তু ফাঁকি রাখতে নেই, যে পথটি বেছে নিলে, তার ওপর শ্রদ্ধা যেন থাকে। একেই আমি আদর্শ বলি। এটা খুব বড় ফিলসফির কথা নয়। নিতান্ত সহজ সরল কথা। আমি এতদিন তোমাদের এই উপদেশ দিয়ে এসেছি। তবু তোমরা ভুল করলে। আজ বুঝতে পারছো, শরদিন্দুর সঙ্গে সত্যি করে তোমার কোন মতভেদ হয়নি, আর সাধনের সঙ্গে মনেপ্রাণে কোন মতমিলনও হয় নি। জীবনে তোমার কোন মতবাদই ঠিক ছিল না। নইলে...।

একটু চুপ করে থেকেই রজনীবাবু বললেন—তোমার মা আর তোমার পুঁটিমাসী, এরা যতই বলুক, আমাকে যতই ঠাট্টা করুক, আমি জানি আমার বিচার ভুল নয়। এ ছাড়া আর কোন নিয়মে সংসার চলতে পারে না। ভালবাসার কোন রীতিনীতিই যখন নেই, তখন ভালবেসে বিয়ে করার কি অর্থ হতে পারে? এধরনের বিয়ের পরিণামও কোন রীতি মেনে চলে না, শেষে সব ভেঙ্গে যায়।

শেষে সব ভেঙ্গে যায়! এক পরম হতাশার আক্ষেপ যেন দীর্ঘশ্বাসের সুরে রজনীবাবুর বুক থেকে বের হয়ে এল। মীনু হাতপাখাটা তুলে নিয়ে রজনীবাবুর কাছে এগিয়ে গেল। রজনীবাবু বললেন—যাক মীনু, তুই দুঃখ করিস না, চিন্তা করিস না। আমার জন্য ভাবতে হবে না।...হ্যাঁ, একটা চেষ্টা করে দেখ, পুজোর ঘর থেকে ওকে একবার টেনেটুনে বাইরে আনতে

পারিস যদি। নইলে আমি আর পারছি না মীনু. সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।
মীনু সান্ত্বনা দিল—তাই করবো বাবা। তুমি এইবার শান্ত হয়ে শুয়ে পড়।

রজনীবাবুকে পাখার বাতাস দিয়ে শান্ত করতে চায় মীনু। সঙ্গে সঙ্গে পুঁটিমাসীর কথাগুলি নিদারুণ অভিশাপের প্রতিধ্বনির মত বার বার মীনুর মনের ভেতর বাজছিল। এ কি জঘন্য কথা বলে চলে গেলেন পুঁটিমাসী—শাস্তি নয়, ওঁকে শিক্ষা দিতে হবে। কী খাপছাড়া অশোভন আক্রোশ! কি এমন ভয়ানক তাঁর জীবনের দাগা, যার জন্য আজও তিনি সুস্থির হতে পারলেন না?
এই নিস্তব্ধ সংসারের ওপর হঠাৎ একটা মমতার আবেশ অনুভব করে মীনু। এখানে আজ সবাই অবুঝ হয়ে গিয়েছে। পুঁটিমাসীর মত মানুষও ক্ষমার পথ, সহ্যের পথ, সান্ত্বনার পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে গেলেন। এই বাড়ি-ভরা রুগীদের সংস্পর্শে তিনিও রুগী হয়ে পড়েছেন।
মীনুও কিছুক্ষণের জন্য জীবনের সকল ক্ষোভ আঘাত ও ভুলের আবিলতা থেকে যেন নিজেকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। ভুল যখন হয়েই গেছে, তখন ভুলে যাওয়াই বোধ হয় মুক্তির একমাত্র পথ। এই ভুলের বেদনাকে সারা জীবন দিয়ে উপাসনা করার কোন অর্থ হয় না। জীবনের রীতি নীতি ও রহস্য যখন বুঝে ওঠাই কঠিন, তখন অবুঝ হয়ে প্রতি দিনরাত্রির ছন্দ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে থাকার কোন অর্থ নেই। সব ভুলে যাওয়াই একমাত্র পথ। জীবনে যে অধ্যায় ফুরিয়ে গেল, তাকে একেবারে লাইন টেনে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই উচিত। নতুন অধ্যায়ের পৃষ্ঠা খুলে যাক। নতুন সুখ দুঃখ হর্ষ ও কামনার কাহিনী আরম্ভ হোক।
চিন্তার পীড়া থেকে খানিকটা মুক্তি পায় মীনু। কানপুরের জীবনের কথা, সাধনের মনোবৃত্তি ও আচরণের ইতিহাস—এখনো সবই মনে পড়ে। কিন্তু দূর দৃশ্যের মত মীনু আজ যেন সেই ঘটনাগুলি তাকিয়ে দেখতে পারে। একটা মরীচিকা নিজের জ্বালায় পুড়ছে, তার আঁচ আজ আর মীনুর গায়ে লাগে না। কানপুরের জীবনকে পূর্ণ বিসর্জন দিতে পেরেছে মীনু। আজ সে নতুন করে এক স্থিরতা শান্তি লাভ করতে পেরেছে। কানপুরের জীবনের ব্যর্থতা একটা অপচ্ছায়া হয়ে তার সারা জীবনের পেছু ধাওয়া করে ফিরতে পারবে না। কারণ, সেই প্রশ্রয় নেই। যা ঘটে গেছে, তাকে ভুলে গেছে মীনু।
রজনীবাবু উসখুস করছিলেন। একটু অন্যমনস্ক ছিল মীনু, তাই হাতপাখার চাঞ্চল্য একটু মন্দালস ও বেতালা হয়ে আসছিল।
রজনীবাবু বললেন—ওদের খবর শুনেছিস নিশ্চয়।
মীনু—কাদের খবর?
রজনীবাবু—তোমাদের ভ্রাতাটির খবর?
মীনু আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। রজনীবাবুর কথার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারে না।
রজনীবাবু জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন--শুনেছিস কিছু?
মীনু—অমিদার খবর আমি কিছু শুনিনি।
রজনীবাবু যেন একটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলেন—আমি কার কথা বলছি, আর তুই কার কথা ভাবছিস?
মীনু ভয়ে ভয়ে বললো—আমি বুঝতে পারিনি বাবা।
রজনীবাবু শান্ত হলেন। উত্তেজনাটা হঠাৎ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তারপরেই একটু যেন বিষাদের সুর টেনে বললেন—যতী এসেছিল, কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে চলে গেল।
মীনু কোন উত্তর দিল না। রজনীবাবু যেন নিজেরই মনের দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নের ভীড়ের মধ্যে

নির্বোধের মত একটা আশ্বাস খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।—যতী ঠিক কাজই করেছে। আজও যতী তার আদর্শ ছাড়তে পারেনি। যাই হোক, জীবনে একটা ছুতো নিয়েও সে আছে। একেবারে ফাঁকা নয়। সুলেখার সঙ্গে যতীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কেন হলো, বুঝতে পারলাম না। যাক, নিশ্চয় কোন একটা কারণ আছে। কিন্তু সবচেয়ে নিষ্ঠুর হলো তোর মা। যতীর সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বললে না। পূজোর ঘর থেকে একবার উঁকি দিয়েও দেখলে না। কি ভেবেছে এই মহিলা?

মীনু—মা'র কথা তুমি এত বড় করে দেখলে ভুল হবে বাবা।

রজনীবাবু—এতদিন যতী যতী করে নাকিকান্না কেঁদে দিন কাটিয়েছে, কিন্তু কি আশ্চর্য, যতীর সঙ্গে একটা কথাও বললে না! কী ভণ্ডামি!

একটা দুর্বোধ্যতার সঙ্গে লড়াই ক'রে রজনীবাবুর গলার স্বর শ্রান্ত হয়ে আসছিল। যে ভরসা ও কঠিন বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে, সম্মুখ আদর্শের মুখ চেয়ে এক দিব্য সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, ধীরে ধীরে সেই গতির বেগ শিথিল হয়ে আসছে। তিনি নেমে পড়ছেন ধাপে ধাপে। হয়তো সম্মুখে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সংশয়ের স্তূপ দেখতে পেয়েছেন।

রজনীবাবু বললেন—আমার কেমন যেন মনে হয়, প্রমীলা কিছুতেই আর এ বাড়ির জীবনে ফিরে আসবে না। তার মন ফিরে গেছে। সে সত্যিই এখানে আর নেই। ঐ ধূপ দীপ ঘণ্টার সঙ্গে প্রমীলার প্রাণ বোধ হয় এক প্রাচীন শান্তির কোলে মাথা রাখবার জন্য আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভুলতে পারেনি প্রমীলা। নিশ্চয় ভুলতে পারেনি।

রজনীবাবু চুপ করে গেলেন। রজনীবাবুর সব উত্তেজনার জ্বালা সান্ত্বনা দিয়ে দূর করার জন্যই যেন মীনু জোরে জোরে একমনে পাখার বাতাস দিচ্ছিল।

গলার স্বর বেদনায় দীর্ণ হয়ে গেছে, রজনীবাবু বললেন—এতদূর এগিয়ে এসে, এতদিন পরে, আমাকে এত ভাল করে চিনতে পেরেও আজ প্রমীলা আবার আমার কাছ থেকে ছাড়া পেতে চায়। বেশ, তাই ভাল...তাই ভাল।

এর বেশী বলতে পারলেন না রজনীবাবু, তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত যেন হঠাৎ এই পর্যন্ত এসে ফুরিয়ে গেল, সত্যি সত্যিই রজনীবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

সারা বাড়িটার সত্তা থেকে সকল চঞ্চলতা মুছে গেছে, রজনীবাবু নিশ্চল হয়ে ঘুমোচ্ছেন। পূজোর ঘরের দিক থেকে আর কোন শব্দ আসে না।

শুধু মীনু যেন এক শব্দহীন জগতে একা বসে আছে, এইভাবেই হয়তো তাকে চিরকাল বসে থাকতে হবে। হাত ধরে মিনতি করে কেউ আর ডাকতে আসবে না। কোথা থেকেও আর পথ চলবার আহ্বান আসবে না। একটা শোকহীন আক্ষেপ, তবু নিতান্ত আকস্মিক ভাবে এরই মধ্যে একটি পরিচিত মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে—শরদিন্দু। একটা প্রশ্নের চরম উত্তর শুনবার জন্য শরদিন্দু যেন মীনুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই প্রথম অন্তরঙ্গতার দাবীকে বিমুখ করেছিলে কেন? কি অপরাধ করেছিল সে? শরদিন্দুর প্রশ্নগুলি যেন চারদিকের স্তব্ধতা, মীনুর নিঃসঙ্গ শূন্যতা, এবং সব-ভুলে-যাওয়ার প্রশান্তিকে মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্রূপ করে—আমি তোমার প্রথম বন্ধু ; তোমাকে আমি প্রথম আহ্বান করেছিলাম, আমার দাবীকে স্বীকার ক'রে তুমিই আমার মুখের দিকে প্রথম হাসিভরা চোখ নিয়ে কত লজ্জায় ও কত গর্বে তাকিয়ে ছিলে। সেই গোধূলির স্বপ্নে কি শুধু ধূলিই ছিল, আলো ছিল না?

মীনুর দু'চোখে এক ভবিষ্যতের ছায়া শঙ্কায় কাঁপতে থাকে। অতীতের এক উৎসবের হাসি আজ অপমানের আঘাতে ধিক্কার হয়ে উঠেছে, অলক্ষ্যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার প্রশ্নকে উত্তর দিয়ে ফিরিয়ে দেবার সামর্থ নেই মীনুর।

অবুঝ নয় মীনু, তবু ভয় হয়, এই ভুলে যাওয়ার কৌশলও ব্যর্থ হয়ে যাবে। সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না, শুধু এই শাস্তিই কি সারাজীবন একমাত্র সত্য হয়ে থাকবে?

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে একটু চমকে ওঠেন রজনীবাবু। যেন নিতান্ত অসময়ে ভোর হয়ে গেছে। মনে হয়, এই কিছুক্ষণ আগেই মীনু হাতপাখা নিয়ে তাঁর পাশে বসেছিল। কেমন নতুন ধরনের সান্ত্বনা, একটা আশ্বাস, একটা মমতা তাঁর আহত জীবনের সকল বেদনা জুড়িয়ে দেবার জন্য যেন দেখা দিয়েছিল। এ বাড়ির কপালে শূন্যতার অভিশাপ লেগেছে, শুধু একে একে ছেড়ে চলে যাওয়ার পালা শুরু হয়েছে। এই পালার যেন ক্ষান্তি নেই, থামবার লক্ষণ নেই, থামানো যায় না। পুঁটুদি বোধ হয় সরেই গেলেন, প্রমীলা সরেই রয়েছে। এর চেয়ে আর কতদূরে সরে যাওয়া যায়? যেন এক তন্ময় শিল্পীর কাজের সময় তাঁর হাতের কাছ থেকে রঙের বাটিগুলি সরে গেছে, তুলিগুলি লুকিয়ে পড়েছে। বড় রঙীন এক আদর্শের ডিজাইনে সংসার সাজাতে বসেছিলেন রজনীবাবু, কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছেন—কেউ নেই, কিছু নেই, একেবারে উপকরণহীন আয়োজন। পুঁটুদি নেই, প্রমীলা নেই, মঞ্জু নেই, যতী নেই।

শুধু আছে মীনু। মীনুর মাথার ওপর দিয়ে কত বড় অপমানের ঝড় বয়ে গেল কিন্তু তবু ভেঙে পড়েনি। আঘাত পেয়েও পিছিয়ে পড়েনি মীনু। সব সহ্য করে, সব ভুলে গিয়ে, আবার নিজের জায়গাটিতে হাতপাখা নিয়ে এগিয়ে এসেছে মীনু। আশ্চর্য মায়ায় ভরা এই মেয়েটার মন। এই সংসারের সব জ্বালাকে যেন হাওয়া দিয়ে দূর করতে চায়। আর কত করবে? আর বেশী কি করবার সাধ্য আছে ওর? তবু এই লক্ষণটাই সবচেয়ে বড় আশার কথা। ওরই মধ্যে যেন একটু বেঁচে থাকার ইঙ্গিত, একটু টিকে থাকার চেষ্টা ফুটে উঠেছে। সব অনিয়মের বিদ্রূপগুলিকে উপেক্ষা ক'রে ওরই মধ্যে যেন জীবনের একটা আভাষ মাথা তুলে দাঁড়াবার জেদ জাহির করেছে।

সকাল বেলার শীতার্ত সূর্যটাও যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় কুয়াশার ঘোরের মধ্যে লাল পশমের আলোয়ান জড়িয়ে ঘুমকাতুরে চেহারা নিয়ে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে, রজনীবাবুর মনটার মতই। চারদিকের উদাস স্তব্ধতার মধ্যে যেন কোন সাড়া জেগে না ওঠে, তারই চুপি চুপি চক্রান্ত!

রজনীবাবুর মেজাজ হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একটু ব্যস্তভাবে পাইচারী করেন। তারপর বাগানে নেমে পড়েন। চারদিকে ঘুরে ফিরে যেন টাটকা হাওয়ায় নিশ্বাস খুঁজে বেড়ান।

না, এভাবে আর সহ্য করে থাকা যায় না। জীবনের ঘটনাগুলিকে শুধু তাড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। ঘটনাগুলিকে ঘাড়ে ধরে নিজের নিজের জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে। আর সঙ্কোচ করা উচিত নয়। বাড়িটা দিন দিন নিঃশব্দ হয়ে আসছে। দিন দিন শুধু উপোস করতে শিখছে। দিন দিন শুধু খালি হয়ে যেতে শিখছে। শুধু চলে যাওয়া, সরে যাওয়া, লুকিয়ে পড়া। রজনীবাবু তাঁর মনের সাহসের ওপর নির্ভর ক'রে, চোখ খুলে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করছেন—হ্যাঁ, সত্যিই তো, কে জানে কোন ভুলের দুর্বলতায় এই বাড়িটার অদৃষ্টে এক শ্মশানের আইন কাজ করে চলেছে! কিন্তু আর নয়, আর এই দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আর ভুল করা চলবে না। এই ভুল খুঁজে বার করতে হবে।

রজনীবাবু সাহসে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। ঘটনাগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই, ডেকে আনতে হবে, হেস্তনেস্ত করতে হবে। একটা চরম বিচার হয়ে যাক। পুঁটুদি ফিরে আসুক। আসতেই হবে তাঁকে। যদি না আসেন, ডেকে আনতে হবে। একেবারে বোর্ডিং ছেড়েই চলে আসতে হবে। রজনীবাবু নিজে গিয়ে নিয়ে আসবেন। পুঁটুদির কোন ওজর আপত্তি শুনবেন না।

শরদিন্দু এখন কোথায় আছে জানা নেই। কিন্তু রজনীবাবু আজই তার খোঁজ নেবেন। যেখানে থাকুক, শরদিন্দুকে একবার দেখা করতে আসতেই হবে। যদি বাইরে গিয়ে থাকে, আজই টেলিগ্রাম করবেন রজনীবাবু। এবং যদি টেলিগ্রাম পেয়েও আসতে শরদিন্দু দ্বিধা করে,

তবে স্বয়ং রজনীবাবু তার কাছে সশরীরে উপস্থিত হবেন। ধরে নিয়ে আসবেন। রজনীবাবু আজ সবাইকে সোজাসুজি প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন—কিসের জন্য এই বিড়ম্বনা? কি চাও তোমরা জীবনে? কোথায় তোমাদের অভিমান? কোথায় ভয়? কোথায় ভুল?

বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রজনীবাবু আজ যেন বিশ্বাস করতে পারেন—এত দুঃখ করার কিছু নেই পৃথিবীতে। কিছুই চিরবিদায়ের হুকুমনামা নিয়ে আসেনি। সবই যায়, আবার ফিরে দেখা দেয়। আবার চলে যায়। এর মধ্যে ফিরে-আসাগুলিই চিরকাল সত্য। ফিরে-যাওয়াগুলিই চিরকাল মিথ্যা। সংসারের রূপ ঠিক এই আকাশপটের মত, অনন্তকাল ধরে যেমন ছয় ঋতুর আবির্ভাব তেমনি তিরোভাবও লেগেই রয়েছে। ঘরের সুরে আর শ্মশানের সুরে দোতারা সংসারের বীণ অহরহ বেজে চলেছে।

যেন বহুদিন হলো, কি কারণে বলা যায় না, বোধ হয় মনের ভেতর একটা মস্তবড় আদর্শবাদের গর্জনে, রজনীবাবুর কানে তালা ধরেছিল। আজ তিনি শুনতে পাচ্ছেন, বেশ স্পষ্ট করেই তিনি আজ এই দুই সুরের ধ্বনিকে ভিন্ন করে বুঝতে ও শুনতে পারছেন।

ঘরের ভেতর উঠে এলেন রজনীবাবু। খুবই উৎসাহিতের মত এ-ঘর ও-ঘর ঘুরলেন। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে, বারান্দার দিকে তাকিয়ে, ঘরের আসবাবগুলির দিকে তাকিয়ে, বাগানের ফুলগাছগুলির দুর্দশার দিকে তাকিয়ে আজ অনেক কাজের কথা মনে পড়লো। সব ঠিক করতে হবে। এই এলোমেলো অগোছাল জঞ্জাল তাকে নিঃশেষ করতে হবে।

রজনীবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন—মীনু! মীনু!

সঙ্গে সঙ্গে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

রজনীবাবু ঘর ছেড়ে ভেতর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। উঠোনের দিকে তাকালেন। ব্যস্তভাবে ডাকলেন—মীনু, শীগগির শুনে যা।

উঠোনের ওপারেই প্রমীলাবালার পূজোর ঘর। রজনীবাবুর ডাকাডাকির এত ব্যস্ততার একটু সামান্য ধাক্কা যেন পূজোর ঘরের দরজায় পৌঁছলো। কপাটটা আস্তে আস্তে একটু ফাঁক হলো। ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে মীনু দূর প্রতিধ্বনির মত স্বরে উত্তর দিল—আমি এখানে পূজোর কাজে রয়েছি বাবা।

কপাট বন্ধ হলো। রজনীবাবু চীৎকার করে ডাকলেন—মীনু! মীনু! তুই ওখানে কেন মীনু? ওখানে তোর কোন কাজ থাকতে পারে না।

রজনীবাবুর কণ্ঠস্বর যেন যন্ত্রণায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখ দুটো তপ্ত বাষ্পের ছোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে উঠলো। ঝরঝর করে দু'চার ফোঁটা জল দু'চোখের কোণ ফুঁড়ে হঠাৎ ঝরে পড়লো।

বারান্দা থেকে স'রে নিজের ঘরের দিকে চললেন রজনীবাবু। একেবারে নিঃস্ব হয়ে, দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে, মরুভূমির পথে যেন ফিরে চললেন। আর একবার ফিরে তাকিয়ে তিনি পরীক্ষাও করতে চান না, তবে কি সত্যিই মীনুও লুকিয়ে পড়লো?

কী সাংঘাতিক অভিশাপের দুর্গ ঐ পূজোর ঘর। দেখতে কত শান্ত, কত স্তব্ধ, কত নিঝুম ও নির্বিকার। কিন্তু কী জাগ্রত দৃষ্টি। ঠিক সময় বুঝে মীনুর আহত আত্মাকে বন্দী করে নিয়ে একেবারে আত্মসাৎ করে ফেলেছে। এ বাড়ির সব অসহায়তা, সব দুর্বলতা ও ব্যর্থতার ওপর যেন জেগে জেগে নজর রাখছে ঐ পূজোর ঘর, অথচ ঘুমের ভাণ করে আছে।

আজই সকালবেলার ঝাপসা সূর্যালোকের মধ্যে রজনীবাবুর মনের কাছে এক আশাভরা পরিকল্পনায়, চোখের এক নতুন দৃষ্টিতে, কানের কাছে এক নতুন সুরের ধ্বনিতে জীবনের একটা নতুন অর্থ কুঁড়ি হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে তাঁর ঘরের আঙিনার দিকে চোখ ফেরাতেই যেন অলক্ষ্য এক বিদ্রূপের ঝড়ে সেই কুঁড়ি ঝরে পড়লো। এটা কি ধরনের ঘটনা? কে বলে দেবে? কে উত্তর দেবে?

দোতারা সংসারের বীণ আর বাজে না। আর সুর শোনা যায় না। রজনীবাবুর দৃষ্টি আবার অন্ধ হয়ে যায়, আবার কানে তালা ধরে। শুধু চারদিকে কতগুলি প্রশ্নের ঝড় মাতামাতি করে, শুধু ধুলো ওড়ে, তাঁর অন্তরাত্মার ওপর লক্ষ লক্ষ কাঁকরের কণা ছিটকে এসে বিঁধতে থাকে।

এ আবার কোন ঘটনা? রজনীবাবু বিছানার ওপর অসহায়ভাবে শুয়ে পড়েন। মীনু পূজোর ঘরে বন্দিনী হয়েছে। বোধ হয় ঘর খুঁজে পেল না, তাই কি?

কিন্তু রজনীবাবুর বেদনা তাঁর বুকের ভেতরেই বোঝা হয়ে হাঁপাতে থাকে। আজ যে তিনি বুঝতে পেরেছেন অনেক কথা। আজ তিনি অনেককেই ঘরে ফিরিয়ে আনতে চান। ঘর হারিয়ে গেলেই পূজোর ঘরে পালিয়ে যেতে হবে কেন? নতুন ঘর খুঁজে বার করতে হবে। শরদিন্দুকে ডেকে, ক্ষমা চেয়ে, ওর সঙ্গে মীনুকে বিয়ে দেবার জন্যও যে আজ তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন। শরদিন্দু যদি নির্দোষ হয়ে থাকে, মীনুর যদি ভুল হয়ে থাকে—সে ভুলের দোষ শুধরে দিতে হবে। ভুলের জন্য কি শুধু প্রায়শ্চিত্ত করাই নিয়ম? মোটেই নয়. এটা জীবনকে অস্বীকার করার পথ। জীবনের সকল ভুলের সন্মুখে কি শুধু তুষানল জ্বলছে? সন্মুখে কি গঙ্গাজল নেই? ভুলের পরে শুধু কি পুড়তেই হবে? স্নান করে শুচিস্নিগ্ধ হবার এতবড় অধিকার কি কারও চোখে পড়ে না?

ভুলের পর আবার ভুল কেন? রজনীবাবুর ইচ্ছা করে, মীনুকে ডেকে অজস্র আদর ক'রে একবার যদি ওর অভিমানের কথাটা জিজ্ঞেসা করতে পারেন। বার বার উঠতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না, একটা ভয়ের বোঝা যেন বুকের ওপর চেপে রয়েছে। বার বার যেন কেউ তাঁকে টিটকারী দিচ্ছে—চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। চেষ্টা করলেই সব কিছু সফল হয় না। চেষ্টার অসাধ্যও পৃথিবীতে অনেক বস্তু আছে। সব চেষ্টা যত্নকে ফাঁকি দিয়ে অনেক ঘটনা, অনেক হাসিকান্না সুখদুঃখ বিনা কারণেই পালিয়ে যায়।

আদর্শবাদের অহংকারে রজনীবাবু চিরকালই সম্মুখে শুধু তাকিয়ে দেখেছেন। দেখেছেন—পৃথিবীতে নিয়ম আছে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ঘৃণাভরে পেছনে তাকিয়েছেন। দেখেছেন—পৃথিবীতে অনিয়ম আছে। কিন্তু বোধ হয় আশেপাশে তাকিয়ে দেখেননি কখনো। নইলে দেখতে পেতেন—পৃথিবীতে বিনা-নিয়ম আছে। সব পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে আছে আকস্মিকের আঘাত, পথিক পথের পাশে ছিটকে পড়ে। পৃথিবীতে দুর্ঘটনারও একটা নিয়মসঙ্গত দাবী আছে।

হ্যাঁ, তাই মনে হয়, একটা চিরকেলে বিনা-নিয়মের সত্য বা মিথ্যা জগৎ জুড়ে ছুটাছুটি করছে। তাকে বাগিয়ে রাখার মত কোন বল্‌গা মানুষের বুদ্ধি আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। এই তো কালকের রাত্রেই হাতপাখা নিয়ে সান্ত্বনার রূপে, শান্তির রূপে, জীবনের সর্বংসহা শক্তির প্রসন্নতা নিয়ে এইখানেই রজনীবাবুর গায়ে বাতাস দেবার জন্য এসেছিল মীনু। গভীর রাত্রের অন্ধকারে মাত্র কয়েকঘণ্টা পরেই যেন বিনা-নিয়মের একটা ষড়যন্ত্র মীনুকে একেবারে বদলে দিল। সব ছেড়ে দিয়ে পূজোর ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল মীনু।

চিনছেন, একে একে জীবনের প্রত্যেকটি বিধি-অবিধির অধ্যায়কে চিনতে পারছেন রজনীবাবু। তাই তিনি আজ একেবারে ভেঙে পড়তে চান না, আবার উঠতে চান। তিনি বুঝতে পারেন—মীনু ও যতী ভুলের জন্যই ভুল করেনি। জীবনের নানা কাজের ভীড়ের মধ্যে বেছে বেছে একটা ব্রত ওরা ধরতে গিয়েছিল। একটা আদর্শের দীক্ষা নিয়েছিল। বড় কষ্টের পরীক্ষার আদর্শ. বড় কঠিন সাধনার আদর্শ। ভুল তো ওরা করবেই। ওরা লড়তে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। এই তো জীবনের স্বাভাবিক উপহার। শুধু বিয়ের জন্যই যদি ওরা বিয়ে করতো, আজ ওদের অদৃষ্টে এই দুঃখ দেখা দিত না। নিরিবিলি অলস সুখের নেশায়, খাওয়া-পরা আর সন্তান পালনের ধরাবাঁধা কর্তব্যের মধ্যে ওরা নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারতো। ভুল করেছে মানুষের মন চিনতে গিয়ে, ভুল করেছে সাথী খুঁজতে গিয়ে, ভুল করেছে আদর্শের

সম্মান রাখতে গিয়ে। নইলে বিয়ে তো সবাই করে, কিন্তু এত বিড়ম্বনা সবারই হয় না।

সেই পুরাতন অহংকারের খুঁটো যেন আবার প্রবল আগ্রহে আঁকড়ে ধরেন রজনীবাবু। বাগানের পাঁচিলের ওপারে সড়কের ওপর দিয়ে এক সাধু সেতার বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায়।

আসনসে মত্ ডোল রে
তোঁহে পিব্ মিলেঙ্গে!

তোমরা আসন থেকে একটুও নড়বে না, বিচলিত হবে না। তবেই তো প্রিয়কে পাওয়া যাবে। ভক্ত কবীরের দোহাঁর মর্ম সুকণ্ঠ সাধুর দরবারী কানাড়ার সুরে যেন এক প্রেরণার আশীর্বাদ ছড়িয়ে চলে যায়। রজনীবাবু উৎকর্ণ হয়ে চোখ বন্ধ করে মাথা পেতে, এই বাণীকে দ্বিগুণ বিশ্বাসে গ্রহণ করেন।

উঠে বসলেন রজনীবাবু। বাইরের বারান্দায় একটা কলরব শুনে কৌতূহলী হয়ে রইলেন। কারা যেন এসেছে। খুব জোরে জোরে কথা বলছে।

একটু আশ্চর্য হয়েই ঘর ছেড়ে ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন রজনীবাবু। আশ্চর্য হবারই কথা।

মঞ্জু এসেছে, সঙ্গে নীহার। চার পাঁচটা কুলি জিনিসপত্র এনে বারান্দার ওপর স্তূপীকৃত করেছে। আরও আনছে। রাস্তার ওপর দুটো ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে।

মুহূর্তের মধ্যে রজনীবাবুর বিষন্ন মূর্ত্তির মধ্যে অপ্রত্যাশিত খুশীর আলো চমকে উঠলো।

—একি? কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ তোরা কোথা থেকে এলি? যাক ভালই করেছিস। খুব ভাল হলো।

নীহার তখনো একটা ফর্দ মিলিয়ে জিনিসগুলি গুনছিল। মঞ্জুও ব্যস্ত ছিল।—ও রঘু, শীগগির যাও, কলার কাঁদিটা গাড়িতেই রয়ে গেছে। নিয়ে এস।

মঞ্জুর চাকর রঘু দৌড়ে গাড়ির দিকে ছুটলো। নীহার আর মঞ্জু ফর্দ মিলিয়ে ভাল করে জিনিসগুলি হিসেব করছিল।—চারটে সুটকেস, বেডিং তিনটে, টিফিনবক্স দুটো, ফলের ঝুড়ি চারটে, লণ্ঠন দুটো, একটা বাস্কেট, আচারের শিশি, তিন হাঁড়ি ক্ষীর...

ফর্দ মিলে গেছে। সব ঠিক ঠিক এসেছে। মঞ্জু ও নীহার এগিয়ে এসে রজনীবাবুকে প্রণাম করলো।

মঞ্জু একটু দুঃখিতভাবে বলে—তোমার চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে বাবা!

নীহার বলে—এঃ, বাগানটার এ দশা কেন? একটা মালী রেখে দিলেই তো হয়, শুধু ফলগুলির যত্ন করতে পারলে কত আয় হয়!

রঘু কলার কাঁদি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। রজনীবাবুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেলাম জানায়।

মঞ্জু বলে—বড় তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম বাবা। কিছুই আনতে পারলাম না। কিন্তু সেই জিনিসটা আনতে ভুলিনি বাবা।

মঞ্জু কৃতার্থভাবে হাসতে থাকে। রজনীবাবু জিজ্ঞেসা করেন—কি জিনিস?

মঞ্জু—যা তুমি খুব ভালবাসতে।

রজনীবাবু খুশী হয়ে ওঠেন—যাক, এতদিনেও যে জিনিসটার কথা ভুলে যাস নি, সুখের কথা। কই, বার কর দেখি?

মঞ্জু বেতের বাক্স খুলে একটা প্যাকেট বের করে বললো—এই নাও।

রজনীবাবুর চোখ দুটো যেন হঠাৎ জ্বালা করে উঠলো। ম্লানভাবে হাসতে লাগলেন—আমসত্ত্ব কেন রে মঞ্জু? আমার খদ্দরের চাদর কই?

কপালে হাত ঠেকিয়ে যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল মঞ্জু—তুমি কী ভয়ানক লোক বাবা! এখনো মনে করে রেখেছো? ওঃ, সেই কবে বলেছিলাম খদ্দরের চাদরের কথা।

রজনীবাবু—হ্যাঁ, তুই বলেছিলি নিজের হাতের কাটা সুতোয় নতুন ডিজাইনের একটা চাদর উপহার দিবি আমাকে।

মঞ্জু একটু লজ্জিত ভাবেই বলে—সত্যি বড় ভুল হয়ে গেছে বাবা! কি করবো বল? হঠাৎ সব চরকা-ফরকা ছেড়ে, সব বিক্রী করে দিয়ে মধুপুর চলে যেতে হলো...।

রজনীবাবু—মধুপুর কেন?

নীহার—এখন তো মধুপুরেই রয়েছি।

রজনীবাবু—কেন?

নীহার—ওখানেই তো আমার ব্যাঙ্ক।

রজনীবাবু—ব্যাঙ্ক?

নীহার—আজ্ঞে হ্যাঁ, হেড অফিস মধুপুরেই, যশিডিতে একটা ব্রাঞ্চ হবে শিগগির।

রজনীবাবু—তোমার চরকা আশ্রম? গোশালা?

নীহার খুব জোরে হেসে ওঠে—ওঃ, আপনি আগেকার দিনের কথা বলছেন! সেসব আর নেই, অনেকদিন আগেই সেসব চুকে গেছে।

রজনীবাবু—তোমার সান্‌ডে স্কুল কি হলো?

নীহার—আর কি করে থাকে? এক ব্যাঙ্কের কাজের চাপেই দিশে পাই না।

রজনীবাবু উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন—তাহলে তুমি এখন ব্যাঙ্কার? আর কোন কাজ নেই?

নীহার—আছে বৈকি?

মঞ্জু গর্বিতভাবে বলে—এখন তো সবসুদ্ধ বোধ হয় সাতটা স্কুলে...।

রজনীবাবু—কি?

নীহার—চাঁদা দিতে হয়।

রজনীবাবু একটু কঠোর ভাবে বলেন—আজকাল গীতা পড়ার সময় বোধ হয় আর হয় না মঞ্জু?

মঞ্জু—এখনো পড়তে খুব ইচ্ছা করে বাবা, কিন্তু সময় পাই না।

রজনীবাবু দেখছিলেন, নীহারের পরিচ্ছদের মধ্যে খদ্দরের কোন চিহ্ন নেই। শরীর আগের চেয়ে অনেক মোটাসোটা হয়েছে। মঞ্জু বেশ একটু কথা বলতে শিখেছে। চোখে মুখে এক সুগৃহিণীর প্রতিভা ও উৎসাহ ছড়িয়ে রয়েছে।

মঞ্জু নীহারের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললো—এটা মকতপুর, মনে রেখ, একটু সামলে চলবে। এখানকার ঠাণ্ডা ভুলে গেছ? গলার বোতাম লাগাও!

স্যুটকেশ খুলে একটা আলোয়ান বের করে নীহারের দিকে এগিয়ে দিল মঞ্জু।

রজনীবাবু যেন অভিনয় দেখছিলেন। সংসারের আকস্মিকের লীলা অতি নির্দয় হয়, এ সত্য তিনি কিছুক্ষণ আগেই মর্মে মর্মে বুঝেছেন। কিন্তু এত লজ্জালেশহীন হতে পারে, তা ধারণা করতে পারেননি। আর বেশীক্ষণ আলাপ করার মত ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না রজনীবাবু। মঞ্জু ও নীহারের সঙ্গে তাঁর আর কোন বক্তব্য নেই।

বহুদিন আগের আর একটা সকাল বেলার কথা মনে পড়ছিল রজনীবাবুর। মঞ্জু ও নীহার যেদিন প্রথম একসঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে এ বাড়ি থেকে চলে গেল। সেদিন আশীর্বাদ করতে ভুলে যাননি রজনীবাবু। সেই আশীর্বাদকে বর্ণে বর্ণে ব্যর্থ করে দিয়ে ওরা আবার ফিরে এসেছে। ওরা দু'জনে যেন দুটি জীবন্ত প্রমাণ, রজনীবাবুকে চরম ভাবে ঠাট্টা করার জন্য আবার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে তাকিয়ে আজ আর বুঝতে কোন বাধা থাকে না—বিয়ের মধ্যে বিয়েটাই সত্য, আদর্শটা একেবারে মিথ্যা।

তবু ওদের দু'জনকে সুখী বলেই মনে হচ্ছে। ওদের ভালবাসায় কোন ফাঁকি নেই। শুধু তাই নয়, নিঃসন্দেহে আজ বিশ্বাস করতে হয়, ওদের ভালবাসা সব চরকা-ফরকা ছাপিয়ে

অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, শুধু দুটি বিবাহিত জীব, স্বামী আর স্ত্রী। ভাবতেও রজনীবাবুর মন ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। শিব গড়ার মাটি দিয়ে যেন দুটো বাঁদর তৈরী হয়ে ফিরে এসেছে।

—ভাল লেডি ডাক্তার নিশ্চয় আছে এখানে?

হঠাৎ নীহারের প্রশ্ন শুনে রজনীবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নীহারের ভাষার রকমটাও আর মানুষের মত নয়। একেবারে জন্তু-জানোয়ারের আগ্রহের মত সুস্পষ্ট। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। কোন উত্তর না দিয়েই রজনীবাবু তাঁর ছোট ঘরটির দিকে ফিরে চললেন।

মঞ্জু ততক্ষণে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। চেঁচিয়ে রঘু চাকরকে শতরকম কাজের নির্দেশ দিচ্ছে মঞ্জু—জল তুলে নিয়ে এস...মাঝের ঘরটা পরিষ্কার কর...বড় বেডিংটা খুলে দাও।

কারও সাহায্যের অপেক্ষায় নেই মঞ্জু। সব ব্যবস্থা চটপট হতে থাকে। রঘু এখুনি উনুন ধরিয়ে দেবে। নীহার নিজেই বাজারে যাবে। মঞ্জু রান্না করতে বসবে।

নিজের ঘরে বসে মঞ্জুর গলার স্বরে বার বার চমকে ওঠেন রজনীবাবু। বহুদিন পরে এই মুখভার বাড়িটার স্তব্ধতার মধ্যে তবু তো একটা জাগ্রত সংসারের সোরগোল জেগে উঠেছে। মঞ্জু এসেছে। সেই মঞ্জু! ক্ষণে ক্ষণে রজনীবাবুর উত্তেজিত ধারণার ওপর মমতার আমেজ লাগে। নিজের মেজাজের রূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হন। মঞ্জু ও নীহার, তাঁরই মেয়ে ও জামাই, একটা নতুন তত্ত্বের মূর্তি ধরে দুজনে ফিরে এসেছে। কোন আদর্শের বন্ধন নেই, দেশসেবা পলিটিক্স চরকা গোসেবা সান্‌ডে স্কুল—কিছুই নেই। সবই ওদের ছিল, কিন্তু সব ছেড়ে দিয়েছে। তবু কী সুন্দর ওরা দু'জনে মিলে গেছে। কত আপন করে ওরা পরস্পর দুজনকে গ্রহণ করেছে! কত সুখী কৃতার্থ ও ধন্য হয়ে গেছে।

এটাই বা কি করে হয়?

তিন-চারটে দিন ধ'রে বাড়ির মধ্যে তবু সোরগোল শোনা যায়। হাসি আলাপের কলোচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে যেন জানালা দিয়ে ঘরের বদ্ধ বিষণ্ণতা ছুটে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় চায়ের টেবিল টেনে আনা হয়। উজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোক আর সযত্নে তৈরী চায়ের উষ্ণতায় বারান্দার শীতার্ত অন্ধকার দূরে সরে যায়। মঞ্জু আর নীহার কারও সমাদরের ওপর নির্ভর করে থাকে না। কেউ জিজ্ঞাসা করুক বা না করুক, কেউ সাহায্য করুক বা না করুক, ওরা দু'জন নিজেরাই সব করে নিতে পারে। ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকলেই পৃথিবীটা সম্পূর্ণ হয়, নইলে নয়! রজনীবাবু নেপথ্যে সরে আছেন, প্রমীলা আর মীনুর অবসর নেই, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না। কটা দিনের জন্য যেন হাওয়া বদল করতে এসেছে মঞ্জু। এখানে হাতের কাছে কেউ কিছু এগিয়ে দেবে না, কেউ নিজে থেকে এগিয়ে এসে সাহায্য করবে না! চটপট সংসার করার একে অপূর্ব আর্ট আয়ত্ত করেছে মঞ্জু। এ তো তবু তার বাপের বাড়ি, কোন বাধাই নেই। চলন্ত ট্রেনেই স্টোভ জ্বেলে পাঁপর ভেজে চা তৈরী করে ফেলেছিল মঞ্জু!

রঘুয়া চাকর সারাদিন ছুটাছুটি করে; ঠিক সময় মতই রান্না ও খাওয়া শেষ ক'রে, মঞ্জু ও নীহার বেড়াতে বের হয়ে যায়। সময় মতই ফিরে আসে। প্রতিদিনের ডাকে তাড়া তাড়া কাজের চিঠি আসে। দু'দিনের জন্য বাইরে এসেও তার বড় আদরের ব্যাঙ্কের আবদার থেকে যেন রেহাই পায় না নীহার। এখানে বসেই পত্রপাঠ জবাব দিতে হয়। জবাব লেখার সময় নীহার ঘন ঘন মঞ্জুকে ডাকে। মঞ্জু এসে অনেক ভাল ভাল পরামর্শ দেয়। লেডি ডাক্তার নিয়মিত আসছেন।

দিন কাটছে রজনীবাবুরও। কিন্তু দুদিনের জন্য বাড়ির মধ্যে এই অবান্তর কলরবের পাশ

কাটিয়ে যেন তিনি চলছেন। এই নূতন হাসি ও কলরব কলের গানের মতই। এই বাড়ির হৃদয়ের সুর নয়। মঞ্জু ও নীহার, এক জোড়া বিদেশী গ্রামোফোন যন্ত্রের মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে, নিজেদের রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। দুদিন পরে চলে যাবে, উপদ্রব শান্ত হবে।

মঞ্জু কোন কারণেই ক্ষুণ্ণ হয় না। অভিমান করা তার স্বভাব নয়। অভিমান করার সময়ও বোধ হয় তার নেই। রজনীবাবুর খেয়ালকে ভাল করেই চেনে মঞ্জু। প্রমীলাবালার মেজাজও জানে। শুধু বার বার ইচ্ছে করে মীনুকে ডেকে মন খুলে আলাপ করতে। অনেক কথা তার বলার ছিল। মীনুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যও একটা বিজ্ঞ সমবেদনা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। কিন্তু সুযোগ পায় না। মীনু ঘেঁসতে চায় না।

লেডি ডাক্তার কয়েকবার এসে গেছেন। ভরসা দিয়ে গেছেন, কোন ভয়ের কারণ নেই। তবু মঞ্জুর দু'চোখে এক নতুন গর্বের পুলক সলজ্জ ভয়ে মাঝে মাঝে চিকচিক ক'রে কেঁপে ওঠে। সকলের কাছে আশ্বাস পেতে চায় মঞ্জু, তার জীবনের এই নতুন আত্মপ্রকাশের পুলক পৃথিবীর কানের কাছে চুপি চুপি খবর হয়ে ধরা দিতে চায়। অন্তত মীনুর কাছে বলতেই হবে। বলেনি ব'লেই ওরা এমন ক'রে উদাস হয়ে আছে। সত্যিই বড় আশ্চর্য, মীনুটা তো অন্ধ নয়। তবু একবার সন্দেহও করে না। একটা প্রশ্ন করে না। আলগোছে তাকিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায়। মঞ্জুকে চিনতেও যেন কত দেরী করে মীনু।

নীহারও তাই মনে করে। কিছু বুঝতে পারেনি, তাই এই খামখেয়ালী বাড়িটার হৃদয় নিজের রাগেই অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে আছে। মঞ্জুর এ বিশ্বাস আছে, খবরটা শোনা মাত্র এই অবরোধ ঘুচে যাবে, সাড়া জেগে উঠবে। মীনু হেসে ফেলবে, রজনীবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, এমন কি প্রমীলাও বোধ হয় পূজোর ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে এগিয়ে আসবেন। হয়তো চিন্তিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করবেন—শরীরটা আজকাল ভাল বোধ করছিস তো মঞ্জু?

অনেক কথা না হোক, মীনুকে এই একটা কথা জানিয়ে দিতে পারলে মঞ্জুর মনের সরল অহংকার তবু একটা রাস্তা পায়। কিন্তু আজ তিন দিনের মধ্যে বার দশেক মীনুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছে, তবু কিছুই বলতে পারেনি মঞ্জু। এইবার বাধ্য হয়েই মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। অহংকার পথ পায় না, তাই মনভরা অভিমান দানা বাঁধতে থাকে।

মঞ্জুর অভিমানের মুখরক্ষা করার জন্য নীহারই একদিন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পূজোর ঘরের পাশে, জীর্ণ দোলমঞ্চের ধারে একটা করবীর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুরছিল মীনু, ফুল তুলতে এসেছে। নীহার এগিয়ে গিয়ে বলে—একটা কথা তোমায় বলে যাচ্ছি মীনু, খবরদার তোমার দিদি যেন টের না পায় যে আমি বলেছি। নইলে আমার রক্ষা থাকবে না।

মীনু শান্ত ভাবেই তাকিয়ে থাকে। এক জোড়া কাঁচের চোখ, তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই, কোন স্পন্দন নেই।

নীহার বলে—লেডি ডাক্তার তো ভয় দেখিয়ে দিয়ে গেল, এবার থেকে একটু বেশী সাবধান থাকতে হবে। লগ্ন এগিয়ে আসছে।

নীহারের কথাগুলির মধ্যে বড় করুণ একটা উৎসাহ ফুটে উঠবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মীনু শুনতে পেয়েছে কি না বোঝা গেল না। বোবা মৌমাছির মত করবী বীথিকার চারিদিকে ঘুরে ফিরে, শুধু হাতড়ে হাতড়ে ফুল খুঁজে বেড়ায়। নীহার সটান ফিরে এসে একটা চেয়ারের ওপর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে মঞ্জু এসে কাছে দাঁড়ায়। নীহার মাটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে—এখানে না এসে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে থাকলেই ভাল ছিল! তবু সেখানে কথা বলবার লোক পাওয়া যেত।

একটু থেমে নিয়ে নীহার আবার বলে—কথা শোনার মত মানুষ এখানে কেউ নেই।

মঞ্জু তখুনি বিশ্বাস করে ফেলে—এখানে কেউ নেই। এই বাড়িটা পৃথিবীর বাইরে চলে

গেছে। চলন্ত ট্রেনে স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরী ও পাঁপড় ভাজার কাণ্ডকারখানা দেখে যাত্রীরাও অবাক হয়ে গিয়েছিল, চোখ তুলে তাকিয়েছিল। কিন্তু মঞ্জু আজ তার জীবনের শোণিতে কত বড় বিস্ময়ের আবির্ভাব বহন করে এনেছে, এ বাড়ির কোন মানুষ একবার খোঁজ নিয়েও তার সম্মান দিল না। অথচ, এ বিস্ময় এই বাড়ির ইতিহাসে এই নতুন বিস্ময়, যার আবির্ভাবে এই প্রাচীন অট্টালিকার গহনে নির্বাসিত বৃদ্ধ ও বিষণ্ণ রজনী মিত্র রূপকথার দাদুর মত হেসে উঠবেন, তারই বার্তাকে উপেক্ষা ক'রে রইল সবাই? শুনতে পেয়েও সাড়া দিল না? অন্য বাড়ি হ'লে এরই মধ্যে দশবার শাঁখ বাজতো। এ অভিমান ভুলতে পারে না মঞ্জু। মনে হয়, এখুনি চলে যাওয়া উচিত।

কি মনে ক'রে লেডি ডাক্তার প্রিয়ংবদা একদিন বড় বেয়াড়া ভাষায় স্পষ্ট করেই রজনীবাবুর কাছে সংবাদটা খুশী হয়ে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা ক'রেও রূপকথার দাদু হেসে উঠলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে বিমূঢ়ের মত লেডি ডাক্তারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ছোট ঘরটিতে এসে বন্দী হয়ে রইলেন রজনীবাবু।

জীবনে এতদিন ধরে বহু প্রশ্ন সংশয় ও কৌতূহলের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন রজনীবাবু। উত্তর না পেলে অধীর হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হয়েছেন, সব আনন্দ বিস্বাদ হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ বুঝতে পারলেন, তাঁর প্রশ্নগুলিই হারিয়ে গেছে। মনে হয়, ডুববার আগে তাঁর দুর্ভাগ্যের ভরা পূর্ণ হয়েছে। তবু এই ধরনের সমাপ্তির মধ্যে একটা শান্তি আছে। দূরের লক্ষ্য যদি দূরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আর পথ চলার আহ্বান থাকে না। রজনীবাবুর আদর্শের ডঙ্কামুখর অভিযান ঠিক ঐরকম ব্যর্থ হয়ে গেছে। যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইখানেই সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। আর কোন প্রশ্ন করার অবকাশ নেই, আর এগিয়ে যাবার, উঁকি দিয়ে দেখবার প্রয়োজন নেই। কাজেই আর কোন উদ্বেগ বেদনা ও পথশ্রমের আশঙ্কা নেই।

মঞ্জু এমন হয়ে গেল কেন? নীহারের এ দশা কেন? কেনই বা ওরা এখানে এল? কি প্রয়োজন ছিল? চলে যাবে কবে? আর দেরী না ক'রে চ'লে গেলেই ভাল? কোন প্রশ্নটা উচিত, কোনটা উচিত নয়, এতটা বোঝবার শক্তি আর রজনীবাবুর নেই। তাঁর চিরকালের উদ্ধত 'কেন'র মূর্তিটা এইবার ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করছে। লেডি ডাক্তারের কাছে স্বকর্ণে খবরটা জানতে পেয়েও আজ তিনি সুখী হতে পারছেন না, দুঃখিত হবারও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। তার ওপর, তাঁর কোন পূজোর ঘর নেই। পথ নেই, আশ্রয়ও নেই, রাজগীরের রৌদ্রতপ্ত খোলা মাঠের ওপর পাথুরে প্রহরীর ভগ্ন মূর্তির মত তিনি শুধু থমকে দাঁড়িয়ে আছেন।

শুধু মাঝে মাঝে নিজেকে ভয় হয়। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে! ভয় হয়, মঞ্জুর ওপর যেন একটা ঘৃণা ধীরে ধীরে তাঁর মনের ভেতর বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে। শুধু মনটা অসাড় হয়ে আছে বলেই সুবিধা করতে পারছে না। নিজের ছোট ঘরের খাটের ওপর ব'সে, গায়ে চাদর জড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর স্পর্শকে যেন দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন রজনীবাবু।

আজ তাঁর রাগ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মঞ্জু ও নীহার যেন জীবনে শুধু দাম্পত্যের একটা জৈব বন্ধনকেই সবার ওপরের সত্য বলে স্বীকার করেছে। কোন আদর্শের ভিত্তি নেই; শুধু ওরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, রজনীবাবু আজ আর সন্দেহ করেন না, পাশাপাশি দাঁড়ানো এই দুই মূর্তিকে ধাক্কা দিয়ে তফাৎ করে দেবার সাধ্য কারও নেই। মঞ্জু ও নীহার, ওরা মীনু-সাধন নয়। ওরা দুজনেই সেই জিনিস পেয়েছে, যতী ও সুলেখা যা পায়নি, মীনু ও সাধন যা পেল না। মীনু ও সাধন এক আদর্শের কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তবু ওরা কর্পূরের মূর্তির মত সংসারের হাওয়ায় উবে গেল। মঞ্জু ও নীহারের ভিত্তি সরে গেছে, কিন্তু কী কঠিন পাথরের অণু দিয়ে তৈরী ওদের মূর্তি, জলে ডুবিয়ে দিলেও ওরা যুগ যুগান্ত কাল পাশাপাশি এক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

দুঃখ করার কোন পথ নেই রজনীবাবুর। বিরাট এক লজিক গ্রন্থের মত জীবনের প্রত্যেক পৃষ্ঠাকে তিনি প্রশ্ন-মীমাংসায় আকীর্ণ করে রেখেছেন। কীটদষ্ট লক্ষ লক্ষ অক্ষরের আবর্জনা। জীবনের ইতিহাসকে সম্মান করেননি তিনি। লজিক দিয়ে ইতিহাসকে বাঁধতে গিয়েছিলেন, জীবনব্যাপী এই অবোধ দুঃসাহস তাঁকে পথভ্রান্ত করেছে।

ছেলেমানুষের খেলাঘর ভেঙে যাওয়া যতটা করুণ ব্যাপার, বৃদ্ধ রজনীবাবুর আদর্শের ঘর ভেঙে যাওয়া বোধ হয় তার চেয়ে করুণ নয়। তবু আজ তাঁকে দেখে মনে হয়, জীবনের দুরন্ত ইতিহাসের বিদ্রূপে খড়কুটোর মত ছিটকে এক কোণে পড়ে রয়েছেন।

নীহার ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে। কয়েকটি ছোট ছোট কথা বলে চলে যায়—আজ আমরা চলে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, চলে যেতে হবে নিশ্চয়। কাউকে ধরে রাখবার নিয়ম আজও আয়ত্ত করতে পারেননি রজনীবাবু। যতী চলে গেছে, পুঁটিমাসী সরে গেছেন, প্রমীলা সরে আছে, মীনুও সরেছে—তবে মঞ্জুর দাবীটাই বা নতুন নিয়মে বুঝতে হবে কেন? রজনীবাবু নীহারের কথার কোন উত্তর দেন না।

মঞ্জুকে থাকতে বলেই বা কি লাভ হবে রজনীবাবুর? লাভ হবে শুধু মঞ্জু ও নীহারের। শুধু ওরা দু'জন খুশী। কিন্তু মঞ্জু ও নীহার রজনীবাবুর বিচারের শুধু ভুলটুকু প্রমাণ করার জন্যই যেন এসেছে। সবাই জীবন দিয়ে কায় মনে প্রাণে শুধু রজনীবাবুকে ব্যর্থ করার সাধনাই করে এসেছে। তাই তো রজনীবাবু আজ এত অসহায়। কেউ তাঁকে শুধরে দিতে এগিয়ে এল না। কেউ সুস্থ মন নিয়ে ফিরে দেখা দিল না। কেউ নতুন নিয়মের সন্ধান দিল না। এত আশীর্বাদ ক'রে, এক একজনের হাতে প্রদীপ দিয়ে তিনি পাঠিয়ে ছিলেন। কেউ ফিরে এল প্রদীপ হারিয়ে, কেউ ফিরে এল প্রদীপ নিভিয়ে। এ ভাবে আসার চেয়ে না আসাই ভাল।

মঞ্জুকে এখানে থেকে যেতে অনুরোধ করার উৎসাহ পান না রজনীবাবু। লেডী ডাক্তার খুশী হয়েই সংবাদটা দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে কোন উৎসবের প্রেরণা নেই। নিছক একটা হাসপাতালের রিপোর্ট বলে মনে হয়। এ সংবাদে খুশী হবার সাধ্য নেই রজনীবাবুর। মঞ্জু ও নীহার—ভালবেসে, মন্ত্র পড়ে, রজনীবাবুর আশীর্বাদ নিয়ে ওদের বিয়ে হয়েছে, কোথাও অপূর্ণতা ছিল না। আজও ওদের মিলিত জীবনে কোথাও কোন ছন্দোভঙ্গ নেই। তবু চিরকালের কঠোর রজনীবাবু আজ ভেঙে পড়েও ভাঙতে চান না। মঞ্জুর ছেলেকে, তাঁরই নাতিকে কল্পনা করতে গিয়ে মনের ভেতর কোন আদর আকুল হয়ে ওঠে না। কোথায় যেন একটু খটকা লাগে, আদর্শবাদী রজনী মিত্রের জীবনে চরম অভিশাপ এইখানে সত্য হয়ে ওঠে। পৃথিবী আজ যাই মনে করুক, তিনি মনে করেন মঞ্জু যেন আজ তার অন্তরাত্মা দিয়ে এক অবৈধ সন্তানের প্রাণ বহন করছে।

সন্দেহ নেই, দু'জনার হৃদয়ের অনুরাগে, পুরোহিতের মন্ত্রে, রজনীবাবুর আশীর্বাদে, মঞ্জু ও নীহার আদর্শ দম্পতি। কিন্তু দাম্পত্যের আদর্শ কই? বিয়ের আগে ওদের জীবনে আদর্শ ছিল, ওদের প্রতিজ্ঞা ছিল। আজ সব মুছে গিয়ে শুধু ওরা দুজনে রয়েছে। ওরা রজনী মিত্রের আশীর্বাদের বাইরে চলে গেছে।

মঞ্জু ও নীহার চলে গেল, যাবার আগে মঞ্জুর চোখ ছলছল করলো। দেখতে পেয়েও রজনীবাবু কিছু বলতে পারলেন না। ঘোড়ার গাড়িটা রওনা হবার আগে, রজনীবাবু শুধু একবার ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

নিস্তব্ধ বাড়িটার আঙিনায় ফিরে এসে দাঁড়ালেন রজনীবাবু। তাঁর পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। এইখানে মাটির ওপর এই চরম স্বীকৃতি লিখে রেখে, যদি কোথাও চলে যেতে পারতেন, তবে তাঁর নিজের না হোক পৃথিবীবাসীর একটা উপকার হতো।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন রজনীবাবু। আজ বুঝতে পারেন, তিনি কাউকে বর্জন করেননি, তিনি সবারই বর্জিত। এক হাতে আদর্শ আর এক হাতে সংসার, প্রবল দম্ভে দুই শক্তির ঝুঁটি ধরে তিনি এক পথে চলবার একটা ফরমূলা খুঁজছিলেন। আজ দেখতে পাচ্ছেন, সংসার পালিয়ে গেছে, আদর্শ ধোঁয়া হয়ে আকাশের ঊর্ধ্বে উঠে পড়েছে। শুধু তিনি একা পড়ে আছেন।

ধীরে ধীরে পা চালিয়ে চলতে আরম্ভ করেন রজনীবাবু। বিস্তীর্ণ বাগানের গাছের ভীড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকেন। যেন একটা পালিয়ে যাবার আবেগ মনের ভেতর গিয়ে পৌঁছেছে। সরে যেতে হবে, সরে যেতে হবে। বাগানের প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে পথের দিকে পিপাসার্তের মত তাকিয়ে থাকেন।

কারা যেন আসছে, জলজ্যান্ত কতগুলি মূর্তি, কিন্তু ছায়া বলে মনে হয়। এক এক করে কয়েকটি যুবক ও ছাত্র কিসের একটা দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে। রজনীবাবুর সামনে দাঁড়ায়।—আপনাকে যেতেই হবে।

বাইরের পৃথিবীর দাবী ; বহু পুরাতন দাবী। এর আগে অনেকবার গেছেন রজনীবাবু। সাধ করেই গেছেন, জিদ করে গেছেন। কিন্তু আজকের আবেদন একেবারে নতুন রকমের মনে হয়। সভা শোভাযাত্রা নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু তিলক জয়ন্তী কি বন্ধ থাকতে পারে? সভা হবেই, শোভাযাত্রা বের হবেই। রজনীবাবুর কাছে তাই আবার নেতৃত্বের আবেদন এসেছে।—আপনাকে যেতেই হবে, আপনাকে সবার আগে থাকতে হবে।

রজনীবাবু যেন সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। সবার পেছনে চলে যাবার জন্য আজ তাঁকে সবার আগে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এটা তাঁর পক্ষে আজ আর এগিয়ে যাবার অভিযান নয়, এক পরাস্ত পলাতকের অন্তর্ধানের চোরাপথ এই আবেদনের মধ্যে যেন উঁকি দিচ্ছে।

রজনীবাবু খুশী হয়ে উত্তর দেন।—নিশ্চয় যাব।

গিয়েছিলেন রজনীবাবু। সভা হলো, শোভাযাত্রাও হলো। সব শেষে ধূলায় ধূসর ক্লান্ত মূর্তি নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরলেন রজনীবাবু, কারণ, গ্রেপ্তার হননি। পৃথিবীর কাছে শেষে অনুকম্পার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়েও পেলেন না। বাড়ি ফিরতে প্রতি পদক্ষেপে যেন কাঁটা ফুটছে। তাঁর মনুষ্যত্বের শেষ সম্বলটুকুও এভাবে লাঞ্ছিত হবে, ক্লান্ত ও পরাভূত জীবনে শেষ আত্মসমর্পণের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হবেন, এত বড় শাস্তি তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

ফটকের ভেতর পা দিয়েই রজনী মিত্রের ঝাপসা চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠলো। বারান্দার ওপর একদল পুলিস বসে আছে। তাঁরই প্রতীক্ষায় সময় গুনছে। পুলিস অফিসার বললেন—আপনাকে যেতে হবে।

যাক, পথ বন্ধ হয়নি, ব্যর্থ জীবনের এক আসন্ন সন্ধ্যায় শান্তির বাতাস তাঁকে ডাকছে—যেতে হবে, যেতে হবে। রজনীবাবু খুশী হয়ে বললেন—নিশ্চয়।

পুলিস অফিসার—হ্যাঁ, তবে কোন তাড়াহুড়ো নেই, আপনি সময় নিন। আমরা বসছি।

সময় নিতে ইচ্ছে নেই রজনীবাবুর। সারা জীবন ধরে কত আকাঙক্ষা করেছেন রজনীবাবু, কিছুই সফল হয়নি। আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, তাঁর প্রবঞ্চিত সত্তা শেষবারের মত পৃথিবীর কাছে শুধু এই একটি উপহার আশা করেছিল। রজনীবাবু বুঝতে পারেন, তাঁর আকাঙক্ষা সফল হয়েছে। এই প্রথম সাফল্য!

ঘরের পর ঘর পার হয়ে ভেতর বারান্দায় এসে অকারণে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন রজনীবাবু। উঠোনের দিক থেকে যেন হঠাৎ বাতাস ফুঁড়ে একটি অপরিচিত মূর্তি বেরিয়ে আসে।

লোকটি বলে—অনেকক্ষণ হ'ল আপনার অপেক্ষায় রয়েছি, চিঠি আছে।

আজ কত লোক তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে, কত আহ্বান আসছে! পৃথিবী যেন বুঝতে পেরেছে, রজনী মিত্রের বিফল ব্রত আজ সাঙ্গ হলো।

রজনীবাবু বলেন—কার চিঠি?

লোকটি—শরদিন্দুবাবুর চিঠি?

রজনীবাবু তীব্র দৃষ্টি তুলে তাকান। লোকটা যেন একটু কাঠোর ভাবেই দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্যই উঠোনের একদিকে হাত তুলে ইঙ্গিত ক'রে বলে—আর ঐ, জমা করে দিলাম। আমি যাই।

দৃষ্টির মোড় চকিতে অন্য দিকে ঘুরে যায়। উঠোনের এক কোণে বছর তিনেক বয়সের একটী শিশু পেঁপে পাতার ডাঁটা আর মাটি নিয়ে খেলা করছে। রজনীবাবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

কিন্তু লোকটি চলে গেছে। রজনীবাবু কাঁপছিলেন, চিঠি পড়ছিলেন।

বারান্দার মেঝের ওপরেই বসে পড়লেন রজনীবাবু। শক্ত করে চিঠিটাকে ধরলেন, যেন তাঁর জীবনের শেষ ভরসার লিপিকা কোন চক্ষুহীন বাতাসের খেয়ালে উড়ে না যায়।

শরদিন্দু জানিয়েছে—মাত্র কিছুদিন আগে অমিয় একটা সমিতি করেছিল...।

রজনীবাবু চিঠির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দূরের একটা শিমূলের চূড়ার দিকে নিষ্পলক ভাবে তাকিয়ে থাকেন। কে অমিয়? রজনীবাবু যেন ভেবে দেখতে চেষ্টা করছেন। দেখতেও পাচ্ছে—ঝাপসা মত একটা অপদার্থ মূর্তি। রজনীবাবুর দীক্ষায় সুরভিত এমন সুন্দর সংসারের চন্দন ফেলে দিয়ে, মুখে কালি মেখে যে-ছেলেটা একদিন পালিয়ে গেল।

শিমূলের মাথা থেকে লক্ষ লক্ষ শাদা তুলোর ফুল ফুরফুর ক'রে উড়ে যেন আকাশমুখী অভিযানে ছুটে চলে যাচ্ছে। বাতাসের আঘাতে জীর্ণ শিমূল শুঁটির খোলস ফেটে পড়ছে। রজনীবাবু ভাবতে চেষ্টা করেন—অমিয় আবার সমিতি করে কেন? ওর তো জীবনে কোন প্রতিজ্ঞা ছিল না, কোন আদর্শ ছিল না। অমিয় তো তাঁর আর তিনটি ছেলে-মেয়ের মত নয়। শুধু চাকরী খুঁজতো, শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে দিন পার করে দিত। অমিয় কোন কালেই মানুষ ছিল না। অমিয় একটা রিপুময় প্রাণ মাত্র। কিন্তু তবু, সেই অমিয় আবার সমিতি করে কেন?

আবার দৃষ্টি নামিয়ে চিঠিটা পড়তে থাকেন রজনীবাবু।

...অনেক কষ্টে সমিতিটা গড়ে তুলেছিল অমিয়।

শরদিন্দুর চিঠির এক একটা লাইনে যেন দূর রহস্যময় ইতিহাসের এক একটি প্রতিধ্বনির মর্ম লুকিয়ে রয়েছে। তাহ'লে কষ্ট ক'রে সমিতি গড়তে পারে অমিয়! এত সংকল্পের জোর কেমন ক'রে, কোথা থেকে সে কুড়িয়ে পায়? অমিয়'র জীবনে কোন নিয়মের পুণ্য ছিল না। কোন দিন সে পথ বেছে নেয়নি। তবু পথ পেয়ে যায় কি করে?

...দুঃখের বিষয় অমিয়'র সমিতিটা ধরা পড়ে গেছে।

রজনীবাবু চিঠিটাকে চোখের কাছে টেনে আনেন। মনে হয়, অমিয়ও যেন আজ ধরা পড়ে গেছে। সমস্ত মানুষের পৃথিবী আজ ধরা পড়ে গেছে তাঁর কাছে। তিনি আজ তাই দেখতে পাচ্ছেন, সারা জীবন পাঁয়তাড়া-করা আদর্শের গর্বে যে-সত্যকে দেখতে পাননি। রাজপাটপুর, পুঁটুদি, প্রমীলা। যতী-সুলেখা, মীনু-শরদিন্দু, মঞ্জু-নীহার...এমন কি সাধনকেও দেখতে পান। কত ভুল ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। কিন্তু কী এক রূপ আছে এ ভুলের মধ্যে। এক একটি অশ্রুজলের ফোঁটা। কোন নিয়ম দিয়ে ওদের মুছে দেওয়া যায় না। ওদের আঘাত দিলেই ওরা কুশ্রী হয়ে ওঠে। ওদের মেনে নিলেই, ওরা গলে যায়, কত সুন্দর ও শান্ত হয়ে যায়।

...অমিয় এখন জেলে।

রজনীবাবুর মাথাটা চিঠির ওপর যেন অভিবাদনের আবেশে ঝুঁকে পড়ে। অযোগ্য অনধিকারী অকৃতি অমিয় কীর্তিমান হয়েছে। জীবন ওকে বিমুখ করেনি।

কেন করেনি? রজনীবাবুর হৃৎপিণ্ডের ভেতর যেন তাঁর সংস্কারভরা শোণিত এক নতুন বাতাসের নিশ্বাসে শুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর চোখের দৃষ্টিও ঝলসে উঠছে। তাঁর সব কেন'র উত্তর আজ বুকভরা উপলব্ধির ভেতর উথলে উঠছে। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ছিল অমিয়, তাই সব

পেয়ে গেছে। এভাবেই সব পেতে হয়। অন্য কোন নিয়ম নেই।

...শুভা এখন জেলে।

সেই ছোট্ট শুভা। রজনীবাবু দু'চোখ বন্ধ ক'রে জীবনলোকের গহনে একবার দৃষ্টিপাত করেন। দেখতে পান, কত বড় হয়ে গেছে শুভা। বিনা-নিয়মের সিঁদুর দিয়ে আঁকা শুভার সিঁথিটা, কিন্তু কী টুক্‌টুকে লাল! জীবনের কামনাকে ভুলে বা খেলার ছলে সহজ ভাবেই ধরেছিল বোকা মেয়ে শুভা, তাই কি জীবনকে এত নিবিড় ভাবে পেয়ে গেল? এবং, তাই কি হীরের মত এত কঠিন আদর্শকে এত সহজে পেয়ে গেল, জেলে চলে গেল?

...কাজেই ওদের ছেলেকে আজ আপনার কাছেই...।

বেশ করেছে শরদিন্দু। রজনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দৃষ্টির ঘোর বোধ হয় কেটে গেছে, সংসারের সৃষ্টিকে নতুন ক'রে চোখে দেখতে পান রজনীবাবু। আজ তিনি প্রস্তুত হন, তিনি সম্মান দেবেন, মূল্য দেবেন। আইনের সংসারকে নয়, সংসারের আইনকে।

নিজের কাছ থেকেই যেন ছাড়া পেয়ে, একটা লাফ দিয়ে উঠোনের ওপর নেমে পড়েন রজনীবাবু। দেখতে পান, উঠোনের এক কোণে জীবনের ইতিহাসের একটি উপহার নিজের মনে খেলা করছে। অস্ফুট কথার ভারে রজনীবাবুর ঠোঁট দুটো কাঁপছে, রূপকথার দাদুকে আজ যে নতুন ক'রে তাঁর কাহিনী আরম্ভ করতে হবে। রজনীবাবু দেখছিলেন, তিনি তাঁর প্রথম শ্রোতা পেয়ে গেছেন। তার হাজার পিতৃপুরুষের দেহের শোণিত ও জীবনব্যাপী আদর্শের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর প্রথম বৈধ বংশধর পৌঁছে গেছে।

চীৎকার ক'রে ওঠেন রজনীবাবু।—দরজা খোলো প্রমীলা। মীনু বেরিয়ে এস। অমি'র ছেলে কাউকে না ব'লে ঘরে ঢুকেছে। দেখ এসে।

প্রমীলার পূজোর ঘরের বন্ধ কপাট ঝংকার দিয়ে খুলে যায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন প্রমীলা, ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে দাঁড়ান। নিতান্ত শান্ত স্বাভাবিক তাঁর গলার স্বর—কখন এল?

যেন এইটুকু জানবার জন্যই আজ বছর বছর ধরে পূজোর ঘরে কপাট বন্ধ করে তপস্যা করছিলেন প্রমীলা।

মীনু বেরিয়ে আসে। রজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—বাবা, তুমি ধীর হয়ে বসো।

সবারই গলার স্বরে যেন সংসারের মমতার আবেশ লেগেছে। সবাই বেরিয়ে আসছে। কত শান্ত সহজভাবে, ঘুমভাঙ্গা পাখির মত, দীঘির জলের মত, সবাই কথা বলছে!

রজনীবাবু বলেন—আমাকে কিন্তু এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে। বাইরে ওরা আমার অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রমীলা বলে—এখুনি? কেন?

রজনীবাবু—হ্যাঁ, এখুনি যাব। আবার ফিরে আসবো। হ্যাঁ, সবাইকে ডেকে পাঠাও। এইবার ডাকলে নিশ্চয় সবাই আসবে। আমি জানি, পুঁটুদি আসবেন, যতী আসবে। মঞ্জু ও নীহার রাগ করে চলে গেছে, ওরাও আসবে। আমার বিশ্বাস হয়, শরদিন্দুও আসবে...।

মীনু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

রজনীবাবু বলেন—কোন লজ্জা, কোন ভয় করার নেই মীনু! আমি আজ সবার সঙ্গে মেশবার পথ পেয়ে গেছি। সবাইকে ডাকবার সাহস পেয়েছি।

রজনীবাবু চলে যাবার জন্য এগিয়ে যান। মীনু বলে—তুমি কখন আসছো বাবা?

রজনীবাবু হেসে ফেলেন—ঠিক জানি না, এক বছরও হতে পারে। কিন্তু শুভা আর অমিয় আগে ফিরে আসুক, তারপর আমি তো আসছিই।

তিলাঞ্জলি

বালিগঞ্জ প্লেসের এই একতলা বাড়িটার দক্ষিণ কোণের ঘরটা সত্যিকারের আর্টিস্ট ও ভাবুক মানুষের পক্ষে একটি আদর্শ আশ্রয়। জানালার পাশেই মাঠটার আরম্ভ। কলকাতার বর্ষার আদরে ঘাসভরা মাঠটা যেন আহ্লাদে ফেঁপে উঠেছে—সতেজ সবুজে কানায় কানায় ভরা। চারদিকের পীচঢালা চারটে রাস্তা যেন পালিশ করা চারটে কালো ফ্রেম, এই সবুজের উচ্ছলতাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে জানালার ঠিক বাইরেই পর পর কতকগুলি কাঁঠাল আর শিউলি—একটা বারোমেসে ছায়া জায়গাটাকে যেমন ঠাণ্ডা তেমনি স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছে। গাছের গোড়ায় ক'দিন থেকে ঝরা শিউলি জমে উঠেছে। কাঠবিড়ালীর দল গাছ থেকে নেমে মাঝে মাঝে হুটোপুটি ক'রে চলে যায়। বাসি ফুলের থমকানো গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে—বাতাসের আস্বাদ বদলে দেয়।

সূর্য ওঠে আর ডোবে—খোলা জানালার ধারে সময়মত বসে থাকলেই উদয়াস্তের দুই ঘাটে বসে থাকার মত আনন্দ পাওয়া যায়। মাঠের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে কর্নফিল্ড রোডের বাড়ি আর বাগানগুলি একটু উদ্ধত হয়ে ওপরের আকাশপটকে ছুঁয়ে ছোট করে দিয়েছে। যখন বৃষ্টি হয়, তখন স্পষ্ট দেখা যায়—এক গম্ভীর নিসর্গের গলিত জটার মত মেঘগুলি গাছের মাথা ছুঁয়ে ভেসে চলেছে।

অনেক রাত্রে ট্রেন যায় ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। শব্দহীন রাত্রির সুষুপ্তির মধ্যে পথিক-ট্রেনের আভরণগুলি ঠুং ঠুং করে সুচ্ছন্দে বেজে চলে যায়। শুনতে বেশ লাগে।

এই ঘরটিতে শিশির থাকে। কেউ হয়তো জানে না, শিশির আজকাল গানবাজনা নিয়ে একটা গবেষণা করছে। ঘরের দেয়াল ঘেঁষে একটা লম্বা বেঞ্চ। তার ওপর সারি সারি বিঁড়ে বসানো। বিঁড়ের ওপর কয়েকটা বীণ সেতার আর তানপুরা। একটা মেহগণির স্ট্যাণ্ডে তিনটে হুক থেকে গিটার ব্যাঞ্জো আর ম্যাণ্ডোলিন ঝোলানো। খাটের নিচে আরও হরেক রকমের যত বাদ্যযন্ত্র—তার মধ্যে সারেঙ্গী থেকে আরম্ভ করে ইরানী বেদিয়াদের বেহালা পর্যন্ত নানা জাতির সুরশিল্পের যত যান্ত্রিক আধার জড়ো করা হয়েছে। তামার তৈরি একটা প্রকাণ্ড ঝাঁপির মধ্যে নানারকম বাঁশী—হাড়ের, শাঁখের, মোষের সিঙের। টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ—স্বরলিপি লেখা। আজ পনের বছর ধরে যখন যেখানে পাওয়া গেছে, প্রত্যেকটি সুরের শ্রুতিচ্ছবিকে সে যেন গণিতের শিকল পরিয়ে বন্দী করে রেখেছে খাতার মধ্যে।

কুম্ভমেলায় কাশ্মীরী সাধুদের মুখে একটা ভজন শুনেছিল শিশির। বিকেলবেলা নদীর চড়ার ওপর বসে চিমটে বাজিয়ে সাধুরা গাইছিল।—হে উদাসী সাধু, তুমি হিমানীর নদীর মত। তোমার বুকে কোন পানকৌড়ি খেলা করতে আসে না। তোমার ঢেউ নেই, তাই তুমি ঘোলা হও না। তুমি স্থির, তাই তুমি সুখী।

গানের সুরটা লক্ষ জনতার চাপল্য মিথ্যে করে দিয়ে এমন এক উদাস আবেশ সৃষ্টি করেছিল যা সে আজ পর্যন্ত রাগ বেহাগের কোন রূপের মধ্যে পায়নি। সেই অনুভবের সুর ও স্বরকে এক আবিষ্কৃত রত্নের মত বহু সমাদরে ও সাধনায় পাতায় পাতায় চিহ্নিত করে রেখেছে শিশির। এই সব নিয়েই তার সাধনা।

আরও আছে। বছর কয়েক আগে পুজোর ছুটিতে চাঁদপুরে মামাবাড়ি যাচ্ছিল শিশির। স্টীমারটা যখন মাঝ-মেঘনায়, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। ঝড় এল। পুব-দক্ষিণ কোণ থেকে একটা অদৃশ্য আক্রোশ আর্ত শব্দে আকাশ উতলা করে উড়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। তার সঙ্গে হাওয়ার ঝাপটা। স্টীমারটা একদিকে কাৎ হয়ে দিশেহারার মত কখনও প্রবল বেগে, কখনও ধীরে ধীরে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে চলেছিল। সব চেয়ে মাৎ করে দিয়েছিল বিদ্যুতের খেলা। আকাশ থেকে ছোট্ট এক একটা লিকলিকে বিদ্যুৎ আগুনে পোড়া সাপের

মত ছটফট করে নদীর জলে লাফ দিয়ে পড়ছিল। পরমুহূর্তে জলতলের আড়ালে যোজনব্যাপী একটা অগ্ন্যুৎপাতের সর্পিল ঝলক নিষ্ঠুর ধাঁধার মত ত্রস্ত যাত্রীদের প্রাণভয় আরও ভয়াবহ করে তুলছিল। সেই ক্ষুব্ধ বাতাস আর ঢেউ-এর শব্দ, স্টীমারের ইঞ্জিনের অবসন্ন স্বর—তার সঙ্গে যাত্রীদের করুণ আক্ষেপ মিশে গিয়ে যে বিচিত্র বিলাপ সৃষ্টি করেছিল, তার সুরস্বরূপটি শিশিরের খাতার পঁচিশটি পাতায় স্বরলিপিতে বাঁধা আছে। মনটা যেদিন কোন কারণে খুবই বিমর্ষ থাকে, সেই দিন এই সুরটিকে একবার মুক্তি দেয় শিশির—সরোদের তারে। তুচ্ছ কয়েকটা তারের স্পন্দন ছাপিয়ে এক দিব্যধ্বনির আকুলতায় জড় ও প্রাণের সহমরণের সেই জ্বালা যেন নতুন করে শিখায়িত হয়ে ওঠে।

শিশির গবেষণা করছে অর্থাৎ কিছু একটা খুঁজছে। প্রতিবেশীরা কেউ ভাল করে চেনেও না শিশিরকে। তারা শুধু জেনে রেখেছে, শিশির একজন গানের মাস্টার, যদিও গান নিয়ে মাস্টারী করতে শিশিরকে দেখেনি কেউ। এর বেশী কেউ কিছু বলে না, কোন খোঁজখবর করবারও প্রয়োজন মনে করে না।

নানারকম বাদ্যযন্ত্র তৈরি করছে শিশির। প্রতি রবিবার একজন কামার আর একজন ছুতোর আসে। তাদের সঙ্গে র‍্যাদা হাতুড়ি নিয়ে ঠুকঠাক ক'রে সমানে কাজ করে শিশির। সম্প্রতি একটা আরম্ভ হয়েছে। অর্ধচন্দ্রের আকারে একটা গাম্ভার কাঠের ফ্রেমের ওপর ছোট বড় পনরটা শঙ্খ বসানো। শঙ্খের মুখের ভেতর থেকে এক একটা তার ঘাট-বাঁধা দণ্ডের ওপর দিয়ে উঠে এক স্তবক হাতির দাঁতের কানের সঙ্গে বাঁধা। আজ এত যত্ন নিয়ে, পয়সা খরচ করে আর ভাবনা ভেবে, শিশির এই যন্ত্র গড়ছে ; ক'দিন পরেই এর ওপর একটা পরীক্ষা নেবে, তারপর কি হবে বলা যায় না। হয়তো যন্ত্রটা কোন কাজেই আসবে না। পাশের ঘরে চিরদিনের মত বিদেয় করে দেওয়া হবে। এরই মধ্যে পাশের ঘরটা একটা ভাগাড়ের মত হয়ে উঠেছে। যত জীর্ণ ভগ্ন অপদার্থ ও অকালমৃত বাজনার কঙ্কালে ঘরটা ভরা।

তবু পরীক্ষার শেষ নেই। একটা ব্যর্থ হয়, নতুন একটা ধরে। উদ্ভাবনার ক্ষান্তি নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাতটা ঘণ্টা মাত্র তাঁর অন্য ও অন্নচিন্তার দায়, বাকী সতের ঘণ্টা সুরে বাঁধা না হোক, সুরের কাছে বাঁধা। একদিন না খেলে, না ঘুমোলেও চলে, কিন্তু বেসুরো হয়ে একটি দিনও কাটতে পারে না শিশিরের।

জীবনে সুর যখন আছে, বিরামও আছে নিশ্চয়। এই বিরাম নিছক শূন্যতা নয়। শিশিরের সম্বন্ধে বলতে পারা যায়, সেখানে তার প্রতিটি মুহূর্ত একটি মেয়ের ভালবাসার আশ্বাসে ভরা।

শিশিরের সঙ্গে যাদের মেলামেশা আছে, তারাও শিশিরকে চিনতে পারে না। শুধু তাই নয়, তারা ঠিক উল্টোটাই বোঝে। শিশিরের যদি কোন দোষ থাকে, তবে সেটা শুধু তার মুখচোরা স্বভাব। আজ পর্যন্ত কখনও মুখ ফুটে বললো না, গান আর বাজনা নিয়ে এই যে তার দিনরাত কায়মন সেবা, তার উদ্দেশ্য কি? পরিচিত ঘনিষ্ঠ অভ্যাগত—সকলেরই সঙ্গে শিশির সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে—শুধু সেই বিষয়টি ছাড়া, যে-বিষয় তার জীবন গ্রাস করে বসে আছে। কাজেই লোকের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়। নিজের নামের ঢাকে কাঠি পিটিয়ে যদি কেউ নিজেকে জাহির করতে না চায়, তবে অপরে তার বিরুদ্ধে দুর্নামের শিঙে বাজিয়ে বেড়াবে নিশ্চয়। শিশিরের অদৃষ্টে তাই ঘটেছে। শত অনুরোধেও যে-মানুষ কোথাও গাইতে চায় না, বাজাতে চায় না, সে-মানুষ শুধু একটি ক্ষেত্রে এই জেদের ব্যতিক্রম করে বসে—সিতার কাছে। সুতরাং ধরে নিতে হয়, সিতার জন্যই তার গান গাওয়া। পরচার্চিকদের গবেষণা এই পর্যন্ত এসে সকল সংশয় প্রশ্ন ও কৌতূহলের একটা সদুত্তর পায়।

কিন্তু সিতাই একমাত্র মানুষ, যে সত্যি করে জানে, শিশিরের সুরের খেয়াল কোথায় ও

কোন দিকে খেয়া দিয়ে চলেছে।

শিশিরের একটা থিওরি আছে—রাগ-মহাদেশ থিওরি। বিদ্রূপের ভয়ে এই থিওরির কথা কারও কাছে প্রকাশ করে না শিশির। শুধু জানে সিতা।

শিশির বলে।—ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণীর কৃপা ভরসা করে থাকলে আর চলবে না। নতুন এক রাগ-সৃষ্টির লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। আজ ভারতবর্ষ আর নারদ ঋষির দেশ নয়—সারা পৃথিবীর আত্মীয়। গীতময় ভারতের আকাঙক্ষা আজ এক নতুন সুরস্বরূপকে খুঁজছে। গুণীর কাজ তাকে আবিষ্কার করা, তাকে চেনা, তাকে পূর্ণতা দেওয়া। মিঞা তানসেন একদিন তাই করেছিলেন। কিন্তু তারপর? তারপর থেকে যুগের বাতাসে আমাদের জীবনে কত নতুন পাখি ডেকে গেল—আরও কত বিচিত্র ডাক আসছে, কিন্তু নতুন মুরলী আর তৈরি হলো না।

এই থিওরিটা শিশিরের কাছে একটা উপলব্ধির মত সত্য। কোন কার্পণ্য না করে শিশির মাত্র একজনের কাছেই বিশ্বাস করে এই উপলব্ধির খবর সঁপে দিয়েছে—গোপন উপঢৌকনের মত ; এত জন থাকতে শুধু বেছে বেছে সিতার কাছে।

সিতার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই শিশিরের মনে পড়লো—আজ সিতা দেখা করতে আসবে, অনেকদিন অদেখার পর।

বোম্বাই থেকে রেকর্ডের পার্শেলটা কালই এসে পৌঁছেছে। য়ুরোপের সুরগুরু বীটোফেনের ন'টি সিম্‌ফনি।

বাইরে মোটরের হর্নের শব্দ শোনা গেল। শিশির বাইরে এসে দাঁড়াতেই, সিতা গাড়ি থেকে নামলো। যে-ভদ্রলোক স্টীয়ারিং-এ ছিলেন, তিনি আর নামলেন না। শিশিরের দিকে তাঁর নজরটাও পড়লো না। যেমন বসেছিলেন তেমনি সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন এবং পরক্ষণেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন।

সিতা এগিয়ে আসতেই শিশির জিজ্ঞাসা করলো।—উনি চলে গেলেন কেন? কে উনি?

সিতা—ওঁর নাম জয়ন্ত মজুমদার।

একটু ব্যস্ততার সঙ্গে একবার ঘাড় উঁচু করে রাস্তার শেষ সীমা পর্যন্ত শিশির তাকিয়ে দেখলো, যদিও জয়ন্ত মজুমদারের গাড়ির কোন চিহ্ন এই সৌজন্যের অপেক্ষায় তখনো রাস্তায় বসে ছিল না। শুধু এলোমেলো কতগুলি ধোঁয়া আর ধুলোর কুণ্ডলী ভাসছিলো পথের বাতাসে।

ঘরে ঢুকে রেকর্ডগুলি একবার নেড়েচেড়ে দেখলো সিতা। তারপর দেয়ালে টাঙানো শিশিরের মায়ের ফটোখানা অনেকক্ষণ ধরে দেখলো।

রেকর্ড বাজতে শুরু করলো।—এই রেকর্ডটা একটু মন দিয়ে শোন সিতা। এটা হলো বীটোফেনের তৃতীয় সিম্‌ফনি। এর নাম ফিউনারাল মার্চ, নেপোলীয়নকে এইটি উপহার দিয়েছিলেন বীটোফেন।

শিশির নিঝুম হয়ে বসে থাকে। সিতা চুপ করে মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে বসে। একটু পরেই শিশিরের চোখে মুখে কতকটা অদ্ভুত রকমের রক্তাভ আবেশ দেখা যায়।—শেষের দিকের স্ট্যান্‌জা কয়েকটা মন দিয়ে শোন সিতা। লক্ষ লক্ষ ক্লান্ত আত্মা যেন মার্চ করে এক পরম বিশ্রান্তির দেশে চলেছে। তাদের অবসন্ন পদক্ষেপের ধ্বনি ধীরে ধীরে শূন্যতায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

সিতা শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সপ্তম সিম্‌ফনির সমাধি থেকে নতুন একটা পুলক সেই শূন্যতা ছাপিয়ে তারই মনের মধ্যে রেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সিতা শুধু দেখে, শিশিরের ভুরু দুটো ঠিক তার মায়েরই মত—ঘন টানা ধনুকের মত বাঁকা।

শিশির বলে।—এইবার শোন, আর কিছু নেই। এখন শুধু শূন্যতার সুর শুনে যাও, শুনেছো

কখনো?

শিশির অভিভূতের মত দুচোখ বুজে বসে থাকে। বিদ্যুতের পাখার প্রতিচ্ছবিটা তার চশমার কাঁচের ওপর এক বন্দী চাঞ্চল্যের মত নিঃশব্দে বিভোর হয়ে ঘুরতে থাকে। সিতা উঠে এসে পাশে দাঁড়ায়। শোনা ও দেখার এক ধাঁধার মধ্যে ফাঁপরে পড়ে সিতা। নরম ক্রীমের মত হাতে প্ল্যাটিনামের চুড়ি দুটো অসাবধানে বেজে ওঠে। শিল্পীর তন্ময়তা ছুটে যায়। হাতটা লুফে ধরে শিশির, পাশে বসিয়ে রাখে সিতাকে।

একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় আরম্ভ হয়। নবম সিম্‌ফনি শব্দের ফুলঝুরি ছড়ায়। শিশির আর সিতা পাশাপাশি ব'সে যেন সুরের রঙীন উল্লাসটুকু চোখ দিয়ে দেখে উপভোগ করে।

শিশির।—এই বাজনাটি বীটোফেন স্বয়ং শুনতে পাননি। এর ব্যাকরণটুকুই শুধু তৈরি করে শেষ করেছিলেন। তারপরেই বধির হয়ে যান। শিল্পীর জীবনে এর চেয়ে বড় দুঃখ ও বঞ্চনা আর কি হতে পারে?

সিতা আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। একটা আশ্বাস যেন শিশিরের এই ক্ষণিক বিমর্ষতাকে মুছে ফেলার জন্য অন্তরের দিকে বাহু প্রসারিত করে।

বাজনা শেষ হয়। শিশিরের তৃপ্ত সংবিৎ এতক্ষণ পরে একটা ধ্যানলোক থেকে ছাড়া পেয়ে পাশের মানুষটিকে ভাল করে দেখতে পায়।—এতদিন পরে তোমার সময় হলো সিতা।

সিতা যেন এই মুহূর্তটিব অপেক্ষায় বসে ছিল। তার সতর্ক ধৈর্য শুধু মিনিট গুনছিল।, কতক্ষণে এই শিল্পীপ্রবর তাঁর মানুষী সত্তায় ফিরে আসেন। মনে হচ্ছে এতক্ষণে ফিরেছেন। সিতা ততক্ষণে একটু দূরে সরে গিয়ে বসে। আঁচলটা দিয়ে হাত দুটি ভাল করে ঢেকে নেয়। সব দিকেই দৃষ্টি পড়ে সিতার, শুধু শিশিরের দিকে পড়ে না।

শিশির।—কথা বল সিতা?

সিতা অন্যদিকে তাকিয়ে একটু ফিকে হাসির সঙ্গে আস্তে আস্তে বললো।—কথা বলার কি যোগ্যতা আমার আছে বলুন? তারপর, আপনি গাইয়ে মানুষ, আপনার কাছে গানাৎ পরতর কিছু নেই। আর আমি হলাম অকৃত্রিম অগান।

শিশির চেয়ার ছেড়ে উঠে সিতার কাছে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল।—আমার কাছে গানাৎ পরতর যদি কিছু থাকে সে তো তুমি!

সিতার মুখের ভাবে একটু ব্যস্ততা দেখা দিল, দরজার বাইরে যেন কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল সিতা। তার পরেই বললো।—না, জয়ন্তবাবুর গাড়ির হর্ন নয়।

শিশির প্রশ্ন করলো।—কে জয়ন্তবাবু? সিতা চকিতে একবার সুরলোকের মানুষটির দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। এরই মধ্যে ভদ্রলোক ভুলে গেছে—জয়ন্তবাবু কে? পাগল গৃহস্থের মত দরজা খুলেই লোকটা ঘুমিয়ে আছে—কোন সতর্কতা নেই—চোরের ভয় নেই। বোধহয় মনে করেছেন, চুরি যাবার ভয় নেই! এমনও হতে পারে, চুরি গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

শিশির ঘরের মধ্যে চুপচাপ পায়চারি করে বেড়ায় কিছুক্ষণ। সিতা লক্ষ্য করে, শিল্পী বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। নিবিষ্ট মনে ভাবছেন। ভাবনার ঘোর মুখের উপর একটা সান্ধ্য বিষণ্ণতা বিস্তার করেছে।

অনেকক্ষণ পার হয়ে যায় তবু কথা বলে না শিশির। সিতার বিড়ম্বনা তার মনের শান্তিকে পীড়িত করে তোলে। আঘাত দিয়ে, খুঁচিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রত্যয় জাগিয়ে তুলবে—এই মানুষের মতি সে-ধাতুতে গড়া নয়। তাই তার নাগাল পাওয়া যায় না। ভুল শোধরাতে, নতুন করে বুঝতে, আত্মরক্ষা করতে, নিজেকে জাহির করতে, অধিকার অর্জন করতে ও রাখতে—এ

সবের কোন কায়দা নেই শিশিরের। এই অস্বভাবী মনের কাছে সমাদরেরই বা কি মূল্য আছে? যে জিনিসের যাচাই হওয়া সম্ভব নয়, তার খাঁটিত্ব বিচার কি করে হয়?

সিতা বললো।—কি ভাবছেন?

শিশির।—এবার যেদিন আসবে, জয়ন্তবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এস।

সিতা।—তাতে আপনার লাভ কি?

উত্তর দিতে গিয়ে কথাগুলি কতখানি রুক্ষ হয়ে উঠলো, সিতার বোধহয় সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

শিশির।—তাঁর সঙ্গে তুমিও আসবে, এই আমার লাভ।

সিতার সুন্দর মুখ কাতর হয়ে উঠলো। মনের গহন থেকে যেন একটা জ্বালাকর বেদনার আঁচ এসে লেগেছে মুখের ওপর। যত সংকোচ ও অভিমান যেন অনুশোচনায় পুড়তে আরম্ভ করেছে। সিতা উঠে গিয়ে শিশিরের পাশে দাঁড়ালো।—তুমি বলতে বড় দেরি করে দাও শিশির। আগে তোমার গান শেষ হবে, তারপর নির্লজ্জের মত আমাকে সব স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, তারপর তোমার সব মনে পড়বে। সিতাকে তোমার চোখে পড়ে সবচেয়ে শেষে। শুধু এইটুকুই তোমার ভুল। নইলে তোমার চেয়ে প্রিয় আর আমার কি থাকতে পারে শিশির!

সিতা অবসন্ন হয়ে একটা সোফার কাঁধে ভর দিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে রইল। আর বেশীক্ষণ থাকলে পড়ে যাবে। ডুবন্ত মানুষের মত একটা অসহায়তার মধ্যে সিতা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শিশির সিতার হাতটা শক্ত করে ধরে সোফার ওপর বসিয়ে দিল।

সব ক্ষোভ শান্ত হয়ে যায়। সিতা যেন এতক্ষণে একটা আশ্রয় লাভ করে। তটস্থলীর মত কঠিন ও স্পষ্ট এই আশ্রয়।

সিতা বলে।—শুধু মুখের কথায় আমাকে গানাৎ পরতর বলছো, কিন্তু কাজের বেলার উল্টো। আমি চাই...।

শিশির।—কি?

সিতা।—আগে আমি, তারপর তোমার গান।

শিশির।—পার্থক্যটা কোথায়?

সিতা—অনেক পার্থক্য। আজ যদি তুমি গান ছেড়ে দাও, তুমি বেসুরো হয়ে যাও, তোমার গলা খারাপ হয়ে...

শিশির।—কি বলছো সিতা! এসব কথা বলতে তোমার বাধছে না একটুও?

সিতা শিশিরের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো—গানকে খুব বেশী বিশ্বাস করে বসে আছ তুমি। সেটা তোমার ভুল।

শিশির অপ্রস্তুত হয়ে বসে থাকে। সিতার কথাবার্তা আচরণের অর্থ তার কাছে ক্রমেই বোধাতীত হয়ে উঠছে। তার মধ্যে এতগুলি ভুল কবে আবিষ্কার করলো সিতা?

সিতা।—একটা জিজ্ঞাস্য আছে। জয়ন্তবাবুর ওপর তোমার হিংসা হয় না?

শিশির।—হিংসা? ছি ছি, হিংসা করবো কেন?

সিতা।—আচ্ছা আমি চলি এবার।

শিশির সেইখানেই দাঁড়িয়ে শুনলো, বাইরে মোটরগাড়ির হর্নের শব্দ বাজছে। জয়ন্তবাবুর গাড়ি নিশ্চয়। নেটের গোলাপী পর্দাটা সামনের দরজার ওপর স্থির হয়ে ঝুলছে। সিতা নেই। সিতার চলে যাবার চাঞ্চল্যটুকুর কোন রেশ পর্যন্ত পর্দার মধ্যে নেই। একটা স্থিরতার সমাধির মত ঘরটা চুপ হয়ে গেছে।

গানকে বিশ্বাস করতে মানা করে দিয়ে গেছে সিতা। শিশিরের চিন্তার ভেতর এক বছরের একটা ইতিহাস বর্ণায়িত হয়ে ওঠে। বৌদির মামাবাড়ি সম্পর্কে সিতা তার আত্মীয়া হয়। গত

বছর চেঞ্জে ডালহৌসী যাবার পথে বৌদি ঢাকা থেকে কলকাতায় একবার এসেছিলেন। বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সিতা। তাই সিতার সঙ্গে দেখা হলো শিশিরের—জীবনের প্রথম দেখা। বৌদি যেসব ঠাট্টা করেছিলেন, তা সবই মনে আছে শিশিরের। আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বৌদি বললেন—এইবার দেখবো গুণী মানুষের সুরের জালে সিতার মত মেয়েকে যদি ধরতে পার তবেই বুঝবো তুমি পাকা জালিয়াত।

বৌদি সব কথাই খুলে বলেছিলেন। সিতার বাবার আভিজাত্য একটু বেশী প্রখর। ভাবী জামাইয়ের জন্য তিনি বিলেতের দিকে অথবা কোন বিলিতী গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাজেই তাঁর কাছে প্রস্তাব করে কোন লাভ হবে না। সিতা মেয়েটি যদিও একটু ছটফটে, তবুও ওর মনটা বড় সরল। ফিলসফিতে এম-এ নিয়ে পড়ছে, কিন্তু তাতেও ওর ছেলেমানুষি ঘোচেনি। দর্শনের ভার যেন সইতে পারে না সিতা।

বৌদি যেন শিশিরের কানে কানে এক নতুন জাদুমন্ত্র শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—সিতার বাবা আর সিতা অনেক তফাত। সিতা কোন বড়মানুষির ধার ধারে না। ওর এখন মনমানুষি করার বয়স। মাথায় কিছু ঢুকলো সুরসাধক? নাও, এবার একটা গান গাও।

বৌদির নির্দেশ উপেক্ষা করতে শিশিরের সামর্থ সেদিন আর হয়নি। গান শেষ হলে বৌদি জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগলো সিতা?

সিতা।—সুন্দর।

বৌদি তাঁর চিকিৎসার সফলতায় মনে মনে খুশিতে ও কৃতার্থতায় গর্বিত হয়ে উঠছিলেন। তারপর সিতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কত কথা বললেন, তার কিছুই শোনেনি শিশির। অনুমানে বোঝা যায়।

ডালহৌসী যাবার পথে বৌদি যেন হঠাৎ এসে শিশিরের নিরালা ও একাকিত্বের জীবনে নতুন একটা গুঞ্জন ছেড়ে দিয়ে গেলেন। যাবার সময় পর্যন্ত বলে গেলেন।—সিতা তোমার গুণমুগ্ধা। আমার কর্তব্য এইখানে শেষ। এইবার তোমার কর্তব্য আরম্ভ। ভুল হয় না যেন।

সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটা আজও শিশিরের মনের মধ্যে একটা উৎসবের স্মৃতির মত জেগে আছে। গানের ভেতর দিয়েই সিতার আবির্ভাব। সিতা গুণমুগ্ধা।

আজ মনে হচ্ছে, সেই সুর ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গুণীর সঙ্গে সিতার হৃদয়ে একটা আড়ির ভাব দেখা দিয়েছে। গানের সঙ্গে তার যেন একটা বৈরিতা ও বিরোধ। আজ সিতা বলতে চায়, তার কাছে শিশিরের গানটা কিছু নয়।

ভাবতে গিয়ে শিশিরের মাথা ধরে এল। কপালের একটা পাশে রগগুলি দপদপ করছে। সিতা নিজের থেকেই এক আশ্বাসের পসরা নিয়ে তার মনের পথ জুড়ে বসলো, আবার নিজেই সেই আশ্বাস মিথ্যে করে দিচ্ছে।

সিতা বলে গেল, তার নাকি ভুল হচ্ছে। বৌদি অনেকদিন আগেই বলে গিয়েছিলেন—ভুল হয় না যেন। ভুল খুঁজতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে শিশির, কোন হদিস পায় না।

জানালাটা খুলে দিল শিশির। আশ্বিনের এই স্বচ্ছ দিনটার আলোর প্রসন্নতা আসুক ঘরের ভেতর। নইলে সব যেন বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে। সিতা যদি আর না আসে? গুণীর জীবনে না-চাওয়া উপহারের মত সিতা নিজেই এসেছিল। আজ সিতা শুধু হিসেব করছে—তার নিজেরই মহত্ত্বকে সে অসম্মান করছে।

শিশিরের বার বার শুধু মনে পড়ছিল—সিতা যদি আর না আসে। তার এত সাধের কল্পনার রাগ-মহাদেশ অপমানে আবর্জনা হয়ে যাবে। সিতা বুঝতে পারছে না, কতখানি ক্ষতি ও শাস্তি রেখে গেল সে।

শিশির দেখছিল, মাঠের ওপর চাটাই দিয়ে একটা মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। পাড়ার দুর্গোৎসবের আসর। সকাল থেকে ছেলেপিলে আর নরনারীর ভিড় লেগেছে সেখানে। সানাই

বাজছে।

বিষাক্ত সুর। সানাইয়ের আলাপটা যেমন কর্কশ, তেমনি তার মধ্যে তাল মানের বালাই নেই। সানাইটা যেন কুৎসিত চীৎকার ক'রে আজকের সকাল বেলার এক অসহায় ভৈরবীর হাত পা কামড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

আর বেশীক্ষণ শোনা অসম্ভব। চারদিকে আজ অ-সুরের আক্রমণটাই প্রকট হয়ে উঠছে। সিতা যেন আজ সকালে এসে আগেভাবেই এই সংকেত জানিয়ে দিয়ে গেছে। এইবার নাদসমুদ্রের সব সরসতা শুকিয়ে যাবে, ঢেউগুলির অকাল মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, চারদিক থেকে একটা কটুমন্দ্রে মারী জাগবে। ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিল শিশিরের।

শিশির ঘর ছেড়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসলো। এখনি একটা সাইরেন বাজুক, এই সুরহীন কুৎসিত ভিড়টার ওপর একটা জাপানী বোমা এখুনি ফেটে পড়ুক। সব শেষ হয়ে যাক সানাইটার চীৎকার থেকে তবু রেহাই পাওয়া যাবে।

পথ দিয়ে একটি ছেলে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। দেখে বুঝতে পারা যায়, ছেলেটি এই দুর্গোৎসবের একটি উদ্যোগী কর্মী। শিশির ডাকলো।—শোন ভাই।

ছেলেটি এগিয়ে এসে বললো—বলুন।

শিশির।—দয়া করে তোমরা ঐ সানাইটা বন্ধ করাতে পার?

ছেলেটি হাসলো।—শুনতে খুব খারাপ লাগছে আপনার?

—আর বলো না, অসহ্য।

—কি করবেন বলুন, এবারকার পুজোয় পীরপুরের হরু ডোমকে পাওয়া গেল না। শুধু হরু ডোম কেন, তার ছেলে নিতাই, তার ভাই শ্যামু, এমন কি হরুদের গাঁয়ের কোন সানাইওয়ালাকে পাওয়া গেল না, তাই কোন মতে অনেক চেষ্টা করে অন্য গাঁ থেকে একটা আনাড়ী ধরে এনেছি। পুজোয় একটা কিছু না বাজলে উৎসব বলে যে মনেই হয় না।

—হরু ডোমের কি হয়েছে? ওদের পাওয়া গেল না কেন?

—আর কোন কালেই পাওয়া যাবে না। সব খতম হয়ে গেছে। এই দুর্ভিক্ষে ওরা সব মরে গেছে।

কর্মী ছেলেটি ব্যস্ত হয়েই চলে গেল।

বালিগঞ্জ যাবার পথে দশ নম্বর বাসটা শেয়ালদার মোড়ে যাত্রী নেবার জন্য কিছুক্ষণ থামে। বহু যাত্রী নেমে যায়, তার চেয়ে বেশী যাত্রী উঠে আবার মোটর বাসের উদর কৃমিসংকুল করে তোলে। যাত্রীদের তাড়াহুড়া সন্ধ্যে হলেই সব চেয়ে বেশী মারাত্মক।

দশ নম্বর বাস নিয়মিত যাত্রী বহন করে ; এর মধ্যে এমন কিছু বিচিত্রতা নেই। কিন্তু তত্ত্ব আছে—বঙ্গীয় সমাজতত্ত্ব বললে খুব বেশী ভুল হবে না।

বাসের মধ্যে পেছনের সীটে ইন্দ্রনাথ বসে অনেক কথা ভাবছিল। টাউনহলের জনসভা থেকে এইমাত্র সে ফিরছে। টাউন হলের বাঙালী বক্তাদের বাক্‌বৈখরী দেখলে অতি বড় সংশয়বাদীরও বিচার ঘুলিয়ে যায়। মনে হয় বাঙালী জাতির রক্তে যেন একটা ঝড় লুকিয়ে আছে ; সুযোগ পেলেই এই ঝড় অনায়াসে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। বিদেশী ইংরাজ শাসকের মত সেয়ানা সম্প্রদায়ও এই টাউন হলের বাচনিক আঁধি দেখে অনেক সময় আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ে। তারা রজ্জুতে সর্পভ্রম করে। ইংরেজ ভুল করে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বলেই, টাউনহলী রাজনীতিকেই বাঙালীরা একটা অস্ত্র ঠাউরে বসেন।

টাউন হলে নয়, দশ নম্বর বাসের যাত্রী হয়ে শেয়ালদার মোড়ে এসে ইন্দ্রনাথের মত একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে শহরে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের হাড়মাংসটুকু পর্যন্ত দেখা হয়ে যাবে।

বাসের দরজার মধ্যে একটা স্টেলমেট অবস্থা। পাঁচজন যাত্রী নামবে আর গোটা দশেক নতুন যাত্রী উঠবে। বাসের ভেতর জায়গা এখনো প্রচুর আছে। পনের জনও উঠতে পারে—একটু ঠেসাঠেসি হবে এই যা।

দরজার কাছে দুটো মারামারি আরম্ভ হলো। একটা দরজার সিঁড়ির ওপরে—উতরনে-ওয়ালা যাত্রী বনাম জন চারেক উঠনে-ওয়ালা। আর একটা মারামারি সিঁড়ির বাইরে রাস্তার ওপর—উঠনে-ওয়ালাদের মধ্যে, কে আগে উঠবে এই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি। একটা মহিলা ভীরু পতঙ্গের মত এক একবার এই মানবব্যূহের ভেতর দিয়ে গাড়িতে ওঠার আশায় এগিয়ে আসছেন, কিন্তু মোটা মোটা কনুইয়ের পৌরুষ দেখে ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

এরা সবাই ভদ্রলোক—বৃদ্ধ প্রৌঢ় ও যুবক। এদের মধ্যে সব শ্রেণীর মানুষই আছেন—ধনবান, মধ্যবিত্ত, অল্পবিত্ত। এদের পরিচ্ছদে সুরুচির পরিচয় আছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের একটা অধ্যায় বোধ হয় এদের কাছে এখনো একেবারে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। যাত্রী বদল করতে বড় জোর তিন মিনিট সময় লাগতো, সেক্ষেত্রে তের মিনিট সময় চীৎকার ধাক্কাধাক্কি গালিগালাজের একটা তাণ্ডব সৃষ্টি করে এক একটি গলদঘর্ম ভদ্রলোক বাসের ভেতর কৃতার্থভাবে ঢুকলেন। মহিলাটি উঠলেন সবার শেষে।

বাস চলতে আরম্ভ করলো। ইন্দ্রনাথ এই দৃশ্যটাকে মনে মনে নানা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বিশ্বাস্য একটা হেতু আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করছিল। কেন এমন হয়? এঁরা সবাই শিক্ষিত, অথচ মানুষের রীতিতে বাসে উঠবার মত অতি নগণ্য একটা সামাজিক আচরণের প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও এঁদের চরিত্রে কেন সত্য হয়ে উঠতে পারেনি?

টাউন হলের জনসভায় আজ যে সঙ্ঘের পত্তন হলো, তার বহুবিধ কর্তব্য ব্রত ও দায়িত্বের সুবিশাল ফর্দটি একটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মত ইন্দ্রনাথের মনের চোখে ভাসতে লাগলো। সেই সঙ্ঘে আজ যারা সভ্য হিসাবে নাম লেখালো, কর্মী হয়ে যোগ দিল—যারা চাঁদা দিল, যারা আশীর্বাদ অভিনন্দন জানালো—তারা সবাই দশ নম্বর বাসের যাত্রীদের সমগোত্র।

জাগৃতি সঙ্ঘের কথা মনে পড়ছিল ইন্দ্রনাথের। উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতা আছে সন্দেহ নেই। তাঁর দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা নতুন জাগরণ আনতে চান। তাঁরা বন্যাতে দুঃখ ঘোচাবেন, খাদ্যসংকটে অন্ন যোগাবেন, নতুন গান গাইবেন, নতুন কবিতা রচনা করবেন, নতুন গল্প লিখবেন। নতুন করে নাটক লিখবেন আর নতুনভাবে অভিনয় করবেন এঁরা। সারা দেশের সাংস্কৃতিক রূপকে এঁরা ঢেলে সাজাবেন। এঁরা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা চান। পৃথিবীর গণমুক্তির আদর্শকে এঁরা শ্রদ্ধা করেন। তাই যুদ্ধ-তত্ত্বও এঁদের বিচারের বাইরে যায়নি। এঁরা মনে করেন—এই যুদ্ধে মানবতার শত্রু ফাসিস্তির ধ্বংস হোক আগে ; তারপর বিশ্বজনতার মুক্তির ঝাণ্ডা ওড়াবার সুদিন দেখা দেবে। বাধা দেবার কেউ থাকবে না। তাই এঁদের বলতে দ্বিধা নেই—এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ।

কিন্তু সবার উপরে সোভিয়েট রুশিয়া সত্য, তাহার উপরে নাই। এ মন্ত্র একেবারে নতুন মন্ত্র। লোকের বুঝতে কষ্ট হয়। হোক, প্রত্যেক নতুনকে মানুষজাতি চিরকাল দেরিতে বুঝেছে।

ইন্দ্রনাথও জাগৃতি সঙ্ঘের সভ্য। তার মত চিরকালের কর্মী মানুষের কাছে কোন কাজের আহ্বান উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য। টাউন হলের জনসভায় জাগৃতি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠায় দলে দলে বন্ধুরা যোগ দিয়েছে। তাদের অনেককে চেনে ইন্দ্রনাথ। তারা সবাই ফ্যাশানেবল্ বুলিবাজ নয়। আরও কত অচেনা মুখ—তাদেরও উৎসাহের অন্ত নেই। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। সিতা বসুর মত নাম-করা ছাত্রী সঙ্ঘের আহ্বানে সাড়া দিল। একদল কবি ও সাহিত্যিক সানন্দে সঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। প্রকাশবাবু আছেন। উর্মিলা কাঞ্জিলাল আজই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সঙ্ঘে যোগ দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

দশ নম্বর বাস তখন মৌলালি ছাড়িয়ে সার্কুলার রোডের গোরস্থান ঘেঁষে অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে চলেছে। ইন্দ্রনাথের মন অনেকখানি শান্ত হয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারলো, এতক্ষণ একটা ক্ষমাহীন উত্তেজনা তার চিন্তা গ্রাস করে বসেছিল। বাসযাত্রীদের ইতরতা দিয়ে সব কিছু বিচার করা উচিত নয়। জাগৃতি সঙ্ঘে আজ যারা যোগ দিল, তারা সবাই এমন কিছু নরোত্তম নয়। তবু দশে মিলে কাজ করার একটা সুযোগ যদি পাওয়া যায়, দূরে সরে থেকে লাভ কি? দশে মিলে ভুল করার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে।

কিন্তু এহেন সঙ্ঘের মধ্যে জয়ন্ত মজুমদার কেন? ইন্দ্রনাথ একটু হতবুদ্ধি হয়েই বার বার তাকিয়ে দেখছিল জয়ন্তকে। লোকটা একটা কসাক টুপি মাথায় দিয়ে এসেছে। হাতে একটা ফাইল। বোঝা গেল, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগপর্বে তারও কিছু হাত আছে।

ঠিক সে সময় প্রকাশবাবুকে যদি দেখতে না পাওয়া যেত, তবে ইন্দ্রনাথ বোধ হয় তখুনি সভা ছেড়ে চলে আসতো। ডায়াসের পাশে ঘোরাফেরা করছিলেন প্রকাশবাবু। সেই চিরকালের সাদা-সিধা মুখচোরা মানুষটি। শীর্ণ শরীরটা খদ্দরের চাদরে জড়ানো। সদাহাস্যে মুখখানা উজ্জ্বল। ইন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে যেতেই বলে গেলেন—তুমিও এসেছ। জয়ন্ত মজুমদারকে দেখার যন্ত্রণা প্রকাশবাবু যেন একটি কথায় নিরাময় করে দিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত মজুমদারকে দেখার মত বিদ্‌ঘুটে লেগেছিল আর একটা দৃশ্য। পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র থেকে গোটাচারেক ভদ্রলোক কড়া লাল সেলাম দেগে মারি-মারি খাই-খাই গোছের নিরর্থক কতকগুলি বক্তৃতা করলেন। এই সঙবাজেরাই দর্শকদের কাছে কান-ফাটা হাততালির বাহবা পেলেন সব চেয়ে বেশী? এঁদের স্বরূপ কতকটা চেনে ইন্দ্রনাথ। আগে কয়েকবার এঁদের দেখবার সুযোগ হয়েছে, তাই চেহারাগুলি পরিচিত। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে শুধু গণ্ডগোল আর উপদ্রব করে এঁরা কেউ কেউ বিখ্যাত হয়েছিলেন। যাক, তাতে কিছু আসে যায় না।

ইন্দ্রনাথের চোখে পড়লো—মেয়েদের সীটে পাশাপাশি দুটি বৃদ্ধা বসে আছেন। তার মধ্যে একটি বাঙালী বিধবা, অপরটি হিন্দুস্থানী মহিলা—গরিব গোছের চেহারা ; বোধ হয় কোন ডাল-ওয়ালার মা।

খাকি শার্ট গায়ে রোগা চেহারা একটি ছেলে বুড়ীদের সামনেই পুরুষদের সীটে প্রথম দিকে বসেছিল। ছেলেটির বয়স বাইশ তেইশের বেশী নয়। বাঙালী বিধবা বললেন—নরেন নাকি।

ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে বললো।—হাঁ, আপনি কোথায় চললেন?

—কি রকম ছেলে গো তুমি, না বলে ক'য়ে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে রয়েছ? তোমার পিসে খুঁজে খুঁজে কি হয়রানিই হচ্ছে।

ছেলেটি চুপ করে বসে রইল। হিন্দুস্থানী বুড়ী কৌতূহলী হয়ে বিধবা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলো।—বাড়ি থেকে ছেলেটি ভাগিয়েছে কেন?

বিধবা।—যুদ্ধে কাজ নিয়েছে গো। মাইনে বেশী পাবে তাই।

হিন্দুস্থানী বুড়ী গলার সুর সপ্তমে চড়িয়ে আপসোস করলো।—ছি-ছি-ছি প্রাণ থাকলে কত টাকা আসবে। কিন্তু প্রাণ গেলে মাইনে নিয়ে কার পূজা হোবে? তোমার বুদ্ধি খারাপ হইয়াছে গো ছেলে। এমন কাজ করো না। যাও ঘরে ফিরিয়ে যাও।

বিধবা বললেন।—আরও মুশকিল, মা নেই কি না। তাই তেমন করে বলবারও কেউ নেই। ছেলের মনেও কোন মায়ার বেড়ি নেই।

হিন্দুস্থানী বুড়ী প্রায় ধমক দিয়ে ঝাঁঝালো সুরে ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বললো।—হামি লোক কি মা নই? মা নেই তো কি হইয়েছে? লড়াইয়ে যেতে হবে? ছি ছি ছি!

ছেলেটি মিচকে মিচকে হাসছিল আর অন্যদিকে তাকিয়ে বুড়ীদের অনুযোগ শুনছিল।

হঠাৎ বাসযাত্রীদের পিলে চমকে দিয়ে একটি যুবকের চীৎকার শোনা গেল।—পঞ্চম বাহিনী! পঞ্চম বাহিনী। এই কণ্ডাক্টর, একদম বাঁধকে। বুড়ীকে পুলিসে দিতে হবে। অ্যান্টি-ওয়ার প্রপাগাণ্ডা করছে বুড়ী। বিশ্বাস নেই এদের।

ইন্দ্রনাথ যুবকটিকে চিনলো। গালভরা চাপদাড়িতে পায়জামা-পরা সিড়িঙ্গে চেহারাটা আরও বুনো দেখাচ্ছে। এই পাগলটাই আজকের জাগৃতি সঙ্ঘের উদ্বোধনে একটা কবিতা আবৃত্তি করেছে। যতদূর মনে পড়ে, নামটা বোধ হয় রণজিৎ দে বা দত্ত হবে।

বিস্মিত বাসযাত্রীরা রণজিতের চীৎকারের অর্থ বুঝতে না পেরে শুধু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো। হিন্দুস্থানী বুড়ী বুঝতে পেরেছে—অভিযোগটা তারই উদ্দেশে। বুড়ী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে একটা হিংস্র চীৎকার ছাড়লো।—কি বলছিস রে বেইমানকা বেটা? কাকে পুলিসে দিবি? তুই কার দাড়ি চুরি করে চলেছিস রে চোর, পাজী...।

ইন্দ্রনাথ একটা লজ্জাকর অস্বস্তিতে মুখ নীচু করে হাসতে লাগলো। কবি রণজিৎ যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ আতঙ্কগ্রস্তের মত বুড়ীর দিকে স্থিরদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। পার্ক স্ট্রীটের মোড় আসতেই প্রায় একটা লম্ফ দিয়ে নেমে পড়লো রণজিৎ।

পাশের ভদ্রলোক হাঁপ ছেড়ে বললেন—পাগল বোধ হয়।

গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস থামলে নেমে পড়লো ইন্দ্র। মেঘলার জন্য অন্ধকারটা একটু বেশী ঘোরালো হয়ে উঠেছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাঝে মাঝে বৃষ্টির কুচি ছুটে এসে পড়ছে।

জোছু অর্থাৎ জ্যোৎস্নার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। জ্যোৎস্নার দাদা অবনীনাথের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের সম্পর্কটা নিছক সখ্যতার বন্ধন—ছেলেবেলা থেকেই। অবনীনাথ ঠাট্টা ক'রে জোছুকে ইন্দ্রনাথের পলিটিক্যাল মক্কেল নাম দিয়েছিল। অবনীর সঙ্গে বিতণ্ডা সৃষ্টি করে ইন্দ্রনাথ যখন হাঁপিয়ে পড়তো, তখন অবনীকে ছেড়ে দিয়ে ডাক পড়তো অরুণা ও জোছুর। —এস জোছু, আসুন বৌদি। আপনারাই বুঝবেন ভাল। ওকে বাদ দেওয়াই ভাল। অফিস লেজার আর একগুঁয়েমি নিয়েই ওর দিন কেটে যাক।

অরুণা শান্তভাবে হেসে হেসে বলতো—যাই বলুন, কত কি কাণ্ড তো করলেন আপনারা। কিন্তু কি লাভ হলো? বোমা, বয়কট, চরকা, হরতাল, ধর্মঘট, মীটিং, মিছিল—শুধু জেলে যাওয়াই সার হলো আপনাদের। স্বরাজ তো চোখে দেখলাম না।

অবনীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ জবাব দিত—ঐ রকম মহাশয় ব্যক্তি যদি সংখ্যায় বেশী হয়, তবে স্বরাজ হয়ে বসেছে।

কাঁকুলিয়ার দিকে অনেকদূর এগিয়ে এল ইন্দ্র। আর পাঁচ মিনিট হাঁটতে পারলে অবনীর বাসাটা প্রথমেই পড়বে। মনের মধ্যে তার প্রতিজ্ঞাটাকে আর একবার ভাল করে সেধে তৈরি করে নেয় ইন্দ্র। অবনীদের বাড়িতে গিয়ে আজ একটা হৈচৈ বাধাতেই হবে। অবনীর একলা স্বভাবের গোঁয়ার্তুমি ভাঙতে হবে। অরুণা বৌদি আর জোছুকেও আজ কোন কথার ফাঁকির আড়ালে সরে থাকতে দেওয়া হবে না। ওদের সবাইকে জাগৃতি সঙ্ঘের মধ্যে টেনে আনতে হবে। অবনী হয়তো ভয়ানক রকমের প্রতিবাদ করবে, ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। আজ কোন আপত্তি গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না ইন্দ্র। অবনী সাধ করে গণ্ডী দেগে তার নিজের একটা পৃথিবী তৈরি করে নিয়েছে ; দিন দিন সিনিক হয়ে পড়ছে। সংসারী অনেকেই হয়, কিন্তু অবনীর মত প্রতিভাবান মানুষের সংসারযাত্রা একটু অন্য রকমের হওয়া উচিত ছিল। অফিস বাজার আর ঘর ছাড়া একটু বাইরে গেলেই অবনীর চৈতন্য যেন কোন আলো সইতে পারে না। অবনীর এই পেচক মনোবৃত্তি ভাঙতে হবে।

ইন্দ্রনাথের সেই বিশ্বাস আজও অটুট আছে যে তার দাবী এ বাড়িতে এককথায় উপেক্ষিত হবার মত নয়। আর একটা দাবী, দাবী কেন, সহজ সত্য—এ বাড়িতে বহুদিন আগেই স্বীকৃত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ যদি আপত্তি না করে এবং জোছু যদি মুখ ফুটে একবার হাঁ

জানায়, তবে অবনী ও অরুণা খুশী হয়েই ওদের দুজনকে জীবনের পথে মিলিয়ে দেবে। আজও বোধ হয় সেই দাবী অসত্য হয়ে যায়নি ; কিন্তু সেই প্রশ্ন ওঠবার আর কোন অবকাশ নেই, কেননা সেই পথ আজ অস্পষ্ট। বহুদিনের ব্যবধানে ও নীরবতায় সে-কাহিনী আজ যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। জেল আর আন্দোলন আর জেল—সংগ্রাম ও নির্বাসন পালা ক'রে কত পরিণামের চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে ইন্দ্রনাথের জীবনে। প্রথম অনুরাগের কল্পনা শুধু কটি দিনের জন্য এক নবোঢ়ার সাড়া দেখতে পেয়েছিল ; কিন্তু প্রথম পাখির ডাক শোনবার আগেই তাকে সরে যেতে হয়েছে। ঘটনার শঙ্খনাদ আজ তাকে বহু দূরে নিয়ে ফেলেছে।

সেসব কথা ভাবতে গেলে আজও মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ে ইন্দ্র। সুখের কথা, খুব বেশী করে মনে পড়ে না। জীবনে নানা লাভ ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ সত্যি করে আজও কোন ক্ষতি দেখতে পায় না। জোছু দূরে সরে গেল, এটাও ঠিক কোন ক্ষতি নয়। একটা লাভ হতে চলেছিল শুধু, একটা শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠতো—সেটা আর হলো না।

দরজা খোলাই ছিল, কড়া নাড়তে আর হলো না। মধ্যের ঘরটা পার হয়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো ইন্দ্রনাথ।

অবনী বাইরের ঘরে চুপ করে বসেছিল, ইন্দ্র এসেছে জানতে পেরেও সাড়া দিল না। জোছু একবার সামনে এসে দাঁড়ালো মাত্র। তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কি এমন পড়ার তাড়া তা সে-ই জানে!

আর বেশীক্ষণ এখানে থেকে লাভ কি? কেউ তো স্পষ্ট ভাষায় চলে যেতে বলবে না। কিন্তু গৃহবাসীর এই সসংকোচ মৌনতা আর সসম্ভ্রমে আলগোছে সরে থাকার চেয়ে স্পষ্টতর নির্দেশ আর কি হতে পারে?

অগত্যা ইন্দ্রকে উঠতে হলো। যাবার সময় একটা লৌকিকতার ফাঁকা হাঁক দিল শুধু—যাই বৌদি।

রান্নাঘরের ভেতর এতক্ষণ অদৃশ্য হয়ে ছিল অরুণা—অবনীর স্ত্রী। ইন্দ্রনাথের হাঁক শুনে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তারপর এগিয়ে দরজাটা পর্যন্ত এল—তার বেশী নয়। আজ অরুণার সামাজিকতার সীমানা ঐ পর্যন্ত। ছেঁড়া শাড়ি পরে আছে, তার জন্য নয়। ইন্দ্রকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করে বসতে বলার মত সামর্থ নেই। আজ পাঁচ বছর ধরে ইন্দ্রনাথ এ-বাড়িতে আসছে—পুজো-পরবের দিনে, অসুখের সময়, ছুটির দিনে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গড়পারের মেসে যাবার আগে, সটান এ-বাড়িতেই এসে স্নানাহার করেছে ইন্দ্র। অন্তত এক কাপ চা না খেয়ে ইন্দ্র চলে গেছে, এমন অকল্পেয় ও অশোভন ঘটনা কখনও ঘটেনি! কিন্তু আজ তাই ঘটলো।

জাগৃতি সঙ্ঘের একটি নতুন মশালের মতই আজ সোৎসাহে অবনীদের বাড়িতে ঢুকেছিল ইন্দ্রনাথ, কিন্তু ঢোকা মাত্রই যেন নিভে গেল। সারা বাড়ির আলাপী মনটা যেন আব্রু দিয়ে রয়েছে। কিছু ঠাউরে উঠতে পারছিল না ইন্দ্র। কেউ কাছে আসতে চাইছে না, এক কাপ চা পর্যন্ত না। ইন্দ্রনাথের সংশয়দগ্ধ মন চকিতে একটা বাস্তব সত্যের আঘাতে চমকে উঠলো। তাই কি? এক কাপ চা পর্যন্ত ওরা আজ দিতে পারে না? এই অসামর্থের জন্যই কি আজ এখানে সকল প্রীতি কুণ্ঠিত? ইন্দ্রনাথের মনে হলো, আজ এখানে তার উপস্থিতি নিছক শান্তিভঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

—না, আজ আর চা খাব না বৌদি। কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে দিয়েই পথে নেমে পড়লো ইন্দ্র। কাঁকুলিয়া রোডের নিরালায় এই বাড়িটা তার জন্য ইন্দ্রনাথের কাছে সেই মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল না—হতে পারে না। জোছু পরীক্ষার পড়া পড়ুক, অবনী বাইরের ঘরের অন্ধকারে তার অভিমান নিয়ে বসে থাক, অরুণা বৌদি দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। এরা

কেউ দোষ করেনি, ভুল করেনি। যা হবার তাই হতে চলেছে।

কিন্তু আশ্চর্য এই অবনী! একটাও কথা বললো না কেন? অবনীর এই সংকোচ অত্যন্ত বিসদৃশ। ইন্দ্রনাথের হঠাৎ সন্দেহ হয়, অবনীর জীবনের মতবাদটা এখনো নিশ্চয় পুরনো হিংস্রতায় অন্ধ হয়ে আছে। নতুনকে দেখতে চায় না, নতুন কিছু শুনলেই চটে যায়। ইন্দ্রনাথ যে পলিটিক্সের এক নতুন তত্ত্ব ধরেছে, তার পায়ের শব্দেই যেন সেকথা জেনে ফেলেছে অবনী। তাই কি অবনী চুপ করে রইল? অবনী কি চায় না যে, সে এখানে আসে? বেশ তাই হোক। ইন্দ্রনাথ জানতো, এ ভুল করবে অবনী। এ ভুলের একদিন প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে অবনীকে। ছেলেবেলা থেকে শুরু দুজনের কর্মীজীবনের ইতিহাসে বহু বিরোধের পরীক্ষায় শুধু আঘাত দিতে গিয়েও তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। শত্রুতাও কত মুখোমুখি ছিল। আজ কিন্তু অবনী একেবারে মুখ লুকিয়ে ফেলছে। মুখ দেখতে চায় না, অথবা দেখাতে চায় না। এ কী ভয়ানক সংশয় অবনীর?

ইন্দ্রনাথ চলে গেল।

রোমাঁ রোলাঁ নাকি হিসেব তৈরি করেছিলেন--গত মহাযুদ্ধে একা ফ্রান্সের ক'হাজার শিল্পী সন্তান মারা গিয়েছিল। ফ্রান্সের মাটিতে যব বার্লি আর জলপাই ফলাতে লোকের অভাব পূর্ণ করা যেতে পারে--ভাল ভাল যন্ত্রের লাঙ্গল দিয়ে, ভিন্ দেশের চাষী এনে। কিন্তু ফরাসী হৃদয়ের সুর শোনাতে, ফরাসী কামনার ছবি রাঙিয়ে তুলতে যাদের দরকার, তারা একেবারেই চলে গেল। সে অভাব পূর্ণ হবে কি দিয়ে?

শিশির ভাবছিল--দুর্গোৎসবের ভলান্টিয়ার ছেলেটি যা বলে গেল, তার অর্থ কি? এই অধম বাংলাদেশের ততোধিক অধম একটি পাড়াগাঁয়ে হরু ডোমের মত সানাইওয়ালারা মরে গেছে। কত মানুষ কত রকমের পণ্য বেচে পয়সা করে--ভেজাল ঘি থেকে আরম্ভ করে চোরাই চরস। তারা সবাই বেঁচে আছে। হরু ডোম ছিল সুরবণিক। এক ডালা মুড়ির বদলে তার কাছে ক্ষণিকের জন্য জগৎ বদলে নেওয়া যেত। কত শিশুর জন্মদিনে তার সানাই সুর ছড়িয়ে সূর্যরশ্মির সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে, কত ভীরু নববধূর স্বামীগৃহ যাত্রায় পালকি চলার পথটুকু সান্ত্বনায় ভরে দিয়েছে হরু ডোমের সানাই। কত বিবাহের মিলনরাত্রি সুস্বরে মধুর করে দিয়েছে। সেই হরু ডোমের সানাই আজ খুন হয়েছে। আর বাজবে না। প্রতি সুলগ্নকে শব্দের মালা দিয়ে বরণ করতে সে আর নেই। জীবনে এই প্রথম যেন দেশের একটা ক্ষতির বেদনাকে হৃদয় দিয়ে ভাবতে পারলো শিশির।

হরু ডোমের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, জীবনে বোধহয় এই প্রথম পরের কথা ভাবলো শিশির। অন্নাভাবের বিপাকে কত নিরীহের প্রাণ প্রতিদিন বাংলাদেশের ঘরে পথে মাঠে প্রতি মিনিটে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন খবরের কাগজে সেসব বিবরণ পড়ে কিছুক্ষণ মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির উপদ্রব চলতো। তার বেশী নয়। কিন্তু আগে যেন আত্মীয়বিয়োগের মতো এই দুঃখে একটা ক্ষতি আবিষ্কার করেছে। ফ্রান্সের শিল্পীরা বন্দুক হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হরু ডোমের গায়ে কোন উর্দি ছিল না, হাতে বন্দুক ছিল না। নিতান্ত নন-এসেন্সিয়াল জীব। তার সানাই নিয়ে সে তার ঘরে বসেছিল। তবু সে নিস্তার পায়নি। তাকে মরতে হয়েছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে একটা উলুখড়ের প্রাণ গেছে। এক লক্ষ গেলেই বা ক্ষতি কি? অক্টারলোনি মনুমেণ্টের ছায়া তার জন্য একটুও শিউরে উঠবে না।

অন্নাভাবের প্রসঙ্গে যুদ্ধের কথাটা অবান্তর নয় কি? হরু ডোমের মৃত্যুর প্রসঙ্গে অন্নাভাব কথাটাও তেমনি অবান্তর। হরু পেটের অসুখে মারা গেছে। থানার রিপোর্টে এই সত্য কথাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। এক একটি হোয়াইট পেপারের বিশুদ্ধ ভাঁওতায় সভ্য পৃথিবীর সমালোচনা বন্ধ করতে যখন ফ্যাক্টের প্রয়োজন হবে--তখন এই ক্ষুদ্র পীরপুর থানার

ডায়েরীটারই ডাক পড়বে আগে। হরু ডোমের জীবনটা যখন ভুয়ো, তখন এই ডায়েরীর লেখাটা ফ্যাক্ট বৈকি। পীরপুর থানার জমিদারেরাই আর একটু পোক্ত হয়ে ভারতসচিব হয়—তখন তার নাম হয় মিস্টার এমেরি।

শিশিরের মত নিরীহ শিল্পী-মানুষের মুখটাও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠছিল। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম প্রতিহিংসা।

হরু ডোমের কথাটা ভুলতে পারছিল না শিশির। তীক্ষ্ণ শলাকার মত ঘটনাটা তার এতদিনের সুরপ্রসন্ন শিল্পীমনের প্রত্যয়গুলিকে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে তুলছিল। ক্ষণে ক্ষণে একটা সংশয় জাগে, তার সাধের রাগ-মহাদেশের ধারণাটা একটা দিবাস্বপ্নের মত অলীক মনে হয়। কোথায় যেন একটা ভুল রয়ে গেছে। জীবনে এই প্রথম নিজেকে একবার সমালোচনা করে দেখলো শিশির।

কিন্তু শিশির তো এতদিন শুধু চোখ বুজে ধ্যান করেনি। তার সুরসাধনার উপচার জীবনের পথ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া। সারা ভারত ঘুরে যেখানে যা দেখেছে—ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছে শিশির ; সেই কুম্ভমেলায় ত্রিবেণীর চড়া থেকে আরম্ভ করে মেঘনার ডুবন্ত স্টীমারের বুকে দাঁড়িয়ে, চূর্ণরত্নের মত লক্ষ লক্ষ ধ্বনির কণিকা আহরণ করেছে সে। তবে ভুল হলো কোথায়?

সন্দেহ জাগে—ঐভাবে জীবন দেখা সত্যিকারের দেখা তো? দৌড়ন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরার জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে টুরিস্টেরা দেশের ছবি দেখে। সেটাও একরকমের দেখা। কিন্তু এই দেখাটা সত্য কি?

না, তা হতে পারে না। চোখ দিয়ে শুধু ছবি দেখা যায়। হৃদয় দিয়ে দেখা যায় প্রাণ। সেটাই সত্যিকারের দেখা। আজ হরু ডোমের পরিণাম সমস্ত বেদনা নিয়ে যেন শিশিরের দৃষ্টির বাঁধাপথের মোড় ঘুরিয়ে দিল। কান পেতে শোনা যায়, দুঃখের আঘাতে নিঝুম সারা জাতির চিত্তের কলবেণু বিচিত্র সুবে উথলে পড়ছে। রাগ-মহাদেশ জন্ম নিচ্ছে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম এক উপলব্ধির সাড়া শুনলো শিশির।

সিতা চলে যাবার দিন থেকে অহরহ একটা উদভ্রান্তিতে শিশিরের কাজ ও অবসরের মুহূর্তগুলি ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সিতা যদি অকারণে শুধু একটা দুর্ভেদ্য ছলনা রেখে এমনি করে সরে যায়--তাহ'লে আর রইল কি? আজ নিজের দুর্বলতা স্পষ্ট চোখে পড়েছে। সিতার ভালবাসার কাছে তার রাগ-মহাদেশের শ্রদ্ধাটুকু পর্যন্ত বন্ধক পড়ে গিয়েছিল। বড় ভুল হয়েছিল।

শিশিরের দুশ্চিন্তার বিষণ্ণ মূর্তিটা এই নতুন উপলব্ধির স্নিগ্ধতায় যেন স্নান সেরে নিয়ে বসে। দূরে নিকটে, দেখা অদেখা, তার আত্মার প্রতিবেশী শত শত দুঃখী সানাইয়ের সুর আজ তার অন্তরে সঙ্গ এনে দিয়েছে। তারপর? তার পরের অধ্যায় ভাবতে গিয়ে একটু গোলমালে পড়ে শিশির। কাজ করতে হবে এবং সে কাজটা কি, তাও সে জানে। সে গুণী, তাকে গাইতে হবে। শুধু প্রশ্ন, কোন সুরে আজি বাঁধিবে যন্ত্র? এইখানে সমস্যা। এইখানে তার রাগ-মহাদেশ রহস্যের কুঞ্জি। সে রাজসভার কবি নয়, দরবারের ওস্তাদ নয়, সিতা বসুর ভালবাসার উর্ণাজালে বাঁধা আর্তস্বর মাছির আত্মা সে নয়। তবে?

তার কাজ জনতার সেবা। সে এক চারণ মাত্র। মহারাজ অব্ গৃধ্রকুটুম্ তার জন্য তাকে কোন খেতাবের পাগড়ী পরিয়ে দেবে না, সিতা বসু মিষ্টি হেসে ধন্য করে দেবে না। তাতে কিই-বা আসে যায়! হরু ডোমের সানাই যেখানে ঘা খেয়ে ফুরিয়ে গেল, সেইখান থেকে নতুন করে রচনার উত্তরাধিকার পেয়েছে সে। তার সৃষ্টি যাচাই হবে জনতার সাড়ায়! বহুজনের হর্ষে তার গুণীপনার সত্য মূল্যের নির্ণয় হবে।

কি করতে পারে শিশির? খবরের কাগজে একটা কর্তব্যের ঘোষণা রোজই দেখতে

পাওয়া যায়—অধিক ফসল ফলাও। ঠিক কথা। এই নিরন্নতাই সুরমেধ রূপে দেখা দিয়েছে। অন্ন থাকলে হরু ডোমের মত জনতার শিল্পী অনশনে বিলীন হয়ে যেত না। তবে কি লাঙ্গল নিয়ে পড়ো জমি চষতে হবে? তাহলে যে শুধু চাষ করাই হবে, সানাইওয়ালা হরু ডোমের শিল্পীসত্তার তর্পণ হবে না।

কিন্তু এমন কোন সুরের বোধন কি নিতান্তই অসম্ভব, যে-সুরের স্পর্শে পড়ো মাঠের মাটি সোনার ফসলে ভরে যাবে? নিরন্নতার সংকটে মুহ্যমান লক্ষ লক্ষ দেশের লোক মত্ত সৈনিকের মত আত্মরক্ষার ব্রতে, ফসল ফলাবার উৎসবে মাঠে নেমে পড়বে—লাঙ্গল নিয়ে, মই নিয়ে, খুরপি কোদালি নিয়ে?

সম্ভব বৈকি? জনতার শিল্পীর এই তো কাজ। শিল্পীরা একধারে চারণ ও সৈনিক। জনতার গুণী শুধু কাজের পথে গান শোনায় না, গান শুনিয়ে কাজের পথে টেনে আনে।

হরু ডোমের মৃত্যুর কথাটা আবার মনে পড়ে। এই ভালমানুষী কাজের চিন্তাটা হঠাৎ অর্থহীন হয়ে যায়। অধিক ফসল ফলাও? কিন্তু কার জন্য ফলাবে? পরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য? দেশ জুড়ে এক প্রচণ্ড কুলিগিরির প্রেরণা জাগাবার জন্যই কি এই প্রবচনটি তৈরি করা হয়েছে?

শিশির জানে, তার পাশের বাড়ির এক রায় বাহাদুর সম্প্রতি দশটা নতুন টবে কচু ফলিয়েছেন। বেশ করেছেন, অধিক ফসল ফলাবার ব্রত নিয়ে সুখে থাকুন শহুরে বাহাদুরের দল। ফসল ফলিয়েও যারা মরতে চলেছে, তাদের কাছে এই অধিকতার ইয়ার্কি না করলেও চলবে। ফসল বাঁচাও, ফসল বেচা বন্ধ কর—বাঁচবার প্রথম মন্ত্র আগে ধ্বনিত হোক।

শিশিরের মনের ভেতর দুই পাখির প্রশ্ন আর উত্তর চলে। কঃ পন্থা? বিচার এক কথায় শেষ হয় না। কিন্তু যতক্ষণ কুয়াশার ঘোর থাকে, ততক্ষণই পথ বিপথের প্রশ্ন চলে। ঘোর কেটে গেলে সে-প্রশ্নের প্রয়োজন আর থাকে না—পথ আপনি দেখা দেয়।

শিশিরের মনের কুয়াশায় ঘোর কেটে গেছে। পথ দেখা দিয়েছে।

শিশির ডাকলো—বিপিন।

বিপিন কাঁদছিলো। কতকগুলি বাজনার ঢাকা অনেকদিন থেকে ধুলো পড়ে ময়লা হয়ে গেছে, সাবান নিয়ে সেগুলি কলতলায় কাচতে বসেছে বিপিন। তার হাত দুটো অবশ্য কাজে কোন ভুল করছিল না, কিন্তু মাথাটা একেবারে ঝুঁকেছিল—নিঃশব্দে একটা যন্ত্রণাকে যেন মনের ভেতর গিলে ফেলছিল বিপিন। মাঝে মাঝে মাথাটা কাৎ করে হাতের পুটে গলাটা ঘষছিল ; মুখটা এক একবার কুঁচকে গিয়ে ভেংচানির মত এক বিকৃতির মধ্যে স্থির হয়ে থাকছিল। তারপরেই একটা যুক্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দুটো জলের ধারা দু'চোখের কোণ ফুঁড়ে উথলে পড়ছিল।

আজ ক'দিন ধরেই বিপিন বিমনা হয়ে আছে। প্রভু-ভৃত্য দুজনেরই মনের অবস্থা কতকটা এক। শিশির ঠিক সময় মত স্মরণ করিয়ে দিতে পারে না।—'ওরে বিপিন, এইবার হোটেলে যা, আর দেরি করিস নে।' বিপিনেরও মনে পড়ে না—'এগারটা বেজে গেছে, বাবুকে বাইরে বের হতে হবে, এখনই দৌড়ে গিয়ে হোটেল থেকে খাবারটা আনতে হয়।' লনড্রির রসিদটা বিপিনের পকেটেই ক'দিন থেকে পড়ে আছে, কাজের কথাটাই ভুলে গেছে। বাজনার নোংরা ঢাকাগুলি কাচবার জন্য আজ পাঁচদিন থেকে শিশির তবু বিপিনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ক'দিন থেকেই বিপিনের আজ্ঞাবহ নিষ্ঠাটুকু কি কারণে যেন একটু শিথিল হয়ে গেছে। মনেই ছিল না তার। শেষে শিশিরের ধমক খেয়ে কর্তব্যবোধ জেগেছে। একটা নোংরা কাপড়ের পাহাড় নিয়ে সকাল থেকেই কাচতে বসেছে বিপিন।

শিশির ডেকে ডেকে দুবার সাড়া না পেয়ে সামনে এসে ধমক দিল।—কানে শুনতে পাচ্ছ

না যে। ধ্যান করছো নাকি?'

কথাটা শেষ করেই শিশির একটু বিচলিত স্বরে বলে উঠলো।—তুমি কাঁদছো মনে হচ্ছে?

বিপিনের কান্নার নীরবতার বাঁধ ভেঙে পড়লো। অসহায় আহত মোষের মত গোঙিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল বিপিন। শিশিরের কৌতূহল হঠাৎ একটা বিস্ময়ে যেন হোঁচট খেয়ে বোকার মত তাকিয়ে রইল। এই রকম একটা হট্টাকট্টা চেহারার জোয়ান পুরুষ, ছেলেমানুষের মত কাঁদতে পারে, দেখতেও কেমন বিসদৃশ লাগে। করুণা হয়, হাসিও পায়।

—কান্না থামিয়ে এবার বল, কি হয়েছে?

বিপিনের কান্না তবু থামে না দেখে বিরক্ত হয়েই শিশির বললো—কথার উত্তর যদি না দিয়েছ, তবে এখন বাইরে যাও, এখানে বসে কাঁদতে পারবে না।

বিপিন একটা লাফ দিয়ে উঠে পড়লো। উঠোনের কোণ থেকে একটা লাঠি তুলে নিয়ে বললো—আমি ফিরে এসে বলবো। কিছু মনে করবেন না বাবু।

শিশির।—যাচ্ছ কোথায়?

বিপিন।—যাব না কোথাও, এখনই ফিরে আসবো।

বিপিনের চোখে আর জল নেই। গোঁয়ার লাঠিয়ালের মত চোখে মুখে বেশ একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা উঁকি দিচ্ছে। শিশির ধমক দিল—চুপ করে বসো। কি হয়েছে বল?

বিপিন আপত্তি ক'রে তবু বসলো।—ছোটমানুষের ছোট কথার মধ্যে কেন আসছেন বাবু। ওসব শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। ঘিন্না হবে আপনার। শেষে খ্যাদিয়ে দেবেন। তখন আবার দু'টো ভাতের নেগে দৌড়রে ছুটরে...।

শিশির।—না, তুমি বল। আমি কিছু মনে করবো না।

বিপিন।—ঘরের বউ যদি স্বামীর কথা না মানে, ঘর ছাড়ে—এটাকে আপনি কি বলেন বাবু?

—খুব খারাপ।

—খারাপ তো বটেই। বেবুশ্যের চেয়ে খারাপ—একবার বাগে পেইছি কি ওর টুঁটি কামড়ে রক্ত চুষে নিইছি। মেরে মাতলার খালে ভাসিয়ে দেব।

—কাকে বাগে পেতে চাইছ? সে কি করেছে তোমার?

—এখনও এসে পৌঁছায় নাই। আসছে।

—সে কে?

—আপনার দাসী।

—তার অপরাধ?

—ঘর ছেড়ে দলের সঙ্গে বের হয়েছে—কলকাতায় আসছে।

—ভালই তো হলো। অনেক দিন পরে দু'জনাতে দেখা-সাক্ষাৎ হবে।

—সে কি আমার কাছে আসছে বাবু? ভিক্ষে করতে আসছে। আসুক একবার, ভিক্ষে খাওয়াচ্ছি আমি ওকে। মাগী মনে করলে আমি বুঝি মরে গেছি।

বিপিনের চোখ দুটো শিকারী বিড়ালের হিংসুক দৃষ্টির মত জ্বলতে লাগলো। কথা বলতে বলতে চোয়াল দুটো হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠে—একটা দুর্দম আক্রোশ দাঁতে চেপে রাখে।

বিপিন পরক্ষণেই একটু যেন মুষড়ে পড়লো। বললো—টুনার মায়ের কথা আমি বেশী ভাবছি না বাবু। ভাবছি টুনার কথা। একেবারে—বাচ্চা ছেলে বাবু। ও কি বাঁচবে? মাগীদের প্রাণ বড় কঠিন—কাদা খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু আমার বাচ্চা ছেলেটা?

শিশির।—তুমি যে টুনার মা'র ওপর এত রাগ করছো বিপিন, কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, ঘরে টিঁকতে পারে না বলেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে?

—টিঁকতে পারবে না কেন বাবু? গরিবের পেটে এত লোভ থাকতে নেই।

—তোমার ঘরে চাল আছে?

—না।

—টাকা পয়সা আছে?

—না। বিপিন একটু হাসলো।

—এখন তুমি বল টুনার মা কি করে গাঁয়ে থাকবে? কি খাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বিপিন জানে না। উত্তর দিতে সে চায় না। সে শুধু চায়, টুনার মা ঘরে থাকুক। ঘরই যদি ছাড়লো—তবে সবই যে ছেড়ে গেল। স্বামী ছাড়তে হবে ছেলে ছাড়তে হবে। বাপের ঘরেও ঠাঁই নাই। জাত কু-জাতের এঁটো খাবে, ভিক্ষে মাগবে. লুচ্চো গুণ্ডো গায়ে হাত দেবে—সব ধর্ম খুইয়ে পেটটা ভরবে শুধু। টুনার মা যদি তাই ভাল মনে করে থাকে, করুক—কিন্তু ঘরে ফেরার পথ ওর বন্ধ।

বিপিনের এক জ্ঞাতি-ভাই কদিন থেকেই দেখা করতে আসে। বিপিনের সঙ্গে বসে বসে গম্ভীরভাবে কত কি ফিসফিস করে আলোচনা হয়। ঘটনাটা শিশিরের চোখেও মাঝে মাঝে পড়েছে। তাতে শিশিরের কোন কৌতূহল জাগেনি। তখন সত্যিই তাঁর পক্ষে ছোটমানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন ঔৎসুক্যের তাগিদ ছিল না।

কিন্তু বিপিন কেঁদে ফেলেছে। লাঠি বাগিয়ে ধরে আবোল-তাবোল বকলে কি হবে, ওর এই তর্জন-গর্জনের পেছনে দাম্পত্যে ও বাৎসল্যে কোমল একটা গৃহী-মনের অভিমান আর্তস্বরে ডুকরে উঠছে। প্রশ্নটা তাই নিতান্ত ছোটমানুষের ঘরোয়া কথা নিয়ে নয়—মানুষের ঘরের প্রশ্ন।

শিশির বললো—টুনার মা'র সঙ্গে দেখা হলে তুমি কি করবে?

বিপিন।—বলবো, যেমনটি এসেছিস, তেমনটি এখনই ঘরে ফিরে যা।

শিশির।—বেশ তো, একমণ চাল দিয়ে ওকে ঘরে ফিরিয়ে দিও।

বিপিন।—চাল দিতে যাব কেন? পাব কোথা থেকে? পেলে কি দিতাম না? তা কি সে জানে না?

শিশির।—তাহলে তুমি চাইছ, টুনার মা ঘরে ফিরে যাক আর সেখানে চুপচাপ বসে বসে মরে যাক।

বিপিনের মুখটা আতঙ্কে সিঁটকে উঠলো—মরবে কেন? মরতে বলবো কেন? এমন কিছু পাপ করে নাই যে উপোসে মরবে।

শিশির।—স্পষ্ট করে বল, টুনার মা কি করবে? বাজে কথা বললে মার খাবে আমার কাছে। টুনার মা খাবে না, তবু বেঁচে থাকবে—এটা কি করে হয়, তুমি আমাকে বোঝাও।

বিপিন ফাঁপরে পড়লো। বাবুর সমবেদনার প্রশ্রয়ে এতক্ষণ মনটা যেন চাকরগিরি ভুলে গিয়েছিল। একটা আবদারের জোরে খুশিমত রোখা রোখা উত্তর দিয়ে চলেছিল—শিশির যেন তার আর একটি জ্ঞাতিভাই। এর পর যে-উত্তরটা দিতে হবে, সেটা সাবধানে ভেবে-চিন্তে বলাই উচিত, যাতে বাবুর মত ভদ্রলোক একেবারে খুশী হতে পারেন।

—ওকে আমি ত্যাগ-ই করলাম বাবু।

বিপিন হাতের লাঠিটা উঠানের কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

শিশির।—তুমি তো কবেই ত্যাগ করেছ। আর বাকি কি আছে? ঘর ছেড়ে পালিয়েছ সবার আগে। আমার এখানেই আজ ছ'মাস হয়ে গেল তোমার। তখন মনে ছিল না—টুনার মা আর টুনার কথা? তুমি ঘর ছেড়েছ, তোমার ধর্ম যায়নি?

বিপিন।—আর দু'টি মাস সবুর সইল না ওর। আমনটা উঠবার আগেই আমি পৌঁছতাম বাবু।

বিপিন ছটফট করতে লাগলো। টুনার মা আর টুনা ছ'টি মাস কিভাবে কাটিয়েছে, তার

কোন খবর রাখে না বিপিন। তারা শুধু বিপিনের কল্পনার মধ্যেই বেঁচে আছে, ঘরে আছে। ভাগ্যের কাছে আরও মাত্র দুটি মাসের মেয়াদ প্রার্থনা করে বিপিনের অন্তরাত্মা শুধু যেন দিন গুণছিল।

কিন্তু জ্ঞাতি-ভাই ত্রিভুবন হঠাৎ কোথা থেকে এসে তার অজ্ঞাতবাসের প্রশান্তি একটি সংবাদে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। গাঁয়ে কোথাও এক দানা চাল নেই—রসুলগঞ্জে নেই, পীরপুরহাটে নেই—ভাব্‌নো ভিরমিতলা কুঁড়েরহাট সইমানিক শিমুলে কোন দোকানে খুদকুঁড়ো পর্যন্ত বিক্রি হয় না। পয়সা থাকলেই বা কি? কায়েতপাড়ার সুন্দর সুন্দর বৌগুলি পর্যন্ত সব শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছে। মড়ক লেগে শিমুলের গরু মানুষ অর্ধেক সাবাড়। আর কেউ থাকবে না। হ্যাঁ, চাল পেতে পার, সেরকে যদি দুটি টাকা দাও। পীরপুর হাটে পাওয়া যায়। তা যদি পেয়েছ, তাতেই বা কি. ঘরে আনতে পথে ছিনিয়ে নিচ্ছে। টুনার মাকে দেখেছি, ভাব্‌নোর তেলিবাড়িতে চালার টিনটা বেচতে এসেছিল। টুনা ভাল আছে--কাঁদছিল খুব। না, ভাত খাবে কোথা থেকে? শাপলা আর কলার থোড় সিদ্ধ খাচ্ছে সবাই। কেওটদের সঙ্গে আমাদিগের একটা মারামারি হয়ে গেল—ঐ শাপলা তুলতে গিয়ে। আমিও দিইছি এক শালাকে জখম করে--চোখটা ফুটো করে দিইছি। তা, যাই বল বিপিনদাদা, গাঁয়ে থাকতে ভয় করে। তাই চলে এলাম। আমি এলাম রেলে। আমার আগেই টুনার মা পুনি কেওটানীর দলের সঙ্গে কেনিংয়ের পথে হেঁটে মেলা দিয়েছে! কলকাতাতেই আসবে। এটা বড় খারাপ হলো বিপিনদাদা ; লফরের জাত তো নই। মালীর ঘরের বউ কেওটদের সঙ্গে ভিক্ষে মাগতে বেরোবে, ভাল হলো না বিপিনদাদা।

সেইদিন থেকে বিপিনের শান্তি নেই। শিশির লক্ষ্য করেছে, আজ ক'দিন থেকেই না বলে কয়ে হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে যায় বিপিন। বোধ হয় কাছে বা দূরে আগন্তুক নিরন্নদের আড্ডাগুলি এক একবার তল্লাশি করে আসে। এরকম উচাটন অবস্থায় কাজের ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

শিশির বললো--আমার কাপড়গুলো এনে রেখেছ বিপিন?

বিপিনের কানে প্রশ্নটা পৌঁছল না। সেইখানে বসে দু'হাঁটু বুকে জড়িয়ে রাস্তার দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে ছিল বিপিন। ক্রোশের পর ক্রোশ ছাড়িয়ে আরও দূরে, কেনিংয়ের রেললাইন ধরে এই শরতের সকালবেলার রোদে এক যাযাবরের দলের পেছু পেছু একটি গাঁয়ের বৌ হেঁটে চলেছে ; তারও পেছনে একটি উলঙ্গ শিশু আস্তে আস্তে হাঁটছে। এই ছবির মিছিল ক্রমেই এগিয়ে আসছে। টুনার মায়ের নাকছাবিটা যেন স্পষ্ট দেখা যায় -অন্ধকারে কল্‌কের আগুনে ফুঁ দিতে গিয়ে নাকছাবিটা কেমন যেন চিক্‌চিক্ করতো। হাসিটাও সেই ছ'বছর আগেকার। সুধন্য বহুরূপীর গানটা মনে পড়ে—কে করেছে ফাঁদি নথের আমদানি, হায় গো হায়। সেই গান শোনার পরেই তো নাকছাবিটা গড়িয়ে দিয়েছিল বিপিন। হায় রে হায়!

শিশির ডাকলো--বিপিন!

--আজ্ঞে।

—মন খারাপ করো না। কাজ করে যাও। টুনার মা এলে আমাকে না বলে কোন গোলমাল করতে যেও না।

বিপিন গা-মোড়া দিয়ে হাড়গুলি একবার বাজিয়ে নিয়ে মনের বেদনাময় অবসাদটাকে ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সারাদিনের কাজের তালিকাটি মনে পড়লো—অনেক কাজ আছে। বাবুকে অনেকক্ষণ ত্যক্ত করা হয়েছে, আর নয়। কাজে মন দিল বিপিন।

আজ ছুটির দিন। পাড়ার সবাইকে চটিয়ে বসে আছে অবনীনাথ। সবাই শুনতে পেয়েছে, পরশুদিন অবনীনাথের বাড়িতে উনুনে হাঁড়ি চড়েনি। এর কারণ আর কিছু নয়, অবনীর

গোঁয়ার্তুমি। অবনী প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, উপোস থাকবে তবুও চোরাবাজার থেকে আটচল্লিশ টাকা মণ দরে চাল কিনে খাবে না।

ত্রৈলোক্যবাবু এসে বললেন—আপনার এই অভিমানের কোন মানে হয় না অবনীবাবু। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মত ব্যাপার করছেন আপনি।

অবনী।—চোরের ওপর রাগ করার ব্যাপার নয়, চোরের কৃপায় ভাত খাওয়ার ব্যাপার।

সুলতার মাসীমা এলেন। অরুণা আর জোছুকে ইনি খুবই ভালবাসেন। বললেন—অবনীকে কিছু জানাবার দরকার নেই অরুণা। আমি এক মণ চাল পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি পরে আমায় দামটা দিও।

অরুণা।—ওঁকে না জিজ্ঞেস করে কিছু নিতে পারবো না মাসীমা।

মাসীমা।—পরে না হয় চাল দিয়েই শোধ করে দিও। টাকা চাই না।

অরুণা।—তা'ও একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।

মাসীমা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন।—তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছো অরুণা। কার ওপর যে রাগ করছো বুঝি না। পাড়াসুদ্ধ সবারই চাল ডাল যোগাড় হচ্ছে, আর তোমরা শুধু উনুন নিভিয়ে বসে থাকবে, এ কি রকম কাণ্ড! যে-করেই হোক কষ্টেসৃষ্টে দুটো মুখে গুঁজে বেঁচে থাকতে তো হবে। দেশে অধর্ম এসেছে, কি করবে বল?

পরশু দিনটা অরন্ধনে গেছে। তারপরের দুটো দিন অবশ্য উপোসী যায়নি। প্রায় পনের যোলটা দোকান ঘুরে মাত্র একটি দোকানে সের দশেক চাল পেয়েছিল অবনী—সরকারী দরে, বাইশ টাকা মণ। এটা ঠিক চাল কিনা তাতেও সন্দেহ হয়। পচা গলা কতকগুলি শস্যকণা, চেহারাটা চালের মতনই দেখতে।

দোকানদার চাল দেবার সময় নিজেই লজ্জিত হলো। এ চাল নেবেন না বাবু, খেতে পারবেন না। এসব তো আপনাদের মত খদ্দেরকে বেচবার জন্যে নয় ; লাইসেন্সটা জিইয়ে রাখতে হবে তাই।

এই দশ সেরও ফুরোতে কত দিন? রান্নাঘরের নিভৃতে বসে অরুণা ও জোছুর মধ্যে কথা হচ্ছিল। অরুণা বললো—তুমি বলগে জোছু, কালই যেন চাল যোগাড় করে রাখে।

জোছু।—আমি বলতে পারবো না ; মাপ কর বৌদি।

অরুণা।—তুমিই বললে কাজ হবে। আজ পর্যন্ত কখনো দেখেছো, ভদ্রলোক আমার একটি কথাকেও আমল দিয়েছে?

জোছু।—তার চেয়ে চল, দুজনে মিলে একসঙ্গে বলি।

শোনা গেল অবনীনাথ ডাকছে—জোছু শীগ্‌গির আয়।

অরুণা ও জোছু ব্যস্ত হয়ে অবনীর ঘরে গিয়ে পৌঁছলো। অবনী বারান্দার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।—ঐ দেখ।

একটি ভিখিরী উবু হয়ে বসে আছে। খালি গা, ছেঁড়া নোংরা কাপড়ের ওপর একটা নতুন গামছা জড়ানো। লোকটা খুবই জীর্ণ-শীর্ণ দেখতে, কিন্তু সেই অনুপাতে অশক্ত মনে হয় না। অরুণা ও জোছুকে দেখতে পেয়েই হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে দণ্ডবৎ জানালো। বেশ চটপটে কেতাদুরস্ত স্বভাবের লোক মনে হলো।

অবনী বললো—উনি কে বল তো জোছু?

জোছু ও অরুণা একসঙ্গে জবাব দিল।—দেখে তো ভিখিরি বলেই বুঝছি।

অবনী।—কিছু বুঝছো না। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে নেই—এক জপরত ভক্ত মন্দির-দ্বার থেকে এক ভিখিরীকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল ; পরমুহূর্তেই ভক্তপ্রবর অবাক হয়ে দেখলো—ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।

জোছু এইটুকু বুঝতে পারছিল, কোন নতুন একটা তথ্য এর মধ্যে আছে। অবনীনাথ শুধু

হেঁয়ালি করে একটা মুখবন্ধ তৈরি করছে ; আসল বক্তব্য আর একটু পরেই বোঝা যাবে।

কিন্তু অরুণা যেভাবে বিস্ময়াবিষ্টের মত দেখছিল, তাতে ধারণা হতে পারে, সেই রকমই একটা অলৌকিক আবির্ভাবের আভাস খুঁজছে সে।

অবনী বললো—ভিখারী ধরেছে মূর্তি ব্যবসায়ী বেশে। উনি চাল বেচতে এসেছেন। বল তো, উনি এখুনি সের দশেক চাল এনে দিতে পারেন, দাম বারো আনা সের।

অরুণা বিমূঢ়ের মত ভিখিরীটার দিকে তাকাতেই, ভিখিরীটা একটা আপ্যায়নের হাসি হেসে সবিনয়ে বললো—হ্যাঁ মা। এর বেশি এখন আর নেই।

উত্তরে অবনী জানিয়ে দিল—আপনি যেতে পারেন, আপনার দয়া দেখে আমরা খুবই বাধিত, কিন্তু চাল চাই না।

বলা মাত্র ভিখিরীটা বারান্দা থেকে নেমে পড়লো।

অরুণ আর জোছুর বিমূঢ়তার ঘোর তখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। অবনী বললো—তোমরা এইখানে চুপটি করে বসো কিছুক্ষণ, এই বার এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যটি দেখ। দেখতে পাচ্ছ? যুগলবাবুর বাড়ির পাশে মাঠের ওপর?

শতখানেক মানুষের কঙ্কাল যেন সার বেঁধে বসে আছে মাঠের ওপর। তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। প্রায় প্রত্যেকেরই কোলে একটি করে শিশু। শিশুগুলির চেহারা ডানাকাটা চামচিকের মত, আকারে তার চেয়ে একটু বড়। পাড়ার কয়েকটি সেবাব্রতী ছেলে আর যুগলবাবুর বাড়ির মেয়েরা খিচুড়ি পরিবেশন করছে। মাটির হাঁড়ি, টিনের কৌটো, সান্‌কি, সরা, এনামেলের থালা সামনে রেখে ক্ষুধার্তেরা বসে আছে। যুগলবাবুর স্ত্রী একটি টুল নিয়ে একটু দূরে বসে দরিদ্রনারায়ণের সেবা তদারক করছেন। মাঝে মাঝে হাঁক দিয়ে বলছেন,—আরো দাও যে যা চাইছে দাও। কিপটেমি করো না তোমরা, ওরা দুটো বেশী খেলে ভূমিকম্প হবে না।

একটু দূরে একটি বাড়ির জানালা থেকে একটি বৌ উঁকি দিয়ে দেখছিল। তাকে উদ্দেশ করে যুগলবাবুর স্ত্রী গলার স্বর বেশ উচ্চগ্রামে ঠেলে নিয়ে গিয়ে বললেন—দুটো খেতে পেলেই এরা ধন্য। শত হোক মানুষ তো। পোকামাকড়ের মত চোখের সামনে মরবে, মানুষ হয়ে সহ্য করতে পারি না বৌমা।

অবনী বললো—শুনছিস্ জোছু, ওঁকে চিনিস তো?

অরুণা।—পয়সা থাকলে ওরকম পুণ্যি আমিও করতে পারি।

অবনী।—কিন্তু ঠিক যুগলবাবুর মত পয়সাওয়ালা হলে পারবে না। তারকের ভাই পচাকে মনে পড়ে? সেই পচা যুগলবাবুর প্রেসে আড়াই বছর বিনা মাইনেতে এপ্রেন্টিস্ খেটেছিল ; পরে পচা অবশ্য নিজেই সরে পড়লো থাইসিস্ নিয়ে।

অরুণা।—সেটা চাকরির ব্যাপার। সেখানে যুগলবাবু হয়তো অন্যায় করেছেন। তার জন্য উনি যে আজ গরিবদের খাওয়াচ্ছেন, সেটা কিছু পাপকাজ নয়।

অবনী।—পচার মত কাজের মানুষকে না খাইয়ে মেরেছেন, তাই ভাল মত মুনাফাও মেরেছেন। আজ আবার প্রেততুষ্টির জন্য শ'খানেক অকাজের মানুষকে ধরে খিচুড়ি খাইয়ে দগ্ধ আত্মা জুড়িয়ে নিচ্ছেন। পাপ কাজ কে বললে?

জোছু বললো—তোমাদের তর্ক শুনে আমার মাথা ধরে গেল দাদা। কি দেখাতে চাইছ, তাড়াতাড়ি বল। নইলে আমি চললাম।

অবনী।—তিষ্ঠ ক্ষণকাল। ঐ দেখ, দরিদ্র ভগবানেরা ভোজন সমাধা করেছেন টিউবওয়েলে জলপান করেছেন। এইবার এই পথেই যাবেন।

এক দুই তিন চার পাঁচ—একে একে দশ-বারটি সসন্তান নারী, বুড়ো মানুষ অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে আর রোগে ক্ষীণতনু কয়েকটি যুবক—সেই নিরন্ন জনতার একটি ভগ্নাংশ অবনীর

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ছোট ছোট বেলুনের মত এক একটি পেট সাঁড়াশির মতো দু'থাক পাঁজরের মাঝখানে ফেঁপে রয়েছে। পেটের ভেতর খিচুড়ির তাপ তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। উলঙ্গ ছোট ছেলেগুলির ভেজা গায়ের জল তখনো শুকোয়নি--থেকে থেকে আচমকা ঢেঁকুর ছাড়ছে।

পরমুহূর্তে এক বীভৎস বিলাপের কোরাস আরম্ভ হলো।--দুটো এঁটো কাঁটা দাও মা। একটু ফেন দাও বাবা। ক্ষিদেয় মরে গেলাম বাবা। দুটি পয়সা দাও মা। একটা টেমের কুপন দিয়ে দাও বাবা।

অরুণা আর জোছু শঙ্কিত হয়ে বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। দরজার সামনে সেই বীভৎস প্রার্থনার বিরাম ছিল না। কতকগুলি গৃধিনীর যকৃৎ মানুষের রূপ ধরে খাই খাই চীৎকার ছাড়ছে। জঙ্গলের পশুও একবার ক্ষুধা শান্তির পর ঘুমিয়ে পড়ে--বিশ্রাম করে। কিন্তু মানুষ হয়েও ভিখিরীদের এ কিরকম ব্যবহার!

ওদের দুজনারই মনে এই আতঙ্ক ও প্রশ্ন একসঙ্গে মিলে এক চিন্তার দুশ্ছেদ্য জটিলতা সৃষ্টি করছিল। অরুণা বললো--রক্ষে কর বাবা, এমন দরিদ্রনারায়ণ বৈকুণ্ঠে থাকুন। ঘরের দোরে এসে যেন ভিড় না করেন।

জোছু শুয়ে পড়লো। মাথার যন্ত্রণা এইবার বেশ জোরে চেপে ধরছে। অবনীও বারান্দা থেকে ঘরের ভেতরে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। ভিখিরীদের চীৎকারে স্বস্তির সঙ্গে কোন কথা বলার উপায় ছিল না। কখনো নাকী সুরে, কখনো কান্নার ঢঙে, কখনো কর্কশ হুংকারের মত--ভাঙা গলায়, দম বন্ধ করে, কাঁপিয়ে কাতরিয়ে এক দেহি দেহি হিংস্র উল্লাস যেন বাতাস আচ্ছন্ন করছিল।

অবনী বললো--আজ যদি একটা খুনী গুণ্ডা ছুরি নিয়ে ঘরে চড়াও হয়ে আক্রমণ করতো বা একটা বিষাক্ত সাপ ঘরে ঢুকতো তবে পাড়ার দশজন হয়তো ছুটে আসতো বাঁচাবার জন্য। কিন্তু তার চেয়ে শতগুণে কদর্য ও মারাত্মক এদের আক্রমণ। এদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই, কেউ বাঁচাবার জন্য ছুটে আসবে না। এরা সবাই নারায়ণত্ব লাভ করেছে। একটা গলাধাক্কা দেবার উপায় নেই। তখনি যুগলবাবুর দল তেড়ে আসবেন--ছি, ছি, ঠাকুরের গায়ে হাত দিতে আছে!

অরুণা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে গিয়ে জানালা দুটো আর কপাটটা বন্ধ করে দিল--নাঃ এ শব্দ আর সইতে পারি না।

অবনী।--আজ তোমার ঘরে আগুন লাগুক, এরা খুশী হয়ে আলুপোড়া খোঁজবার জন্য এইখানে এসে ভিড় করবে। লক্ষ্য করে দেখতে পার, রাস্তায় যখন কেউ মোটর চাপা পড়ে, চারদিক থেকে হায় হায় রব ওঠে। কিন্তু ভিখিরীরা নিঃশব্দে নির্বিকারভাবে সে দৃশ্য দেখে। ওদের মনের মধ্যে কোন সামাজিক বোধ বা কোন অনুভবের বালাই নেই। ওরা কতগুলি জীবন্ত শব মাত্র। অথচ ওদের জন্যই আমাদের সবচেয়ে মহত্ত্বটি রিজার্ভ করে রাখতে হবে--দয়া ত্যাগ আর সেবা।

ভিখিরীর উপদ্রব শান্ত হয়ে গেছে। বাইরে থেকে আর কোন হল্লা শোনা যায় না। শুধু জানালাটা কে যেন একবার ধাক্কা দিল--বাবা একটা বিড়ি ফেলে দাও না বাবা।

শেষ চেষ্টার ফলাফলের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ ভিখিরীটাও চলে গেল। জোছুর মাথার জ্বালা একটু কমেছে। বিছানার ওপর উঠে বসে বললো--তুমি এত ঘটা করে কি বোঝাতে চাইছ দাদা? ওরা মরে যাক ; এইটেই কি তুমি চাও?

অবনী।--আমি ওদের খেতে দিতে পারবো না। তার ফলে যদি ওরা মরে, মরে যাক।

জোছু।--এর পর আর কথা চলে না ; নিষ্ঠুরতাই যখন তোমার কাছে একটা বড় গুণ।

অবনী।--তোর মত গব্য দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এটা নিষ্ঠুরতা বৈকি। দীনবন্ধু সমিতির

ছোকরারা একটা লঙরখানা খুলেছে ; চাঁদা চাইতে এসেছিল—দিইনি। ওরাও মুখের ওপর আমাকে কসাই বলে গাল দিয়ে গেছে।

অরুণা।—মিছামিছি ওদের সঙ্গে লাগতে যাও কেন?

অবনী অরুণার মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে সামনে আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার ওপর পা দুটো ছড়িয়ে দিল। হাবভাবে মনে হয় একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতার বন্দোবস্ত করে নিচ্ছে।

কপাটে একটা টোকা দিয়ে কে ডাকলো—বাবু!

শোনামাত্র অরুণা ও জোছুর মুখের ওপর একটা আতঙ্কের শক্ লাগলো। দুজনে একসঙ্গে আঁৎকে উঠে বললো—কী আশ্চর্য, এখনো বসে আছো।

অবনী।—যাবে কেন? জোছুর মত একটি মূর্তিমতী দয়া যে এখানে আছে, সেটা ওরা অন্তশ্চক্ষে দেখতে পায়। শিকারী হিসাবে ভিখিরীদের লক্ষ্য কদাচিৎ ভুল হয়। কোন কাবুলীর কাছে কোন ভিক্ষুককে হাত পাততে দেখেছো?

জোছুর দিকে তাকিয়ে অবনী বক্তৃতা শুরু করে দিল।—তোর তাকানোর ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, তুই এই কথাটাই বলতে চাইছিস যে, বিষের জ্বালা সে কি বুঝবে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে? কল্পনা করতে কত দুঃখই তোদের হৃদয়ে উথলে ওঠে—আহা! বেচারীরা এই জলঝড়ে ফুটপাথে শুয়ে আছে, এঁটো ভাত খাচ্ছে, গায়ে জামা নেই। এটাই তোদের গব্য মায়াবাদ, এর মধ্যে বস্তু নেই। ভিখিরীদের জীবন কষ্টের জীবন, এটা তোদের মস্ত একটা ভুল ধারণা। ভিখিরীদের আড্ডার কাছে একটু দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করিস—ওদের হাসি মস্করা ফূর্তি গল্পের নমুনা দেখে ঘাবড়ে যাবি। পৃথিবীর কাছে ওদের কোন কর্তব্য নেই—এক অবাধ দায়িত্বহীন জীবন। দুটি রিপুর চর্চা ছাড়া ওরা আর কিছু বোঝে না। গেঁজেলের কাছে গাঁজার সুখ এর তুলনায় কিছু নয়। ভিখিরী মায়ের কোলের ছেলে মরে গেলে ওদেরও একটা দুঃখ হয়। কিন্তু তোমার আমার যে দুঃখ হবে, ওটা মোটেই সে ধরনের নয়। মানুষের দুঃখের তাপ তার মধ্যে নেই। ভাতের হাঁড়িটা ভেঙে গেলে ওরা আরও বেশী করুণভাবে কাঁদে।

দরজায় টোকা পড়লো আবার।—বাবু!

অবনী।—ডাকুক, উত্তর দিও না। এ-আর-পি ইঞ্জিনিয়ার শুভেন্দুবাবু হতভম্ব হয়ে গেছেন ; ট্রেঞ্চ পরিষ্কার করার জন্য গোটা বিশেক শক্ত-সমর্থ ভিখিরীকে দিন বারো আনা মজুরি দিয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন। ফিরে এসেই দেখেন শুধু কোদালিগুলি পড়ে আছে, সব পালিয়েছে।

জোছু।—পালালো কেন?

অবনী।—ভগবানেরা খাটবে কেন? কি দায় পড়েছে? চোর ডাকাতের চরিত্রের মধ্যেও একটা সামাজিক মানুষ আছে। চোরেরা জানে কোন কাজটা গর্হিত ও সমাজবিরুদ্ধ। তাই বেশ সাবধানে গোপনে অপকর্ম করে। সমাজের নিয়মকে চোরেরা ভয় করে। জীবনের অন্য সব ব্যাপারে ওরা তোমার আমার মত মানুষ। ছেলেপিলেকে ভালবাসে, বাপ-মার সেবা করে, গান শোনে, ছবি দেখে। কিন্তু ভিখিরীরা সমাজের কোন তোয়াক্কা করে না। সব অপকর্ম প্রকাশ্যভাবে করে। কখনো দেখেছো, কোন যাত্রা-গানের আসরের কাছে দশটা ভিখিরী ধৈর্য ধরে গান শুনছে? ভিখিরী মানেই হলো মৃত মনুষ্যত্ব।

দরজার ওপর জোরে দু' তিনবার টোকা পড়লো।—বাবু! বাবু! রুগ্ন তৃষ্ণার্ত মানুষের গলার স্বরের মত।

অরুণা বিরক্ত হয়ে বললো—না, এখানে আর টিঁকতে দিল না। চল ভেতরের ঘরে যাই।

অবনী।—চোরকে আমরা শাস্তি দিই, পাগলকে বেঁধে রাখি, কুষ্ঠ রোগীকে ট্রেনে উঠতে দিই না। জোছুর মতে এসব নিষ্ঠুরতা নয়। আর একেবারেই মনুষ্যত্ব নেই যাদের, এই ভিক্ষেবাজ জীবগুলিকে প্রেমানন্দে কোল দিতে হবে। নইলে নিষ্ঠুরতা হবে।

জোছু।—আমাদের সবারই অন্যায়ের জন্যই তো মানুষ ভিখিরী হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈ কি?

অবনী।—আমাদের সবারই অবিচার অন্যায়ের জন্য তো লোকে চোর ডাকাতও হয়ে যায়। তাদের ধরে কচুকাটা করিস কেন? ভিখিরীকে হাঁড়ি ভরে খিচুড়ি খাইয়ে সারা জীবন ভিখিরী করে রাখা যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ম হয়, তবে চোরকে সিঁদকাটি সাপ্লাই করে আর গেরস্থের ঘটিবাটির খবর দিয়ে সারাজীবন চোর করে রাখাও প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। কি বলিস জোছু?

জোছু।—বুঝলাম, তোমার মতে গরিবের বাঁচবার অধিকার নেই। তারা সব শেষ হয়ে গেলেই তোমরা সুখে থাকবে।

অবনী।—পথে এস খুকুমণি। আমি গরিবদের বিষয়ে একটা কথাও এতক্ষণ বলিনি। ভিখিরীদের কথাই হচ্ছে। গরিবেরা মানুষ, ভিখিরীরা মানুষ নয়। গরিব অর্থ একটা অবস্থার ব্যারাম, তাতে মানুষে কষ্ট পায়। দিন আধপেটা খেয়ে গরিবেরা মানুষের মত থাকে। দিনে আটবার খেয়ে ভিখিরীরা ভিখিরীই থাকে। ভিখিরীকে খাওয়ালে তার পেটের নাদাটি শুধু বৃহত্তর হয়, এক কণাও মনুষ্যত্বের সাড়া জাগে না! গরিব যাতে ভিখিরী না হয়ে যায়, সেই দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত। ভিখিরীকে খেতে দেব না—প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষীর মনে এই প্রথম প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। ভিক্ষের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাক। তখন এই অভাবের দেশে ঠিক এই রকমই আর একটা দেহি দেহি রব উঠবে—কাজ দাও, কাজ দাও।

অরুণা।—তখন সবাই কাজ পাবে তো?

অবনী।—তখন সমস্যাটাকে আমরা কাছে পাব—কাজ দেবার সমস্যা। ভিক্ষে দেবার প্রশ্ন থাকবে না।

জোছু।—তারপর কি হবে?

অবনী।—কাজের দাবি নিয়ে লড়াই চলবে, যতক্ষণ না প্রত্যেকের কাছে খেটে খাওয়ার পথ খুলে যায়।

অরুণা।—কাজ পেলেই দুঃখ ঘুচবে? তবে দেশের এত হাজার হাজার কেজো লোকের সংসারে এত দুঃখ অভাব কেন?

অবনী।—কাজ পেলেই দুঃখ ঘুচবে না। আর একটা দাবির লড়াই উঠবে—মজুরির দাবি। পেটভরে খাওয়ার মত মজুরি চাই।

জোছু।—চাইলেই দিতে বসেছে!

অবনী।—তখন আর একটা দাবির লড়াই লাগবে, ক্ষমতার দাবি। ক্ষমতা চাই।

জোছু।—ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে বসেছে!

অবনী।—ক্ষমতা ছাড়িয়ে আনতে হবে—তারই নাম লড়াই।

জোছু ও অরুণার মুখে একটা স্মিত-হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো। কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের তিক্ততা যেন হঠাৎ এক স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে গেল। বিতণ্ডার কুটিল স্রোতটা নানা খাত, নানা আবর্ত প্রপাত পার হয়ে এক মুক্ত সমতলের কাছে পৌঁছে গিয়ে তার সব গতি শেষ করে দিল।

জোছু।—শেষ দিকটা যেন কয়েকটা মন্ত্র পড়ে শেষ করে দিলে দাদা।

অবনীর মুখের ভাব আবার পরক্ষণেই যেন একটা দুর্বোধ্য ধূর্ততায় চঞ্চল হয়ে উঠলো।—কিন্তু তবুও আমি দীনবন্ধু সমিতির লঙ্গরখানায় কাজ করবো। তোদেরও বসে থাকলে চলবে না। যুগলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কাজ করতে হবে তোদের।

জোছু বোকার মত তাকিয়ে রইল। অরুণা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল—আমি আগেই জানতাম, তোমার যা-কিছু সবই একটা হেঁয়ালি। জীবনে কখনো স্পষ্ট হলে না তুমি।

অবনী।—লঙ্গরখানায় ঢুকে মানুষ বেছে নিতে হবে আমাকে।

জোছু।—কিসের মানুষ?

অবনী।—যারা লড়তে পারে তারা।

অরুণা।—এই ভিখিরীগুলো লড়বে?

অবনী।—এদের মধ্যে যারা আমার কথায় সাড়া দেবে, যারা চালের জন্য লড়তে রাজি হবে, তাদের আমি ভিখিরী বলবো না। তাদেরই উদ্ধার করে আনতে হবে আমাদের সত্যাগ্রহের আয়োজনে।

অবনীর মুখটা কুঁচকে গিয়ে হিংসুকের মত হয়ে উঠলো—ওদের কানে কানে শুনিয়ে দেব—বড়লোকেরা তোমাদের মেরে ফেলতে চায় ; গবর্নমেন্ট হল বড়লোকের বন্ধু। আমরা দেশের গরিব লোকেরাই তোমাদের খাওয়াচ্ছি।

জোছু আর অরুণা শান্তভাবে বসে অবনীর কথাগুলির মর্ম লক্ষ্য করছিল। অবনী বললো--পুণ্যবান দাতা আর সরকারী ভাঁওতার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে। আমরা ওদের কানে কানে শুধু কেড়ে খাবার মন্ত্র পড়ে দেব।

একটু চুপ করে থেকে অবনী বললো—যারা সাড়া দেবে তাদেরই আমরা সঙ্ঘবদ্ধ করবো। তারা মানুষ। তাদের ভিখিরী হতে দেব না। যারা সাড়া দেবে না, তারাই ভিখিরী, তাদের নিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। তারা যাতে না খেতে পায়, আমরা বরং সেই দিকে লক্ষ্য রাখবো। সেই অপদার্থ শবগুলি পচে যাক, আমরা তার জন্য দুঃখিত নই। পতিতপাবন সমাজ সংস্কারকেরা তাদের নিয়ে মাথা ঘামাক।

দরজার ওপর আস্তে দু'বার ধাক্কা দিয়ে সেই ক্ষীণস্বরটা যেন বিব্রত হয়ে ডাকলো—বাবু।

জোছু উঠে দাঁড়ালো—না আর এ ঘরে নয়। ঐ রব শুনলে আমি পাগল হয়ে যাব। প্রত্যেক মুহূর্তকে যেন ওরা পাহারা দিচ্ছে, একটু নিশ্চিন্তে একটু স্বস্তিবোধ করেছ কি, ঐ শব্দের বিষ ছুঁড়ে মারবে। আশ্চর্য! ওঠ বৌদি।

—কে ডাকে? কথাটা বলেই অবনী যেন সম্মোহাবিষ্টের মত ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা হাত তুলে ইশারায় জানিয়ে দিল—চুপ, শুনতে দাও। চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ অথচ আকস্মিক বিস্ময়ের স্পর্শে একটু অস্থির।

জোছু ভয়ে শিউরে উঠলো। অরুণা দম বন্ধ করে অনড় কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল—একটা না-জানা শঙ্কায় চোখ ছলছল করতে লাগলো। অবনীর এরকম আচরণ তারা কখনো দেখেনি। অবনী তখনো সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার সমস্ত অন্তর যেন কান পেতে আছে সেই ডাক শোনার জন্য। নাটকের শেষ অঙ্কে উপসংহারের আগে একটা রহস্যভরা স্তব্ধতার মধ্যে তিনজনে অভিনেতার মত দাঁড়িয়ে আছে।

শুনতে পাওয়া গেল। দরজার কড়া নেড়ে সেই ক্ষীণস্বর ডাকছে—অবু।

অবনী দরজার খিলটা সশব্দে খুলে একটা লাফ দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। পেছনে পেছনে প্রায় দৌড়ে এল জোছু আর অরুণা।

অবনী চেঁচিয়ে উঠলো—পিসিমা আপনি?

পরিধানে আধময়লা একটা থানের শাড়ি, একটা নামাবলী গায়ে জড়ানো, ছোট্টখাট্ট দেখতে এক বৃদ্ধা বিধবা দাঁড়িয়ে আছেন। অবনীকে দেখতে পেয়েই আস্তে একবার হাসলেন। মুখখানা খুবই শুকনো বলে হাসিটাও একটু শুকনো মনে হলো।

তিনজনে প্রণাম করলো। পিসিমা আশীর্বাদের ভঙ্গীতে জোছুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন--জ্যোৎস্না নাকি? কত বড়টি হয়ে গেছ! দশ বছর পরে জোছুকে তিনি দেখলেন।

অরুণার চিবুকে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এই প্রথম দেখছেন অরুণাকে।

জোছু পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। অরুণা একটা আসন এনে পাতলো। হাতমুখ ধুয়ে পিসিমা বসলেন। অবনী জিজ্ঞেসা করলো—এখন কোত্থেকে আসছেন পিসিমা?

—দেশ থেকে!

—হঠাৎ দেশ থেকে চলে এলেন?

অবনীর প্রশ্নের উত্তরে পিসিমা শুধু নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। অরুণা একটা পাখা হাতে কাছে বসেই পিসিমাকে বাতাস করছিল। একটা ক্লান্তিমুক্ত আরামের আস্বাদে পিসিমার চোখ মাঝে মাঝে বুজে আসছিল ; মাথাটা থেকে থেকে কাঁপছিল, সদ্য রোগমুক্ত মানুষের দুর্বলতার মত।

অবনী দেখছিল পিসিমার মুখখানা। পুরাতন পুঁথির পাতার মত যেন ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ হয়ে উঠেছে। সবারই জীবনে শেষযাত্রার গাটের সিঁড়িগুলি এই রকমই ভাঙা ভাঙা। কিন্তু পিসিমা হাসছিলেন, ঈষৎ বিষণ্ণ আবছায়ার মধ্যে ক্ষীণ জোনাকির আলোর মত প্রচ্ছন্ন একটা উত্তর সে-হাসিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

অবনী।—দেশে আর থাকা যায় না, নয় পিসিমা?

পিসিমা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন—না, আর থাকা যায় না।

অরুণা ও জোছুর চোখে তখনো একটা কৌতূহল ফুটে রয়েছে। পিসিমার মত লোক বলছেন—দেশে আর থাকা যায় না। এর অর্থ কি? পিসিমার মত একটি জেদী রাশভারী ও অহংকারী মানুষ! শ্বশুরের সংসারে কর্ত্রীপনার গর্ব ও গৌরব পিসিমা কখনো ভুলতে পারতেন না। জোছু ও অরুণা সেসব পারিবারিক ইতিহাসের ঘটনাগুলি কিছু কিছু শুনেছে। পিসেমশায় মারা যাবার পর কতবার পিসিমাকে আনতে লোক পাঠানো হলো, কত চিঠির অনুরোধ গেল--কিন্তু তিনি এলেন না। তিনি নিজে নিঃসন্তান, তবু বলতেন, আমার সংসার ফেলে কোথায় যাব? দাদু তখনো বেঁচে আছেন, কত দুঃখ করতেন। পিসিমার দেওরদের বিরাট সংসার--মাসে একটা করে অন্নপ্রাশন, বছরে একটা করে বিয়ে আর জগদ্ধাত্রী পুজো। পিসিমার আমিত্ব সেখানে সর্বময়। পিসিমাকে না হ'লে ছেলেগুলি পড়তে বসবে না, গরুগুলির যত্ন হবে না--সে-সংসারের তরণী যেন বানচাল হয়ে পড়বে।

কিন্তু আজ এমন কি অঘটন ঘটেছে যে, সেই পিসিমা শুধু একটি নামাবলী গায়ে, খবর না দিয়ে, দূর পথের ক্লেশ সহ্য করে হঠাৎ একা একা কলকাতায় চলে এলেন? কি বা সেই অঘটন, যার জন্যে তাঁর আদুরে সংসারের হাত থেকে আঁচল ছাড়িয়ে পিসিমা সরে আসতে পারলেন? সেই সংসারই বা তাঁকে ছেড়ে দিল কেন?

অবনী পাশের ঘরে উঠে গিয়ে ডাকলো।—শোন।

অরুণা আর জোছু আসতেই অবনী একটু চাপাস্বরে বললো--পিসিমাকে স্নানের জল দাও। আমি কিছু ফল কিনে আনছি। ফিরে এসে আবার আটার যোগাড়ে বের হতে হবে। পিসিমাকে বিছানা করে শুইয়ে দিও। বুড়ো মানুষ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কথাগুলি শেষ করেই অবনী চটে গেল।--হাঁ করে শুধু তাকাচ্ছো কেন তোমরা? পিসিমা মরে যেতেন, খেতে না পেয়ে—তাই চলে এসেছেন। এখন তাঁকে বাঁচতে দাও। এই সোজা কথাটা বুঝতে হাঁ করার দরকার হয় না।

অরুণা সত্যিই তার চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে আনতে পারছিল না। একটা প্রকাণ্ড বিমূঢ়তার ফাঁদের মধ্যে তার বুদ্ধিটা যেন হাঁসফাঁস করছিল। জোছু ভয় পেয়ে যেন আরও বোকা হয়ে গেল। হঠাৎ চোখে পড়লো, পিসিমা মেঝের ওপরেই শুয়ে পড়েছেন। ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে জোছু পিসিমাকে জড়িয়ে তুলে ধরলো।—বিছানা করে দিচ্ছি পিসিমা, তারপর শোবেন। আগে স্নান করে নিন।

জোছুর চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠলো, যেন ধোঁয়ার জ্বালা লেগেছে। জীর্ণ খড়ের পুতুলের মত পিসিমার ছোট্ট শরীরটা দু'হাতে জড়িয়ে জোছু বসে রইল। পিসিমা নিঃশব্দে অপ্রস্তুতের মত একটু সলজ্জ ও শুকনো হাসি হাসতে লাগলেন।

অবনী বললো—আমি বাজারে চললাম।

একটা গামছা হাতে নিয়ে গড়িয়াহাটা বাজারের দিকে এগিয়ে চললো অবনী। মাত্র তিনটে বেজেছে, বিকেলের রোদে ঝলসে রয়েছে চারদিক। ইঁট-পাথরের কলকাতার কঠিন শহুরে ভব্যতার পরিচ্ছদটুকু কোথাও একটু টোল খায়নি। সেই রম্য রাজপথ আর অট্টালী, দু'পাশে বিপণির বিথার, ট্রাম-বাসের রেস, ছোট ছোট লনের কানায় কানায় সুশ্যামল পরিপূর্ণতা, পার্কের তরুলতায় ছায়াময় প্রসন্নতা আর ছোট পাখির ডাক—কোথাও কোন ছন্দোভঙ্গ নেই। শুধু বিধ্বস্ত হয়ে গেছে জীবনের ধর্ম। ঘোলা জলের ফেনার মত পুঞ্জ পুঞ্জ মানুষের প্রাণ পথের ওপর ঘুরছে-ভাসছে—থমকে রয়েছে। কলকাতা শহরে যেন কোন বড়লোকের রঙিন বজরার মত এক মড়া-ভাসা শ্মশাননদীর ওপর ভাসছে।

তিনটে কন্ট্রোলে লাইন মার্কেটের তিনটে ফটক পার হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে—একটা চালের লাইন, একটা আটার লাইন আর একটা চিনির। ফুটপাথের ওপরে মুখোমুখি দুটো সমান্তরাল পঙক্তি—শিশি বোতল নিয়ে ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী, ভদ্র ও ভদ্রেতর প্রায় দু'শো মানুষ সুবাধ্য পড়ুয়াদের মত বসে আছে। এটা কেরোসিনের লাইন। চালের লাইনের চেহারাটা সব চেয়ে ভয়ানক—কলিশনে বিকৃত ট্রেনের মত এঁকেবেঁকে, কখনো কাৎ হয়ে, কোথাও কুঁকড়ে গিয়ে, গড়িয়াহাটা রোডের ওপর দিয়ে লেকের দিকে চলে গেছে।

প্রত্যেক ট্রাম-বাসের স্টপগুলির কাছে অর্ধোলঙ্গ অস্থিসার মানুষের এক একটা ব্যূহ। ক্ষণিকের জন্য একটু অসতর্ক বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কোন পথচারীর আর রক্ষা নেই। ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে পশ্চাতে মুহূর্তে একটা নরকঙ্কালের প্রাচীর যেন মাটি ফুঁড়ে ওঠে—এক মৃত্যুকুণ্ডের মধ্যে টেনে নেবার জন্য পঙ্কিল দাঁতগুলি দাও দাও শব্দ থাকতে থাকে।

রোডের দুপাশের ফুটপাথ আর মাঝের আইল্যাণ্ড ট্র্যাকের ওপর নিরন্ন গ্রাম ছাড়া মানুষের ছাউনি পড়ে গেছে। শত শত উনুন জ্বলছে। হাঁড়িতে সেদ্ধ হচ্ছে কচুর শাক, চিংড়ির খোসা, ভাত। ধোঁয়ার উৎপাতে কাকের দল এগুতে পারে না, শুধু আশেপাশে লাফালাফি করে বেড়ায়।

একদল লোক হাঁড়ি-সরা নিয়ে অবনীর গায়ের ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে হিন্দুস্থান পার্কের দিকে দৌড়লো। হাতে প্রকাণ্ড একটা লাঠি আর মাথায় পাগড়ি, দারোয়ান গোছের একটা লোক দূরে স্লিট ট্রেঞ্চের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছিলো—আয়! আয়! দেখা যায়, কোমরে গামছা বেঁধে জন দশেক ছেলে দুটো বড় বড় টবের ভেতর লম্বা লম্বা কাঠের হাতা ডুবিয়ে একটা সুপক্ক খাদ্যবস্তু ঘাঁটছে—ভুরভুর করে বাষ্পের স্তবক চূর্ণ হয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ লোকগুলির দৌড়ের উৎসাহ মন্থর হয়ে গেল। সামান্য কয়েকজন মাত্র ভাণ্ড হাতে একটা অনিচ্ছার ভাঁটি ঠেলে টেনেটুনে কোনমতে এগিয়ে চললো। অবনী শুনলো, তারই সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিরাশ্রয়ের দল সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আলোচনা করছে—ওখানে কেউ যেও না গো। জাউ খাইয়ে দেবে, থুঃ।

এটাই কি ডক্টর সর্বরঞ্জন সেনগুপ্তের বৈজ্ঞানিক লঙ্গরখানা? অবনীর মনে পড়লো, প্রতিদিন খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি নিরন্নদের বৈজ্ঞানিক খাদ্য বিতরণের জন্য সাগ্রহে আহ্বান করে। ছোট একটা ছেলে দৌড়তে দৌড়তে আসছিল, তার হাতে টিনের একটা কৌটাতে সেই বৈজ্ঞানিক খাদ্য টলটল করছে। অবনী ছেলেটাকে ডেকে একবার স্বচক্ষে সেই বিচিত্র বস্তুটির রূপ দেখে নিল। সবুজ রঙের কাইয়ের মত দেখতে—নানারকম শাক গাছড়া ভূষি আর চীনে ঘাসের দানা দিয়ে তৈরি একটা লপসি।

যেদিকে তাকানো যায়, শুধু নিরন্ন রুগ্ন ও মুমূর্ষু মানুষের জটলা। হুল্লোড়, চীৎকার, কান্না, কলহ ও বিলাপের শব্দতাণ্ডব। সেই দগ্ধ জনারণ্যে পৃথিবীর সব সুস্বর চাপা পড়ে গেছে। প্রত্যেকটি গাছের গোড়ায়, গুঁড়ির ওপরে, ডালের গায়ে যত সব উচ্ছন্ন সংসারের সামগ্রী জড়ো করা, তুলে রাখা, টাঙানো। হাঁড়ি কলসী, কাঁথার পুঁটলি, ঝুড়ি, ডালা, তেলাই। মানুষ

যেন গর্ত খুঁড়ে, চাক বেঁধে, ঢিবি তুলে যেখানে যেমন খুশি বাসা করে ফেলেছে।

লেকের দিক থেকে গর্জন করে ধুলো উড়িয়ে একটা আঁধি ছুটে আসছে মনে হলো। একটা মিলিটারি লরির ক্যারাভান। আকারে অতিকায় ঐরাবতের মত, রঙ ঘেসো ফড়িংয়ের মত, ক্রুদ্ধ গণ্ডারের চেয়ে প্রমত্ত বেগ—লরিগুলি সগর্জনে গড়িয়াহাটার মাটি থরথরিয়ে বিদ্যুৎ তাড়িত ছবির মত ট্রাম-লাইন ডিঙিয়ে উধাও হয়ে চলেছে। তবু শেষ হতে আর চায় না। টিকালো নাকে চশমা পরা, হাসিখুশী ইয়ারবাজ চেহারা, এক একটি যুবক-আমেরিকা আলগোছে স্টিয়ারিং ধরেছে, পাশে মেয়েমানুষ নিয়ে, শরীর হেলিয়ে বসে আছে—এক সুতীব্র ইয়ার্কির উল্লাসে যেন উড়ে যাচ্ছে। তারপর আর এক শ্রেণীর রথী, সখ করেই গা আদুড় করে নিয়েছে। গায়ের রঙ ঘেয়ো ঘেয়ো, মুখটা তামাটে—চুরুট চুষে চুষে ঠোঁটগুলি ভোঁতা হয়ে গেছে। এরা বোধহয় খাস ব্রিটেনের চাষাভুষো জাতের ড্রাইভার—স্টিয়ারিংয়ের ওপর বুক সাঁটিয়ে দিয়ে বেপরোয়া বেগে ছুটে চলেছে। হঠাৎ এক একটা ভারতীয় মুখ দেখতে পাওয়া যায়—খাকি পাগড়ির নিচে এক জোড়া কড়াপাকের জাঠ গোঁপ। এদের হাতে পড়ে গাড়িগুলি যেন একটু সাত্ত্বিক হয়ে পড়েছে—মোটেই উদ্দামতা নেই, একটা সংযতালস ভাব, মন্দস্রোতের ভেলার মত আস্তে আস্তে চলেছে। আবার আসে গোটা পঞ্চাশ ছোট ছোট মোটর—শ্যাসির ওপর শুধু একটুকরা ক্যানভ্যাসের ছই। খাকি উর্দির সাজের মধ্যে নিগ্রো সৈনিক ড্রাইভারের কুচকুচে কালো মুখগুলি বহুদূর থেকেই চিনতে পারা যায়। পুরু ঠোঁটে বেশ একটা গম্ভীর ভাস্কর্যের বনেদিয়ানা আছে। চোখের দৃষ্টিতে রসালুতা আছে। মেয়েদের ভিড় দেখলেই একটু জোরে হর্ন বাজানো অভ্যাস। বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

শেষ হলো এতক্ষণে! বিশ্বজোড়া যুদ্ধের নিদারুণ ঝিল্লীস্বর যেন কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র গড়িয়াহাটার এক ভিক্ষুক-নিকেতনের বিলাপ ডুবিয়ে দিয়েছিল।

মিত্রশক্তি না শক্তির মিত্রত্ব? চাল কিনতে বার হয়ে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধতত্ত্বের রহস্যটা অবনীর মত বাঙালী কেরানীর চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে খোঁচা দিয়ে হিসাব ভুল করে দেবে, তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। লড়াইটা চিরকালই পুণ্যে ও পাপে। এটা সবারই জানা কথা, এর মধ্যে কোন উঁহুর অবকাশ নেই। এই লড়াই অর্থই নাকি ইষ্ট বনাম অনিষ্টের লড়াই। এবং, ইংরাজ যেপক্ষে থাকবে সেটাই ইষ্টপক্ষ। এটা বিশ্বাস না করা বে-আইনী।

কিন্তু অবনী যদি আজ বলে—'তুমি ভেবে দেখ ইন্দ্র, পাপে-পাপেও লড়াই হতে পারে। সেই লড়াইয়ের মত ভণ্ড মূঢ় ও নিষ্ফল সংগ্রাম আর কিছু হতে পারে না। তার মধ্যে কোন ইষ্টের প্রশ্ন নেই—তার পরিণাম অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ইন্দ্র তাহ'লে শুধু অবনীকে মারতে বাকি রাখবে, বলতে অবশ্য কিছুই বাকি রাখবে না। আড়াই ডজন বুলি আউড়ে তখুনি প্রমাণ করে দেবে—এটা হলো জনযুদ্ধ।

—দেখছো বাবু, এই খাল-ভরা মেউড়োগুলো আমাকে জ্বালালে।

মেয়েমানুষের গলার স্বর শোনা গেল। অবনী পেছনে তাকিয়ে দেখলো, একটু দূরে রাস্তার পাশে একটা খোলা হাইড্রেন্ট থেকে জলের ফোয়ারা উঠছে। দুটো পশ্চিমা গাড়োয়ান চার পাঁচটে কাদামাখা মোষ নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই ফুটপাথের ওপরে মাটির সরার ওপর একটি জলে ভেজা শিশু বসে আছে, বোধহয় স্নান করানো হয়েছে। ঠিক শিশু তো নয়—শিশুর ভগ্নাবশেষ। ক্ষুদ্র একটি চর্মপেটিকা, মাথাটাও চুপসে গেছে। শিশুর মাতা হাইড্রেন্টের মুখের কাছে গুটিসুটি হয়ে বসে একটা কাপড়ের টুকরো থুবে থুবে কাচছে। সেই বলেছে কথাটা।

অবনী সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ওঠবার আগেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো—শুষ্ক শীর্ণ একটা উলঙ্গ মূর্তি। সেই কাচা কাপড়ের টুকরোটা কোমরে এক পাক জড়িয়ে, এগিয়ে গিয়ে

শিশুটিকে কোলে তুলে নিল মেয়েটি।

মার্কেটের দিকে আরও কিছু দূরে এগিয়ে দাঁড়ালে কোলাহলের মাত্রা বৈচিত্র্যে ও বীভৎসতায় চরম হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম নোংরা করে দেয়। মানুষের বোধশক্তির ওপর একটা পঙ্কিল বর্ষা নেমে আসে। জায়গাটা যেন একটা বিরাট পুরীষক্ষেত্র—দুর্গন্ধে বাতাসের পরমাণুগুলি বোধহয় বিষিয়ে গেছে। লাইন-বাঁধা জনতা নিজেদের মারামারি গালাগালি ও ধাক্কাধাক্কিতেই বিপর্যস্ত। মার্কেটের ফটক যেন হাঁ করে একটা নরমুণ্ডের মালা চিবোচ্ছে।

আর একটু অন্যমনস্ক হলেই মাড়িয়ে ফেলতো অবনী। পথের ওপরেই একটা শুকনো নারকেলের ডেগোর ওপর ছোট্ট একটা ছেলে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটার চোখের কোটর দুটো মাছিতে ভর্তি—বিকট পক্ষ্মহীন প্রেতচক্ষুর মত দেখাচ্ছে। মরেনি এখনো, পেট আর পাঁজরাগুলির মধ্যে নিশ্বাসের স্পন্দন এখনো লুকোচুরি খেলছে।

উনিশশো তেতাল্লিশের কলকাতার একটি অপরাহ্ণের এই এক রূপ। বিরাট একটা কটাহে যেন মনুষ্যত্ব ভাজা হচ্ছে। হৃত-অন্ন যুদ্ধদাস বাংলার প্রতি গ্রামে জনপদে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত নাড়ীর লালা বেনো জলের মত সব ঠাঁই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! মেঠো ইঁদুরের মত নিরাশ্রয় মানুষেরা দলে দলে কলকাতার চড়ায় এসে ঠেকেছে। সকাল বিকেল সন্ধ্যা রাত্রি—এরা আসছেই। ট্রেনে চড়ে, পথে হেঁটে, বনবাদাড় ঝোপঝাপ ঠেলে তারা আসছে। ক্ষান্তি নেই। এক অফুরান অন্ত্যেষ্টির মিছিল!

সব পথের শেষ কলকাতায়। বাংলার রাজধানী, মহাযুদ্ধের স্কন্ধাবার, পণ্যের ভাণ্ডার, শস্যের গোলা কলকাতা। বাংলার সামাজিক অর্থনীতিক ও রণনীতিক জীবনের হেড অফিস কলকাতা। লাটের মসনদ, উজিরের দপ্তর—সাহিত্য বাণিজ্য ধর্ম শিল্প ও বেশ্যার ডিপো কলকাতা। সারা বাংলার স্নায়ু শিরা আর নাড়ী এখানে এসে এক হয়ে মিশে গেছে—একটি ভয়ানক মস্তিষ্ক, একটি বিরাট হৃৎপিণ্ড ও একটি প্রকাণ্ড উদর সৃষ্টি করেছে। এই হলো কলকাতা। এ কলকাতার সর্দি লাগলে সারা বাংলা হেঁচে মরে।

চাল কিনতে হবে, না পেলে আটা। খেতে হবে—আপাতত ব্যক্তিস্বার্থের এই ক্ষুদ্রতম প্রশ্নটাকে একটু প্রশ্রয় না দিলে বড় কথার চিন্তায় শুধু খাবি খেতে হবে। চাল চাই, ফুটপাথ ধরে এক একটি দোকানে ঢুঁ মেরে ঘুরতে লাগলো অবনী। কিন্তু কোন দীনশরণ আগরওয়ালা বা কৃপাসিন্ধু সাহার দোকান পাওয়া গেল না।

অগত্যা কি করতে হবে এবং কি করা উচিত সে বিষয়ে অবনীর ধারণাটাও স্পষ্ট ছিল। তার জন্য সে তৈরি হয়েও আছে। এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে সমস্ত দৃশ্যটা বেশ একটা নাটকীয় মোহ নিয়ে অবনীকে যেন ধীরে ধীরে শান্ত করে দিচ্ছিল। না, পালিয়ে লাভ নেই। ভবিষ্যতের কলকাতা হয়তো ধনধান্যে লক্ষ্মীস্বরূপা হয়ে যাবে, সহাস্যে মুঠি মুঠি সমৃদ্ধির সোনা ছড়াবে। এই মূর্তি তখন আর থাকবে না। কিন্তু এই চৌরতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী কলকাতাকে চিনে রাখতে হবে। অভ্যস্ত হয়ে থাকাই ভাল। ঐ যে উপেনবাবু ঘুরে বেড়াচ্ছেন—ইশারা করলেই এখনি এক মণ চাল পৌঁছে দেবেন—পঁয়তাল্লিশ টাকায়। আপাতত উপেনবাবুরা একটু দূরে থাকুক। উপেনবাবুদের অনুকম্পা কোন মনুর সংহিতা গ্রাহ্য করে চলে না ; মুনাফার জন্যই মুনাফা—এর মধ্যে একটা নিষ্কাম নিষ্ঠা আছে ; তাই এর রূপ এত ভয়ানক। আজ এই মুনাফার বাঘ পঁয়তাল্লিশ টাকা দরেই তৃপ্ত হয়ে আছে। আবার বিগড়ে যেতে কতক্ষণ? কালই হয়তো হাঁ করে একশো টাকা দরের স্বাদ খুঁজবে। এতখানি রক্ত দেবার মত রোজগার কেরানী অবনীনাথের নেই। তখন এই পথেই নেমে আসতে হবে। তার চেয়ে এখনই ভাল। মার্কেটের ফটকের দিকে এগিয়ে গেল অবনী।

একটা ফলওয়ালার চাকর পাঁচ ঝুড়ি পচা বেদানা পথের ওপর উপুড় করে ফেলে দিয়ে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে শকুনের ঝাঁকের মত একদল স্ত্রীলোক পচা ফলের ওপর লাফিয়ে

পড়ে হানাহানি করে যেন নিজেদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো। একটা মোটরগাড়ি তীর বেগে দৌড়ে এসে আচমকা ব্রেক কষে থামলো। রেড ক্রস সোসাইটির একটা ভ্যান—লাউড স্পীকারের চোঙ থেকে একটা নাচের বাজনা ভীমমন্দ্রে সুরের গদা ভাঁজতে লাগলো।

এই শ্মশানে আবার নেড়ার নাচ কেন? গাড়ি থেকে কতকগুলি লোক নেমে বড় বড় কয়েকটা পোস্টার চারদিকে সাজিয়ে রাখলো। বাংলাদেশের কাছে চল্লিশ লক্ষ টাকা চাই—তার জন্য আবেদন। ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে—ঠিক উপযুক্ত জায়গা বেছে এসেছে রেড ক্রসের ভ্যান। রসিকতা জিনিসটা শ্লেষোক্তি অলংকারেই বেশ ভাল করে জমে।

একটার ধাক্কা মিটতে না মিটতে আর একটা। দু'পা এগিয়ে যেতে না যেতেই একটা লোক এসে অবনীর হাতে হ্যাণ্ডবিল গুঁজে দিয়ে গেল।-রক্ত দাও। এই আবেদনটা সত্যিই রক্ত খুঁজছে—তরল উষ্ণ লোহিত বর্ণের যে বস্তু মানুষের দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। ব্লাড ব্যাঙ্কের আবেদনটা একবার পড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো অবনী। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আটার লাইনটা এরই মধ্যে ক্ষয়ে অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। অবনী এই নরশৃঙ্খলের শেষ কড়াটির মত একেবারে শেষে গিয়ে গামছা হাতে দাঁড়ালো।

সিতা বসুর জন্মদিন। প্রতি বছর এই দিনটিতে সিতার বাড়িতে একটা উৎসবের সমারোহ জাগে। সিতার বাবা গুরুদয়ালবাবু, ওরফে মিস্টার বসু, তাঁর কারবার ডিভিডেণ্ড শেয়ার আর ডিবেঞ্চারের সারা বছরের তুফান পাড়ির মধ্যে এই একটি দিনের জন্য নোঙর ফেলে সুস্থির হন। বছরের এই একটি দিন তাঁর কাছে পার্বণের মত। ফুলবাগানে শামিয়ানা টাঙিয়ে দুটি সুদীর্ঘ সারি দিয়ে টেবিল চেয়ার সাজানো হয়। নিমন্ত্রিতেরা আসেন।

বছরের মধ্যে এই একটি দিনে তাঁর বাড়িতে একটা সজ্জনতার মেলা আহ্বান করেন গুরুদয়ালবাবু। সারা বছরের অর্জন ও সঞ্চয়ের গর্বকে যথাসৌজন্যে অভ্যাগতদের কাছে ব্যক্ত করার এই সুযোগটি তিনি কখনো বৃথা হতে দেন না। গল্পে ও কথাচ্ছলে, ঘোষণায় ও সমবেদনায়, হাসিতে ও বিদ্রূপে, প্রতিবাদে ও রসিকতায়—প্রত্যেকটি আচরণে তাঁর কাঞ্চনকৌলীন্যের এক একটি কীর্তিকে তিনি পরিবেশন করেন। তাঁর কাছে শুনতে হবে—সম্প্রতি দুটো উগাণ্ডা জেসমিনের চারা আনিয়েছেন, খরচ পড়েছে হান্‌ড্রেড এণ্ড সিক্সটি ফাইভ। তাতে কিছু আসে যায় না, জেসমিন দুটো বাঁচলে হয়। তাঁর ক্রাইস্‌লারের ইঞ্জিনটা ভাল ওয়ার্ক করছে না, কাশ্মীর যেতে পথে দু'বার দাগা দিয়েছে, তাই নতুন একটা পন্টিয়াক কিনেছেন। ঐ যে দেখছেন বড় চায়না ভাজটার মধ্যে ছোট একটা গাছ, লুক্, বলতে পারেন ওটা কি?

অভ্যাগতেরা কৌতূহলী হয়ে গলা লম্বা করে দেখতে থাকে। গুরুদয়ালবাবু বলেন—ওটা একটা ওক। বয়স তেত্রিশ বছর। যখন কিনেছিলাম তখন ওটার বয়স ছিল এগার বছর। আমার কাছে আসবার পরেও প্রায় তেরশো টাকা খরচ পড়েছে বোনসাই করাতে—আর আধ ইঞ্চিও বাড়তে দিইনি।

গুরুদয়ালবাবু উঠে গিয়ে বেঁটে ওকটার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে এক পশলা প্রশংসার আশায় সকলের দিকে তাকাতে থাকেন।

দেখাবার পক্ষে তাঁর কাছে সবচেয়ে গর্বের বস্তুটি হলো তাঁর দুহিতা সিতা বসু। রূপের ও গুণের এমন সমাবেশ বিরল, এই সত্যে কেউ সংশয় করতে পারে না। সিতার মুখের দিকে তাকিয়ে অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ সবারই মনে প্রথম যে-প্রশ্নটি দেখা দেয়, সেটা হলো—গুরুদয়ালবাবু জামাতৃপদ এখনো খালি পড়ে আছে কেন? কে সেই ভাবী ভাগ্যবান? মিস্টার বসু কি কাউকে বেছে রেখেছেন? অথবা সিতা বসু নিজেই তার জীবনের দোসর ঠিক করে রেখেছে? জয়ন্ত মজুমদার ঘুরঘুর করছে, বড় বাধ্য ও বিনয়াবনত ভাব, যেন বাড়ির ছেলেটি।

তবে কি জয়ন্তই সেই উপপদ তৎপুরুষ? কিন্তু জয়ন্তর কোন গুণের খবর তো কেউ আজও শোনেনি। বাপের টাকা আছে, ঐ পর্যন্ত।

আজকের জন্মদিনের উৎসবটার রূপ ঠিক হুবহু অন্য বছরের মত নয়। একটু ব্যতিক্রম আছে। প্রথমেই চোখে খটকা লাগে, এই অভিজাত সমাবেশের মধ্যে দু'তিনটা আটপৌরে মূর্তি—প্রকাশবাবু ইন্দ্রনাথ আর উর্মিলা কাঞ্জিলাল।

গুরুদয়ালবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।—এঁরা হলেন সিতার সঙ্ঘবন্ধু। এঁরা মস্ত একটা কালচারাল কাজে হাত দিয়েছেন। সিতা এঁদের খুব সাহায্য করছে।

অভ্যাগতেরা উৎসুক হয়ে তাকালেন। তাঁরা জানতে চান—কি সেই কাজ? কিসের সঙ্ঘ?

প্রকাশবাবুই কথা বলে কৌতূহল ভঞ্জন করলেন—জাগৃতি সঙ্ঘ।

গুরুদয়ালবাবু হেসে বললেন—জয়ন্তও সঙ্ঘের একজন বড় কর্মী। কিন্তু দেখুন, কেমন চুপটি করে বসে আছে। সায়লেন্ট ওয়ার্কার!

সাহেবী পোশাকে সজ্জিত, সম্ভবত ব্যারিস্টার এক বৃদ্ধ বললেন—জাগৃতি সঙ্ঘের ব্যাপারটা শুনতে আমাদের খুবই আগ্রহ হচ্ছে। কেউ যদি অনুগ্রহ করে বলেন।

প্রকাশবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন—আজকের এই আসরে জাগৃতি সঙ্ঘের আলোচনাটা অবশ্য একটু অবান্তর মনে হবে, তবে যদি নিতান্তই আপনারা ইচ্ছুক থাকেন...।

বৃদ্ধ।—যদি আইনের কোন বাধা না থাকে...।

প্রকাশ।—না, না, আইনের বাধার কোন কথা এর মধ্যে নেই বরং আইন আমাদের তরফেই আছে।

উর্মিলা কাঞ্জিলালের মন্তব্য শোনা গেল।—আমাদের কাজই হলো সকলের কাছে এই আদর্শ প্রচার করা। এইভাবে বলতে বলতে যদি সাধারণের মধ্যে একটা চেতনা আসে!

বৃদ্ধ।—ঠিক বলেছেন। ঐ চেতনা জিনিসটার বড়ই অভাব আমাদের মধ্যে। প্রকাশবাবুর মুখে দুটো নতুন কথা শুনতে পেলে আমাদের বড় উপকার হবে।

প্রকাশবাবু আরম্ভ করলেন।—প্রথমে মনে করুন, এই ফ্যাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে...।

বৃদ্ধ।—Hypothesis ; এটা প্রমাণিত হলে খুশী হব।

প্রকাশ।—জার্মানী, ইটালি ও জাপান, এরা ফ্যাসিস্ত-ধর্মী।

বৃদ্ধ।—একটু পরিষ্কার করে বুঝতে চাই।

প্রকাশ।—এরা পররাজ্য গ্রাস করতে এবং শোষণ করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে নতুন রকমের একটা সামরিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি এরা আয়ত্ত করেছে, সেটা যেমন ভয়ানক, তেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি কঠোর।

বৃদ্ধ।—ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের কথাটা ভুলে যেতে বলছেন? সেটা আছে কি নেই? তার পদ্ধতিটা কি রকম? অভয়ানক, সদয় ও কোমল?

প্রকাশ।—আছে, তবে ফাসিস্তির চেয়ে ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের মেশিনারি একটু সেকেলে ও জীর্ণ।

বৃদ্ধ।—সেই কারণে ইম্পিরিয়ালজ্‌ম্‌ বাঞ্ছনীয়?

প্রকাশবাবু বিরক্তিভরেই উত্তর দিলেন।—না।

বৃদ্ধ।—তাহলে আপনি আমাকে এই রকম একটা কুস্তির ছবি দেখাচ্ছেন, যার মধ্যে দেখছি—একটি বুড়ো পালোয়ান ও একটি ছোকরা পালোয়ানে ধস্তাধস্তি বেধেছে। বুড়োর চেহারা বিরাট, গায়ের জোরও আছে। কিন্তু ছোকরা প্যাঁচ জানে ভাল।

প্রকাশ।—তাই যদি বলি, তবে আপনি তার থেকে কি সিদ্ধান্ত করবেন?

বৃদ্ধ।—সিদ্ধান্ত এই যে, বুড়ো পালোয়ান ভাবছে, এ যাত্রা পার পাই তো এমন সব প্যাঁচ শিখে রাখবো যে ভবিষ্যতে কোন ছোকরা আমার ওস্তাদী চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করবে না।

প্রকাশ।—তাহ'লে আপনি বলতে চান...।

বৃদ্ধ।—বলতে চাই, এই লড়াইটা ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ বনাম অতি ইম্পিরিয়ালিজ্‌মে। অন্যভাবে বলা যায়, ফাসিস্তি বনাম অপ-ফ্যাসিস্তির লড়াই। ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ তার নিজের ভালর জন্যই দ্রুত তার ঠাট বদলে ফেলেছে, ভোল ফেরাচ্ছে। এটা ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের আত্মরক্ষার যুদ্ধ।

প্রকাশ।—মস্ত ভুল করলেন। ভোল ফেরাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে। ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ নিজেই ভেঙে পড়ছে।

বৃদ্ধ।—প্রমাণ করুন।

প্রকাশ।—দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধ।—কি দেখতে পাচ্ছেন?

প্রকাশ।—ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ ভেঙে পড়ছে।

বৃদ্ধ।—Circulus in probando—আচ্ছা তারপর?

প্রকাশ।—এদিকে পৃথিবীর একমাত্র সাম্যবাদী দেশ রুশিয়াকে ফ্যাসিস্তরা আক্রমণ করেছে।

বৃদ্ধ।—জাপান আক্রমণ করেনি।

প্রকাশ।—নিজের সুবিধে বা অসুবিধের জন্যেই করেনি। ভবিষ্যতে করতেও পারে।

বৃদ্ধ।—Argumentum ab inconvenienti—আপনার বলা উচিত, ফাসিস্তদলের কোন কোন সদস্য রুশিয়ার ওপর হামলা করেছে।

প্রকাশ।—তাই যদি বলি, তবে আপনার কোন সুবিধা হলো কি?

বৃদ্ধ।—মস্ত সুবিধা হলো। আমি এখন বলতে পারবো, কোন আদর্শগত সংকল্প নিয়ে এ যুদ্ধ হচ্ছে না। দেশগত স্বার্থ নিয়েই এ যুদ্ধ।

প্রকাশ।—কিন্তু রুশিয়ার ওপর জার্মানীর আক্রমণটাই যে এই যদ্ধের গতি প্রকৃতি ও পরিণাম বদলে দিল।

বৃদ্ধ।—আবার এ বুড়োকে বিপদে ফেলছেন প্রকাশবাবু। প্রমাণ না দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত থেকেই যদি বক্তব্য আরম্ভ করেন, তাহলে আমি কিছু বুঝতে নাচার।

প্রকাশ।—সেদিন সোভিয়েট রুশিয়ার ওপর জার্মানী আক্রমণ করেছে, সেই ১৯৪১ সালের ২২শে জুন থেকে এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ।—প্রমাণ করুন। আমি বলবো, সেইদিন থেকে ফাসিস্তরা সত্যি করে ইম্পিরিয়ালিস্ট হবার পথে যাত্রা শুরু করেছে।

প্রকাশ।—বিশ্বের জনসাধারণের মঙ্গল সোভিয়েট রুশের জয়ের ওপর নির্ভর করছে।

বৃদ্ধ।—প্রমাণ করুন। অবশ্য রুশ জনসাধারণের শুভাশুভ রুশিয়ার জয়-পরাজয়ে নির্ভর করবে, এটা সাদা কথা।

প্রকাশ।—তার চেয়ে বেশী। রুশিয়ার জয়ে পৃথিবীর জনসাধারণের জয়।

বৃদ্ধ।—বড় দুঃখু দিচ্ছেন মশাই। একটু আধটু প্রমাণ পেলেই আমরা খুশী হয়ে বিশ্বাস করি। কিন্তু আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করতে আর ভরসা পাই না।

প্রকাশ।—সোভিয়েট রুশিয়া যে পৃথিবীর সর্বদেশের প্রলেটারিয়েটের পিতৃভূমি, এ তথ্য জানা থাকলে আপনাকে ঐ ল্যাটিন ফ্রেজের ধাঁধার মধ্যে বৃথা ঘুরতে হতো না।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল সিতার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন। সিতাও হেসে ফেলবে, এইটেই বোধ হয় তিনি আশা করছিলেন।

বৃদ্ধ।—আমার মত জিজ্ঞাসুর বিদ্যেবুদ্ধির মাথায় জোরে একটা তাচ্ছিল্যের চাঁটি বসিয়ে দিলে আপনার মত প্রচারকের বিজ্ঞতা বড় হয়ে ওঠে না। প্রশ্ন করা যদি অন্যায় হয়, তবে বুঝবো আপনি আপনার কতগুলি বিশ্বাসের কথা বলছেন ; এবং আমিও আপনার বিশ্বাস

ভাঙতে ইচ্ছে করি না।

প্রকাশবাবু সুর নরম করে বললেন—সোভিয়েট রুশিয়ার শাসনক্ষমতা প্রলেটারিয়েটের হাতে।

বৃদ্ধ।—বেশ তো, আমাদের কাছে সেটা একটা মহৎ দৃষ্টান্ত ও আদর্শ।

প্রকাশ।—সেইজন্য রুশের জয়লাভ সর্বদেশের প্রলেটারিয়েটের পরিণাম বদলে দেবে।

বৃদ্ধ।—যুদ্ধের আগে যখন জয়পরাজয়ের প্রশ্ন ওঠেনি, তখন অন্য দেশের প্রলেটারিয়েট শাসকশ্রেণীর চাকর হয়ে ছিল। সোভিয়েট রুশের প্রভাব তখন কোথায় ছিল? আমরা তো মনে করবো, সেই পূর্বাবস্থাই ফিরে আসবে।

প্রকাশ।—যুদ্ধের আগে ফাসিস্তির অভ্যুদয়ের একটা সময় গেছে। সে সময়টা শ্রমিকের দুর্ভাগ্যের ভরা শুধু পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু রুশিয়ার জয় হ'লে ফাসিস্তির পতনের ভেতর দিয়েই সেটা হবে। সেই সঙ্গে সর্বদেশের শ্রমিকের মুক্তির পথ খুলে যাবে।

বৃদ্ধ।—অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, রুশিয়ায় সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও অন্য দেশে তার প্রভাব পড়েনি, উল্টো ফাসিস্তির অভ্যুত্থানটাই সহজভাবে হয়েছিল।

প্রকাশ।—কিন্তু কতকগুলি দেশের শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে সাম্যবাদের সাড়া জেগেছে; চীনে ভারতবর্ষে ফ্রান্সে, এমন কি ইংলণ্ডেও।

বৃদ্ধ।—একই সূর্যের কিরণে এক জায়গায় আলো হলো, আর এক জায়গায় অন্ধকার। আমাকে এই কথাটা বিশ্বাস করতে বলছেন?

প্রকাশ।—করুন না, ক্ষতি কি?

বৃদ্ধ।—না মশাই, এটা আপনার জুপিটারের আলো। সূর্যের আলো এরকম হতে পারে না।

প্রকাশ।—তাই বিশ্বাস করুন।

বৃদ্ধ।—কিন্তু জাগৃতি সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে আপনি ব্যর্থ হয়ে গেলেন। আপনার বিশ্বাসটা আমি পেলাম না।

প্রকাশ।—আমার বক্তব্য শেষ না করতে পারলে, আমি আপনার কাছে ব্যর্থ বৈকি।

বৃদ্ধ।—কিছু মনে করবেন না, আপনি বলুন। আমি শুধু বলতে চাইছিলুম—দেশে দেশে অবস্থার প্রভাবে কোথাও শ্রমিকেরা জাগছে, কোথাও আবার খপ্পরে পড়ে ঝিমিয়ে পড়ছে। ঐতিহাসিক নিয়মের প্রভাবেই এটা হচ্ছে। ঐ একই ঐতিহাসিক নিয়মে রুশিয়ায় শ্রমিকের অভ্যুত্থান ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সকালবেলা সূর্য ওঠে, সেটা রুশীয় প্রভাবের জন্য নয়—প্রাকৃতিক নিয়মের জন্য। আমার আশ্চর্য লাগে, পলিটিক্সেও কেন আপনারা এত মূর্তিপূজা পরলোকবাদ আর জপতত্ত্ব নিয়ে পড়েছেন? শুধু রুশিয়া রুশিয়া রুশিয়া! আমার মনে হয়, এসব আপনাদের কতগুলি মুখের কথা মাত্র। আপনারাও সেটা ভালরকম জানেন। কাজের কথা চাপা দিতে গেলে আবোল-তাবোল যা বলতে হয়, তাই আপনারা বলেন।

প্রকাশবাবু রুষ্ট হয়ে বললেন—আমরা এ যুদ্ধে সেই পক্ষের জয় কামনা করি, যেপক্ষে সোভিয়েট রুশ আছে।

বৃদ্ধ।—এতক্ষণ এই ভয় করেছিলাম প্রকাশবাবু। শুধু ঐ পক্ষটারই জয়লাভ করাবার জন্যই কি আগে থেকে রুশীয় জয়ের থিওরিটা তৈরি করে রেখেছিলেন?

প্রকাশ।—আপনার তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বৃদ্ধ।—রুশের জয় অর্থ বুঝি কিন্তু রুশপক্ষের জয় মানে কি মশাই? ব্রিটেন আমেরিকা ও...

প্রকাশ।—আমাদের জয়।

বৃদ্ধ।—আপনি সত্যিই জয়লাভ করছেন। আমি আর দম পাচ্ছি না। এই জয়যাত্রায় আমাদের বেচারা ভারতবর্ষ কি করবে?

প্রকাশ।—যুদ্ধে সাহায্য করবে, যেন ফাসিস্তির আশু পতন হয়।

বৃদ্ধ।—কিভাবে?

প্রকাশ।—সৈন্য দিয়ে পণ্য দিয়ে। যুদ্ধের সময় দেশের কোন শৃঙ্খলা যাতে নষ্ট না হয়, সেইদিকে পাহারা রাখতে হবে।

বৃদ্ধ।—বিনিময়ে যদি দেশের পক্ষে ব্রিটিশের কাছে বা মিত্রশক্তির কাছে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে অথবা দাবি জানিয়ে...।

প্রকাশ।—না, কোন কণ্ডিশনের মানে হয় না। এ যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ। যদি একবার ফাসিস্তির হাতে আমরা চলে যাই তাহলে উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত।

বৃদ্ধ।—আপনি বিশ্বাস করেন নিশ্চয়, জাপানী ফাসিস্তের হাত থেকে বর্মাকে মুক্ত করার পর ব্রিটিশ তাকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেবে?

প্রকাশবাবু চারদিকে তাকালেন। ধৈর্যহীন দৃষ্টিগুলি চারদিক থেকে উত্তর শোনার জন্য যেন হাঁ করে আছে। ইন্দ্রনাথ যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে। এত বড় একটা ঝড় চলেছে চারদিকে, সেদিকে তার কোন লক্ষ্য নেই। শুধু উর্মিলা কাঞ্জিলাল একটু ছটফট করছিলেন—বোধ হয় কোন একটা মোক্ষম উত্তর তাঁর মুখে এসেছে। তবু প্রকাশবাবুই শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

বৃদ্ধ।—আপনার কতগুলি বিশ্বাস ও ইচ্ছের কথা শুনলাম। কাজেই প্রতিবাদ করার কোন প্রয়োজন নেই। এখনো কিন্তু জাগৃতি সঙ্ঘের বিষয় কিছু শুনলাম না।

প্রকাশ।—দেশের জনসাধারণের মনের অবস্থা ও মোরাল আপনার মতই—কিছু ঠাউরে উঠতে না পেরে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। নিষ্ক্রিয়তায় ঝিমিয়ে পড়ছে। এটা মারাত্মক রোগের লক্ষণ। ফাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে তাই আমাদের একটা সচেতন প্রয়াস নিয়ে লেগে থাকতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে যে-তিমিরে সে-তিমিরেই পড়ে থাকতে না হয়।

বৃদ্ধ।—তাহলে সে ভয় আছে, বিজয়ী সোভিয়েট রুশিয়া থাকতেও তিমিরে পড়তে পারেন?

প্রকাশ।—সোভিয়েট রুশিয়া আমাদের হাতে মুক্তির লাড্ডু তুলে দিতে আসবে না।

বৃদ্ধ।—বিশ্বাস করেন সেটা?

প্রকাশ।—একটা বুর্জোয়া ইমোশন, একটি অ্যান্টি-ব্রিটিশ অভিমান, একটা জাতিবাদী দৃষ্টি দিয়ে যদি সবকিছু বিচার করেন...।

বৃদ্ধ।—এক কথায় আমি হলাম—advocatus diaboli.

গুরুদয়ালবাবু সতর্ক হয়ে উঠলেন। এই প্রসঙ্গের পাগলা ঘোড়া এইবার লাগাম ছিঁড়েছে। গুরুদয়ালবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ডমাস্টারের ভঙ্গীতে হাত তুলে ব্যস্তভাবে বললেন—আমি বলছিলাম...।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল বললেন—ব্যারিস্টারী মর্জিতে সওয়াল জবাব করে কোন আদর্শের বিচার হয় না।

বৃদ্ধ বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করলেন।—ব্যারিস্টার! কে ব্যারিস্টার?

গুরুদয়ালবাবু সংশয় খণ্ডন করলেন।—আমি বলছিলাম, উনি ব্যারিস্টার নন, উনি ডাক্তার মুখার্জি—বি এম মুখার্জি—বনমালী মুখার্জি।

ডাক্তার মুখার্জি।—আমি এইখানে থামলাম। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। জাগৃতি সঙ্ঘের কাজের সম্বন্ধে যদি কারও কিছু জানতে ইচ্ছে থাকে, তিনি প্রশ্ন করুন।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল।—মানবতার শত্রু ফাসিস্ত দস্যুদের বিরুদ্ধে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে একটা প্রচণ্ড জনমনোভাব সৃষ্টি করতে হবে, সোজা কথায় এটাই হলো জাগৃতি সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

গুরুদয়ালবাবু পূর্ণচ্ছেদ টানলেন।—এই তো! আমি আপনাদের দু'জনকেই বুঝতে পেরেছি। প্রকাশবাবু রাইট এবং ডাক্তার মুখার্জিও রাইট।

দুষ্পাচ্য যুদ্ধতত্ত্ব আর পলিটিক্স গুরুদয়ালবাবুর ভাল লাগছিল না মোটেই। বছরের মধ্যে মাত্র এই একটা শুভদিনে এতগুলো অভিজাত সজ্জনকে একসঙ্গে পেয়েছেন। তিনি একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চান না। আজকের আসরটা শুধু দু'কান খাড়া করে তাঁর বৈভবের ইতিবৃত্ত শুনুক, এটাই তিনি চান। যদি সে বিষয়টাই না-বলা ও না-শোনা থেকে যায়, তাহ'লে তাঁর সারা বছরের মৃগয়ালব্ধ বিত্তের ফেস্ ভ্যালু যেন কমে যাবে।

গুরুদয়ালবাবু বললেন—এই যুদ্ধের চোট সবচেয়ে বেশী পড়েছে আমাদের ওপর। দু'হাতে লুটছেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের দল। তাঁরাই বা কজন? হাতের আঙুলে গুণে বলে দিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা যারা বুদ্ধি আর পরিশ্রম খরচ করে দুটো উপায় করি, তাতেই সবারই চোখ কটকট করে। হন্যে কুকুরের মত বাজারে বাজারে দৌড়তে হয় মশাই। রেট বেচা কাজ—যিনি না ভুগেছেন তিনি কিছুই বুঝবেন না। অথচ যত আইন শুধু আমাদেরই বেলায়। দশ শিশি বার্লি কিনে একটু রেট রিস্ক করেছি কি সবাই হেঁ হেঁ করে তেড়ে আসছে—মজুতদার মজুতদার। ওরে বাবা, আমাদের ছেড়ে দিয়ে তাদের বল না, যারা আসল মালিয়াৎ—দশ হাজার শিশি বার্লি বাজারে ছাড়ুন না তাঁরা। ছুঁতেও যাব না আমরা। আমরা ব্রোকার মানুষ, তোমরা মাল যোগান দিলে, আমরা আর কত রেট খেলাতে পারি। মাল নেই, তাই রেট তেড়ে উঠছে। যুদ্ধের পর এই মুদ্দফরাশী ছেড়ে দেব। একটা কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং না ধরলে আমাদের আর শান্তি নেই।

ইন্দ্রনাথ এতক্ষণ নির্বিকারভাবে বসেছিল। বর্তমান দৃশ্যটার সঙ্গে যেন তার কোন দেখাশোনার সূত্র নেই। কিন্তু গুরুদয়ালবাবুর বাণিজ্যতত্ত্বের রহস্যটা তার কৌতূহল জাগিয়ে তুলছিল। ইনিয়ে বিনিয়ে সবিনয়ে বাখান করে গুরুদয়ালবাবু যা বলতে চান, তার সার কথা হলো—এই যুদ্ধের বাজারে তিনি বেশ কিছু পিটেছেন, পিটছেন এবং পিটবেনও। তবু প্রসঙ্গারম্ভে যুদ্ধটাকে একবার নিন্দা করে নিলেন—যেন যুদ্ধটার গায়ে একটা আহ্লাদের চড় মেরে মনের কৃতজ্ঞতাটা ঝালিয়ে নিলেন।

ইন্দ্রনাথ।—এই যুদ্ধের বাজারে তাহ'লে আপনাকে একেবারে লোকসান করিয়ে বসিয়ে দিয়েছে বলুন!

গুরুদয়ালবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন।—লোকসান? এতক্ষণে তাই বুঝলেন? লোকসান দেবে গুরুদয়াল বসু?

ইন্দ্রনাথ একটু খোঁচা দেবার উদ্দেশ্যেই বললো—তাহ'লে আপনি স্বীকার করছেন, যুদ্ধটা আপনাদের পক্ষে একটা শুভলগ্ন। তারপর, একাদশে বৃহস্পতি—ইনফ্লেশন। যুদ্ধটা যদি আরও পাঁচ বছর চলে, তাহ'লে...।

গুরুদয়ালবাবু আপত্তি করলেন।—ভয়ানক ভুল করছেন মশাই। আপনারা মনে করছেন সস্তায় কাঁচা টাকা কুড়োচ্ছি আমরা? ভুল আপনাদের। কোন ইনফ্লেশন হয়নি ; নেহাত বুদ্ধি আছে তাই টিঁকে আছি, নইলে কবে ভেসে যেতাম। গোড়ার গলদ হলো, পণ্যদ্রব্যের অভাব। পণ্য অল্প, অথচ খদ্দের প্রচুর। এর ফলে দর বেড়ে যাবেই—এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। এখানে আমার ও আপনার ইচ্ছে চলবে না। কালীকিংকরবাবু চুপ করে কেন? বলুন না—সত্যি কি মিথ্যে বলছি। আপনি তো অথরিটি মশাই। তিন তিনটে ব্যাঙ্ক চালাচ্ছেন। বলুন আপনি, ইন্দ্রনাথবাবুর সন্দেহটা একটু জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে...।

ইন্দ্রনাথ কালীকিংকরবাবুর দিকে তাকিয়ে অনুরোধ জানালো।—হ্যাঁ, বলুন আপনি। উনি এতক্ষণ যেভাবে জ্ঞানের গাঁট্টা মারছিলেন তাতে আমার বুদ্ধি থেঁতলে গিয়ে...

জয়ন্ত সিতার কাছাকাছি চেয়ারে বসেছিল। ইন্দ্রনাথের কথা শুনে হঠাৎ ঠোঁটের ওপর এক

পাটি দাঁত চেপে বসলো—যেন একটা উদ্যত বিদ্বেষকে আড়ালে ঢাকা দিল জয়ন্ত। পা দুলিয়ে দুলিয়ে সিতার অন্যমনস্ক দৃষ্টিটাকে যেন একবার সংকেতে ডাকবার চেষ্টা করলো। সিতা একবার তাকিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। কালীকিংকরবাবু তখন বলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন ঃ

—আমার কাছে দু'রকমের উত্তর তৈরি হয়ে আছে। কোনটা শুনতে চান? একটা ব্যাঙ্কওয়ালার উত্তর, আর একটা সোজা সাধারণ উত্তর—পথের লোকের মনের কথা।

ইন্দ্রনাথ।—ব্যাঙ্কওয়ালার উত্তরটা কি রকম?

কালীকিংকরবাবু—এই যুদ্ধের চোট সবচেয়ে বেশী পড়েছে ব্যাঙ্কগুলির ওপর...।

একটা হাসির সোর পড়ে গেল। গুরুদয়ালবাবু হাসলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যেন একটু মুখ ভার করে বললেন—না না। আমাকে অপদস্থ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল না।

কালীকিংকরবাবু।—গুরুদয়ালবাবু, ভুল করবেন না। আমিও যে কত বড় পদস্থ ব্যাঙ্কওয়ালা, তা আজ বাসে উঠেই টের পেলাম। শেয়ালদা আসবার ইচ্ছে ছিল, কণ্ডাক্টরকে একটা এক টাকার নোট দিতেই দরজা দেখিয়ে দিল—উতার যাও, রেজ্‌কি পয়দা করেগা হাম? যাক্ গুরুদয়ালবাবু বলছেন—পণ্যদ্রব্য কম আর খদ্দের বেশী। অতএব কি দাঁড়ালো?

ইন্দ্রনাথ।—বলুন। পথের লোকের মনের কথাটাই বলুন।

কালীকিংকরবাবু।—মশাই, যুদ্ধও করবেন অথচ একটু কষ্ট করবেন না, এ কি করে হয়? সরকার বাহাদুর যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করেন—ট্যাক্স বসিয়ে, ঋণ নিয়ে এবং তাতেও না কুলোলে, ইনফ্লেশন করিয়ে অর্থাৎ কাগজের নোট ছাপিয়ে সরকার তখন সবচেয়ে বড় খদ্দের হয়ে দাঁড়ান, সবসে আচ্ছা দর দেনে-ওয়ালা। এই ফাঁপা কারেন্সি প্রকারান্তরে একটি জবরদস্ত ট্যাক্স মাত্র। বাজারে সাতশো কোটি টাকার নোটের ব্যাঙাচি থৈথৈ করছে—লোকের হাতে পয়সা আছে। কিন্তু খরিদ করতে গেলে সরকারের দরের সঙ্গে পেরে ওঠে না। পণ্যলক্ষ্মীও এই দেমাকে দর চড়িয়ে তার কদর বাড়িয়ে দেন।

ইন্দ্রনাথ।—তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? যুদ্ধের জন্য সরকার মাল কিনছেন, মাল একচেটে করছেন—আসলে মালের ঘাটতির কারণেই দরের ডাকাতি শুরু হয়েছে।

কালীকিংকরবাবু।—কিন্তু এই ঘাটতি যে সরকারই করালেন, ইনফ্লেশন করিয়ে।

ইন্দ্রনাথ।—এর মধ্যে মজুতদারদের হাত নেই কি? বেপরোয়া মাল মজুত করে মালের ঘাটতি হয়েছে—অনেকে তো এই কথা বলেন।

কালীকিংকরবাবু।—ঘোড়ার আগে গাড়ি থাকে না। আগে ইনফ্লেশন তারপর মজুতদারী চোরাবাজার। স্বয়ং সরকার বাহাদুর যে সবচেয়ে বড় মজুতদারী আরম্ভ করেছেন। হরিলুটের বাতাসার মত এই যে কাগজের নোট বাজারে ছড়িয়ে পড়লো, তাতে সবারই হাতে পয়সা হয়েছে মনে করা ভুল। বে-সামরিক জীবনের সেবায় যারা কাজ করেছে, তাদের উপার্জন প্রায় সেই পুরনো দরেই বাঁধা আছে। শোনেননি কি যে, এসেন্সিয়াল আর নন্-এসেন্সিয়াল নামে দু' শ্রেণীর জীবন ভাগ করে দেওয়া হয়েছে?

ইন্দ্রনাথ।—আপনার কথার শেষে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়, সবার মূলে রয়েছে ইনফ্লেশন।

ডাক্তার মুখার্জি।—ইনফ্লেশনেরও মূলে যেটি রয়েছে, সেটিকে কি চিনলেন না?

ইন্দ্রনাথ।—না।

ডাক্তার মুখার্জি।—এই যুদ্ধটার কথা ভুলে গেলেন? যুদ্ধ না থাকলে এই সময় এত কড়া ইনফ্লেশনের দরকার হতো কি? এই যুদ্ধের বাঁশ না থাকলে, ইনফ্লেশনের বাঁশীও বাজতো না মশাই।

হঠাৎ প্রকাশবাবু এই প্রসঙ্গের স্থৈর্যকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন—আবার সমস্ত কথাকে টেনেটুনে সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে। ঐ একটি নন্দ ঘোষকে হাতের কাছে

পেয়েছেন, সব দোষ তারই ঘাড়ে না চাপালে আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না।

প্রকাশবাবুর উষ্মায় ইন্দ্রনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। কালীকিংকরবাবু দু'হাত জোড় করে, শেষে একটু থিয়েটারী ঢঙে মিষ্টি করে বললেন—এই অধম এযাবৎ ছত্রিশ হাজার টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছে। আরও কেনার মতলব আছে। আর যাই বলুন, যুদ্ধ বিরোধী বলবেন না, এর চেয়ে প্রচণ্ড মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না।

প্রকাশবাবু যেন নেহাত অযাচিতভাবে তাঁর অর্থনীতিজ্ঞতাকে জাহির করার জন্য বললেন--ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্টার্লিং জমার জোরেই নোট চালু করা হয়েছে। একে ইনফ্লেশন বলে না।

কালীকিংকরবাবু লম্বা একটা নিশ্বাস ছেড়ে চুপ করে গেলেন।

ডাক্তার মুখার্জি একটু সন্দিগ্ধভাবে কালীকিংকরবাবুর এই হঠাৎ মৌনতা লক্ষ্য করলেন। যুদ্ধ নেই, ইনফ্লেশন নেই, মজুতদারী ফাটকা নেই—এমন একটি নিষ্ফল পৃথিবীকে কালীকিংকরবাবুর অন্তরতম চেতনা বোধ হয় মেনে নিতে পারে না। পেট্রিয়টের গর্ব নিয়ে, শুধু কয়েকটা বড় বড় কথা বলার আনন্দে প্রকাশবাবুর যুদ্ধবাদকে যুক্তি দিয়ে ছিন্ন করতে পারেন তিনি, কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে চান না। এক জায়গায় এসে তাঁকে থেমে যেতে হবে। প্রায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে, অন্তত কাজের বেলায় তিনিও যুদ্ধবাদী। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের ভয়েই আর বোধহয় কিছু বলতে চান না কালীকিংকরবাবু। এইখানে এসে প্রসঙ্গটাকে তিনি এড়িয়ে যেতে চান। প্রকাশবাবুকে ডোবাতে গিয়ে তিনিও ডুবে যেতে পারেন। হয়তো সেই ভয় তাঁর আছে। ব্যাঙ্কার কালীকিংকরবাবুকে একটু ঘনিষ্ঠভাবেই চেনেন ডাক্তার মুখার্জি।

প্রকাশবাবু পরিশ্রান্তের মত নির্জীব সুরে তবু বললেন।—যুদ্ধের ভবিষ্যৎটা কি কিছুই নয়? আমাদের অভাব আর উপোসটাকে শুধু বড় করে দেখতে হবে।

কেউ কোন উত্তর দিল না।

প্রকাশবাবু একটু প্রেরণা ছড়াবার চেষ্টা করলেন।—একবার এই অভিমান ছেড়ে দিয়ে যদি যুদ্ধের জন্য অন্য দেশের লোকের দুঃখ ও ত্যাগের দিকটা দেখতেন, তাহ'লে এই উপোসটা আপনাদের কাছে এত বড় কথা হয়ে উঠতো না।

ইন্দ্রনাথ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো প্রকাশবাবুর অবস্থাটা কল্পনা করে। প্রকাশবাবু সোজাসুজি একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে চান, কিন্তু প্রসঙ্গের প্রশ্নময় স্রোতের কম্বলটা তাঁকে ভালুক হয়ে আঁকড়ে ধরে আছে, ছাড়তে চায় না। প্রকাশবাবুর জ্ঞানবুদ্ধির ওপর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনার এই পদ্ধতিটাকে ঠিক মনের মধ্যে গ্রাহ্য করে নিতে পারছিল না। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে একটা ভাল প্রসঙ্গের আলোচনাটাও শেষ দিকে কেমন একটু লাঠালাঠি গোছের হয়ে গেল।

প্রকাশবাবু শেষ দিকে একেবারে বিরক্ত হয়ে বললেন—বর্তমানের ক্ষতিটা সত্যিই ক্ষতি, যদি ভবিষ্যতে সেটা কোন লাভ না আনতে পারে। ভারতের বর্তমান দুঃখ যদি একটা মহত্তর ভবিষ্যৎ নিয়ে আসে, তবে আজ সেটা আদৌ দুঃখক্লেশ নয়।

গুরুদয়ালবাবু যেন একটা তন্দ্রার পর জেগে উঠলেন।—খুব সত্যি কথা। আপনারা দু'জনেই রাইট। কালীকিংকরবাবুর সঙ্গে আমি একমত—আজকের এই ইনফ্লেশনের জন্যই যত দুঃখ সইতে হচ্ছে। প্রকাশবাবুর সঙ্গেও আমাদের একমত হবে যে, যুদ্ধক্ষান্তির পর আবার একটা ডিফ্লেশনের জ্বালা সইতে হবে না—একটা মহত্তর ইয়ে আছে ভবিষ্যতে।

ডাক্তার মুখার্জি।—বর্তমান শেষ হয়ে গিয়ে ভবিষ্যৎ এসে পড়েছে, এইখানে হল্ট্ করাই ভাল।

গুরুদয়ালবাবু।—বর্তমানে শুধু স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকে আপনারা সিতাকে তার জন্মদিনে আশীর্বাদ করতে এসেছেন। আমার অহংকার—সিতা আমার মেয়ে। বাপের মুখে এই

স্নেহের প্রলাপ আপনারা মাপ করবেন। এ রকম মন, এ রকম প্রতিভা, শীলতা ও বুদ্ধি আমি দেখিনি।

—তুমি থামো বাবা। সিতা রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল।

গুরুদয়ালবাবু।—আমাকে ধমক দিয়ে স্যুট থেকে ধুতি-চাদরে নামিয়ে এনেছে সিতা। কত বললাম, ওরে ওটা আমার বিলাতিয়ানা নয়, আমি একটু ইন্টারন্যাশনাল মনোভাবের মানুষ ; কিন্তু কে শোনে? আপনারা আমাকে যে মিস্টার বসু ব'লে ডাকেন সেটাও ওর পছন্দ নয়। বেশ, সিতা মায়ীকি মরজি—আমি গুরুদয়ালবাবুই হয়ে গেলাম।

অতিরিক্ত আন্তরিকতায় গুরুদয়ালবাবু ছেলেমানুষের মত বকে যাচ্ছিলেন।—লোকের উপকার না করতে পারলে যেন সিতার গায়ের জ্বর ছাড়ে না। চাকর-বেয়ারাগুলি আমার কাছে ঘেঁষবে না ; জানে, দিদিমণির কাছে একবার হাত পাতলেই বাস্। এই ধরুন না, প্রকাশবাবুরা হাত পাততেই জাগৃতি সঙ্ঘে এক কথায় পাঁচশো টাকা চাঁদা ফেলে দিয়েছে।

সিতা যেন দুঃসহ লজ্জায় আর্তনাদ করে উঠলো।—কি বলছো বাবা। তোমার কথা কেউ বুঝতে পারছে না। তুমি চুপ কর!

•ইন্দ্রনাথের মুখে হঠাৎ এক ঝলক তপ্ত রক্তাভার জ্বালা ছড়িয়ে পড়লো। সম্মুখের দৃশ্যটাকে ভোলবার জন্য যেন মাথাটা হেঁট করে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। গুরুদয়ালবাবু তখনো খুশির উচ্ছ্বাসে চোখের তারা দুটি বড় করে সিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, বুঝতে চেষ্টা করছিলেন, সিতার আপত্তির অর্থটা কি?

ডাক্তার মুখার্জি অবস্থাটাকে এই সংকট থেকে মুক্তি দিলেন।—এখন একটু মিউজিক হলেই আমাদের সবারই ভাল লাগতো। সিতা মা, তুমিই যদি একটা নতুন গানটান শোনাও, তবে আমি এখন অন্য কিছু শুনতে চাই না।

গুরুদয়ালবাবু আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—হাঁ, আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো ডাক্তার মুখার্জি। হঠাৎ গান ছেড়ে দিয়েছে ; কিছুতেই গাইবে না। অথচ গত বছরেও আপনারা শুনেছেন—এমন নাইটিংগেলের মত ভয়েস্ খামকা নষ্ট করছে।

সিতা কাঁচুমাচু হয়ে ডাক্তার মুখার্জিকে লক্ষ্য করে বললো--কিছু মনে করবেন ন' কাকাবাবু, সত্যিই আমি আজকাল গাইতে পারি না।

গুরুদয়ালবাবু।--সেই ছেলেটিকে আসতে বলনি সিতা? তোমার পারুলদির কি জানি হয় ছেলেটি? দেবর বোধ হয়। শুনেছি ছেলেটি বেশ গাইতে বাজাতে পারে। সে এল না কেন?

সিতা।—সে এলেও গাইতো না।

গুরুদলায়বাবু।—কেন? প্রফেশনাল বোধ হয়? তা, কার্ডের সঙ্গে একটা পঞ্চাশ টাকার চেক পাঠিয়ে দিলেই পারতে।

সিতা।—না, তাকে কার্ড পাঠানো হয়নি।

গুরুদয়ালবাবু মুখ দিয়ে একটা শ্বাস ছেড়ে দিয়ে চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে বললেন —এইবার আপনাদের শেষবারের মত বিরক্তটা করে নেব।

তারপর হাঁক দিলেন—বয় মেজ লাগাও।

এবারে সিতার জন্মদিনে অন্য বছরের তুলনায় অনেকগুলি ব্যতিক্রম ঘটে গেল। এবার সেই গল্প ও গানের মজলিসী উল্লাস নেই, তার বদলে দুটো তত্ত্বভরা তর্ক যেন উৎসবের রগ চটিয়ে দিল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকেই একটু অপ্রতিভের মত বসেছিলেন। দেখে মনে হয়, উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, ইনি একটু উদাস—আর একটু দূরে প্রকাশবাবু একেবারেই অন্যমনস্ক। ডাক্তার মুখার্জি একটু ক্লান্ত। গুরুদয়ালবাবুর হাঁক শুনে সকলের চেতনায় একটু সাড়া লাগলো—এইবার ভোজন পর্ব আরম্ভ, তারপরই সম্মেলনের সমাপ্তি। এতক্ষণে যেন সবারই

চোখে পড়লো এই প্রীতি-সম্মেলনের হেতু রূপ আর মর্ম সিতার জন্মদিন—সেই সিতা চুপ করে বসে আছে। এতক্ষণ যেন সিতা ছিল না, শুধু সম্মেলনটাই ছিল।

এবারের জন্মদিনের উৎসবে অনেক ব্যতিক্রম। সিতার মনেও তাই। সিতার হঠাৎ মনে হয়েছে, আজ এখানে যেন সে একটু বেমানান হয়ে গেছে। এই উৎসবে সেও যেন একটি অভ্যাগত।

অনেক ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। গুরুদয়ালবাবু ধুতি চাদর পরে রয়েছেন। সিতারও রূপসজ্জায় সেই হেলিয়োট্রোপ আর নেই—শেড-মানানো শাড়ি আর জামপারের আহ্নিক বর্ণবিবর্তন ঘুচে গেছে। কাঁধের দু'পাশে নীল লিমারিক ব্লাউজের দুটি পুষ্পিত শ্রাগ্ আজ উপড়ে ফেলে দিয়েছে সিতা। গাউন-ঢঙের যে নিভাঁজ ক্রেপের শাড়িগুলি বর্মের মত এতদিন সংক্ষেপে তার তনুরুচিকে সবার গোচরে রেখে পাহারা দিত—আজ হঠাৎ সেগুলিকে বড় বেশী নিলাজ মনে হয়েছে সিতার। তাই একটি ধানী রঙের জামদানী পরেছে সিতা। দোলন চাঁপা প্যাটার্নে একটা রূপোর বাজুবন্ধ দুলছে হাতে। চোখের চাউনিটাও যে আজ এত নিবিড়, তার কারণ শুধু তার ঘন পক্ষ্মপল্লবের ছায়া নয়—দুটো বর্ণচোরা কাজলের আয়ত রেখা লুকিয়ে আছে সেখানে। পায়ে জরির কাজ করা স্যাণ্ডেল থাকলেও সরু আলতার টান ঢাকা পড়েনি। সাদা ফুলের মালা দিয়ে বড় করে খোঁপা বাঁধা। যারা কখনো দেখেনি, তারাই একটু আশ্চর্য হয়ে দেখবে এই কানাড়া ছাঁদের কবরীবন্ধ। রিভাইভালিস্ট শিল্পীর আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে সিতাকে—একটি অতি আধুনিক রূপের ফুল পুরাতন বর্ণে ও সৌরভে ফুটে উঠেছে।

প্রকাশবাবুর দিকে লক্ষ্য রেখে গুরুদয়ালবাবু বললেন—আপনাদের সঙ্ঘটা সত্যিই ডেঞ্জারাস্। কি যে মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন—সিতা প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার এরিস্টোক্রেসি ভাঙবে। আমি বলেছি, বেশ তাই হোক তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ। আপনারা জনতার সেবায় নেমেছেন, সিতাকে নামিয়েছেন। আপনাদের আদর্শটা যে খুবই মহৎ সন্দেহ নেই। সমাজের সকলের সঙ্গে সুখদুঃখ সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে—খুব ভাল আইডিয়া। সিতা বলছে—শুধু আইডিয়া নিয়ে থাকলে চলবে না, জীবনে সেটা কাজে লাগাতে হবে। দেখুন না, কেমন গাঁয়ের মেয়েটি সেজে বসে আছে। হ্যাঁ, আমার আর একটু দুষ্কৃতি আপনাদের মাপ করতে হবে। আজ শুধু ডাল-ভাতেই আপনাদের তৃপ্ত হতে হবে। শুধু ডাল-ভাত—গরিব বাংলাদেশের ছ'কোটি লোকে যা খেয়ে বেঁচে আছে।

দুটো বয় বড় বড় দুটো বারকোশ ব'য়ে নিয়ে এল—ছোট ছোট বাটি সাজানো তার ওপর। বাটিতে ডাল। এক কিস্তি ডাল পরিবেশনের পর আর এক কিস্তি বাটি এল, এটাও ডাল। তারপর আরও। সবসুদ্ধ তের রকমের ডাল।

রুপোর বোল'এ করে একরাশ ঝরা জুঁইয়ের কুঁড়ির মত ভাত এল। নিমন্ত্রিতদের পাতে পাতে মাত্র এক চামচ করে সুশ্বেত অন্ন নৈবেদ্যের মত সাজিয়ে দেওয়া হলো।

গুরুদয়ালবাবু উঠে দাঁড়ালেন।—এই চালটার নাম লক্ষ্মীকাজল। নামে ও চেহারায় কত পার্থক্য দেখছেন! যেমন আমি, গুরুও নই দয়ালও নই—স্রেফ ব্রোকার।

আবার এক বোল ভাত। গুরুদয়ালবাবু বয়টাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এক চামচ করে দাও। এ চালটার নাম কনকচূর।

কোথাও যেন অন্নপূর্ণার ঝাঁপি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বয়গুলি অকাতরে সেইখান থেকে একের পর এক ভাতের পসরা কুড়িয়ে আনছে। নিমন্ত্রিতদের বিস্ময়ের ওপর ডুগডুগি বাজিয়ে গুরুদয়ালবাবু যেন একটা ভেল্কি খেলতে লাগলেন—দাও, একটু চটপট দিয়ে দাও। এটার নাম দেওয়ানপ্রসাদ, ওটার নাম ভবানীভোগ, আর এটা হচ্ছে চন্দনশালি। আচ্ছা এইবার নিয়ে এস—সোনাজিরা, সোহাগমণি আর...।

সবসুদ্ধ পনের রকম চালের ভাত। চালহীন কলকাতার কপালে চরম আভিজাতিক

চালিয়াতি। খাওয়া আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসরটা তর্ক ও বক্তৃতার কবল থেকে যেন ছাড়া পেল, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিমন্ত্রিতদের ঘরোয়া আলাপের কলোচ্ছ্বাসে ভরে উঠলো। ইন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে বললো—বড় অস্বস্তি বোধ করছি প্রকাশবাবু।

প্রকাশবাবু--কেন? কি হলো তোমার?

—একটা প্রহসন দেখছি।

—ওসব হামবাগ্‌দের কথায় কান দিও না।

—কাদের কথা বলছেন?

—ঐসব ব্যাঙ্কার আর শতং মারী ডাক্তারদের!

—আমি তাঁদের কথা বলছি না ; গুরুদয়ালবাবুর বড়মানুষী ভাঁড়ামি আর সহ্য হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি শেষ হলে বাঁচি।

—ওঁর কথা ছেড়ে দাও। ওঁরা হলেন সাদাসিধে মনখোলা মানুষ। ওঁদের একবার বুঝিয়ে দিতে পারলে ঠিক বোঝেন। কারণ ওঁদের মধ্যে বুদ্ধির কোরাপ্‌শান্‌ নেই। কিন্তু ঐ যে দুটি ঝানু কুতার্কিক এতক্ষণ পলিটিক্‌স্‌ আর ইকনমিক্‌স্‌ নিয়ে পণ্ডিতি করলেন, ওঁরাই হলেন সাংঘাতিক জীব। ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক তবু একটু পদের আছেন কিন্তু ঐ ডাক্তারটা...

ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল সিতাকে বলছিলেন—বড় বড় কাজে হাত দিলে বাধাটাও বড় হয়েই আসে। লোকের বুঝতে দেরি হয়, বুঝতে ভুলও করে। ডাক্তার মুখার্জিও অবশ্য একদিন তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। আমরা শুধু কাজ করে যাব ; নিন্দে শুনে মুষড়ে যাবে, জাগৃতি সঙ্ঘ সে ধাতুতে তৈরি নয়।

সিতা।—জাগৃতি সঙ্ঘের নিন্দে কারা করলেন?

ঊর্মিলা।—এতক্ষণ শুনলেন না? ডাক্তার মুখার্জি আর কালীকিংকরবাবু কী ভয়ানকভাবে, কতগুলি কুযুক্তি দিয়ে, অল্পবিদ্যের ভয়ঙ্করী কেরামতি দেখিয়ে...।

সিতা।—আপনাকে আর একটু ডাল দিক? মুগের ডাল?

ঊর্মিলা।—না, আর চাই না।

গুরুদয়ালবাবুর সুউচ্চ আনন্দোদ্গার শোনা গেল।—বড় আনন্দ। বড় আনন্দ। বছরে মাত্র একটি দিন। আপনাদের মত এতগুলি সজ্জনকে আবার যে কবে এক সঙ্গে পাব! বহুদিন অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি, নইলে আজ একবার বেহালাটা নিয়ে বসতাম।

ডাক্তার মুখার্জি মুখ নিচু করে খেতে খেতেই বললেন—হ্যাঁ, যখন রোম নগরী পুড়ছে তখন...।

গুরুদয়ালবাবু।—রোমের বুঝি হয়ে এল? অ্যালায়েড আর্মিকে আর ঠেকাতে পারছে না। আগেই বুঝেছিলাম পারবে না।

দারোয়ানটা হল্লা শুরু করেছে। ফটকের কাছে একটা ঠুলিপরা আলো খানিকটা ঘেয়ো অন্ধকার ছড়িয়ে রেখেছে। আশেপাশে কয়েকটা ঝাউ চোরের মত চুপ করে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। আর দেখা যায়, ফটকের গরাদ। গরাদের ওপারে যেন একটা থিয়েটারের ছেঁড়া সীন অল্প অল্প দুলছে। দারোয়ানের ধমকের হুংকারে সেই সীন একবার থরথর করে কেঁপে আবার আগের মত দুলতে লাগলো।

হাঁড়ি আর সরা হাতে একটা নোংরা ক্ষুধার্তের জনতা ফটকের গরাদের ওপর হুমড়ি দিয়ে পড়ে আছে। উৎসবের আসর থেকে সেই মানুষগুলির মুখ আর চোখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও চিনতে পারা যায়। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, ফটকের ওপারে যেন প্রাচীন গুম্ফার একটা ভগ্নাংশ এসে লেগে রয়েছে। ভাঙাচোরা সব মূর্তি—নাক, চোখ, হাত-পা সবই কেমন ভাঙা ভাঙা। আজকের জন্মোৎসবের সজীব প্রসন্নতার মধ্যে ওদের খুবই অবাস্তব ও অবান্তর মনে হয়।

হল্লা বেড়ে চললো। নিমন্ত্রিতদের কলালাপ ততই মৃদুতর ও মন্দতর হয়ে আসতে লাগলো। প্রত্যেকেই এক একবার ফটকের দিকে একটু অন্যমনস্কভাবে আলগোছে ভীতভাবে তাকাচ্ছিলেন। এই জন্মোৎসব নাটকের উপসংহারে যখন তৃপ্তোদর নিমন্ত্রিতদের একটু রোমন্থনের পালা, ঠিক সেই সময় অভাবিতভাবে একটা শত্রুবাহিনী যে দুর্গতোরণে হানা দিয়েছে। অভ্যাগতদের উদ্বেগ আর অস্বস্তি তাদের মুখের চেহারায় আবিষ্কার করা যায়—কারণ, এই ফটক দিয়েই সবাইকে এখন বাইরে যেতে হবে, গাড়িগুলি সব বাইরেই আছে।

তবু ভরসা, দারোয়ানটা হুংকার দিচ্ছে। অতিথিদের মুখগুলি নীরব থাকলেও, আন্তরিক একটা ইচ্ছা ভেতরে ভেতরে সরব হয়ে উঠছিল। একটা হুংকার আর সামান্য একটা লাঠির খোঁচা দিয়েই দারোয়ান হাঁপিয়ে পড়ছে কেন? এই মারাত্মক আবির্ভাবকে কি ওভাবে হঠাতে পারা যায়? দারোয়ানের লাঠিটার মানবতাবোধ একটু বেশী প্রখর। যদি লোকটা এখন ভালয় ভালয় হঠাৎ সাহসী হয়ে একচোট লাঠি চালাতে পারে—তবেই উদ্ধারের পথটা পরিষ্কার হয়ে যায়। কালচার আর ভদ্রতার বোঁচকা নিয়ে যে যার সুবিধা মত গা বাঁচিয়ে তাহলে সরে পড়তে পারেন।

মনে মনে মুষড়ে পড়ছিলেন সবাই। দারোয়ানটা শুধু মুখের গর্জনে তাড়া দিয়ে কর্তব্য সেরে দিচ্ছে। কিন্তু ফল হচ্ছে না কিছু। কিছুক্ষণ আগেই দু'দুটো বেয়াড়া রাজনীতি আর অর্থনীতির প্রশ্ন এই সম্মেলনের মেজাজ তিরিক্ষি করে দিয়েছিল। তার ওপর যদি সভাভঙ্গের এই প্রাক্কালে আর একটা ভব্যতাহীন প্রশ্ন কেউ পেড়ে বসে, কেউ যদি বেফাঁস বলে ফেলে—ওদের ওপর আমাদের একটা কর্তব্য আছে, তাহ'লে তর্কের হালে আর পানি পাওয়া যাবে না। হয়তো কাজের কথা এসে পড়বে। হয়তো এখনি ক'রে দেখাতে হবে। মূলতুবী ক'রে রাখার উপায় থাকবে না। সব তাত্ত্বিকতা, সামাজিকতা ও ভদ্রয়ানার ওপর নোটিশ না দিয়েই সমস্যাটা যেন একটা পরোয়ানা হাতে তুলে ফটকের ওপারে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সময় পেলে কাল সকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা বিবৃতি পাঠিয়ে এই সমস্যার একটা সমাধানের পথ সহজে দেখিয়ে দিতে পারা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন পথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ফাঁদে পড়া শেয়ালের মত করুণভাবে সবাই ফটকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতগুলি ভদ্র মনস্বী ও মনস্বিনীর হৃদয় যেন পরস্পরের স্পন্দনটুকু টের পাচ্ছিল। যেন একসূত্রে হঠাৎ তারা গেঁথে গেছেন। মতান্তর ও তর্কের উপদ্রবে এতক্ষণ যারা বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ মনে মনে তারা এখন একই ফ্রন্টে মিলে গেছে—একটি কথার অনুরোধও খরচ করতে হয়নি। সবাই আজকের উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে এই উদর তৃপ্তির উদগারটুকু সযত্নে বাঁচিয়ে সরে পড়তে চায়।

দারোয়ানটা একটা চৌবাচ্চা থেকে এক বালতি ময়লা জল নিয়ে উচ্ছিষ্ট-গৃধ্নু জনতার ওপর ছিটিয়ে দিল। নিমন্ত্রিত সজ্জনেরা আড়চোখে তাকিয়ে সে-দৃশ্য দেখছিলেন। কালীকিংকরবাবু একবার পকেট ঘড়িটা বের করে সময় দেখলেন।

দারোয়ানটা উচ্চস্বরে কদর্য খিস্তিভরা ভাষা ও ততোধিক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে জনতার ওপর যেন কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়তে লাগলো। সজ্জনেরা বসে বসে সবই শুনলেন আর দেখলেন। ডাক্তার মুখার্জি হাতছড়িটা হাতে তুলে নিয়ে পা দোলাতে লাগলেন।

দুম দাম্ শব্দ ফাটতে শুরু করলো। সজ্জনেরা দেখলেন—দারোয়ানটা বেপরোয়া চড় চাপড় চালাচ্ছে। সবাই যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিলেন। প্রকাশবাবু খদ্দরের চাদরটা একটু গুছিয়ে নিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলালের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

দারোয়ানটা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু জনতা যেন শত নখর দিয়ে ফটকের গরাদ আঁকড়ে ধরে আছে। মরণ পণ করে, উত্তীক্ষ্ণ প্রতিজ্ঞার কণ্টকবর্ম পরে একটা ক্ষুধার্ত শজারুর পাল হানা দিয়েছে। কোন ভীতি বা শাস্তি আজ ওদের আক্রমণ ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

গুরুদয়ালবাবু অলসভাবে আসরের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। তার পরেই যেন একটি ভদ্রোচিত ভণ্ডামির, একটি পরিপাটি চম্পটের পথ আবিষ্কার করলেন।—আমার ড্রইং-রুমে নতুন একটি জিনিস রয়েছে, সম্প্রতি এসেছে, সেটি আপনাদের দেখাতে পারলে খুশী হতাম।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল উৎসাহিতভাবে সাড়া দিলেন।—নিশ্চয় দেখবো আমরা।

গুরুদয়ালবাবু সকলকেই উদ্দেশ্য করে বললেন—সম্প্রতি একখানি তিব্বতী পেন্টিং কিনেছি।

নিমন্ত্রিতেরা উঠলেন। গুরুদয়ালবাবু পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অল্প কিছুদুর হাঁটার পর একটা পাতাবাহারের কেয়ারি পার হয়ে খিড়কির দরজার কাছে পৌঁছলেন। নিমন্ত্রিত সজ্জনতা তুড়তুড় করে পেছনে পেছনে এসে পৌঁছলো। একটা আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কতগুলি ভীরুচিত প্রাণ চোরাপথে পালিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর দৃশ্য! এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা। বাংলাদেশের একটা খাঁটি আত্মার সমাবেশ—ক্যাপিটালিস্ট, ন্যাশনালিস্ট, কম্যুনিস্ট—শত্রু দলের চোখ এড়িয়ে কেমন গুটিসুটি হেঁটে চলেছে, কত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে সবাই।

খিড়কি দিয়ে ঢুকে একটা বড় চত্বরের মত জায়গায় সবাই কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। গুরুদয়ালবাবু সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। আবার এগিয়ে চললেন সবাই। চাকরদের ঘরগুলি পাশে পড়ে রইল। রান্নাঘরের সুমুখ দিয়ে লম্বা করিডর ধরে খাবার ঘরের কাছে পৌঁছতে কয়েকটি মিনিট লাগলো মাত্র। গুরুদয়ালবাবুর সঙ্গে অতিথির দল বাঁ দিকের বারান্দার দিকে চললেন। তার পরেই একটা হল আর তার উত্তর দিকে হলো ড্রইংরুম। ড্রইংরুমে পৌঁছে মুক্তির শ্বাস ছাড়তে পারা যায়। এর পরেই মাত্র কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ, গাড়ি বারান্দা। তার পরেই লতাবিতানে সাজানো সদর ফটকটা—সাধুর আশ্রমদ্বারের মত নীরব নির্জন উদার ও প্রশস্ত। তিব্বতী পেন্টিং চক্ষের পলকে দেখে নিয়ে এক একটি গুড-নাইট সম্ভাষণ ব্যস্তভাবে পথে নেমে পড়লো। কেউ হেঁটে ট্রামপথের দিকে, কেউ বাগানের ফটকের দিকে গাড়ি আনতে ছুটলেন।

আসর ভাঙলো। ড্রইংরুমে একটি সোফার ওপর অবসন্নভাবে বসেছিলেন গুরুদয়ালবাবু। সিতা চুপ করে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। পাশে জয়ন্ত মজুমদার।

জন্মোৎসবের প্রীতির আসরটা ভাঙবার আগে আর একটা চরম ব্যাতিক্রম ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সিতাকে আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানাতে সত্যই সকলে ভুলে গেছে। নিমন্ত্রিতেরা যেন এতক্ষণ একটা বন্দীশালায় ছটফট করছিলেন, মুক্তির পথ পাওয়া মাত্র ছুটে পালিয়ে গেলেন সবাই।

জয়ন্ত মৃদুস্বরে বললো—আজ তোমার শুভ জন্মদিনে তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ ছিল সিতা।

সিতা।—আজ আর কিছু বলো না জয়ন্ত। আমি বোধ হয় উত্তর দিতে পারবো না।

জয়ন্ত।—তুমি যদি কিছু না মনে কর, তবে তোমার বাবাকে বলতে পারি।

সিতা।—ভুল করছো জয়ন্ত। আজ আর তুমি আমার দুঃখের বোঝা বাড়িও না।

জয়ন্ত।—দুঃখের বোঝা?

সিতা।—তোমার চোখ নেই।

জয়ন্ত।—আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না।

সিতা।—আজ সিতা বসুর জন্মোৎসব না মরণোৎসব? আজকের উৎসবে বাবা পন্টিয়াক কিনেছেন, ইনফ্লেশন হয়েছে, জনযুদ্ধ বেধে গেছে, পনের রকম ভাত, আর ডালের সৎকার হয়েছে, শুধু সিতা বসুই বাদ গেছে। সিতা বসু একটা আশীর্বাদও পায়নি আজ। আজকের উৎসবে অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু মানুষ কেউ আসেনি। নইলে, সিতা বসু একটা

আশীর্বাদ পেত নিশ্চয়। যদি একটিও মানুষ থাকতো তবে...।

জয়ন্ত।—কিন্তু আমার অপরাধ নিও না সিতা। আমি সে দলে নই।

সিতা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ রুষ্ট ও স্পষ্ট স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো—হ্যাঁ, তোমারও অপরাধ আছে।

জয়ন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো।—আমার অপরাধ?

সিতা।—বাবা যখন শিশিরের নামে যাচ্ছেতাই বলছিলেন, তখন তুমি তো একটি কথাও উচ্চারণ করে প্রতিবাদ করলে না।

জয়ন্ত।—আমি তাঁর একটা ধারণার প্রতিবাদ করতে যাব কেন?

সিতা।—বুঝেছি, সায়লেণ্ট ওয়ার্কার তা করতে পারে না।

জয়ন্তর মনটা বোধ হয় খুব শক্ত ও সহনশীল ধাতুতে গড়া, সিতার কথার আঘাতে অমনি ভেঙে পড়বার মত নয়। অনুচারী ছায়ার মত জয়ন্ত সিতার ভালবাসাকে যেন ধাওয়া করে ফিরছে। ছায়া, তাই তাকে সরানো এত কঠিন। আঘাতে অপমানে কোন ফল হয় না। জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সিতা।—তোমার গাড়িটা এবারে নিয়ে এস জয়ন্ত।

জয়ন্ত।—কোথাও যেতে চাইছ?

সিতা।—হ্যাঁ।

জয়ন্ত।—কোথায়?

সিতা।—বালিগঞ্জ প্লেস।

শিশিরের বাসার সামনে একটা মোটরকার নিশীথ-মাতালের মত যেন চুপি চুপি টলতে টলতে এসে থামলো। সিতা নেমে পড়লো। রাত্রি দশটা।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো—আবার কখন গাড়ি নিয়ে আসবো তোমার জন্য?

সিতা।—এস, কিছুক্ষণ পরে।

জয়ন্ত।—যদি একেবারে ভোরেই নিয়ে আসি, তাহ'লে তোমার আপত্তি আছে কি?

—জয়ন্ত! সিতার মুখের সাবধানবাণী রাত্রির স্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধ্যে যেন সশব্দে জ্বলে উঠলো। জয়ন্ত ছায়া, কিন্তু তার দাঁতগুলি বোধহয় লোহার তৈরি। নইলে এই কঠিন নির্লজ্জ অভিযোগ কি করে তার মুখ থেকে ভাষা ধরে বের হয়ে আসে?

স্টীয়ারিং ধরে বসে আছে, এই যে তুচ্ছ লঘু মূর্খ একটি সুবাধ্য দাস্যমূর্তির ছায়া, ওর হৃৎপিণ্ডে এতখানি দুঃসাহসের শোণিত এল কোথা থেকে? পথ থেকে সরে যাক এই ছায়া—চিরকালের মত। সিতার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের গায়ে যেন পোষা কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে! একটা ক্ষমাহীন প্রতিশোধ স্পৃহা চক চক করছিল সিতার চোখে।

সিতা বললো—হ্যাঁ, একেবারে ভোরেই গাড়ি নিয়ে এস।

সেকেণ্ড গীয়ারে একটা আচমকা লাফ দিয়ে জয়ন্তর গাড়িটা যেন ভয় পেয়ে সরে গেল। রুস্তমজী স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ঘুরে গেল বাঁদিকে। ইঞ্জিনের কাতরানি আর শোনা গেল না।

বিপিনের কাজ সারা হয়ে গেছে। বিপিন বাইরে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই।

কেনিং থেকে কোন দল পৌঁছলো কিনা, অন্নহারাদের এক একটি আড্ডায় গিয়ে বিপিন প্রশ্ন করে বেড়ায়। শুধু রাত্রির অন্ধকারে নয়, দিনের বেলার আলোতেও বিপিনের চোখে একটা ধাঁধা লেগে থাকে। একটু দূর থেকে যে কোন সসন্তান মেয়েকে দেখা মাত্র প্রথমে চমকে ওঠে, তারপর শিউরে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে বিপিন। টুনা আর টুনার মা বলেই

মনে হয়। পরক্ষণে বিভ্রম ঘুচে যায়, অন্যদিকে আর একটি আড্ডার দিকে বুকভরা কৌতূহলের বেদনা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। আবার থমকে দাঁড়াতে হয়।

রাত্রির অন্ধকার। এখানে এক জায়গায় ঘাস আর ধুলোর ওপর একটা ছেঁড়া কাঁথা ঢাকা দিয়ে কোন মা ও ছেলে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিপিন আস্তে আস্তে একটা দেশলাই জ্বালে। ঘুমন্ত মা-ছেলের মুখ দুটো ঢাকা থাকায় দেখা যায় না, শুধু মা-গোছের জীবটির পায়ের পাতা দুটো বার হয়ে আছে। পাকা চোরের মত চুপি চুপি সেইখানেই তাক বুঝে বসে পড়ে বিপিন ; কাঁচা চোরের মত বুকের ভেতর একটা শ্বাসবায়ুর গোলক টিপটিপ করে আছাড় খেতে থাকে—ভয়ে আগ্রহে লোভে ও সংশয়ে। আবার দেশলাই জ্বালে। কাঁথা-ঢাকা ছেলেটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যতখানি ঠাহর করা যায়, প্রায় টুনার সমানই মনে হয়। কিন্তু তার চেয়ে বেশি মিলে যায়, ঐ একজোড়া অল্পগৌর পায়ের পাতা, শুধু চুটকি জোড়া নেই, টুনার মায়ের আছে। দেশলাইয়ের কাঠি পুড়ে শেষ হয়ে যায় ; বিপিন মাথায় হাত দিয়ে ধুঁকতে থাকে।

হঠাৎ ঘুমন্ত স্ত্রীলোকটির নিশ্বাসের শব্দ একবার জোরে নাক ডেকে শেষ হয়ে যায়—ধড়ফড় করে উঠে বসে।—এত রাত্রে আবার মরতে এলে কেন?

স্ত্রীলোকটি রুক্ষ স্বরে একটা ঝামটা দিয়ে উঠে বসলো, হাই তুলে গা-মোড়া দিতে লাগলো। বিপিন যেন তার নিজের অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল। নিস্পন্দ মূর্তির মত বসে থাকে বিপিন। স্ত্রীলোকটি আবার বলে—ফটিক আসে নাই?

বিপিনের নিরুত্তর মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—ওমা, কে গো ওখানে? কথা বলে না যে গো!

বিপিন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল—তোর যম।

শিশির যে কিছু ফল কিনে নিয়ে যাবার জন্য বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, সেকথা একেবারে ভুলে গেছে বিপিন। রাত হয়ে গেল, সব দোকান বন্ধ হয়ে গেল—সেদিকেও কোন হুঁশ ছিল না বিপিনের। রেল লাইনটা পার হয়ে একবার কসবার দিকটা দেখে আসবে কিনা, বিপিন তখন শুধু তাই ভাবছিল। পথের গ্যাসের আলোগুলি একে একে নিভে যায়, বিপিনের মনের ভেতর তার ভাবনার জোরটাও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে। এই অন্বেষণের যেন শেষ হবে না কোনদিন। টুনা আর টুনার মায়ের অভিযানও বোধহয় ক্ষান্ত হবে না। তারা শুধু চিরকাল আসতেই থাকবে।

একটু এগিয়ে গিয়ে আবার মন্থর হয়ে এল বিপিন। গামছাটা মাথার ওপর টেনে, কান ঢাকা দিয়ে ক্লান্তভাবে সেইখানে বসে পড়লো। একটা বিড়ি ধরালো, মনের অস্বস্তিটাকে একটু চাপা দেবার জন্যই বোধ হয়।

চারদিকের দৃশ্যটার দিকে চোখ পড়তেই বিপিনের গায়ে কাঁটা গিয়ে উঠতে লাগলো। নরকের একটা রাত চুপিসারে যেন এইখানে এসে ঢুকে পড়েছে। একটা প্রকাণ্ড পাপাত্মার ছাউনি ঘুমোচ্ছে। জাত নেই, ধর্ম নেই, স্বামিপুত্রের মায়া নেই—শুধু পেট-চাঁড়ালের পুজো। শুধু দুটো খেয়ে বাঁচবার জন্য ঘর ছেড়ে এই নরকে এসে সবাই ঢুকছে। মরার পর নাকি সবাইকে একটা নরক ভুগতে হয় ; সে-নরক কি এর চেয়ে দেখতে খারাপ?

—টুনার মা'ও এই পথেই পা বাড়িয়েছে। কিচ্ছু বুঝলো না মাগী। এখনো মনের সাধে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে ধেইধেই করে আসছে। এখনো কিছু বুঝছে না।

—কিন্তু তাকে আটকাবে কে? সে আসবেই। অন্ধকারে গাছতলায় এক কোণে শুয়ে শুয়ে এই নরকরাত্রির আস্বাদ নেবে। তারপর? তারপর, তাকে আর ঘরে ডেকেই বা লাভ কি?

ভাবতে ভাবতে বিড়ি নিভে গেল বিপিনের। একটা বন্য আক্রোশ হাতের পেশীগুলিতে দপদপ করতে লাগলো। মাতলার খালে কি একটা কুমিরও নেই? হিড়হিড় করে মাগীকে

টেনে নিয়ে গিয়ে ইহজন্মের মত গুম করে দিতে পারে না? আর টুনা? এত লোক আসছে, টুনাকে কি কেউ পথ থেকে কোলে তুলে নিয়ে আসবে না? বিপিন বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলে—শালার ভগবানের যদি কোন বিচার থাকতো, এভাবে একটা সুরাহা নিশ্চয় হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়।

সামনে লক্ষ্মী বস্ত্রালয় বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দোকানের ভেতর থেকে ঘড়ির শব্দ আসছে, টুং টাং করে এগারোটা বাজলো। একটা ঘরমুখো ট্রাম ঊর্ধ্বশ্বাসে বালিগঞ্জ ডিপোর দিকে ছুটির আনন্দে দৌড়ে চলেছে—ট্রামের টালিটা থেকে থেকে নীল আলোকের ঝিলিক ছাড়ছে।

বাবুর জন্য ফল কেনা হয়নি। বিপিন হতাশ হয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। আর ভুল শোধরাবার উপায় নেই, সারা শহরটা নিঝুম হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি খুব পছন্দ হয়েছে শিশিরের। আজ সারা দিন ধরে এই কবিতাটির ওপর একটা কঠিন সুরের পরীক্ষা গেছে। শুধু স্বরলিপিটা লিখে শেষ করতেই পঞ্চাশ পাতার ওপর লেগেছে। লিখতে লিখতে রাত হয়ে গেছে। শেষ হলো এতক্ষণে।

সমস্ত কবিতাটিকে পঙক্তি হিসাবে দশটা অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছে শিশির। এক একটি অধ্যায়ের শেষে দোহার দেবার মত কতকগুলি উপজ নিজেই রচনা করে নিয়েছে। ধ্রুপদের রাগে, ধামার তালে, একটা বাবুয়ালি লোভের সুগম্ভীর ষড়যন্ত্র ধীরে ধীরে সরব হয়ে ওঠে। হঠাৎ দুই বিঘা জমির হৃৎপিণ্ড নখ দিয়ে আঁকড়ে ধ'রে সেই ষড়যন্ত্রের সুর উল্লাসে দুলতে থাকে।

মাটির আত্মা বিদ্রোহ করে,—'দুই বিঘা জমি নয় দুই বিঘা সোনা। প্রাণ গেলেও কেউ ছেড়ো না। হোক বিঘে দুই ভুঁই—তাকে ছাড়তে নেই। দুই বিঘে ধূলি ধূলি নয় সে'যে জীবনের রেণুকায়া। তাকে ছাড়তে নেই। তোমার ধানের ঘর—তোমারই মানের ঘর। যৌবনে বাসর—সংসারে দোসর। বাবুদের খাতায়, ঋণ লেখা থাক পাতায় পাতায়। ভয় কি তাতে? জমির মান রইবে মাথায়—চাষী ভাইয়ের লাঠি হাতে।'—ধীর মূর্চ্ছনা ভরা তান আর দুন চৌদুনে লয় বদলফের করে উপজগুলিকে সুরে সেধে রেখেছে শিশির।

মহাজনের গাথা যে সুরের পথে শত বছর ধরে হৃদয়ে নতুন বাণী পৌঁছে দিয়ে এসেছে, সেই তৈরী পথেই তার চারণ-ব্রতের আরম্ভ। শিশির বিশ্বাস করে, সারা দেশের মন জুড়ে একটা সুরের মানুষ কান পেতে বসে আছে। হঠাৎ একটা সিমফনির ঝড় তুলে তার কাছে পৌঁছনো যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে এই অভিনবত্ব নিছক একটা আক্রমণ মাত্র, আবির্ভাব নয়। কিন্তু ঐ সপ্তম সিমফনির লক্ষ ক্লান্ত আত্মার পদধ্বনির করুণতাটুকু একটি ভজনের মধ্যে সুরের অন্তরায় ছড়িয়ে দিতে পারা যায় ; সারা দেশের লোক শুনবে বুঝবে মুগ্ধ হয়ে যাবে—সেইখানে শিল্প সত্য হয়ে ওঠে।

মনের মত একটা কাজ এতদিন পরে আবিষ্কার করেছে শিশির। জীবিকার জন্য যেটুকু তাকে কাজ করতে হয়, সেটা মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ঠিক মাসের দশ তারিখে বাড়ি থেকে দেওয়ান মশাইয়ের মনিঅর্ডার যদি না পৌঁছয়, তবে একটা পোস্টকার্ড লিখতে হয়—স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। আর কোন কাজ নেই। কাজের চিন্তা নেই। সিতা এসে এতদিন চিন্তার একটা দিক দখল করে বসেছিল। সে বালাই মিটে গেছে। শিশিরের মনে হয়েছে, কাজের মধ্যে না থাকলে তার মনুষ্যত্ব ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়ে যাবে, সিতার মত সাধারণ একটি মেয়ের মুখের একটা ধিক্কারে তার ভালবাসার মর্যাদা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। কাজই হলো জীবনের চক্ষু। নিছক সুর শিল্প সাহিত্যেরই বা মূল্য কতটুকু, যদি তা কাজের রূপে ফুটে উঠতে না পারে। বনবাসীর নিস্পৃহা, বোবার আহ্লাদ আর গুলিখোরের

চাঁদের ঘুড়ির মতই সেসব অর্থহীন ও অবাস্তব।

প্রথমে একটা প্ল্যান মাথায় এসেছিল, একটা সভা আহ্বান করবে শিশির—'অনশনে মৃত দেশের অখ্যাত লোকশিল্পীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি' দেবার জন্য শহরের যত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করা হবে। একটি মর্মর মনুমেন্ট রচনার জন্য চাঁদা তোলা হবে। কোন পার্কে একটুকরো জমি আদায় করতে হবে। সেইখানে মনুমেন্টের গায়ে উনিশশো তেতাল্লিশের বাংলার চরম শোকের বেদনা শিলাশাসনে উৎকীর্ণ থাকবে। প্রতি বছর শিল্পীরা আসবে পুষ্পার্ঘ নিয়ে তর্পণ করতে।

প্রস্তাবে বাধা দিয়েছেন অবনীবাবু। অবনীবাবু বলেছেন,—ভুল করলেন শিশিরবাবু। কর্তব্যকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার এই ধরনের আলংকারিক উপায় আরও বহু আছে! এতে কোন লাভ হবে না মনে হয়।

শিশির।—আপনি বলছেন, এই ধরনের শোকসভা আহ্বান করার অর্থ কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া? এটা কি কোন কর্তব্য নয়?

অবনীবাবু হেসে উত্তর দিলেন—না, তা বলছি না। কিছু না-করার চেয়ে তবু এটা অনেক ভাল। তবে আপনার ঐ সভায় আমি কিন্তু একটা সংশোধন প্রস্তাব তুলবো।

শিশির।—এতে আবার সংশোধন প্রস্তাব কেন?

অবনীবাবু।—'অনশনে মৃত' কথাটির বদলে 'অনশনে নিহত' কথাটি বসিয়ে দিতে হবে।

শিশির চুপ করে রইল।

অবনীবাবু।—তার চেয়ে ওপথে না যাওয়াই ভাল। যদি নেহাতই কোন সভা আহ্বান করতে হয়, তবে কোন গাঁয়ে গিয়ে করবেন। হরু ডোমের গাঁয়েতেই প্রথম সভা আহ্বান করলে ভাল হয়। শহুরে শিল্পীদের সেখানে নিমন্ত্রণ করুন। যাচিয়ে দেখুন, শহুরে শিল্পীদের জাতীয়তার ময়ূরপুচ্ছ আর কম্যুনিজ্‌মের সিংহচর্মের রহস্য ধরা পড়ে কিনা। আমার বিশ্বাস সেখানে এঁদের একজনকেও উপস্থিত দেখতে পাবেন না। সুতরাং...।

শিশির যেন হঠাৎ চিনতে পারলো অবনীকে।—বুঝলাম অবনীবাবু।

এবার থেকে মাসের মধ্যে অন্তত পনরটা দিন তাই শিশির বাইরে বার হবে। এ মাসে যাবে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে, আসছে মাসে কাঁথি, তার পরের মাসে কাটোয়ার দিকে। গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে ফিরবে শিশির, জনতার সাড়া যাচাই করবে। যদি কেউ তাকে না বোঝে, তবে বুঝতে হবে তার ভুল হচ্ছে কোথাও। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে।

শিশির ডাকলো—বিপিন এসেছ?

বিপিনের সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু দরজার পর্দাটা নড়ে উঠলো। শেডঘেরা আলোটার দ্যুতি শুধু টেবিলের খাতাপত্রের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে। দরজাটা পর্যন্ত তার একটা ফিকে আবছায়া পৌঁছেছে। সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে মূর্তি, শিশির তাকে চিনতে পারলো না। একটা বিস্ময়ের আবেশে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে শিশির বললো—কে? কুন্তলা? মীরা? জ্যোৎস্না?

সিতা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো।—ধরা পড়ে যাচ্ছ শিশির। না, তারা কেউ নয়, আমি।

শিশির।—একি, তুমি?

সিতা।—হ্যাঁ, আজ আমার জন্মদিন। আজ আমায় কেউ আশীর্বাদ করেনি, তাই তোমার কাছে এলাম শিশির। আশীর্বাদ বা অভিশাপ, যা দেবার হয় তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। তাই নিয়ে আমি এখনি চলে যাই।

সিতার চোখের পাতাগুলি ভিজে ভারী হয়ে এল। হঠাৎ অভাবিতভাবে, শিশিরের কাজের পথে যাত্রাশুরুর রৌদ্রময় লগ্নে এক কাজরী মায়ার মত সিতা যেন আবার দেখা দিয়েছে।

হিসেব ভুল করিয়ে দেবার মত এত বড় ছলনা বুঝি আর কিছু নেই।

শিশির বললো—তুমি শান্ত হয়ে আগে বসো।

সিতা।—আজ আমায় আশীর্বাদ করতেও তোমার দ্বিধা করতে হচ্ছে, তোমার কাছে এতটা অবহেলা পাওয়ার মত কোন অপরাধ করেছি কি?

আর একটু হলে বোধ হয় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতো সিতা। তবু শিশিরের অনুরোধটাই আগে রাখলো। একটা চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসলো।

শিশির।—তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারবো না, এতটা কৃপণ আমি নই।

সিতা।—তবু এখনও তুমি দাতা হতে পারলে না। এখনো শুধু দানের ব্যাখ্যা করছো।

শিশির।—হ্যাঁ, আশীর্বাদ করি...।

সিতা।—কি আশীর্বাদ করলে?

শিশির।—তোমার ভাল হোক।

সিতা।—এ আশীর্বাদ তো বিপিনকেও করা যায়।

শিশির।—পৃথিবীর সব কিছু কি তুমি বিশেষভাবে পেতে চাও? আর কত চাই তোমাদের?

সিতা।—তুমি আমার ওপর রাগ করছো শিশির। বিশেষভাবে আমার আজ এই লাভ হলো ; এর আগে কখনো তোমার কাছে এই জিনিসটি পাইনি।

শিশির।—বিপিন যা পেয়ে খুশী, তুমি সেটা পেলে খুশী হবে না কেন?

সিতা।—বিপিন তোমার চাকর. আমিও কি তাই?

শিশির।—বিপিনকে যখন আশীর্বাদ করি, তখন অন্তত সেই মুহূর্তে সে আমার কাছে চাকর নয়। সে তখন আমার প্রিয়জন।

সিতা।—বল, তোমার যা ইচ্ছে বল।

সিতা রুমালে মুখ চাপা দিল। কাঁদছিল সিতা। এক পলাতক মধুপতঙ্গ যেন তার ভাঙা চাকের কাছে ফিরে এসে দুঃখের গুঞ্জন তুলেছে। সিতার কান্না দেখে সেইরকম মনে হয়। সিতার মত গরবিনী মেয়ের এই অবলুণ্ঠিত অভিমান শিশিরের কাছে যেন একটা সফল প্রতিশোধের তৃপ্তি এনে দিচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই শিশিরের মনের ভেতর এক উজ্জাগর প্রহরী শত সতর্কতা সত্ত্বেও সম্মুখের দৃশ্যটার করুণতার ছোঁয়াচ লেগে ক্রমেই বিবশ হয়ে পড়ছিল।

--তুমি একটু চুপ কর সিতা।

শিশিরের অনুরোধে সমবেদনার আভাস ছিল। সিতা চুপ করে গেল, কিন্তু শিশির তার বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেললো। এইটুকু বলেই চুপ করে থাকা যায় না, কিন্তু কি-ই বা আর বলার আছে?

বক্তব্য খুঁজতে গিয়ে ভাবনায় পড়লো শিশির। একদিন একপথে তারা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছিল—তাকে ভাল-লাগা, ভালবাসা, অনুরাগ বা গুণগ্রাহিতা যা-ই বলা হোক না কেন। সে পথ আজও কোন বিপত্তির বাজ পড়ে ভেঙে যায়নি। তবু ব্যবধান এসে গেছে। শিশির আর সিতার জীবনের ইঙ্গিত দুটি ভিন্ন গ্রহের মত নিজের নিজের কক্ষটিকেই সত্য বলে বুঝতে শুরু করেছে।

ভাবতে গিয়ে আবার খেই হারিয়ে ফেলে শিশির। একটা মুগ্ধ দৃষ্টি দু'চোখের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে স্থানকালের সীমা পার হয়ে এক যুগোপান্তে পৌঁছে সিতাকে দেখতে থাকে। এক মঙ্গল কাব্যের নায়িকার মত দেখাচ্ছে সিতাকে। অগ্নিপাটের শাড়ি পরে সন্ধ্যামালতীর বনে সুন্দর পান্থের আশায় যারা প্রতীক্ষায় থাকতো, জলটুঙ্গী ঘরে সোহাগিনী রূপে স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে যারা একদিন শাওনিয়া মেঘ দেখেছে আর বারমাস্যা গান করেছে, প্রবাসী রত্নেশ্বর সাধুদের চৌদ্দ ভুবনে পাটেশ্বরী হয়েও যে-বিরহিণীরা এক গোপনে-আপন কিশোর বন্ধুর পবনের ডিঙাখানির প্রতীক্ষায় ঘাটের দিকে তাকিয়ে অধীর হয়ে উঠতো—সিতা আজ সেই

অতীতের যত মানিনী মূর্তিদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে রয়েছে। কলকাতার বিখ্যাত ব্রোকার গুরুদয়াল বসুর মেয়ে সিতার গত বছর বি-এ পাস করার ঘটনাটাও যেন সর্ব্বৈব মিথ্যা। সিতা এ-যুগের কেউ নয়, কোন যুগেরই নয়। সিতা একটি অভিজাতক প্রেমের আত্মা, নিছক মানের বালাই নিয়ে যারা ত্রেতা দ্বাপর পার করে দিল। প্রণয়কলাপে পরাজিত হলে কেঁদে ফেলে, জয়ী হলে তুচ্ছ করতে শেখে।

সমালোচনাটা একটু মাত্রাহীনভাবে কঠোর হয়ে পড়ছে। শিশির মনে মনে লজ্জিত হলো। কিন্তু মেঘরৌদ্রের খেলার মত সিতার ওপর এই দুই মনোভাবের দ্বন্দ্ব থেকে আজ রেহাই পাচ্ছিল না শিশির, কোনমতেই। কোথাও যেন একটা ক্ষত প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, ক্ষতটা খুবই গভীর বোধ হয়।

সিতা ডাকলো।—শিশির।

শিশিরের হুঁশ ফিরে এল।—অ্যাঁ, আমায় কিছু বলছো?

সিতা।—হ্যাঁ, চল আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু তার আগে আমি যা চাইব, আজ আমাকে সেই আশীর্বাদ দিতে হবে।

শিশির।—বল।

সিতা।—আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না। যদি এতটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে বল—আমার চেয়ে আর কাউকে বেশী ভালবাসতে পারবে না।

শিশির।—এভাবে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি কেন আদায় করছো সিতা?

সিতা।—না, আমি কোন কথা শুনবো না।

শিশির।—শোন সিতা...।

সিতা।—না?

আগ্রহে সুন্দর একটি বরণদৃষ্টি শিশিরের মুখের দিকে স্থির হয়ে রইল।

শিশির বললো—তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসতে কাউকে পারবো না সিতা।

বলবার সময় বুকটা কেঁপে উঠেছিল। কথাটা শেষ করেই শিশির এক লাফে দূরে সরে গেল।—ছি ছি, কি করছো সিতা! পা ছুঁতে পাবে না। আমাকে বিপদে ফেলো না।

সিতা যেন ধমক দিল।—চুপ করে দাঁড়াও, আমায় বাধা দিও না।

শিশির স্তব্ধের মত দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় বললো—এ কি কাণ্ড করলে তুমি?

সিতা।—কোন কাণ্ড করিনি। চল, আমায় পৌঁছে দেবে।

বিপিন তখনো এসে পৌঁছয়নি। দরজায় কুলুপ লাগিয়ে শিশির পথে নেমে পড়লো। টব থেকে দুটো নতুন গাঁদা পটপট করে ছিঁড়ে তুলে নিয়ে সিতা বললো—আজ থেকেই বিনা হুকুমে নিতে আরম্ভ করলাম।

সিতা এক টুকরো স্ফূর্তির মত শিশিরের পাশে পাশে হেঁটে চলেছিল। একটা আশ্রয়লিপ্সু হাত শিশিরের মুঠোয় বন্দী হয়ে চলেছে। শিশিরের আংটিটা সিতার নরম হাতটার ওপর চেপে বসে গেছে—একটু ব্যথাও লাগছে। তবু ভাল লাগছিল সিতার।

শিশিরের দেহ-মন এক প্রবল মমতার উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। কত বড় আশ্বাসে আজ তারই গা-ঘেঁষে পাশে পাশে চলেছে সিতা। কত ছোট্টটি হয়ে গেছে সিতা। সেই গরবিনী আধুনিকার অবলেশও খুঁজলে এখন পাওয়া যাবে না। অসহায় অথচ আদুরে মেয়ের মত মাত্র একটা সান্ত্বনাতেই কত বড় তৃপ্তি বয়ে নিয়ে চলেছে।

সিতার মুখে অবাধ কথার ফোয়ারা ছুটছিল।—তুমি তো কোন খোঁজ রাখবে না, রাখতেও চাও না। জয়ন্ত বাবার কারবারে পার্টনার হতে চলেছে। দলিলও তৈরী হয়ে গেছে, শুধু রেজিস্ট্রেশন বাকী।

শিশির।—তবু ভদ্রলোক একটা কাজে নামছেন। আমি এখনও নিষ্কর্মাই রয়ে গেলাম।

সিতা।—জয়ন্তকে আমি ভয় করি না শিশির। বাবাকেই ভয়। জয়ন্ত এরই মধ্যে বাবার কাছে আইডিয়াল ইয়ং ম্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিশির।—বাবাকে ভয়? এ যে নতুন কথা শুনছি। মিস্টার বসু চুরুট খাবেন, না, সিগারেট খাবেন, সেটাও শুনেছি তোমারই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

সিতা।—হ্যাঁ, সেই জন্যেই ভয়। বাবা যদি কোনদিন তাঁর নিজের ইচ্ছা জাহির করেন, সেদিন সেটা চরম হয়েই হাজির হবে। বাবার সেই ইচ্ছাটা এখন থেকেই অনুমান করে নিতে পারি। তাই সত্যি আমার ভয় করে—অবাধ্য হয়ে বাবাকে কষ্ট দেবো, কল্পনা করতেও আমার কান্না পায় শিশির।...তুমি হাসছো মনে হচ্ছে?

শিশির।—হাসছিলাম নিজের অবস্থাটা কল্পনা করে।

সিতা।—বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ করা উচিত ছিল। আমার সে অনুরোধ রাখলে না।

শিশির।—আমি তো আগেই আমার সেই ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েছি। মিস্টার বসুর সঙ্গে আলাপ করে পরিচিত হতে আমি অক্ষম, সেটা আমারই দোষ বলতে পার।

কিন্তু তুমি আর ঘরকুনো হয়ে থাকতে পারবে না। ঘরে বসে বসে শুধু দিনরাত রাগ-রাগিণীর চচ্চড়ি ভেজে আর আমার ওপর রাগ করে দিন কাটিয়ে দিলে চলবে না।

শিশির।—রাগ-রাগিণীর ওপর এখনো তোমার আক্রোশ মিটে যায়নি দেখছি।

সিতা।—রাগ-রাগিণীর ওপর আমার কোন রাগ নেই। কিন্তু যে-গানের সঙ্গে জনমনের যোগ নেই, সে-গানের কোন মূল্য নেই। তোমার ঐ ঘরটি হলো একটি সুন্দর সুরের কবর, ঘরের বাইরের কাজে তার কোন মূল্য নেই।

শিশির চমকে উঠলো। সোনার পিঞ্জরের পাখির শিসে সমুদ্র-বাতাসের শব্দ শিউরে উঠছে যেন। এই বাণী কোথা থেকে পেল সিতা!

শিশির।—তুমি আমাকে আশ্চর্য করে দিলে সিতা। যা বললে, তা সত্যিই বিশ্বাস কর তো?

সিতা।—করি বৈকি। এটাই যে আমাদের জাগৃতি সঙ্ঘের বাণী।

শিশির।—জাগৃতি সঙ্ঘ?

সিতা।—হ্যাঁ, তোমাকে এই সঙ্ঘে আসতে হবে। জনতার জন্য গান গাইতে হবে।

শিশির।—কিসের গান?

সিতা।—ফাসিস্ত-বিরোধী গান। এখন সবচেয়ে আগে এটাই আমাদের প্রয়োজন।

শিশির।—ও হরি! বুঝলাম।

সিতা।—তুমি বিদ্রূপ করছো শিশির।

শিশির।—বিদ্রূপ নয়। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি হঠাৎ বুঝে ফেললাম।

সিতা।—কি বুঝে ফেললে?

শিশির।—তুমি একটা দলের বুলি আওড়ে দিলে শুধু।

সিতা।—বুলিটা যদি সত্য হয়, তবে তোমার আপত্তি কি?

শিশির।—বুলি কখনো সত্য হতে পারে না।

সিতা।—তুমি এসব শুধু বলছো তোমার অক্ষমতাকে চাপা দেবার জন্য। কাজ এড়িয়ে যাবার ছুতো।

শিশির।—না, আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই সিতা।

সিতা।—তাহ'লে জাগৃতি সঙ্ঘে আসছো?

শিশির।—না, আমি একাই কাজ করবো। যদি ব্যর্থ হই, যদি দেখি ভুল হচ্ছে আমার, তখন তোমাদের জাগৃতি সঙ্ঘের উপদেশ শোনবার চেষ্টা করবো। আপাতত...।

সিতা।—কি করবে ঠিক করেছ?

শিশির।—আমি বাইরে যাচ্ছি। ডায়মণ্ডহারবার, কাঁথি, কাটোয়া...।

সিতা।—কিছু প্রচার করতে যাচ্ছ?

শিশির।—হ্যাঁ, প্রচারই করবো।

সিতা।—কিভাবে?

শিশির।—গান শুনিয়ে।

সিতা।—এটাও বোধহয় তোমার রাগ মহাদেশ আবিষ্কারের যাত্রা।

শিশিরের মনে হলো, সিতা বোধহয় মুখ টিপে হাসছে। শিশির উত্তর দিল—আমার আকাঙ্ক্ষা আরও বেশী বেড়ে গেছে সিতা। আমি রাগ মহাদেশ আবিষ্কার করবো না, তৈরী করবো। সেই সুরের বীজ ছড়াবো দেশ জুড়ে।

নিজের মনের উত্তেজনাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে একটু শান্তভাবেই শিশির বললো—খেতে না পেয়ে এক একটা গাঁয়ের শানাইওয়ালার দল শেষ হয়ে গেছে। মনের ওপর দিয়ে এখন যেন একটা কালাশৌচের পালা চলেছে। এই ক্ষতিটা তুমি কতদূর ভাবতে পর জানি না; কিন্তু আমার কাছে এটা স্বজনের মৃত্যুর মত দুঃখ। বিপিনের বউ ছেলে কোলে করে মৃত্যুযাত্রায় বার হয়েছে; বিপিনটা কাঁদছে আর ছটফট করছে, পথেই ওদের শেষ হয়ে যাবে কিনা কে জানে। অবনীবাবুর মত লোক গামছা হাতে পথে খাবি খাচ্ছেন, এক সের আটার জন্য। সবই দেখছি, বুঝছি। আজ কোন গান গাইবার সময় এসে গেছে, তা'ও বুঝতে পারছি।

সিতা হঠাৎ ভয় পেয়ে আমতা-আমতা করে বললো—এ অবস্থায় তুমি আবার কি করতে চলেছ?

শিশির।—আমি বাঁচবার গান গাইবো।

সিতা।—বেশ তো, তার জন্য বাইরে যাবার দরকার কি? তুমি লিখে দিও, আমি পত্রিকাগুলিতে ছাপাবার ব্যবস্থা করে দেব।

শিশির।—খেতে না পেয়ে দেশের লোক নিঃশেষ হয়ে যাবে, এটাকে আমি মৃত্যুর ব্যাপার বলি না। এটা নিছক হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকে ঠেকাতে হবে। ধানের দাবি, জমির দাবি, মজুরীর দাবির গানই আমার গান। আগে বাঁচতে হবে।

সিতা ভয় পেয়ে নির্বোধের মত চেঁচিয়ে উঠলো।—এসব করতে যেও না শিশির। শেষে কি একটা বিদ্রোহ...।

শিশির।—বিদ্রোহ নয়, বাঁচবার দাবির সংগ্রাম।

সিতা।—না, না, ওসব তুমি করতে পারবে না। তুমি সবই ভুল বুঝেছ। প্রকাশবাবুর কাছে একবার চল—তিনিই তোমাকে বোঝাতে পারবেন। তুমি ভুল করে ফাসিস্ত-বিরোধী যুদ্ধের ব্যবস্থা নষ্ট করতে চলেছ। ভয়ানক ভুল করছো, জাপানীরা এসে পড়লে কাউকে আর আস্ত রাখবে না। তোমাকে কিছু করতে হবে না, চুপ করে ঘরে বসে থাক। নইলে আমি পারুলদিকে কালই চিঠি দিয়ে দেব যে তুমি ক্ষেপে গিয়ে যা-তা করতে চলেছ।

আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছিল সিতা। উদ্বেগের প্রকোপে কথাগুলি সবই খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছিল।—আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ তোমাকে এসব শিখিয়ে উস্কে দিয়েছে নিশ্চয়। হ্যাঁ, একটা কথা জানবার ছিল। কুন্তলা কে?

শিশির।—ছোড়দির মেয়ে।

সিতা।—ভাল কথা। মীরা কে?

শিশির হেসে ফেললো।—কিছু একটা পরীক্ষা করে দেখছো বোধ হয়?

সিতা।—যা বলছি, তার উত্তর দাও।

শিশির।—মীরা হলো বড়দির নাতনী।

সিতা।—বেশ, আর একটি কার নাম শুনলাম? জ্যোৎস্না?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—কে এই মহাশয়া?

শিশির।—অবনীবাবুর বোন।

সিতা।—আচ্ছা, আর একটি কথা। এই যে ক'মাস তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, ততদিন তুমি কি করতে?

শিশির।—সেরকম নতুন কিছুই করিনি। লোকগীতি নিয়ে একটা রিসার্চ গোছের কাজ করেছি, অবনীবাবু খুব সাহায্য করেছেন। প্রচারক বল আর চারণ বল, দেশের মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে দেশের গীতময় প্রাণের প্যাটার্নটি আগে বুঝে নিতে হবে।

সিতা বিরক্ত হয়ে বললো—একটু থাম তুমি।

শিশির।—যদি দেশের মর্মে পৌঁছতে চাও, তবে এই পথেই অগ্রসর হতে হবে। এমন যে দূর আরবদেশের ইসলাম, তাও বাঙলাদেশে এসে গাজীর গানে ও জারির গান বাণীরূপ পেয়ে কত সহজ সজীব ও সত্য হয়ে উঠলো। মাটির সুরে মেজে না দিলে কোন বাণীই সত্য হয় না। কীর্তন, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, বারমাস্যা, ধামালি, ঝুমুর, যোগীদের গীত, গাজন গান, চণ্ডীমঙ্গল, বেহুলা মনসা ও বিষহরির গান—এই সব লোকগীতি নিয়েই দেশের জীবন্ত কলাদেহটি তৈরী হয়ে আছে। তাকে চিনতে হবে। অবনীবাবুও আমার সঙ্গে সমানভাবে খেটেছেন, বলতে গেলে তিনিই সব পুঁথিপত্র যোগাড় করে দিয়েছেন।

সিতা।—তোমার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমি।

শিশির।—আমাদের খাটুনি অন্তত একদিক দিয়ে এইটুকু সার্থক হয়েছে যে, আর্টের ক্ষেত্রে প্রচারতত্ত্বের দুটো নিয়মের সূত্র আজ ধরতে পেরেছি। প্রথম হলো, নতুন বাণী প্রচার করতে হলে পরিচিত সুরে সাজিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়, সুরটি নতুন হলে পরিচিত বাণীর আশ্রয়ে তাকে পরিবেশন করতে হবে। আর একটা বড় গলদ ধরা পড়েছে—কালচারের ব্যাপারে দেশে একটা দ্বৈরাজ্য চলেছে। গাঁ আর শহর নামে দেশের মাটিতে দুটো সভ্যতা পাশাপাশি চলেছে —কেউ কারও সঙ্গে মিশতে পারছে না। এই ব্যবধান জুড়ে দিতে হবে। অবনীবাবুকে ধন্যবাদ দিই—আজ আমি যে এত প্রাঞ্জল ও সরল একটা কাজের প্রোগ্রাম পেলাম, সেটা তাঁরই বন্ধুত্বের প্রসাদ। না, আর কাজ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই সিতা। আমার এসরাজ আর 'দুই বিঘা জমির' দাবি—এই মূলধন নিয়েই প্রচারে নামবো। দেখি, আমাদের থীসিস মিথ্যে না সত্য।

সিতা।—অবনীবাবু নামে এক ভদ্রলোক তোমার হাতে এই থীসিসের গর্ব তুলে দিয়েছেন। সেই অবনীবাবুর বোন জ্যোৎস্না। কেমন?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—ডোভার লেন এসে পড়েছে। আর তোমাকে আসতে হবে না, এইটুকু আমি একাই স্বচ্ছন্দে চলে যাব।

শিশির।—আচ্ছা, এস।

তোমার চাইতে আর কাউকে বেশী ভালবাসতে পারবো না—সিতার কাছে তার প্রেমিকতার নিষ্ঠা ঘোষণা করার আগের মুহূর্তেও শিশির বুঝতে পারেনি যে, কথাগুলি বলতে গিয়ে তার বুক কেঁপে উঠবে, তার বিশ্বাসের নেপথ্য থেকে হঠাৎ একটা গোপন প্রতিবাদ সেই প্রতিশ্রুতির ছন্দ নষ্ট করে দেবে। দুষ্টু ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে কাজের মা যখন নিশ্চিন্ত মনে উঠতে যান, হঠাৎ আঁচলে টান লাগে, চমকে উঠে দেখেন যে, আঁচলটি ঘুমন্ত ছেলের সাবধানী মুঠোর ভেতর বন্দী হয়ে আছে। শিশিরের মনের আঁচলে আচমকা টান পড়েছিল; তাই বুক কেঁপে উঠেছিল। এরকম যে হবে, আগে তার তিলমাত্র আভাসও টের পায়নি

শিশির।

ধরতে গেলে একটা মাসও পুরো পার হয়নি। সামান্য কয়েকটা ঘটনা শিশিরের মনের বাগানের ডালপালা নুইয়ে দুলিয়ে যেন ভিন্ন করে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। যদি সেদিন বিপিনকে খুঁজতে বাইরে যেতে না হতো, তবে শিশিরকে মার্কেটের কাছে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হতো না। কন্ট্রোলের লাইনের দীনসাধারণের মধ্যে একটি ভদ্রবেশ মূর্তির দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকতে হতো না। যেচে আলাপ করে, অভাবিতভাবে, অবনীর সঙ্গে পরিচিত হতে হতো না। তাহ'লে অবনীনাথের বাড়িতে যাবার কোন কারণও ঘটতো না শিশিরের। অরুণা ও জ্যোৎস্নার সঙ্গে আলাপই বা হতো কি করে? সেখানে গান গাইবার দরকারও হতো না। গান শেষ হলে জ্যোৎস্নাও অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো না, অরুণা দেবী এত খুশী হতেন না।

পর পর এতগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। নেহাত পথে-বিপথে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক বটের ছায়া পেয়ে গেছে শিশির, অবনীর বন্ধুত্ব। এই আশ্রয়ে ক্ষণিকের জন্য জিরিয়ে নিতে পারলে আপনা থেকেই ক্লান্তি মুছে আসে—একাকিত্বের রিক্ততা ঘুচে যায়। কাজ করবে শিশির, কিন্তু অবনী যেন যেচে সেই ভাবনার অর্ধেক ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। তার জন্য অবনীকে কোন অনুরোধ করার দরকার হয়নি। লোকগীতি নিয়ে রিসার্চ করার জন্য যতখানি সাধ্য ততখানি সাহায্য করেছে অবনী। অবনী বোধ হয় এখানো ঠিক করে জানেও না—শিশিরের দেশ কোন জেলায়, কোন গাঁয়ে? কায়স্থ না ব্রাহ্মণ? চাকরি করে কি করে না? কিন্তু মানুষ হিসাবে যে-পরিচয় সবচেয়ে বড় সত্য, সেটা আগেই জানা হয়ে গেছে। প্রথম আলাপের পরদিন শিশির জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনারাও কি শুনেছেন যে, একটা গ্রামের সব শানাইওয়ালারা খেতে না পেয়ে মরে গেছে?

অবনী বলেছিল—শুনিনি তবে খবরটা বিশ্বাস করি। একটা গ্রাম কেন, বহু গ্রামেই বাদ্যকর, কারিগর, চাষা মজুর একেবারে শেষ হয়ে গেছে। এর জন্য দুঃখ করবেন না।

অবনী দেখছিল, ভদ্রলোকের মুখটা হতাশ্বাসে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। শিশিরকে তখুনি যেন চিনতে পারলো অবনী। ওর মনের ভেতর একটি দেশী মানুষ অঝোরে কাঁদছে, হরু ডোমের মৃত্যুর দুঃখটা ভুলতে পারছে না। অবনী তার কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললো—আমার বাসায় চলুন, মন খুলে আলোচনা করা যাবে। পথে দাঁড়িয়ে কথা বলার অসুবিধা আছে।

খুলিলে মনের দ্বার না লাগে কপাট। অবনী দ্বিধা না করে বলেই ফেললো—আর মুখ বুজে মরতে চাই না শিশিরবাবু। আমরা প্রতিবাদ করবো, সেই জন্যই আপনার সঙ্গে আলোচনা।

আলোচনার শেষে শিশির বললো—আপনি যা বললেন, আমি সবই বিশ্বাস করছি অবনীবাবু। আমি কাজ করবো। তার জন্য কোন আপদকে আমি ভয় করবো না। যখন নিজেকে একা মনে করি, তখনই শুধু ভয় করে। যদি জানি আপনি সহায় আছেন, তবে...।

অবনী।—শুধু আমি নই, বিশ্বাস করুন হাজার হাজার প্রাণ আপনার আগে ও পেছনে, আপনার আশেপাশে সহায় হয়ে আছে। কাজের মধ্যেই তাদের পাবেন।

এই গরিব বাড়িটার হৃদয়ের মধ্যেও একটা মাঙ্গলিক মোহ ছড়িয়ে আছে। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেলে অবনীবাবু বলেন—আর একটু দেরি করুন, একেবারে খেয়েই ফিরবেন।

জোছু হাত-পা ধোয়ার জন্য জল দিয়ে যায়। হাতে তোয়ালে তুলে দেয়। খেতে বসলে পিসিমা একবার চৌকাঠের বাইরে এসে বসেন। কথা বলতে গিয়ে পিসিমার গলার স্বর ভারী হয়ে আসে।—যাবার সময় হয়ে গেছে তবু যাবার ডাক আসে না। এ মরা প্রাণ যেতে চায় না

বাবা। বিধি আরো কত দুর্ভোগ অদৃষ্টে লিখে রেখেছেন কে জানে! আরো কত দেখতে হবে, সইতে হবে ঃ নইলে আজ তোমাকে বাজরার খিচুড়ি খাইয়ে...স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি বাবা।

পিসিমা আঁচলের খুঁটে চোখ মোছেন। শিশির খেতে খেতেই আবেগভরে চেঁচিয়ে বলতে থাকে—আপনি সব ভুল বুঝেছেন পিসিমা। আবার দিন আসবে—আপনার হাতের রান্না ক্ষীরের পায়েস এইখানে বসেই খেয়ে যাব।

খাওয়া শেষ হলে শিশির দেখে, অরুণা এঁটো থালা নিয়ে গেল। শিশিরের চেতনায় এক বিস্ময়ের বর্ণালী খেলতে থাকে। প্রীতি এত স্বচ্ছন্দ হতে পারে, তা আগে কখনো জানা ছিল না শিশিরের। সব ব্যক্তিত্বের দর্প এখানে আপনা হতেই নত হয়ে আসে। এক আপন-করে-নেবার সুন্দর চক্রান্ত নীড় বেঁধে রয়েছে এখানে। যেই আসুক না কেন, এখানে পরাজিত হতেই তার ভাল লাগবে।

বাইরের ঘরে এসে শিশির দেখতে পায়, একটা ইজি চেয়ারে ঘাড় কাৎ করে ঘুমিয়ে পড়েছে অবনী। গলার পেশীগুলি নিশ্বাসের সঙ্গে কাঁপছে। ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁকে বুকের হাড়গুলি উঁকি দিচ্ছে। ডান চোখের ভুরুর ওপর একটা পুরাতন ক্ষতের দাগ। শ্রান্ত সৈনিকের মত দেখাচ্ছে অবনীবাবুকে। শিশিরের ভাবাকুল চোখের দৃষ্টি শ্রদ্ধা ও মমতায় আরও নিবিড় হয়ে আসে। শিশির শুধু দেখতে থাকে অবনীকে, জাগাতে ইচ্ছে করে না।

ততক্ষণে অরুণা এসে যায়।—একটা গান না শুনিয়ে যেতে পারবেন না।

শিশির উত্তর দেয়—নিশ্চয়।

জোছু এসে বলে—একটা বাংলা গান।

শিশির হেসে স্বীকৃতি জানায়—তথাস্তু।

অবনী গা-মোড়া দিয়ে জেগে ওঠে।—হ্যাঁ, ওদের পাওনা আর বাকী রাখবেন না। যাবার আগে মিটিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল। আর ক'টা দিনই বা আছেন।

কলকাতা থেকে চলে যাবার আগে সিতাকে একবার মনে মনে খুঁজেছিল শিশির। শেষ দুটো দিন প্রায় সব সময় একটা আশাভরা প্রতীক্ষায় কাটতো। এক-আধবার বাইরে বেড়াতে গেলেও, বিপিনকে বলে যেত—ডোভার লেনের দিদিমণি এলে, বসতে বলো বিপিন। আমি এখনি আসছি।

শেষ পর্যন্ত সিতা আর এল না। শিশিরের মন থেকে একটা উদ্বেগের পীড়া দূর হয়ে যায়। ভারবদ্ধ মনের পাখা দুটো যেন শিকলি কেটে লঘু হয়ে ওঠে। নিজের কাছেই ধরা পড়ে যায় শিশির। এটাই কি সে চাইছিল? তার ভালবাসার প্রতিশ্রুতিকে একটা ভুয়া বাক্যোচ্ছ্বাস মনে করে সিতা সাবধান হয়ে যাক, এই প্রতিশ্রুতিকে শতভাবে তুচ্ছ করুক সিতা—ঘৃণায়, সন্দেহে, রাগ করে, না এসে। শিশিরের মনস্কাম কি ভীরুচোখে এই চোরাপথে মুক্তির স্বপ্ন দেখছিল?

ভাববার শক্তি ফুরিয়ে আসছিল শিশিরের। তার পৌরুষের উদ্ধত মূর্তিটি সিতার কাছে এক অপরাধের গ্লানিতে নুয়ে পড়ছে। কাজ ও জীবনের স্বচ্ছন্দ ধারাকে স্বেচ্ছায় বিকৃত করে একটা কুটিলাবর্ত সৃষ্টি করেছে শিশির। নিজের ওজন যে জানে না, পদে পদে তাকে স্খলন পতনের দুঃখ ভুগতে হবেই। নিজেরই মূঢ়তাগুলি ক্রূর সর্পের মত নির্মমভাবে শিশিরের গায়ে যেন ছোবল দিচ্ছে। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

নিজের কাছে একে একে ধরা পড়ে যাচ্ছে শিশির। প্রতিজ্ঞা করার সময় বুক কেঁপে ওঠে। সিতার কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার বিপরীত পটে কাঁকুলিয়ার একটি অন্তঃপুরের প্রীতি স্মিতগোধূলির ছবির মত ফুটে ওঠে। সিতা তখন যেন দূর নক্ষত্রের মত নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শিশির ডাকলো—বিপিন, শীগগির আমার বিছানাটা বেঁধে দাও। আমি স্টেশন চললাম। ক'দিন পরে ফিরবো।

শিশির চলে গেল, যেন এতক্ষণ ছটফট করে পালিয়ে যাবার একটা পথ খুঁজছিল।

কন্ট্রোলের লাইনে দাঁড়ানো অভ্যাস হয়ে গেছে অবনীর। যারা নিয়মিত লাইনে এসে দাঁড়ায়, তাদের চক্ষেও অবনীর মূর্তিটা পরিচিত হয়ে উঠেছে। লাইনের আগু-পিছু সংস্থান নিয়ে যারা কুকুরের মত ঝগড়া করে, তারাও সাগ্রহে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় অবনীকে। অবনী তাদের ধন্যবাদ জানায়, খুশী মনে লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ বাবুটি রোজই আসে—তারা বলাবলি করে। সারি সারি মাথাগুলি ডাইনে-বাঁয়ে কাৎ হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে থাকে অবনীকে। কে এই বাবুটি? এরই মধ্যে লাইনসমাজে এই প্রশ্নটা নানারকম গল্প ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেকে জানে—বাবুটি নাকি কোন এক রাজার ছেলে, গরিবের জন্য সব দান করে দিয়েছে। এখন নিজেই খেতে পায় না। কেউ বলে—গান্ধী মহাত্মা পাঠিয়েছেন বাবুটিকে। এই চাল পাঠানো হবে গান্ধী মহাত্মার কাছে। গরিবেরা যা খায়, গান্ধীজীও যে তাই খান। কদাচিৎ দু' এক জনের অনুমান ও জল্পনায় খানিকটা সত্যের আভাস ফুটে ওঠে—বাবুটি হলেন কংগ্রেসের লোক। গরিবের দুঃখ স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। হবে হবে, একটা ব্যবস্থা হবেই, বেশীদিন আর এই নরক যন্ত্রণা ভুগতে হবে না।

বেশ লাগে অবনীর। দুঃখে ক্লেশে ও ধৈর্যে কঠিন এই লাইনের ভিড়ের মধ্যে এক নূতন আশ্বাসের বাতাস বইছে, তার সমস্ত অন্নদাসত্বের ঘৃণা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিড়ির দোকানে ছোট একটা শ্রোতার ভিড়ের ভেতর থেকে কোন রসিক গাইয়ের গান শোনা যায়—'সমরের ঢেউ লেগেছে বাংলায়।' একটা মাংসের দোকান থেকে ধুপধাপ দা-কোপানির শব্দ আসে—কসাইরা কিমা কুটে ঢেরি লাগিয়ে রাখছে। একটা গুণ্ডা আসে গোটা দশেক পোষা ভিখিরী নিয়ে, জোর করে লাইনের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে। অবনীকে দেখতে পেয়ে কি ভেবে অন্য দিকে চলে যায়। পাঁচটা মুটের মাথায় চেপে কোন নেমন্তন্ন বাড়ির বাজার চলে গেল। ঝাঁকাভরা নতুন কপির ওপর গণ্ডা গণ্ডা ইলিশ রোদ লেগে যেন রুপো হয়ে গেছে। চারদিকে কতকগুলি নাটুকে ঘটনা কিছুক্ষণের জন্য সব বাস্তব কদর্যতাকে ভুলিয়ে দেয়। লাইনটা মাথাছাঁটা হয়ে ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হতে থাকে।

দৈবী আবির্ভাবের মত কতকগুলি ভদ্রবেশী তরুণ-তরুণীর মূর্তি লাইনের কাছে এসে দাঁড়ালো। অবনী কিছু ঠাহর করার আগেই তারা কাজে লেগে গেল।

'স্থির হয়ে দাঁড়াও। ধাক্কাধাক্কি করো না। চেঁচাচ্ছ কেন? এই চুপ কর, টিকিট আসছে।' আবির্ভূত মূর্তিগুলি দলে দলে ভাগ হয়ে, চেঁচিয়ে চারদিকে একটা খবরদারির হুল্লোড় সৃষ্টি করলো। ছোট একটা ছেলে সামনের লোকটার পায়ের ফাঁকে মাথা গলিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। একটি তরুণ পায়জামা হঠাৎ ছুটে এসে ছেলেটার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। ধমক দিয়ে বললো—ডিসিপ্লিন নষ্ট করবে তো মেরে তোমার..

কে এরা? অবনী তখনো কিছু বুঝতে পারছিল না। খকখক করে কাশতে কাশতে অবনীর পেছনে দাঁড়িয়ে লুঙ্গিপরা লোকটি উত্তর দিল—আর এক ফ্যাচাং জুটেছে বাবুমশাই, এরা লাইন সাজাতে আসে। মিছিমিছি ঘাঁটাতে আসে বাবু। বলে—জাপানীকে রুখবে চল। আমি বলি, কি করে সেটা হয় বাপধন? আমার যে শ্লেষ্মা হয়েছে, পাঁজরগুলো একটু তেল মালিশও পাচ্ছে না। ওষুধপথ্যি না পেয়ে দিন দিন বেঁকে যাচ্ছি মশাই—সাধে কি আমাকে বাঁকারাম বলে!

অবনী কৌতূহলী হয়ে আবার প্রশ্ন করলো—ওরা এই কথা বলতে প্রায়ই আসে বুঝি?

লোকটি বুকে হাত দিয়ে কেশে নিয়ে উত্তর দিল—হ্যাঁ গো মশাই। যাকে ইচ্ছে বলুক, আমাকে কেন? তিন ভাইয়ের মধ্যে দুভাই তো লড়াইয়ে ভেগেছে। শুধু আমি বাঁকারাম পড়ে আছি। আল্লা মিঞার মরজি, বাঁকারামেরও হয়ে এল।

অবনীর সব সংশয় ও কৌতূহল ভঞ্জন করে ততক্ষণে সত্যি সত্যি একটা কোরাস্ গান

মার্কেটের রঙ্গমঞ্চে এক অকথ্য চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে।

"জাপানীকে রুখবি বল
কিউয়ে দাঁড়াবি চল"

গান গেয়ে আর ভেজা বারুদের পটকার শব্দের মত কতকগুলি আধাভৌতিক বুলি চীৎকার করে তারা ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো। অবনী সামনে এসে যেন একটা বিষম খেয়ে সেই চড়া গর্জনের সুরটা হঠাৎ খাদে পড়ে গেল। জোড়া জোড়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টি অবনীর আপাদমস্তক যেন খুঁটে খুঁটে দেখছিল—পাতিহাঁসের দলে এই বকটি আবার কোথা থেকে এসে ভিড়েছে।

কৌতূহল সামলাতে না পেরেই তাদের মধ্যে দুচার জন, তারপর একে একে সবাই অবনীর সামনে এসে দাঁড়ালো। একটি যুবক বেশ সমীহ করে অবনীকে প্রশ্ন করলো—চাল পেতে আপনাকে খুব ভুগতে হচ্ছে, নয়?

অবনী।—আপনারা কি উদ্দেশ্যে এসব প্রশ্ন করছেন, কেনই বা এখানে এসেছেন, তা না জানলে আমি কিছু বলতে পারছি না।

—আমরা জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মী, ফুড ফ্রন্টে কাজ করছি।

অবনী।—এখানে কি করতে এসেছেন!

—এখানে কাজ করছি।

অবনী।—কিসের কাজ?

—ফুড ফ্রন্টের কাজ।

অবনী।—যান, কাজ করুন গিয়ে।

জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীদের মধ্যে একটা কানাঘুষা ফিসফাস করতে লাগলো।

আর একটি কর্মী উৎসাহিতভাবে এগিয়ে এসে বললো—আপনার কোন অভিযোগ থাকলে বলুন।

অবনী।—অভিযোগ নেই, একটা প্রশ্ন আছে।

—বলুন।

অবনী।—আপনারা রোজ ভাত খাচ্ছেন তো?

কর্মী ছেলেটি হেসে ফেললো।—তা খাচ্ছি বৈকি।

অবনী।—চাল কোথায় পাচ্ছেন?

—কিনছি।

অবনী।—কন্ট্রোলের দোকান ছাড়া তো চাল কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু চোরাবাজারে পাওয়া যায়।

ছেলেটি একটু হকচকিয়ে সহকর্মীদের দিকে তাকালো। বয়স্ক চেহারার একজন কর্মী ছেলেটির তরফে উত্তর দিল—এই চোরাবাজারের ষড়যন্ত্র ধ্বংস কবার জন্যই আমরা কাজে নেমেছি।

অবনী।—বিশ্বাস করলাম, কিন্তু আপনারা চাল কিনছেন কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর দিন।

—আপনার ঠিকানাটা জানতে পারি কি?

অবনী।—না।

—আপনি কি কোন কাগজের রিপোর্টার?

অবনী।—না। আপনারা এখানে চাল কেনার একটা ঢঙ লোককে শেখাতে এসেছেন, কিন্তু নিজেরা কোন ঢঙে কেনেন, সেই খবরটা আমাকে জানাতে পারেন?

কর্মীদের মধ্যে চাপা স্বরে একটা ঘরোয়া আলোচনা হয়ে গেল।

আর একটি কর্মী উত্তর দিল—আমাদের একটা বৃহত্তর রাজনীতিক উদ্দেশ্য আছে, সেইজন্যই এখানে এসে ..।

অবনী।—সেই জন্য এখানে লাইনের গরিব লোকগুলিকে নিয়ে ছিনিমিনি করতে এসেছেন।

—আমরা পীপ্‌লের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখতে এসেছি।

অবনী।—কিন্তু পরিণামে সেটাই একটা দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্মীদের ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন টিটকারি দিল—এখানে বৃথা কষ্ট করছেন কেন? বর্মা চলে যান, জাপানীরা সস্তায় চাল বিলোচ্ছে সেখানে।

বিদ্রূপটা শুধু কানে শুনে শেষ করে দিল অবনী। ক্ষোভ সংযত করে শান্তভাবে জবাব দিল—আমার কড়া কথা মাপ করবেন আপনারা। আমি জানি, আপনারা বাধ্য হয়েই চোরাবাজার থেকে চাল কেনেন, কিংবা আগেই কিনে মজুদ করে রেখেছেন, অথবা অফিস থেকে পাচ্ছেন, যারা প্রত্যেকে মজুতদারী করছে। এই তিনের যদি কোনটিও সত্য না হয়, তবে ধরে নিতে হবে আপনারা অনশনে আছেন।

একটি ছেলেমানুষ কর্মী বেফাঁস বলে ফেললো—আমরা এখান ওখান থেকে চাল পাই।

অবনী।—ঐ এখান-ওখানকেই চোরাবাজার বলে খোকা।

—লাইসেন্স থাকলে চোরাবাজার হবে কেন?

অবনী।—তোমার সঙ্ঘদাদা কি এই সোজা তত্ত্বটাও শিখিয়ে দেননি? দেশের মানুষের পেটের খোরাক দেশের হাটবাজার থেকে সরিয়ে ভাঁড়ারে বন্ধ করে রাখাটাই পাপ। পাপের আবার লাইসেন্স কি?

বোঝা গেল, কর্মীদের মধ্যে একটা উষ্মা ধীরে ধীরে মুখর হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। লাইনটা এরই মধ্যে ছোট ও জনবিরল হয়ে এসেছে।

অবনী।—অন্তত এইটুকু নিষ্ঠা আপনাদের মত কর্মীদের থাকা উচিত ছিল যে, মজুতদারের চাল আপনারা খাবেন না। ফুড ফ্রন্ট তো চোখের সামনে রয়েছে। ঐ তো পীপ্‌ল রয়েছে। বাইরে দাঁড়িয়ে ধাক্কা দিচ্ছেন কেন? ভেতরে আসুন। এসে দাঁড়ান না এর মধ্যে? তাহলে আমরা কতখানি জোর পেতাম বলুন তো?

কর্মীদের উষ্মা যেন একটু ফিকে হয়ে এল।

অবনী।—মজুতদারের চাল যারা কিনে খায়, তারাও চোরাবাজারী চক্রান্তের ভাগী। সবচেয়ে হতভাগ্য তারা। আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই কাল থেকে এই লাইনে এসে চাল কিনতে দাঁড়াবেন। আপনাদের প্রতিদিনের খাওয়া-পরার জীবন যদি চোরাবাজার সমর্থন করে, তবে কথার বিদ্রোহে কি ফল হবে বলুন?

কর্মী ছেলে ও মেয়েরা চুপ করেই সব কথা শুনলো। আরও কিছু যেন তারা শুনতে চাইছিল। অবনীর সামনে তখন অল্প ক'জন ক্রেতা দাঁড়িয়ে আছে। চাল নেবার পালা এগিয়ে এসেছে।

অবনী বললো—আমি আশা করে রইলাম। কাল আপনারা আসবেন, তারপর আমরা সবাই মিলে লাইনে এসে দাঁড়াবো।

পেছন থেকে বাঁকারাম কাশলো।—এগিয়ে চলুন বাবু, চাল দিচ্ছে।

অরুণা সামনে এসে বললো—কোথায় যাচ্ছ?

অবনী।—অফিস চললাম, চাকরিটা আর থাকবে না। রোজ লেট হচ্ছে!

কতকগুলি কাগজপত্র হাতে নিয়ে অবনী বললো—জোছু কি এখনো শুয়ে আছে? ওর মতলব কি? পরীক্ষাটা দেবার ইচ্ছে নেই বোধ হয়?

অরুণা।—জানি না। চুপ করে বসে আছে তখন থেকে।

অবনী।—কেন?

অরুণা।—জানি না।

অবনী হাঁক দিয়ে জোছুকে ডাকতে যাচ্ছিল, অরুণা বাধা দিয়ে বললো—না, ডেক না।

অবনী সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—তুমি একটা কিছু বোধ হয় অস্পষ্ট করে বলতে চাইছ? স্পষ্ট করে বললেই বুঝতে পারবো, বল।

অরুণা খানিকক্ষণ দ্বিধার মধ্যে থেকে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, ইন্দ্রনাথ এখন কোথায়?

অবনী।—কলকাতায়।

অরুণা।—ইন্দ্র কি এদিকে আসা একেবারে ছেড়ে দিল?

অবনী।—তা আমি বলতে পারি না। আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি!

অরুণা।—ইন্দ্রনাথ কি আমাদের ওপর রাগ করেছে?

অবনী।—ইন্দ্রনাথ জানে।

অরুণা।—যদি কিছু না জানো, তবে কিছু শুনতেও চেয়ো না।

অবনী।—এইটুকু শুধু জানি, ইন্দ্রনাথের পক্ষে এখানে আসার বাধা আছে।

অরুণা।—কেন?

অবনী।—ইন্দ্রনাথ এখন জাগৃতি সঙ্ঘের মানুষ।

অরুণা।—তাতে বাধাটা কোথায়? এখানে এলে কি জাগৃতি নষ্ট হয়ে যাবে?

অবনী।—অন্তত ইন্দ্রনাথ আজকাল তাই মনে করে।

অরুণা।—তোমার সঙ্গে কোন ঝগড়া হয় নি তো?

অবনী হাত তুলে তার ভুরুর ওপর একটা পুরাতন ক্ষতচিহ্ন দেখালো।—এটার ইতিহাস জানো?

অরুণা।—না।

অবনী।—আমি আর ইন্দ্র একই স্কুলে পড়তাম। দেশের কাজ করতে গিয়ে আমাদের ছেলেবেলার জীবনও দুটো দলে ভাগ হয়েছিল। আমাদের ছিল মুক্তি-সমিতি, ইন্দ্রদের ছিল শক্তি-সমিতি। ইন্দ্রনাথের প্রথম দেশসেবার কীর্তি হলো এই দাগটা।

অরুণা বুঝতে পারছিল না, অবনী তাই আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল—ইন্দ্রনাথ ছুরি মেরেছিল।

অরুণা।—ইন্দ্রনাথ?

অবনী।—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা চরকা একজিবিশন সেরে দুর্লভপুর থেকে মাঠে মাঠে ফিরছিলাম, ইন্দ্রনাথ কোথা থেকে ছুরি নিয়ে এসে পথ রুখে বললো—দেশের শত্রুকে শেষ করবো।

অরুণা।—দেশের শত্রু?

অবনী।—হ্যাঁ, আমরা তখন দলের শত্রুকেই দেশের শত্রু বলতাম, অর্থাৎ রাজনীতির চর্চা করতাম।

অরুণা।—বলিহারি তোমাদের বন্ধুত্ব আর শত্রুত্ব!

অবনী।—তার দু'বছর পরে আমরা আবার পার্বতীপুর জংশনের প্ল্যাটফর্মে রাত্রিবেলা পাশাপাশি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে শীতে কাঁপছিলাম। ইন্দ্র জেল থেকে বেরিয়ে এল ম্যালেরিয়ায় রক্তহীন হয়ে, আমি বের হলাম কালাজ্বর নিয়ে, একই দিনে।

অরুণা।—আবার দুই শত্রু বুঝি বন্ধু হয়ে গেলে?

অবনী একটু অন্যমনস্কের মত বিড়বিড় করে উত্তর দিল—হ্যাঁ, সেই শত্রুতার পরেও তো ইন্দ্র আবার এসেছে। পথ বন্ধ হয়নি কখনো। সব দাগ মিটে গিয়েছিল। কিন্তু এইবার ইন্দ্রনাথ আর আসবে না। পথ বন্ধ হয়ে গেছে!

অরুণা।—তুমি একবার ভালভাবে আসতে বললেই আসবে।

অবনী।—যতদূর শুনছি আর বুঝতে পারছি, বললেও ইন্দ্র আর আসবে না।

অরুণা।—আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি তিলকে তাল করে দেখছো।

অবনী।—না অরুণা, তুমি জান না। জাগৃতি সঙ্ঘের লোকেরা সঙ্ঘেরই মানুষ। তাদের মনুষ্যত্বই ভিন্ন। খেতাবী মানুষ যেমন সকলের কাছে পর হয়ে যায়, ঐ সঙ্ঘের অফিসটি সেই রকম একটি অমনুষ্যত্বের সুড়ঙ্গ। যে সেখানে যায়, সেই সরীসৃপ হয়ে যায়। চারদিকের আলোকের জীবনের জন্য কোন দরদ থাকে না। ইন্দ্রনাথ এখন ভিন্ন মানুষ। এখন যদি সে শত্রুতা চায়, তবে নিজের হাতে ছুরি নিয়ে আসবে না, ভাড়াটে গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে।

অবনীর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। অরুণা শঙ্কিত হয়ে অবনীর হাত ধরলো।—কী ভয়ানক কথা বলছো তুমি। না, এ তোমার ভুল ধারণা। আমি ইন্দ্রকে ডেকে আনবো। তুমি তার ওপর অন্যায় করছো, খুব বেশী রাগ করছো।

অবনী।—একটুও রাগ করিনি আমি, তুমি ইন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়ো না, ভুল হবে।

অরুণা।—একটু আস্তে বল, জোছু কি মনে করবে বুঝতে পারছো না?

অবনী ব্যস্ত হয়ে উঠলো।—যাক এসব কথা। আমি যাই। আজও অফিস লেট হবে।

অবনী বাইরে যেতেই জোছু উঠে এল। অরুণা কিছু বলবার আগেই জোছু বললো—কিছু মনে করো না বৌদি। তুমি দাদাকে এইমাত্র মস্ত একটা মিথ্যা কথা বলেছ।

অরুণা কিছু ঠাহর করতে না পেরে বললো—বুঝলাম না জোছু।

জোছু।—ইন্দ্রদা আর আসে না, এটা তোমার আর দাদার ভাবনা হতে পারে আমার ভাবনা নয়।

অরুণা।—কি বলছো জোছু! তোমাদের ভাইবোনের দুজনারই কথার মর্ম বুঝতে আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না।

জোছু হেসে ফেললো।—মোট কথা তুমি এতক্ষণ যা ভাবছিলে তা সবই ভুল। এটা বিশ্বাস কর।

অরুণার মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা অপ্রসন্নতার ছায়া দেখা দিয়ে সরে গেল।—তোমরা গায়ের জোরে সব বিশ্বাস উল্টে দিচ্ছ।

জোছু।—না বৌদি। তুমি বিশ্বাস কর।

অরুণা।—ইন্দ্রনাথ না এলে এ বাড়ির কি কারও কোন ক্ষতি হবে না?

জোছু।—বিশেষ করে কারও ক্ষতি হবে না। সবারই সমান ক্ষতি হবে।

অরুণা।—বেশ, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। তোমার হাতে ওটা কি?

জোছু।—চিঠি, এইমাত্র পিওন দিয়ে গেল।

অরুণা।—কার চিঠি?

জোছু।—দাদার নামে এসেছে।

অরুণা চিঠিটাকে হাতে নিয়ে একবার দেখলো।—এ যে শিশিরবাবুর হাতের লেখা মনে হচ্ছে! তাই নয় কি?

জোছু উত্তর দিতে একটু দেরি করে বললো—হতে পারে।

অরুণা যেন পরীক্ষকের মত জোছুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললো—তুমি জেনেও সত্যি কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলে না জোছু।

কথাগুলির মধ্যে সমবেদনার স্পর্শ ছিল না বলেই বেশ একটু রূঢ় শোনালো।

ছেলেটার মাথাটা শুকনো নারকেলের মত, গলাটা দড়ির মত, তার নিচে মাছের কাঁটার

মত ছোট ছোট পাঁজরা। রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টের নিচে মাটির ওপর একটি শিশুর মূর্তি বিষণ্নভাবে চারদিকে তাকাচ্ছিল। পাশে একটা নোংরা কাঁথার পুঁটুলি আর হাঁড়ি। অল্প একটু ভাতের ফেন হাঁড়ির তলায় থিতিয়ে আছে। মাছির ঝাঁক হাঁড়ির উদরে উৎপাতের সুখে ভনভন করছে। শিশুটির চেয়ে হাঁড়িটাকেই বেশী জীবন্ত মনে হয়।

আয়ুর সলতে পুড়ে ক্ষয়ে এসেছে। শিশুটির চোখে সেইরকম একটা নিভন্ত প্রদীপের বিষণ্নতা। তালুর মাঝখানে একটা ঘা, মাছির কামড় থেকে পরিত্রাণের আশায় মাঝে মাঝে হাত তুলতে চেষ্টা করে। দেয়াল ঘড়ির কাঁটার মত লিকলিকে হাতটা আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে—উঠতে চায় না। ছেলেটার সামনে একটা ঠোঙায় খানিকটা রান্না-করা তরকারি কে জানি ফেলে দিয়ে গেছে। দুটো কাক লাফঝাঁপ দিয়ে বারবার এসে ঠোঙাটা উল্টে দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ছেলেটা একবার প্রতিবাদের সুরে কাঁদবার চেষ্টা করলো। ড্রেনের ইঁদুরের আর্তনাদের মত সেই কান্নার শব্দ কাছে দাঁড়িয়েও শোনা যায় না। দশদিক জুড়ে কলকাতার কাজের ফুসফুস সগর্জনে দপদপ করছে। ট্রাম বাস দৌড়য়, রিকশা গাড়ি ছুটে যায়, এক একটি দোকানের অদৃশ্য স্বরনালী থেকে রেডিওর সাঙ্গীতিক হর্ষ সেই শব্দের তাণ্ডবে নতুন মাতান সৃষ্টি করে! ল্যাম্পপোস্টের নিচে ছেলেটা এক একবার মুখ বিকৃত করে কেঁদে ওঠে—উদ্ভ্রান্ত কলকাতার পায়ের তলায় পড়ে যেন একটি দলিত শিশুর পরমায়ু আক্ষেপ করতে থাকে।

সব কাজ ভুলে বিপিন ল্যাম্পপোস্টের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে। চোখের দৃষ্টিতে একটা মত্ততা, মনের ভেতর একটা বাঘিনীর প্রাণ যেন হারানো শাবকের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। ছেলেটার কাছাকাছি নিজের বলতে কোন লোক ছিল না। টুনা যদি হঠাৎ আশি বছরের বুড়ো হয়ে যেত, কতকটা এইরকমই দেখাতো বোধ হয়। দুঃসহ একটা উত্তেজনায় হাবুডুবু খেয়ে বিপিন হাঁপিয়ে পড়ে। রাস্তার ওপারে বিপরীত ফুটপাথে কতকগুলি বিশ্রান্ত ট্যাক্সির আড়ালে বিপিন চুপচাপ বসে থাকে, যেন ওৎ পেতে, শিকারী জানোয়ারের মত। ওই যদি টুনা হয়, তবে টুনার মায়ের দফা আজ এইখানেই শেষ। এইখানে হাজার লোকের ভিড়ের চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে টুনার মাকে ইঁট দিয়ে ছেঁচে শেষ করে দেবে বিপিন। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিপিনের চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে যায়, ব্যথায় টনটন করে। কোন সন্দেহ থাকে না—এ টুনা না হয়ে যায় না। এমন তাজা-গোটা ছেলেটাকে এভাবে আমসি করে পথের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে যে, সেই রাক্ষসীর টুঁটি আজ শুধু একবার পাঁচ আঙুলের থাবার মধ্যে খুঁজছে বিপিন। সেই পরম প্রতিশোধের মুহূর্তটিকে মনপ্রাণ দিয়ে সে জপতে থাকে। দাঁতে দাঁত পিষতে থাকে। পথের শব্দ আলো গতি সব মুছে গিয়ে একটা কুহেলিকার ঘোর দৃষ্টি ঝাপসা করে নেমে আসে। টুনার মূর্তিটা কাকের পালকের ফাত্‌নার মত তারই মধ্যে যেন ভাসতে থাকে। পেঁকো জলের বানের মত এই হাভাতে জনতার স্রোতে কোথায় ঘাই দিয়ে ফিরছে টুনার গর্ভধারিণী? কিসের আশায়? কোন সাধে? বিপিন বুঝে উঠতে পারছিল না কিছু। কিন্তু সে আসবে নিশ্চয়! টুনার ক্ষিধে পেয়েছে—কাঁদছে। আর কতক্ষণ বা সে দূরে দূরে থাকবে?

কাছে গিয়ে টুনার নাম ধরে একবার ডাকতে পারলো না কেন বিপিন? ইচ্ছে থাকলেও বিপিন পারলো না। ওর বিশ্বাস, ডাক শুনেই ছেলেটার প্রাণপাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে। ছেলেটার ধড়ে আর সাড়া দেবারও কোন শক্তি নেই।

দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কতক্ষণ বসেছিল বিপিন তা সে জানে না। যখন মুখ তুলে তাকালো, তখন বেলা অনেক বেড়ে গেছে। ট্রামের দৌড়াদৌড়ি বিরল হয়ে এসেছে। লাইনম্যানটা শাবল হাতে গাছের ছায়ায় টুলের ওপর বসে ঝিমোচ্ছে।

বিপিনের বুকের ভেতরটা আচমকা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠলো। ফাত্‌না নড়েছে—একটি স্ত্রীলোক টুনাকে কোলে তুলে নিচ্ছে। বিপিন তিন লাফে রাস্তাটা পার হয়ে স্ত্রীলোকটির

সামনে এসে দাঁড়ালো।

একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক। কোন জাতের তা সহজে ঠাহর করা যায় না। স্ত্রীলোকটির কোঁচড়ের ভেতর থেকে কলাপাতার একটা টুকরো উঁকি দিচ্ছে—বোধ হয় এঁটো ভাত তরকারি বাঁধা। কোঁচড় চুঁইয়ে ঝোল পড়ছে টপটপ করে।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে প্রায় স্ত্রীলোকটির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিপিনের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো।—এই ছেলেকে তুমি পেলে কোত্থেকে গো মেয়ে?

চমকে বিপিনের মুখের দিকে স্ত্রীলোকটি তাকিয়ে রইল। বিপিনের গলায় কালো সুতোর তাগাটার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি বিবর্ণমুখে রোগীর মত আস্তে আস্তে বার কয়েক কেঁপে উঠলো। পর মুহূর্তেই খেঁকিয়ে উত্তর দিল—কিরকম কথা গো তোমার? ছেলেকে পাব আবার কোথা থেকে। আমার ছেলে।

বিপিন ডাকলো—টুনা।

ছেলেটি শীর্ণ ঘাড়ের পেশীগুলিতে যেন চকিতে একটা বিদ্যুতের শক লাগলো দু'চোখে সজীব দৃষ্টি তুলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলো বিপিনকে।

বিপিন ডাকলো—আয় টুনা আয়।

টুনা যেন প্রত্যাঘাত খেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। স্ত্রীলোকটির কাঁধের হাড়টার ওপর ভারী মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে দু'হাতে আগ্রহে গলা জড়িয়ে ধরলো।

আতঙ্কিত টুনাকে যেন আশ্বস্ত করার জন্য আদর করে আস্তে আস্তে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো স্ত্রীলোকটি। তারপর ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে বিপিনের দিকে একটা চোখমুখের ভেংচি ছুঁড়ে সরে যাবার উদ্দেশ্যে অন্যদিকে পা বাড়ালো। পথ রুখে দাঁড়ালো বিপিন।—পালাতে দেব না গো ঠাকরুন। টুনার মা কোথায়, সেই খবরটা আগে বল।

ছেলেটাকে ধীরে ধীরে কোল থেকে নামিয়ে স্ত্রীলোকটি দাঁড়ালো। উত্তর দিতে গিয়ে একটা শঙ্কা ও দ্বিধায় তার গলার স্বর দু'বার হেঁচকি দিয়ে উঠলো।

বিপিন বললো—টুনার মা কোথায়?

স্ত্রীলোকটি ভয়ে ভয়ে বললো—তুমিই কি টুনার বাপ?

স্ত্রীলোকটির চুলের ঝুঁটি খপ করে মুঠোর মধ্যে ধরে একটা ঝাঁকানি দিল বিপিন।—আমি তোরও বাপ। বল শীগগির।

স্ত্রীলোকটি।—হাঁ বাবা। টুনার মাও হেথা আছে। তোমার কথাটা বলবো ওকে।

ঝুঁটি ছেড়ে দিল বিপিন।—আমার কথাটা বলতে হবেনি, ওর কথাটা বল। কোথায় আছে?

স্ত্রীলোকটি কুপিতভাবে উত্তর দিল—তা আমি কি জানি?

বিপিন।—তুই আমার ছেলে চুরি করেছিস।

স্ত্রীলোকটি।—চুরি? এখনো টুনার মা আমার কাছে তেরটি টাকা ধারে?

বিপিন।—কিসের ধার?

স্ত্রীলোকটি।—তোমার মাগ টাকা ধার নিয়েছে গো। আমি টুনাকে জমা নিইছি। টাকা শুধে দাও, ছেলে নিয়ে যাও। আমি কারও গালি শুনবার বাঁদী নই।

স্ত্রীলোকটি কঠোরভাবে কথাগুলি শেষ করে টুনাকে মরা মাছের মত এক হাতে তুলে ধরলো।—ছেলে ছেলে কি করছো, এই নাও ছেলে। হাঁ, আমার টাকাটি শুধে যাও বাপ। নইলে আমিও সাপের মত পিছু নেব। কেওটানীর সাথে লাগতে এস না বাপু।

বিপিন।—তোমার নাম পুনি?

স্ত্রীলোকটি।—হাঁ গো হাঁ, আমি তোমাদিগের পুনি কেওটানী। শ্যাম স্যাকরা বলে কেউটেনী—জান তো? তা বলুক গিয়ে। এখন কেউটেনীর টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে চলে যাও, ছেলেকে বুকে তুলে নাও। কেউটেনীও আর ফোঁসটি করতে যাবে না।

পুনি কেওটানীর হাতে ঝুলতে ঝুলতে টুনা চিচি করে কাঁদতে লাগলো। টুনাকে মাটির ওপর বসিয়ে দিল পুনি। হতভম্ব হয়ে তাকিয়েছিল বিপিন। পুনি কেওটানী রঙ্গ করে গলার স্বর দুলিয়ে দুলিয়ে বললো—কই গো? মরদ হয়েছ মুরোদ নাই কেন? টাকা দাও, ছেলে নিয়ে যাও।

নিষ্প্রাণ মাটির মূর্তিটির মত নিরুত্তর বিপিন শুধু তাকিয়েই ছিল। পুনি কেওটানীর অঙ্গভঙ্গী উদ্দাম হয়ে উঠলো, কণ্ঠস্বর ততোধিক। এক দুর্বোধ্য নাটকের তিনটি কুশীলবের মত পুনি বিপিন ও টুনা রাসবিহারী এভেনিউয়ের ফুটপাথের একপাশে অভিনয় জমিয়ে তুলেছিল। ছোট একটা ভিড় একটা জমাট উপসংহার আশা করে উদ্‌গ্রীব হয়ে আসর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পুনি কেওটানীর মুখটা শেয়ালের মত দাঁত খিঁচিয়ে বিদ্রূপ করলো--কি রে আবাগীর ছেলে? বড় যে তেড়েমেরে ঝুঁটি ধরেছিলি? নে, এইবার টাকা শুধে দিয়ে ছেলে নিয়ে যা।

বিপিনের হুঁশ ফিরে এল। চারদিকে তাকালো। একটা দায়রা জজের আদালতে আসামীর কাঠগড়ার মধ্যে যেন দাঁড়িয়ে আছে বিপিন। পুনি কেওটানীর নির্লজ্জ সওয়াল ও নিষ্ঠুর জেরায় বিপিনের অন্তরাত্মা খানখান হয়ে ছিঁড়ে পড়ছিল। মনের ভেতর লুণ্ঠিত যত সাহস ও মর্যাদা আবার টেনেটুনে সংযত করে নিয়ে জবাব দিল বিপিন—এখন টাকা নাই। তুমি বসো, আমি নিয়ে আসছি।

পুনি কেওটানী দর্শকদের ভিড়টাকে যেন সাক্ষী মেনে নিয়ে ঘোষণা করলো—তোমরা শুনে রাখ বাবুরা।

বিপিন।—কী টাকার ভয় দেখাচ্ছিস? এখুনি টাকা নিয়ে আসছি।

পুনি।—নে, তোর ছেলে নে। আমি টাকা চাই না। নে, নে, শীগগির নিয়ে যা তোর ছেলে।

দর্শকেরা নাটকের বিষয়বস্তুটি অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছিল। তারা বুঝেছিল, কোন এক অভাগিনী পেটের দায়ে ছেলে বন্ধক রেখে তেরটি টাকা ধার নিয়ে গেছে যার কাছ থেকে, পুনি কেওটানী নামে এই স্ত্রীলোকটি সেই মহাজন। পুনি কেওটানীর মত দরিদ্রার হৃদয়ের মহিমা দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কি স্বার্থ আছে পুনির? এই বিচিত্র তেজারতির পেছনে পুনি কেওটানীর শুধু উদারতাটুকুই বড় হয়ে চোখে পড়ে। সুদ নেই, লাভ নেই, উল্টো ছেলেপোষার খরচ। গাঁটের কড়ি খরচ করে ফুটো কলসী কিনেছে পুনি। তার ওপর, সব কিছু সন্দেহ ও অপবাদকে চরমভাবে মিথ্যে করে দিয়ে পুনি কেওটানী শেষ পর্যন্ত সুদমূল সবই ছেড়ে দিতে চাইছে।

বিপিনের দিকে দৃপ্তভাবে তাকিয়ে পুনি আবার গর্জন করলো—নিয়ে যা ছেলে। তাকিয়ে দেখছিস কি?

যেন ফাঁসিকাঠের সামনে দাঁড়িয়েছিল বিপিন। পুনির ধমক শুনেও কোন সাড়ার চিহ্ন দেখা গেল না। চারিদিকের ভিড় বড় কড়া রকম ঠেসে রয়েছে—পালাবার ফাঁক নেই। বিপিনের পিতৃত্বের স্পর্ধা পুনির হাতে হঠাৎ একটি মারাত্মক খোঁচা খেয়ে সন্ত্রস্ত চোরের মত মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

সের পাঁচেক ওজনের একটা হাড়চামড়ার মূর্তিকে সামনে ঠেলে দিয়ে পুনি কেওটানী তখনো হাঁক দিচ্ছিল—নিয়ে যা তোর ছেলে।

হেঁটমুখে মাটির দিকে তাকিয়ে বিপিন তার ভীরু চোখের দৃষ্টি লুকোবার চেষ্টা করছিল।

পুনি কেওটানী দর্শকদের মনস্তত্ত্বে ওস্তাদ বাজিকরের মত একটা মোচড় দিল।—দেখছো বাবুরা? স্বচক্ষে দেখে নাও। নিজের ছেলেকে নিতে চাইছে না।

বাপ না পিশাচ? মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের আক্রোশ সরবে গর্জন করে ধৈর্য হারিয়ে ফেললো। এক পশলা চড় ঘুষি ও লাথির বৃষ্টি ঝরে পড়লো বিপিনের ওপর।

ভিড় ভাঙলো। গামছাটা দিয়ে ধীরে ধীরে নাকের রক্ত মুছে ফেললো বিপিন। একটা পাহারাওয়ালা পুলিস হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে দেখে পুনি চটপট টুনাকে কোলে তুলে নিয়ে সরে পড়ার জন্য পা বাড়ালো। বিপিন বললো—পালিয়ো না পুনিদিদি। টুনার মাকে একবার খবর দিয়ে নিয়ে এস।

পুনি চলে যাবার আগে আর একবার মুখ ঝামটা দিল—হাঁ, আসবে টুনার মা, ঝাড়ু হাতে নিয়ে আসবে। এইখানে বসে থাক।

আমাদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে ডিসিপ্লিন একটু কড়া করতে হবে—কথা কয়টি একনিশ্বাসে ছেড়ে দিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলাল আশ্রমমাতার মত বাৎসল্যভরা আবেগ নিয়ে প্রকাশবাবুর দিকে তাকালেন।

প্রকাশবাবু উত্তর দিতে গিয়ে আশ্রমপিতার মত একটা স্নেহপ্রবণ উদ্বেগ নিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কথা ভুলে গেলেন।

জয়ন্ত মজুমদার বললো—লোকটার নাম অবনীনাথ।

সিতা চমকে উঠলো।—অবনীনাথ?

ইন্দ্র বললো—আমার বন্ধু অবনীনাথ।

প্রকাশবাবু কাশলেন।—হ্যাঁ, এই অবনীনাথ আমাদের কয়েকজন কর্মী ছেলেমেয়েদের মনে বিষ ঢুকিয়েছে।

সঙ্ঘের ধর্মতলা শাখা-অফিসের বিবরে হৈমন্তী বিকালের ঘোলাটে আলোর মধ্যে কার্যকরী কমিটির দুশ্চিন্তার ভার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে স্তব্ধ হয়ে রইল। প্রকাশবাবু সজীব হয়ে উঠলেন।—পার্টির নির্দেশ সকলকে জানিয়ে দিতে হবে। এই নির্দেশের একতিল ব্যতিক্রম হলে কোন কর্মীর এখানে স্থান নেই।

ইন্দ্রনাথ যেন এই ধরনের একটা উক্তির প্রতীক্ষায় দম ধরে ছিল। কৌতূহলের তীব্রতা চাপতে না পেরেই বলে উঠলো—পার্টি? কোন পার্টির নির্দেশ? কিসের নির্দেশ?

ইঙ্গিতে ইন্দ্রকে শান্ত করে প্রকাশবাবু বললেন—ডাক্তার খোপড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টো এক কপি করে সব কর্মীদের দিয়ে দেওয়া হোক। অক্ষরে অক্ষরে এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে কোন প্রশ্নের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

বিস্ময় সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছিল ইন্দ্রনাথের। একটু বেহায়ার মত সভাঘরের স্থৈর্য উত্ত্যক্ত করে ইন্দ্রনাথ আবার বললো—ম্যানিফেস্টো? কেন? কিসের জন্য?

প্রকাশবাবু সভাস্থ জনতার সবাইকে উদ্দেশ করে ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন।—আমাদের বিশ্বস্ত কমরেড ইন্দ্রনাথের মনে কতগুলি গোলমাল রয়ে গেছে। আমার মনে হয়, আরও অনেকের মধ্যে এই রকম চিন্তার সংকট দেখা দিয়েছে। কর্মীদের মধ্যে এই সব সংশয় ও প্রশ্ন কাজের পথে সবচেয়ে ভয়ানক বাধা। আপনারা জেনে রাখুন সবাই, ইন্দ্রনাথ ভাল করে শুনে রাখ...।

ঢোক গিলে নেবার পর প্রকাশবাবুর মূর্তিটা আরো কঠোর হয়ে উঠলো।—জেনে রাখুন, আমাদের পার্টির নাম কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টির ভয়ে হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র জাতিবাদী আত্মা দুঃস্বপ্নে আঁতকে উঠছে। জাগৃতি সঙ্ঘ সেই পার্টির একটি বাহু। সব কাজের বড় কাজ, সব চেয়ে প্রথম কাজ—এই পার্টিকে বড় করা। আমাদের যতকিছু স্লোগ্যান এই পার্টিকে বড় করার জন্যই। পার্টির প্রতিষ্ঠার পথে অন্য যে কোন দলের প্রভাবকে নৃশংসভাবে, ছলে বলে কৌশলে উপড়ে ফেলতে হবে। পার্টি আমাদের প্রাণ, পার্টি আমাদের আত্মা, পার্টি আমাদের সমাজ। আমরা পার্টির গান গাইবো, পার্টির ছবি আঁকবো, প্রেমে-প্রণয়ে পার্টির মানুষকেই দোসর করে নেব। পুরাতন পৃথিবীর মানুষের কাছে এই আদর্শ অদ্ভুত লাগবে, তারা নিন্দে

করবে। করুক, আমরা নতুন পৃথিবী তৈরি করতে চলেছি, সুতরাং আমাদের পার্টির মতপথনীতি সবই নতুন হবে। পার্টির অন্যতম প্রিয় নেতা ডাক্তার খোপড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টো আমাদের কাছে বেদ বাইবেল কোরানের মত। পার্টির কর্মীদের শুধু সৈনিকের মত এই নির্দেশ মেনে চলতে হবে—They are not to reason why।

প্রকাশবাবুর বক্তৃতার সুরে শম পড়লো। উর্মিলা কাঞ্জিলাল বললেন—সুতরাং আমাদের ছেলেমেয়েরা...।

জয়ন্ত মজুমদার ধুয়া ধরে বললো—অবনীনাথকে চিনতে শিখুক যে...।

প্রকাশবাবু ড্যাশ পূরণ করে দিলেন—...সে একজন পঞ্চমবাহিনী ফ্যাসিস্ট এবং সবার ওপর কম্যুনিস্ট পার্টি তথা জাগৃতি সঙেঘর শত্রু।

কথাগুলি ইন্দ্রনাথের বুকেপিঠে যেন ঘাতকের ছুরির মত কুপিয়ে চলেছিল। সমস্ত অন্তর একটা ক্ষোভে ও আতঙ্কে রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল। মরিয়া হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে মনের সব প্রতিযুক্তি প্রতিবাদ ও সংশয় চেপে, তবু বেহায়ার মত চেঁচিয়ে উঠলো ইন্দ্রনাথ।—এ কি রকম কথা প্রকাশবাবু? বলুন, কেন অবনীনাথ আপনাদের শত্রু? কেন তাকে ফ্যাসিস্ট বলছেন? কেন তাকে পঞ্চমবাহিনী বলতে আপনাদের একটুও বাধছে না?

ইন্দ্রনাথের কানের দিকে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রকাশবাবু সমস্ত পার্থিব সত্যকে যেন দাঁতের কামড়ে উল্টে দিলেন।—অবনীনাথ কংগ্রেসের লোক। এই কংগ্রেস আমাদের পার্টির পথে সব চেয়ে বড় বিঘ্ন।

ইন্দ্রনাথ যেন ডুবন্ত মানুষের মত চীৎকার করতে লাগলো—প্রকাশবাবু, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু কি বলছেন আপনি? কংগ্রেস আমাদের পথের বিঘ্ন? কি অপরাধ করলো কংগ্রেস? কই, আপনারা তো আজকাল একথা লেখেন না। আপনারাই তো কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবি করেন!

প্রকাশবাবু।—অনেক কিছুই মুখে বলতে নেই, খুলে লিখতে নেই। একটু তলিয়ে বুঝতে শেখো ইন্দ্র।

অভিভাবকের হাতে চড় খেয়ে অতি দুরন্ত ছেলেও পরিত্রাণের জন্য ক্ষণকালের মতই সব উপদেশ শিরোধার্য করে নেয়। ইন্দ্রনাথ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উত্তর দিল—হাঁ, বুঝতে পারছি প্রকাশবাবু। জনযুদ্ধ থিওরি আগে বুঝতে পারিনি, আজ সব স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমাকে মাপ করবেন, আমি সব বুঝতে পারছি।

ইন্দ্রনাথের অবস্থা দেখে উর্মিলা কাঞ্জিলালের করুণা হচ্ছিল। পাশের আসনে সিতা বসুর অন্যমনস্কতা ভেঙে দিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলাল চাপাস্বরে বললেন—যত সব আনকোরা গোঁয়ারগোবিন্দ নিয়ে প্রকাশবাবুর কারবার!

প্রকাশবাবু।—আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি এখনো বুঝতে পারনি ইন্দ্র। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথাটা তোমার খুব খারাপ লাগছে। তোমার ন্যাশনালিস্ট সেন্টিমেণ্টে বাধছে।

ইন্দ্র।—আজ্ঞে না প্রকাশবাবু, আমি সব বিশ্বাস করছি।

প্রকাশবাবু হেসে ফেললেন।—উঁহু, তুমি চেপে যাচ্ছ ইন্দ্র।

ইন্দ্র।—আজ্ঞে না।

ইন্দ্রনাথ মিথ্যে বলেনি। জাগৃতি সঙেঘ অনেক কথার মর্ম বুঝতে তার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যেত। সঙ্ঘ অফিসের এই বৈকালী বৈঠকটি সব রহস্য ভঞ্জন করে দিয়েছে। দেশের শত্রু কংগ্রেস—এই কষ্টিপাথরটি দিয়ে এখন সঙ্ঘ-মতবাদের সব সোনাগুলি একের পর এক ঘষে যাচাই করে নিতে পারা যায়। ইন্দ্রনাথের ক্লান্ত মস্তিষ্কের স্নায়ুপথে ডাক্তার খোপড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টো যেন একটা স্পেশ্যাল ট্রেনের মত হুহু করে দৌড়ে যাচ্ছিল। বিচিত্র তত্ত্বে বোঝাই এক একটি কামরা। কামরার দরজার গায়ে এক একটি উদ্ভট শ্লোক লেখা—'কংগ্রেস

লীগ ঐক্য', 'জাতীয় গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা', 'আগস্টপ্রস্তাব প্রত্যাহার কর', 'যুদ্ধোদ্যোগে সাহায্য কর', 'পাকিস্তান চাই'।

পার্টির পথের কাঁটা কংগ্রেস—ভাবতে গিয়ে যেন একটা ধুলোর ঝাপটা ইন্দ্রনাথের চোখে এসে লাগে। চোখ ঘষে নিয়ে ভাল করে তাকাবার চেষ্টা করে। চমকে ওঠে ইন্দ্র। রহস্যটা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডাক্তার খোপড়িওয়ালার ম্যানিফেস্টোটা ঠিক ম্যানিফেস্টো নয়—একটা হুকুমনামা, একটা সার্কুলার। ঠিক স্পেশ্যাল ট্রেন নয়—লাটের স্পেশ্যাল।

—আমাদের ছেলেমেয়েরা...ঊর্মিলা কাঞ্জিলালা আশ্রমমাতার মত আবার বললেন। ইন্দ্রনাথ রুদ্ধ নিশ্বাসটাকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে বসলো। সভায় কাজের প্রোগ্রাম আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মজুমদার একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। তারই ওপর নির্ভর করে একটা কর্মপন্থা আবিষ্কারের জন্য আজকের জরুরী বৈঠক আহূত হয়েছে।

ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—আর দেরি করা যায় না। আমাদের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করছে। স্কোয়ারের সভার সময় হয়ে গেছে।

জয়ন্ত মজুমদার।—আমি এইবার আরম্ভ করি...অবনীনাথ নামে কংগ্রেসের একটি দালাল কাঁকুলিয়া রোডে থাকে। রীতিমত ধূর্ত লোক। খুব সম্ভব সে একটি দল পাকিয়েছে। কতকগুলি এক্স-টেররিস্ট ছেলে তার সহায় হয়েছে। অনেক নতুন রিক্রুটও সংগ্রহ করেছে। মফস্বলের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে লোক্যাল কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বেশ ভালভাবে অর্গানাইজ করছে। মার্কেটের কন্ট্রোলের লাইনে ও লঙ্গরখানাগুলিতে লোক রেখে ঘাঁটি তৈরী করেছে। সব চেয়ে সাংঘাতিক হলো, লোকটা পাঁচ হাজার নিরন্নকে নিয়ে দল পাকিয়ে একটা সত্যাগ্রহ করার ষড়যন্ত্র করেছে। অ্যাসেমব্লী হাউসের ফটকে, প্রত্যেক মার্কেটে, লাটভবনের ফটকে, মিনিস্টারদের বাড়ির সামনে ওরা দল বেঁধে শুয়ে থাকবে। চাল না পেলে নড়বে না। এক কথায়, অবনীনাথ একটি ভয়ানক রকমের এনার্কি সৃষ্টির প্ল্যান এঁটেছে।

রিপোর্টের প্রথম অধ্যায় শেষ করে জয়ন্ত জিরিয়ে নিল।—আর একটি খবর আছে, সে বিষয়ে একটু নির্ভুল হয়ে নিয়ে তারপর কমিটিকে জানাবো।

ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল।—বেশ তো, খবরটার একটু আভাস এখনি দিতে পারেন।

জয়ন্ত।—অবনীনাথ গাঁয়ে গাঁয়ে গাইয়ে প্রচারক পাঠাতে আরম্ভ করেছে! জমি আর ফসলের ব্যাপার নিয়ে চাষাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ গোছের গোলমাল বাধাবার উদ্দেশ্যে...।

হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা বরাভয় দৃষ্টি দিয়ে সিতার দিকে যেন গোপন আশ্বাস ছুঁড়ে জয়ন্ত আবার বলে চললো।—আজ এ বিষয়ে বেশী কিছু আর বলতে চাই না। প্রয়োজন হলে সবই জানতে পারবেন।

জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে সিতার মুখ থেকে সজীবতার আভা মুহূর্তের মত নিঃশেষে মুছে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই চোখের তারা দুটো স্ফুলিঙ্গের মত একবার জ্বলে উঠে কুঞ্চিত হয়ে এল। উঠে দাঁড়ালো সিতা।—আমি এ বিষয়ে কিছুটা নির্ভুল খবর দিতে পারি। এই গাইয়ে প্রচারকটির নাম শিশির। কিছু করে না, শুধু গান গায়।

বলতে গিয়ে সিরসির করে কাঁপছিল সিতা। আর কেউ না দেখুক জয়ন্ত ঠিকই দেখতে পেয়েছিল।

এরই মধ্যে কর্মীদের জন্য নির্দেশলিপি লিখে শেষ করেছেন প্রকাশবাবু। ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল বললেন—অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কর্মী ছেলেমেয়েরা আর কতক্ষণ একা একা মিটিং চালাবে? এখন ওঠা উচিত।

প্রকাশবাবু উঠলেন। যেতে যেতে গম্ভীরভাবে বললেন।—তোমার বন্ধু অবনীনাথকে আর বাঁচাতে পারলাম না ইন্দ্র।

ইন্দ্র বোকার মত না বুঝেই আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।—অবনীকে কি করতে চাইছেন আপনারা?

প্রকাশবাবু।—অবনীকে পথ থেকে সরাতে হবে।

ইন্দ্র।—মারধর করবেন নাকি?

প্রকাশবাবু।—অবনীর প্ল্যান সব চূর্ণ করবো। কর্মীদের কাছে আজ এই নির্দেশ দেওয়া হবে। ফ্যাসিজ্‌মের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত লোপাট করে দিতে হবে। তুমিও এবার থেকে একটু সাবধান হয়ে যাও ইন্দ্র। অবনীর সঙ্গে বন্ধুত্বটা কিছুদিনের জন্য শিকেয় তোলা থাক। নইলে, তোমার কাজের অসুবিধা হবে।

আহত ও অসহায় জীবের মত ধড়টাকে কোনমতে দু'পায়ে গড়িয়ে নিয়ে সঙ্ঘবন্ধুদের সঙ্গে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ। জনযুদ্ধের প্রথম কামান নল উঁচিয়ে তাক করেছে প্রথম শত্রুর দিকে—অবনীনাথের হৃৎপিণ্ডের দিকে।

জনযুদ্ধ কি জয়! সভাস্থলের দিক থেকে উল্লাসধ্বনি শোনা যায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তালগাছের কোটরে ঘুমন্ত পেঁচা জেগে ওঠে, বিরক্তভরে উঁকি দিয়ে দেখে।

সকলে এগিয়ে গেছে। স্কোয়ারের ফটকে পা এগিয়ে দিতেই পেছন থেকে কে ডাকলো—ইন্দ্রবাবু।

ডাকছিল সিতা। ইন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়ালো। সিতা বললো—আপনার কাছে একটা দরকার ছিল। এখানে নয়। একটু অপেক্ষা করুন, গাড়িটা আসুক।

সন্ধ্যের সার্কুলার রোডের আধো-অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সিতা বসুর গাড়ি দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছিল। নেপালী ড্রাইভারের ছোট ছোট চোখ দুটো অন্ধকারে বোধ হয় আরো ভাল দেখতে পায়। পথের এলোমেলো গাড়ি-ঘোড়া ও পথিকের মন্থর ভিড়গুলিকে সিতা বসুর পন্টিয়াকের স্পীড লঘু গ্যাসের কুণ্ডলীর মত অবাধে তুচ্ছ করে, ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। দু'পাশে দোকানগুলিতে ও থামের গায়ে জোনাকির গায়ের আঠার মত ঠুলি-পরা প্রদীপের নির্জীব ছটা যেন অন্ধকারের গাম্ভীর্যকে চিমটি কাটছিল। এর নাম ব্ল্যাক-আউট—সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার নাগরিক জীবনের বর্ণশব্দছন্দ ভুসো মেখে ছদ্মমূর্তি ধরবে, কোমরভাঙা জীবের মত হামা দিয়ে এক অন্ধকারের সুড়ঙ্গে লুকিয়ে পড়বে। শত্রুর সন্ধানী দৃষ্টি যেন শিকারের টিকিটিও দেখতে না পায়। দফায় দফায় কড়া আইনের ধমকানি আলোকবিলাসী নাগরিকের সব চপলতা বন্ধ করে দিয়ে সংযম শিখিয়েছে। চাদর ঢাকা দিয়ে বিড়ি ধরাতে গিয়ে সাবধানী পথিকের গোঁফ পুড়ে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই এক লাফে পথের পাশে সরে যেতে হয়—একটা মিলিটারী লরীর প্রবাহ উদ্দাম বেগে ছুটে আসছে। হেডলাইটের সুতীব্র আলোকের ছটায় ক্ষণিকের জন্য সন্ত্রস্ত পথ গলি ও অট্টালিকার কালো বোরখার লজ্জা ছিঁড়ে পড়ে। গোঁফপোড়া পথিকের ক্ষোভ নিঃশব্দে আইনের কেরামতিকে ধিক্কার দিতে থাকে।

সিতা বসুর গাড়িটাকে দেখাচ্ছিল অ্যাম্বুলেন্স কারের মত। পেছনের সীটের দুই কোণে দুই আহত মানুষ অসাড়ভাবে পড়ে আছে—সিতা আর ইন্দ্র। ল্যান্সডাউনের দিকে মোড় ফেরার জন্য গাড়িটা একটু কাৎ হতেই পাশের লাইটপোস্টের শীর্ষ থেকে এক মুঠো আলোকের বিবর্ণ আবীর গাড়ির ভেতর ছিটকে এসে পড়লো। সিতা দেখলো, ইন্দ্র তার কপালটাকে এক হাতে টিপে নিঝুম হয়ে বসে আছে।

অনেকক্ষণ দ্বিধা করার পর সিতা বললো—এতক্ষণ নিশ্চয় বন্ধু অবনীনাথের কথা ভাবছিলেন।

ইন্দ্র সাড়া দিল—না, নিজের কথাই ভাবছিলাম।

সিতা।—অগত্যা কি করবেন, সেই কথাটাই বোধ হয় ভাবছেন।

ইন্দ্র।—এ প্রশ্ন আপনার মনে কেন আসছে?

সিতা।—অবনীবাবুকে বাঁচাতে হবে।

ইন্দ্র একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলো না। অবনীকে বাঁচাবার জন্য মাথাব্যথা আর যারই থাক, সিতা বসু নামে এই সঙ্ঘচারিকা ধনী দুহিতার পক্ষে সেটা একান্ত অস্বাভাবিক। সিতা বসু তাকে জীবনে দেখেওনি বোধহয়। অবনী কি বেতারে প্রভাব বিস্তার করছে? আজকের বৈঠকে প্রকাশবাবুর পার্টিবাদের ব্যাখ্যা শুনে কয়েকজন কর্মীর মুখে মেঘলা দিনের মত একটা গুমোট দেখা দিয়েছিল, তাও লক্ষ্য করেছে ইন্দ্র। একটা খুশিমাখা হিংসা অগোচরে ইন্দ্রনাথের মনের ভেতরে ঢুকে যত পুরনো অভিমান ও ধারণার দাম্ভিকতাকে অবজ্ঞাভরে ছোট করে দিচ্ছিলো।

ভাবতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ছিল ইন্দ্র। অবনীর কথা আজ নতুন করে মনে পড়ছে তা নয় ; প্রায়ই যেন মনে পড়তো। দুঃখ হ'তো—

তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।

অবনী সেখানেই থেমে আছে। জাগৃতি সঙ্ঘের মতবাদের প্রসাদে এ কয়টা মাস অবনীনাথকে শুধু মনে মনে করুণা করছিল ইন্দ্র। এই গোলকীয় যুদ্ধে পুরাতন জীবনের সব স্বস্তিবাদ উপড়ে পড়ছে, পাল্টে যাচ্ছে। সংকটের পর সংকট দেখা দিচ্ছে, নতুন কাজের আহ্বান আসছে। ঠিক সেই সময় অবনীনাথ যেন ফুরিয়ে গেল। বড় আপসোস নিয়ে সেদিন অবনীর বাসা থেকে চলে গিয়েছিল ইন্দ্র।

আজ ভাবতে গিয়ে অলক্ষ্য একটি গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল ইন্দ্র। এর কারণ কি, তা'ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। পুরনো সেপাই অবনীনাথ তাহ'লে থেমে যায়নি। ঠিক সময়মত ঘুম ভেঙে গেছে অবনীনাথের। ঠিক বুঝেছে অবনীনাথ—ক্ষুধার্তের জিহ্বাকে প্রার্থনাস্তোত্র শিখিয়ে কোন লাভ নেই। মিনতি করলে মৃত্যু দূরে সরে যায় না—প্রতিরোধ করতে হয়। জয়ন্ত মজুমদারের রিপোর্টটা এক নিমিষে ইন্দ্রনাথের একটা গর্বকে আরও উদ্ধত করে দিয়েছে—তারই বন্ধু অবনীনাথ। বর্ণে বর্ণে সত্য হোক জয়ন্ত মজুমদারের রিপোর্ট।

গাড়িটা থামবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের চিন্তা থেমে গেল। প্রাসাদের মত বিরাট ও সুশ্রী একটি বাড়ির ফটকের সামনে গাড়িটা দাঁড়ালো। সিতা বললো—নামুন।

হলঘরের ভেতর ঢুকতেই অনেককে দেখামাত্র চিনতে পারলো। সিতার জন্মদিনে এঁরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ঐ যে উনি, সেই বৃদ্ধ ডাক্তার মুখার্জি। বিশেষ করে ব্যাঙ্কার কালীকিংকরবাবুকে আগে চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কালীকিংকরবাবুর বেশভূষার একটা নূতনত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তাঁর খদ্দরের সাজ।

আসুন আসুন। ইন্দ্রনাথকে দেখে অভ্যর্থনা-বাণী উচ্চারণ করলেন গৃহস্বামী কালীকিংকরবাবু, কিন্তু প্রশ্নভরা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলেন সিতার দিকে।

সিতা বললো।—হ্যাঁ মেসোমশাই, ইনি ইন্দ্রবাবু, অবনীনাথের একজন বন্ধু।

এখানেও অবনীনাথ! অবনীনাথের নাম কি পাখির ডাকে, বাতাসের দোলায় আর জলের স্রোতে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে? সবাই মিলে কি ঐ নামটি শেষে জপতে আরম্ভ করবে? বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল ইন্দ্র।

কালীকিংকরবাবু।—আমরা আপনার সহযোগিতা চাই ইন্দ্রবাবু। আপনাকে বোধ হয় নতুন করে বলে দিতে হবে না যে, এখানে যাঁদের দেখছেন তাঁরা সবাই ন্যাশনালিস্ট। আপনার বন্ধু অবনীনাথও নিজেকে ন্যাশনালিস্ট বলে, সে নাকি কংগ্রেসের লোক ; কিন্তু আমাদের উভয়ের ধারণার মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। এই পার্থক্যটাই একটা ভেদ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এই ভেদটা আবার একটা বিরোধে না দাঁড়িয়ে যায়। সেই জন্যই একটা ব্যবস্থা করার জন্য আপনার সহযোগিতা চাই।

ইন্দ্র।—আপনার কথা আমি এখনও পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।

কালীকিংকরবাবু।—আপনার বন্ধু অবনী যে-পথ ধরেছে, সেটা ভুল পথ। সেটা ন্যাশনালিজ্‌মের পথ নয়, সম্ভবত কংগ্রেসেরও পথ নয়।

ইন্দ্র।—তাই কি আপনারা একটা নির্ভুল পথ ধরতে চাইছেন?

কালীকিংকরবাবু।—হ্যাঁ, সেই জন্যই আপনার সহযোগিতা চাই।

ইন্দ্র চুপ করে রইল। কালীকিংকরবাবু সুকথকের মত তাঁর বক্তব্য টেনে নিয়ে চললেন।—আপনি জানেন যে, আমরা গভর্নমেন্টকে ছেড়ে কথা বলি না?

ইন্দ্র।—আজ্ঞে না, সে খবর আমি রাখি না।

কালীকিংকরবাবু।—এই ধরুন, সিতার জন্মদিনের আসরে আপনাদের সঙ্গে আমার যে ডিবেট হলো, তাতে আমি যেসব পয়েন্ট তুলেছিলাম, সেগুলি কি ভুয়ো?

ইন্দ্র।—না।

কালীকিংকরবাবু।—দেশের বাণিজ্য ব্যাপারে আমাদের একটি দায়িত্ব আছে, আপনি কি অস্বীকার করবেন?

ইন্দ্র।—না।

কালীকিংকরবাবু।—দায়িত্ব থাকবে অথচ ক্ষমতা থাকবে না, এই অবিচার কি চুপ করে মেনে নিতে হবে?

ইন্দ্র।—না।

কালীকিংকরবাবু।—দেশের লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ না খেয়ে মরে যাবে এই দৃশ্য কি আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো?

ইন্দ্র।—না।

কালীকিংকরবাবু।—সেই জন্য আমরা একটি আন্দোলন করতে চাই। দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্যেও ভারতরক্ষা আইন এসে উপদ্রব করবে, ভেবে দেখুন, পরাধীনতার কোন স্তরে এসে আমরা পৌঁছেছি।

ইন্দ্র।—দেশের ব্যাঙ্কগুলির ওপর গভর্নমেন্ট কি কোন জুলুম আরম্ভ করেছে?

কালীকিংকরবাবু।—না, ব্যাঙ্কের ওপর নয়, চালের ওপর।

ইন্দ্র।—চাল?

কালীকিংকরবাবু।—হ্যাঁ।

ইন্দ্র।—সত্যিই আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না কালীকিংকরবাবু।

কালীকিংকরবাবু।—যখন দেখলাম দেশের লক্ষ লক্ষ গরিবের মুখের ভাত নিয়ে ছিনিমিনি চলছে, তখন আমাদের বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসতে হলো। জানি, ইণ্ডাস্ট্রি ব্যাঙ্কিং সাইন্টিফিক ফার্মিং সবই জানি। দেশের উন্নতির সব উপায় জানা আছে। কিন্তু কিছুদিনের জন্য এই সব বড় বড় কথা আর কাজ স্থগিত রাখতে হবে। এখন কোন মতে দেশের চাল বাঁচাতে হবে, দেশের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

ইন্দ্র।—সুতরাং আপনারা কি করতে চান?

কালীকিংকরবাবু।—আমরা কিছুটা করতে পেরেছি। এই সংকটে দেশের জনসাধারণের জন্য একটা খাদ্যের রিজার্ভ তৈরী করতে হবে।

ইন্দ্রনাথের ধৈর্যের কাঠিন্য হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত পেল।—বলেন কি মশাই? আপনারা কি তবে চাল স্টক করতে চাইছেন?

কালীকিংকরবাবু হেসে ফেললেন।—ঐ বাজারী বুলিটা একবার দয়া করে ছাড়ুন তো

মশাই! স্টক করা মানে? ঐ কথাটার অর্থ কি? আমরা ব্যবসার জন্য ব্যবসা করি না। দেশের লোকের সেবার জন্য ব্যবসা। আপনারা বড় তাড়াতাড়ি ভুল বোঝেন। ব্যাপারটা চাল স্টক করা নয়। চালের রিজার্ভ তৈরী করতে চাই। ভগবান না করুন, জাপানীরা যদি হঠাৎ ভয়ানক রকমের একটা কাণ্ড করে বসে, তখন দেশের লোককে খাওয়াবে কে? প্রভুরা? প্রভুদের কথা আর বলবেন না।

ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কালীকিংকরবাবুর কথাগুলি বিষমাখা ছুঁচের মত ইন্দ্রনাথের বুদ্ধির গ্রন্থিগুলির মধ্যে ছুটছিল। একটা বীভৎস অবসাদ ঘিরে ধরছিল ইন্দ্রকে। মজুতদার! এতদিন মজুতদার বলতে গড়পারের শ্রীনাথ মুদির মত একটা গামছাপরা মূর্খ মূর্তি মনের মধ্যে দেখা দিত। আজ ল্যান্সডাউন রোডের এই প্রাসাদের কক্ষে বসে মজুতদারী সিংহস্বরূপকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ইন্দ্র। শ্রীনাথ মুদিরা মজুতদারের ফেউ মাত্র। একটি লাথি মেরে তাদের সরিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু ল্যান্সডাউন রোডের মর্মর কক্ষে এই 'জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির' ক্ষুরধার দুর্বুদ্ধির বিষ দাঁত ভাঙতে, নিখুঁত ছদ্মবেশ ছিঁড়ে ফেলতে, দুর্মদ মুনাফার লোভ শান্ত করে দিতে পারে, এমন সাধ্য কার? এরা ইচ্ছে করলে মাধ্যাকর্ষণ আইনকেও ঘুষের জোরে কিনে ফেলতে পারে বোধ হয়। ভারতরক্ষা আইন কোন ছার!

কালীকিংকরবাবু ততক্ষণে আবার আরম্ভ করেছেন।—আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, চালের রিজার্ভ তৈরী করলেই কি সমস্যা মিটে যাবে? বুভুক্ষুরা খাবে কি? আমরা অন্ধ নই ইন্দ্রবাবু। এই কর্তব্যজ্ঞানটুকু আমাদের আছে। শহরে ষোলটি লঙ্গরখানা আমাদেরই উদ্যোগে চলছে। দৈনিক এগার হাজার নরনারীর মুখে ভাত দিচ্ছি আমরা। এর জন্য কোন প্রাইজ, কোন প্রতিদান আশা করি না আমরা।

ইন্দ্র।—একটা প্রশ্ন, ধরুন এই চালের রিজার্ভটি তৈরী করলেন। তারপর তার সদগতি কিভাবে হবে?

কালীকিংকরবাবু।—আমাদের বিশ্বাস খাদ্য সংকট ভবিষ্যতে আরো কঠিন ও জটিল হয়ে উঠবে। তখন...।

সৌজন্য ভুলে গিয়ে ইন্দ্রনাথের স্বর হঠাৎ মাত্রাহীনভাবে তিক্ত হয়ে উঠলো।—অর্থাৎ, চারশো পার্সেন্ট প্রফিটেও পেট ভরছে না। আটশো পার্সেন্ট চাই। আরও কয়েক হাজার গ্রামকে শ্মশান করা চাই। এক কথায়, এই সংকটকে একেবারে চরমে তুলে নিয়ে যেতে হবে।

সন্দিগ্ধভাবে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কালীকিংকরবাবু বললেন—এতক্ষণ কি আমি বৃথাই এতগুলি বাক্য ব্যয় করলাম ইন্দ্রবাবু। আপনার ভুল ভাঙেনি দেখছি।

সিতা বললো—তর্কে কোন নিষ্পত্তি হবে না মেসোমশাই। ইন্দ্রবাবুকে তর্কের মধ্যে টানবেন না। আসল কাজের কথাটা নিয়েই আরম্ভ করুন।

কালীকিংকরবাবু গলাঝাড়া দিয়ে চারদিকে তাকালেন। সিতা একটু ব্যস্ত হয়ে বললো—আমি ভেতরে যাই, নইলে মাসীমা রাগ করবেন।

সিতা চলে গেলে ডাক্তার মুখার্জি পাকা ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়ালেন।—আমিও যাই, কাজের কথার মধ্যে আমি নেই।

কালীকিংকরবাবু অনুযোগ করলেন—আপনি আমাদের কেস খারাপ করে দিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার মুখার্জি।

ডাক্তার মুখার্জি।—যাতে খারাপ না হয়, তাই সরে পড়ছি। সিতার জন্মদিনে একবার জাগৃতি সঙেঘর কেস খারাপ করেছি। ভয় হচ্ছে, আজ আবার আপনাদের ন্যাশনালিস্ট কেস খারাপ করে দেব। আমাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আমি নিজের কেস নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট আছি। ফী বাড়িয়ে দিয়েছি।

ডাক্তার মুখার্জি চুরুট ধরিয়ে চলে গেলেন। হাসতে চেষ্টা করেও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

একটা অস্বস্তিকর নিঃশব্দতার মধ্যে কিছুক্ষণ উসখুস ক'রে জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির চেহারাটা ক্রমে সজীব হয়ে উঠলো। বঙ্গকল্যাণ ইনসিওরেন্স কোম্পানির নিমাই চ্যাটার্জি হাসলেন। আলকাতরা মার্চেন্ট হৃষীকেশ রায় কাশলেন। কুমার শুভেন্দুনারায়ণ চশমা জোড়া খুলে নিয়ে মুছলেন। শুধু বন্দে মাতরম গানটাই বাকী রইল।

কালীকিংকরবাবু বললেন—আপনার বন্ধু অবনীনাথ কিন্তু ভয়ানক ভুল করছে ইন্দ্রবাবু। তাকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার আপনাকে দিতে চাই। এই জন্যই আপনার সহযোগিতা চাই।

ইন্দ্র।—বলুন।

কালীকিংকরবাবু।—অবনীনাথ একটা সত্যাগ্রহ করবার প্ল্যান এঁটেছে। খবর পেয়েছি, ওর ভলাণ্টিয়ারেরা কয়েক হাজার ভিখিরী নিয়ে আমাদের স্টোরে ধর্না দেবে। এখন ভাবুন, অবনীর এই মতিচ্ছন্নতা কি করে দূর করা যায়!

ইন্দ্র।—এক্ষেত্রে আমি আপনাদের কি সাহায্য করতে পারি, বুঝতে পারছি না।

কালীকিংকরবাবু।—অবনীকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার ভার আপনার ওপর দিলাম।

জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির স্তম্ভ কয়টির দিকে কালীকিংকরবাবু একটা সংকেতপূর্ণ দৃষ্টি ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি নরসিংহের পকেট থেকে পাঁচটি চেক বই ও ফাউণ্টেন পেন বের হয়ে এল। কিছুক্ষণ শুধু খস খস কলমের শব্দ—আর কিছু শোনা যায় না। মূর্ছার মত একটা হতভম্বতার প্রকোপ থেকে মুক্ত হয়ে যখন ইন্দ্রনাথ ভাল করে তাকালো, তখন তার সামনে টেবিলের ওপর পাঁচটি চেক জ্যান্ত মাছের মত বাতাসে ফরফর করে নড়ছে। এক এক হাজার করে—সাকুল্যে পাঁচ হাজার।

কালীকিংকরবাবু অকপট সৌহার্দ্যের আবেগে গলা খুলে বলে যাচ্ছিলেন।—আপাতত এই নিয়েই অবনীকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কুমার শুভেন্দুনারায়ণ তখনো মনোযোগ দিয়ে আর একটি চেক লিখছিলেন।

কালীকিংকরবাবু প্রশ্ন করলেন—আর কেন?

কুমার শুভেন্দু।—সবাইকে যখন দিচ্ছি, যখন সরকারী আমলাগুলি পর্যন্ত দু'হাত ভরে নিয়ে গেল, তখন জাগৃতি সঙ্ঘ বা বাদ পড়বে কেন?

কালীকিংকরবাবু চেঁচিয়ে আপত্তি করলেন।—আরে না না। জাগৃতি সঙ্ঘকে ভয় করবার কিছু নেই। ওরা অত্যন্ত নিরীহ। অত্যন্ত ভীরু এজিটেটারের দল। তা'ছাড়া ওদের নিজেদেরই তোফা গৌরী সেন রয়েছে, তার সঙ্গে দরে এঁটে উঠতে পারবেন না। ওরা আপনার চালের গোলা ঘিরে ধরতে আসবে না। ওরা ইস্তাহার বিলি করে, আবেদন করে, গালাগালি দেয়। আপনিও সেই ইস্তাহার দুহাতে তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিন। বাস্—ওরাও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।

কালীকিংকরবাবু মাতালের মত হাসতে লাগলেন।

বঙ্গকল্যাণ ইনসিওরেন্সের নিমাই চ্যাটার্জি বললেন—হ্যাঁ, একটা জার্নাল চালাবার যে প্রস্তাবটা ছিল, সেটা এবার...।

কালীকিংকরবাবু—হ্যাঁ, আর একটি কাজের কথা শুনতে হবে ইন্দ্রবাবু। আপনাকে জাগৃতি সঙ্ঘ ছাড়তে হবে ; আমি জানি সেখানে আপনার মত ন্যাশনালিস্ট মন টিকতে পারবে না। সিতাও সেই কথা বলছিল। আপনাকে এই জার্নাল চালাবার কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

আলকাতরা মার্চেন্ট হৃষীকেশ রায় কাশলেন।—জাগৃতি সঙ্ঘের ফাজলামিকে আর বরদাস্ত করা যায় না। ওরা শুধু দেশের লোকের কানে বৃটিশ-প্রীতির মন্ত্র পড়ছে। যত পাপের মূল নাকি আমরা—ন্যাশনালিস্ট ক্যাপিট্যালিস্টের দল।

কালীকিংকরবাবু—এর ওষুধ আমরাও জানি। আমরাও দেশের লোককে জোর গলায় এই সত্যটা বুঝিয়ে দেব যে, যত অনর্থের মূল বৃটিশ। দেখি, কে হারে কে জেতে? কি বলেন ইন্দ্রবাবু?

ইন্দ্র হঠাৎ সব ভব্যতার সংযম ভুলে গিয়ে স্পর্ধার সুরে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—কিন্তু মশাই, কংগ্রেসী অবনীনাথের ন্যাশনালিজ্‌ম এখনও আপনাদের চেক স্পর্শ করেনি। সে যদি দেশের পথে হাটে মাঠে প্রচার করে বেড়ায় যে আপনারা ভুয়ো, আপনারা মিথ্যা, আপনারা দেশের শত্রু, আপনারা শুধু আপনাদেরই জন্য। আপনারা না দেশের, না নেশনের, না বৃটিশের, না পৃথিবীর। অবনী যদি কংগ্রেসের নাম করে বলে, জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতি কারও মঙ্গলের জন্য নয়, তারা একটা প্রচণ্ড ছলনা। তারা একটা জুয়াড়ী সঙ্ঘ—ক্ষুধার্তের পাকস্থলী নিয়ে তারা ফাটকা খেলছে...

কালীকিংকরবাবু উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলেন।—থামুন থামুন। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ইন্দ্র।—না, উত্তর দিন, আমি খোলাখুলি জানতে চাই।

কালীকিংকরবাবু—যদি তাই হয়, তখন অবনীনাথের সঙ্গে আপোসের দিনও শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরাও দেখে নেব, কে কংগ্রেস? অবনীনাথ, না আমরা।

ইন্দ্র।—তখনও যে অবনীর ওপর টেক্কা দিয়ে সুবিধা করতে পারবেন, এই বিশ্বাস কেমন করে পাচ্ছেন?

কালীকিংকরবাবু ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে বললেন—তখন দেখে নেব, কে ন্যাশনালিস্ট? কংগ্রেস, না আমরা।

ইন্দ্র।—ধন্য আপনাদের দুঃসাহস। সেই শক্তিপরীক্ষার লগ্নটির অপেক্ষায় তৈরী হয়ে থাকুন। আমার আর কিছু বলবার নেই। সিতা বসুকে ডেকে এই চেকগুলি সঁপে দিন। এই দৌত্যের ভার তারই হাতে দিন। আমি উঠলাম।

সন্ত্রস্ত মক্ষিকার মত একটা ভয়াবহ মাকড়সার জাল ছিঁড়ে ইন্দ্রনাথ যেন উড়ে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে শুধু একটা কথা কানে ভেসে এল, যেই বলুক—বন্ধু অবনীনাথকে তাহ'লে আর বাঁচাতে পারলেন না ইন্দ্রবাবু।

ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে গুঁড়ো বৃষ্টি ঝরে পড়ছিল। দিগ্বিদিক ঠাহর হচ্ছিল না ইন্দ্রনাথের। অকারণে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে শুধু হন হন করে পথ ধরে হেঁটে চলেছিল। দৌড়তে পারলে বোধ হয় একটু সোয়াস্তি পেত। ভয় করছিল ইন্দ্রনাথের—জীবনে যা কখনো হয়নি। কলকাতার কপালে এই ব্ল্যাক-আউটের ভ্রূকুটি চিরকালের মত সত্য হয়ে থাক, আর যেন সূর্য না ওঠে। ইন্দ্রনাথের বুকের ভেতরে শ্বাসবায়ু হঠাৎ শিউরে শীতল হয়ে যায়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কে জানে কোন দুর্মুখ এই বার্তা কানে শুনিয়ে যাবে—অবনীনাথ খুন হয়েছে।

একটা ট্রাম চলে গেল। ভিজতে ভিজতে একটা জনাকীর্ণ পথে এসে পড়লো ইন্দ্র—পার্ক সার্কাস। একটা চলন্ত ট্রামে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো ইন্দ্রনাথ। শুচিবাতিক মানুষের মত, যেন আজ বাংলাদেশের মাটির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চাইছে সে। পার্ক সার্কাস থেকে এসপ্ল্যানেড, এসপ্ল্যানেড থেকে আবার শেয়ালদা—এক গন্তব্যহীন পরিক্রমায় শুধু পাক দিয়ে ইন্দ্রনাথ ঘুরতে লাগলো।

বিচিত্র এক অপরাধপুরীর মত দেখাচ্ছে কলকাতাকে। আলো-আঁধারী আবছায়ার মধ্যে মানুষগুলি ঘুরঘুর করছে। শব্দ ছায়া স্পন্দন আলোড়ন—সবই কেমন সন্দেহজনক। তার মধ্যে কোন সদুদ্দেশ্যের ছন্দ নেই। মিথ্যা সত্য হয়ে উঠেছে—সত্য সর্বৈব মিথ্যা হয়ে গেছে। এই মোড়ে যাত্রী ওঠে না, স্টপের কাছে নিরন্নের বাসি লাশ কুঁকড়ে পড়ে থাকে। পরের স্টপে মাতাল সৈনিকের বগলদাবা হয়ে নতুন বেশ্যা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে গাড়িতে ওঠে। পথের

মোড়ে মোড়ে ক্লান্ত ঘরমুখো যাত্রীর দল বাসে উঠতে জায়গা পায় না—নাতির হাত ধরে কালীঘাটের বুড়ী পথের মাঝে দাঁড়িয়ে হতাশায় কাঁপতে থাকে। বাসের সংখ্যা কম—যাত্রী বেশী। এরই নাম পেট্রল রেশনিং। ওদিকে প্রতি লম্পটের নিশাচর গাড়ি ট্যাঙ্কভর্তি পেট্রলের আবেগে চৌরঙ্গীর চারপাশে চিতাবাঘের মত হুটোপুটি করে বেড়ায়। একদিকে আত্মম্ভর রাষ্ট্রের লঙ্গরখানায় দয়ালু খিচুড়ির ফাঁকি, আর একদিকে বার বিলিয়ার্ড, বলরুম, হোটেল রেস্তোরাঁ ও কাফে—মাংসান্নের নিত্য মহোৎসব।

সুতানুটি আজ সিটি অব ক্যালকাটা হয়ে গেছে। ইতিহাসের চিত্রগুপ্তকে ধন্যবাদ! ডাউনিং স্ট্রীটের গণতন্ত্রের হিরণ্ময়েন পাত্রেণ ভারতের মসীলিপ্ত আত্মা আরো ভাল করে ঢাকা পড়ুক—কোথাও যেন আর ফাঁক না থাকে! দেশের সীমা ছাড়িয়ে শত যোজন দুরে যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ চমকায়। তবু বাংলাদেশের খালে বিলে মড়া ভাসে। ভারতের বীর ফকির, বিংশ শতাব্দীর নরোত্তম গান্ধী মানবতার নামে প্রশ্ন করে—কেন এ যুদ্ধ? ভাগাড়ধর্মী সাম্রাজ্যবাদী চিলের চীৎকার উত্তর দেয়—We mean to hold our own! ভাড়াটে প্রেসের ফেরুপাল চীৎকার করে—জনযুদ্ধ মুক্তিযুক্ত গণযুদ্ধ। অদ্ভুত এই দেশ—বিদ্‌ঘুটে এর আইন। যে-কোন চোর, যে-কোন খুনী লাইসেন্সের আড়ালে মজুতদারি ফাটকা আর ভেজাল খাদ্যের ব্যবসা করে। ভণ্ড আর ঠুঁটো মন্ত্রিত্ব লাল ফিতে আর লেপাফার গদিতে বসে অসার গলাবাজির দাপট দেখায়। উৎকোচে বিক্রীত-বিবেক আমলা আর অফিসারের দল অবাধে লক্ষ মানুষের মঙ্গল নিলামে চড়িয়ে দেয়।

সব ব্ল্যাক-আউটের অন্তরালে চরম অন্ধকারে দেখা যায় কারাকক্ষের লোহার গরাদ। তার পেছনে এক একটি বন্দী বেদনার্ত মূর্তি—চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর প্রিয়তম কল্যাণসঙ্ঘ কংগ্রেসের অগ্নিহোত্রী নায়কের দল। এই গ্লানির পারাবারের অপর পারে এক একটি ক্ষমাময় মূর্তি যেন নিঃশব্দে শোকের প্রহর গুনছে। কে এরা? মস্কো চুংকিং লণ্ডন নিউইয়র্কের যে-কোন পথের লোক মনে মনে স্বীকার করে নেবে—পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বমানবের মুক্তির সনদ প্রথম যারা লিখলো, এরা তারাই।

ট্রামের ঝাঁকুনি হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠলো, লালবাজারের মোড়ে। ট্রামটা আস্তে আস্তে মোড় ফিরছে। ধ্যান ছুটে গিয়ে স্বাভাবিক সংবিৎ ফিরে এল ইন্দ্রনাথের। পথের পরিচয় বুঝতে পেরেই নেমে পড়লো—শেয়ালদার ট্রামে ফিরতে হবে। পথ নিরালা, রাত মন্দ হয়নি।

কাছেই একটা মোটরকার প্রভুর অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সাহেবী পোশাকপরা একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মোটরে উঠে স্টিয়ারিং ধরলো। স্টার্ট নিতে বেশী দেরি হয়নি, তবু সেই চকিত কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে ইন্দ্র তাকে চিনে ফেললো—জয়ন্ত মজুমদার।

এত চুপি চুপি কেন? জয়ন্তের মাথার টুপিটা সাপের ফণার মত দোলে কেন? কার প্রাণের স্বপ্নে অলক্ষ্যে ছোবল দিয়ে এল জয়ন্ত মজুমদার?

সেই জুডাসের প্রেতাত্মা, ইতিহাসের পথের পাশে গুপ্তঘাতকের ছায়া আজও যেন একবার চকিতে দেখা দিয়ে চলে গেল। চরমভাবে এদের চেনা হয়ে গেছে! দৌড়ে সরে এসে একটা চলন্ত ট্রামের ভেতর লাফিয়ে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। ব্ল্যাক-আউট আরও গভীর হয়ে ঘনিয়ে উঠেছে।

শিশিরের চিঠি আসছে। অবনীর নামেই আসে। প্রথম দিকে চিঠিগুলি আকস্মিকভাবেই আসতো। চিঠি খুলতো অবনী। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে—চিঠি এসে পড়ে আছে দু'তিন দিন, তবু অবনীর সময় হয়নি। হঠাৎ কোন অবসরের ফাঁকে মনে পড়তো চিঠির কথা, অবনীই চিঠি খুলে পড়তো, সবাইকে শুনিয়ে দিত—শিশিরবাবু ভাল আছেন। কাজ নিয়ে বেশ

মেতে আছেন।

কিন্তু সে-অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। কাঁকুলিয়ার বাড়িটার মন উৎকর্ণ হয়ে থাকে প্রতীক্ষায়। পর পর পাঁচটা দিন এমনিতে যদি কেটে যায়, তবে ভাবতে হয় সবাইকে—শিশিরের চিঠি আসা উচিত ছিল এতদিনে। অবনী ভাবে, পিসিমা ভাবেন—জোছু ও অরুণা ভাবে।

শিশিরের চিঠি আসছে নিয়মিত।

হলুদবাড়ি, ৫ই অগ্রহায়ণ : বেশ আছি অবনীবাবু। I feel like a conqueror—দৈনিক সাত-আটটি গ্রামের হৃদয় জয় করে ফিরছি। তারা গান শুনছে, জয়ধ্বনি করছে, আমার নাম দিয়েছে বাউল রাজা। বাঁচতে শেখ, বাঁচাতে শেখ—দিনরাত মন্ত্র পড়ে দিচ্ছে তাদের কানে কানে। তারা মেতে যাচ্ছে। কখনো ভাবতে পারিনি অবনীবাবু, এই আধমরাদের নিঃশ্বাসে, এই উপবাসী মূর্তিগুলির হাড়ের অণুপরমাণুতে এতখানি প্রাণ লুকিয়েছিল। আমি যেন এক সুন্দর স্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছি। আমাকে বাধা দেবার শক্তি বোধ হয় কারও নেই। আমি নিজেকেই আর থামাতে পারবো কিনা জানি না। এইভাবে চলতে চলতে যদি একদিন ফুরিয়ে যাই অবনীবাবু, জীবনে সেটাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হবে। কিন্তু আপনারা সুখী হবেন তো অবনীবাবু? কেন জানি মনে হয়, আপনি আমার এই সৌভাগ্য সমর্থন করবেন না। আপনি হয়তো ভাববেন, এটা এক অকর্মীসুলভ দুর্বলতা, ভাবালুতা ভীরুতা। পিসিমা বলবেন—ছেলেমানুষী দুরন্তপনা। আর জোছু ও অরুণা দেবী কি ভাববেন জানি না। কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ আছে আমার? আর ফিরে যাবার পথও কই? কোথায় ফিরে যাব? কি লাভ হবে? কোন কাজে আসবো?

কাল একবার মহকুমা শহরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, রেজিস্টারী অফিসের সামনে রোদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভিড় যেন নিঃশব্দে চিতার ওপর দাঁড়িয়ে পুড়ছে। এই ভিড়টার চেহারা অদ্ভুত, ভয়াবহ, করুণ। যেন একটা আত্মহত্যার সম্মেলন। জমি বিলিয়ে উৎসব। সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার জন্যও মানুষ এভাবে ভিড় করতে পারে, আগে কখনো কল্পনা করতে পারিনি। গাঁয়ের লোকগুলি যেন পাগল হয়ে গেছে। জোত জমি অবাধে বেচে দিয়ে কতকগুলি কাগজের টাকা ট্যাঁকে গুঁজে পালিয়ে যাচ্ছে। বীভৎস এই উৎসব, মাতৃহত্যার মত একটা মূঢ়তা।

কিনছে কে? কলকাতার একটি চাঁই ব্যাঙ্কার কালীকিংকর বাঁড়ুজ্যেকে চেনেন কি? এই কে-ব্যানার্জি নামধেয় একটি বাণিজ্য জগতের জাম্বুবানের মত মর্কট দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে। কিনছে তারাই। এই জমিবেচা টাকা নিয়ে গেঁয়ো পাগলগুলি যাচ্ছে কোথায় জানেন?

কে-ব্যানার্জির ব্যাঙ্কের একটি শাখা অফিস আছে এখানে। ব্যাঙ্ক তো নয়, চালের ভাঁড়ার। ষাট টাকা মণ দরে ক্ষুধার্ত দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে। জমিবেচা অর্থের শেষ কড়িটা এখানে বিলিয়ে দিয়ে গেঁয়ো জীবগুলি কৃতার্থ হয়ে চলে যাচ্ছে—চাল নিয়ে যাচ্ছে। কেউ দশ সের, কেউ আধ মণ, আর যার ভাগ্য ভাল—সে দু' মণ। বিশ্বাস করছি অবনীবাবু, মানুষকে হত্যা করে তার হাড় দিয়ে পিরামিড তৈরী করার পালা আজও শেষ হয়নি। চোখের সামনে দেখছি, কে-ব্যানার্জির এস্টেট গড়ে উঠছে। কত হাজার চাষীর চৌদ্দপুরুষের হাড়ে তৈরী জমি লুঠ হয়ে গেল।

এই পাপের চক্র কবে ভাঙবে অবনীবাবু? আমি কি সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবো?

আজ হলুদবাড়ি ছেড়ে গেলাম। রেল লাইন ডিঙিয়ে মাঠে মাঠে চলে যাব। বেশ সুন্দর মাঠটা—একেবারে ফাঁকা মনখোলা শূন্য উদাস। বাবলার বন আছে মাঝে মাঝে, কিন্তু ছায়া নেই। তাতে কিছু আসে যায় না। আর ছায়া চাই না জীবনে।

এরা রইল পড়ে—হলুদবাড়ির সাতশো ক্ষুধার্ত প্রতিজ্ঞা করেছে, তারা মরবার আগে একবার জ্বলে উঠবে। সকাল সন্ধ্যা এই লাইন দিয়ে অন্তত বিশটা মালগাড়ি যায়। তার মধ্যে

কি চাল নেই? আটা নেই? কার জন্যে এই অন্নসম্ভার? হলুদবাড়ি আজ সাধ করে নিজেরই চিতাশয্যা রচনা করেছে। এই লাইনের ওপর তারা শুয়ে থাকবে। মালগাড়ির চলাচল বন্ধ করবে। আমি কি এদের মানা করতে পারি? পারি না।"

অবনী চিঠি পড়ে শোনায়। জোছু ও অরুণা চুপ করে শোনে। পিসিমা শান্তভাবে শুনতে শুনতে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—ও কী কথা! না না, এসব ভাল নয়। ফিরে আসবে না, এসব ভাল কথা নয়। মাথা পাগলা ছেলে। ওকে লিখে দে অবু, চলে আসুক। ফুরিয়ে যাবে কেন? ফুরিয়ে গেলেই হলো। এসব অভিমানের কথা।

মল্লিকের চক, ১১ই অগ্রহায়ণ : পথে আসতে একটা পোস্ট অফিসের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম অবনীবাবু। এখানেও একটা ভিড় দেখলাম। প্রায় সবাই বুড়ী ও বিধবা। শুনলাম এরা রোজই আসে। কেউ কেউ খোঁড়াতে খোঁড়াতে চার ক্রোশ দূরে থেকেও আসে। বুড়ীদের প্রাণের জোর অদ্ভুত। একদিন মাসকলাইয়ের খিচুড়ি খেয়ে পাঁচ দিন চলাফেরা করে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। একটা কথা আছে না, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ? আমি কথাটা উল্টিয়ে নিয়েছি, যতক্ষণ আশ ততক্ষণ শ্বাস। বুড়ীরা প্রবাসী ছেলের চিঠির আশায় আসে এখানে। রোজই আসে। ছেলেরা যুদ্ধে গেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি গো বুড়ীমা, ছেলে বুঝি টাকা পাঠালো? বুড়ী বললে—না বাবা, ছেলের টাকার জন্য আসিনি। ছেলের খবরের আশায় এসেছি। ভাল আছে, এইটুকু জানতে পারলেই বাঁচি।

হ্যাঁ, এই আশায় বুড়ীরা বেঁচে আছে। এই আশার বাতাসটুকুই বুড়ীদের ছেঁড়া বুকের কোটরে প্রাণ হয়ে ধুকপুক করছে। নইলে ও ছাই মাসকলাইয়ের খিচুড়ি কি এই মৃত্যুপথযাত্রিণীদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে?

একটি কৈবর্তের ছেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখিয়ে অনেক দূর এসেছে। এর নাম রামচন্দ্র। ভারী মিষ্টি গলা ছেলেটির। ওকে একটা গান শিখিয়েছি, জীবনে এই প্রথম গান শেখালাম অবনীবাবু। রামচন্দ্র আমার প্রথম ছাত্র। রামচন্দ্রের গলায় গানটার যেন অন্য রকম অর্থ হয়ে যায়। শুনতে আমার কেমন ভয় করে। বাংলাদেশের মাটির হৃদয়গহ্বর থেকে একটা প্রতিধ্বনি উঠছে, তার সঙ্গে একটা ক্ষীণ অভিশাপের গুঞ্জন। একটা অকাল বিদায়ের বেদনা সমস্ত অভিমান নিয়ে রামচন্দ্রের গানে শব্দময় হয়ে ওঠে। রামচন্দ্র শুধু গুগলি খেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু আর ক'দিন? ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি, মৃত্যুর ঘুণ ধরে গেছে। দীঘির বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে রামচন্দ্র আমাকে বিদায় দিয়ে বলেছে—আবার ফিরে এস বাবু। তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব।

বড় দমে যাচ্ছি অবনীবাবু। আমার ফেরবার পথ যেন একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যদিও ফিরতাম, কিন্তু রামচন্দ্রও যেন একটা বাধা দিয়ে গেল। যদি কোনদিন এই পথে ফিরতে যাই, তবু আমার প্রথম ছাত্রের সঙ্গে আর জীবনে দেখা হবে না। শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে রামচন্দ্র—পনের দিন, এক মাস, দু'মাস—তার বেশি নয়।

খুবই জানতে ইচ্ছে করছে—আপনারা কেমন আছেন? অবশ্য আপনি কেমন আছেন, তা আমি এখান থেকেই কল্পনা করতে নিতে পারি। আপনি তো আহিতাগ্নিকের মত, চারদিকের হোমধূমের মাঝখানে আপনি রয়েছেন। সবার মধ্যে আছেন বলেই আপনি আছেন। তাই আপনি বোধ হয় কোন দিন ফুরোবেন না, আপনি হলেন ভবিষ্যৎ।

কাজের মধ্যে আছি। তাই শ্রান্তিও আসে। কাজকে একরকম সেরে আনতে পারছি, কিন্তু শ্রান্তির মুহূর্তগুলি কেমন অকেজো হয়ে যাচ্ছে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই—সেসময় মনটা ঘরমুখো হয়ে ওঠে। বালিগঞ্জ প্লেসের বাসার জন্য নয়, আপনার কাঁকুলিয়ার বাসার বাইরের ঘরটা। ইচ্ছে করে, এ সময় অরুণা দেবী এসে অর্ডার করেন—গান গাইতে হবে। ইচ্ছে করে, জোছু এসে বলুক—একটা বাংলা গান। কিন্তু বহু দূরে সরে এসেছি অবনীবাবু। কাজের মধ্যে

ভাল থাকি, কাজ না থাকলেই ফাঁকা লাগে।"

আমড়াতলি, ১১ই অগ্রহায়ণ : মল্লিকের চক ছেড়ে চলে এসেছি। এখান থেকে মস্ত একটা গর্ব কুড়িয়ে নিয়ে চললাম অবনীবাবু। না বললে কিন্তু আপনি অনুমান করতে পারবেন না, কি সেই গর্ব।

এখানে একটি ডাচ মিশনারীদের সেবাকেন্দ্র আছে। এরা ছিল বলেই আমড়াতলির মানুষগুলি মানুষের মতই এখনো বেঁচে আচে। ডাচ পাদরীদের আশ্রমে নানাজাতির লোক দেখলাম--ক'জন যাভানীজ আছেন, একটি আফ্রিকান আছেন, আর দু'জন পালেস্তিনী আরব। এঁরা সবাই খৃস্টান। এরা প্রায় দু'বছর থেকে সারা গ্রামের জীবনকে শিখিয়ে পড়িয়ে সুস্থ করে রেখেছেন। এ গ্রামে কেউ অনশনে মারা যায়নি। কোন কুলবধূকে কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ হতে হয়নি। কেন জানেন?

তাঁদের কাছেই প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছি। তাঁরা খুবই বিনীতভাবে জানালেন--'আমাদের সামর্থ্য কম, কতটুকু আর করতে পারি। সমস্যা বড়ই জটিল। তবু, থ্যাঙ্ক গড, আমড়াতলিকে আমরা বাঁচাতে পেরেছি।'

--কেমন করে পারলেন?

--ভারতের কংগ্রেসের 'আত্মরক্ষা স্কীমের' একটা কপি ভাগ্যক্রমে আমরা পেয়েছিলাম। আমরা শুধু ঐ লাইনেই কাজ করে গেছি। সফল হয়েছি। এ এক অদ্ভুত স্কীম, এর তুলনা হয় না।

হ্যাঁ অবনীবাবু, তাকিয়ে দেখলাম আমড়াতলি সবুজ হয়ে আছে। আজ এতদিন পরে প্রথম চোখে পড়লো--ফুল ফুটে আছে, টকটকে গাঁদা ফুল চাষীদের ঘরের পাশে। এ ফুল ফুটতে পারতো সব গাঁয়ে। কিন্তু ফুটলো না কেন অবনীবাবু? আমড়াতলি বেঁচেছে, হলুদবাড়ি কি বাঁচতে পারতো না?

কিন্তু শুধু এই জন্যেই গর্ব নয়। ঐ যাভানীজ, আফ্রিকান আর আরব ভদ্রলোকেরা কি বললেন শুনবেন? তাঁরা বললেন--দেশের স্কুলে যখন ছাত্র ছিলেন তাঁরা, তখনই ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের নাম শুনেছিলেন। তাঁরাও নাকি ছাব্বিশে জানুয়ারী তারিখে আমাদের মত স্বাধীনতা দিবসের ব্রত পালন করতেন। মিছিল বার করতেন, প্রার্থনা করতেন, উপোস করতেন। ভেবে দেখুন অবনীবাবু, সুদুর কৃষ্ণ-আফ্রিকা যাভা আর পালেস্তিনের কোন নগণ্য জনপদের বুকে কংগ্রেসের মন্ত্রে ভরসার সাড়া জাগছে। কংগ্রেস তাদের ভবিষ্যতের দীপ। আমড়াতলিতে এসে আমি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি। মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, আনন্দ রাখতে পারছি না। কংগ্রেসের মর্যাদার সংকটে এক আন্তর্জাতিক প্রীতির ব্রিগেড এসে যেন অলক্ষ্যে এখানে কাজ করে চলেছে।

জিজ্ঞাসা করেছি--ভারতের কংগ্রেসকে আপনারা সত্যিই ভালবাসেন?

তাঁরা উত্তর দিয়েছেন--হ্যাঁ মশাই, পৃথিবীর কোটি কোটি দরিদ্র অবনত মুকমৌন মানুষের মুক্তির নেতা ভারতের কংগ্রেস। আমাদের কাছে একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের মুক্তি হলে সারা পৃথিবীর কলোনিবাসী ক্রীতদাস মানুষের মুক্তি হবে।

আমড়াতলি থেকে এই নূতন গর্ব হৃদয়ে ভরে নিয়ে চললাম। আজ ডাচ পাদরীদের সেবাকেন্দ্রে চা খেয়েছি। দুটো নতুন গান তৈরী করেছি। বিশ্বাস হচ্ছে. আবার আপনাদের দেখতে পাব। ফুরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। জোছু আর অরুণা দেবীকে বলবেন আমার কথা। বলবেন, তাদের গান শোনাতে পারছি না, এটা আমারই দুঃখ।"

অবনী চিঠিটাকে আগাগোড়া আবৃত্তির সুরে পড়ে যায়। একটা রক্তাভ উত্তেজনায় অবনীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জোছু ও অরুণা অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে চিঠিটার প্রতি বর্ণ

শব্দ ও ধ্বনি অনুসরণ করতে থাকে।

চিঠি পড়া শেষ হয়। পিসিমা শুধু একবার পাশের ঘর থেকে প্রশ্ন করেন।—কি রে অবু, ছেলেটি ভাল আছে তো?

অবনী উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

জোছু ও অরুণা ততক্ষণে চোখ নামিয়ে নেয়।

সুদামগঞ্জ, ১৭ই অগ্রহায়ণ—একটি শ্মশানের মধ্যে এসে পৌঁছে গেছি অবনীবাবু। কেউ বেঁচে নেই। কিছু পালিয়েছে—বাকী সবাই মরেছে। জিরিয়ে নেবার জন্য একটা বটগাছের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু দাঁড়িয়ে থাকিনি, খুব প্রাণভরে হেসে নিয়েছি। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের একটা দৃশ্য দেখছিলাম—বেশ লাগছিল। দুটো লাস পড়ে ছিল পাশাপাশি। এক বৃদ্ধ মুসলমান, হাতের কাছে এখনো এঁটো একটা সানকি পড়ে রয়েছে। দ্বিতীয় লাশটি কোন আধবয়সী হিন্দুর ; পেটটা ঢোলের মত ফুলে উঠেছে। দেখে মনে হয়, এরা এ গাঁয়ের কেউ নয়। অন্য কোন দূর গাঁয়ের লোক—ভিক্ষে করতে করতে এতদূরে এসে পড়েছে। বটের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিতে শুয়েছে, আর শেষ হয়ে গেছে।

সম্প্রদায়-দরদীরা কোথায়? সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরির পার্সেন্টেজ নিয়ে যাঁরা ভেবে ভেবে রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন, কোথায় তাঁরা? দাঙ্গায় কটা হিন্দু আর কটা মুসলমান মরে, সরকারী হিসাবে সেই সংখ্যাবিজ্ঞানের কত না নিষ্ঠা দেখেছিলাম। অনশনে কত মুসলমান মাঠে-ঘাটে কবর নিল, সে-হিসাব কই? লজ্জা কেন? লজ্জা সত্যিই কি আছে?

সুদামগঞ্জ দেখতে বড় সুন্দর। মাটি একটু লালচে, কিন্তু খুব নরম, খুব ঠাণ্ডা। আলের ওপর শিশিরভেজা ঘাস চকচক করে। ক্ষেতের ওপর কোন মানুষের সাড়া নেই—মাঝে মাঝে এক-একটা গরুর কঙ্কাল উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তবু বটের ঘনপাতার ছায়ায় পাখির দল কলরব করে। এক-একটা ঝাঁক উড়ে যায় দক্ষিণের তালকুঞ্জের দিকে। ওদিক থেকে ফিঙের ঝাঁক উড়ে আসে।

আমারও ঘুম আসছে অবনীবাবু। আমার সব গান যেন হাঁপিয়ে পড়ছে। নাম সুদামগঞ্জ, কিন্তু গঞ্জ কই? খালের ধারে একটা পুরনো বাজারের ধ্বংস দেখা যায়। চালা নেই, শুধু ভিটেগুলি পড়ে আছে। সাঁকোটা নেই, সাঁকোর খুঁটো কয়েকটা আছে। দুর্ভিক্ষের ঘুণে সব যেন কুরে কুরে খেয়ে দিয়ে গেছে।

বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছে আমার। তা হোক, শুধু একটু আশ্রয় পেলে হতো। হ্যাঁ, একটা কথা, আপনি দয়া করে একবার খোঁজ করবেন কি অবনীবাবু, আমার চাকর বিপিন কি-অবস্থায় আছে? লোকটা বড় দুঃখী। বউ আর ছেলের জন্য সব সময় কাঁদছে, শেষে ক্ষেপে গিয়ে কোথাও চলে না যায়। আপনি ওকে একটু বোঝাবেন। আমি ওকে ভরসা দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, ভুল করেছি। ওর সব ভরসা বোধ হয় কেনিং থেকে আসতে আসতে পথেই শেষ হয়ে গেছে।

কোন সম্পদ নেই আমার, থাকলে আজ আপনার ওপর সঁপে দিয়ে যেতাম। কিন্তু এই একটি দায় আছে, ঋণের দায়, তাই আপনার ওপর সঁপে দিয়ে গেলাম। বিপিন সুখী হলে, আমি সুখী হব—জানি না কেন এরকম ভাবছি। বিপিন তার গৃহ ফিরে পাবে, বউ ফিরে পাবে, ছেলে ফিরে পাবে—একটা ভগ্ন নীড় আবার জোড়া লেগে সজীব হয়ে উঠবে। ভাবতে আমার বড় ভাল লাগছে।

আমি শুধু চলতেই থাকবো অবনীবাবু। আমার বাধা নেই, বাঁধন নেই, নীড় নেই। নীড় বাঁধবার যোগ্যতা নেই। আমার শ্রান্তি চিরদিনই ফাঁকি হয়ে থাকবে। আমি শুধু সরে যেতে শিখেছি। কাছে পৌঁছতে শিখিনি। কাজের মধ্যে আমি নিজেকে ভুলে আছি, কিন্তু এই কাজ আমার আপন হয়েছে কি? আমার সন্দেহ হচ্ছে অবনীবাবু।

আপনি সুখী, আপনাকে হিংসে করতে আমার ভাল লাগে। বড় দেরি হয়ে গেছে, নইলে একেবারে নতুন করে আরম্ভ করতে পারতাম। জীবনে কিছু চাইতে শিখিনি, পেতে শিখিনি। না-চাইতে যা আসে, তাও গ্রহণ করতে পারিনি। বোধ হয় গ্রহণ করার মত নয় বলেই।

কিন্তু আপনি জীবনে এত পেলেন কি করে? যা সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য, সেই ভালবাসার কোহিনুরটিও কি আপনার কাছে এমনিতে চলে এসেছে?

মনে হচ্ছে, আর আপনার সঙ্গে কোনদিনও দেখা হবে না। তাই বেহায়ার মত যা-খুশি তাই লিখে ফেলছি। বড় বেশী সাহস বেড়ে গেছে আমার। জানি, শাস্তি দিতে পারবেন না আপনি। আপনার কোন উত্তর আমার কানে পৌঁছবে না। আজ রাত্রে না পারি কাল ভোরে রওনা হয়ে যাব। খালের ওপারে গ্রামটার নামও জানি না। ঘাট আছে, কিন্তু কোন খেয়া নেই। কি করে পার হব জানি না।

আমি কি শেষে আপনার বিশ্বাসকে ফাঁকি দিলাম অবনীবাবু? আমার দুর্বলতায় আপনি লজ্জা পাবেন নিশ্চয়। কিন্তু আপনার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, তার মর্যাদা রাখবো। নিভে যাবার আগে আপনার বাণী একবার শেষবারের মত জ্বালিয়ে দেব—জ্বলেও যাব। ভাল লাগুক, খারাপ লাগুক—ইচ্ছে থাক আর না থাক, আপনার ভরসা ব্যর্থ হতে দেব না।

এখানে আর বেশীক্ষণ টিঁকতে পারছি না। এ-গ্রামটার নিস্তব্ধতা ভয়ানক রকমের। একেবারে অবশ করে আনছে। তার চেয়ে ভাল, চলে যাই খালের কিনারা ধরে তিনকোপ জিয়নপুর আর শ্যামনগরের দিকে। একটা দুটো নয়, শুনেছি উনিশটা চালের আড়ত আছে সেখানে। যে-করেই হোক, ঐ চাল বের করতেই হবে। আড়তদারেরা লেঠেল বসিয়েছে—তা'ছাড়া থানা আছে কাছেই। কাজেই আর কিছু ভাবতে পারছি না। বোধ হয় শেষ চিঠি লিখলাম আপনাকে। আর কিছু লিখবার নেই।

শুধু অরুণা দেবীর কথা মনে পড়ছে। আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন তাঁকে। বলবেন তাঁকে, তিনিই আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময়। বলবেন তাঁকে, সুদামগঞ্জের বটতলায় আমি বসে আছি। জ্বর বাড়ছে। বটের বাতাসে শান্তি পাচ্ছি না। যখন সব ভুলে যাই, চোখ মুদে আসে, তখন শুধু মনে হয়, আমি একা নই। মনে হয়, আমার পাশে একটি অকৃপণ প্রীতির হৃদয় বসে আছে। অরুণা দেবীর আঁচলের বাতাসে আমার সব সন্তাপ জুড়িয়ে যাচ্ছে। অরুণা দেবীকে বলবেন, তাঁকে আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু তিনি বোধ হয় আমায় চিনতে পারলেন না। তবু মাপ করেন যেন।"

চিঠি পড়া শেষ হলে অবনী কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। পিসিমা পাশের ঘর থেকে বার বার বলতে থাকেন—ওরে শিশিরকে ফিরে আসতে লিখে দে। বেঘোরে শেষ হয়ে যাবে ছেলেটা।

পিসিমার কথাগুলি অবনীর কানে যায় না বোধ হয়। একটু অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে। লক্ষ্যহীন চোখের দৃষ্টিটা ক্রমেই নিবিড় হয়ে আসতে থাকে, যেন নিজের মনের উদ্বেল চিন্তার আবর্তগুলির খেলা দেখছে অবনী। মুখটা হঠাৎ রঙীন হয়ে ওঠে, বড় সুন্দর দেখায় অবনীকে।

সবচেয়ে সহজ ও সজীব দেখায় জোছুকে। চিঠিটা নেবার জন্য হাত পাতে অবনীর সামনে।—দাও, ওটা রেখে দিই।

মুক্ত ও নিশ্চিন্ত মানুষের মত জোছু চিঠিটা নিয়ে চলে যায়। এই অভিনয়ে তার আর কোন ভূমিকা নেই। শিশিরের চিঠির লেখার মধ্যে জ্যোৎস্নার নামটা ছোট হয়ে আসছিল অনেকদিন থেকেই। আজ সে খারিজ হয়ে গেছে একেবারে স্পষ্টভাবে। পেছনে টানবার মত আর কোন সংশয় নেই।

অরুণা বসেছিল স্তব্ধ হয়ে। মাথাটা একেবারে ঝুঁকে পড়েছিল, তাই মুখ দেখা যায় না।

অবনীরও সেদিকে খুব বেশী কৌতূহল ছিল না। অরুণা যদি মুখ ঢাকতে চায়, ঢাকুক। অবনী জোর করে অরুণার মুখ দেখতে চাইবে না। কি আর এমন অপূর্ব বস্তু দেখা যাবে? হয়তো চোখ দুটো ছলছল করছে, লজ্জায় শিউরে উঠছে, কিছু বলবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

পিসিমা আবার কি একটা কথা বললেন। অবনী উত্তর দিল—যাই পিসিমা।

যাবার আগে অরুণার সামনে এসে দাঁড়ালো অবনী। অরুণার মাথাটা যেন আরও ঝুঁকে পড়লো। অরুণা তখনো বুঝতে পারেনি যে অবনী হাসছে।

—এই বোকা মেয়ে!

অবনী মুহূর্তের মধ্যে অরুণার হাত দুটো ধরে এক টানে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। অরুণা আবার মাথা ঝোঁকাতে গিয়েও পারলো না—অবনীর কাঁধের ওপরেই মাথাটা আরামে লুটিয়ে রইল।

খুবই ছোট ছোট ঘটনা। কালো কলকাতার অস্বাভাবিক আলোড়নের মধ্যে বুদ্বুদের মত ফুটে উঠছে।

প্রথমেই ভাবতে হয় এবং ভয় পেতে হয়—বোস এণ্ড মজুমদার নামে একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান হঠাৎ কায়েম হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। প্রবীণ গুরুদয়াল বসু এবং নবীন জয়ন্ত মজুমদারের প্রতিভা এক সাধনায় যুক্ত হয়েছে।

ভাবছিল এবং ভয় পাচ্ছিল সিতা। জয়ন্তের ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে। সবচেয়ে খুশী গুরুদয়ালবাবু। তিনি বোধ হয় এই ধরনেরই একটি মানুষের মত মানুষ খুঁজছিলেন—নীরব কর্মী, কঠোর, নির্ভীক, উন্নতিবাদী ও সুচতুর একটি মানুষ। তাঁর সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ পাহারা দেবার মত বিশ্বাসযোগ্য লোক জয়ন্ত মজুমদার ছাড়া আর কে আছে? জয়ন্ত কাজের লোক, পয়সা চেনে, পথ করে নিতে জানে। এই জয়ন্তের ওপর নির্ভর করা যায়। আজ যদি গুরুদয়ালবাবু হঠাৎ চোখ বোজেন, ডোভার লেনের বাড়ির একটি চৌকাঠের পালিশও মলিন হতে দেবে না জয়ন্ত। গুরুদয়ালবাবুর বিদেহী আত্মা সুরক্ষিত সম্পদের পরমাণুগুলির মধ্যে তাহ'লে অনন্তকালের মত আরামে ঝিমোতে পারবে। সেই সঙ্গে যদি তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ, সোনার হরিণের মত তাঁর মেয়ে সিতাও যদি একই প্রহরীর পাহারায় থাকে, তবে সত্যিই তিনি নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারেন। তাঁর সব কিছু অটুট রইল। এই সুস্বপ্নের মধ্যেই গুরুদয়ালবাবু এক রকম আবিষ্ট হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু সিতার এত ভয় কেন? বিছানায় শুতে গিয়ে, বিছানা ছেড়ে ওঠবার আগে, সব সময় এই একটা কণ্টকাক্ত ভাবনা মনের মধ্যে যন্ত্রণা ছড়াতে থাকে। বালিশে মুখ গুঁজে অসহায়ের মত পড়ে থাকতে ভাল লাগে সিতার।

শিশির নামে সেই ভাবুক শিল্পী ছেলেটিকে সত্যিই কি সে ভালবাসে? স্পষ্টভাষী কোন সমালোচকের প্রশ্নের মত হঠাৎ কেউ যেন সিতার ভাবনাগুলিকে জিজ্ঞাসা করে বসে। তবে কেন এত দ্বিধা, এত বিচার, এত হতাশ্বাস? এ যে অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকার মনোভাব। পাঁজি দেখে, পুরুত ডেকে, শাঁখ বাজিয়ে কোন এক আকস্মিক লগ্নে গ্রাম্য পিতা যার হাতে মেয়েকে সঁপে দিলেন, সেই তার পতি পরম গুরু। গেঁয়ো মেয়ে প্রতিবাদ করে না। কিন্তু তুমি সিতা বসু? তুমি গ্র্যাজুয়েট, আধুনিকা, জাগৃতি সঙ্ঘচারিকা, তোমার এত আত্মসংযম কেন? মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে এত বাধা কিসের?

সিতা কেঁদে ফেলে। গুরুদয়ালবাবুর স্নেহসিক্ত প্রতিটি চোখের দৃষ্টি, মুখের কথা, হাসি তৃপ্তি ও আবদারের ছবিটা চোখের সামনে মায়াযবনিকার মত নেমে আসে। একে অস্বীকার করার মত সামর্থ্য কই সিতার?

সিতার কান্না মনের ভেতরই বাজতে থাকে—কিন্তু তুমি আমার দুঃখ বুঝলে না বাবা। তুমি শুধু এত ভালবেসেই আমাকে ব্যর্থ করে দিলে। তোমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পারছি। মুখ ফুটে কিছু বলছো না, কিন্তু কী প্রচণ্ড তোমার অনুরোধ! তুমি একবার খোঁজ করলে না, জয়ন্তকে আমি ভালবাসি কি না। তুমি ভেবে দেখলে না, আমার ভালবাসার জন পৃথিবীতে আর কেউ আছে কিনা! তুমি চাইছ, আমি ডোভার লেনের বাড়ির পোষা সোনার হরিণ হয়ে চিরকাল তোমার কাছে থাকি। তুমি শুধু একাই আমাকে ভালবাসতে চাও। যদি আজ জানতে পার যে শিশির আমায় ভালবাসে আর আমি শিশিরকে ভালবাসি, তুমি বোধ হয় সহ্য করতে পারবে না। না, তুমি নিশ্চয় জান, তোমার জয়ন্ত আমায় ভালবাসে না, আমিও জয়ন্তকে ঘৃণা করি। তাই বোধ হয় বেছে বেছে জয়ন্তকেই তোমার পছন্দ হয়েছে। বেশ তুমিই সুখী হও।

হাত মুখ ধুয়ে পাখার নিচে বই নিয়ে সুস্থির হয়ে বসে সিতা। মনের সব প্রশ্ন-ভাবনা ও যন্ত্রণাগুলি যেন এতক্ষণ কাঁচা কাঠের আগুনের মত শুধু ধোঁয়া আর ধাঁধা সৃষ্টি করছিল। এখন শুধু একটা গর্বের শিখা জ্বলজ্বল করছে, তারই ছায়া যেন পড়েছে সিতার মুখের ওপর। বোধ হয় ত্যাগের গর্ব। বিজয়িনীর মত একটা আত্মপ্রসন্নতা। এটা তার পরাজয় নয়। বিদ্রোহ সে করতে পারে, তবু স্বেচ্ছায় নিজেকেই আজ সে ভেঙে দিয়েছে। সুখী হোক গুরুদয়ালবাবু। আজও তাঁর ক্লাইভ স্ট্রীটের অফিসে টেবিলের পাশে ছোট্ট একটা চেয়ার রয়েছে। বাইশ বছর আগে তৈরী হয়েছিল চেয়ার। সেই এতটুকু অপোগণ্ড শিশু সিতা এই চেয়ারে বসে থাকতো আর গুরুদয়ালবাবু কাজ করে যেতেন। নইলে, কাজের প্রেরণাই তিনি পেতেন না। যেন গুরুদয়ালবাবু চোখের ওপর আর বুকের কাছে আজ বাইশ বছরের প্রতি মুহূর্ত ধরে সিতা বড় হয়ে উঠেছে। এ কাহিনী সিতার অজানা নেই। সেই সুমহিম বাৎসল্যের ইতিহাসকে যেন অভিনন্দন জানালো সিতা। নিজের দিকটা দেখলো না।

বইটা শুধু এতক্ষণ কোলের ওপর খোলা পড়ে ছিল। একটি পাতাও পড়া হয়নি। পড়েও কোন লাভ হতো না। অনেকদিনের পড়া বই, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা—শিশিরের দেওয়া উপহার। শুধু শিশিরের নামটা বার বার বড় হয়ে চোখে পড়ছে।

আবার ধীরে ধীরে মনের আকাশ মেদুর হয়ে আসে। জোর করে নিজেকে সহজ করে রাখতে চায় সিতা, কিন্তু সকল প্রয়াস বিফল হয়। সমস্ত চিন্তার ওপর একটা কাঁকরের ঝড় ছিটকে এসে পড়ে। তার সব অভিযোগগুলি কল্পনায় শিশিরকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে থাকে। —তবু তোমায় ভুলতে পারি না কেন? শুধু তোমার কাছেই অহংকার করতে পারিনি, তাই কি তুমি অপমান করলে? তুমি আমায় কাঁদালে। তোমাকে যদি এমনি করে কাঁদাতে পারতাম, তাহ'লে আমার এই অকারণ অপমানের শোধ নেওয়া যেত। কিন্তু তুমি অদ্ভুত মানুষ। জানি না কোন নিশির ডাক শুনতে পেয়েছ। অবনীবাবুর বোন বা যেই হোক সে, সুরশিল্পীর কানে এতই মধুর লাগলো সে-ডাক? কিন্তু তোমার তো চোখ ছিল। দেখতে পাওনি সিতাকে? দেখতে পাওনি, শুধু সিতার হাতটা ধরতে তুমি একটু দেরি করলে সে কত অস্থির হতো, রাগ করতো, অভদ্র হয়ে উঠতো। সে সব যে তোমারই জন্য। বুঝতে পারতে না? তুমি কি এতই গোবেচারা?

কিন্তু বেশ তো শিভালরি জান দেখছি। আকাশকুসুম হোক বা সিতা বসু হোক—সুলভ হলে তোমার কাছে তার বোধ হয় কোন মূল্য নেই। অবনীবাবুর বোন জ্যোৎস্না কি এতই সুদুর্লভা যে তার মান রাখতে এক নিমেষে জীবনটাকে উল্টেপাল্টে দিলে। হঠাৎ ছুটে পালিয়ে গেলে—কোথায় গেলে জানি না।

কিন্তু তোমার হৃদয় নেই, এ কি বিশ্বাস করতে পারি? আজ তবু আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। জ্যোৎস্নার কথা ছেড়ে দিই। তার আগে? তুমি আমার জন্যে কেন এতটুকুও

ত্যাগ স্বীকার করতে চাইলে না? লোকে বাঞ্ছিতের জন্য কত ঘুষ দেয়। তোমার আর কতটুকু করতে হতো? একটি দিনের জন্য যদি আমাদের বাড়িতে আসতে, বাবাকে একটা প্রণাম করতে—তাই যথেষ্ট হতো। বাবা নিশ্চয় বিশ্বাস করতেন যে, তুমি টাকাকে শ্রদ্ধা কর। তাহ'লে সব কিছু তোমারই লাভ হতো শিশির। ডোভার লেনের বাড়িতে জয়ন্তর ছায়া পড়তো না কোনদিন।

এখন কোথায় আছ জানি না। কিন্তু এমন করে পালিয়ে গেলে কেন? যাবার আগে একটা খবরও দিলে না। যে-সিতাকে এত গান শুনিয়েছ, তার একটা অভিমানেরও মর্যাদা রাখলে না? ক্ষণিকের জন্যও কি নিজেকে অপরাধী ভেবেছিলে? তা যদি সত্য হতো, আর জানবার উপায় থাকতো, তবু আমি খুশী হতাম শিশির। বুঝতাম, তোমার হৃদয় আছে।

সব শূন্য করে দিয়ে যেতে, তাও ভাল ছিল। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে সরে পড়লে কেন? তোমার কাছে পরাজয়ের কথা বলছি না। কোথায় নাকি এক চাঁদের রাজ্য খুঁজে বের করেছ, জ্যোৎস্না নামে কোন একটা মেয়ের কাছে আমাকে হারিয়ে দিলে। এই পরাজয়ের অভিশাপ বোধ হয় আমাকে চিরকাল অসুখী করে রাখবে। তুমি নিজে যত খুশী আমায় তুচ্ছ কর, ঘৃণা কর—সব সইতে পারবো। কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আমার ভালবাসার দুর্বলতাকে অন্ধকার বলে বিদ্রূপ করলে কেন? তোমার কাছে আমার কোন পরাজয় নেই। স্বামী কাকে বলে জানি না, সতীত্ব কাকে বলে বুঝি না। শুধু জানি, আমার জীবনে একটি পুরুষ আছে, যার দু'টি বাহু দিয়ে ঘেরা ছোট্ট স্বর্গটির মধ্যে আমার সব লজ্জা নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে চায়। আর কোথাও নয়। তোমার চুমোয় ভেজা মুখ নিয়ে কতবার ঘরে ফিরেছি। তোয়ালে হাতে টবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তবু মুখ মুছতে হাত ওঠেনি। বাতিকের মত তোমার আদরের চিহ্ন কতভাবে বাঁচিয়ে চলেছি। এ গল্প তোমার কাছে চিরদিন না-শোনা রয়ে গেল। নইলে সিতাকে বোধ হয় চিনতে পারতে।

খুব ইচ্ছে করছে তোমায় একটিবারের মত কাছে পাই। একটা বোঝাপড়া করি তোমার সঙ্গে। এটাও বোধ হয় বাকি জীবনে দুরাশা হয়ে রইল। শুধু জোনাকি ও আলেয়ার একটা মিতালী দুদিনের জন্য সত্য হয়ে উঠেছিল। আলেয়া সরে গেছে, এবার জোনাকিও নিভে যাবে। তবু আজকের মত প্রার্থনা করে নিই—যেখানেই থাক, যেন ভাল থাক।

খোলা বইটা আবার বন্ধ করে তুলে রাখলো সিতা।

কন্ট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন অবনী। বোরখা-ঢাকা একটি নারীমূর্তি কাছে এসে দাঁড়িয়ে খানিকটা ইশারায় খানিকটা অস্পষ্ট ভাষায় কি যেন বলছিলো, প্রথমে বুঝতে পারেনি অবনী।

বোরখাবৃতা এইবার একটু গলার স্বর চড়িয়ে ডাকলো—আপনাকেই বলছিলাম বাবু।

অবনী।—আমাকে?

বোরখাবৃতা।—হ্যাঁ। আমি মৈনুদ্দীনের বিবি।

অবনী।—মৈনুদ্দীন কে?

বোরখাবৃতা একটু ইতস্তত করে বললো—যাকে আপনারা বাঁকারাম বলে ডাকেন।

বাঁকারামকে মনে পড়ে গেল অবনীর। অনেকদিন তার দেখা নেই, আজকাল চাল নিতে আর আসে না। তবু বাঁকারামকে এত তাড়াতাড়ি অনেকেই ভুলে যেতে পারেনি। আজও লাইনের জনতা খোঁজখবর করছিলো—কই, আমাদের বাঁকারাম আর আসে না কেন? বাঁকারামও কি লড়াইয়ে চলে গেল।

বেশ ছিল বাঁকারাম। যেমন কাশতো, ঝগড়া করতো, তেমনি গল্পে রসিকতায় লাইনের

উত্ত্যক্ত মনের ওপর মাঝে মাঝে প্রসন্নতার হাওয়া ছড়িয়ে দিত। সেই বাঁকারামের বিবি কি জানি বলতে এসেছে আজ।

অবনী।—হ্যাঁ চিনেছি। মৈনুদ্দীন কোথায়?

মৈনুদ্দীনের বিবি বোরখার ভেতর ফুঁপিয়ে উঠলো।—তার কলেরা হয়েছে।

বাঁকারামের পরিচিত লাইনের অনেকেই খবরটা শুনেই বিষণ্ণ মুখে আপসোস করে উঠলো—আহা!

এক বুড়ো হাত নেড়ে বললো—কলেরা যখন, তখন আর উপায় নেই গো, আর কোন উপায় নেই। এখন ভগবান যদি রাখেন...।

ফাজিল গোছের চেহারা একটি ছোকরা উত্তর দিল—আরে মোসাই, এর নাম লাটের কলেরা। ভগবান নিজেই টেঁসে যাবে যদি একবার ছুঁয়েছে। আমাদের বৈরাগীপাড়া তিন ঘণ্টায় সাফ হয়ে গেল মোসাই।

অবনী।—তুমি কি বলতে চাইছ, বল।

মৈনুদ্দীনের বিবি।—দাওয়াই চাই বাবু।

অবনী বললো—আচ্ছা চল।

মার্কেটের বাইরে এসে অবনী একবার থামলো। মৈনুদ্দীনের বিবি আবার ফোঁপাতে আরম্ভ করলো।—হরদম আপনার কথা বলছে বাবু। বলছে, যা লাইনে একটি কংগ্রেসী বাবু দাঁড়িয়ে আছে, তাকে গিয়ে খবর দে। তাই দৌড়ে এলাম। এখন আপনাদের দোয়া থাকলে ও বাঁচবে বাবু। একটি পয়সা নেই আমার। নারকেলডাঙ্গা মিঞাদের বাড়ি বাঁদিগিরি করি, দুটো খেতে পাই। কাল রাত্রে খবর পেয়ে দেখতে এসেছি। দরগার ধুলো এনে বুকে মাথায় ছুঁইয়ে দিয়েছি। আমি আর এর বেশি কি করতে পারি বাবু?

অবনী।—মৈনুদ্দীন থাকে কোথায়?

মৈনুদ্দীনের বিবি।—দাসপাড়ায়।

অবনী।—তোমরা দুজনে এখন ভিন্ন থাক?

মৈনুদ্দীনের বিবি একটু সংকোচ করে বললো—জী, আপনাকে বলতে দোষ নেই, আমি মৈনুদ্দীনের তাল্লাকী বিবি। হ্যাঁ, ও আমাকে মেরেছে, খেতে দেয়নি, তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু রহম তো শেষ হয়ে যায় না বাবু। তাই খবর পেয়ে থাকতে পারলাম না।

অবনী হাসছিল। মৈনুদ্দীনের বিবি যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়লো।—তা ওকে দোষ দিই না বাবু। রোগী মানুষ, নিজেই ভিক্ষেসিক্ষে করে খাচ্ছিল। আমাকে পুষবে কোথা থেকে।

অবনী।—মৈনুদ্দীন আগে কি করতো?

মৈনুদ্দীনের বিবি।—দপ্তরীর কাজ করতো, অসুখ হবার পর থেকে হাত কাঁপে কাজ করতে পারে না। তিন ভাই ছিল, তারাও লড়াইয়ে ভেগেছে। ওর দোষ নেই বাবু। আমার নসীবে বাঁদিগিরি ছিল।

দাসপাড়ায় মৈনুদ্দীনের ঘরের ঠিকানা আর রাস্তার পরিচয় ভাল করে জেনে নিয়ে অবনী বললো—তুমি এখন ঘরে গিয়ে মৈনুদ্দীনের কাছে বসো। আমি ওষুধ আর ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি। চিন্তা করো না, আমি নিশ্চয় যাব।

মৈনুদ্দীনের বিবির ছেঁড়া-নোংরা বোরখা-ঢাকা অবসন্ন মূর্তিটা আশ্বাসে সজীব হয়ে ব্যস্ত পায়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল। বেলা তখন দশটার কাছাকাছি। বাসায় পৌঁছতে সওয়া-দশটা। দশটা টাকা হাতে নিয়ে আবার পথে এসে দাঁড়াতেই সাড়ে দশটা। একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লো অবনী। আজ আবার অফিস কামাই হলো।

ইন্দু ডাক্তার বললেন—ফী চাই না অবনীবাবু। আপনি শুধু স্যালাইন যোগাড় করুন। তারপর খবর দেবেন, ইঞ্জেকশনটা সেরে দিয়ে আসবো।

এক এক করে যত ড্রাগিস্টের দোকান, ফার্মাসি আর মেডিক্যাল স্টোর টুঁড়ে হাঁপিয়ে পড়লো অবনী। একটা বেজে পার হয়ে গেল।

স্যালাইন আছে? প্রশ্ন শুনেই দোকানের লোকগুলি কেমন সন্দিগ্ধভাবে তাকায়, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।

কত দাম স্যালাইনের? তবু প্রশ্নটা যেন কারও কানে ঢোকে না। কখনো বা দোকানের ভেতরঘরের পর্দাটা হঠাৎ সরে গিয়ে এক জোড়া ধূর্ত চোখ ক্রেতার চেহারাটা একবার মুহূর্তের মধ্যে পরীক্ষা করে নিয়ে তখুনি আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

কি ব্যাপার মশাই, উত্তর দেন না কেন? কথাগুলি একটু জোর গলায় বলা মাত্র দোকানের মালিক বা কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করেন—না, নেই। চেঁচালেই স্যালাইন আসে না।

অবনী।—কি করলে আসবে?

—যদি অপেক্ষা করতে পারেন, আর টাকা ছাড়তে পারেন, তবে আনিয়ে দিতে পারি।

অবনী।—কোত্থেকে আনবেন?

—খোঁজ করতে হবে, কোন স্টকিস্টের কাছে আছে।

অবনী।—এই সামান্য খবরটা দিতে এতক্ষণ খাবি খাচ্ছিলেন কেন? জিজ্ঞাসা করা মাত্র বলে দিলেই তো চুকে যেত।

—খদ্দের বুঝে খবর দিই।

অবনী।—ইঁদুরের মত আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বুঝি খদ্দের চিনতে হয়?

—হাঙ্গামা করবেন না মশাই।

অবনী আর হাঙ্গামা না করে সত্যিই পথে নেমে পড়ে। একটা দুটো করে প্রায় তেরটা দোকান দেখা হয়ে গেছে। তবু রহস্যটা ঠিক পরিষ্কার হয় না।

এই দোকানটার বাইরের বারান্দায় এক কোণে কয়েক বাক্স গেঞ্জি আর মোজার পসরা সাজিয়ে একটি নিরুৎসাহ চেহারার ভদ্রলোকের ছেলে বসেছিল। ছেলেটি অবনীকে সমবেদনা জানালো।—সত্যি হাঙ্গামা করে কোন ফল হবে না দাদা। ধমক দিলে মাল বেরুবে না। কিছু ভাল মত হাতে গুঁজে দিন, এখুনি মাল চলে আসবে।

অবনী।—কত দিতে হবে?

—সে অনেক, কোন ঠিক ঠিকানা নেই। দশ হতে পারে, বিশ হতে পারে, পঞ্চাশ চাইলেও না দিয়ে যাবেন কোথায়? স্যালাইনের ওপর ফাটকা শুরু হয়ে গেছে। ধরুন না, এই তো সবে পরশু সন্ধ্যা থেকে—যেই না কলেরাটা একটু ছড়িয়েছে, অমনি বেমালুম এঁটে দিলে রে বাবা। এখন যেখানেই যান, আর স্যালাইন নেই। তবে হ্যাঁ, সবচেয়ে পিটে নিলে ক্লাইভ স্ট্রীটের বোস মজুমদার। কলকাতার অর্ধেক স্যালাইনের স্টক ওদের ঘরে গিয়ে উঠেছে। যাই বলুন, এদের ব্রেনকে থ্যাঙ্কস দিতে হয় দাদা। বোস মজুমদার যখন দুনো দরে সব দোকান থেকে মাল ছেঁকে নিয়ে সরে পড়েছে তখন সবারই ঘুম ভাঙলো। এখন আপনার সঙ্গে ছ্যাঁচোড়পনা করে আর কত সুবিধে করতে পারবে? লুটে নিলে বোস মজুমদার। ব্রেন থাকলে সব হয় দাদা। আর ব্রেন না থাকলে এই গেঞ্জি আর মোজা—সারা দুপুর ধুঁকছি। সাত সিকের বিক্রি আর দেড় সিকে লাভ।

জানবার অনেক বেশী জানা হয়ে গেল অবনীর। রহস্যটার মধ্যে আর জটিলতার লেশমাত্র নেই। স্যালাইন পাওয়া যাবে না—সোজাসুজি একটা বালাই মিটে গেল।

অবনী ফেরবার আগে গেঞ্জিওয়ালা ছেলেটি একবার অনুতপ্তের মত বললো—আমার কথায় দুঃখ পেলেন না তো দাদা? কলেরা কার হলো? আপনার নিজের লোক কারও নয়তো?

অবনী।—একথা তোমার মনে হলো কেন?

ছেলেটি হাসলো।—আমার কথায় দোষ নেবেন না দাদা। নিজের লোক হলে কি এতক্ষণ এখানে এদের সঙ্গে তর্ক করতেন? সর্বস্ব দিয়েও এদেরই দয়া সেধে সেধে জিনিসটি কিনতে হতো আপনাকে। সারাদিন বসে এই কাণ্ড দেখছি। আপনি আসার একটু আগে এক মহিলা এসেছিলেন। ঐ স্যাকরার কাছে চুড়ি বেচলেন, আমি এখানে বসে বসে দেখছি। তারপর এদেরই সাধাসাধি করে, কেঁদেকেটে, স্যালাইন আর ওষুধ নিয়ে গেছেন। পঞ্চাশটি টাকা ফুঁয়ে উড়ে গেল মহিলাটির। স্বামীর কলেরা হয়েছে—বেচারীর কি আর দরাদরি করার সময় আছে? তাই বলছিলাম...।

ছেলেটির কথাগুলি কশাঘাতের মত অবনীর অন্তরাত্মার ওপর দাগ বসিয়ে দিল, জ্বালা ধরিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে তার উদ্ধত মনুষ্যত্বের গর্বগুলি নিজেরই তুচ্ছতার লজ্জায় খর্ব হয়ে গেল। রোগীর মুখের মত অবনীর চেহারাটা ক্ষণে ক্ষণে বিশীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে পড়ছিল। না, এটা তার নিজের বিপদ নয়, নিজের লোকের বিপদ নয়। বাঁকারাম নামে এক হতভাগ্যের বিপদ—বাঁকারাম তার কেউ নয়। মনের গোপনে বহুদিনের লালিত একটা মোহ নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে পড়েছিল অবনীর। তার জাতিপ্রীতির গর্বিত মূর্তিটার গায়ে যেন এক আঁচড় দিয়ে ধরা পড়িয়ে দিল ছেলেটি, ভেতরে রক্ত নেই। এমন নিষ্ঠুরভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি লাভ হলো ছেলেটার? যাক, নিজেরই লাভ হলো বোধ হয়।

বিকেল শেষ হতে চললো। রোদের ঝাঁঝ ঝিমিয়ে আসছে, পূর্বচর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। পথের ভিড় আরও ঘন ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই অবসরে ফুটপাথের ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে অবনী যেন তার জীবনবেদের বর্তিকাটিকে মনে মনে সাজিয়ে নিল। যেন আর কখনো ভুল না হয়।

সবার মধ্যে মিশে যেতে হবে, ব্যক্তিকে বিলীন করে নিতে হবে সমাজের মধ্যে। এই গোত্রহীন, ব্যক্তিহীন, শ্রেণীহীন, স্বার্থহীন সত্তা সংগ্রাম ও সেবা দিয়ে মানবতার পুণ্য সৃষ্টি করবে। এই অবাস্তব নরোত্তমবাদের ভুলটুকু আজ যেন ধরা পড়ে গেল। অবনী এতদিন যেন পথকেই লক্ষ্য ও লক্ষ্যকে পথ বলে বুঝেছিল।

আজ একটা নবোপলব্ধ সত্যকে মনে মনে আবৃত্তি করে নিল অবনী।—আমি অসম্পূর্ণ, আমি পঙ্গু, আমি ক্ষুদ্রচেতনা মানুষ। সংগ্রাম ও সেবাই আমার পথ। এই পথেই এগিয়ে গিয়ে আমার পূর্ণতা আসবে, পঙ্গুত্ব ঘুচবে, চেতনা প্রসারিত হবে। সবার মধ্যে ব্যাপ্তি স্বস্তি ও স্থিতি লাভ হবে আমার। নিরহংকার সেই সেবক আমিই 'আমি'। সেই আমার সিদ্ধি, আমার সমাজবাদ, আমার লক্ষ্য। সবার উপরে সেবা সত্য। সবার প্রথমে সংগ্রাম সত্য।

গেঞ্জিওয়ালা ছেলেটি এতক্ষণ উত্তর না পেয়ে বিস্মিতভাবে অবনীর হাবভাব লক্ষ্য করছিল। ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দ মানুষের মত হঠাৎ উৎসাহে দীপ্ত হয়ে অবনী বললো—না ভাই, তুমিই ঠিক বলেছ। আমার একটি চেনা লোকের কলেরা হয়েছে। নিজের কেউ নয়।

ইন্দু ডাক্তারের সঙ্গে আর কোন প্রয়োজনের সম্পর্ক নেই। বাসু কবরেজকে সঙ্গী করে দাসপাড়ার বস্তির গলিঘুঁজি ভেদ করে যখন মৈনুদ্দীনের ঘরের কাছে পৌঁছলো অবনী, তখনে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। মৈনুদ্দীনের ঘরের দরজার ঝাঁপ খোলা, একটি মেটে পিদিম জ্বলছে কুলুঙ্গির ওপর। ঘরের মেঝে ভেদ করে একটা অতিক্ষীণ আর্তস্বর যেন থেকে থেকে ফুঁড়ে উঠছে—আল্লাহ্...রহমানের...রহিম।

মেঝের ওপর উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়েছিল মৈনুদ্দীনের বিবি। বোরখা নেই, কবরেজ আর অবনীকে হঠাৎ ঘরের ভেতর দেখতে পেয়ে তার শোকাহত রক্তশূন্য শীর্ণ মুখের ওপর ক্ষণিকের জন্য একটা প্রসন্নতার আভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

দেয়াল ঘেঁষে একটা চটের বিছানার ওপর মৈনুদ্দীনের শরীরটা শক্ত হয়ে বেঁকে কুঁকড়ে

পড়েছিল। বাসু কবরেজ সামান্য একটু টেপাটিপি করেই হাত গুটিয়ে নিল।—শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই।

দাসপাড়ার গলির অন্ধকারে আবার পা বাড়িয়ে দেবার আগে আর একবার স্পষ্টভাবে শোনা গেল, মৈনুদ্দীনের বিবি ফুঁপিয়ে কাঁদছে, ফরিয়াদ করছে—আল্লাহ্ রহমানের রহিম...।

জাগৃতি সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন।

এটা একটা রহস্য, ইন্দ্রনাথ কেন এখনো সঙ্ঘের সঙ্গ ছাড়তে পারলো না। বুঝতে আর কি বাকি আছে তার? সঙ্ঘের জন্য কোন দরদ নেই ইন্দ্রনাথের। সাম্যবাদের বুলির ঘেরাটোপ দিয়ে সঙ্ঘের অন্তঃস্বরূপটা এতদিন ঢাকা পড়েছিল। তাই বুঝতে ও চিনতে একটু দেরি হয়েছে। ইন্দ্রনাথ জানে, সে একা নয়, আরও বহু উৎসাহী কর্মীর মনের দশা তারই মতন। কেউ তার চেয়ে আগেই বুঝে ফেলেছে, কেউ কেউ বুঝতে আরম্ভ করেছে। দুর্ভাগ্য ও পণ্ডশ্রমের অভিশাপ নিয়ে কিছু নতুন নিরীহ ছেলেমেয়ে এসে সঙ্ঘের ভেতরে ঢুকছে। রুচি শিক্ষা ও চেহারা, সব দিক দিয়েই অপদার্থ—দলে দলে এই ধরনের ছেলেমেয়েগুলিই বেশী করে ঢুকছে। কিন্তু সমবেদনা হয় নিরীহদের জন্যই, ওদেরই জীবনের অনেকে ক্ষতি ভ্রান্তি ও অপচয়ের ওপর সঙ্ঘনায়কদের ভবিষ্যতে মোটা চাকুরী ও মোড়লী নির্ভর করছে।

কিন্তু স্বয়ং প্রকাশবাবু এখনো ইন্দ্রনাথের কাছে একটি রহস্য। কারাগার নির্যাতন অজ্ঞাতবাস—রাজনীতির জন্য, দেশের কাজের জন্য, প্রকাশবাবু জীবনে একদিন কোন দুঃখ না বরণ করে নিয়েছিলেন? আদর্শের জন্য সর্বস্ব খুইয়ে যাঁরা পথে নেমে পড়েন, পথের ধুলোকে যাঁদের জীবনের শোণিতবিন্দু গৌরবে মহনীয় করে তোলে, প্রকাশবাবু তো সেই বিরল পথিকার মানুষের মধ্যে একজন। ইন্দ্রনাথের কাছে সে-ইতিহাসের কিছুই অজ্ঞাত নেই। এক মুহূর্তের সংশয়ে সেই শ্রদ্ধার বন্ধন ছিঁড়ে যেতে পারে না। আজ প্রকাশবাবু প্রৌঢ় হয়ে পড়েছেন, কিন্তু এই একটি পরিবর্তন ছাড়া আর এমন কি ঘটতে পারে, যার জন্য সেই চিরকালের প্রদীপ্ত প্রকাশবাবু একেবারে নিভে যেতে পারেন? সংসারে এমন কোন মারের ছলনা আছে, প্রকাশবাবুর মত কঠিন ব্যক্তিত্বকে পথ ভুল করিয়ে দিতে পারে?

প্রকাশবাবুকে চেনবার জন্যই যেন ইন্দ্রনাথ এখনো সঙ্ঘের আনাচে-কানাচে একরাশ সংশয় ও কৌতূহল নিয়ে ঘুরছে।

জাগৃতি সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনের আয়োজনটা চমক লাগিয়ে দেবার মতই। সভ্য, কর্মী, দরদী, দর্শক ও নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে টাউন হলের জঠর মুণ্ডাকীর্ণ। নানা প্রদেশের প্রতিনিধির দল এসেছেন। দেশী ও বিদেশী কয়েকটি প্রেসের সংবাদদাতা ও প্রতিনিধিরা আছেন। কয়েক মাসের মধ্যেই জাগৃতি সঙ্ঘের কী প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে, আজকের অধিবেশনের উৎসাহ ও ভিড়টাই তার প্রমাণ। একে অস্বীকার করা যায় না। এত দেখেও যারা অস্বীকার করতে চায়, তারা নিছক নিন্দুক ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা এখানে আসবেই বা কেন?

কিন্তু হলের পেছনে কতকগুলি ছেলেকে দেখা যাচ্ছে—একটু বিমর্ষ, নিরুৎসাহ ও বোকা বোকা দৃষ্টি। জাগৃতি সঙ্ঘের কয়েকজন কর্মী বার বার ঘুরে এসে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে এই নিরুৎসাহ ছেলেগুলির আপাদমস্তক পরীক্ষা করে চলে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই একটি কর্মী সেখানে একটা টুল নিয়ে এসে রাখলো। একটি পুলিস সার্জেণ্ট বেল্টনিবদ্ধ রিভলভারটির ওপর একবার হাত বুলিয়ে, হেলমেটটা কোলের ওপর নামিয়ে টুলের ওপর শক্ত হয়ে বসলো। জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজে চলে গেল।

দেয়ালভরা পোস্টার সাজানো। সবচেয়ে বড় পোস্টারটা দেখবার মত—কয়েকটি গাঁয়ের মেয়ে বঁটি হাতে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টারের ছবির মর্ম নিচেই লেখা আছে—

'চট্টগ্রামের চাষী মেয়েরা জাপানীদের রুখিবে।'

একদল শ্বেতাঙ্গ দর্শক বিস্ময়ে চোখ কুঁচকে পোস্টারগুলিকে দেখছিল। —Are those knives sharp enough? What a hoax! Pooh! কতগুলি অস্পষ্ট মন্তব্য বিদ্রূপ ও রসিকতা হঠাৎ উচ্চ হাসির হররা জাগিয়ে তুললো। নিকটেই কয়েকটি কর্মী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। মন্তব্যগুলি শুনে নিয়ে, ঢোঁক গিলে আবার শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

পেছনের বিমর্ষ ভিড়টার ভেতর একটি ছেলে পাশের বন্ধুটিকে বোধ হয় বলছিল—যাই বল, এরাই কিন্তু বেশ জমিয়ে তুলেছে ভাই। নিন্দে করলে আর কি হবে?

উত্তর এল এক অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখ থেকে।—বাদলার দিনে বাদলা পোকারাই বেশ জমিয়ে তোলে ভাই। ওদেরই তখন বেশী করে দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলে বাদলা পোকারাই সত্য নয়। ঝড় আসুক ভায়া, তখন দেখবে কারা থাকে আর কারা উড়ে যায়।

আবার একটা হাসির হররা উঠলো। পুলিস সার্জেণ্ট ঘাড় ফেরালেন।—ইউ, হল্লা মৎ করো!

হল্লা সত্যই বন্ধ হয়ে গেল। সভার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

সভাপতি কার্যতালিকাটি হাতে তুলে ঘোষণা করলেন—প্রথমে, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী কবিতা।

আবির্ভূত হলেন কবি রণজিৎ দে। মেঘারাবের মত গভীর সুরে আবৃত্তি করলেন,—

অভিশপ্ত বুসিডো
          নিপ্পনী সূর্যের তেজ ঢুঢু,
য়ামাতো দামাশি
          শেষ কাশি কাশে।

কবি রণজিৎ হঠাৎ দুর্ধর আবেগে কাঁপতে লাগলেন—

চূর্ণ কর, চূর্ণ কর
          গেঞ্জির স্বপন,
মিকাডোর ব্যাদিত রসনা।
ভোঁতা ভোঁতা ভুরুর ছলনা।
তোল হাত, হাতিয়ার ধর
য়ামাতো গোকোরো
কাঁপে থর থর।

হাততালির শব্দ না থামতেই সভাপতি ঘোষণা করলেন।—দ্বিতীয়, ফ্যাসিস্তবিরোধী গান।

উর্মিলা কাঞ্জিলালের ইঙ্গিত মত চারটি মেয়ে উঠে এসে সুর ধরলো।—

অশথ কেটে বসত করি
জাপানী কেটে আলতা পরি...

মঞ্চের ওপরেই উপবিষ্টদের মধ্যে কে একজন বাধা দিয়ে বললেন—জঘন্য!

ডাক্তার মুখার্জির মন্তব্য। সভাপতির দিকে তাকিয়ে তিনিই কথাটা বললেন। পাশে বসে সিতা বসু আস্তে আস্তে বললো—থাক কাকাবাবু, আপনি কেন আর...।

গানটা শেষ হলে সভাপতি তবু ডাক্তার মুখার্জিকে তাঁর আপত্তি ব্যক্ত করবার সুযোগ দিলেন না। ডাক্তার মুখার্জি সভাপতিকে বললেন,—জাপানীদের কেটে আলতা পরার সখ কেন মশাই? এটা কোন ধরনের কম্যুনিজ্‌ম্‌? আমাদের বিবাদ জাপানের পররাজ্যলোভী শাসকদের কারসাজির সঙ্গে। লক্ষ লক্ষ গরিব দুঃখী নিরীহ জাপানীদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমার দেশের ছেলেমেয়েদের মনে এই ধরনের জাতিগত ঘৃণা ছড়াবার জন্য কার অর্ডার পেয়েছেন?

হলের শ্রোতার দল শুধু বুঝতে পারলো, ডায়াসের ওপর একটি ছোটখাট বচসা বেধেছে।

স্পষ্ট করে কিছু বোঝবার আগেই সবাই দেখলো, ডাক্তার মুখার্জি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

সভাপতি ঘোষণা করলেন—এরপর, সোভিয়েট-সৌহার্দ্যের মিউজিক।

জন-সাঙ্গীতিক নামে সম্প্রতি-পরিচিত কমরেড গণেশ চট্টোপাধ্যায় চাষাদের ঢঙে মাথায় গামছা বেঁধে, গলায় একটা মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে আসরে নামলেন। মৃদঙ্গের বাজনার সঙ্গে বোল আরম্ভ হলো।—

কিট্ কিট্ কিট্ ধাং ঝেঙ্কু
টিমোশেঙ্কু।
ধেক্ ধেক্ ধো ধো,
কিরিটি কিরিটি
প্রলিটারিয়াটি
দিমিদ্রাং দ্রিমি-দুনিয়াং।
থো থো থো থোক্কু থোরে
রুশ্যা রে! রুশ্যা রে!

শ্রোতাদের সুরুচিবোধের সকল সংযম ও মাত্রার ওপর কমরেড গণেশ যেন বে-পরোয়া চাঁটি মেরে চলেছিল। হলভর্তি জনতার গাম্ভীর্যের বাঁধ আর অটুট থাকা সম্ভব ছিল না। হাসি হল্লা আর টিটকারির সহস্র ফোয়ারা যেন হঠাৎ মুখর হয়ে কিছুক্ষণের জন্য সভার কাজ পণ্ড করে দিল।

হাসাহাসির ঝড়ের মধ্যে দর্শকদের এক একটা মন্তব্য জ্বালাভরা বিদ্যুতের মত ঠাট্টায় ঝলসে উঠছিল।—'মলোটোভকে কেউ একটা তার করে দাও হে, এসে দেখে যাক রুশপ্রীতির ছিরি।'

'ডোবালে, সব ডোবালে, গনা রে, তোর মনে এতও ছিল!'

'ও কালামুখে আবার রুশিয়ার নাম কেন? তোরাও কম্যুনিস্ট? গড়ের গুগলি বলে আমি হব শঙ্খ। ছোঃ।'

জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীরা বিচলিত হয়ে পড়ছিল। জয়ন্ত মজুমদারের মাথায় কশাক টুপি হেলে পড়ছিল। প্রকাশবাবু পার্থসারথির মত কর্মীদের কানে কানে অভয়ডিণ্ডিম বাজিয়ে গেলেন।—Steady! বিদ্রূপ আর কুৎসা শুনে ঘাবড়ে যেও না। এর চেয়ে আরও অনেক বড় বড় সংকটের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের উপদ্রব তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যে এন না। এখন বৃথা শক্তি ক্ষয় করে লাভ নেই। তৈরী হয়ে থাক, সিভিল ওয়ারের দিন ঘনিয়ে আসছে।

কিন্তু এদিকে দর্শকদের গ্যালারির একটা দিক খালি হয়ে গেছে। সভা শান্ত হয়েছে। প্রস্তাব উত্থাপনের পালা আরম্ভ হলো।

কমরেড হাবুল দত্তের প্রস্তাব : জনৈক ব্রিটিশ সৈনিক কোন এক ভারতীয় স্ত্রীলোকের মর্যাদাহানি করিয়াছে, এই সংবাদে যেসকল লোক উষ্মা প্রকাশ করিতেছে, এই সভা তাহাদিগকে পঞ্চম বাহিনী বলিয়া গণ্য করে। তাহারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধোদ্যোগ ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

...স্বরূপরাম এণ্ড কোম্পানির ইস্ক্রুপের কারখানার মাগ্যি ভাতা দাবি করিয়া স্ট্রাইক ঘটাইবার জন্য যে সকল ভুঁইফোড় মজদুরবন্ধু শ্রমিকদিগকে উস্কানি দিয়াছে, এই সভা তাহাদের নিন্দা করিতেছে।

...সভা এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে যে, জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীদের চেষ্টায় স্ট্রাইক ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মজুরেরা কাজে যোগদান করিয়াছে।"

হাবুল দত্তের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দর্শকদের মধ্যে আরও একদল সভা ছেড়ে চলে গেল।

হাবুল দত্তের প্রস্তাবের মধ্যে নেহাত বেফাঁস যেন একটা ঠুঁটো নিষ্কর্মবাদের ইঙ্গিত ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেটা চাপা দেবার জন্যই বোধ হয় জয়ন্ত মজুমদারের প্রস্তাব একটা জঙ্গী পাঁয়তাড়ার মত সহর্ষে দেখা দিল।

"এই সভা সর্ববিধ শান্তিবাদ, অর্থাৎ প্যাসিফিজ্‌মের নিন্দা করিতেছে। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস এতদিন 'সংগ্রামের' ছুতা করিয়া শুধু নিষ্ক্রিয়তার চর্চা করিয়াছে। তাই আমরা 'ওয়ার' করিতেছি। এই যুদ্ধ আমাদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনিতেছে। পরিবারবন্ধন ভাঙিয়া যাইতেছে, সতীত্ব পতিত্ব মাতৃত্ব ভদ্রতা ইত্যাদি সব পেটি বুর্জোয়া সংস্কার অন্নাভাবের গুঁতায় গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। কী বিরাট পরিবর্তন! কী আনন্দ! এই পরিবর্তনের উপর আমাদের নতুন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। এই যুদ্ধের রুদ্ররূপ আমাদের জীবনে একটি পরম পরিণামের সন্দেশ আনিয়াছে।"

—প্রতিবাদ করা উচিত ইন্দ্রবাবু। কথাটা যারা বললো তারাও জাগৃতি সঙেঘর সভ্য। তারা জাগৃতি সঙেঘর পাঁকের মধ্যে থেকেও যেন নেই। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তারা বক্তৃতামঞ্চের পেছনে এক কোণে বসেছিল। ইন্দ্রনাথের মতই তারাও সঙেঘর হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সব চুকিয়ে দিয়ে খসে পড়ার আগে তারা যেন শুধু সঙেঘর গায়ে ভাঙা ডালের মত ঝুলছে।

জয়ন্ত মজুমদারের বিচিত্র সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে ইন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে স্কুল-মাস্টার আশুবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে আপত্তি করে উঠলেন—'দুর্ভোগ ভোগা অর্থ পরিবর্তন নয় মশাই।'

মঞ্চের নিচে প্রথম সারিব চেয়ার থেকে এক ভদ্রলোক পাল্টা প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ালেন। ইন্দ্রনাথ চিনতে পারলো—ইনিই অধ্যাপক সুকুমার মুস্তাফী। মাথার টাক আর মার্ক্সবাদ, এই দু'টো জিনিসকেই অধ্যাপক সুকুমার একই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করেন।

অধ্যাপক সুকুমার আশুবাবুকে একটি ধমকে যেন দমিয়ে দিলেন।—কে বললে এটা পরিবর্তন নয়? লিথুয়ানিয়ার কমিউনিস্ট কনফেডারেশন অব্ লেবারের গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী আদ্রিয়েভ মিলিমিরোরস্কির মত মার্ক্সবাদী স্কলার তাঁর আত্মজীবনীর একশো ছাপান্ন পৃষ্ঠায় কি লিখেছেন, প্রতিবাদ করার আগে মশাই সেটা একবার পড়ে এলেই ভাল করতেন।"

এরপর, বিনা বিসংবাদেই জয়ন্ত মজুমদারের প্রস্তাব গৃহীত হলো।

কমরেড দিনেশ পুরকায়স্থের প্রস্তাব: "যুদ্ধজনিত এই পরিবর্তন ও ভাঙনের সুযোগ দেশের শাসনযন্ত্রটি যেন কংগ্রেসের মত কোন সঙ্ঘবদ্ধ ফ্যাসিস্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে গিয়ে না পড়ে, তাহার জন্য এখনই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জাগৃতি সঙেঘর সাম্যবাদী পন্থায় বিশ্বাসী সভ্যদিগকে একে একে নতুন চাকুরীর পদগুলি অধিকার করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া যত এমার্জেন্সী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারের পোস্টগুলি ক্যাপচার করিয়া লইতে হইবে।"

প্রস্তাব সমর্থিত ও গৃহীত।

কমরেড পরিতোষ সরকারের প্রস্তাব : "কন্ট্রোলের লাইনের ভিড়ে মুসলমান ভাইদিগের চাউল পাইতে বড়ই কষ্ট ও বিলম্ব হয়। এমন অভিযোগও শুনা যায় যে, দোকানের হিন্দু কর্মচারীরা বাছিয়া বাছিয়া মুসলমানদিগকে মোটা চাউল দেয়, হিন্দুরা সরু চাউল পায়। পাকিস্তানী গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ প্রচারক আবু মোর্তাজা মুসলমানদিগের জন্য ভিন্ন কন্ট্রোলের দোকান ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, জাগৃতি সঙ্ঘ সর্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেছে।"

প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত।

কমরেড তড়িৎ চট্টরাজের প্রস্তাব : "এই সভা প্রস্তাব করে যে, অবিলম্বে দেশের সর্বত্র লঙ্গরখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। আমাদের জাগৃতি সঙ্ঘকে লোকে বিশ্বাস করিয়া চাঁদা দিলে বন্যার্ত এবং ক্ষুধার্তকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে পারি। অবশ্য উহা ফাসিস্তবিরোধী প্রথায় পরিচালনা করা হইবে। কিন্তু লঙ্গরখানাগুলির মারফত কতকগুলি পঞ্চবাহিনী কর্মী সাজিয়া জনসাধারণের কানে জাতীয়তার মন্ত্র পড়িয়া দিতেছে। পঞ্চমবাহিনীকে জনতার সংস্পর্শে আসিতে এইরূপ সুযোগ দেওয়া উচিত নহে।"

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত।

সভাপতি হাঁক দিলেন—এইবার কমরেড ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব। প্রকাশবাবু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

ইন্দ্রনাথ আরম্ভ করলো—"আমরা বিশ্বাস করি, এই যুদ্ধে হিটলারী জার্মানীর আক্রমণে সোভিয়েট রুশিয়া পরাজিত হলে সভ্যতার ক্ষতি হবে। মানুষের স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে।

ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ ও আমেরিকা আজ সোভিয়েট রুশের মিত্ররূপে নিজেকে ঘোষণা করেছে—চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ফাসিস্তির বিনাশের এই সংগ্রামে সোভিয়েট রুশিয়া বার বার ব্রিটেন ও আমেরিকাকে সত্যিকারের সহযোদ্ধরূপে পেতে চাইছে। সোভিয়েট রুশিয়ার একমাত্র দাবি—দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রন্ট কি? সোভিয়েট ভূমির অকৃত্রিম সুহৃদ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে—সোভিয়েট রুশিয়ার ওপর নাৎসী আক্রমণ থাকতে থাকতে অর্থাৎ সম-সময়ে যদি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জার্মানী-অভিযান আরম্ভ করে, তারই নাম দ্বিতীয় ফ্রন্ট। এই 'স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রন্ট' আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করবো।

কিন্তু নাৎসী-আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া যদি একা লড়াই করে শত্রুকে হটিয়ে দিতে পারে, এবং তার পরে যদি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জার্মানী-অভিযান আরম্ভ করে, তার নাম 'সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় ফ্রন্ট'। সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় ফ্রন্ট আমরা সমর্থন করি না।

সুতরাং, সভা প্রস্তাব করে যে, স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রন্ট না খোলা পর্যন্ত আমরা এই যুদ্ধ সমর্থন করবো না।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবি নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করা হোক। জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীরা দেশেব সর্বত্র 'স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রন্ট দাবি'র মিছিল মিটিং ও প্রচার আরম্ভ করুক। আমরা ডেমোক্রেসির সদিচ্ছা যাচাই করে দেখতে চাই। সোভিয়েট রুশের শুভাশুভের উপর আমাদের সর্বস্ব যখন নির্ভর করছে, তখন আমাদের আর চুপ করে থাকলে চলবে না। আজ থেকে 'স্বাধীনতার দ্বিতীয় ফ্রন্ট' আন্দোলন আমাদের সঙ্ঘের কর্মজীবনের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করুক।"

একটা অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি তুলে প্রকাশবাবু ইন্দ্রনাথকে দেখছিলেন। জয়ন্ত মজুমদারের মত আরও কয়েকজন সঙ্ঘ-সারথি ব্যতিব্যস্ত হয়ে সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরছিল। ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল প্রকাশবাবুর চাউনি থেকেই ইঙ্গিত পেয়ে সভ্যদের মধ্যে একটা গোপন উৎসাহ ছড়িয়ে বেড়ালেন কিছুক্ষণ।

ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলো। সভাপতি হেসে হেসে রায় দিলেন—প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

ইন্দ্রনাথ ততক্ষণে সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে এসেছিল। সঙ্গীরা ধিক্কার দিল।—এবার হলো তো ইন্দ্রবাবু! সঙ্ঘের রুশপ্রীতি পরীক্ষা করতে চাইছিলেন, দেখুন এইবার। প্রীতির পাল্লা কোন দিকে ঝুঁকে রয়েছে, এখনো বুঝতে বাকি আছে নাকি আপনার? এ পলিটিক্স্ কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অগম্য। না, কোথাও একটা গলদ আছে ইন্দ্রবাবু। কোন বঁধুয়ার যেন মান রক্ষা করে

চলেছে আপনার জাগৃতি সঙ্ঘ। হাত তুলে একটা প্রতিবাদও করতে চায় না, যদি বঁধুয়ার গায়ে আঁচড় লাগে। নইলে মানুষ কখনো এত যুক্তিভ্রষ্ট কথা বলতে পারে? থাকুন আপনি, আমাদের কিন্তু আজ থেকেই ইতি। আপনার জাগৃতি সঙ্ঘ আর পার্টি একটি বিশুদ্ধ প্রপঞ্চবাহিনী।

সত্যি সত্যি তারা চলে গেল। ইন্দ্রনাথের মনের ভেতরটা একটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। এই সঙ্গীদের ভাল করেই চেনে ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ জানে তারা কি আশা করে এসেছিল, যাবার সময় কি হতাশ্বাস আর গঞ্জনা নিয়ে চলে গেল। যাক, এরা চলে গেলে জাগৃতি সঙ্ঘের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে বই কমবে না।

সভাপতি তখন জাগৃতি সঙ্ঘের এই ক'মাসের ফ্যাসিস্তবিরোধী ও জনরক্ষা কীর্তির একটা ফিরিস্তি পড়ে সভা শেষ করে আনছিলেন—এই ক'মাসেই জাগৃতি সঙ্ঘ তাদের কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রচারপত্রে সাতশো সই যোগাড় করেছে, ডাক্তার খোপড়িওয়ালার চব্বিশটা ফটো বিক্রি করেছে, দক্ষিণ কলকাতায় পঁচিশটা স্লিট ট্রেঞ্চের ঘাস ছিঁড়ে পরিষ্কার করেছে।

বিপিন বললো—ঐ দেখুন বাবু, ঐ সেই কেউটেনী।

অবনী দেখছিল, একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ট্রাম স্টপের কাছে কপট কান্নার সুরে চীৎকার করে ভিক্ষে করছে। মাঝে মাঝে শুকনো কাঁকড়ার মত বিকৃত একটা শিশুর শরীরকে এক হাতে তুলে ধরে যেন পথিকদের উদাস দয়াবৃত্তিকে খুঁচিয়ে জাগাবার চেষ্টা করছে।

বিপিন বললো—ওরই নাম পুনি কেওটানী।

অবনী।—আর ঐ ছেলেটিই বুঝি...

বিপিন।—হ্যাঁ, ঐ আমার টুনা।

পুনি কেওটানী ভিক্ষে করছিল। টুনাব এই জীর্ণ মানবীয় আকৃতিটাই পুনির উপজীবিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়, টুনার শরীরটা পুনির একটা ভিক্ষাপাত্র মাত্র—পথিকের হাতের কাছে তুলে ধরছে, চোখের সামনে দুলিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা পায়ের কাছে মাটিতে পেতে দিচ্ছে। মহাজন পুনি টুনার গর্ভধারিণীকে টাকা ধার দিয়েছে—তার সুদ চাই। সুদ তুলে নিতে একটুও ত্রুটি করছে না পুনি—কারবারের নিয়মে ক্ষমা বলে কোন জিনিস নেই।

টুনার দৌলতে সুদ মন্দ আদায় হয় না। টুনার চোপসানো মাথা কাঁপতে থাকে, কখনো হেঁচকি তোলে—মাঝে মাঝে গলনালী ভেদ করে একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ ছাড়ে। হঠাৎ কোন বিবেকবান পথিক দয়ার ঝোঁকে একটা ডবল পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সকাল-সন্ধ্যা পথে পথে আয়ুর এক-একটি মুহূর্ত উৎসর্গ করে টুনা যেন মাতৃঋণের সুদ শোধ করে। পুনি কৃতার্থ হয়।

অবনী বিপিনকে জিজ্ঞাসা করলো—টুনার মা কই?

বিপিন।—সেই খবরটাই তো পাচ্ছি না বাবু। আমি শুধু ওর গর্দানটা একবার বাগে পেতে চাই। পুনিকে দূষে আর কি হবে? পুনির মত কেউটেনী ডাইনীর হাতে পেটের ছেলেকে যে-রাক্ষুসী ছেড়ে দিয়ে গেছে, তাকে আমি একবার দেখে নেব বাবু। একবার পেইছি কি ওর মাথাটা ছেঁচে ছেঁচে...।

বিপিন কঠোর হয়ে উঠছিল। অবনী ধমক দিল—চুপ কর।

কিন্তু অবনী কোন কর্তব্য খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পুনি কেওটানীর কীর্তি দেখছিল অবনী। বোধ হয় ঠিক এই চাক্ষুষ কীর্তিটা নয়, তার আড়ালে এক অমানুষিক অপমানের ইতিবৃত্তটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একটু মনস্ক হয়ে নিয়ে অবনী আবার জিজ্ঞাসা করলো—বিপিন?

বিপিন।—আজ্ঞে।

অবনী।—ছেলেকে চাও?
বিপিন।—হ্যাঁ বাবু।
অবনী।—তাহ'লে পুনিকে ডাকি?
বিপিন।—হ্যাঁ বাবু।
অবনী।—তুমি ছেলেকে নিয়ে চলে যেও, আমি পুনিকে টাকা দিয়ে দেব। কেমন?
বিপিন।—না বাবু।
অবনী আশ্চর্য হয়ে তাকালো।—তার মানে? ছেলেকে চাও না?
অপরাধীর মত বিবর্ণ মুখে বিপিন উত্তর দিল।—না।
অবনী রাগ করে বললো—আমাকে ভুগিয়ো না বিপিন। স্পষ্ট করে বল, তুমি কি চাও।
বিপিন।—পুনিকে বলে কয়ে টুনার মাকে একবার ডাকিয়ে দেন বাবু।

অবনী অপ্রস্তুতের মত প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি নিয়ে বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ভীরু লম্পটের মত একটা নির্বাসিত লজ্জার ছায়া বিপিনের মুখের ওপর যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছিল। কি চায় বিপিন? তার কথাবার্তার সমস্ত অর্থহীনতার আড়ালে কি যেন একটা আবেদন ছটফট করছে। অবনী হঠাৎ নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লো।

হাত তুলে ইশারা করে পুনি কেওটানীকে ডাকলো অবনী। পুনি কিছুক্ষণ চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে অবনীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সশ্রদ্ধ ভয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে একটা প্রণামও জানালো।

পুনি বললো—আপনি ডাকলেন বলেই এলাম। ঐ মুখপোড়া ডাকলে আসতাম না।

পুনি বিপিনের দিকে ভেংচিয়ে একটা ধিক্কার দিল। অবনী বললো—তুমি আমাকে চেন?

উৎসাহিতভাবে শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে পুনি উত্তর দিল—আপনাকে চিনবো না বাবু? আপনার ছেলেদিগের সাথে আমাদের রোজই দেখা হয়।

বুঝতে দেরি হলো না অবনীর। কথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য অবনী বললো—এটা কিন্তু তুমি খুবই খারাপ কাজ করেছ, ছেলেটাকে এভাবে...।

পুনি কেওটানীর কানে কথাগুলি বোধ হয় পৌঁছয়নি। তার মনের ভেতর যে-প্রসঙ্গটা সাড়া দিয়ে উঠেছে, তারই প্রতিধ্বনি করে পুনি বলে উঠলো—কংগ্রেসের ছেলেরা বলছে, ভিক্ষে করো না। আমরাও বলেছি, না করবো না। কিন্তু খেতে তো হবে।

অবনী।—ভিক্ষে করেই বা ক'দিন খাওয়া জুটবে?

পুনি।—তা জানি বাবু। ভিক্ষে করতে কি সাধ যায়! তাছাড়া আমার আবার কেউটেনীর মত রাগ। ভিক্ষে করা কি আমার মত লোকের মেজাজে সয় বাবু? ইচ্ছে করে ট্রেমের বাবুগুলোর নাকের ওপর থাবড়া মেরে চশমাগুলো নামিয়ে দিই। তাই হবে একদিন। তারপর গঙ্গায় ডুবে মরবো—ভবযন্ত্রণা চুকে যাবে।

পুনি অন্যমনস্ক হয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কি ভাবলো। অহিংসার রুক্ষ মূর্তিটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। পুনি বললো—তাই করবো বাবু, কংগ্রেসের ছেলেরা যা বলেছে। বড়লোকের দোরে ভিক্ষে করে লাভ নেই। ভিক্ষে দেবে না। মরণ লেখা আছে আমাদের কপালে। ওদের চালের ভাঁড়ারে হানা দিতে হবে, যতক্ষণ না মরি। তাই ভাল।

পুনি কেওটানীর কোলে বসে টুনা চিঁ চিঁ করে কেঁদে উঠলো। পুনি বললো—মর মর, শীগগির মর। রাক্ষুসে বাপের ঘরে জন্মেছিস, মরলেই তোর শান্তি। আমারও হাড় জুড়োয়।

বিপিন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অবনী পুনিকে বাধা দিয়ে বললো।—থাক ওসব কথা। তুমি টুনার মাকে একবার ডেকে দাও। ওদের ছেলে ওদের হাতে দিয়ে দাও, তোমারও হাড় জুড়োক।

—আসুন বাবু। পুনির আহ্বানে অবনী ও বিপিন পুনিকে অনুসরণ করে গরচা লেন পার

হয়ে একটা গলির ভেতর গিয়ে ঢুকলো। মজুরদের একটা চা-তেলেভাজার দোকানের সামনে, রাস্তার ওপর জলের কলের কাছে তিনটি তরুণ বয়সের মেয়ে হাসাহাসি করছিল। প্রত্যেকের হাতে একটা কলাই-করা থালা। প্রত্যেকেরই পরনের শাড়িগুলি পরিচ্ছন্নতা ও বাহারের কোন অভাব নেই। ঠোঙায় ভরে তেলে-ভাজা হাতে নিয়ে একটি লোক কাছেই দাঁড়িয়েছিল। লোকটার চেহারায় রসিকতার কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু বেশ রসস্থ ভাব—গোঁপ চুমড়ে ফিকফিক করে হাসছে। একটা মেয়ে কল থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে লোকটার গায়ে ছিটিয়ে দিল।

হাসির সোর না থামতেই পুনি কেওটানী হাঁক দিল—ও টুনার মা।

ওদের মধ্যে সেই মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকালো:. যার মুখ এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

পুনি একটু কঠোরভাবে আবার ডাকলো—এস এইখানে!

এগিয়ে আসছিল টুনার মা। কপালে একটা বড় টিপ, গালভরা পান—একটি পরিপাটি রঙ্গিণী মূর্তি। এই কি টুনার মা? অবনী একটু বিস্মিত হয়ে দেখছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত চেহারা, চটুল সুন্দর এই মেয়েটিই কি বিপিনের বর্ণনার নির্দয়া রাক্ষুসী? মেয়েটি এগিয়ে আসছে, যেন ঘাতকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, সমস্ত চৈতন্য সম্মোহিত হয়ে আছে।

বিপিন অবশ হয়ে মাটিতে বসে পড়তে যাচ্ছিল। অবনী বাধা দিতে গিয়েই দেখলো, বিপিন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে।—সব গেল, আমার সব গেল বাবু।

অবনী।—কি গেল?

বিপিন—দেখছেন না বাবু, ও যে বেশ্যে হয়ে গেছে। ও মরে গেছে।

অবনীর প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল, বিপিনের মত গোঁয়ার গেঁয়ো হঠাৎ গৃহত্যাগিনী পত্নীকে মুখোমুখি পেলে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে না বসে। বিপিনের মেজাজ দেখে তাই মনে হতো। একটা হিংস্র বিক্ষোভকে যেন অতিকষ্টে প্রতীক্ষিত একটি মুহূর্তের জন্য এতদিন মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল বিপিন। সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু বিপিনের সব পৌরুষ সেই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতার বলির পশুর মত রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। সহ্য করার শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

পুনি কেওটানী একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল বিপিনের দিকে। বিপিনের ফুঁপিয়ে-কান্নার শব্দটা পুনিকে ধীরে ধীরে বিচলিত করে তুলছিল। পরমুহূর্তে টুনার মাকে লক্ষ্য করে পুনি কেওটানী খেঁকিয়ে উঠলো—তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আজও হলো না বৌ। ঐ সব নষ্ট ছুঁড়িদের রঙ্গ দেখতে তুমি কেন গিয়েছ? যার জন্য কেঁদে কেঁদে মাথা কুটতে, সে এসেছে। ছেলে নিয়ে, সোয়ামিকে নিয়ে এইবার সুখ কর। কেওটানীকে আর গালমন্দ করো না।

বিপিনের দিকে তাকিয়ে পুনি কি বলতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। বোঝা যায় একটা ফাঁপরে পড়ে পুনি যেন সহজে কোন পথ করে নিতে পারছে না। একটু এগিয়ে এসে বিপিনের কাঁধে হাত দিয়ে কতকটা সান্ত্বনাচ্ছলে যেন পুনি বলতে লাগলো—ও কি? পুরুষ হয়ে এ আবার কোন ঢঙ তোমার? ওঠ, নিজের জিনিস নিজে বুঝে নিয়ে ঘরে যাও। পুনি কেওটানীকে আর গালমন্দ করো না!

টুনার মায়ের প্রথম হতভম্বতা দূর হয়ে গিয়ে বেশ সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল। নির্বিকারভাবে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল টুনার মা। কপালের টিপটা চিকচিক করছিল। দু'বার পানের পিক ফেললো। শহুরে ঢঙে পরা শাড়ির আঁচলা নিয়ে বার বার একটা অনভ্যস্ত অস্বস্তিতে টানাটানি করলো। তারই দীক্ষাদাত্রী ভ্রষ্টজীবনের অভিভাবিকা পুনি কেওটানীর কথাগুলি হঠাৎ একটা অতিগূঢ় ইঙ্গিত নিয়ে টুনার মায়ের চোখে শুধু কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। অবুঝের মত দাঁড়িয়ে থাকলেও, প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছিল টুনার মা।

বোধ হয় ভুল করে একবার মুচকে হেসে ফেলেছিল টুনার মা। পুনি কেওটানী একটু আড়াল করে ভুরু কুঁচকে ইশারায় যেন একটা ধমক দিল। মাথায় কাপড় নেই, বেহায়ার মত আঁচলা নিয়ে লোফালুফি করছে, পানের পিক ফেলছে। কী দজ্জাল গোমুখ্যু মেয়ে! পুনি কেওটানী হাত নেড়ে নেড়ে আবার আরও স্পষ্টভাবে ইশারা করলো—ঘোমটা দাও।

টুনার মা যেন জেদ করেই বিদ্রোহিনীর মত দাঁড়িয়ে রইল। পুনি কেওটানী এইবার মুখ খুলে স্পষ্ট ভাষায় অনুযোগ জানালো—কি গো বৌ, ভিক্ষে করলেই কি ছোটলোক হয়ে যেতে হয়? দেখছো না, কে এসেছে। চোখের মাথা খেয়েছ না কি? বিপিনকে চিনতে পারছো না? আর এই স্বদেশী বাবুটি রয়েছেন তবু তোমার।...

টুনার মার ঠেঁটা চেহারাটা ধীরে ধীরে আড়ষ্ট হয়ে এল। সবই বুঝতে পারছে সে। পুনি কেওটানী নিজেই তার ষড়যন্ত্রের জালের গিঁটগুলি একে একে খুলে আলগা করে দিচ্ছে। আড়ালের একটা কাহিনীকে আড়ালেই শেষ করে দিয়ে, ঘরের বৌয়ের সম্ভ্রমে সাজিয়ে পুনি কেওটানী আজ টুনার মাকে মুক্ত করে দিতে চায়।

পুনি অবনীর দিকে তাকিয়ে গলার স্বর চড়িয়ে, বিনিয়ে বিনিয়ে সোৎসাহে বলছিল—এতদিন মেয়েটা কি কান্নাটাই কেঁদেছে বাবু! খেতে চায় না, ভিক্ষে করতে চায় না। ভিক্ষে করবে কি? লোক দেখলেই ঠকঠক করে কাঁপে।

ঘটনাটা সহ্য হচ্ছিল না অবনীর। ক্ষুধাহত একটা সংসারের প্রাণ সব বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যেও কেমন ছলেবলে আবার সরল হবার চেষ্টা করছে। পুনি কেওটানীর কথার চিকিৎসাগুণে বিপিন একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। টুনার মাথাটা পুনি কেওটানীর কাঁধের ওপর হেলে পড়েছে—বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। টুনার মা হঠাৎ ঘোমটা টেনে দিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে সেই রঙ্গিণী মূর্তিটার সব চটুলতা মুছে গিয়ে গভীর বিষণ্ণতায় করুণ হয়ে উঠেছে। এক দুঃখিনী গ্রাম্য বধূর মূর্তি।

টুনার মা ঘোমটা আর একটু টেনে দিল, সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটা যেন অদ্ভুত ভাবে বদলে গেল। অবনী দেখলো, টুনার মা কাঁদছে—দীর্ঘ অদর্শনের পর স্বামীকে দেখে সব গেঁয়ো মেয়ে যেভাবে আনন্দে ও অভিমানে কাঁদে।

অবনী বললো—আমি চললাম বিপিন। এখানে পথে দাঁড়িয়ে হৈচৈ করো না। আমার বাসায় এস তোমরা।

শোনা গেল, পুনি কেওটানী বল্‌ছে—হাঁ তাই ভাল। চল বৌ, ওঠ বিপিন...।

অবনী একটু বিরক্তভাবেই অরুণাকে বলছিল—এসব ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই অরুণা। চিঠিতে শিশিরবাবু অনুরোধ করেছে, তাই একটু খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিপিন সমস্যাকে যত সোজা ভেবেছিলাম, দেখছি মোটেই তা নয়। অন্তত আমার বুদ্ধি কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

অরুণা।—সমস্যাটা কিসের?

অরুণার প্রশ্নের উত্তরে সমস্যাটা ততক্ষণে সশরীরে বাইরের বারান্দায় এসে উঠে দাঁড়িয়েছে। পুনি কেওটানী ডাকছিল।—বাবু, আমরা এসেছি।

সমস্যাটাকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছিল সবাই—অরুণা জোছু পিসিমা। পুনির আহ্বান শুনতে পেয়ে সবাই এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। পুনি উত্তেজিতভাবে চীৎকার করছিল—আপনি মীমাংসা করে দিন বাবু। এদের দু'জনারই মাথা খারাপ হয়েছে।

অরুণা জিজ্ঞেসা করলো—কি হয়েছে?

পুনি।—ছেলেকে নিতে চাইছে না মা। না ছেলের বাপ, না, ছেলের মা।

অরুণা টুনার মায়ের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—কি গো, তুমি এরকম

করছো কেন? এইবার ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে নাও, বুড়ি আর কতদিন পুষবে?

অরুণার কথায় টুনার মা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

পুনি টুনাকে কোল থেকে নামিয়ে বারান্দায় মেঝের ওপর শুইয়ে দিল। পিসিমা ও জোছু একটা আর্তনাদ করে সরে এল।—ইস, এ ছেলে কি বাঁচবে?

অবনী ধৈর্য হারিয়ে বিপিনকে ধমক দিল—তুমি স্টুপিড এতদিন ছেলের জন্য হাঁউমাউ করছিলে, এখন ছেলেকে নিতে চাইছ না কেন?

বিপিন ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

পুনি কেওটানী বললো—আপনি সাক্ষী থাকুন মা, এদের ছেলেকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি চললাম।

পুনি কেওটানী চলে যাচ্ছিল। অবনী ব্যস্ত হয়ে ডাকতে যাচ্ছিল। অরুণা বাধা দিয়ে বললো—ওকে আবার কেন?

অবনী।—ওর টাকা পাওনা আছে। তের টাকা ধার দিয়ে টুনাকে বন্ধক নিয়েছিল।

অরুণা।—ও-বুড়িকে দেখলে কেমন ভয় করে। যদি টাকা চাইতে আসে, তবে দিয়ে দেওয়া যাবে। ও চলে যাক, ডেক না।

পুনি কেওটানী ততক্ষণ অনেক দূর চলে গিয়েছিল। অবনী সেই দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো—যেন পালিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। অদ্ভুত!

সবচেয়ে আগে আর্তনাদ করলেন পিসিমা, তাঁরই চোখে দৃশ্যটা সবার আগে ধরা পড়েছে। টুনার শরীরটা শুধু পড়েছিল মেঝের ওপর। কিন্তু টুনা আর ছিল না। নিষ্প্রাণ টুনার শব মাত্র এক হাত জায়গার পবিত্রতাকে আবর্জনার মত কলঙ্কিত করে স্থির হয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পিসিমা স্নান করতে চলে গেলেন। অরুণা অবনী আর জোছু—তিনটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট মূর্তি চুপ করে ঘরের ভেতর গিয়ে বসে রইল।

আলো জ্বালবার পর অরুণা প্রথম কথা বললো—ওরা সবাই চলে গেল নাকি?

অবনী।—আমাকে আর ওসব প্রশ্ন করো না।

অরুণা।—কিন্তু শিশিরবাবু যে লিখলেন...।

অবনী।—চেষ্টা করে দেখ, আমাকে আর এর মধ্যে ডেক না।

অরুণা যেন একটু ঠাট্টা করলো—তুমিও হাঁপিয়ে পড়ছো দেখছি।

অবনী।—তুমি তো তাজা আছ। আমার হাঁপানি একটু লাঘব করার চেষ্টা করতে পার কি?

অরুণা উঠে গিয়ে একবার বারান্দার দিকে উঁকি দিয়ে এল—না, ওরা যায়নি। দুজনে দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে দুকোণে বসে আছে।

অবনী।—থাক, ওদের ব্যাপার নিয়ে আর......

অরুণা আশ্চর্য হলো। অবনী যেন এই ক্লিন্ন আবহাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটা পরিচ্ছন্ন নিঃশ্বাস খুঁজছে, দূরে সরে থাকতে চাইছে। সত্যিই কি হাঁপিয়ে পড়লো অবনী?

অরুণা।—তুমি এরকম উপেক্ষা দেখাচ্ছ কেন?

অবনী।—উপেক্ষা নয়, তোমাদের ওপর রাগ হচ্ছে।

অরুণা।—কেন?

অবনী হাসলো।—তুমি জান, কত রকম কাজের দাবিতে আমি এমনিতেই পাগল হয়ে আছি। তার ওপর, দাম্পত্য প্রেমতত্ত্ব বিরহতত্ত্ব—এই সব হোম পলিটিক্সের মধ্যে মাথা ঘামাবার সুযোগ কই আমার? তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে একটু হাল্কা করে দিতে পার অরুণা। তোমার উচিত ছিল...।

অরুণা।—হোম পলিটিক্সের ভার নেওয়া।

অবনী।—হ্যাঁ।

অরুণা।—তবে শিশিরবাবুকে চিঠি লিখে দাও, চলে আসুক।

অবনী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—শিশিরবাবুকে? কেন?

অরুণা গুছিয়ে কোন উত্তর দিতে পারলো না।

—কেন? দ্বিতীয়বার অবনীর প্রশ্নে সচকিত হয়ে অরুণা উত্তর দিল।—ইন্দ্র কি আর এদিকে আসবে না?

অবনী।—তুমি আরও গোলমাল করে দিচ্ছ। কথা এড়িয়ে যাচ্ছ।

অরুণা।—বিপিন আবার চলে না যায়।

অবনী।—যাক চলে। তুমি বারবার ফাঁকি দিচ্ছ অরুণা।

অরুণা।—চলে গেলে কি করে হবে?

অবনী।—সৎকার সমিতিকে খবর দিয়ে দেব সকালবেলা, মড়া তুলে নিয়ে যাবে।

অরুণা।—এর বেশি আর কিছু করবার নেই?

অবনী।—আর কি করবার আছে?

অরুণা।—থাক এসব কথা।

অবনী কাগজপত্র টেনে নিয়ে বসলো। অরুণা হেঁশেলে ঢুকবার আগে পিসিমার ঘরে উঁকি দিয়ে গেল—পিসিমা মালা জপছেন। পড়ার ঘরে উঁকি দিল—জোছু একটা খোলা বইয়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কোন সাড়া-শব্দ না করে অরুণা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কি কারণে যেন খুব খুশি দেখাচ্ছিল অরুণাকে। তার কল্পনার সীমানা ঘিরে কতগুলি কর্তব্য ভিড় করে আসছে। এই দায় তাকে তুলে নিতে হবে। অবনী অবনীর মত কাজে থাকুক—সেখানে এগিয়ে যাবার মত সামর্থ্য নেই তার। কিন্তু অরুণা অরুণার মত নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পারে। এই প্রেরণা তার অনুভব ছাপিয়ে যেন নেমে আসছে। শিশিরবাবু লিখেছেন—বিপিন তার বউ ফিরে পেলে সে খুশি হবে। কেন খুশি হবে শিশির? যাক, এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। বিপিনের ভাঙা ঘর জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শিশিরের অনুরোধ।

কতক্ষণ এভাবে আবিষ্টের মত বসেছিল, রাত কত গভীর হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেনি অরুণা। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অবনীর কাছে এসে বললো—ওরা চলে গেল কি না, একবার দেখ তো?

অনিচ্ছা থাকলেও অরুণার সঙ্গেই আলো হাতে বাইরের দরজা খুলে অবনী এসে দাঁড়ালো। অবনী বললো—ওরা চলে গেছে।

অরুণা বলে উঠলো—না, ওরা যায়নি। বিপিন!

অরুণার ডাক শুনে বারান্দার এক কোণ থেকে ধড়ফড় করে একটা শায়িত মূর্তি উঠে বসলো। আলোটা তুলে ধরলো অবনী। টুনার মা লজ্জায় বিব্রত হয়ে ঘোমটা টেনে দিল। তারই পাশে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল বিপিন। আর এক পাশে টুনার মায়ের আঁচলটা মাটিতে পাতা—তার ওপর টুনার শবটা যেন একটা সযত্ন আশ্রয়ে কুঁকড়ে রয়েছে।

বীভৎস! মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবনী ঘরে এসে ঢুকলো।

অরুণার মুখের ওপর এটা সুগভীর আনন্দের চাঞ্চল্য সুস্মিত হয়ে উঠেছিল। অরুণার ব্যস্ততা আরও বেড়ে গেল। অবনীর পেছু পেছু ঘরে ঢুকেই বললো—নাও, আর পড়তে হবে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়।

যুদ্ধ ইনফ্লেশন আর ঘুষখোর আমলা—তিন স্পর্শমণির ছোঁয়ায় মুনাফাবাজের কাছে সোনার ফেরদৌস হয়ে উঠলো কচুরিপানার বাংলাদেশ। বাঙালীর জীর্ণ মুণ্ডে যেন প্রচণ্ড এক জিজিয়া বসাবার ফরমান পেয়েছে তারা। সদরে, মফঃস্বলে, রাজধানীতে—খালের মুখে, মাঠের

ওপর, গাছের তলায়—মৃত নিরন্নের মুণ্ডগুলি গুণতে পারলে এই অতিলোভী হিংসার একটা হিসাব দাঁড় করানো যেত।

তবু ব্যাঙ্কার কালীকিংকরবাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত অদ্ভুতভাবে দেখা দিয়েছে। ঘুমের আবেশে যখন চোখের পাতা নরম করে আনে, তখনই হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসেন। ঘন ঘন স্মেলিং সল্ট শুঁকে অবসন্ন মস্তিষ্কটাকে চাঙ্গা করে তোলেন। মাঝ রাত্রে সুপ্তিশয়ান থেকেও হঠাৎ চমকে জেগে ওঠেন। চোখে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিয়ে. টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা টিপে দেরাজ থেকে ফাইল টেনে নিয়ে বসেন। অদৃশ্য রত্নপীঠের প্রহরী কোন যখের সমস্ত শঙ্কা নিষ্ঠা ও সংশয়ের দায় যেন হঠাৎ তাঁরই স্কন্ধে এসে চেপেছে। তাই প্রতি মুহূর্তে উদ্ব্যস্ত হয়ে থাকেন। হারাই হারাই সদা ভয় হয়—ঘুমিয়ে পড়লে যেন একেবারে অসহায় হয়ে পড়বেন কালীকিংকরবাবু। সেই সুষুপ্ত কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা খণ্ডবিপ্লব হয়ে যেতে পারে। জেগে উঠেই হয়তো শুনবেন, আহিরীটোলার চালের ভাঁড়ার লুঠ হয়ে গেছে। অবনী নামে একটা কুৎসিত কালো ছায়া, তার পেছনে একটা কঙ্কালের পল্টন। ঘুষ অনুরোধ তোষামোদ ভীতি মৃত্যু তুচ্ছ করে তারা চালের ভাঁড়ারের ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে। দারোয়ানেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, ফোন করলে পুলিস আসে না, চিৎকার করে ডাকলে প্রতিবেশীরা কেউ সাড়া দিয়ে ছুটে আসে না। চালের ভাঁড়ার লুঠ হয়ে যায়। হায় হায়! বস্তা বস্তা সোনা যেন ছিঁড়েকুড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় মেঠো ইঁদুরের দল। ফাইলের ওপরেই ঝিমোতে ঝিমোতে আবার চমকে ওঠেন কালীকিংকরবাবু। ঘন ঘন স্মেলিং সল্ট শুঁকতে থাকেন।

ছ' মাসে দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার পিটেছেন। বাকি স্টকটাকে কোনমতে সেই চরম দরের দিনটা পর্যন্ত যদি বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবে? উগ্র রকমের একটা আনন্দের জ্বালায় ছটফট করে ওঠেন কালীকিংকরবাবু। রেডি রেকনার খুলে পেন্সিল হাতে তখুনি কাগজের ওপর শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত কত দাঁড়াতে পারে? পাঁচশো পার্সেন্ট? ছ'শো? আটশো? হাজার পার্সেন্ট হওয়া কি নিতান্তই অসম্ভব? ভগবান সকলকেই জীবনে ঠিক একটিবারের মত সত্যই সুযোগ দেন। যে মূর্খ সেই সুযোগ অবহেলা করলো, ইহকালের সুখের কপাটে বেড়ি পড়ে গেল তার। নইলে এই উনিশ বছর ধরে সুদ-চাটা ব্যাঙ্কারজীবনে শুধু দিনের পর দিন তাঁর শ্রম শক্তি মেধা বৃথা ক্ষয় হয়ে গেছে। পরধন পোদ্দারীর এই কীর্তিপথের শেষে শুধু একটা লালবাতির আলো অবধারিত পরিণামের মত এতদিন শিখায়িত হয়েছিল। তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কালীকিংকরবাবু। তিনি জানতেন—ব্যাঙ্ক ডুববে, নিজে দেউলে হবেন। এই তো সেদিন, গত বছর এপ্রিল মাসেই ব্যালেন্স সীটের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন কালীকিংকরবাবু। আজও সেকথা ভাল করেই তাঁর স্মরণে আছে। তাই আজ তাঁর সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে—ভগবান মাত্র একবার সুযোগ দেন, এবং সেই সুযোগ এসেছে।

এই ভগবত বিধানের বিরুদ্ধেই অবনী নামে একটি ভূঁইফোঁড় জাতি-সেবক ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। তাই কি বার বার কালীকিংকরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়?

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে গিয়ে প্রতিদিনের মত কালীকিংকরবাবু ভাবছিলেন, হিসেব করছিলেন, চিঠি লিখছিলেন। দারোয়ানের সংখ্যা আর কতই বা বাড়ানো যায়? একটা গোলমাল বাধলে তারাই বা কতটুকু করতে পারবে? মাঝখান থেকে বৃথা ভরসা দিয়ে সিতা কোত্থেকে আর একটা রগচটা লোক নিয়ে এল। চেকগুলো ফেলে রেখে তিরিক্ষে হয়ে চলে গেল ইন্দ্রনাথ। লোকটা নিশ্চয় এতক্ষণে অবনীনাথের কানে সব বৃত্তান্ত শুনিয়েছে। অবনীও এতক্ষণে বোধ হয় অহংকারে আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বেশ আছে স্বরূপরাম। তার ইস্ক্রুপের কারখানায় অবনীর চেলাচামুণ্ডারা স্ট্রাইক

বাধাবার চেষ্টা করেছিল। সিতার জাগৃতি সঙ্ঘের ছোঁড়ারা নাকি লাল ঝাণ্ডা দুলিয়ে আর কুলির সর্দারগুলোকে বিনি পয়সায় তাড়ি খাইয়ে সিচুয়েশন বাগিয়ে ফেলেছে। অবনীর চেলাদের বদমাইসী ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ছোঁড়ারা বাহাদুর বটে। এর জন্য কত আর খরচ করেছে স্বরূপরাম?

গুরুদয়ালবাবুও ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে গলাগলি হয়ে চুটিয়ে কারবার করছেন। বেশ আছে সবাই।

চা-পানের পর এই প্রশ্নটাই তাঁর চিন্তার ভেতর গুনগুন করে ঘুরতে লাগলো। সবাই বেশ আছে। গুরুদয়াল আছে, স্বরূপরাম আছে। আর, আরও কত ভাগ্যবান রয়েছেন। কিন্তু শুধু তাঁরই বেলায় এই সঙ্কটের দুর্ভোগ কেন?

চিন্তা করছিলেন কালীকিংকরবাবু। চিন্তায় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। হঠাৎ যেন এতদিনের একটা বদ্ধদৃষ্টি খুলে গেল কালীকিংকরবাবুর। বর্তমানের ভুলটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন—দেখে অনুতপ্ত হচ্ছেন। ভবিষ্যতের পথটাও সেই সঙ্গে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—দেখে খুশি হচ্ছেন।

জাগৃতি সঙ্ঘের ওপর হঠাৎ একটা মমতার আবেশে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন কালীকিংকরবাবু। এতদিন তাদের ভুল বুঝে কত কটূক্তি করেছেন, তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন—আজ নিজেকে সত্যই অপরাধী মনে করছিলেন তিনি। আজ তাঁর সেই সংশয়টি চরমভাবে ঘুচে গেছে। জাতীয়তা নামে কথাটার মধ্যে কোন জোর নেই, ভরসা নেই, প্রশ্রয় নেই। কংগ্রেস নামে প্রতিষ্ঠানটা আগে তবু একরকম ছিল। কিন্তু দিনে দিনে ওর মধ্যে বিষ ঢুকতে আরম্ভ করেছে। অবনীর মত লোকগুলিই ওর মধ্যে বেশী প্রশ্রয় পাচ্ছে। ওরা শুধু মুখে জাতীয়তার বুলি বলে, কিন্তু কাজের বেলায় চাষা ক্ষেপিয়ে জাতির জমিদারদের সায়েস্তা করতে চায়। সুযোগ পেলেই জাতিসেবার নাম করে মজুর উস্কিয়ে জাতির কারখানা আর কারবারের ওপর উপদ্রব করতে আসে।

জাতি কথাটার ওপর ভয়ানক ঘৃণা বোধ করছিলেন কালীকিংকরবাবু। একটা আদ্যিকেলে ছেঁদো বুলি। তার চেয়ে জন কথাটা ঢের সুন্দর, বেশ ছোট্টখাট্ট নতুন নামটি। বেশ প্রগ্রেসিভ। জাতীয়তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। অবনীর মত কংগ্রেসানুচর দুর্বৃত্তের মুখেও জাতীয়তার ধ্বনি। কংগ্রেস রথের লাগাম আর ভদ্রলোকের হাতে নেই—যত চাষা-ভূষো আর জেলফেরত হাভাতে বেকার গ্র্যাজুয়েটের হাতে পড়ে এই কংগ্রেসটাই দেশে সর্বনাশ ডেকে আনবে।

উদ্ধারের একটি মাত্র পথ আছে। স্বরূপরাম ও গুরুদয়ালবাবু যেভাবে উদ্ধার পেয়েছেন। কালীকিংকরবাবু ঠিক করলেন, তিনি জনতাবাদী হয়ে যাবেন, তিনি কম্যুনিস্ট হবেন। অবনীর জাতীয়তা থেকে বাঁচতে হলে জাগৃতি সঙ্ঘের জনতার সঙ্গে এক হয়ে না দাঁড়ালে আর উপায় নেই।

জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির নাম আজই বদলে দিতে হবে। আর দেরি করার সময় নেই। এবার থেকে নাম হবে জনবাণিজ্য সেবক সমিতি—কত শ্রুতিমধুর এই নতুন নাম! আজই সমিতির সভ্যদের সাধারণ সভা আহ্বান করবেন কালীকিংকরবাবু। আজই তাঁরা একযোগে জাগৃতি সঙ্ঘের সদস্য হবেন।

জনবাণিজ্য সেবক সমিতি! কথাটা আবিষ্কার, না তাঁর অন্তরের একটা উপলব্ধি? নিজেকেই শতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন কালীকিংকরবাবু। আশ্চর্য, আজ শুধু ভগবানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। তাঁর আহিরীটোলার গুদামের চাল আর কয়েকটি ঘণ্টা পরে জনতার খাদ্যে পরিণত হয়ে যাবে, অথচ সব কিছু তাঁরই রইল। নামের গুণ। আশ্চর্য।

একটা চিঠি লিখে শেষ করেই মুখ তুললেন কালীকিংকরবাবু। ঘরে ঢুকলো সিতা, সঙ্গে জয়ন্ত মজুমদার।

উপলব্ধি ও ঘটনার এই যোগাযোগ দেখে কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে ও আনন্দে শুধু

অভিভূত হয়ে রইলেন কালীকিংকরবাবু। ভগবানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল।

সিতা বললো—সেদিন আপনি নিশ্চয় আমার ওপর খুব রাগ করেছিলেন মেসোমশাই।

কালীকিংকরবাবু।—একটুও না।

সিতা।—আমারই ভুল হয়েছিল মেসোমশাই। ইন্দ্রনাথকে ডাকা উচিত হয়নি।

কালীকিংকরবাবু।—ঠেকে শেখা গেল। এই একটা লাভ। যাক অন্য একটা কাজের কথা ছিল।

একটু থেমে নিয়ে উৎফুল্লভাবে হাসতে হাসতে কালীকিংকরবাবু বললেন—ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, যাঁর সঙ্গে এই কাজের কথাটা ছিল, যাঁর কাছে কিছুক্ষণ আগেই চিঠি লিখছিলাম, তিনি আজ নিজেই অভাবিতভাবে এখানে উপস্থিত। আমার সৌভাগ্য দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

জয়ন্ত।—আমার কথা বলছেন?

কালীকিংকরবাবু।—হ্যাঁ।

জয়ন্ত।—বলুন।

কালীকিংকরবাবু।—জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির জাতীয়তা আজ থেকে বাতিল করে দেব, এ বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই।

জয়ন্ত।—যথাসাধ্য করবো।

কালীকিংকরবাবু।—জাগৃতি সঙ্ঘের আইডিয়লজিকে আমরাও পালন করতে পারি কি না, সেই সুযোগ আমাদের নিতে হবে।

জয়ন্ত।—বলুন, কি করতে হবে।

কালীকিংকরবাবু।—আমরাও আপনাদের সঙ্ঘের সদস্য হব। দেশের লোকের জাতীয়তার স্বরূপ খুব চিনেছি। পেট ভরে গেছে আমাদের। ঐ ছেঁদো কথাটির ওপর আর আমাদের কোন শ্রদ্ধা বা আগ্রহ নেই।

জয়ন্ত সস্মিত মুখে একবার সিতার দিকে তাকালো। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো—বাস্তবিক, কী আশ্চর্য যোগাযোগ! ওঁর কাছে আমি সবই শুনেছি। আপনার ঘরে ঢুকবার আগের মুহূর্তেও ওঁকে বলেছি, ঐ জাতীয়-ফাতীয় কথাগুলি বাদ দিলেই আমাদের সঙ্ঘে আপনারা বিনা বাধায় চলে আসতে পারেন। দেখছি, আপনি নিজেই আগে সেটা বুঝেছেন। আসুন আমাদের সঙ্ঘে। আপনাদের জনবাণিজ্য সমিতির ভেতর দিয়েই আমরা আর একটা ফ্রন্ট খুলবো।

কালীকিংকরবাবু চায়ের জন্য বয়গুলিকে ডাকাডাকি করছিলেন। অদ্ভুত রকমের একটা স্ফূর্তিতে তাঁর চিন্তাপীড়িত মনটা লঘু হয়ে উঠেছিল। এ রকম স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ বহুদিন পাননি তিনি—অথবা জীবনে এই প্রথম। হাস্যালাপের ফাঁকে ফাঁকে তবু এক একবার অন্যমনস্কের মত সিতার দিকে তাকাচ্ছিলেন, এটাও যেন একটি প্রশ্ন।

কালীকিংকরবাবু আশা করছিলেন, সিতাই কথাটা তুলবে এবং সেই কথার একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে তিনি চূড়ান্তভাবে আশ্বস্ত হতে পারেন। তারপর সত্যই তিনি সুখী।

সিতা হয়তো ভুলে গেছে। অগত্যা কালীকিংকরবাবু নিজেই উত্থাপন করার চেষ্টা করলেন।—আপনি নিশ্চয় জানেন জয়ন্তবাবু, অবনীনাথ নামে একটা ন্যাশনালিস্ট একটা দল পাকিয়েছে।

ভূমিকা শুনেই জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলে উঠলো—বুঝেছি, আর বলতে হবে না আপনাকে। অবনীর কথা ভেবে আপনি মোটেই দুশ্চিন্ত হবেন না। জাগৃতি সঙ্ঘ রয়েছে কেন?

তবু যেন একটা খটকা রয়ে গেল। কালীকিংকরবাবু বললেন—আমি বলছিলাম, এমন কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না, যাতে অবনীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষের মধ্যে আদৌ আসতে না হয়?

কিরকম যেন চিবিয়ে চিবিয়ে চোয়ালটা শক্ত করে কথাগুলি বলছিলেন কালীকিংকরবাবু।

জয়ন্ত বললো—সংঘর্ষ হবেই, তার জন্য এখন থেকেই আমরা তৈরী হচ্ছি। তাই যেভাবে পারে, সঙ্ঘ আজ নিজেকে শক্তিশালী করছে। আপনাদের পেয়েও সঙ্ঘের শক্তি অনেকটা বাড়লো।

কালীকিংকরবাবু।—ধরুন, কতগুলি হাভাতে নিয়ে অবনী যদি একটা সত্যাগ্রহ করেই বসে, ঠিক তখন তার সঙ্গে সংঘর্ষ করতে গেলে...।

জয়ন্ত হেসে ফেললো।—তা'হলে আপনি কি করতে চান বলুন?

কালীকিংকরবাবু।—কিছু টাকাকড়ি দিয়ে যদি অবনীকে...।

জয়ন্ত।—কোন লাভ নেই। টাকা ও নেবে, গোলমাল করতেও ছাড়বে না। পঞ্চম বাহিনীদের স্বভাবই এই।

কালীকিংকরবাবু একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো।—তা'হলে কি কোন উপায় নেই?

জয়ন্ত বিরক্তি চাপতে গিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে কালীকিংকরবাবুর কথাগুলি একটু ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনতে লাগলো।

কালীকিংকরবাবু।—মারধর করা বা ঐরকম সাংঘাতিক কিছু করতে বলছি না। শুধু তার এই বদ উৎসাহটা ভেঙে দেওয়া যেত, তা'হলেই...।

জয়ন্ত সেই রকমই গম্ভীর থেকে বললো—এক কাজ করতে পারেন।

কালীকিংকরবাবু।—বলুন।

উত্তর দেবার আগে একবার থেমে গিয়ে জয়ন্ত সিতার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

সিতা বললো—আমার পরামর্শ শুনে ইন্দ্রবাবুর মারফত টাকা দিতে গিয়ে মেসোমশাই অনর্থক একবার নাকাল হয়েছিলেন। তুমি আবার সেইরকম একটা কিছু করতে বলো না। যা বলবে, তাতে যেন কাজ হয়।

কিছুক্ষণের মত হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল জয়ন্ত। সিতার কথাগুলিকে যেন সে সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। জয়ন্তের মুখের গাম্ভীর্যের ওপর সিতার কথাগুলি থেকে একটা নির্বিকার নিষ্ঠুরতার আঁচ লেগে ধীরে ধীরে গভীর বিষণ্নতার কালি ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। সিতাকে যেন জীবনে এই প্রথম ভয়ের চক্ষে দেখলো জয়ন্ত। কালীকিংকরবাবু উৎসুকভাবে তেমনি তাকিয়ে আছেন। জয়ন্তর হঠাৎ গা-বমি করে উঠলো। রুমালটা জলে ভিজিয়ে ঘাড় আর মুখের ওপর আস্তে আস্তে দু'চারবার বুলিয়ে নিয়ে একটু সুস্থ হয়ে নিল জয়ন্ত।

সিতা ব্যস্ত হয়ে যেন আগ্রহে ছটফট করতে লাগলো—বল, বল। সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

কালীকিংকরবাবু।—বলুন জয়ন্তবাবু।

জয়ন্ত।—অবনী যে একটি ব্যাঙ্কে কেরানিগিরি করে, সে খবর আপনি জানতেন?

কালীকিংকরবাবু।—না।

জয়ন্ত।—কাবেরী ব্যাঙ্কে কাজ করে অবনী।

কালীকিংকরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।—কাবেরী ব্যাঙ্কে? আমার বেয়াই জগৎ ভটচাযের কাবেরী ব্যাঙ্কে?

জয়ন্ত।—জগৎ ভটচায আপনার বেয়াই হন, সে খবর অবশ্য জানতাম না।

কালীকিংকরবাবু।—তা'হলে আজই আমি জগৎবাবুকে গিয়ে একবার...।

জয়ন্ত।—জগৎবাবুকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন যে, না-জেনে কী ভয়ানক জীব তিনি মাইনে দিয়ে পুষে রেখেছেন।

কালীকিংকরবাবুর যেন তর সইছিল না।—আজই আমি নিজে গিয়ে জগৎবাবুকে তাতিয়ে দিয়ে আসছি। আজই যেন ঐ বিভীষণটাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দেন। চিরকাল এই ধরনের একটা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমরা লড়ে আসছি জয়ন্তবাবু। দুধ দিয়ে যাকেই পুষি, সেই কালসাপ হয়ে যায়—আমার চব্বিশ বছরের কারবারী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বড় দুঃখে বলছি।

জয়ন্ত।—আমি এইবার উঠবো কালীকিংকরবাবু।

কালীকিংকরবাবু বিদায়-অভ্যর্থনা সরবরাহ করতে গেট পর্যন্ত এলেন।

অন্যমনস্কের মতই গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরে বসে রইল জয়ন্ত। সিতা এল অনেকক্ষণ পরে। সিতাকে আহ্বান করতে বা সিতার ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারেনি জয়ন্ত। নিজের মনে সোজা চলে এসে গাড়িতে উঠেছে। একটা প্রকাণ্ড ওলটপালট হয়ে গেল বলতে হবে। সিতাই আজ জয়ন্তকে অনুসরণ করে পেছু পেছু হেঁটে এসে গাড়িতে বসলো। এই বোধ হয় প্রথম।

গাড়িটা ডোভার লেনের কাছাকাছি পৌঁছলো। সিতা তখনো মনের ভেতর একটা সংশয় বিস্ময় ও অপমানের জ্বালার সঙ্গে লড়ছিল। জয়ন্ত একটা কথা বলা মাত্র এই অপমানের পাল্টা আঘাত দিতে হবে—সেই সুযোগটির জন্যই যেন ধৈর্য ধরে নিজেকে সামলে রেখেছিল সিতা। নিজের এইটুকু সংযমও যেন অপমানের মত পীড়াদায়ক হয়ে উঠছিল তার কাছে। ছায়া জয়ন্ত হঠাৎ কঠিনকায় একটি ব্যক্তি হয়ে উঠলো আজ। জয়ন্তকে দু'কথা শুনিয়ে দিতেও আজ তাকে ভাবতে হচ্ছে, কোনদিন যার জন্য মুহূর্তেকও দ্বিধা করতে হয়নি।

শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত চুপ করেই রইল। এভাবে জয়ন্তকে কখনো দেখেনি সিতা, এই ধরনের শক্ত সোজা আপন-মনা জয়ন্তের সঙ্গে মেলামেশার রীতি কোনদিনও তার অভ্যাসে নেই। সিতার মনের যত উষ্মা আর মুখরতা ধৈর্যের চূড়ান্তে উঠেও হঠাৎ একটা সশঙ্ক সংকোচে একেবারে নিচে নেমে গেল।

যেন এই উদ্‌ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সিতা বলে উঠলো—অবনীনাথের বাড়াবাড়ি এইবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

জয়ন্ত যেন প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্যই ছোট একটা উত্তর দিয়ে সেরে দিল।—হুঁ।

সিতা আরও বিব্রত হয়ে উঠলো।—তুমি কি অন্য কোন কাজের কথা ভাবছো?

জয়ন্ত।—কেন জিজ্ঞেসা করছো?

সিতা।—তোমাকে খুবই অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

জয়ন্ত গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে সীটের ওপর একটু কাত হয়ে বসে স্টীয়ারিং ধরে রইল। সিতার মুখের দিকে তাকাবার কোন চেষ্টা না করেই প্রশ্ন করলো—আচ্ছা, অবনীর বাড়াবাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য তুমি হঠাৎ এত উৎসাহী হয়ে উঠলে কেন?

সিতা আশ্চর্য হলো।—এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করছো কেন? তুমিও কি উৎসাহী নও।

জয়ন্ত।—ঠিক যে-কারণে অবনীকে আমি সায়েস্তা করতে চাই, তুমিও কি সেই কারণে চাইছ?

সিতা।—নিশ্চয় ; সঙ্ঘে থাকবো অথচ সঙ্ঘের নীতি মেনে চলবো না—অন্তত আমার মধ্যে সে ভণ্ডামি পাবে না।

সিতার চোখে পড়লো, জয়ন্তর ঠোঁটের ওপর কুটিল একটা হাসি ধীরে ধীরে দীর্ঘায়ত ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিব্রত হয়ে সিতা বললো—তুমি বোধ হয় আমার কথাটা বিশ্বাস করলে না। আজ বার বার তুমি আমায় অপমান করছো। আমি ভেবে পাচ্ছি না, আজ হঠাৎ কোথা থেকে তোমার এত সাহস...।

জয়ন্ত চকিতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সিতার দিকে। জয়ন্তর চোখের কঠোর

দৃষ্টিটা সেই মুহূর্তে সিতার সব মুখরতাকে যেন গলা টিপে শান্ত করে দিল।

সিতা শান্তভাবে আবার প্রশ্ন করলো—বল, কি বলছিলে?

জয়ন্ত।—অবনীর ওপর তোমার নিজের একটা আক্রোশ আছে। জাগৃতি সঙ্ঘের নীতির সঙ্গে এই আক্রোশের কোন সম্পর্ক নেই।

সিতা।—আমার নিজের আক্রোশ? কেন? এর কোন মানে হয় না।

জয়ন্ত।—অবনী জাগৃতি সঙ্ঘের কতটুকু ক্ষতি করেছে, জাগৃতি সঙ্ঘ সে-খবর রাখে। এ ছাড়াও অবনী যেন তোমার বিশেষ একটা ক্ষতি করেছে, তার জন্যই তুমি অবনীকে ঠাণ্ডা করে দিতে চাও।

সিতার কথার প্রাচুর্য সেই নিমেষে ফুরিয়ে গেল। জয়ন্তর কথাগুলি নির্লজ্জ কৌঁসুলীর জেরার মত সিতার মনের চারদিকে একটা শক্ত বেড়ার বাঁধ দিয়ে ঘিরে ধরছিল। কথার ফাঁকে পালিয়ে যাবার কোন পথ ছিল না। সিতার স্তব্ধতার ওপর আর একটা আঘাত দিয়ে জয়ন্ত বললো—আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি সিতা। তোমাকে যেন আজ ঠিক চিনতে পারছি। শত্রুকে কিভাবে শেষ করতে হয়, সে-কৌশল আমিও জানি। তবু, তুমি যেন আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ।

—কিসে তোমায় ছাড়িয়ে গেলাম? তোমার সাহস মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে জয়ন্ত!

ধারালো ছুরির নিক্বণের মতই সিতা প্রতিবাদ করে উঠলো।

জয়ন্ত আস্তে আস্তে উত্তর দিল—নির্মমতায়।

সিতার মাথাটা ঝুঁকে পড়লো। জয়ন্ত তখনো শান্তভাবেই বলে যাচ্ছিল—তবু তোমার প্রশংসা না করে পারি না। শিশিরের জন্য তুমি সব করতে পার। অবনী শিশিরকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাই আজ অবনীকে ঠাণ্ডা করছো। কাল আর কাউকে ঠিক এমনিভাবে ঠাণ্ডা করে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না জানি।

সিতা দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠলো—চুপ কর জয়ন্ত।

জয়ন্ত।—আমার সবচেয়ে আশঙ্কা কি হচ্ছে জান? শেষ পর্যন্ত ঐ শিশিরকেই ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য তৈরী হবে তুমি। সেদিন তোমার নির্মমতা আবার কী বিচিত্ররূপে দেখা দেবে জানি না।

সিতা।—আমার ওপর বড় বেশী রাগ করছো জয়ন্ত। এত বিদ্রূপ আমি সইতে পারবো না। তোমাকে চিরদিনই...

জয়ন্ত।—আমাকে চিরদিনই তুচ্ছ আর ভয় করে এসেছ।

সিতা।—আর তুমি?

জয়ন্ত।—আমি তোমায় ভালবেসে এসেছি, তা তুমিও জান। পৃথিবীতে কোন পুরুষ বোধ হয় এভাবে ভালবাসতে পারে না। যাক ওসব কথা।

সিতা চোখ মুছে এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালো।—কিন্তু আর তোমায় ভয় করবো না জয়ন্ত।

হঠাৎ গাড়ির ব্রেক দিল জয়ন্ত। গাড়ি থেকে নেমে পড়ার আগে সিতা জিজ্ঞাসুভাবে জয়ন্তর দিকে একবার তাকালো। জয়ন্ত বললো—কিছু মনে করো না সিতা। একটা সত্য কথা বলবো আজ।

সিতা।—বল।

জয়ন্ত।—আমার কিন্তু ভয় করছে।

প্রকাশবাবুর ঘরের দরজার কড়া নাড়বার জন্য হাতটা তুলেই ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে গেল, হাত নামিয়ে নিল।

স্কুল মাস্টার আশুবাবু কৌতূহলী হয়ে চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি?

দুটি অভিযাত্রী আবিষ্কারকের মত এক রহস্যে পরিকীর্ণ গুপ্ত গুহার মুখে যেন উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু। আবার শুনতে পাওয়া গেল, ঘরের ভেতর কে যেন আকুল হয়ে বলছে—তোমাকে দেখে আমার কি মনে হয় জান রুমি?

প্রকাশবাবুর গলার স্বর। অত্যদ্ভুত এক প্রণয়নম্রতায় কথাগুলি যেন লুটিয়ে পড়ছিল। শোনা গেল, প্রকাশবাবু আবার বলছেন—তোমাকে দেখে আমার সব সময় লা পাসিয়োনারার কথা মনে পড়ে রুমি।

—কেন লজ্জা দিচ্ছ আমায়। উত্তর দিতে গিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলালের কথা আর হাসিটা অনুরাগের আবেগে যেন একটা রুমালের আড়ালে লুকোচুরি খেলতে লাগলো।

প্রকাশবাবু।—এইবার আমি নতুন করে জীবন আরম্ভ করবো উর্মিলা।

উর্মিলা।—কর।

প্রকাশবাবু।—কিন্তু আমি একা কি করে পারবো?

উর্মিলা।—ভেবে দেখ।

প্রকাশবাবু।—না, আর ভাববার কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখেছি, আমার জীবনে তোমাকে আসতেই হবে রুমি।

উর্মিলা।—মাপ করো প্রকাশ, এত সাহস আমার নেই। উর্মিলার কণ্ঠস্বর থেকে একটা সন্ত্রস্ত চাঞ্চল্যের আভাস বদ্ধঘরের বুক ভেদ করে দরজার বাইরেও যেন ছটফট করে পালিয়ে আসছিল। খুবই করুণ হয়ে শোনাচ্ছিল কথাগুলি।

প্রকাশবাবু।—তোমার সাহস নেই। আমি বিশ্বাস করতে পারি না উর্মিলা। তোমারই সাহসের প্রেরণায় আমাদের সঙ্ঘের প্রাণ দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। সবার আগে এগিয়ে চলেছ তুমি, পেছনে পার্টি আর সঙ্ঘ। তোমারই ওপর পার্টির শত শত ছেলেমেয়ের জীবনের আদর্শ নির্ভর করছে। আমাদের নতুন সংসারের মডেল তোমার মধ্যে প্রথম সার্থক হয়ে উঠবে।

হঠাৎ থেমে গেলেন প্রকাশবাবু। উর্মিলা কাঞ্জিলালও যেন নিঝুম হয়ে রয়েছে। এই নিঃশব্দতাকে সহ্য করার ধৈর্য রাখতে পারছিল না ইন্দ্রনাথ। কড়া নাড়বার জন্য আবার হাত তুলতেই প্রকাশবাবুর গলার শব্দ চমকে দিল ইন্দ্রনাথকে।—ছি ছি, তুমিও মুষড়ে পড়ছো উর্মিলা। আর কেউ নয়, তুমি! তোমাকে আমি এতদিন যেভাবে ভালবেসে, শ্রদ্ধা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে...।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল একটু শান্তভাবেই জবাব দিল—না, মুষড়ে পড়ছি না।

প্রকাশবাবু।—এত ভাবনাই বা হচ্ছে কেন তোমার?

উর্মিলা।—না ভেবে যে পারছি না প্রকাশ। সেই ভদ্রলোকটির কথা কি তুমিও একটু ভেবে দেখছো না?

প্রকাশবাবু।—কাঞ্জিলাল মশাইয়ের কথা বলছো?

উর্মিলা।—হ্যাঁ।

প্রকাশবাবু।—তোমার মত নারীর জীবনে ভদ্রলোক কতটুকু গৌরব এনে দিতে পেরেছে উর্মিলা?

উর্মিলার গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যেন সায় দিল।—বোধ হয় কিছুই নয়।

প্রকাশবাবু।—তবে? তবে এত দ্বিধা কেন উর্মিলা?

উর্মিলা।—শক্তিতে কুলোচ্ছে না প্রকাশ। কিসের দ্বিধা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

প্রকাশবাবু।—আশ্চর্য হচ্ছি উর্মিলা। তোমার মত মেয়ে একটা জীর্ণ কন্‌ভেনশনকে দূরে ঠেলে দিতে পারছে না, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল?

উর্মিলা।—ওটা সমাজেরই কন্‌ভেনশন নয় কি?

প্রকাশ।—মন্ত্রপড়া গাঁটছড়া আর সাতপাক মানে বিয়ে নয়। তুমি বিয়ে করেছিলে, একটি পুরুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে, নিজেকে বিকিয়ে দেবার জন্য নয়।

ঊর্মিলা যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠলো—না, নিজেকে বিকিয়ে দেবার জন্য নিশ্চয় নয়।

প্রকাশবাবুর উৎসাহিত গলার স্বর হঠাৎ যে প্রমত্ত গোখুরার মত ঊর্মিলার সংকোচ ও সংশয়কে চারদিক থেকে পাক দিয়ে জড়িয়ে অবশ করে ফেলবার চেষ্টা করলো।—কাঞ্জিলালমশাই তোমার স্বামী, আজ একথা বললে একটা মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আলো আর অন্ধকারের মত তোমরা দুজনে ভিন্ন। তিনি কেরানী, তাঁর জীবনের কাম্য হলো পেন্সন। তুমি জাগৃতি সঙ্ঘের অগ্রনায়িকা, তোমার কাম্য মুক্তি।

ঊর্মিলা।—আমার কোন ক্ষতি হবে না তো প্রকাশ?

প্রকাশবাবু।—ক্ষতি? তুমি আমি নতুন করে ভালবাসার ইতিহাস তৈরি করবো ঊর্মিলা। আমাদের দুজনার হৃদয় এক হয়ে পার্টির হৃদয় হয়ে যাবে। অবশ্য যদি জানতাম তুমি আমাকে এখনো...।

প্রকাশবাবু তাঁর আবেগ একটু সংযত করলেন। ঊর্মিলা হেসে ফেলে বললো—কি বলছিলে থামলে কেন?

প্রকাশবাবু।—যদি জানতাম তুমি আমাকে ভালবাসতে পারনি, তবে...।

কথার মাঝখানেই ঊর্মিলা উত্তর দিল—ভালবাসতে পেরেছি প্রকাশ। তোমাকে যেদিন দেখেছি, সেদিনই আমার বারবার থেইলমানের কথা মনে পড়ছিল।

প্রকাশবাবু ডাকলেন।—রুমি?

ঊর্মিলা।—কি প্রকাশ?

প্রকাশবাবু—এতদিন জীবনকে একটা বঞ্চিতের তপস্যার মত শুধু ভুগে ভুগে টেনে নিয়ে এসেছি ঊর্মিলা। আজ মনে হচ্ছে, সব শূন্যতা কানায় কানায় ভরে গেল। জীবনের আকাশে প্রথম রামধনুর মত তোমায় আমি পেলাম ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা।—এত তাড়াতাড়ি সঙ্ঘকে সব কথা জানিয়ে দিও না প্রকাশ।

প্রকাশবাবু আপত্তি করে উঠলেন—আবার সংকোচ কেন? এ শুনে সমস্ত সঙ্ঘ কত খুশী হবে অনুমান করতে পার? তোমার আমার বিয়ের কথা ঘোষণা করে কালই আমরা পার্টির আশীর্বাদ গ্রহণ করবো।

দরজার কড়া কর্কশ শব্দে বাজতে লাগলো। দরজা খুলে দিয়েই প্রকাশবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন—কি খবর ইন্দ্র?

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু ঘরের ভেতর গিয়ে বসতেই ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল বললো—আমি উঠি এবার প্রকাশবাবু। আপনারা আলাপ করুন।

ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল ব্যস্তভাবে চলে গেল।

টেবিলের ওপর কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে প্রকাশবাবু বললেন—তুমি বড় ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছ ইন্দ্রনাথ। সঙ্ঘের কাজে একটু গা লাগিয়ে কিছু কর এবার। নইলে...।

ইন্দ্রনাথ।—সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি।

প্রকাশবাবু চেহারাটাকে একটু কঠোর করে নিয়ে বললেন—কথাটা কি আন্তরিকভাবে ?

ইন্দ্রনাথ।—হ্যাঁ।

প্রকাশবাবু।—বেশ। এর পর আর কি বলবার আছে?

ইন্দ্রনাথ।—আপনাকে চেনবার জন্যই এতদিন ছিলাম, চেনা হয়ে গেল।

প্রকাশবাবু উত্তপ্ত হলেন—কি বলছো?

ইন্দ্রনাথ।—সুন্দর একটি আশ্রম তৈরি করেছেন প্রকাশবাবু। আশ্রম চালনার বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বও খুব ভাল করে জানেন আপনি।

প্রকাশবাবুর রুষ্ট দৃষ্টিটা শতমুখী হয়ে ইন্দ্রনাথকে বিদ্ধ করে যেন তার উদ্ধত শোণিতের আস্বাদ নেবার চেষ্টা করছিল।

ইন্দ্রনাথ তবু নির্বিকারভাবেই বলে চললো—আপনাকে আমি চিনেছি প্রকাশবাবু, এইবার আপনিও নিজেকে চিনতে শিখুন।

প্রকাশবাবু।—এই তত্ত্ব তুমি আজ আমায় শেখাতে এসেছ?

ইন্দ্রনাথ।—স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

প্রকাশবাবু—কি?

ইন্দ্রনাথ।—একবার হাতড়ে দেখুন, শিরদাঁড়াটি আছে কি না?

প্রকাশবাবু।—তুমি এবার উঠতে পার ইন্দ্র।

ইন্দ্র।—জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট করেছেন, অনেক আঘাত নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু তার ফলে আপনার মনুষ্যত্ব বলিষ্ঠ হয়নি প্রকাশবাবু। ভেতরে যে এতখানি ক্ষয় হয়ে গেছেন এতটা বুঝে উঠতে পারিনি। উর্মিলা কাঞ্জিলালকে বিয়ে করবেন, সেটা দোষের কিছু নয়। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এ রকম ব্যতিক্রম চলে আসছে। কিন্তু পাপটা কোথায় হলো জানেন? পাপ হলো ঐ ছুতোগুলি—পলিটিক্স, প্রগ্রেস ও আদর্শের ছুতো।

আশুবাবু অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ উসখুস করে বললেন—উঠুন ইন্দ্রবাবু।

প্রকাশবাবু।—আমি তো বারবার বলছি, উঠুন আপনারা। যে তত্ত্ব আপনাদের বুদ্ধির ধাতে সইবে না, তা নিয়ে বৃথা কথা খরচ করবেন না।

আশুবাবু উষ্মা বোধ করলেন—তত্ত্বটা যে আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে বলতে পারলেন না মশাই। তা হলে নয় একবার বুঝতে চেষ্টা করতাম।

প্রকাশবাবু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ঠোঁট কুঞ্চিত করলেন—নানা দেশের সাম্যবাদী পার্টির ইতিহাসের পাতাগুলি একবার উল্টে দেখবেন।

ইন্দ্রনাথ হেসে ফেললো। আশুবাবু শান্তভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন—একটা পাতা সামনেই খোলা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। দেখছি টালির নালার জল, আপনি বলছেন ব্রহ্মাকমণ্ডলু নিঃসৃত বারিধারা।

প্রকাশবাবু।—এর অর্থ আপনার দৃষ্টিটা নোংরা হয়ে গেছে। যা দেখছেন তা-ই নোংরা মনে হচ্ছে।

আশুবাবু।—কিন্তু মশাইরা যে একেবারে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। নইলে দেখতে পেতেন যে, আপনাদের কম্যুনিস্ট পার্টির পার্টিত্ব হয়তো আছে, কিন্তু কম্যুনিজ্‌ম্ নেই।

প্রকাশবাবু।—কি বললেন? কি নেই?

আশুবাবু।—কম্যুনিজ্‌ম্ নেই। যেমন জার্মান সিলভারে জার্মানত্ব আছে, কিন্তু সিলভারত্ব নেই। আরও উপমা যদি শুনতে চান তবে বলি...

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবুর সৌজন্যহীন বিদ্রূপ প্রশ্ন আর উত্তরের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েও চেষ্টা করে যেন নিজেকে একটু সংযত করলেন প্রকাশবাবু। একটু ইতস্তত করে আস্তে আস্তে বললেন—কি এমন ব্যাপার হলো যে তুমিও আজ নিঃসংকোচে আমায় অপমান করছো ইন্দ্রনাথ?

ইন্দ্রনাথের মনের ভেতরটা হঠাৎ বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। তারই আবাল্য শ্রদ্ধায় লালিত একটা মূর্তি যেন তারই হাতের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে অভিমানে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রকাশবাবু তেমনি নিষ্প্রভ চোখে শঙ্কাতুর দৃষ্টি দিয়ে ইন্দ্রনাথকে দেখছিল। আশুবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন।

ইন্দ্রনাথ বললো—আপনাকে অপমান করলাম প্রকাশবাবু, এটা আমার জীবনের প্রথম শাস্তি। এক-দিন আপনার আদেশ নিঃসংশয়ে মেনে চলেছি। কিন্তু আপনি ফুরিয়ে গেছেন, কাজেই আমার একটা ভরসাই ফুরিয়ে গেছে। আপনি থেমে গেছেন, আপনি শ্রান্ত। আপনি নিরুপদ্রব জীবন খুঁজছেন। পলিটিক্স করার শক্তি যোগ্যতা আর উৎসাহ নেই আপনার। কিন্তু পলিটিক্সের অভিমান আপনার অভ্যাসে মিশে আছে। তাই এমন একটি পলিটিক্স খুঁজছিলেন, যার মধ্যে কাজ নেই, ত্যাগ নেই, সংগ্রাম নেই। আপনার এই ব্যর্থতাকে মনভোলানো সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন জাগৃতি সঙ্ঘ নামে সঙ্ঘটি গড়ে তুলেছেন।

ইন্দ্রনাথের অভিযোগের আবর্তের মধ্যে যেন অসহায়ের মত ভাসছিলেন প্রকাশবাবু। কোন সাড়া দিচ্ছিলেন না।

ইন্দ্রনাথ বললো—সবচেয়ে দুঃখের বিষয় কি হলো জানেন প্রকাশবাবু? কাজকে ফাঁকি দিতে গিয়ে আপনারা পার্টিকে একটা বাবাজীর আখড়া করে ফেললেন। ধর্মের ভড়ং দিয়ে আখড়ার ব্যবসাটা বড় পুরনো হয়ে গেছে। পলিটিক্সের ভড়ং থাকলে আখড়ার ব্যবসা আজকাল বেশ তাড়াতাড়ি জমে ওঠে। দুর্ভাগ্য আপনার, শেষে এই ব্যবসা ধরলেন। এখন এই গলদকে ঢাকবার জন্য একে একে শুধু নতুন ফাঁকির আশ্রয় নিতে হবে। এইভাবে কোথায় গিয়ে শেষে ঠেকবেন কে জানে। আমার শেষ অনুরোধ প্রকাশবাবু, এই আখড়াই প্যাটার্নটি ভেঙে ফেলুন! নইলে একটা নষ্টামির আশ্রয় হয়ে উঠবে আপনার পার্টি আর সঙ্ঘ।

প্রকাশবাবু হঠাৎ তাঁর মৌনতা ভেঙে একটু ক্লান্তভাবেই বললেন—অনেকদূর এগিয়ে গেছি, আর ফেরা যায় না।

সূক্ষ্ম একটা আশাভরা ইঙ্গিতের নিশানা পেয়ে যেন ইন্দ্রনাথ আগ্রহে বলে উঠলো—কেন ফেরা যাবে না প্রকাশবাবু? নিশ্চয় ফেরা যাবে। আপনি শুধু একবার...।

প্রকাশবাবু মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে সপ্রতিভভাবে বললেন—কী আবোল-তাবোল বকছো? আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

আশুবাবুর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললো—চলুন আশুবাবু।

ঘর ছেড়ে প্রকাশবাবুর বাসার বাইরে পথের ওপর পৌছে আশুবাবু প্রথম কথা বললেন—কোন দিকে যাবেন ইন্দ্রবাবু?

অন্যমনস্কভাবেই ইন্দ্র উত্তর দিল—যাবার আর কোন পথ নেই।

আশুবাবু সন্দিগ্ধভাবে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রচ্ছন্ন কোন বেদনার জ্বালায় যেন ইন্দ্রনাথের মুখটা পুড়ে যাচ্ছে। কোন প্রিয় আত্মীয়ের চিতাবহ্নি নিভিয়ে যেন এই মাত্র চলে আসছে ইন্দ্রনাথ। সেই শোকের আগুনের আঁচ লেগে মুখটা কালো হয়ে আছে।

আশুবাবু আস্তে আস্তে ডাকলেন—শুনছেন ইন্দ্রবাবু? আপনি অবনীনাথের সঙ্গে একবার দেখা করুন।

ইন্দ্রনাথ।—সেখানে যাবার সামর্থ্য নেই আশুবাবু।

আশুবাবু যেন একটু অনুযোগ করলেন—কেন ছেলেমানুষি করছেন ইন্দ্রবাবু? পুরনো কথা নিয়ে মন ভার করে রাখবেন না। মন খারাপ করবেন না।

সাদাসিধে শান্তদর্শন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ জিজ্ঞাসুভাবে এগিয়ে এলেন—এটাই কি আটাশ নম্বর?

আশুবাবু—কাকে খুঁজছেন আপনি?

আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন—অটাম স্কুল অব পলিটিক্সের অফিস কি এইটা?

আশুবাবু উত্তর দিলেন—না, এটা প্রকাশ সরকারের বাসা।

আগন্তুক ভদ্রলোক উৎফুল্লভাবে বললেন—হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজছিলাম। তিনি হলেন ঐ

স্কুলের অধ্যক্ষ।

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু দু'জনেই বিস্মিতভাবে ভদ্রলোকের কথাগুলির মর্মার্থ বুঝবার চেষ্টা করছিল। ভদ্রলোক নিজে থেকেই একটু হৃদ্যতার স্বরে বললেন—আমার স্ত্রীও এই স্কুলের টীচার।

ভদ্রলোকের আলাপের রীতির মধ্যে একটা মফঃস্বলসুলভ সঙ্গপ্রিয়তার আভাষ ছিল। ইন্দ্রনাথ তাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আপনার নাম?

ভদ্রলোক—দ্বিজেন কাঞ্জিলাল।

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য একটা বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে রইল। দ্বিজেন কাঞ্জিলালের তখন আলাপের সূত্রটাকে ভাল করে ধরে কথা বিস্তার করে চলেছিলেন।—আমি আসছি পাবনা থেকে। পাবনা আমার বাড়ি নয়, চাকরির জন্যই সেখানে থাকি।

আশুবাবু।—আর আপনার স্ত্রী?

দ্বিজেনবাবু।—উনি আছেন কলকাতায়, এই স্কুলে টীচারী করেন।

ইন্দ্রনাথ।—আপনি কলকাতায় হঠাৎ...!

দ্বিজেনবাবু।—হ্যাঁ, হঠাৎ চলে এসেছি ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ; মেয়েটির গলায় একটা টিউমারের মত হয়েছে, অপারেশন করাতে হবে। বড় বিব্রত বোধ করছি মশাই। বাপ করবে চাকরি, মা করবে চাকরি—উদরান্নের দাবি মেটাতে গিয়ে আমরা দু'জনাই উদ্ব্যস্ত, এ দিকে মেয়েটার অবস্থা কাহিল। তারপর, উনি পড়ে রয়েছেন বিদেশে। হ্যাঁ আপনারা ওঁর নাম শুনে থাকতে পারেন...।

দ্বিজেনবাবু একটু সতর্কভাবে গলার স্বর নামিয়ে বললেন—উনি দেশের কাজে জেল খেটেছেন একবার, ওঁর নাম ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল। নাম শুনেছেন বোধ হয়?

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু বিমর্ষভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ শুনেছি।

দ্বিজেনবাবু কৃতার্থভাবে বললেন—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে বড় উপকৃত হলাম মশাই। এবার আসি। দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, শুনেই তো মেয়ের মা আঁৎকে উঠবেন! কতদিক সামলাই বলুন! সংসারধর্ম সত্যিই এক ল্যাঠা। বড় বিব্রত বোধ করছি মশাই।

নমস্কার জানিয়ে দ্বিজেনবাবু প্রকাশবাবুর বাসার ভেতর ঢুকলেন। আশুবাবু সেইদিকে তাকিয়ে যেন একটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন।—আর সহ্য হচ্ছে না ইন্দ্রবাবু। চলুন, আর এখানে নয়।

ইন্দ্রনাথ বললো—ভদ্রলোককে ডেকে বরং বলে দিন যে, ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল মারা গেছেন।

আশুবাবু।—থাক ওসব কথা, শীগগির চলুন এখানে থেকে, মাথা ঘুরছে আমার।

পিসিমা মালা জপছিলেন। অরুণা এসে বললো—শিশিরবাবুকে চলে আসতে খবর পাঠালাম পিসিমা।

পিসিমা খুসী হয়ে সমর্থন জানালেন।—ভাল করেছ। জ্বর-জ্বালা নিয়ে কোথায় যে পড়ে রয়েছে, আহা! বড় ভাল ছেলেটি!

অরুণা।—ইন্দ্রকেও চিঠি দিলাম, যেন একবার দেখা করতে আসে।

পিসিমা নিরুত্তর রইলেন। পিসিমা ইন্দ্রকে চেনেন না।

অরুণা যেন মনে মনে বিচিত্র এক দৌত্যের দায় তুলে নিয়েছে। কদিন থেকে অরুণার আচরণ একটা নতুন উৎসাহে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। বিপিন ও টুনার মা, দুজনে মিলে যেদিন অরুণাকে প্রণাম করে শান্তভাবে চলে গেল, সেই দিনই যেন অরুণার চিন্তায় রশ্মিময় এক পরিকল্পনার দীপালি জ্বলে উঠলো। টুনার মা'কে এক কৌটো সিঁদুর উপহার দিয়েছে অরুণা।

অবনী সে-খবর জানে না। জানবার জন্য বোধ হয় অবনীর কোন ইচ্ছাও নেই। হোম পলিটিক্সে মাথা ঘামাবার সময় নেই অবনীনাথের—রাগ করে বললেও এই অভিযোগের ইঙ্গিতটি বুঝতে দেরি হয়নি অরুণার। সময় নেই, না সামর্থ্য নেই? কথাটা মনে পড়তে বার বার হেসে ফেলেছিল অরুণা। মায়া হচ্ছিল অবনীনাথের জন্য। নিরন্নদের জন্য ভাতের দাবির লড়াইয়ের ভাবনা নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছে ভদ্রলোক। এই ধ্যানে মজে থাকুন তিনি। প্রণয়-বিরহ-মিলন—চিন্তালীলার এই ধাঁধার ভেতর টেনে এনে ভদ্রলোককে নাকাল করে লাভ নেই। তার সামর্থ্য নেই। যা-কিছু করতে হবে, সব অরুণাকেই করতে হবে। নতুন এক সাধনার গর্ব যেন কুড়িয়ে পেয়েছে অরুণা।

পিসিমার কাছ থেকে সরে এসে অবনীর কাছে দাঁড়ালো অরুণা।—ইন্দ্রকে আসতে লিখে দিলাম।

অবনী আশ্চর্য হয়ে বললো—কেন?

অরুণা।—জোছু বড় ভাবিয়ে তুলেছে।

অবনী আরও আশ্চর্য হলো।—কি ভাবিয়ে তুলেছে জোছু?

অবনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ ফাঁপরে পড়ে গেল অরুণা। অরুণার বোধ হয় সিদ্ধান্তটিই তৈরী ছিল, প্রমাণগুলি ছিল না।

অরুণার দ্বিধা দেখে অবনী একটু স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেসা করলো—কিসে প্রমাণ পেলে?

অরুণার উত্তরটা তেমনি অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।—দেখেই বোঝা যায়।

অবনী।—তুমি ভুল বুঝেছো।

অরুণা জোর করে বললো—না, আমি ঠিকই বলছি।

অবনী চুপ করে রইল। অরুণার কথাগুলি একটানা আবেগে তার গোপন পরিকল্পনার কিছুটা আভাষ যেন ধরিয়ে দিয়ে গেল।—ইন্দ্রকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করাই ভাল। আমার বিশ্বাস, ইন্দ্র আমাদের সবার ওপর একটা অভিমান নিয়েই দূরে সরে রয়েছে। ইন্দ্র জোছুকে ভালবাসে, একথা জেনেও আমরা সবাই চুপ করে রইলাম—এতে ইন্দ্রকে সত্যিই অপমান করা হয়েছে।

অবনী।—আমি তোমাকে জোছুর কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। তুমি বলছো, জোছু ভাবিয়ে তুলেছে। কি করে বুঝলে?

অরুণা একটু সংকুচিতভাবে জবাব দিল।—জোছুকে দেখে আমার তাই মনে হয়।

অবনী।—কি মনে হয়?

অরুণা।—ইন্দ্রকে অপমান করা হয়েছে, জোছু যেন এই ঘটনাকে চুপ করে সহ্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখে বুঝতে পারি, সহ্য করতে পারছে না।

অবনী।—তোমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে।

অরুণা।—কিন্তু মিথ্যে হলে কি করে চলবে?

অরুণার কথায় একটা হতাশার আক্ষেপ লুকিয়েছিল। অবনী হেসে ফেললো।—তাই বল! জোছু কিছুই ভাবিয়ে তোলেনি, কিন্তু তোমার ইচ্ছে জোছু ভেবে ভেবে সবাইকে ভাবিয়ে তুলুক। তাই নয় কি?

অরুণা অপ্রস্তুত হয়ে বললো—এ আবার কিরকম কথা হলো?

অবনী অন্যদিকে তাকিয়ে একটু শান্তভাবেই বললো—শুধু ইন্দ্রনাথের জন্যই জোছু তোমাদের ভাবিয়ে তুলুক, এটাই বোধ হয় তুমি চাইছ।

অরুণা সশঙ্কভাবে যেন অবনীর কথাগুলিকে দেখছিল। মুখটা বিনা কারণে ক্রমেই করুণ হয়ে উঠছিল।

অবনী বললো—ইন্দ্রকে ডাকিয়ে তুমি সমস্যাটাকে সরলভাবে মিটিয়ে দিতে চাও, এই

তো?

অরুণার চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক রকম স্থৈর্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল। অবনীর কথাগুলি এক-একটি লোষ্ট্রাঘাতের মত তার মনের গহনে যেন তরঙ্গ-ক্ষোভ জাগিয়ে তুলছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল অরুণা।

অবনী।—তুমি আশা করছো, ইন্দ্র এলে একটি দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে।

আর একটু উৎসাহের প্রেরণা ভরে দিয়ে কথাগুলি বললো অবনী। কিন্তু কথাগুলি থেকে আলোর বদলে শুধু একটা জ্বালা এসে অরুণার মনের ওপর যেন ছড়িয়ে পড়ছিল।

মুখ ঘুরিয়ে অরুণার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিস্ময়ে ও সমবেদনায় বিচলিত হয়ে উঠলো অবনী।—একি? তুমি মুষড়ে পড়ছো কেন? আমি তো তোমায় কোন বাধা দিচ্ছি না অরুণা! যা ভাল বোঝ, তাই করবে, এর মধ্যে এত অভিমান করার কি আছে?

অরুণার চোখের সুমুখ থেকে একটা শাস্তির ভ্রূকুটি যেন মিথ্যা ভয় দেখিয়ে এতক্ষণে সরে গেল। দুর্লক্ষ্য একটা দুর্বলতা নিজেরই সংশয়ের বিষে অন্ধ হয়ে অবনীর কথাগুলিকে চিনতে পারছিল না এতক্ষণ। কী লজ্জাকর দুর্বলতা!

অরুণা বেশ সুস্থভাবেই বললো—এর মধ্যে আমাকে টেনে আনছো কেন? আমি মুক্তি পাব, একথার কোন অর্থ হয় না।

অবনী।—আজ আমার কথাগুলি তুমি কিছুতেই বুঝতে পারছো না অরুণা।

উত্তর দিতে গিয়ে অবনীর কথার সুরটা যেন সূক্ষ্ম একটা ধিক্কার দিয়ে হঠাৎ ছিঁড়ে গেল।

প্রসঙ্গটা এইখানে এসে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়লো। অগ্রসর হবার আর কোনো পথ সহসা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অরুণাই বললো—শিশিরবাবুকে খবর পাঠালাম, যেন পত্রপাঠ চলে আসেন।

অবনী চমকে উঠে প্রশ্ন করলো—কেন?

অরুণা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—জ্বর হয়ে পড়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।

অবনী।—জ্বর সেরে গেলে আবার নিজের কাজে চলে যাবেন তো?

অরুণা।—এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি করে দেব?

অবনী।—সেই কথা তাঁকে লেখা হয়েছে নিশ্চয়?

অরুণা।—না।

অবনী।—তাহ'লে বল, জ্বরের জন্য তাঁকে ফিরে আসতে লেখনি। শুধু ফিরে আসার জন্যেই লিখেছ।

মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়েছিল অরুণা। অবনীর কথাগুলি যেন দুর্বোধ্য একটি তূণীরের মত, এক একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সুতীক্ষ্ণ শরের মত মাঝে মাঝে ছিটকে পড়ছে।

অবনী।—ইন্দ্রনাথকে কেন আসতে লিখেছ, তা বুঝতে পারছি। জোছু তাতে যদি খুশী হয়, আমি খুশী হব। কিন্তু শিশিরবাবু ফিরে আসবেন কেন?

ক্রমেই যেন নিঝুম হয়ে পড়ছিল অরুণা। অরুণার কাছে এগিয়ে এসে তেমনি শান্ত সুরে অবনী বললো—কথা বলছো না যে অরুণা?

অরুণা অবনীর হাতটা দুহাতে আবেগে ধরে কথা বলবার জন্য মুখ তুললো। চোখ দুটো চকচক করছিল অরুণার।—তুমি আজ আমাকে কোন কথার উত্তর দিতে দিচ্ছ না কেন অবন? কি ভাবছো তুমি?

অরুণাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের ওপর চুমো দিতেই ঠোঁট ভিজে গেল অবনীর।—ছি ছি, তুমি কাঁদছো অরুণা?

অরুণা।—আমি আবার চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, কাউকেই আসতে হবে না।

অবনীর চোখের দৃষ্টি কৌতুকে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল।—এরই মধ্যে হাল ছেড়ে দিলে?

অরুণা।—হ্যাঁ, আমার সে শক্তি নেই।

অবনী।—খুব আছে।

অরুণা।—আবার তুমি আমার সব ভুল কারিয়ে দিও না।

অবনী।—কোন ভুল হবে না তোমার। তুমি ভাল ভেবে যা করবে, তাই ঠিক। শুধু আমাকে এর মধ্যে ডেক না। যাও, জোছুকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

—ইন্দ্রকে একবার দেখা করে যেতে চিঠি দিলাম জোছু।

কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেও অরুণার কথাটা শুনতে পেল না জোছু। খোলা বইটা কোলের ওপর পড়েছিল ; কিন্তু বইয়ের পাতার বাইরে, বহুদূরে, উদাস চিন্তায় আচ্ছন্ন কোন জগতে জোছুর মন বোধ হয় তখন একাকী পথের পর পথ পার হয়ে চলেছিল। অরুণা জোছুর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে হেসে ফেললো।—এত ভাবনা ভাল দেখায় না জোছু।

চমকে অরুণার দিকে তাকিয়ে জোছু বইটার ওপর আবার মনস্থ হবার চেষ্টা করলো। বইটা কেড়ে নিয়ে অরুণা বললো—ইন্দ্রকে একবার দেখা করে যাবার জন্য চিঠি দিলাম।

জোছু বোধ হয় বিরক্তি চাপতে গিয়েই বললো—বইটা দাও।

অরুণা।—আগে আমার কথার উত্তর দাও।

জোছু।—তুমি অনর্থক আমার ওপর উপদ্রব করছো বৌদি।

অরুণা।—উপদ্রব?

জোছু।—হ্যাঁ।

অরুণা বিমর্ষ হয়ে বললো—ইন্দ্র দূরে সরে থাকলেই কি তোমার ভাল হবে?

জোছু।—আমার ভালর কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

অরুণা।—হ্যাঁ, এটা তোমারই ভাল মন্দের প্রশ্ন।

জোছু।—ভুল হচ্ছে বৌদি।

অরুণা।—বেশ, তাহলে ইন্দ্রকে আসতে বারণ করে দিই। কিন্তু খুবই অশোভন ব্যাপার করলে জোছু।

অরুণার সর্তকতা সত্ত্বেও তার উত্তরের মধ্যে একটা তিক্ততা ফুটে উঠলো।

জোছু চুপ করে রইল। অরুণা যেন জোছুর মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য একটা লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছিল। সেই অশোভন সত্যের কাহিনীটাই সেখানে কঠোরভাবে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

অরুণা বললো—শিশিরবাবুকে আসতে লিখেছি।

জোছু উৎসাহিতভাবেই প্রত্যুত্তর দিল—আরও আগেই লেখা উচিত ছিল বৌদি।

খুবই নির্লজ্জ হয়ে জোছুর কথাগুলি অরুণার কানে বাজলো। বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না অরুণা। সেই সন্দেহের সত্যটাকে চরমভাবে যাচাই করবার জন্যই যেন অরুণা আবার বললো—কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, শিশিরবাবু আসবেন না। তুমি যদি অনুরোধ করে লেখ, তবেই আসতে পারেন।

জোছু হেসে ফেলে বললো—তুমি জেনেশুনে একটা ভয়ানক রকমের উল্টো কথা বললে বৌদি। এটা উচিত হলো না তোমার।

জোছুর প্রতিবাদটা স্পষ্টতায় উদ্ধত হয়েই শোনায়। অরুণা যেন পাশে দাঁড়িয়ে মধ্যাহ্ন-ছায়ার মত সঙ্কোচে ছোট হয়ে পড়ছে। অনেক সাহস ও ভরসার একটা অভিযানের নেশা নিয়ে এগিয়ে চলেছিল অরুণা। কিন্তু পদে পদে ব্যর্থ হয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। এর জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না অরুণা। তাই ক্ষণে ক্ষণে সামান্য এক একটা বাধায় অসহায় হয়ে পড়তে হয়। কোথায় যেন দুরন্ত একটা ভুল তাকে দুর্বল করে রেখেছে। তাই পথটা এত কুটিল, ও

অবুঝ মনে হয়।

অরুণার মৌনতায় একটু বিচলিত হয়ে পড়লো জোছু।—ভুল বুঝে আমার ওপর রাগ করো না বৌদি।

অরুণা।—হ্যাঁ, আমারই শুধু ভুল হচ্ছে। তুমিও একথা বলছো, তোমার দাদাও তাই বলে।

নিতান্ত অর্থহীন অভিমানের মত শোনালো কথাগুলি।

চলে যাচ্ছিল অরুণা। জোছু শুধু একবার বললো—এসব নিয়ে দাদার সঙ্গে কোন আলোচনা করো না বৌদি।

মনের ভেতর এক বোঝা অস্বস্তি নিয়ে চলে গেল অরুণা। কোন উত্তর দিল না। আজ এতক্ষণ সে যেন দ্বার থেকে দ্বারে শুধু পরাভব কুড়িয়ে ফিরেছে। পরের জন্য লড়তে গিয়েই তো এই পরাভব।

এঘর থেকে ওঘরে বৃথা অনেকক্ষণ কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল অরুণা। আলমারিটাকে নতুন করে সাজিয়ে, আলনাগুলিকে সরিয়ে, সিন্দুক খুলে বাসনগুলিকে রৌদ্রে দিয়ে, একটা ছেঁড়া সোয়েটারের উল খুলে—তবু কাজ ফুরোচ্ছিল না। নিতান্ত নিরাস্বাদ কতগুলি কাজ।

অবনীর আলোয়ানটা তুলে নিয়ে রোদে মেলতে গিয়ে আত্মাপরাধের একটা চিহ্ন আবিষ্কার ক'রে দুঃখে ও লজ্জায় অরুণার মনের ভেতরটা কেঁদে উঠলো হঠাৎ। আলোয়ানের পাড়ের কাছে এক জায়গায় অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে, তবু রিপু করতে ভুলে গেছে অরুণা। অরুণা জানে, লোকটিও তেমনি মানুষ, কস্মিনকালেও স্মরণ করিয়ে দেবে না বা কোন অসুবিধার কথা মুখ ফুটে বলবে না। তেষ্টা পেলে এক গেলাস জল চাইবার মত উদ্যমটুকু পর্যন্ত হারিয়ে বসে আছে ভদ্রলোক। অরুণাকেই নিজে থেকে অবনীর যত অভাষিত ও অযাচিত দাবি মন দিয়ে বুঝে নিতে হয়। অবনী যেন তার প্রতিটি নিশ্বাসের হিসাব অরুণার ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। ভালবেসে সব দিয়ে দিয়েছে অবনী, তাই না অবনী আজ এত ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত।

জীবনে ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে সুখী হয়েছে অরুণা। এমন অকৃপণ ভাগ্য ক'জনের হয়? ভালবাসা দুরূহ হয়ে থাকবে, বিচ্ছেদটাই শুধু নিয়তি হয়ে দাঁড়াবে—জীবনে এর চেয়ে বড় অভিশাপ কল্পনা করতে পারে না অরুণা। জোছুর কথা মনে পড়লে তাই এত বিচলিত হয়ে পড়তে হয় তাকে। ইন্দ্রনাথের জন্য মমতা হয়। বিপিনের কথা ভেবে তাই এত খুশী হয় অরুণা। বিপিন তার সংসারের বীভৎস ভগ্নস্তূপ থেকে হারানো হৃদয়কে আবার উদ্ধার করে ফিরে গেছে। বিপিন আর টুনার মা যেন ভালবাসাকে সকল অক্ষমা ও অবনতি থেকে ঊর্ধ্বে তুলে জয়ী হয়ে চলে গেছে। সুখী হোক ওরা।

এই সাহসেই ভর করে সাগ্রহে এগিয়ে গিয়েছিল অরুণা। জীবনে মিলনই শুধু নিয়তি হয়ে উঠুক। তবুও, এই সুন্দর সাধনার আয়োজন আরম্ভেই কেন যেন একটি আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেতে বসেছে। জোছু একটু ভেবেও দেখলো না, কার স্বার্থের জন্য অরুণা এই ঝঞ্ঝাট সইছে?

অনেকক্ষণ ধরে টুকিটাকি নানা কাজের অস্থিরতার মধ্যে মনের ভেতর এই ব্যর্থতার ক্ষোভটুকু যেন ছেঁকে ফেলতে চেষ্টা করছিল অরুণা। পরের প্রেমের হিসাব মিলাতে গিয়ে নাকাল হবার আর কোন দরকার নেই তার! সে শক্তি তার নেই। কিন্তু ইন্দ্রের কাছে চিঠি চলে গেছে। জোছুর কথা লেখা হয়েছে চিঠিতে। নিশ্চয় আসবে ইন্দ্র। বেচারা ইন্দ্র জানে না যে পাথরের ফুলের মত হয়ে গেছে জোছু, বাতাসের দোলা এসে গায়ে লাগলেও আর সাড়া দিতে পারবে না। স্রোতের গতি ফেরাতে গিয়ে নেহাত মূর্খের মত একটা আবর্ত তৈরী করে তুললো অরুণা। শিশিরবাবুও হয়তো আসবেন। তারপর? এসেই বা কি লাভ হবে তাঁর? কোন উত্তর খুঁজে পায় না অরুণা। যেন ঠাঁই না করেই হঠাৎ দুটি নিরীহ মানুষকে নিমন্ত্রণ

করে বসেছে অরুণা।

আবছা একটা শঙ্কায় বুকের ভেতরটা শিউরে উঠতে লাগলো অরুণার। সামর্থ্য নেই, অথচ প্রচুর উপচারের সমারোহে ভরা এক ব্রত যেন মানত করে বসে আছে সে। উতলা বাতাসের মত ভাবনাগুলি শুধু অরুণার মনের ওপর ধুলোবালি আর খড়কুটো উড়িয়ে এনে পথের শেষ দাগটুকুও ফেলছিল। কাজ ভুলে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল অরুণা।

এই আনমনা আবেশের মধ্যেই একটা কথা শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো অরুণা—এত কি ভাবছো বৌদি?

কাছে এগিয়ে এসে কথাটা বলেই ব্যস্তভাবে চলে গেল জোছু।

দুঃসহ লজ্জায় যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছিল অরুণা। আজ প্রত্যেকটি ঘটনা বার বার তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চাইছে। কেউ কিছু ভাবছে না। অবনী নয়, জোছু নয়। সব ভাবনা একান্তভাবে তারই নিজস্ব বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যে তার নিজেরই জন্য ভাবনা। জোছুর কথাটা যেন আকাশবাণীর মত গোপন চেতনার একটা মুখচোরা সত্যকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়ে গেল।

একটা ভীরু সংশয় ঠাণ্ডা নিশ্বাসের মত অরুণার মনের ভেতর শেষ আলোর দর্পটুকু নিভিয়ে আনছিল। হয়তো জোছু আবার ঘুরে এসে আরও স্পষ্ট করে বলে যাবে—তোমারও নিশ্চয় কোন স্বার্থ আছে বৌদি ; তাই তোমার এত ভাবনা অভিমান আর হতাশা। নিজের জন্যই তোমার এই পরাভবের দুঃখ।

যেন বাতাস হাতড়ে হাতড়ে অবসন্নের মত ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো অরুণা। যার কাছে লুটিয়ে পড়তে সবচেয়ে ভাল লাগবে, চিরকাল ভাল লেগে এসেছে—অরুণা যেন তারই খোঁজ করে ফিরছে। কিন্তু অবনী ঘরের ভেতরে ছিল না। কলতলার দিক থেকে একটা সাড়া পেয়ে এগিয়ে গিয়ে অরুণা দেখলো, অবনী বেশ নিবিষ্ট মনে সাবান দিয়ে কতগুলি রুমাল আর তোয়ালে কাচছে।

চোখ দুটো পুড়ে যাচ্ছিল অরুণার। এ দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা সহ্য করার মত ধৈর্য তার ছিল না। সমস্ত ভুলের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিটাও এইভাবে তৈরী হয়ে ছিল, স্বপ্নেও অনুমান করতে পারেনি অরুণা।

অবনীর হাত থেকে সাবানটা কেড়ে নিয়ে অরুণা ধমক দিল—শীগগির ওঠ বলছি।

অবনীকে কোন প্রতিবাদ করার অবকাশ না দিয়েই অরুণা আবার বললো—কোন কথা শুনতে চাই না। ওঠ তুমি। অফিসের বেলা হয়ে গেছে, খেয়াল আছে কিছু?

অবনী একটু অপ্রস্তুতের মত বললো—হ্যাঁ, সে খবরটা তোমাকে এখনো বলা হয়নি।

অরুণা।—কিসের খবর?

অবনী।—অফিসের।

অরুণা।—কি?

অবনী।—চাকরির পাট চুকে গেছে। কালকেই অফিসে গিয়ে দেখলাম, বিদায়পত্র এবং এক মাসের দক্ষিণা তৈরী হয়ে আছে। ব্যাঙ্কের বড়কর্তা দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে আমার মত কেজো কেরানীকে ছাড়িয়ে দিতে হলো।

অবনীর হাতটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল অরুণা।

অবনী ঠাট্টার সুরে বললো—এ কি? খবরটা শুনে যে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লে!

অরুণার চোখদুটো ছলছল করছিল।—সবাই মিলে তোমার এত ক্ষতি করছে কেন অবন? এমন কি দোষ করেছ তুমি?

অবনী।—সবাই মিলে আমার ক্ষতি করছে, কে বললে? মাত্র একজনের নাম জানতে পেরেছি, ব্যাঙ্কের কর্তা জগৎ ভটচায। কিন্তু এছাড়া আর কে?

অবনীর হাতের ওপর চোখ দুটো ঘষে নিয়ে অরুণা বললো—না, আর কেউ নয়। ষাট, আর কেউ তোমার ক্ষতি করবে না অবন? কেউ ক্ষতি করতে পারবেও না।

—কি শুনলাম রে অবু, চাকরির পাট চুকে গেছে?

পিসিমার গলার স্বরে চমকে উঠে মাথার কাপড় টেনে অরুণা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। জপের মালা হাতে নিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন পিসিমা।

অবনী আপসোসের সুরে উত্তর দিল—হ্যাঁ পিসিমা। বিনা দোষে ছাড়িয়ে দিলে।

পিসিমার চোখ থেকে সংশয়ের ছায়াটা তখনো সরে যায়নি।—বিনা দোষে কি কারও চাকরি যায় অবু? নতুন কথা শোনাচ্ছিস আমাকে?

পিসিমার কথাগুলি থেকে প্রচ্ছন্ন একটা গঞ্জনা উপচে পড়ছিল। আশ্চর্য হচ্ছিল অবনী। পিসিমা উপদেশ দিলেন—দোষ করে থাকিস তো মাপ চেয়ে আবার চাকরিটা ঠিক করে নে অবু। বড়লোকের কাছে মাপ চাইতে কোন লজ্জা নেই। লজ্জা করলে চলবে কেন?

অবনী হেসে জবাব দিল—সত্যিই আমি কোন দোষ করিনি পিসিমা।

—বুঝলাম না বাপু। পিসিমা যেন রাগ করেই কথাটা বলে চলে গেলেন।

সাইরেন বেজে উঠলো। সারাদিনের যত দুঃসংকেতের ভরা যেন পূর্ণ হয়ে উঠলো এতক্ষণে। অবনীর হাত ধরে আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো অরুণা।

অবনী বললো—তোমার গা'টা কেমন গরম মনে হচ্ছে, জ্বর হয়নি তো?

অরুণা।—হোক গে, আমার কাছে বসো তুমি। তোমার কোলে মাথা রেখে শোব।

বাইরের রাস্তায় পথিকের দৌড়োদৌড়ি আর এ-আর-পি কর্মীদের হুইসিলের শব্দ থেমে গেছে, ত্রস্ত ঝড়ের বিলাপের মত দূরে ও নিকটে সাইরেনগুলি একটানা বেজে বেজে থেমে গেল। চল্লিশ কোটি শৃঙ্খলিত মনুষ্যত্বের সকল দুর্দশাকে টিটকারী দিয়ে, সাইরেনের কাতরানি ছাপিয়ে আকাশে ও মাটিতে বিস্ফোরকের নির্লজ্জ উল্লাস মধ্যদিনের কলকাতার দাস্যমুখী আত্মার সাড়া কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিল।

বোমা অনশন আর একশো অর্ডিন্যান্সের শাসন—পাঁচ হাজার বছরের সভ্য মানবতার আধার ভারতের সত্যাগ্রহী সত্তা অপমানের আঘাতে রক্তক্লিন্ন হয়ে উঠেছে। যেন মৃত্যুর হিক্কা উঠছে চারদিকে। শুনলে ভয় পেতে হয়, দেখলে শেষ ভরসার নিশ্বাসটুকু বন্ধ হয়ে আসে, ভাবলে ভাবনা ফুরিয়ে যায়। ভারতের অক্ষয় বটের শিকড়ে যেন আগুন লাগলো এতদিনে। রাজ্যলিপ্সার এই কালদাহে পৃথিবীর শেষ ছায়াটির স্নিগ্ধতা যেন পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে মাঝে মাঝে এই অপমানের শোক সকল আশাবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে দেয়।

এই শ্মশানসন্ধ্যার অবসাদের বাতাসে পরমাণুর সংগীতের মত তবু যেন একটি অশোক মন্ত্র সকল হতাশা ছাপিয়ে জেগে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর উদ্‌ভ্রান্ত মনুষ্যত্বকে প্রেমে মৈত্রীতে শান্তিতে ও সুস্থশৌর্যে সুন্দর করার আয়োজনে, নতুন সঙ্ঘারামের প্রার্থনার মত ভারতের কংগ্রেসের বাণী।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত লক্ষ লক্ষ নিঝুম প্রাণ সে-বাণীর ছোঁয়ায় বিজয়বন্ত মশালের মত দ্যুতিমান হয়ে ওঠে।

তা'রা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পথের দিশা দেখায় তা'রা। তা'রা কানে কানে মন্ত্র পড়ে যায়। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মনুষ্যত্ব চাই, সবার আগে চাই স্বাধীনতা। মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে উদ্ধার চাই। অন্যায়ের প্রতিরোধ চাই, জুলুমের প্রতিকার চাই। নির্ভীক হও, প্রতিজ্ঞা কর, দাবি কর, লড়তে শেখ। করবো, না হয় মরবো।

—পরাধীনতার বিভীষিকা, হঠ্ যাও হিন্দুস্থানসে! নিরন্নদের আড্ডায় প্রতি সন্ধ্যায়

দৈবীমূর্তির মত এই সংকল্পের বাণী নিয়ে কারা যেন আসে, একেবারে আপন হয়ে গা-ঘেঁষে বসে। ক্ষণিকের জন্য এক দুর্মদ জীবনের নেশা নিরন্নদের শীর্ণ পরমায়ুর বৃন্তে ঝড়ের মাতন জাগিয়ে চলে যায়। নিরন্নেরা বলে—যখন ডাক দিবেন, তখনই আমরা তৈরী আছি বাবু। আর কিসের ডর? দুশমনের চেহারাটা একবার দেখিয়ে দেবেন। তারপর দেখে নেব আমরা।

আর একজন উৎসাহে সমর্থন জানায়—একেবারে ঘিরে নিয়ে পড়ে থাকবো।

তৃতীয় আর একজন বলে—এখানে মিছা মরতে পড়ে আছি, না হয় ওখানেই মরবো। যা আছে অদৃষ্টে!

একটি বৃদ্ধ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে--বেঁচে থাক কংগ্রেস। এই ধাক্কাটা একবার সামলে উঠি বাবু, বাকী যে-কটা দিন বাঁচি কংগ্রেসের কথা মেনে চলবো। বেঁচে থাক কংগ্রেস।

লঙ্গরখানায় অন্নার্থীদের পঙক্তিতে বসে খিচুড়ি খেতে খেতে কয়েকটি গ্রাম্য গৃহস্থ যুবক করুণভাবে পরিবেশক ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কর্মী ছেলেরা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে—কি? আর চাই?

একটি গৃহস্থ যুবক ম্লানভাবে হেসে জবাব দেয়—আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলাম বাবুমশাই। একদিন কত স্বদেশীবাবুদের নিজে হাতে পাত পেড়ে মাছ ভাত খাইয়েছি বাবু। আর আজ দেখুন, ভিখিরী হয়ে পাত পেতে বসেছি।

কর্মী ছেলেরা বলে—কে বলে আপনারা ভিখিরী? আমাদের শহরে দুদিনের জন্য অতিথি হয়েছেন আপনারা। গাঁয়ে ফিরে যান, বাঁচতে চেষ্টা করুন। কংগ্রেসের অনুরোধ মনে রাখবেন।

পার্কে বসে একটি ছাত্রদের জটলা রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে। এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে বলে—একটা কথা ছিল।

সন্দিগ্ধ ছাত্রেরা বলে—বলুন।

ভদ্রলোক।—আপনারা নিশ্চয় সম্প্রতি ফাসিস্তবাদকে ঘৃণা করতে শিখেছেন?

ছাত্রেরা।—একশো বার ঘৃণা করবো, তাতে দোষ কি আছে মশাই?

ভদ্রলোক।—তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাসিস্তবিরোধী প্রতিষ্ঠান ভারতের কংগ্রেসের কথা নিশ্চয় ভুলে যান নি?

ছাত্রেরা আগন্তুক ভদ্রলোকের কথায় কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের গলার স্বরটা যেন হঠাৎ আবেগে গভীর হয়ে ওঠে।—আজ নয়, সাত বছর আগের ইতিহাস একবার স্মরণ করুন। ফাসিস্তির আক্রমণে স্পেনের জনতন্ত্রের সেই দুঃখময় মুহূর্তের কথা মনে করুন। বার্সিলোনার পথে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সেবার নৈবেদ্য নিয়ে কংগ্রেসের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ছুটে চলেছে। পথের দুপাশে স্পেনের নরনারী ভারতের জাতীয় পতাকাকে নমস্কার জানাচ্ছে, পুষ্পবৃষ্টি করছে। স্মরণ করুন, মুক্তিকামী চীনের সাধনা। উত্তর চুংকিংয়ের প্রতি গিরিবর্ত্মে অষ্টম রুট আর্মির দেশভক্ত সন্তানেরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছে। তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে ভারতের কংগ্রেসের মেডিক্যাল মিশন। আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর পীড়িতের সান্ত্বনা, আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার সুহৃদ। নয় কি?

ভদ্রলোক একটু চুপ করে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—তবু আমাদের কংগ্রেসকে অপমান করার জন্য চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে ভাই। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, কংগ্রেসের মর্যাদা রাখবেন আপনারা, কংগ্রেসকে ভুলবেন না, ভুল বুঝবেন না। আপনারা মহৎ হলে কংগ্রেস মহৎ হবে। কংগ্রেস মহৎ হলে আপনারা মহৎ হবেন। আপনারাই কংগ্রেস। কংগ্রেস কোন পার্টি নয়, দল নয়, আশ্রম নয়। কংগ্রেস মানুষের ইতিহাসের ইঙ্গিত পথ ও পরিণাম।

কথা শেষ করে ভদ্রলোক চলে যান। ছাত্রেরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। চটুল তর্কের নেশা বিস্বাদ মনে হয়। নতুন একটি গর্ব গৌরব ও বিশ্বাসের বাণী তাদের মন জুড়ে সুরে

সুরে সরব হয়ে উঠতে থাকে।

অধ্যাপকদের ক্লাবে যুদ্ধতত্ত্বের অর্থভেদ করতে বিতণ্ডার ঝড় ওঠে। গণতন্ত্রের যুদ্ধ না সাম্যের যুদ্ধ? কে বেশী ভয়ংকর, সাম্রাজ্যবাদ না ফাসিস্তবাদ? সাম্রাজ্যবাদীরা ফাসিস্ত হতে চায়, না ফাসিস্তরা সাম্রাজ্যবাদী হতে চায়?

নিতান্ত অপরিচিত ও অনাহূত একটি অতিথিবেশী মূর্তি সকলকে বিস্মিত করে উত্তর দেয়—এই দুটিই সত্য, দুই-ই সমান। এই যুদ্ধের সকল অনর্থের ঐ পুরাতন ও নূতন লিপ্সার দ্বন্দ্ব।

প্রশ্ন ওঠে, এই যুদ্ধের বীভৎস ভ্রূকুটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোন দেশ মানুষের সত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ করছে? সত্যি করে আদর্শের জন্য লড়ছে কে? কাদের শৌর্যে ও ত্যাগে অস্ত্রসর্বস্বতার দম্ভ খর্ব হতে চলেছে?

অনাহূত অতিথি করজোড়ে আবেদন করেন—তা হলে বলতে হয়, আমাদের ভারতের কংগ্রেস। সারা পৃথিবীর বিবেকের প্রতীকের মত আমাদের কংগ্রেস। সর্বমানবের সুখ শান্তি ও মুক্তির একমাত্র নিষ্কলুষ আদর্শের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, কত দুঃখের পরীক্ষায় কত মহৎ হয়ে উঠেছে আমাদের কংগ্রেস! কংগ্রেসকে ভুলবেন না আপনারা।

বিয়ে বাড়িতে মেয়েদের আসরে কথায় কথায় রাজনীতি এসে পড়ে। কোন সুবেশিনী খদ্দরের নিন্দে করেন। কোন অতিশিক্ষিতা আন্তরিকভাবেই জাতীয়তা জিনিসটা বরদাস্ত করতে না পেরে বলেন—জাতীয়তাবাদ একটা সংকীর্ণ মনোভাব। একটা গোঁড়ামি। এর থেকেই শেষে ফাসিস্তবাদ পেয়ে বসে।

খদ্দরপরা একটি অচেনা মেয়ে শান্তভাবে জবাব দেয়—ঠিক কথা। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটু আপনার ভেবে দেখা উচিত। পরাধীনের জাতীয়তা আর স্বাধীনের জাতীয়তা কি গুণধর্মে একই ব্যাপার? পরাধীনের জাতীয়তা শত গোঁড়ামি সত্ত্বেও একটা ঐতিহাসিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে যায়। স্বাধীন শক্তিমানের জাতীয়তার গোঁড়ামিতেই শুধু আশঙ্কা—সেইখানেই ফাসিস্তবাদের হাওয়া।

সকলে মিলে সাগ্রহে মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে থাকে—আপনার নাম? কি করেন আপনি? কোথায় থাকেন?

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়—আমি কংগ্রেসের কাজ করি। আজ উঠি, আবার দেখা হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, কংগ্রেসকে ভুলবেন না কখনো। বিশ্বের সভ্যতায় আধুনিক ভারতের সবচেয়ে গৌরবের সৃষ্টি আমাদের কংগ্রেস। এই সত্য আমি দু'চোখে দেখতে পাই, আমি তাই বিশ্বাস করি। সেই আনন্দে সবার কাছে কংগ্রেসের কথা বলি। যতটুকু সাধ্য তাই করি।

সারা ভারতের অদৃষ্টের আকাশে প্রতিদিন নিয়মিত সূর্য উঠে ডুবে যায়। পরাধীন জীবনের অভিশাপ প্রতিদিনের দাহনে বীভৎসতর হতে থাকে। লক্ষ নিরুপায় নরনারী ও শিশুর পরিত্রাহি আর্তনাদের সম্মুখে অন্ন বস্ত্র ভেষজ নির্মম অবজ্ঞায় দূরে সরে যেতে থাকে। সরকারকে খাজনা দিতে কোন ভুল করেনি তারা। তবু তারা রইল না। মারী আর মৃত্যু পালা করে তাদের নিশ্বাস লুটে নিয়ে যায়। নিরীহ প্রজাধর্মের শেষ স্বাক্ষর শুধু অস্থি হয়ে ছড়িয়ে থাকে বাংলাদেশের ক্ষেতে মাঠে আর রাজপথে।

এই অসহায় ধ্বংসের অভিনয়ে আর এক দফা পরিহাসের মত হিরোহিতোর দূতেরা পাখা ঝাপটে আকাশপথে উড়ে আসে। দাসত্বে জীর্ণ কয়েক শত দুর্ভাগার জীবনকে অবাধে ছিন্ন ভিন্ন করে চলে যায়।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত দেশের হাজার হাজার সংগ্রামী সত্যাগ্রহীর বিবেক এই যাতনাময় পরীক্ষায় শুদ্ধ হয়ে তিমির রাত্রির তারার মত ফুটে ওঠে। সকল কলুষের আক্রমণ

থেকে কংগ্রেসের বাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শহরে গাঁয়ে গঞ্জে হাটে, প্রতি জনতার একেবারে হৃদয়ের কাছে গিয়ে তারা কংগ্রেসের ধর্মযুদ্ধের বাণী শুনিয়ে বেড়ায়। যে শোনে সেই নিঃশঙ্ক হয়ে ওঠে। ভারতের মুক্তি না হলে মানুষের মুক্তি হবে না, সবার ওপরে এই সত্যকে তারা মনে প্রাণে অনুভব করে। আটলান্টিক সনদের কপট শব্দতূর্যের আশ্বাস নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যায়।

কাজের নেশায় পেয়েছে অবনীকে, বাইরে ঘুরে ঘুরে দিন ফুরিয়ে যায়। এদিকে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে ভয় পায় অরুণা। একটা দৈন্যের ছায়া যেন নিঃশব্দে মুখ গুঁজে বসে আছে। জোছুর পড়ার বই বন্ধ। পিসিমা অস্বস্তিতে ছটফট করেন। শিশিরের চিঠি আর আসে না। ইন্দ্র কোন উত্তর দেয়নি।

প্রতি বছরের মত ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রভাত কোটি কোটি ভারতবাসীর মুক্তিসংকল্পের পুণ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ভোরে উঠেই অবনী বের হয়ে যায়। ফিরে আসে অনেক বেলা করে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার বুক দুরদুর করতে থাকে। দুঃসহ একটা প্রদাহে যেন অবনীর মুখটা ঝলসে গেছে। কোন বছরের এই শুভ দিনটিতে অবনীকে এতটা অস্বাভাবিক দেখেনি অরুণা।

একটু সহজ হবার জন্যই অরুণা মুখে হাসি টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—স্বাধীনতা দিবসের উৎসব কেমন হলো এ বছর?

অবনী।—ভালই হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অবনী আবার বললো—কিন্তু আমাদের মিছিল ফিরে এসেছে, পার্কে ঢুকতে পারেনি।

অরুণা।—কেন?

অবনী।—পার্কের গেট বন্ধ ছিল। ভেতরে পুলিস আর কম্যুনিস্টরা বসেছিল।

অরুণা ম্লানমুখে বললো—তা হ'লে কি এ বছর সংকল্প পড়লে না তোমরা?

অবনী।—পড়েছি। আশু মাস্টারের বাড়িতে আমাদের অনুষ্ঠান সেরেছি।

অরুণা বিস্মিত হয়ে বললো—আশু মাস্টার? তিনি তো শুনেছি...।

অবনী।—না, তিনি তা' নন। তিনি নিজে থেকে এসে আমাদের মিছিলকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আশুবাবুর প্রসঙ্গে অবনীর মুখের চেহারাটা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠছিল। খুশির আবেগে যেন আপন মনেই বলছিল অবনী।—আশুবাবু একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। আশ্চর্য।

অরুণা বলতে যাচ্ছিল—ইন্দ্রকে দেখতে পেলে না?

তবু মুখ ফুটে বলতে পারলো না অরুণা। উৎফুল্ল অবনীর মুখের হাসিটুকু আজকের দিনে যেন সযত্ন আয়াসে বাঁচিয়ে রাখতে চায় অরুণা!

কিন্তু পরক্ষণেই অবনীর দিকে তাকিয়ে আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ে অরুণা। অবনীর চোখ দুটো যেন অতি নিকটে একটা নির্লজ্জ অপকীর্তির ছবির দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় কুণ্ঠিত হয়ে উঠছিল। যে মানুষ ঘৃণা করতে জানে না, কখনও কাউকে ঘৃণা করেনি, তার দৃষ্টিতে এই আবিলতার ছোঁয়া লাগে কেন? কি এই লাঞ্ছনা?

অরুণা বললো—কি ভাবছো?

—না, কিছু নয়!

অবনী আবার স্বচ্ছন্দে উত্তর দেয়। খোঁজ করে—জোছু কোথায়? পিসিমা কি করছেন?

—এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন তোমরা? হেসে হেসে কথাটা আরম্ভ করলেও অবনী শেষ

পর্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। একটা পালকের চামর দিয়ে দেয়ালের ফটো আর ছবির কাঁচের ধুলো পরিষ্কার করছিল অরুণা। অবনীর প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা না বলে, একটু স্থির হয়ে অবনীর দিকে একবার তাকালো মাত্র।

অবনী আবার বললো—বিশেষ করে তুমিই দেখছি সবার ওপর টেক্কা দিয়ে রোগা হয়ে চলেছ।

অরুণা চকিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আবার কাজে মন দেয়। তবু অবনীর দেখতে ভুল হয়নি, কাজের ছলে অরুণা যেন তার মুখের ওপর থেকে নিবিড় লজ্জার একটা শিহর আড়াল করে নিল। অবনী মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, অরুণার কানের দুল কাঁপছে, যেন তার আরক্ত কপোলের কিছুটা নেশার ছোঁয়া এসে লেগেছে দুলের ওপর—সেই সঙ্গে এক সংগোপনের বার্তা ফুটে উঠেছে ইশারা দিয়ে।

অবনী ডাকলো—অরুণা।

অরুণা।—কি?

অবনী।—উত্তর দিচ্ছ না কেন অরুণা?

অরুণা যেন সহজ হবার ছল করে উত্তর দিল—কি বলবো বল? শুধু আমিই কি রোগা হয়েছি? দেখছো না, পিসিমা কেমন শুকিয়ে গেছেন, আর জোছুও কত কাহিল হয়ে পড়েছে? আর মশাই নিজে কি হয়েছেন, আয়নাতে একবার দেখে নিন।

অবনী হাসলো।—আমরা তো অভাবে রোগা হচ্ছি।

অরুণা।—আর আমি বুঝি...।

অবনী।—তুমি বোধ হয় ভাবে রোগা হয়ে যাচ্ছ অরুণা।

অরুণা আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অরুণা একটু আক্ষেপের সুরে বললো—কিন্তু পিসিমা সত্যি বড় মুষড়ে পড়েছেন!

ক্ষণিকের জন্য অবনীর মনের প্রসন্নতা মুছে গেল। অসহায়ের মত তাকিয়েছিল অবনী। কাতর আবেদনের মত নিজের অজ্ঞাতসারেই অবনীর অসহায়তা যেন হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল।—পিসিমার যেন কোন কষ্ট না হয় অরুণা, তা'হলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

কাজ থামিয়ে অবনীর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে একটু অনুযোগের সুরেই অরুণা বললো—তার জন্যে তুমি চিন্তা করো না।

অবনী বললো—কিন্তু, কিন্তু চিন্তা না করে যে পারছি না। চিন্তা করবার জন্যই যে এখনও পৃথিবীর সবার মধ্যে তোমাদেরই শুধু বেছে রেখেছি। সবার মতই যদি তোমাদের ভাবতে পারতাম, তবে তো কথাই ছিল না। অনশনে বাঁকারামের মত কত প্রাণ শেষ হয়ে গেল, সে দুঃখ বেশ ত সয়ে যাচ্ছি। তাই ব'লে কি তোমরাও একে একে।...কিন্তু এ শাস্তি যে আমি সইতে পারবো না। এত শক্তি আমার নেই। এত দম্ভও আমার নেই। মোট কথা আমি সইতে পারবো না অরুণা। বাঁকারামের প্রাণের জন্য স্যালাইনের দাম দিতে দ্বিধা করেছি। তাই কি তুমি বলতে চাও, তোমরাও একে একে রোগা হয়ে, শুকিয়ে আর কাহিল হয়ে, আমার চোখের ওপর শেষ হয়ে যাবে? তুমি বলতে চাও, তোমাদের বাঁচবার জন্য চুরি ডাকাতি করবো না? মনে করেছ, কোন দাম দিতে দ্বিধা করবো আমি?

একটা স্বপ্নে-দেখা আতঙ্কের দিকে তাকিয়ে যেন প্রলাপ বকে চলেছিল অবনী। চোখ দুটো উত্তেজনায় অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে উঠেছিল। অরুণা ভয় পেয়ে এগিয়ে এসে অবনীর মুখ চেপে ধরলো।—ছি ছি, বড় জ্বালাচ্ছো অবন। ভাল কথা বলতে বলতে আবার কিসব আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলে! এ-সব কথা যে এখন আমার শুনতে নেই, তুমি কি বুঝছো না কিছু?

উত্তেজনার ভাবটা কেটে গিয়ে একটু আশ্বস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবনী লজ্জিত হয়ে

পড়লো।—ব্যাপার এমন কিছু নয় অরুণা। আমারই ওপর পরীক্ষাটা যেন একটু কঠোর হয়ে দেখা দিল। তাই বলছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে অবনী বলে—দেশের লোককে ভালবাসি, জীবনে মরণে ও সংগ্রামে তাদের সঙ্গে সমান হয়ে থাকতে একটা আনন্দ আছে। কংগ্রেসের দুটো কথার সম্মান যদি রাখতে পারি, একটা তৃপ্তি পাই। এর চেয়ে বড় কথা কখনও বলিনি। ধরো, মিথ্যে করেই বলেছি। এর চেয়ে অনেক বড় মিথ্যে বলে কত লোক সেরে যায়। কিন্তু আমাকে সারতে দিচ্ছে না।

অরুণা।—মিছিমিছি বড় বেশি ভাবছো তুমি।

অবনী।—ভাবতে চাইনি, তবু ভাববার সুযোগ চলে এল। ভাবতে পারিনি, এই ক্ষুধাহত মৃত্যুর অভিশাপ ফুটপাত থেকে আমার ঘরেও এসে ঢুকবে। এভাবে ভাগ্য মেলাতে চাইনি তাদের সঙ্গে। তবু তাই হতে চললো। সবার সঙ্গে এবার আমরা সত্যি সত্যি সমান হতে চললাম অরুণা। শুধু এইটুকু দুঃখ হচ্ছে, এ'কে সৌভাগ্য বলে মেনে নেবার মত শক্তি পাচ্ছি না।

অবনী উঠে ঘরের ভেতর একবার পায়চারি করে নিল। এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে যেন মনের সব ভার দূরে সরিয়ে দিল।—চাকরি একটা করতেই হবে। পেয়েও যাব বোধ হয়। শুধু ভয় হচ্ছে, এরই মধ্যে যদি...।

অবনীর কথায় অরুণা একটু উৎফুল্ল হয়ে আবার হাতের কাজ খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু পরক্ষণেই অবনীর আর একটা মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করবার জন্য এগিয়ে এলো।

অবনী বলছিলো—জোছুই ঠিক বুঝেছে।

অরুণা।—কি?

অবনী।—জোছু বুঝেছে যে, আমি বোধ হয় তোমাদের বাঁচাতে পারবো না। তাই আগেভাগেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে জোছু।

অরুণা রাগ করে—ব্যবস্থা করলেই হলো। পাঁচশো মাইল দূরে কোন বিভূঁয়ে মাস্টারনীগিরি না করলেও চলবে। তুমি যেন জোছুর কথায় রাজি হয়ো না।

অবনী।—রাজি হয়ে গেছি। ওর কাজের চিঠি এসে গেছে। শুধু তাই নয়, আজই রওনা হতে হবে।

স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে অরুণা একটু অভিমান করেই বলে উঠলো—জোছু আমাকে কিছু বললে না কেন?

অবনী।—আর ওর ওপর বৃথা রাগ করো না। তোমাকে বোঝাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে জোছু।

একটা হতাশ্বাসের কুয়াশার ভেতর যেন পথ খুঁজে খুঁজে এলোমেলোভাবে অরুণা উত্তর দিল—কিন্তু আমি যে ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি একবার আসবার জন্য আবার চিঠি দিয়েছি। জোছু চাকরি নিয়ে মোরাদাবাদ চলে যেতে চাইছে, সেকথাও লিখেছি। এইবার ইন্দ্র না এসে পারবে না। না, জোছুর যাওয়া হতে পারে না। জোছু চলে গেলে।...

মাত্রাহীন তিক্ততায় অসংযত হয়ে অবনীর আপত্তি বেজে উঠলো—তুমি জেদ করে বার বার একটা ভুল করে চলেছ অরুণা। ইন্দ্র আসবে না।

অবনীর ধমকে পরাভব মেনে নিয়েই অবসন্নের মত অরুণা বললো—সত্যি আসবে না ইন্দ্র?

অবনী।—না। আসবার হলে তোমাকে দুবার চিঠি লিখতে হতো না। তুমি বার বার ইন্দ্রকে চিঠি লিখে আমাদের অপমান করবার সুযোগ দিয়েছ।

অবনীর দুচোখে যেন একটা নিষ্কম্প দৃষ্টি জ্বলছিল। ঘরের ভেতরে কিছুক্ষণ ছটফট করে

ঘুরে বেড়ালো অবনী। অরুণা একেবারে চুপ করে গেল। একটু শান্ত হবার পর অবনী বললো—ইন্দ্র তো এখন আর দেশের মানুষ নয়, সে এখন পার্টির মানুষ। তোমাদের কোন চিঠির ভাষা সে আজ বুঝতে পারবে না। সে-ভাষা ভুলে গেছে ইন্দ্র। ইন্দ্রের যে কি ভয়ংকর উন্নতি হয়েছে অরুণা, সেটা জান না বলেই তুমি ভুল করে তাকে আসতে লিখেছ।

অরুণা।—সত্যিই আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু এতে কি লাভ হবে তার?

অবনী।—তোমাদের মনুষ্যত্বকে অপমান করলে ইন্দ্রের নতুন মনুষ্যত্ব লাভ হবে। পার্টির গৌরব হয়ে উঠবে ইন্দ্র। সে কি কম লাভ?

কথা বলতে বলতে অবনী চাদরটা কাঁধে তুললো, কতগুলি কাগজপত্র পকেটে নিল, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই অরুণা ডাক দিয়ে বললো—পয়সা-টয়সা না নিয়েই যে চললে?

অবনী।—দরকার নেই। ট্রামে চড়া ছেড়ে দিয়েছি, আজকাল হাঁটতেই ভাল লাগে।

অবনীর যুক্তিতে কর্ণপাত করার কোন দরকার ছিল না অরুণার। কৌটা থেকে একটা টাকা বের করে অবনীর পকেটে ফেলে দিয়ে ফিরে এল অরুণা।

ধীরে ধীরে জোছুর ঘরে এসে দাঁড়ালো অরুণা। একটা সুটকেসে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখছিল জোছু। জোছু একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেও হেসে জিজ্ঞাসা করলো—কি বৌদি?

মেঝের ওপর একটা ছেঁড়া চিঠির স্তূপের দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্তভাবে অরুণা আর্তনাদ করে উঠলো—এ কি করেছ জোছু! এ যে ইন্দ্রনাথের চিঠি!

জোছু।—যা উচিত, তাই করেছি। বড় পুরনো হয়ে গেছে চিঠিগুলি।

অরুণা।—এই কি উচিত ছিল?

জোছু।—ইন্দ্রদা যদি তোমাদের সবাইকে অপমান করতে পারে, তবে আমিও তাকে একটু অপমান করতে পারি না কি?

অরুণা।—কিছুই বুঝতে পারছি না জোছু।

জোছু হেসে ফেলে অরুণাকে হাত ধরে বসালো।—তুমি আমাকে কেন বুঝতে পার না বৌদি?

অরুণা।—তোমার কাছে ইন্দ্র এতটা মিথ্যে হয়ে গেছে, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল?

জোছু।—বেহায়ার মত একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবে না তো বৌদি?

অরুণা—না।

জোছু।—শিশিরবাবু যখন ছিলেন, তখন আমার সত্যিই ভুল হয়েছিল। অনেকদিন আগেই ইন্দ্রদাকে আমি অপমান করে দিয়েছি বৌদি।

দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে যাচ্ছিল জোছু। অরুণা জোছুর হাতটা সান্ত্বনার ছলে চেপে ধরলো, কিন্তু বলবার মত কোন ভাষা খুঁজে পেল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর জোছু অরুণার হাত ছাড়িয়ে আবার বইগুলি গোছাতে আরম্ভ করলো। অরুণা তখনো গম্ভীর হয়ে আছে দেখে জোছু হেসে হেসে বললো—আমি বেশ আছি বৌদি, বেশ থাকবোও। আর কোন ভুল আমার মধ্যে নেই। সব দিক থেকে ছাড়া পেয়ে গেছি।

অরুণা তবু চুপ করেছিল। জোছু বললো—তোমাদেরও ছেড়ে চললাম।

অরুণার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল। জোছুর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ধরা গলায় বললো—তুমি আমার ওপর রাগ করলে না তো জোছু।

প্রচ্ছন্ন মার্জনার মত একটা অস্পষ্ট সুরের সঙ্গে কথাগুলি যেন জড়িয়েছিল। জোছু এসে অরুণাকে হাত ধরে টেনে ওঠালো—এবার আমি সত্যিই রাগ করবো বৌদি। ওঠ, একটু সাহায্য কর আমাকে। শাড়িগুলি ভাঁজ করি এস।

দুপুর পর্যন্ত সারা বাড়ির হৃদয়টা ঘরে ঘরে ভাগ হয়ে যেন ভিন্ন ভিন্ন অভিমানে গুমরে রইল। জোছুর বাক্স গোছানো তখনো সারা হয়নি। কি-ই বা এত গোছাবার আছে? বাড়ি-ভরা শব্দের মূর্ছা তাই মাঝে মাঝে খুটখাট করে চমকে ওঠে। পাখি যেন সুযোগ বুঝে চুপিসারে পায়ের শিকলি ঠুকরে ভাঙছে। অন্য ঘরে বসে অরুণা শুনতে পায়। শব্দটা বড় অকৃতজ্ঞ হয়ে অরুণার কানে এসে বিঁধতে থাকে।

মালা জপেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না পিসিমা। থেকে থেকে এক একবার বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন।

সেলাই নিয়ে বসেছিল অরুণা। হেঁসেলের কাজ দিন দিন যত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অন্য কাজের পরিধি বেড়ে গেছে তত। আজকাল শিল-নোড়ার শব্দ ক্বচিৎ শোনা যায়, কয়লা ভাঙার শব্দ মাঝে মাঝে হয়—উনুনের ধোঁয়া শুধু একটি বেলা দেখা দিয়ে চলে যায়। তাই কলতলায় জলের শব্দটা এত প্রচণ্ড হয়ে বাজে, সারা গৃহস্থালির রিক্ততাকে যেন ধরা পড়িয়ে দেয়।

তাই দিন দিন তকতকে ঝরঝরে হয়ে উঠছে বাড়িটা। দরজা জানালার পর্দাগুলি এত পরিষ্কার কোনদিন ছিল না, আজকাল দুদিন অন্তর সাবান-কাচা করে অরুণা। ঘরের মেঝে চকচক করে—প্রতিদিনই ঘষামাজা হয়। বাড়িটার চক্ষুলজ্জা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। একটা নিদারুণ দৈন্যকে ভাল করে লুকিয়ে ফেলতে চায়।

সেলাই শেষ করে আবার কাজ খুঁজছিল অরুণা। অবনী ফিরলো, হাতে একটা পোঁটলা, নানা রকম ফল বাঁধা।

ঘরে ঢুকেই ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে ডাকলো অবনী—আপনার জন্য ফল এনেছি পিসিমা!

পিসিমা এসে সামনে দাঁড়ালেন। একটু শুষ্কভাবে হেসে বললেন—এসব কি ছেলেমানুষি করছিস অবু? এত ফল কি হবে?

অবনী।—এত আবার কি দেখলেন পিসিমা? সামান্য ক'টা ফল, কি-ই বা দাম! নানা কাজে ভুলে যাই, নইলে রোজই আনতে পারি।

পিসিমা।—না না অবু, না রে বাবা, এসব কিছু আমার চাই না।

পিসিমা যেন সন্দিগ্ধভাবে কথাগুলি শেষ করে, একটু শঙ্কিত হয়ে, ফলগুলির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই চলে গেলেন।

পরক্ষণেই একটু উত্তেজিতভাবে ফিরে এলেন পিসিমা।—জোছুকে নাকি চাকরি করতে পাঠাচ্ছিস অবু?

অবনী।—হ্যাঁ পিসিমা।

পিসিমা—একা যাবে জোছু?

অবনী।—হ্যাঁ।

পিসিমা।—তা হবে না, আমি সঙ্গে যাব।

অবনী।—এখনি কেন যেতে চাইছেন পিসিমা? প্রথম চাকরি, নতুন জায়গা—জোছু একটু সুস্থ হয়ে বসুক, তারপর না হয় যেদিন খুশী আপনাকে পাঠিয়ে দিতে...।

পিসিমা।—এই কাঁচা বয়সের মেয়েকে কোন আক্কেলে একা বিদেশে ছেড়ে দিচ্ছিস অবু?

পিসিমার উষ্মায় অপ্রতিভ হয়ে পড়লো অবনী। পিসিমাকে বোঝাবার মত কোন যুক্তি আর স্মরণে আসছিল না, তাই বিস্মিত হলেও চুপ করে রইল।

পিসিমা তখুনি সুর নরম করে বললেন—আমার আর কিসের দুঃখ বল? দিব্যি সুখে রয়েছি আমি। আমার জন্যে কি-না করছিস তোরা। আমার কোন দুঃখটা! কিন্তু জোছুকে একা যেতে দিতে মন মানছে না আমার।

স্পষ্ট করে উত্তর দিতে গিয়েই একটু কঠোর হয়ে শোনালো অবনীর কথাগুলি।—না

পিসিমা, এখন আপনি যাবেন না।

পিসিমা।—কেন?

অবনী।—এখন গেলে দু'জনেই দু'জনকে নিয়ে অসুবিধায় পড়বেন। নতুন জায়গা, জোছু গিয়েই তো সব জানাবে। তারপর সুবিধে বুঝে আপনারও সেখানে চলে যেতে কতক্ষণ? একটু বুঝে দেখুন পিসিমা।

পিসিমা।—সব বুঝেছি অবু। আমি জোছুর সঙ্গে যাব।

মুহূর্তের মধ্যে পিসিমার এত রুষ্ট দৃঢ়তার সুর গলে গিয়ে ছেলেমানুষী আবদারের মত কাতরতায় তরল হয়ে উঠলো।

অবনী তবু বললো—না, এখন হয় না পিসিমা।

পিসিমা নিঃশব্দে অন্য ঘরে চলে গেলেন। ফলের পোঁটলাটা সস্তা ঘুষের মত ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। অবনী ক্রমেই বিমর্ষ হয়ে পড়ছিল। সত্যিই কি পিসিমা সব বুঝে ফেললেন? সবাই বুঝেছে, ক্ষুধার প্রেত এই সংসারের গলা টিপে ধরতে এগিয়ে আসছে। বাঁচতে হলে চলে যেতে হবেই, তাছাড়া পথ নেই।

ফলের পোঁটলাটা তুলে রেখে অরুণা বললো—ওঠ এখন, এখন ভাববার সময় নয়। স্নান সেরে এস।

সমস্ত বাড়িটাকে আরও নিঝুম করে দিয়ে বিকেল পর্যন্ত অঘোরে ঘুমিয়ে রইল অবনী। বার বার ওঠাতে এসে অরুণা ফিরে গেছে। জাগাবার জন্য গায়ে ঠেলা দিতে হাত তুলেও একটা মমতার সংকোচে হাত গুটিয়ে নিয়েছে অরুণা। কিন্তু বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসছে, সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই, তারপরেই জোছুকে ট্রেন ধরতে হবে।

শেষ পর্যন্ত নিজেই জেগে উঠে বসলো অবনী। অরুণা বললো—জোছুর যাবার সময় হলো।

অবনী।—হ্যাঁ, মনে আছে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল অরুণা। অবনীর চোখ দুটো লাল হয়ে ফুলে রয়েছে ; এই আহত অসহায় দৃষ্টির ছোঁয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেন নিজেকে একটু কঠিন করে অরুণা সরে পড়ছিল।

অবনী ডাকলো—আমাকেও কি স্টেশনে যেতে হবে?

অরুণা।—এর মানে? তুমি না গেলে কে যাবে?

অবনী নির্বোধের মত তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করলো।—শেষ পর্যন্ত জোছুকে আবার আমার পাল্লায় পড়ে স্টেশন থেকে ফিরে আসতে না হয়।

অরুণা একটু কড়া করে উত্তর দিতে গিয়েও পারলো না। সান্ত্বনার সুরে বললো—এরকম করছো কেন তুমি? কিছু হবে না, কিছু ভেব না।

অবনী তবু চুপ করে বসেছিল। অরুণা এইবার অনুযোগ করে বললো—তুমি এভাবে লুকিয়ে রয়েছ কেন? ওঠ, জোছুর সঙ্গে দুটো কথা বল। আর সময় নেই।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

অবনী ফুর্তির সঙ্গে একটা লাফ দিয়ে উঠে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো—জোছু, কি করছিস? তৈরী হয়ে নে, আর সময় নেই।

জোছু এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। অবনী যেন অন্যদিকে তাকিয়ে অনুমানে জোছুর ছায়াটাকে দেখে নিল।

আলনা থেকে খপ করে আলোয়ানটা তুলে নিয়ে অবনী বললো—এটা সঙ্গে রাখ জোছু, মোরাদাবাদে যা শীত!

অরুণার ইশারা চোখে পড়তেই কোন আপত্তি না করে আলোয়ানটা হাতে তুলে নিল

জোছু।

অরুণা বললো—এইবার রওনা হয়ে যাও। আর দেরি করো না।

নিথর অভিমানের মূর্তির মত পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। জোছু প্রণাম করতেই সংক্ষেপে আশীর্বাদ সারলেন—ভাল থেক।

জোছু ডাকলো—দাদা।

অবনী।—কি?

জোছু।—সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাচ্ছি দাদা।

অবনী।—তা কি আব করবি বল? আগে প্রাণটা বাঁচাতে হবে তো? যেরকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে...।

কান্নার চেয়েও করুণ হয়ে জোছুর মুখের হাসিটা যেন অনুযোগ করলো—তুমি তাই বিশ্বাস করলে তো দাদা?

জোছুর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে, নিজের রূঢ়তায় লাঞ্ছিত হয়ে অবনী করুণভাবে চেঁচিয়ে উঠলো—বিরক্ত করিস না। আমি কিছু বিশ্বাস-টিশ্বাস করি না, তোর কাছে ফিলসফি শুনতে চাই না আমি। চল আর সময় নেই।

গুরুদয়ালবাবুর আহ্বান শুনতে পেয়ে সিতা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।—কি বাবা?

গুরুদয়ালবাবু তাঁর মনের ভেতর একটা উত্তেজনাকে যেন কঠিন শাসনে সংযত করে রাখছিলেন। তাই শ্রান্ত মানুষের মত দেখাচ্ছিল তাঁকে—একটু নিষ্প্রভ অথচ শান্ত।

গুরুদয়ালবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন—তোর সেই পারুলদি হঠাৎ একটা চিঠি লিখে ফেলেছে আমাকে।

সহসা একটা আঘাত পেয়ে যেন সিতা চমকে উঠলো।—পারুলদির চিঠি?

গুরুদয়ালবাবু।—হ্যাঁ।

মাথাধরার ওষুধের একটা ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিয়ে, পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে, জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন গুরুদয়ালবাবু।—তা, আমার কোন আপত্তি নেই সিতা। আমি আপত্তি করবো কেন? আমি আপত্তি করতে পারি না। শুধু এতদিন কিছু জানতে পারিনি বলেই...।

তেমনি শঙ্কিত মুখে সিতা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো—কিসের আপত্তি বাবা?

গুরুদয়ালবাবু।—সেই ছেলেটি...গানের মাস্টার শিশির।

সিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গুরুদয়ালবাবুর কথাগুলির মধ্যে না বুঝবার মত আর কোন হেঁয়ালি নেই। কাহিনীটা যেন আর শুধু অলক্ষ্য ক্ষোভ ও অভিমানের জাল বুনে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায় না। সংসারের পরীক্ষায় কাহিনীটা আজ নিজের আবেগে কঠিন সমস্যার মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে। সংসারের রূঢ় নিয়মেই এমনি করে সব খাপছাড়াকে একদিন হেস্তনেস্ত করার ডাক এসে পড়ে। গুরুদয়ালবাবু তাই যেন সিতাকে আজ ডেকেছেন।

সিতার কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন না গুরুদয়ালবাবু। পারুলের চিঠিটা প্রখর দিবালোকের মত হঠাৎ সম্মুখের সব আবছায়া সরিয়ে দিয়ে তাঁর কর্তব্য ও অকর্তব্যের পথ স্পষ্ট করে দিয়েছে। যে-পথে চলে গিয়ে জীবনে সুখী হবে সিতা, কোন অতিস্নেহের দাবীর গ্রন্থি দিয়ে সে-পথের মুখ আর বেঁধে রাখবেন না গুরুদয়ালবাবু।

গুরুদয়ালবাবু বিমর্ষভাবে হাসলেন।—বড় অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম সিতা। কিছুই জানতে পারিনি, অথচ নিজের ইচ্ছেমত আয়োজন করে বসে আছি। নইলে...।

একটা গভীর অনুশোচনার আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে গুরুদয়ালবাবুর কথাগুলি মিলিয়ে যেতে

লাগলো।—তোর কোন দোষ নেই সিতা। আমারই জেনে নেওয়া উচিত ছিল। জিজ্ঞেসা করা উচিত ছিল।

সিতা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে গুরুদয়ালবাবুর চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। চেয়ারের কাঁধটা ছুঁয়ে চুপ করে নিষ্পলক চোখে গুরুদয়ালবাবুকেই শুধু দেখছিল সিতা। সিতার দু'চোখের দৃষ্টির একেবারে কোলের কাছে যেন গুরুদয়ালবাবুর মাথাটা ঘেঁষে রয়েছে, কাঁচা-পাকা চুলের স্তবক এলোমেলো হয়ে উড়ছে, প্রবীণ আয়ুর উষ্ণীষের মত। সিতার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠছিল। এত বিজ্ঞ, এত প্রবীণ, এত দামী শালে জড়ানো মূর্তি। কিন্তু কত নিরীহ হয়ে অভিমানী শিশুটির মত যেন চেয়ারের ওপর বসে রয়েছে।

সিতার বুকের কাছে গুরুদয়ালবাবুর মাথাটি যেন ধীরে ধীরে ভাসছে। ক্ষণিকের এক অনুভবের আবেশ সিতার চোখের দৃষ্টি আরও নিবিড় করে তুলছিল। ক্রোধ-ক্রীড়নক একটি ছোট্ট মানুষের মূর্তি যেন আশ্রয়ের লোভে সিতার বুকের কাছে মাথা গুঁজতে চাইছে।

সিতা ডাকলো—বাবা!

গুরুদয়ালবাবু।—লুকোচ্ছিস কেন? সামনে এসে বস।

সিতা।—তুমি ভুল বুঝেছ বাবা। তুমি যে আয়োজন করবে, সেই আয়োজন আমি মেনে নেব।

একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের বাতাসে গুরুদয়ালবাবুও মুখে ক্ষীণ হাসির শিখাটা চঞ্চল হয়ে উঠলো।—কী যে বলিস সিতা! আমার আয়োজনের কথা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোর জীবনের ব্যাপারে, তুই যে আয়োজন করবি, আমি তাই আশীর্বাদ করে দেব।

সিতা।—না বাবা।

গুরুদয়ালবাবু।—কেন?

সিতা।—শিশিরকে তুমি চেন না।

গুরুদয়ালবাবু।—তুই যখন চিনেছিস তখন আমার আর চেনবার দরকার নেই।

সিতা।—সে বড়লোককে ঘৃণা করে।

গুরুদয়ালবাবু একটি বিমূঢ় অবস্থায় পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তিত থেকে নিয়ে বললেন—বুঝেছি, আমাকে ঘৃণা করে। তাতে কিছু আসে যায় না। সময় মত সব ঠিক হয়ে যাবে।

সিতা।—কিছুই ঠিক হবে না বাবা, সে চিরকাল গানের মাস্টার হয়ে থাকবে। এখানে সে আসবে না।

গুরুদয়ালবাবুর অবিশ্বাস ঠাট্টার সুরে ফুটে উঠলো।—যেদিন বুঝবে যে এটা তারই বাড়ি, আমার নয়, সেদিন সে বোধ হয় আর আসতে দেরি করবে না।

সিতা।—না, সে আসবে না। সে অন্য ধরনের লোক।

গুরুদয়ালবাবু একটা সংশয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।—কোন আদর্শ-টাদর্শ আছে নাকি?

সিতা।—হ্যাঁ, কংগ্রেসের কাজ করে।

গুরুদয়ালবাবু।—করুক, কিন্তু তার জন্য কি দরিদ্র হয়ে থাকতে হবে? এরকম কোন নিয়ম আছে না কি?

সিতা।—আমি জানি না বাবা। বড়লোকের সঙ্গে মিশলে বা বড়লোক হয়ে গেলে দেশের লোকের সেবার কাজে বাধা আসে, আদর্শ নষ্ট হয়—এই কথা তাঁরা বলেন।

গুরুদয়ালবাবু হাসলেন।—কী অদ্ভুত আদর্শ সিতা?

পরমুহূর্তেই বেদনাবিবর্ণ মুখে গুরুদয়ালবাবু বললেন—থাক এসব কথা। তবু তুই যখন শিশিরকে...।

গুরুদয়ালবাবু হঠাৎ থেমে গিয়ে সিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে নিলেন—আমার ভুল হচ্ছে না তো সিতা? সত্যি শিশিরকে বন্ধু হিসাবে যদি তুই সবচেয়ে বেশী...। অর্থাৎ, যার

মানে, যাকে জীবনসঙ্গী পেলে তুই সবচেয়ে সুখী হ'তে পারতিস...।

সিতা।—হ্যাঁ বাবা।

গুরুদয়ালবাবু।—শুনে সুখী হলাম সিতা। আর আমার কোন সংশয় নেই।

হঠাৎ ভয় পেয়ে যেন নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন গুরুদয়ালবাবু।—হ্যাঁ, ঠিক কথা। বড় বড় বাড়িতেই সুখ থাকে না। যদি সুখী হোস, তবে গানের মাস্টারের ঘরই ভাল। যেখানে সুখ, সেখানেই ঘর। নিশ্চয়। আমি বাধা দেব কেন? কোন দিন বাধা দিইনি...।

গুরুদয়ালবাবু নিজ মুখে সিতাকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই আশ্বাস যেন সিতার মনের ভেতর চিরদিনের আলোকে পুষ্ট যত প্রত্যয়ের ওপর পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের বুদবুদের মত ছড়িয়ে পড়লো। এই নির্বাধ মুক্তির সঙ্গে এক প্রচণ্ড অসহায়তাও যেন নির্বাধ হয়ে উঠেছে। গুরুদয়ালবাবুর অন্ধ বাৎসল্যের দাবি আর সিতার জীবনের পথে কোন আজ্ঞা ইঙ্গিত উপরোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

—শুধু জয়ন্তর কাছে আমি একটু ছোট হয়ে গেলাম সিতা।

গুরুদয়ালবাবুর গলার স্বরে আবার সিতার শিথিল চেতনা সতর্ক হয়ে উঠলো। কথাগুলির মধ্যে সজীব উৎসাহ টেনে নিয়ে সিতা বললো—না বাবা, তোমাকে কারও কাছে ছোট হতে দেব না। তোমার কোন আয়োজন উল্টে দিতে হবে না। তুমি যা ভাল মনে কর, আমার কাছে তাছাড়া আর কোন ভাল নেই। নিজের ভাল ভাবতে আমি শিখিনি বাবা।

তবু গুরুদয়ালবাবু বোধ হয় ভুল বুঝলেন। সন্ত্রস্তের প্রার্থনার মত সিতার ঐ কথাগুলির আবেদন যেন তিনি শুনতে পেলেন না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্লভাবে গুরুদয়ালবাবু সিতার সব অভিমানকে যেন দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—না, না, কিছু ভাবিস না সিতা। শিশির ছেলেটি বেশ। খুব ভাল ছেলে। আমার ভুলে যদি অন্যরকম কোন ব্যাপার ঘটে যেত, বড় অন্যায় হতো সিতা। তাছাড়া তোর পক্ষেও...বড় অপমানের কথা হতো। যাক, এখন ভালয় ভালয়...।

গুরুদয়ালবাবুর আচরণ সিতাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তুলছিল। জীবনে আজ যেন গুরুদয়ালবাবুকে চিনতে পারলো সিতা। এক দিন যে-বাৎসল্যের নিষ্ঠুরতায় নিজেকে সঁপে দিয়ে মনে মনে আত্মত্যাগের গর্বে সান্ত্বনা খুঁজেছিল সিতা, সে-গর্ব চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আজ। জয়ন্তর কাছে ছোট হয়ে যেতে, শিশিরের মত দাম্ভিককে ভাল ছেলে বলে প্রশংসা করতে, ডোভার লেনের প্রাসাদের আদরিণী হরিণীকে গানের মাস্টারের ঘরনী করে দিতে—এত বিষের জ্বালা সহ্য করে তবু আনন্দে হাসছেন গুরুদয়ালবাবু। কিসের জন্য?

সিতার মনের প্রশ্নটিকে উত্তর দিয়েই যেন গুরুদয়ালবাবু বললেন—তুই সুখী হলেই আমি সুখী। এর ওপর আবার ভাববার কি আছে?

সিতা।—কিন্তু, একটা কথা আছে বাবা, যে-কথা...।

গুরুদয়ালবাবু ব্যস্তভাবে আপত্তি করে উঠলেন—আরে না, বোকা মেয়ে। আমাকে তোয়াজ করতে হবে না। আমি কারও ওপর রাগ করি না। কিছু ভাবিস না সিতা। তুই যা ভাল বুঝেছিস, তাই করবি।

আকাঙ্ক্ষিত ভাগ্যের দিকেই গুরুদয়ালবাবু খুশী মনে সিতাকে যেন হাত ধরে পৌঁছে দিচ্ছেন। সিতা তবু দ্বিধায় পিছিয়ে পড়ছে। একের পর এক, এক-একটি প্রতিবাদের যুক্তি খুঁজছে সিতা। দুর্বোধ্য একটা আশঙ্কায় অস্থিরতায় আর অশোভন কাতরতায় যুক্তিগুলি নিছক অজুহাতের মত নির্লজ্জ হয়ে উঠছে। এত উদার মহৎ প্রসন্ন ও স্নেহপ্রবণ গুরুদয়ালবাবু, এতখানি আত্মত্যাগের বিনিময়ে, কোন জোর দাবি ভর্ৎসনার বালাই না রেখে, সিতার ভালবাসার সাধনাকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। কিন্তু সিতার আচরণ যেন ক্রমেই বিসদৃশ কুণ্ঠায়

কুশ্রী হয়ে উঠছে। এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজছে সিতা। গুরুদয়ালবাবু যেন বলছেন তোমাকে ডুবতেই হবে। সিতা ডুবতে চায় না।

গুরুদয়ালবাবুর খুশীর উচ্ছ্বাসকে কোন প্রতিযুক্তি দিয়ে আর আটক করে রাখতে পারছিল না সিতা। তাঁর আদরের মেয়েকে জীবনের অভিলষিত পথে যাত্রা করার ছাড়পত্র তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিঃশব্দে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো সিতা। একটা অভিমানী চিন্তা যেন মুখভার করে বার বার সিতাকে বিব্রত করে তুলছিল।—এত সহজে তুমি আমায় মুক্তি দিয়ে দিলে বাবা! একটুও ভাবলে না, একটুও বাধলো না। কিন্তু বিশ্বাস হয় না বাবা, তোমার কাছে বাইশ বছর ধরে পাওয়া এই অফুরান অন্ধ-স্নেহ, এ-কি সবই মিথ্যা? না, তুমি নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলেছ। আজ তুমি এত খুশি হয়ে উঠছো, এটাই মিথ্যা। তুমি তো ছাড়পত্র দিয়ে দিলে, কিন্তু একবার ভাবলে না, কী দুর্গম পথে তুমি আমায় ছেড়ে দিতে চাইছ। আমার কাছে দুর্গম না হোক তোমার জীবনের কামনার কাছে এপথ অগম্য অস্পৃশ্য ও অবাস্তব। তোমার মেয়ে গানের মাস্টারের বউ হয়ে যাবে, তুমি কোন মনে এই বিসর্জন মেনে নিতে পারছো? তোমার ভালবাসার বন্ধন এতদিন নিষ্ঠুরভাবে আমার পথ বেঁধে রেখেছিল, তাও ভাল ছিল। কিন্তু আজ আর তুমি নিষ্ঠুর নও, তুমি সরে গেছ। সেই সঙ্গে তোমার হৃদয়টিও বোধ হয় সরে গেছে। আজ তুমি শুধু নির্বোধ।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে সিতার অসংবৃত চিন্তাগুলি আচমকা ভয়ে ও লজ্জায় সতর্ক হয়ে উঠলো। ঘরে ঢুকলো জয়ন্ত।

হাসছিল জয়ন্ত—আমি অনেকক্ষণ এসেছি সিতা।

বিষণ্ণভাবে হেসে সিতা বললো—এসে আবার ফিরে গিয়েছিলে বোধ হয়।

জয়ন্ত।—না, তোমার বাবার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলাম।

পরমুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো সিতা। সিতার মনের কৌতূহলগুলি একটিমাত্র প্রশ্নকে ঘিরে যেন ধ্যানস্থ হয়ে উঠছিল। সিতাকে নীরব দেখে জয়ন্ত শান্তভাবে বললো—গুরুদয়ালবাবু বড় কোমল প্রকৃতির মানুষ।

সিতা একজোড়া নিষ্পলক শুষ্ক-দৃষ্টি তুলে তাকালো, যেন মনে মনে উত্তর দিল।—মিথ্যা কথা।

জয়ন্ত।—গুরুদয়ালবাবু তোমাকে এত বেশী ভালবাসেন যে...।

সিতা চোখ নামিয়ে নিল। মনের ভেতর একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান প্রতিবাদ করে উঠলো।—না, মোটেই সত্য নয়।

জয়ন্ত।—গুরুদয়ালবাবু আজ আমার কাছে মাপ চাইলেন সিতা।

হাত বাড়িয়ে আয়নাটার হুক থেকে একটা রুমাল তুলে নিল সিতা। মনের ভেতর একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উত্তর দিয়ে গেল।—সেটা তাঁর কৃতকর্মের ফল, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত।

জয়ন্ত।—আমিও মাপ চেয়ে নিয়েছি তাঁর কাছে।

জয়ন্তর শান্ত কথাগুলি শেষ দিকে যেন একটা আবেগে টলমল করে উঠলো।

এতক্ষণে সিতা বললো—তুমি মাপ চাইলে কেন? তোমার মত এত শক্ত বুদ্ধিমান অধ্যবসায়ী উৎসাহী উন্নতিপরায়ণ কাজের মানুষ, হঠাৎ মাপ চেয়ে বসলে কেন?

জয়ন্ত—ভুল করলে মাপ চাইতে হয়।

সিতা।—কার ভুল?

জয়ন্ত।—আমার।

সিতা।—তোমারও ভুল হয়।

সিতার ব্যগ্র প্রশ্নগুলির পিছনে একটা বিদ্রূপের জ্বালা ঝলসে ওঠার চেষ্টা করছিল।

তেমনি গভীর নিস্পৃহায় শান্ত হয়ে জয়ন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিল—ভয়ানক ভুল হয়।

সিতা হাসলো।—বিশ্বাস করতে পারলাম না জয়ন্ত।

জয়ন্ত।—তোমার বাবা কিন্তু আমায় বিশ্বাস করেছেন।

সিতা।—কি বিশ্বাস করেছেন?

জয়ন্ত।—তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, আমি শুধু তাঁর কারবারের অংশীদার। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, আমি তাঁর মেয়ের জীবনের পথে ওৎ পেতে বসে নেই। তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর মেয়ে আমাকে শুধু ভয় করে।

সিতার উত্তেজিত মনের ওপর হঠাৎ একটু কোমলতার ছায়া পড়ে তার প্রশ্নটাকেও বিষণ্ণ করে তুললো, অনুযোগের মত শোনালো।—এসব কথা তুমি তাঁকে কেন বলতে গেলে জয়ন্ত?

জয়ন্ত।—তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন তাই বলেছি।

সিতা।—কি জিজ্ঞাসা করলেন?

জয়ন্ত।—শিশিরের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে, আমি খুশী হব কি না?

সিতা।—কিন্তু তুমি...।

জয়ন্ত।—হ্যাঁ, আমি খুশী। গুরুদয়ালবাবু বিশ্বাস করেছেন, এবং খুশী হয়েছেন।

রুমালটা কপালের ওপর আস্তে আস্তে বুলিয়ে, নিশ্বাস সংযত করে, একটা অস্পষ্ট শঙ্কার দিকে তাকিয়ে যেন সিতা নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ নিঃশব্দতার পর সিতা জোর করে তার মনের বিচ্ছিন্ন ভাষাগুলিকে কোনক্রমে গুছিয়ে উত্তর দিল—কিন্তু...কিন্তু তুমি তো খুশী হতে পার না জয়ন্ত।

জয়ন্ত।—না সিতা। শুনে আমি খুশীই হয়েছি, এটাই হওয়া উচিত ছিল।

সিতা।—এ কি তুমি সত্যি সত্যি বলছো জয়ন্ত?

জয়ন্ত।—হ্যাঁ।

সিতা।—তাহলে তোমাকে এতদিন ভুল বুঝে এসেছি?

জয়ন্ত।—না, তুমি আমাকে ঠিক চিনেছিলে, শুধু নিজেকে চিনতে পারনি।

সিতা।—জয়ন্ত...।

জয়ন্তর চোখেমুখে একটা হাসিমাখা উৎসাহের আভা ছড়িয়ে পড়ছিল।—এখনো নিজেকে চিনতে পেরেছ কি না সন্দেহ।

সিতা।—নিজেকে চিনতে পেরেছি জয়ন্ত। দোহাই তোমার, তুমি এত স্পষ্ট করে কথাগুলি আর বলো না। কি ছিলে আর কি হয়ে গেছ তুমি!

জয়ন্ত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসেছিল। সিতা বললো—বাবা আর জাগৃতি সঙ্ঘ তোমাকে যতই শক্ত মানুষ বলে প্রশংসা করুক, আমি তোমাকে কোনদিন তা মনে করিনি! তবু তুমি এত কঠিন হয়ে বদলে গেলে কি করে জয়ন্ত? তুমি...।

জয়ন্ত।—এসব কথা থাক সিতা।

সিতা।—তোমাকে কি এতদিন শুধু...।

জয়ন্ত।—ভালবাসতে অনেক চেষ্টা করেছ, কিন্তু ভালবাসতে তো পারনি।

সিতা হেঁট মুখ হয়ে, যেন মাথা পেতে, এই সত্যকে ভয়ে ভয়ে স্বীকার করে নিল।

হঠাৎ মুখ তুলে সিতা একটু জোর গলায় যেন একটা কৈফিয়ৎ তলব করে বসলো।—তুমি ভেবেছ যে আমি শিশিরকে...

জয়ন্ত।—না, আমি বিশ্বাস করি না যে শিশিরকে তুমি ভালবাস।

সিতা অপ্রস্তুত ভয়ে ভয়ে বললো—তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

জয়ন্ত।—তুমি শুধু নিজেকে ভালবাস সিতা।

সিতার কোন উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে জয়ন্ত ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

জয়ন্তর মন্তব্যগুলি সহ্য করা সিতার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। যেন মুক্তপুরুষের মত যত মোহ ভ্রান্তি চাঞ্চল্য ও কামনার ওপারে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত আজ বড় বড় সত্য কথা বল্‌ছে। কোথাও এতটুকু ব্যথার সংকোচ নেই, একটু হিংসার খোঁচা নেই, ক্ষতির আপসোস নেই। এক বৈরাগীর ঔদার্য নিয়ে বড় বড় উপদেশ বিতরণ করে চলে গেল।

তবু সিতা যেন ইচ্ছে করেই জয়ন্তকে আজ বুঝতে চাইছিল না। চিরকালের আত্মাভিমানিনী সমুক্তিকা সিতা আজ জয়ন্তের প্রশ্ন ও মন্তব্যগুলিকে মুখের ওপর উত্তর দিয়ে জব্দ করতে পারছে না। জয়ন্ত সরে যেতে চাইছে, কিন্তু সিতা বোধ হয় সরিয়ে দিতে চায় না। তাই কঠোর এক একটা প্রত্যুত্তর মনের ভেতর আস্ফালন করে উঠলেও, ভাষায় মুখর হয়ে উঠতে পারছিল না। জয়ন্ত যেন সন্তপ্ত বালুকা-বেলার মত, সেখানে দাঁড়িয়ে শুধু দুঃসহ দাহে ছটফট করতে হয়। তবু তো দাঁড়িয়ে থাকা যায়। কিন্তু তার পরেই যে অতল জলের আবর্ত। একবার ডুবলে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। শিশিরের ভালবাসা তাকে শুধু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্য যেন ডাকছে। সমস্ত ঘটনাগুলি একে একে পথ কেটে তার জীবনের পরিণামকে সেই ভয়ংকর প্রপাতের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। সবাই মুক্ত করে দিতে চায় সিতাকে। গুরুদয়ালবাবু ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন—আশীর্বাদ করেছেন। জয়ন্ত শুভেচ্ছা জানাচ্ছে—সে খুশী হয়েছে। ডোভার লেনের এত বড় বিরাট বাড়িটার হৃদয়ে কোথাও একটু দীর্ঘশ্বাসের শব্দও আর অবশিষ্ট নেই। সিতাকে মুক্ত করে দিয়ে সবাই যেন এক মুক্তির তৃপ্তিতে স্থির শূন্য উদার ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কেউ জানলো না, সব মুক্তির বাণী যে মিথ্যে করে রেখেছে জ্যোৎস্না। কংগ্রেসওয়ালা অবনীবাবুর বোন জ্যোৎস্না। শিশিরের জীবনে দোসর হতে গিয়ে, অপঘাত মৃত্যুর মত এই অপমানকে কি স্বীকার করে নিতে হবে? তাহ'লে সিতা বসু আর রইল কই? এই লাঞ্ছনার কথা যে কেউ জানে না। গুরুদয়ালবাবু জানেন না, জয়ন্ত জানে না। এই একটি বাধা, যে-বাধার সঙ্গে জীবন দিয়ে কোন আপোস করা যায় না।

এতক্ষণে যেন একটা মনের মত ছুঁতো খুঁজে পেল সিতা। চারদিক থেকে সুপ্রসারিত মুক্তির ইঙ্গিত এতক্ষণ ধরে একটা আতঙ্কের ঘনঘটা সৃষ্টি করে তুলেছিল। নিজের দুর্বলতাকে এতক্ষণ ক্ষমা করতে পারছিল না সিতা—বোধহয় বুঝতে পারছিল না তাই। শিশিরকে তুমি ভালবাস না—কুৎসিত জয়ন্তর এই জিঘাংসার গর্জনও চুপ করে শুনতে হয়েছে তাকে। শুধু চুপ করে শোনা নয়, অহেতুক একটা আতঙ্কে কথাটা প্রায় মনে মনে মেনে নিতে বসেছিল সিতা।

কিন্তু জয়ন্ত অনেকক্ষণ হ'ল চলে গেছে। নইলে সিতা একবার তাকে উপযুক্ত উত্তরটা একেবারে স্পষ্ট করেই শুনিয়ে দিতে পারতো—হোক সে গানের মাস্টার, যদি কাউকে ভালবেসে থাকি তবে তাকেই বেসেছি। যদি এতটা বিশ্বাস না কর, তবে শোন—সবচেয়ে তাকেই বেশী ভালবাসি।

এতক্ষণে নিজেকে ক্ষমা করতে পারলো সিতা। তার সকল সংকোচ ভীরুতা ও আতঙ্কের একটা হেতু আবিষ্কার করা গেল। সব আত্মদানতাকে অস্বীকার করতে পারলো সিতা। তার ভুল হয়নি কোথাও। যদি কারো ভুল হয়ে থাকে, শিশিরের হয়েছে। এই মুক্তিকে মিথ্যে করে দিয়েছে শিশির নিজে।

সে অবুঝ যদি কিছু না বোঝে, কে তাকে বোঝাবে? মানুষটিও যে তাঁর রাগ-মহাদেশের মতই দুর্বোধ্য জটিল আর উদ্‌ভ্রান্ত। একে একে শুধু কতগুলি পরাজয়ের অপমান ছাড়া আর কোন উপহার সে এনে দিতে পেরেছে সিতাকে? ছেঁড়া মালার ফুলের মত সিতা আজ তার সত্তাটুকু হারিয়ে ফেলেছে। তাকে ধরে রাখতে কেউ আর দাবি করে না। কন্যাগত প্রাণ গুরুদয়ালবাবু ত্যাগ স্বীকার করছেন। সিতার এক কণা প্রসন্নদৃষ্টির ভিখারী জয়ন্ত মজুমদারও

খুশী মনে সব দাবি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। কিন্তু সকল অবহেলাকে চরম করে দিয়েছে স্বয়ং শিশির। নইলে...।

তবু আজ মনে মনে শিশিরের সব ভুল মাপ করে দেয় সিতা। প্রতি মুহূর্তের ধ্যানে চিত্ত ভরে ধরে রাখার মত তার জীবনের একটি মাত্র পুরুষ শিশির। সব দিকে তার কাছে হার মানতে রাজি ছিল সিতা, হার মেনে যদি তাকে আপন করা যেত, যদি তাকে একা পাওয়া যেত—যদি জয় করা যেত।

সিতার ভাবনার প্রবাহ ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে আসে। সব অস্বস্তি বিরক্তি আশঙ্কা ও অমর্যাদার জ্বালা একে একে থিতিয়ে পড়ে। এই শান্ত স্থৈর্যের মধ্যে একটি শুধু ভাবনা দর্পণের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—শিশিরের ভালবাসা। আত্মীয়-স্বজন শ্রেণী গোত্র গৃহ সম্পদ—তার চিরদিনের কক্ষ থেকে ছিন্ন করে শিশিরের ভালবাসা তাকে লুঠ করে এক ছন্নছাড়া পৃথিবীতে নিয়ে চলে যেতে চায়। সিতারও প্রায় চলে যেতে ইচ্ছে করে।

কেন? শিশিরের চেয়ে গুণী পুরুষ কি আর কেউ ছিল না? ঐ রকম স্বপ্ন দিয়ে ছাওয়া অদ্ভুত দুটি ভুরু কি আর কাউকে সুন্দর করে রাখেনি? তবু কেন জানি মনে হয়, জীবনের পথে এর চেয়ে সুন্দরতর সাথী বোধ হয় আর কেউ হতে পারে না। তার হাত ধরে পাশে পাশে চলা—ক্ষণিকের জন্য জীবনের কটি মুহূর্তের আস্বাদ যেন বদলে যায়। শত অহংকারে সে যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সিতার সামান্য জ্বর হয়েছে, খবর শুনে ঐ অহংকারের চোখও একদিন ছলছল করে উঠেছিল। সব কথা মনে পড়ে সিতার। ভরানদীর জলের মত সিতার ভালবাসার লোভে ঐ উদ্ধত অহংকার এক পরম তৃষ্ণার বেদনায় ছায়া হয়ে নুয়ে পড়বে, সিতা বসু জীবনে প্রথম সত্য হয়ে উঠবে। কী বিশ্বাসে এতদিন স্বপ্ন দেখছিল সিতা। সেই বিশ্বাসের পৃথিবী মুছে গেছে আজ।

সিতা আজও বিশ্বাস করলো, তার নিজের হৃদয়ের প্রতিশ্রুতি কোন দিন শিথিল হয়নি। তার অন্তর জানেন, সে কোন অপরাধ করেনি। শিশিরের জীবনে নতুন জ্যোৎস্নার উদয় হয়েছে। সিতার কাছে তাই সম্মুখের পথ এত অন্ধকারে ভরা—এত স্তব্ধ ও অবরুদ্ধ।

শিশিরের সব ভুল ক্ষমা করতে গিয়ে—সিতা নিজেকেও ক্ষমা করে দেয়। সারাদিনের ভাবনার অভিযানের শেষে হঠাৎ জ্যোৎস্না নামে এক অপরিচিতার মূর্তি যেন সিতার মুক্তির আতঙ্ক শান্ত করে দিল।

সিতা প্রস্তুত হয়ে নিল। গুরুদয়ালবাবুর সব নির্বোধ ব্যস্ততাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে। নির্লজ্জ হয়ে, নিজের মুখে তার চরম পরাজয়ের কাহিনী শুনিয়ে দিতে হবে কন্যাবৎসল গুরুদয়ালবাবুকে। তিনি স্বকর্ণে শুনবেন, তাঁর গর্বের দুলালী রত্নোপমা মেয়ের বিফল তপস্যার কাহিনী। তিনি তো বিশ্বাস করে আছেন যে, তাঁর মেয়ের ভালবাসা চন্দ্রসূর্যের হৃদয় জয় করতে পারে। আজ তিনি শুনবেন—নিতান্ত এক গানের মাস্টারের ঘরের হৃদয়ে ততোধিক তুচ্ছ এক কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারের বোন সগৌরবে জয়িনী হয়ে বসে আছে। ডোভার লেনের সোনার হরিণী সিতা সেখানে থেকে শুধু পরাজয়ের লাঞ্ছনা নিয়ে ফিরে এসেছে। পারুলদির চিঠি পড়ে একবার চেয়ারের ওপর মুষড়ে বসে পড়েছিলেন, আর একবার তেমনি অসাড় হয়ে বসে পড়তে হবে তাঁকে। জয়ন্তও শুনবে। শুনুক।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। জানালার পর্দাটা সরিয়ে একবার পথের দিকে তাকালো সিতা। গুরুদয়ালবাবু হয়তো এখুনি বেড়াতে যাবার জন্য ডাকবেন। ড্রাইভার গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করছে। সিতা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এখনো স্নান করা হয়নি, সাজ সারা হয়নি।

তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালো সিতা। বয় ব্যস্তভাবে গুরুদয়ালবাবুর জন্য চা নিয়ে যাচ্ছে, বারান্দার সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে। আর সময় নেই। নিত্যদিনের মত গুরুদয়ালবাবু বেড়াতে বার হবেন, সিতাকে ডাকবেন। এতক্ষণ

মিছামিছি কুঁড়েমি করে সময় নষ্ট করেছে সিতা। কোনরকমে আলগোছে একটু প্রসাধন সেরে নিয়ে, সাজ বদল করে তৈরী হয়ে নিল সিতা। যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ গুরুদয়ালবাবু! একবার ডেকে ফেললে শুধু পরিত্রাহি ডাকতে থাকবেন। হয়তো এই অহেতুক বিলম্বের জন্য অনুযোগ করে বসবেন। সে কৈফিয়তের লজ্জা এড়িয়ে যাবার জন্যই যেন সিতা তাড়াতাড়িতে একটা ছেঁড়া পশমী স্কার্ফ হাতে তুলে প্রস্তুত হলো। বাছাবাছি করারও আর সময় ছিল না।

সেইভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে সিতা শুনলো, গুরুদয়ালবাবু ডাকছেন। কিন্তু সিতাকে নয়।

—জয়ন্ত এসেছো! গুরুদয়ালবাবু ধীরে ধীরে ডাকছেন। ড্রইং রুম থেকে উত্তর এল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

একটা হিমাক্ত শীতলতা সিতার সমস্ত স্নায়ুজাল আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। আড়ষ্ট মূর্তিটা শুধু জোর করে সজীব হয়ে দু কান দিয়ে গুরুদয়ালবাবুর সেই স্নেহাপ্লুত আহ্বানের স্বর শুনছিল—জয়ন্ত এসেছো।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এইরকম একটি বাৎসল্যলালিত স্বর সিতাকে বেড়াতে যাবার আগে ডাক দিয়ে এসেছে। আজও গুরুদয়ালবাবু ডাকছেন। তবে সিতাকে নয়, তাঁরই কারবারের অর্ধ-অংশীদার জয়ন্ত মজুমদারকে। গুরুদয়ালবাবুর কারবারী হিসাবটা যেন আজ অঙ্কের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে নতুন এক অপত্যে উদার হয়ে উঠেছে। যেন নিজের ছেলেকে আদরের সুরে ডাকছেন গুরুদয়ালবাবু—জয়ন্ত এসেছো!

গাড়িটা স্টার্ট নিল, দারোয়ান ফটক খুলে দিল, গাড়িটা সশব্দে চলে গেল। জয়ন্তকে সঙ্গে করে বেড়াতে চলে গেলেন গুরুদয়ালবাবু। জড় মূর্তির মত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু কান দুটোকে কোনক্রমে অসহ কৌতূহলে সজীব রেখে, একে একে প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেল সিতা।

অনেকদিন পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বালিগঞ্জ প্লেসের বাসার ছোট বারান্দাটা একটি বাঞ্ছিত পদক্ষেপের শব্দে সাড়া দিয়ে উঠলো। শিশির ডাকলো—বিপিন!

শিশিরের গলার স্বরে ঘরের ভেতর সবগুলি আলোর বাল্‌ব যেন বহুদিনের অবহেলার কুণ্ঠা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে প্রখর পুলকে জেগে উঠলো। দুবার হোঁচট খেয়ে, একবার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, দুর্বশ্য আনন্দে অস্থির হয়ে দৌড়ে এল বিপিন।

ঘরের ভেতর থেকে সোজা দৌড়ে এসে শিশিরের সামনে দাঁড়ালো বিপিন। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিজের মনের দুরন্ত আনন্দের আবেগগুলির মধ্যে যেন কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেতে লাগলো। তার পরেই শিশিরের হাত দুটো দুহাতে নিবিড়ভাবে চেপে আস্তে আস্তে বললো—এসেছ!

শিশির একটু বিস্মিতভাবেই বিপিনকে দেখছিল। দণ্ডবৎ করতে ভুলে গেছে বিপিন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার দুঃখ ও উৎকণ্ঠা তার ভৃত্য-ধর্মকে ক্ষণিকের জন্য ভুল করে দিয়েছে। একটি ব্যথিত বান্ধবের হৃদয় নিয়ে বিপিন শিশিরের হাত দুটো তেমনি তৃপ্তিভরা আবেগে ধরে রইল।

শিশির বললো—হ্যাঁ, চলে এলাম বিপিন, বর্ধমান হাসপাতাল থেকে কাল ছাড়া পেয়েছি।

বিপিন কিছুক্ষণ কৌতূহলী হয়ে শিশিরের মুখের চেহারাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল। তারপর একটু রাগের সুরে বলে ফেললো—এ কি চেহারা করেছ! দুটো অক্ষর লিখে একটা চিঠি ছেড়ে দিলে আমি কি হেথায় চুপ করে বসে থাকতাম? আর তুমিই বা হোথায় একা একা অসুখে আপদে পড়ে থাকতে?

বিপিনের ভাষার মধ্যে হঠাৎ এই তুমিত্বের প্রসার শিশিরের সবচেয়ে বেশি মজার লাগছিল। বিপিনই স্বয়ং যেন গৃহস্বামীর মত এক প্রিয় অতিথিকে সাগ্রহে সংবর্ধনা ক'রে ঘরে

ঠাঁই দিতে এগিয়ে এসেছে। শিশিরের হঠাৎ মনে হয়—তবে কি বিপিন ঘর ফিরে পেয়েছে? হতে পারে।

গেঁয়ো বাঙালী চাষীর ছেলে বিপিন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, আধপেটা খেয়ে সুখে থাকাই ওর রক্তের ধর্ম। ভিক্ষে করতে জানে না, অপরাধ করতে বুক কাঁপে, শুধু অমিত সহ্যের পৌরুষে সারা দেশের কাপুরুষতার কলঙ্ককে ওরা কোনমতে ঢেকে রাখে। এক আত্মীয়তাহীন জাতির কোলে জন্ম নিয়েও সে দুর্ভাগ্যকে ওরা ক্ষমা করে দেয়। দেশের মাটির প্রাণটুকু ওদেরই হাতের আলবাঁধা ক্ষেতে ও মাঠে যুগ যুগ ধরে সবুজ হয়ে ফুটে আছে। যত দেশী বিত্তলম্পট আর বিদেশী শাসকের ব্যভিচারী আমলার সুখের প্রদীপে ঘি যোগাতে গিয়ে ওরা নিজেরাই সারা হয়ে যায়। মাত্র কটি মাস উচ্ছন্ন বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে এই অবিধির অবাধ লীলা দেখে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে শিশির। ইতিহাসের নিয়মে কি করে এত বড় একটা অনর্থ লুকিয়ে থাকতে পারে, ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা পায়নি শিশির। এত মহৎ ত্যাগের শক্তিও ওদের আজ আর বাঁচাতে পারলো না। যুদ্ধের অছিলায় সেই যুগব্যাপী পাপের ষড়যন্ত্রটা যেন একেবারে নির্লজ্জ হয়ে উঠলো। মরলো তারাই, যারা এতদিন নিজেরা মরিয়া হয়ে সবাইকে বাঁচিয়ে এসেছে। সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে, সারা দেশে লুটতরাজ চুরি দাঙ্গার সংখ্যা নাকি এই বছরেই সব চেয়ে কম। এতই ধীর স্থির সংযত মনুষ্যত্ব! অন্নাভাবে শুধু এরা ভিখিরী হয়ে পড়ে, কেড়ে খেতে জানে না। এই মুমূর্ষু মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার মত একটিমাত্র মন্ত্র ছিল—কেড়ে খেতে শেখাবার মন্ত্র। অভাগাদের হাতে মার না খেলে কখনো ইতিহাসের কোন অনাচার স্তব্ধ হয়নি। আজও হবার নয়...।

হঠাৎ সাবধান হয়ে উঠলো শিশির। চাযাভুষোর ভাল মন্দ নিয়ে এই প্রগলভ সমবেদনার আজ আর কোন সার্থকতা নেই। চিন্তাগুলি যেন এক বিস্মৃতির ফাঁকে নেহাত ভুল করে অনধিকার চর্চা করে চলেছে। কিন্তু আর নয়, আর দ্বিতীয়বার ভুল করতে চায় না শিশির। এই ভুলেরই ভয়ানক ধাঁধা থেকে এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছে শিশির। এ খবর কেউ জানে না।

বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে শিশিরের ক্লান্ত মস্তিষ্কে পরক্ষণেই একটা বিরুদ্ধ চিন্তা ছটফট করে উঠলো।—এই যে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই সুস্থ সবল জোয়ান চাষীর ছেলে, পেটের দায়ে চাকর হতে এসেছে, এই মুর্খগুলির ঘর বাঁধবার শক্তি নেই, তবু এরা কেন এত গৃহসুখকাতর?

যেন আত্মধিক্কারের একটা গ্লানিকে বিপিনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা করছিল শিশির। কেমন বিমর্ষ বিষণ্ণ ও অবসন্ন হয়ে ফিরে এসেছে শিশির। বর্ধমান হাসপাতালের রোগশয্যায় পনের দিন ধরে ছটফট করে যেন চুপে চুপে চলে এসেছে সে। তার কর্মজীবনের সব গর্ব কিসের একটা অভিমানের সংকোচে লজ্জিত হয়ে একটা ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

শিশিরের অবান্তর চিন্তার উত্তেজনা হঠাৎ ছোট একটা ঘটনার আবির্ভাবে শান্ত হয়ে গেল। বিপিনের পেছনে একটি অবগুণ্ঠিতা পল্লীনারীর মূর্তি সসংকোচে এসে দাঁড়ালো। বিপিন এক পাশে সরে গেল। শিশিরের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো টুনার মা।

শিশিরের বিস্ময় একটা রূঢ় আনন্দধ্বনির মধ্যে বেজে উঠলো।—এ কি বিপিন? টুনার মা সত্যিই এসেছে? কবে এসেছে? টুনা কই?

বিপিন।—টুনা আর এল না বাবু!

বিপিন আর বিপিনের বৌয়ের চাপা কান্নার অর্থটা স্পষ্ট হয়ে উঠতেই শিশির ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘরের ভেতর চুপ করে বসে স্বস্তি পাচ্ছিল না শিশির। চারদিকে যেন কতগুলি ব্যর্থতার ছায়া লুকিয়ে রয়েছে! বাজনাগুলির দিকে তাকিয়ে তাই মনে হয়—এক গাদা বিফলতার আবর্জনা। তবু টুনার কথা থেকে থেকে মনে পড়ে। টুনাকে জীবনে কখনো চোখে দেখেনি শিশির। তবু শিশিরের শোকার্ত কল্পনার কোণে, টোকো মাথায় পাচনবাড়ি হাতে একটি ন্যাংটো চাষী-শিশুর বিচিত্র মূর্তি দেখা দেয়। টুনার মতই তারও সকল কাজের সাধ যেন অকালে মরে গিয়েছে। ব্যর্থ হয়ে, ভয় পেয়ে, ব্রতভঙ্গ করে, বিশ্বাস হারিয়ে অপরাধীর মত ফিরে এসেছে শিশির।

বিপিন যেন সত্যিই অতিথিসৎকার করছে। কাজের উৎসাহে চীৎকার করে, টুনার মাকে দুবার ধমক দিয়ে, শিশিরকে হাত-পা ধোয়ার জন্য জল দিয়ে বাজারে চলে গেল বিপিন।

শিশিরের নজরে পড়লো, ঘরের দেয়ালের ব্র্যাকেটে বিপিনের একটি ধুতি ও গামছা ঝোলানো রয়েছে। টেবিলের ওপর একটা সিঁদুরের কৌটা ও আলতার শিশি।

শিশিরের দৃষ্টিটা ক্রমেই অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণতায় যেন হিংস্র হয়ে উঠছিল। বিপিনের বৌ তখন উনুনে আগুন ধরিয়েছে। ঘরের ভেতর পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া স্বচ্ছন্দে এসে ঢুকছে। বোধ হয় চায়ের জল চড়াবার আয়োজন হচ্ছে। বিপিন নিশ্চয় খাবার আনতেই বাজারে গেছে—অতিথি সৎকারের জন্য। আর একটু পরেই ফিরে আসবে। তারপর?

ব্যর্থতায় শতদীর্ণ, ভগ্নোদ্যম মনের ধ্বংসের ওপর, শিশিরের একটা বিষাক্ত সখ ধীরে ধীরে সাপের মত কেৎরে উঠলো—ফিরে আসুক বিপিন। তারপর দুজনকে তাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? চাকর চাকরানীর আর প্রয়োজন নেই তার। এ বাসা হয়তো শীঘ্রই ছাড়তে হবে। বোধ হয় কলকাতা ছেড়েই চলে যেতে হবে। এখানে মুখ দেখাবার আর জায়গা নেই। ফিরে আসুক বিপিন।

বাইরের আলো যখন আর ভাল লাগে না, তখন ঘরেতে অন্ধকারই ভাল লাগে। শিশিরের শুধু মনের অবস্থা নয়, মনের ইচ্ছাও এখন কতকটা সেই রকমের। বিপিনের এত সখ্যের উচ্ছ্বাস আর প্রীতির উৎসাহ ভাল লাগছিল না শিশিরের। ঘরের ভেতরে বিদ্যুতের বাল্‌ব এত প্রখর আলো ছড়াচ্ছে—শিশিরের অস্বস্তি হচ্ছিল। বিপিনের বৌ প্রণাম করে গেল—সেটা যেন হঠাৎ ভুল করে ভাল লেগে গিয়েছিল শিশিরের। বোধ হয় সে সময় একটু আনমনা হয়ে ছিল, সেই জন্যই। এই আনমনা চিন্তার ফাঁক পেয়েই বোধ হয় কল্পনায় টুনার স্মৃতিটা হঠাৎ ক্ষণিক শোকের আবেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল। নইলে শিশিরের আজ আর এসব ভাল লাগার কথা নয়।

সংসারের আশার মর্যাদা আছে, প্রেমে নিষ্ঠার মূল্য আছে, স্নেহে ও প্রীতিতে পর আপন হয়, কামনা ও প্রার্থনা সফল হতে পারে, বিরহ কভু মিলনে মহিম হয়ে উঠতে পারে—এসব সত্যিই কি জীবনের নিয়ম, না ব্যতিক্রম? শিশিরের সন্দেহ হয়। ত্যাগের মধ্যে সত্যিই কোন শক্তি আছে কি? আদর্শ? আদর্শ সফল হবেই একথা কে বলতে পারে? মহৎ হলেই সেটা দুরূহ হবে, এটাই বা কোন নিয়ম? দুরূহ আদর্শ ছাড়া কি আদর্শ হয় না? যা সহজ স্বচ্ছন্দ সুমধুর—তাই দিয়ে কি জীবন সাজানো যায় না? একটু অলস রঙিন শান্ত জীবন—হলোই বা? ক্ষতি কি?

বিপিন তখনো বাজার থেকে ফেরেনি। বহুদিন পরে বালিগঞ্জ প্লেসের এই ছোট বাসার ঘরটা আবার এক নিভৃত নীড়ের ভীরুতা ও সোহাগ দিয়ে যেন শিশিরের পলায়ন-ক্লান্ত কর্মীজীবনের সকল শৌখিন সংগ্রামের চপলতাকে ক্ষমা করে ধীরে ধীরে আপন করে নিচ্ছিল। এখানে এইভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলে বাইরের সব সত্য যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। মনে হয়, সংসারে ঝড় নেই রোদ নেই। থাকলেও তার কোন সার্থকতা নেই। সেসব বাইরেই থাক। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম—কংগ্রেস অবনী অরুণা—এসব যেন এক ভিন্ন

পৃথিবীর ঝঞ্ঝা। কতগুলি অতি নিষ্ঠুর ছলনা। একটা মোহ।

আমি ও আমার সুর—বেশ তো সুখে ছিলাম। মনের গহনে একটা ক্ষোভ যেন কাতরভাবে চোখ মেলে বার বার শিশিরকে অনুযোগ করতে থাকে। তবে কেন বহুজনের বিড়ম্বনার বোঝা সখ করে মাথায় বইতে যাওয়া ও ব্যর্থ হওয়া?

প্রশ্নটা আরো নিবিড় অনুশোচনায় দীর্ণ হয়ে ওঠে। তুমি ও তোমার সিতা—আরও সুখের আলো উঁকি দিয়েছিল তোমার একাঘরের জীবনে। তবে কপাট বন্ধ করে দিলে কেন? সরে পড়লে কেন? এ কোন মূঢ়তা তোমার?

বর্ধমান হাসপাতালের রোগশয্যার রাতজাগা আতঙ্কটা আবার কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত চিন্তার ওপর অন্ধকারের গুমোট টেনে আনে। তিনকোপ জীয়নপুরের এক হাজার নরকঙ্কালের পায়ের শব্দ যেন সেই অন্ধকারে দৌড়দৌড়ি করে বেড়ায়। বোধ হয় তারা পৃথিবীর ঘাট মাঠ ঢুঁড়ে ফিরছে—শিশিরকে খুঁজছে—আগুন লাগিয়ে দিয়ে যে-লোকটা আলগোছে পালিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, ঘটনাটা যে একেবারে সত্য। তিনকোপ থেকে জীয়নপুর যেতে, গ্রামে ঢোকবার আগে, পথের পাশে একটা ভাঙা একচালা ঘরের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়েছিল শিশির। চালাঘরের পেছন দিকে একটা কাঁঠালীচাঁপার গাছ। পাশে আরও দু'তিনটে ছোট ছোট ঘরের শুধু ভিটের চিহ্ন দেখা যায়। ঘরের চারদিকে কতগুলি ছিন্ন সংবাদপত্রের টুকরো কাদামাটির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে আছে। একটা কাঠের ভাঙা সাইনবোর্ড সামনের আঙিনায় ঘাসের ওপর পড়ে আছে—বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেছে লেখাগুলি।

আগন্তুক শিশিরের পাশে এক একটি করে পথচারী গাঁয়ের লোক আরও বেশী কৌতূহলী হয়ে এসে দাঁড়ালো।—কি দেখছেন বাবু? ওটা কংগ্রেস আপিস ছিল।

এই কথাটাই শোনবার জন্য যেন শিশিরের সমস্ত হৃদয় উৎকর্ণ হয়ে ছিল। শোনামাত্র অদ্ভুত এক পুলকের রোমাঞ্চ তার গা-ভরা জ্বরের জ্বালাকে স্নিগ্ধ প্রলেপের মত জুড়িয়ে দিল কিছুক্ষণের জন্য। যেন এক পুরাতন যুদ্ধক্ষেত্রের পুণ্য মাটির ওপর এসে দাঁড়িয়েছে সে। পরিত্যক্ত কংগ্রেস আপিসটা এক বিধ্বস্ত শিবিরের গৌরব নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

শিশির বললো—আপিসটাকে সারিয়ে তুলতে হবে ভাই, এই কাজের জন্যই আমি এসেছি। এস সবাই—সাহায্য কর।

সে-রাত্রে সত্যিই কাঁঠালীচাঁপার তলায় একটি তকতকে খড়ো একচালার ভেতর নতুন একটি প্রদীপ জ্বলে উঠলো। কংগ্রেস আপিসের জীর্ণদেহটা নতুন বাঁশ খুঁটি আর মাটির সাজ পরে আবার এক প্রাণপূর্ণ নিকেতনের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেল।

পরদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার ক্ষুধার্তের সভা হয়ে গেল—সত্যাগ্রহ হবে। সেই দুর্ধর উৎসাহ আর কোন ভ্রম সংশয় সংকটের বাধা মানছিল না। তারা শুধু তাকিয়ে দেখছিল—কাঁঠালীচাঁপার তলায় নতুন কংগ্রেস আপিস—যেন নতুন এক যজ্ঞের শিখা জ্বলছে। তারা দেখছিল শিশিরকে—দেবতার দূত আবার ফিরে এসেছে।

পরের দিন দুপুর হতে না হতে জীয়নপুরের চালের গোলার চারদিকে ক্ষুধার্তের দল ধর্না দিয়ে ঘিরে রইল। চাল না পেলে তারা নড়বে না। দূরে দাঁড়িয়ে জীয়নপুরের থানাটা শুধু এ-দৃশ্য দেখলো আর মনে মনে হাসলো।

গোলাদারের চাকেররা বস্তা বস্তা শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া ছড়াতে লাগলো চারদিকে। পিচকারিতে গরম জল ভরে নিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হলো। কতকগুলি কুকুর অবিশ্রান্ত চীৎকার করে এই অপার্থিব দৃশ্যের বীভৎসতাকে ঝিক্কার দিতে লাগলো।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ক্ষুধার্তেরা যেন এক উৎকট ধর্না দেওয়ার সুখে বোধশক্তিহীন হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে রইল।

শিশির বোধ হয় জানতো না যে গোলাদারের লেঠেলরা পেট ভরে খেতে পায়—তাদের লাঠির জোর আছে। বিকাল হতে না হতে ক্ষুধার্তদের সত্যাগ্রহের হর্ষ আর্ত চীৎকারে বেজে উঠলো। তখন সূর্য ডুবছিল। কাঁঠালীচাঁপার তলায় দাঁড়িয়ে শিশির শুনলো, সেই আর্ত চীৎকারটা প্রহৃত ঝড়ের মত দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে যেন ছুটে আসছে। তার পরেই দেখলো—তারা দৌড়ে আসছে। ক্ষুধাজীর্ণ কতগুলি চলমান কঙ্কাল শোণিতস্নান সেরে যেন দৌড়ে আসছে—মাথা ফাটা, নাক ফাটা, কান ফাটা। গোলাদারের লেঠেলরা ফাটিয়ে দিয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে জীয়নপুরের থানা শুধু চুপ করে এ-দৃশ্য দেখেছে, টাটকা ঘুষের নতুন নোট গুনেছে, খইনি টিপেছে আর বিড়ি ফুঁকেছে।

প্রথম হতভম্বতা ভাল করে ভাঙতে না ভাঙতেই শিশির শুনলো—লাঠি লাঠি লাঠি। শিশিরকে ঘিরে তারা চীৎকার করছিল।—এত মার সহ্য করবো না বাবু। আমাদিগের কি লাঠি নাই? চলুন বাবু, দেখে নেব আজ, কত চিঁড়া খেয়েছে লেঠেলরা।

লাঠি লাঠি লাঠি—তারা লাঠি খুঁজছিল, শিশিরকে ডাকছিল। বাঁশের ঝাড়গুলি পটপট শব্দে উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। এক একটা ক্রুদ্ধ জনতা চীৎকার করে বাঁশঝাড় ছিঁড়ে লাঠি তৈরি করছিল। একটা ছেলে দৌড়ে একটা শাঁখ নিয়ে এল, আর একজন নিয়ে এল একটা ঢাক। ওদের রক্তে প্রতিশোধের বান ডেকে গেছে, চোখগুলি যেন এক সর্বনাশের নেশায় লাল হয়ে উঠেছে। সব বিবেচনার বালাই আজ ওদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। শাঁখে ফুঁ দিয়ে, ঢাক বাজিয়ে, লাঠিগুলি এক মারাত্মক আনন্দে দুলতে লাগলো।

—চলুন বাবু। ক্রুদ্ধ জনতার ফেনিল উল্লাসের একটা ঢেউ সরোষে ভেঙে পড়ে শিশিরকে আহ্বান করলো। শিশির যেন সেই ঢেউয়ের শীর্ষে চড়ে ভেসে গেল—এগিয়ে চললো।

বেশী দূর এগুতে হয়নি। সবচেয়ে আগে পথ রোধ করে দাঁড়ালো জীয়নপুরের থানা। দশজন লাঠিধারী আর দু'জন বন্দুকধারী কনস্টেবল আর একজন পিস্তলধারী সাব-ইনস্পেক্টর। জীয়নপুরের থানার আত্মাটা যেন এতক্ষণে, এই চীৎকারে খইনির স্বপ্ন ভেঙে শান্তি ও শৃঙ্খলার ঝুঁটি ধরবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। লেঠেলরা বোধ হয় আছে আরও পেছনে, আর এক দফা চিঁড়ে খেতে বসেছে। গোলাদারেরা আরও একটু দূরে—নিজের নিজের গদিতে, সিদ্ধিদাতা গণেশের ঠিক মুখোমুখি।

অন্নপিশাচ গেঁয়ো কঙ্কালগুলির কাঁচা বাঁশের লাঠি উন্মত্ত হয়ে ওঠার আগেই কতগুলি আলোহীন মুহূর্ত যেন শিশিরের সংজ্ঞা স্তব্ধ করে দিল। আড়াল থেকে যেন এক সরীসৃপের ঠাণ্ডা শোণিত তার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। মাথার তালু থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছিল শিশিরের—ঘামে ভিজে উঠছিল। পেছন ফিরে একবার অবারিত মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলো শিশির—অস্তাচলের আকাশ ক্রমেই বিষণ্ণ হয়ে উঠছে।

বর্ধমান হাসপাতালের রোগশয্যায় প্রথম জ্বরের বিরামের মধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রথম বুঝতে পারলো শিশির—সে পালিয়ে এসেছে। কেমন করে, কোন পথে পালিয়ে এল—ঠিক মনে পড়ে না। কেন পালালো? ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না শিশির।

কাঁকুলিয়া রোডে সেই সর্বনেশে এক জাদুকরের আস্তানার মত বাসাটার মধ্যে এখনো বেঁচে আছে অবনীনাথ, যার সকল আয়োজন আর বিশ্বাসের পিঠে পেছন থেকে ছুরি মেরে সে আজ পালিয়ে এসেছে। অরুণার নামে কি সব আবোল-তাবোল লিখে ফেলেছে চিঠিতে! সে ধরা পড়ে গেছে। কি ভাবলো অবনীনাথ? অরুণাও নিশ্চয় সেসব চিঠি পড়েছে। অবনীকে হিংসে করার এ দুঃসাহস কোথা থেকে পেল শিশির!

হাসপাতালের রোগশয্যায় শুয়ে দুঃস্বপ্নটা আরও যন্ত্রণাকর হয়ে ওঠার আগেই ঘুম ভেঙে যায় শিশিরের। জেগে উঠে চোখ মেলে তাকায়, বুঝতে পারে, সবদিক দিয়ে তার সব পথ আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

জীবনে নিজের ওপর কখনো এতখানি দরদ অনুভব করেনি শিশির। কোন দুঃখে পরের জন্য ফুরিয়ে যাবে সে? তার দুঃখে পরের চোখে কতটুকু কান্না বরাদ্দ আছে? কিছু নয়, এই হাভাতেরা বেঁচে থাকলে তার চিতার ওপর সোনার দেউল গড়ে তুলবে না। নিজের ভাগ্য বোঝে না হাভাতেরা, তবে সে-ই বা কেন বৃথা তাদের জন্য নিজের ভাগ্য বিলিয়ে দেবে? পরার্থে প্রাজ্ঞেরা উৎসর্গিত হতে থাক, শিশির পারবে না।

শিশিরের আজ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, জনতার সেবা, মানুষের মুক্তি, সংগ্রাম—এসবই যেন কোন এক হিংসুক দার্শনিকের তৈরী কতকগুলি চতুর নীতিসূত্র। একজনের সুখ দশজনের সহ্য হয় না বলেই আদর্শের নামে একটা কারসাজিকে বিচিত্র মোহ দিয়ে রঙিন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দুনিয়ার যত অবহেলার অভাজনগুলির সঙ্গে মিশে নিজের ভাগ্য খর্ব করতে হবে। একেই নাকি আত্মত্যাগ বলে—একটা আদর্শ। তবে আত্মহত্যা দোষের কেন?

নিজেকে নিয়ে সুখী হতে পারতো শিশির। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভুলের ঝড় এসে সব ওলটপালট করে দিল। এই ভুল আজ বুঝতে পেরেছে শিশির।

তাই বর্ধমান হাসপাতাল থেকে সোজা কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে। এবার থেকে আরম্ভ শুধু ভুল সামলাবার ব্রত। আত্মশুদ্ধির সাধনা।

সবার আগে মাপ চাইতে হবে সিতার কাছে। সিতা...।

মনের ভেতর একটা অপরাধের জ্বালাকে অনুনয়ে শান্ত করার জন্য যেন দুহাতে মাথাটা টিপে কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে রইল শিশির। মনে পড়ে, গত এক বছরের ইতিহাসে জীবনের এক পরম প্রাপ্তিতে কী অবহেলায় অপমান করেছে সে।

এতক্ষণে বিপিন ফিরেছে বাজার থেকে। ভেতরের বারান্দায় বিপিন আর বিপিনের বৌয়ের ব্যস্ত বাক্যালাপের শব্দ খুবই স্পষ্ট হয়ে শোনা যায়।

গান ছেড়ে দিতে হবে, বাজনাগুলো বেচে দিতে হবে, এই খদ্দরের সাজের ভণ্ডামিতে আজ থেকেই ইতি, পারুল বৌদিকে কাল চিঠি দিতে হবে, মেজদা একবার আসুক, আর আলমারিভরা এই রাগ মহাদেশের যত স্বরলিপির জঞ্জাল অচিরে শেষ করে দিতে হবে—পুড়িয়ে হোক বা ছিঁড়েই হোক।

এই বাসাটাও ছাড়তে হবে।

বিপিন ডাকলো—আসন হয়েছে বাবু, আসুন।

বিপিনের আহ্বানের শব্দে যেন আচমকা একটা তন্দ্রা ছিঁড়ে গেল শিশিরের।

—কিসের আসন? বিরক্ত হয়ে শিশির প্রশ্ন করলো।

কৃতার্থতার আবেগে ধন্য হয়ে বিপিনের প্রত্যুত্তর আবার শোনা গেল।—খাবেন আসুন।

কোন উত্তর দিল না শিশির। বিপিন নামে এই নগণ্য জীবটার গলার স্বরেও আজ কী স্পর্ধার সুর। সুখী হতে ও ঘর বাঁধতে সবাই শিখেছে। আড়ালে অগোচরে সকলেই শুধু যেন শিশিরকে বাদ দিয়ে জীবনভরে তৃপ্তি আর সফলতা কুড়িয়ে ফিরছে।

শেষপর্যন্ত বিপিন একেবারে সামনে এসেই বিরক্তির স্বরে অনুযোগ করলো।—বার বার ডাকছি যে বাবু।

শিশির বিপিনের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল। ঈর্ষায় আবিল অথচ তীব্র একটা দৃষ্টি। বিপিনের সকল উৎসাহের শিখা যেন একটি ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে শিশির বললো—কেন ডাকাডাকি করছো?

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল বিপিন। ধীরে ধীরে তার সারা মুখের দীপ্তি মুছে গিয়ে সেই পুরাতন দরিদ্র অরণ্যভুক জীর্ণ মানুষের মূর্তিটা ফুটে উঠতে লাগলো।

শিশির বললো—তোমাদের তো আর এখানে থাকা চলবে না।

মেঝের ওপর অবসন্নের মত বসে পড়লো বিপিন। ঘরের মধ্যে এই আকস্মিক

নিস্তব্ধতাকে সন্দেহ করেই বোধ হয় বিপিনের বৌ দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

শিশির বললো—আজই চলে যাও তোমরা। আমার অসুবিধা হচ্ছে।

আকস্মিক একটা আঘাতে মেরুদণ্ডটা যেন ভেঙে গিয়ে বিপিনের শরীরটা কুঁচকে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছিল। দু হাঁটুর ফাঁকে তার ভয়ার্ত মুখটাকে জোর করে গুঁজে দিচ্ছিল বিপিন। পেছনে দরজার আড়াল থেকে বিপিনের বৌ ডাকলো—শোন।

একবার উঠে গিয়েই আবার ফিরে এল বিপিন। বললো—হাঁ বাবু, এখুনি চলে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু আপনি আগে খেয়ে নিন।

বিপিনের অনুরোধটা যেন অপমানের চাবুকের মত শিশিরের সারা অন্তরাত্মার ওপর আছড়ে পড়লো। কী উদার, কী উদ্ধত হয়ে উঠেছে বিপিন! কত সহজে, অবাধে, সে আজ শিশিরের মত প্রভুকেও অনুকম্পা করছে!

উদ্যত আক্রোশটাকে চাপা দিয়ে শিশির শুধু দুটি সুশাণিত কথায় তার শেষ নির্দেশ জানিয়ে দিল।—যাও তোমরা।

বিপিন তবু দাঁড়িয়েছিল। বিপিনের বৌ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিপিনের হাত ধরে একটা টান দিল।—চল।

চলেই গেল। আলোকিত বৈঠকখানা ঘরের দরজাটা পার হয়ে বারান্দার অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা দুজন যেন ছায়া হয়ে গেল। পায়ের শব্দ আর শোনা যায় না। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো শিশির, তার জীবনের সব সুখ শান্তি ও কামনার সমাধির ওপর ওরা দু'জনে যেন ভুতুড়ে প্রতীকের মত হঠাৎ দীপ হয়ে জ্বলে উঠেছিল।

গুরুদয়ালবাবু আর জয়ন্তকে নিয়ে মোটরগাড়িটা সহর্ষে ফটক পেরিয়ে উধাও হয়ে যাবার পরেই কিছুক্ষণের জন্য একটা একটানা স্তব্ধতা সিতাকে অভিভূত করে রাখলো। ডোভার লেনের প্রাসাদোপম বাড়িটা এই মুহূর্তে একটা ভগ্নপ্রাকার পরিত্যক্ত দুর্গের মত বান্ধবহীন শূন্যতায় সিতার কাছে যেন নিরর্থক হয়ে উঠেছে। বাঁচবার মত এখানে আর কোন আশ্রয় নেই, আস্পদ নেই। কেউ তাকে বাঁচাতে চায় না। তাই সবাই একে একে দূরে সরে পড়ছে। স্বয়ংবরার সকল গর্ব এক মুহূর্তের চক্রান্তে যেন জহর অনলের শিখা হয়ে উঠেছে, তার আত্মলুপ্তির অভিশাপকে সত্য করে তুলেছে।

বড় দুঃখে লজ্জা অনুভব করছিল সিতা। নিজের ভীরুতা এবং দুর্বলতার জন্য নয়। গুরুদয়ালবাবু কত সহজে ধরা পড়ে গেলেন। এখনো চূড়ান্ত কিছুই হয় নি। শুধু পারুলদির একটি চিঠি একটা সুগোপন সত্যকে ব্যক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এই সামান্য চিঠির মর্মটুকুই যেন গুরুদয়ালবাবুর বাৎসল্যের জগতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে তাঁর সোনার হরিণী মেয়ে তাঁর কাছে মাটি হয়ে গেছে। আর দুদিন পরে হয়তো চিনতেই পারবেন না। তাঁর বাইশ বছরের প্রতিটি উৎকণ্ঠা উদ্বেগ স্নেহ ও ভালবাসা ঊর্ণাজালের মত কী ক্ষীণ বন্ধনে গ্রথিত ছিল, তার মধ্যে এতটুকু হৃদয়ের সত্য ছিল না। গুরুদয়ালবাবু আজও হয়তো মুখে স্বীকার করবেন না, কিন্তু আর কোন প্রমাণের বাকি আছে? তাঁর আচরণেই এই সত্যটা আজ সব দিক দিয়ে নির্লজ্জ হয়ে ওঠেনি কি?

সে ভীরু, সে দুর্বল—তাই সে আজ পরাভূত। সিতা মনে মনে তার সব অপরাধকে অকপটে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষিতা নারীর অপমানের জ্বালার মত দুঃসহ একটা ক্ষোভ তার উত্তেজিত চিন্তার পরতে পরতে হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। হিতাহিত বিবেচনার দ্বিধা, অভিমানের সংকোচ, নিরীহতার বাধা চূর্ণ করে একটা প্রতিশোধের অভিলাষ মরিয়া হয়ে ওঠে।

সিতা আজ বুঝতে পারে, সোনার হরিণী সে নয়। ব্রোকার গুরুদয়াল বসুর ডোভার

লেনের বাড়িটাই সত্যিকারের স্বর্ণ তপোবন। এর বাইরে থাকলে সিতার কোন মূল্য থাকে না।

বেশ তো! তাই বলে কি প্রতিশোধ নেওয়া যায় না? গুরুদয়ালবাবুর স্তব্ধীভূত বাৎসল্যের স্নায়ুগুলিকে কি কোন উপায়ে আবার আকুল করে তোলা যায় না? খুব পারা যায়। ভাবতে ভাবতে সিতার মুখটা কঠোর হয়ে ওঠে। আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে, সারা মুখটা কী ভয়ানক কালো হয়ে উঠেছে! হোক।

সত্যিই যেন তার চিন্তার গহনে একটি পথ আবিষ্কার করতে পেরেছে সিতা। আত্মলুপ্তি ছাড়া যদি গতি নেই, তবে সেই পথই ভাল।

এই স্বর্ণ তপোবনের বাইরে যেন শুধু বনজঙ্গল পড়ে রয়েছে—গুরুদয়ালবাবু বোধ হয় তাই মনে করেন। কিন্তু হীরা মরকতের তপোবনও যে আছে। পয়সা আর পুঁজির জোরে ব্রোকার গুরুদয়াল বসুকে কিনে ফেলতে পারে, এমন বড়লোকও যে আছে, সেকথা কেন ভুলে আছেন তিনি?

দেরাজ হাতড়ে ধীরে ধীরে একটা পুরনো চিঠি বার করে সিতা। লীলা পিসিমার চিঠি, প্রায় বছরখানেক আগেকার লেখা। রাজসাহী থেকে লীলা পিসিমা এক বিয়ের প্রস্তাব করে লিখেছিলেন, সিতার সম্মতি জানতে চেয়েছিলেন। এই চিঠিতেই পাত্রের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে—মতিগঞ্জ রাজস্টেটের বার আনির মালিক কুমার অনিমেষ রায়, সুশ্রী যুবক, বিলাত ফেরত, বড় ব্যবসায়ী, বড় অমায়িক সরল সদয়, দানী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ; প্রথমা পত্নী বিগতা, বিয়ের এক বছর পরেই।

চিঠিটা চোখের সামনে টেনে নিয়ে পড়ছিল, যেন একটা বিষের মোড়ক খুলে দেখছিল সিতা। সিতার চোখে যেন সেইরকম একটা আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা। এক বছরের মধ্যে যে-চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি, সিতা আজ সেই চিঠির উত্তর দেবে। একটা কদর্য সঙ্কল্পের ছায়া পড়ে সিতার নিষ্প্রভ লাবণ্যহীন মুখটা আরও কুৎসিত হয়ে উঠলো।

তবু একটা সান্ত্বনা নেশার মত সিতার এই নিদারুণ হঠকারিতাকে মোহগ্রস্ত করে তুলছিল। পরিণামের কথা নিয়ে ভাবনার আর কোন প্রয়োজন নেই। সিতা শুধু দেখতে চায়—গুরুদয়ালবাবুর নির্বাসিত বাৎসল্য আবার এই হীরার জলুসের ধাঁধা লেগে হঠাৎ কোন মূর্তিতে দু'বাহু তুলে অধীর আগ্রহে ছুটে আসে, ক্ষমা চাইতে, করুণা কুড়োতে—মতিগঞ্জের বধূরাণী সিতাকে শতবার নিজের মেয়ে ভেবে ধন্য হতে। সিতা দেখবে—উদ্ধত জয়ন্তের ছায়া একেবারে ব্যর্থ হয়ে গুরুদয়ালবাবুর বাড়ি আর হৃদয়ের আঙিনা থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে।

দরজার বাইরে পর্দার আড়ালে একটা মূর্তি উসখুস করছিল। সিতা ডাকলো—কে?

বয়টা এগিয়ে এসে বললো—দশটা বেজে গেছে দিদিমণি। টেবিল দেব?

—না, শরীর ভাল নয়। খাব না।

একটা হিস্টিরিয়ার আবেশের মধ্যে যেন কাজ করে চলেছে সিতা। চিঠির প্যাড আর ফাউন্টেন পেন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে লিখতে বসলো।

একটি লাইনও লিখতে পারলো না সিতা। গভীর রাত্রির শব্দহীন শান্তি ধীরে ধীরে সিতার ছন্নছাড়া চিন্তার বিকার সুস্থ করে আনতে লাগলো। আত্মহত্যার মত এই প্রতিশোধের লিপ্সা, এই কৃত্রিম জয়ের কল্পনা—নিছক মূঢ়তা ছাড়া কিছু নয়। এভাবে অবশ্য বুড়ো গুরুদয়ালবাবুকে হারিয়ে দিতে পারা যায়, জয়ন্তকে জব্দ করা যায়—কিন্তু সবার আগে যার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত, সেই খেয়ালী শিল্পী আর দেশকর্মী শিশির নামে সকল অপরাধের প্রধান আসামীর জীবনে এক তিল শাস্তির জ্বালা স্পর্শ করবে না। রাগ মহাদেশ, জাতিসেবা, কংগ্রেস—কতগুলি ফাঁকির আড়ালে, সিতার জীবনের প্রথম অভ্যর্থনাকে পরিহাস করে, সেই বরমাল্যবিলাসী গুণীর আত্মাটি আজ অগোচর হয়ে গেছে। তার ক্ষতি করার কোন সুযোগ

নেই। প্রাপ্তির প্রাচুর্যে সেই অপরাধীর সব কামনা ধন্য হয়ে আছে ; এক নতুন তৃপ্তির গোধূলি তার দীক্ষিত জীবনের আকাশ রঙে ও আলোকে ভরে রেখেছে। সব নাগালের বাইরে চলে গেছে সে।

সত্যিকারের প্রতিশোধ নেওয়া যেত, যদি কোন বিভ্রম আজ শিশিরকে অলীক করে ফেলতে পারতো, তার অনুরাগের ডাক যদি সত্যি করে পথ ঘুরে, হৃদয়ের দিক দিয়ে আজ দ্বিতীয় কোন সুজন খুঁজে নিতে পারতো--জয়ন্ত মজুমদারই হোক, বা কুমার অনিমেষ রায় হোক।

হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে শিউরে উঠলো সিতা। এই কুৎসিত চিন্তার ক্লেদ তার মনের ভিতর কী নোংরামির তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলেছে! জয়ন্ত আর কুমার অনিমেষ--হয়তো তারা ডোভার লেনের বাড়ির যোগ্য অতিথি, তারা গুরুদয়াল বসুর বংশ বিত্ত ও শ্রেণীর সুহৃদ, আত্মার আত্মীয়, আপন জন। কিন্তু সিতার মনের রাঙামাটির পথে পথিক হবার মত কি যোগ্যতা আছে তাদের? অসম্ভব।

কাঁদছিল সিতা। নিজেকে কঠিন করে রাখবার আর কোন শক্তি ছিল না সিতার। এই মুক্তিপথহীন অসহায়তার বেদনা যেন দু'চোখ ফুঁড়ে ঝর্ণা হয়ে ঝরে পড়ছিল। কিছুই করা যাবে না, কোন উপায় নেই। সিতা বসু নামে কোন শিক্ষিতা আধুনিকা প্রগতিবাদিনী ভিন্নপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই। ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ, ভিন্ন কোন সত্তা নেই! ব্রোকার গুরুদয়াল বসুর বিত্তকৌলীন্যের প্রতিটি রুচি সাধ অহংকার দিয়ে সিতার বাইশ বছরের জীবনের অস্থিমজ্জা রচিত। সব কিছুর আগে তাকে গুরুদয়াল বসুর মেয়ে হয়ে থাকতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলেই একেবারে ভুয়ো হয়ে যাবে সিতা।

আয়নার ওপর নিজের প্রতিচ্ছবিটার দিকে দরদীর মত তাকিয়ে দেখছিল সিতা। বিনা দোষে এক প্রচণ্ড শাস্তির জ্বালা সহ্য করে অদ্ভুত রকমের করুণ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে ঐ মূর্তিটা। সংসারের স্বরূপ বেশ ভাল করেই চিনে ফেলেছে সিতা। জীবনের প্রত্যেকটি লালিত প্রত্যয় এক একটি ছলনা ছাড়া কিছু নয়। গুরুদয়াল বসুর বাৎসল্যের রহস্য চেনা গেছে। আর শিশির? সে তো সকল অনিয়মের হৃদয়হীনতাকে চরম করে দিয়েছে । এত মিথ্যার সঙ্গে লড়বার মত শক্তি নেই তার। পুরাতন সিতা মরে যাক, আলোহীন বাসরের মত এক অনিয়মের পৃথিবীতে সকল ঘটনার ব্যভিচার ভীরুচিত্তে মেনে নিয়ে, শুধু ঠাঁই খুঁজে বেড়াবে সিতা। তবু ঠাঁই পাওয়া যাবে না। জীবনে এই সত্যটুকুকেই নিয়ম বলে স্বীকার করে নিয়ে, আজ তাকে শান্ত হতে হবে।

সিতা সত্যিই শান্ত হলো। সকালবেলা বিছানায় উঠে বসে প্রথম মনে পড়লো, রাত্রিটা যেন একটা স্বপ্নহীন একটানা ঘুমের সমাধির মধ্যে চকিতে পার হয়ে গেছে। সারা দেহে ও মনে একটা রোগমুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিল সিতা। কত লঘু ও নির্ভার মনে হচ্ছে। সব বেদনার শক্তি ফুরিয়ে গেছে, নিছক বৃত্তান্তের মত সবকিছু অক্লেশে মনে মনে আদ্যোপান্ত পাঠ করা যায়, কিন্তু সেসব স্মৃতি বর্তমানের মুহূর্তগুলিকে খুঁচিয়ে আর বিষণ্ণ করতে পারে না। অত্যন্ত অতীত, অতি দূর ও ঝাপসা হয়ে গেছে ঘটনাগুলি। শিশিরকে আজ স্বচ্ছন্দে স্মরণ করতে পারে সিতা। সমস্ত কাহিনীটি মনের পাতে লেখা কতগুলি অক্ষরের আড়ম্বর বলে মনে হয়, তার সঙ্গে তিলমাত্র ব্যথার রেশ মিশে নেই। জীবনের ইতিহাসটা যেন নিছক বিবরণ হয়ে গেছে। এক অবাধ নিঃশ্বাস নেবার বাতাসভরা অবকাশ পড়ে রয়েছে। নতুন বেদনাহীন পৃথিবীর মাটিতে পা দিয়েছে সিতা। নতুন করে চলতে হবে, আর যেন কোন ভুল না হয়।

ভুলের ব্যাপারে সত্যিই খুব সাবধান হয়ে গেল সিতা। প্রতিদিনের নিয়ম মত স্নানের জন্য গরম জলের দরকার ছিল। গরম জল হয়েছে কি না, কোন চাকরকে ডেকে আজ আর প্রশ্ন করার সাহস পেল না সিতা। এতটা দাবি করার সাহস না থাকাই ভাল। ভুল হবে। এই

বিচিত্র সংকোচ জীবনে প্রথম অনুভব করলো সিতা। এ-বাড়ির সকল সমাদরের পরিমাণ নিক্তির তৌলে মাপা আছে। দাবি করতে গিয়ে কোথায় কখন মাত্রার বেশি হয়ে পড়বে কে জানে! কতটুকু দাবি এখানে গ্রাহ্য—সে-নিয়ম যখন জানা নেই, তখন চুপ করে থাকাই ভাল। অনাহূত অতিথির মত নিজের দীনতায় সংকুচিত হয়ে কোন হাঁকডাক না করে, ঠাণ্ডা জলেই স্নান সেরে এসে বসলো সিতা।

বয়টা চা-খাবার দিয়ে গেল। শুধু চা-টুকুই যথেষ্ট, খাবারগুলি নিতান্ত বাহুল্য মনে হয়। বহুদিন ধরে নিতান্ত না বুঝেই যেন এই অপব্যয়ের ভাগী হয়ে এসেছে। কেউ মুখ ফুটে না বললেও, একটা অশ্রুত প্রতিবাদ যেন আড়ালে বসে এই অপচয় লক্ষ্য করছে।

সিতা বুঝতে পারে, আজ তার চিন্তা ও আচরণ পদে পদে একটা কুণ্ঠায় জড়িয়ে পড়ছে। সদাব্রতের সত্রের মত পিতৃভবনের এই উদার দানের কৃপা গ্রহণ করতে একটা লজ্জার বাধা ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু একটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে সিতা।

এর পর একটু বেড়াতে বের হওয়া উচিত ছিল। চকচকে পণ্টিয়াক গাড়িবারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বৃথা পেট্রল পুড়বে, বৃথা হয়তো কারও কষ্টের ঐশ্বর্য খানিকটা ক্ষয় হয়ে যাবে। কারও জীবনের সবচেয়ে বড় মোহের ওপর উৎপাত করতে চায় না সিতা। সিতা বুঝতে পারে, তার সেই সাহসও আজ আর নেই।

পরাভূত হয়েছে সিতা, আকাঙক্ষার সব উত্তাপ উপে গেছে, শান্ত লঘু ও নির্ভুল হয়ে গেছে সিতা। ডোভার লেনের এই বিরাট বাড়িটার দু'চার কণিকা করুণাব উঞ্ছ কুড়িয়ে এক কোণে যেন পড়ে থাকতে চায় সিতা—তবু এই বাড়িটারই একটি কোণে। আশ্চর্য!

ডোভার লেনের বসু-ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিশির একটা শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। জানালার পর্দার আড়াল থেকে ঘটনাটাকে স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না সিতা। শিশির দাঁড়িয়ে আছে, যেন একটা অবাস্তব আবির্ভাব, অস্তগত সূর্যের সুশান্ত প্রতিবিম্বের মত উত্তপ্ত বাতাসের পটে ক্ষণিকের জন্য মূর্তি ধরে রয়েছে। এ ছবি এখনি মিলিয়ে যাবে। নির্লিপ্তভাবে সিতা শুধু দেখছিল—যেন বস্তুজগতের সীমানার বাইরে, অতি দূরের একটা ছবি!

পরক্ষণেই সিতা দেখলো, কাগজের স্লিপের ওপর শিশির তার নাম লিখে বেয়ারার হাতে দিচ্ছে। দৃশ্যটার ছোঁয়াচ লেগে সিতার সমাধিস্থ চেতনার পাথরটা বোধ হয় নড়ে উঠলো। বুকের ভেতর শ্বাসবায়ুর উদ্দাম আলোড়ন সমস্ত শক্তি দিয়ে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলো সিতা। কাঁপছিল, হাঁপিয়ে উঠছিল, এক ঝলক রক্তাভ উত্তেজনার চূর্ণ পরাগ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত রকমের সুন্দর করে তুলছিল সিতাকে। জীবনে কোন দিন, কোন পুলকে প্রসাধনে ও মানে-অভিমানে এত সুন্দর দেখায় নি তাকে।

বেয়ারা এসে শিশিরের লেখা স্লিপটা দিয়ে গেল। চুপ করে রইলো সিতা। বেয়ারা একটা নির্দেশ আশা করেই একবার বললো—বাবুটি দাঁড়িয়ে আছেন দিদিমণি।

সিতা—আমিই যাচ্ছি।

বেয়ারা নিজের কাজে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই সিতা ফিরে প্রশ্ন করলো—বাবা কোথায়?

—লাইব্রেরীর ঘরে আছেন, কাগজ পড়ছেন।

চলে যাচ্ছিলো বেয়ারা। সিতা ডাকলো—শোন। তুমিই যাও। বাবুটিকে এই ঘরেই নিয়ে এস।

মাত্র পাঁচ মিনিট আগে যে-অনিয়মের পৃথিবীর কাছে শুধু পরাভব মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল সিতা, মাত্র পাঁচটি মিনিট পরেই সে পৃথিবীর রূপ একেবারে মিথ্যা হয়ে গেল। এক নিমেষেই যেন তার চেতনার সেই প্রচণ্ড অবরোধ ঘুচে গেছে। ছোট ছোট ঝড় ছুটে

আসছে আবার, পতিত অনুভবের রিক্ততা ছাপিয়ে যত নির্বাসিত শোক হর্ষ বেদনা ও কামনার খরধারা সব ডুবিয়ে দিতে ছুটে আসছে। এই আবেগময় কয়টি মুহূর্তের প্লাবনের মধ্যে পুরনো দিনের সব মোহ জীবন হয়ে ভেসে উঠলো আবার।

—আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছি সিতা।

ঘরে ঢুকে সিতার দিকে একবার ভাল করে তাকাবার আগেই এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শিশির। যেন বহু ক্লেশে কথাগুলির বল্‌গা ধরে রেখেছিল।

একথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সিতা। শিশিরের রুগ্ন ও বিষন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ভাল-মন্দ কিছু অনুমান করার শক্তিও দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। শিশির যেন সেই পুরনো দিনেরই একটি মেঘস্তবকের মত একেবারে নিকটে নেমে এসেছে। কিন্তু বৃষ্টি না বজ্র? কোন উপহার নিয়ে এসেছে শিশির কে জানে!

সিতার বিস্ময় ক্রমে বিমূঢ়তার মতই হয়ে উঠছিল। তবু শান্তভাবে উত্তর দিল—কেন মাপ চাইছ?

—আমার ভুলেই তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ সিতা। তাই মাপ চাইছি। এবার থেকে আর আমাকে ভুল বুঝো না।

—কি ভুল করেছ তুমি?

—ও-সব কংগ্রেস-ফংগ্রেস ছেড়ে দিলাম।

—কেন?

—ওর মধ্যে শান্তি নেই।

—শান্তি খোঁজার জন্যে কংগ্রেসের কাজ করতে গিয়েছিলে?

—না। শান্তির কথা ছেড়ে দাও, ওর মধ্যে কোন সত্য নেই।

—তবে কি দেখে ওর মধ্যে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, ওর মধ্যে গোঁয়ার্তুমি আছে, সেই গোঁয়ার্তুমির একটা মোহ আছে। তাই গিয়েছিলাম বোধ হয়। কিন্তু বেশী দিন সে মোহ থাকে না।

সিতা হাসলো।—যা বললে তার মধ্যে সব কথা বলা হয়ে গেল কি? এছাড়া আর কোন মোহ ছিল না?

শিশির অপ্রস্তুত হয়ে বললো—এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না সিতা।

সিতা।—সব চেয়ে সত্যি কথাটা এড়িয়ে গেলে শিশির।

শিশির।—আজও তুমি আমাকে কেন বিশ্বাস করতে চাইছ না সিতা?

শিশিরের কথাগুলির মধ্যে একটা কাতরতা ছিল। সিতার প্রশ্নগুলি যেন অতিরিক্ত স্পষ্টতায় আলাপের বদলে আঘাত হয়ে উঠেছে। ক্ষণিকের জন্য একটা মমতা সিতার সংশয়ের রূঢ়তাগুলিকে একটু নরম করে দিল।

সিতা বললো—কবে ফিরে এলে?

—কাল এসেছি।

—সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—বুঝলাম না সিতা।

সিতা চুপ করে গেল। তার সকল কথার সহজ স্রোতে যে প্রশ্নটা ভেসে আসতে চাইছে, বার বার চেষ্টা করেও তাকে বাধা দিয়ে সরিয়ে রাখতে পারছিল না।

সিতা।—জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা হয়নি?

শিশির।—জ্যোৎস্না?

সিতা।—হ্যাঁ।

হেসে ফেললো শিশির। বিষণ্ণ হাসিটা যেন সিতার মনগড়া সংশয়ের অভদ্রতাকে মৃদু

ধিক্কার দিল।—না, দেখা হয়নি, দেখা করার কথা কোন দিনও মনে হয়নি, এখনো কোন প্রয়োজন নেই।

একটু চুপ করে থেকে শিশির বললো—এইখানেই তোমার ভুল সিতা। আমি সত্যিই ভেবে পাই না, তোমার মত মানুষের মনেও সেকেলে মেয়ের এই দুর্বলতা কেমন করে থাকতে পারে। যেটা একেবারেই অলীক, অসম্ভব...।

সিতা হঠাৎ অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠে হেঁটমুখ হয়ে রইল। চোখের সজলতাটুকু লুকিয়ে ফেলার জন্য বোধ হয় উত্তর দিতে গিয়ে সিতার গলার স্বর ক্ষীণতর হয়ে এল।—আর কিছু বলো না শিশির। আমি বিশ্বাস করছি, আজ তুমি সবই সত্য বলছো। হ্যাঁ আমারই দুর্বলতা, কিছু মনে করো না শিশির। জানি না, কোন দুঃখে আমাকে এই দুর্বলতায় পেয়েছিল।

শিশির।—আমি গান ছেড়ে দিলাম সিতা।

সিতা।—কেন?

শিশির।—তোমার জন্য।

সিতা।—এ কি অদ্ভুত কথা!

শিশির।—গান আমার অনেক সময় নষ্ট করেছে। একদিন তোমাকে দূরে বসিয়ে রেখে আমি গান গেয়েছি, গান শেষ হলে তোমায় দেখতে পেয়েছি। আমি কি ভয়ানক মূর্খ ছিলাম সিতা।

দু'হাত তুলে চোখ আর কপালটা চেপে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল সিতা।

শিশির।—অবনীবাবুকে আমি চিনে ফেলেছি সিতা। আমার জীবনের বাঞ্ছিত পথ ভুল করে দেবার সাধ্য তার নেই। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার।

সিতার মাথাটা আরও ঝুঁকে পড়ছিল, আরও নিবিড় একটা আড়াল খুঁজছে যেন।

শিশির।—খদ্দরের ভণ্ডামি ছেড়ে দিলাম সিতা। পারুল বৌদিকে চিঠি দিয়েছি...মেজদা শীগগির আসবেন...তারপর আমি সুখী হতে চাই সিতা। সেই আয়োজনের জন্যই...।

শিশিরের কথায় উৎসাহে সাড়া দেওয়া দূরে থাক, নিষ্প্রভ শিখার মত ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছিল সিতা। দেখে মনে হয়, শিশিরের কথাগুলি সিতার চারদিকে একটা দুঃসহ প্রদাহের বলয় সৃষ্টি করেছে, তারই ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টা করছে সিতা।

শিশিরের আগ্রহ আরও আকুল হয়ে উঠলো।—ওঠ সিতা, চল, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবো।

সেই মুহূর্তে সবেগে মুখ তুলে তাকালো সিতা। চোখের দৃষ্টিটা পুড়ছিল। আকস্মিক অপঘাতে পীড়িত হয়ে সিতার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন রুক্ষস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো—কেন?

সুবিনীত আত্মনিবেদনের গৌরবের একটু কুঁজো হয়ে, গলার স্বরে অন্তরের সব আবেগ ছড়িয়ে দিয়ে শিশির বললো—আজ আমি তোমার বাবাকে প্রণাম করবো সিতা।

ভেজা মাটির মূর্তির মত ভেঙে গলে মাটির সঙ্গে যেন মিশে যাবে সিতা। মাথাটা হেঁট হয়ে ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছিল। পৃথিবীর শেষ সম্ভ্রমের আবরণ ছিঁড়ে গেছে, সিতা তাই যেন তাকাতে পারছিল না।

গুরুদয়ালবাবুর সঙ্গে আলাপ করে এইমাত্র লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে শিশির। বলে গেছে, আজ সন্ধ্যায় আবার সে আসবে।

গুরুদয়ালবাবু পরিত্রাহি সিতাকে ডাকছিলেন, উচ্চস্বরে, উৎসাহের সঙ্গে। সিতা ব্যস্ত হয়ে সাড়া দিয়ে লাইব্রেরী ঘরে গুরুদয়ালবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালো। যেন একটানা নির্বাক একটা যুগের পর আজ প্রথম সিতাকে আহ্বান করলেন গুরুদয়ালবাবু।

খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল গুরুদয়ালবাবুকে। সিতা সামনে এসে দাঁড়াতেই একটা নকল তিরস্কারের সুরে যেন আদর করবার জন্য বললেন—তুই তো বড় মিথ্যুক রে সিতা।

গুরুদয়ালবাবু এতখানি পুলকচাঞ্চল্য তবুও সিতার মুখ-চোখের গভীর বিষণ্নতার আবরণটুকু দূর করতে পারছিল না। সিতা শুধু কৌতূহলী হয়ে স্পষ্টতর কোন বক্তব্য প্রত্যাশা করে দাঁড়িয়ে রইল।

গুরুদয়ালবাবু বললেন—শিশিরের নামে তুই অযথা কতগুলি অপবাদ দিয়েছিস সিতা। প্রত্যেকটি কথা তুই উল্টো করে বলেছিস।

একটু চুপ করে থেকে গুরুদয়ালবাবু বললেন—শিশিরের তো কোন আদর্শ-টাদর্শ নেই। সে নিজের মুখেই বলে গেল যে...।

সিতা আস্তে আস্তে উত্তর দিল—না বাবা সে-সব কিছু তার নেই।

গুরুদয়ালবাবু।—শিশির তো কংগ্রেস-ফংগ্রেস পছন্দ করে না।

সিতা।—না।

গুরুদয়ালবাবু।—শিশির বড়লোককে ঘৃণা করে, এই আর একটা বাজে কথা তুই বলেছিলি।

সিতা।—হ্যাঁ।

গুরুদয়ালবাবু।—ছেলেটি মোটেই দাম্ভিক নয়।

সিতা চুপ করে রইল।

গুরুদয়ালবাবু।—গান-টানও তো ছেড়ে দেবে বলে গেল। কারবার করতে চায়।

শতভাবে নিজেকে সংযত রেখে শান্তভাবে উত্তর দিচ্ছিল সিতা। সত্য কথা বলবে বলে যেন শপথ করেছে সে। তবু গুরুদয়ালবাবুর শেষ কথাটা শুনে তার নিরীহতার শেষ শক্তিটুকু ফুরিয়ে গেল। মনের ভেতর একটা দুঃসহ যন্ত্রণার উৎপাত চাপতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়লো সিতা। গলার স্বর কেঁপে উঠলো।—কি বললে বাবা?

গুরুদয়ালবাবু।—কারবার করতে চায় শিশির। ভেবেছিলাম, জয়ন্তর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট করে দেব, কিন্তু তার চেয়ে ভাল বরং...।

সিতার অন্তরাত্মা যেন মরিয়া হয়ে নিঃশব্দে প্রার্থনা করে উঠলো—তার চেয়ে বরং ভাল মুটে মজুর চাষা বা ভিক্ষুক হয়ে যাক শিশির। এই কথা যেন বলেন গুরুদয়ালবাবু। এই অধঃপতনের ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদে অন্তত এইটুকু মনুষ্যত্বের গৌরব ধ্বনিত হোক।

কিন্তু সিতার এত আন্তরিক প্রার্থনাটাও বাস্তবে সফল হলো না। গুরুদয়ালবাবু বললেন—ভেবে দেখলাম, সেটা ভাল দেখায় না। বরং আমার অফিসে এসে বসুক, কাজ শিখুক, তারপর...।

একটু সুস্থির হয়ে সিতা বলে—যদি সে আপত্তি করে...।

গুরুদয়ালবাবু হেসে ফেললেন।—আপত্তির কথা তুলছিস কেন সিতা? সে রাজি হয়ে গেছে। খুশী মনে রাজি হয়েছে।

সিতার বিরুদ্ধে যত মিথ্যাবাদিতার অভিযোগগুলিকে সংক্ষেপে বিচার করে যেন শেষে রায় দিলেন গুরুদয়ালবাবু।—বাস্তবিক, তুই যত সব বাজে কথা বলে আমাকে বড় দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি সিতা। শিশির ছেলেটি বেশ! কোন দম্ভ নেই, কোন লম্বা-চওড়া বিদ্‌ঘুটে আদর্শ নেই। বেশ ছেলেটি! মোটেই অহংকারী নয়, রাগী নয়—কিছু নয়। ছেলেটি একেবারে কিচ্ছু নয়।

সে-সাহস থাকলে সিতা আজ চীৎকার করে গুরুদয়ালবাবুর মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে পারতো।—সে যে সবকিছুই ছিল বাবা। আজ সে একেবারে কিছু-নয় হয়ে গেছে। আমার সব সত্য আজ মিথ্যে হয়ে গেছে।

মাথা হেঁট করে দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ না করে সিতা ধীরে ধীরে লাইব্রেরী ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর কিছু বলবার মত সাহস তার নেই। ঠিক একথাও সত্য নয়—তার আর কিছু বলবারও নেই।

সন্ধ্যা হবার কিছু আগে থেকেই বাড়ির গেটের কাছে পায়চারি করছিল সিতা। পোশাক আর প্রসাধনের রকম থেকে বোঝা যায় বেড়াতে যাবার জন্যই সিতা প্রস্তুত হয়ে আছে। গাড়িটা গেটের বাইরে সড়কের ওপর এক পাশে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার একটু আড়াল করে ফুটবোর্ডে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

ড্রাইভার একবার উঁকি দিয়ে দেখলো, তেমনি অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিদিমণি। কারও প্রতীক্ষায় রয়েছেন কি? তা'ও মনে হয় না। বেড়াতে যাবার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে অথচ।

হয়তো মজুমদার সাহেব আসবেন এখনি। চিন্তার গবেষণা থামিয়ে হঠাৎ ড্রাইভার কেতাদুরস্ত কায়দায় উঠে দাঁড়ালো। এক ভদ্রলোক সরাসরি গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলেন। এই বাবুটিকে এর আগে কখনো দেখেনি ড্রাইভার। এই রহস্যের আভাস একটু আঁচ করে নেবার জন্য বোধ হয় সে আর একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল, দেখলো এবং শুনলো, দিদিমণি বলছেন—তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি শিশির।

সিতা যেন পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। শিশির কিছু বলার আগেই সিতা বললো—বেড়াতে যাচ্ছি, তুমিও চল।

শিশির আর সিতা গাড়ির কাছে এসে একবার থামলো। শিশির একটু নিরুৎসাহ হয়ে বললো—তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে আসা উচিত ছিল আমার।

সিতা।—কেন?

শিশির।—একটু কাজের কথা ছিল।

সিতা।—বেশ তো, আর এক সময় বলো। আজ সকালে এসেছ, সন্ধ্যেয় একবার এলে, না হয় রাত্রিবেলা আর একবার আসবে। তার জন্য ভাবছো কেন?

শিশির।—আচ্ছা। এখন কোন দিকে যাবে?

সিতা।—কোন দিকে যেতে চাও?

শিশির।—ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে চল।

সিতা।—না, তার চেয়ে ভাল...।

হঠাৎ একটা তীব্র কৌতূহল শিশিরের চেতনার বধিরতাকে আঘাত দিল। সতর্ক হয়ে সিতার কথার আবেগটাকে যেন পাহারা দিতে লাগলো শিশির। উৎকর্ণ হয়ে রইল। শিশির জানতে চায়, ডায়মণ্ডহারবার রোডের সান্ধ্য শোভা আর বাতাসের মদিরতা তুচ্ছ করে কোন ভাললাগা ঠাঁই আজ সিতাকে এত আপন করে টানছে?

সিতা বললো—চল জয়ন্তবাবুর বাড়ি।

গাড়ি চলছিল। চুপ করে বসেছিল শিশির। সিতা বললো—জয়ন্তবাবুর সঙ্গেও তোমার পরিচিত হওয়া উচিত নয় কি?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে সমবেদনার সুরে বললো—এর মধ্যে তোমার কোন অসুখ হয়েছিল কি?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—কি হয়েছিল?

শিশির।—কিছু না, সামান্য একটু জ্বর।

সিতা।—এই সামান্য জ্বরেই তুমি এত কাহিল হয়ে পড়লে? আমার কাছে অনেক কিছু

চেপে যাচ্ছ শিশির।

শিশির।—না না, তুমি কি জানতে চাও বল?

সিতা।—তুমি কংগ্রেসের প্রচারের কাজে মফঃস্বলে গিয়েছিলে না?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—চলে এলে কেন? কি হলো?

শিশির।—অভিজ্ঞতা হলো। ঠেকে শেখাই বোধ হয় সত্যিকারের শিক্ষা। যেদিন বুঝলাম আমার ভুল হয়েছে, সেদিন চলে এসেছি।

সিতা।—কিসের ভুল? অবনীবাবুর থীসিস্‌ও ভুল হয়?

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে রুক্ষস্বরে শিশির উত্তর দিল—শুধু আমারই ভুল, একথা বিশ্বাস করি না আমি। পৃথিবীতে অবনীনাথদেরও ভুল হয়।

সিতা হেসে ফেললো।—আমি তো সে কথাই জানতে চাইছি। অবনীনাথের কোন ভুল তোমাকে এত ভোগালো?

শিশির।—পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করতে হলে শুধু সংগ্রাম করেই করতে হবে, এর কোন মানে হয় না। অনেক বড় বড় কাজ নীরবে শান্তভাবে, কারও সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হৈচৈ না করেও করা যায়।

সিতা সন্দিগ্ধভাবে শিশিরের প্রত্যেকটি কথার গোপন মর্মটুকু ধরবার চেষ্টা করছিল। আন্ত্রিগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসার মত সিতা যেন এক একটি প্রশ্নের টোপ ফেলে শিশিরের এই মানসিক বিক্ষোভের ভেতরের গলদটি উপরে টেনে তুলতে চায়।

সিতা।—হ্যাঁ, দেশের লোক-ক্ষেপানো কাজ এমন কিছু মহৎ কাজ নয়—কঠিন কাজও নয়।

শিশির।—লোকগুলো ক্ষেপেই আছে সিতা। ওদের সঙ্গে মিশতে গেলে পদে পদে বিপদ।

সিতা।—যাক, সে বিপদ থেকে যে তুমি আগে আগে সরে আসতে পেরেছ, এটাই সৌভাগ্য।

শিশির।—এতখানি হিতাহিত জ্ঞানের অভাব, এত মূর্খতা, এতটা খাই-খাই ভাব, বিশ্রী রকমের এই খুনোখুনি করার স্বভাব--এই সব উপাদান দিয়ে কি কখনো বড় কাজ হয়?

সিতা।—কাদের কথা বলছো?

শিশির।—গাঁয়ের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকগুলো।

সিতা।—তুমি দেখছি তোমার এত সাধের 'জনসাধারণের' ওপর খুব চটে গেছ।

শিশির হাসলো।—ঠিক চটিনি সিতা। একটা ভরসা ভেঙে গেছে। পেটে ভাত নেই, মাথায় বুদ্ধি নেই—এই রকম কতগুলি জীব নিয়েই তো জনসাধারণ। এদের দিয়ে কি কাজ হবে বল? এরা নিজেরই ভাল করতে জানে না—আমার ভাল আর কি করবে?

সিতা।—তাহলে তোমারও একটা ভিন্ন ভাল আছে?

শিশির।—একশোবার আছে। আমি সে-কথা আজ বিশ্বাস করি সিতা। আমারও সুখী হবার, যশ খ্যাতি সম্মান পাবার অধিকার আছে।

সিতা।—তুমি তো আগে এরকম কথা বলতে না শিশির। দেশের লোকের সঙ্গে এক হয়ে থাকাই নাকি তোমার সব চেয়ে আনন্দ ছিল? তোমার সেই 'দুই বিঘা জমি' গানটার সুর এখনো মনে পড়ে। কী ভয়ানক অথচ কী সুন্দর সুর দিয়েছিলে শিশির!

সিতার কথায় শিশিরের বাচাল উচ্ছ্বাস হঠাৎ যেন ঘা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিমনা হয়ে চলন্ত পথচ্ছবির দিকে দৃষ্টিটা সঁপে দিয়ে চুপ করে বসেছিল শিশির। সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন সিতা আর একটু আগ্রহভরে বললো—যাক, তোমার কোন ক্ষতি হয়নি তো? কোন অপমানের ব্যাপার হয়নি তো? ভুল সবারই হয়, সেজন্য মন খারাপ করে...।

আড়ষ্টতা একটু কাটিয়ে উঠে শিশির যেন একটা অপরাধের গ্লানি স্খালনের জন্য বললো—

দেশের লোক বা ঐ সব জনসাধারণকে আমি যতটা নিন্দে করছি, অবশ্য ঠিক ততটা সত্য নয়। তারা সব কিছুই করতে পারে, তবে...

সিতা।—কি?

শিশির।—আগে তাদের উন্নত হয়ে নিতে হবে। শিক্ষিত হতে হবে. অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য পেতে হবে। তারপর সংগ্রাম।

সিতা মুখ টিপে হাসছিল—অবনীনাথের থীসিস্‌টা যে একেবারে উল্টে দিলে শিশির।

প্রতিবাদ করার জন্য মুখ ফেরালো শিশির। সিতা লক্ষ্য করেছে, অবনীনাথের নাম শোনা মাত্র শিশির একটা বিরক্তিভরা অস্বস্তিতে ছটফট করে ওঠে। সিতার অনুমান চূড়ান্তভাবে সত্য করে দিয়ে শিশির বলে উঠলো—অবনীর আর কিসের ক্ষতি? সব পেয়েছে সে। ও-সব কাজ তারই সাজে, তার ভাল লাগে। তাই সে সফল কৃতী ভাগ্যবান...।

সিতা।—ওরে বাবা! রাগের মাথায়ও অবনীকে যে মহাপুরুষ করে তুলছো তুমি।

শিশির।—অবনী কত বড় স্বার্থপর তা আমার আর জানতে বাকি নেই।

গলার স্বর অস্পষ্ট করে যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো শিশির—সব কিছু পেয়েছে অবনী, সবচেয়ে বড় পাওয়া পেয়েছে, সবচেয়ে সেরা জিনিস! ভাগ্যই বল আর যাই বল...।

সিতা।—কি বললে?

একটা নিষ্পলক গভীর দৃষ্টিকে যেন শিশিরের অন্তর্লোক পর্যন্ত প্রসারিত করে সিতা তাকিয়ে রইল।

চকিতে সিতার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে শিশির বললো—বলছিলাম, অবনী একজন সুবিধাবাদী। সে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশী ভড়ং করে।

এক বিচিত্র হেঁয়ালির মধ্যে সিতার সকল কূটপ্রশ্নের অভিযান যেন আবার দিশেহারা হয়ে পড়লো। সিতাকে নীরব দেখে শিশির একটু অনুতপ্তের মত বললো—চুপ করলে কেন সিতা? আমার কোন কথায় রাগ করলে না তো? কোন ভুল কথা বললাম কি?

সিতা।—না।

শিশির।—তুমি বিশ্বাস কর সিতা, সব ভুল থেকে রেহাই পেয়ে গেছি আমি। আর কোন মোহ নেই আমার।

সিতা যেন শুনতে পায়নি, সোজাসুজি কতগুলি তীক্ষ্ণ মন্তব্য দিয়ে শিশিরকে যাচাই করার জন্য প্রস্তুত হলো।—তুমি কাজ করতে গিয়েছিলে। সেকাজ তোমার সহ্য হয়নি, তাই পালিয়ে এসেছ।

শিশির।—পালিয়ে আসবো কেন? ভাল লাগলো না, চলে এসেছি।

সিতা।—তুমি যা কিছু বিশ্বাস করতে, আজ তো সবই অস্বীকার করছো।

শিশির।—ভুল বুঝতে পেরেছি, তাই।

সিতা।—তুমি আজ ভয় পাচ্ছ, লজ্জা পাচ্ছ, লুকিয়ে থাকতে চাইছ।

শিশির।—তুমি যদি তাই মনে কর তবে...।

সিতা।—তুমি সব ভরসা ছেড়ে দিয়েছ। নতুন একটি আশ্রয় খুঁজছো।

শিশির।—হ্যাঁ সিতা।

সিতা।—তুমি বড়লোক হতে চাইছ।

শিশির।—ঠিক বড়লোক নয়। প্রয়োজন আছে বলেই টাকার ওপর লোভ আছে।

সিতা।—টাকার ওপর লোভ হয়েছে বলেই ব্রোকার গুরুদয়াল বসুর ওপর তোমার শ্রদ্ধা হয়েছে।

শিশির।—ছিছি, বড় রূঢ় কথা বলছো সিতা।

সিতা।—রাগ করো না ; আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি। তোমার পথ হারিয়ে গেছে, তাই নতুন পথ খুঁজছো।

শিশির।—হ্যাঁ সিতা।

সিতা।—তাই তোমাকে হতাশ হয়ে মুষড়ে পড়লে চলবে না। নতুন করে কাজের জীবন আবার গ্রহণ করতে হবে।

শিশির।—তুমিই বলে দাও সিতা, আমি এখন কি কাজ করতে পারি? তুমি যা বলবে, তাই হবে।

সিতা।—তোমাকে কম্যুনিস্ট হতে হবে। তোমাকে জাগৃতি সঙ্ঘে ঢুকতে হবে।

শিশির।—এ কাজ আমার দ্বারা হবে কি সিতা?

সিতা।—তুমিই এখন এ কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। প্রকাশবাবু, তোমার মত লোক পেলে খুশি হবেন।

কী নিরহংকার হয়ে গেছে শিশির! আর তাকে বাধা দিয়ে আটক করার কোন প্রশ্ন আসে না। একেবারে সোজা সুপথে চলে এসেছে। আর তাকে মিনতি করে কিছু বোঝবার নেই—সে নিজেই সব বুঝে ফেলেছে। আর তাকে ভয় পাবার কিছু নেই—বিদ্রোহ করতে সে ভুলে গেছে।

আর আত্মরক্ষা করারও কোন প্রয়োজন নেই সিতার। কারণ পরাভবের কোন আশঙ্কাও নেই। জয় করবার গৌরবের আশাটুকু পর্যন্ত পরিণাম থেকে মুছে গেছে। সেই অজেয় মানুষটি আজ বিনা শর্তে শুধু কৃপার আশ্রয় খুঁজতে একেবারে কাছে চলে এসেছে। সেই উদ্ধত ব্যক্তিত্ব কতভাবে নত হয়ে গেছে আজ।

ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়ে যদি ঝড় না আসে—সেই শূন্যতার বিদ্রূপ বড় অস্বস্তিকর। ফাঁকিটা অপমানের মতই মনের ওপর বাজে, একটা বিস্বাদ টেনে আনে। সব পসরা জলে ডুবিয়ে দিয়ে, শূন্য নৌকার মত পুরনো ঘাটে ফিরে এসেছে শিশির।

এভাবে না এসে, যদি দুরন্ত এক দুরান্তরের স্রোতে, ঝড়ের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে, নাগালের বাইরে চলে যেত শিশির, তাও ভাল ছিল। দুঃখ করার, কষ্ট পাবার, একটু নীরবে কাঁদবার তৃপ্তি পেত সিতা।

কার কাছে অভিযোগ করবে, কাকে ধিক্কার দেবে আজ সিতা?—ছি ছি ছি। এত অহংকার তোমার ছিল, তাই না তুমি এত সুন্দর ছিলে? কি হয়ে গেলে তুমি? তোমাকে করুণা করতেও যে আজ কোন তৃপ্তি নেই।

জাগৃতি সঙ্ঘের সভায় সিতা আজ যায় নি। শিশির গিয়েছে। ওপরতলায় একটি ঘরে চুপ করে বসে ছিল সিতা। আজ শুধু ভাল করে ভাববার জন্য এই নিরালা অবকাশটুকু বেছে নিয়েছে সিতা। গত তিন-চার দিনের ঘটনাগুলির দিকে যত গম্ভীর হয়েই দেখুক না কেন সিতা—শেষ পর্যন্ত তার হেসে ফেলতেই ইচ্ছে করে। ভদ্রলোক যেন কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এক দৌড়ে ফিরে এল--ভয় পেয়ে, হতাশ হয়ে, বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে। সিতাও যেন সেই মুহূর্তে এক পুরাতন অপরাধীকে বন্দী করে জয়ন্ত মজুমদার নামে এক প্রহরীর হাতে সঁপে দিয়ে এল। জয়ন্ত মজুমদারও তাকে যথোচিত স্থানেই নিয়ে চলে গেল, কোন সঙ্ঘের খোঁয়াড়ে, না ভাগাড়ে, না শ্মশানে!

জীবনে এত আবেগ দ্বন্দ্ব ও সংকটের পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত বঞ্চনাটা এভাবে দেখা দেবে, কখনও কল্পনা করতে পারেনি সিতা। এত অসার, এত হাস্যকর। এ কাহিনী যে কোন গোপন ডায়েরীর পাতায় লিখতেও লজ্জা হবে।

এই প্রহসনের ওপর এখানেই যবনিকা যদি পড়ে যায় তাহলেই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে

সিতা। জাগৃতি সঙ্ঘের আশ্রয়ে থাকুক শিশির। সিতার কাছে আশ্রয় পাবার মত আর কোন ঠাঁই নেই। চরমভাবে সে ঠকে গেছে। সন্ন্যাসিনীর হৃদয়ের মত নিরাবেগ নির্মোহ ও শুচিকঠোর হয়ে গেছে সিতা।

মনে মনে একটা আতঙ্কের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে সিতা। শিশির যদি হঠাৎ এখুনি একবার সোজা এখানে চলে আসে, এই নিভৃত সান্নিধ্যের মোহে ভুল করে সিতার হাত ধরতে আসে? হয় তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে, কিংবা ঘর ছেড়ে নিজেকেই পালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই সিতার। সেই পরিত্যক্ত জীর্ণ ইতিহাসকে আবার কখনও নতুন করে প্রশ্রয় দিতে পারে না সিতা।

এই দাঁড়ালো শেষে! প্রতি মুহূর্তে সিতাকে অতীতের একটা ব্যগ্র বন্ধন থেকে শুধু স্পৃশ্যতা বাঁচিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে। সর্বদা সাবধানে থাকতে হবে। এই তার ভবিষ্যৎ! প্রতি মুহূর্তে অদৃষ্ট আর আকাঙ্ক্ষার চারিদিকে একটা টিটকারি শুধু টিক্‌টিক্ করে বাজতে থাকবে! স্বপ্নে জাগরণে পলে পলে স্মরণ করিয়ে দেবে তার ভুল, তার ব্যর্থতা, তার প্রায়শ্চিত্ত।

এত শাস্তি সইবার কোন প্রয়োজন নেই। সিতার মন থেকে এই দুর্বলতার খাদ হঠাৎ পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মনের ভেতর একটা সংকল্প গুপ্ত ছুরিকার মত ঝকঝক করে ওঠে। এ বন্ধনের গ্রন্থি এখানেই চিরকালের মত ছিন্ন করে দিতে হবে--সবার আগে নিজেকে বাঁচাতে হবে। এভাবে ডুবতে চায় না সিতা। ডুবতে হলে কোন ক্ষেপা গাঙের জলের ঘূর্ণিই ভাল। হাঁটু জলে ডুবে মরে কোন সুখ নেই!

গুরুদয়ালবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন। ফিরে আসতে আর বেশী দেরি নেই। ফিরে আসুন, তারপর কোন অস্পষ্টতার লজ্জা না রেখে শেষ অনুরোধ জানিয়ে দিতে হবে তাঁকে।-- পারুলদির চিঠির কোন উত্তর দিও না বাবা। আমার সর্বনাশ করো না।

দুর্বহ ক্লান্তির মত চিন্তাগুলি সিতাকে অবসন্ন করে ফেলছিল। গুরুদয়ালবাবুর গাড়ি এসে সশব্দে বারান্দার কাছে দাঁড়িয়েছে, সশব্দে গ্যারেজে চলে গেছে। গুরুদয়ালবাবু তাঁর লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন, চাকরদের সঙ্গে কথা বলেছেন, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তবু কোন সাড়া পায়নি সিতা। সিতার সমস্ত সত্তা যেন বধির হয়ে বসেছিল। শুধু জয়ন্ত মজুমদারের একটা অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী সিতার সমস্ত চিন্তা জুড়ে সগর্বে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছিল—'তুমি শুধু নিজেকে ভালবাস সিতা'। কি ভয়ানক অথচ কি সত্য লোকটার কথাগুলি!

সিতা বুঝতে পারলো, সে কাঁদছে! নিজেরই ওপর রাগ করে ব্যস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। চোখ মুখ ধুয়ে সুস্থির হয়ে, টেবিল পাখার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে, একটা ছবির এলবাম টেনে নিযে শান্ত মনে বসলো।

--সিতা!

একটা আর্তস্বরে চমকে উঠে সিতা দেখলো শিশির এসেছে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অস্বাভাবিক রকম শান্ত স্বরে সিতা বললো—আমি আজ বড় অসুস্থ। তুমি লাইব্রেরী ঘরে যাও, বাবা আছেন।

অস্বাভাবিক রকম বিচলিত স্বরে শিশির বললো--আমি আর কোন ঘরে যাব না সিতা। শুধু তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

আতঙ্কগ্রস্ত আঘাত-জর্জরিত ও উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছিল শিশিরকে। সিতা একটু বিস্মিত হয়ে দেখছিল। শিশিরের চোখের দৃষ্টিটাও অস্বাভাবিকতায় কেমন কঠোর হয়ে উঠেছে।

সিতা বললো—আমার কাছে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে কি?

শিশির।—হ্যাঁ সিতা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তাই তোমার কাছেই শুনতে চাই।

সিতা।—কি?
শিশির।—এই জাগৃতি সঙ্ঘ, কিসের সঙ্ঘ সিতা?
সিতা।—তুমি কি এখুনি...।
শিশির।—আমি এখুনি জাগৃতি সঙ্ঘের এক জরুরী বৈঠক থেকে আসছি।
সিতা।—কি হয়েছে?
শিশির।—দেখলাম জাগৃতি সঙ্ঘের পত্রিকায় আমার নাম বের হয়েছে।
সিতা।—আমি আগেই দেখেছি।
শিশির।—কিন্তু এসব কি লিখেছে আমার নামে? আমি তো জাগৃতি সঙ্ঘে মাত্র পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছি। পত্রিকায় লিখেছে পাঁচশো টাকা। এ কি ব্যাপার সিতা?
হাসি চাপতে গিয়ে মুখ নামিয়ে ফেললো সিতা।
শিশির।—কোত্থেকে টাকা পায় এই সঙ্ঘ? খরচের হিসাবটার সাফাই দেবার জন্যই কি এই গোঁজামিল? আমি বুঝতে পেরেছি সিতা, চুরি ডাকাতির চেয়ে খারাপ উপায়ে টাকা যোগাড় করে সঙ্ঘ।
সিতা।—তা আমি কি করে বলি?
শিশির।—'বীটোফেন ও তানসেনের প্রতিভাকে একত্রে বাঁটিয়া লইলে যে প্রচণ্ড প্রতিভা হয়, তাহাপেক্ষা উচ্চতর প্রতিভা যাঁহার আছে, সেই সুরশিল্পী শিশির রায় জাগৃতি সঙ্ঘের আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছেন'...এসব অসত্যের মত কথা ওরা কেন লিখেছে সিতা?
সিতা।—ভালই তো। বিনি পয়সায় নাম কিনছো।
শিশির।—'কমরেড শিশির রায় গত তিন মাসে পাঁচ হাজার পল্লীবাসীকে পঞ্চম বাহিনী কংগ্রেসীদিগের খপ্পর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন'...এই সব আবোল-তাবোল মিথ্যা কথা জাগৃতি সঙ্ঘের কাগজে লেখা হয়েছে কেন?
সিতা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল—তুমি যদি নিজে না বুঝতে পার, আমি কি ক'রে বলি?
শিশির কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিতা বার বার তিনবার শিশিরের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল।
শিশির।—আমি যাই সিতা। ভেবেছিলাম, তুমি অন্তত সত্য কথা বলবে। যাক...।
শিশির দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সিতা ডাকলো—শোন।
শিশির থামলো, মুখ ফিরিয়ে তাকালো। শিশিরের উদ্দীপ্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে সিতা কিছুক্ষণ কথা বলতে ভুলে গেল। সেই অহংকার মাখা হারানো মুখচ্ছবিটি যেন আবার কুড়িয়ে পেয়েছে শিশির।
মৃদু ভয়জড়িত স্বরে সিতা আস্তে আস্তে বললো—আমি সত্যিই কিছু জানি না শিশির। আমাকে জিজ্ঞেসা করো না।
শিশির।—সঙ্ঘের এত বড় অন্তরঙ্গ সভ্যা হয়েও তুমি কিছু জান না, একথা বললে...।
সিতা।—আমি কারও অন্তরঙ্গ নই শিশির। সে ক্ষমতা আমার নেই। বোধ হয় সেই যোগ্যতাও নেই।
শিশির।—তাহ'লে তুমি মিছামিছি...।
সিতা।—তা বলতে পার শিশির। হ্যাঁ, তোমার কথাই সত্যি। ডায়মণ্ডহারবার রোডে আমি মিছামিছি বেড়াতে যাই, তেমনি জাগৃতি সঙ্ঘেও মিছামিছি যাই। আমার সব কিছু মিথ্যা। শুধু এই কথাগুলি তোমায় সত্যি করে বললাম। বিশ্বাস কর।
শিশির।—শুনে খুশী হলাম সিতা। এবার উঠি।
সিতা।—আবার এস।

শিশির।—কেন?

সিতা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মনের এত সাধের বিশ্বস্ত একটা সিদ্ধান্তকে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে যেন কথাটা বলে ফেলেছে শিশির। সিতা দেখছিল—সেই উদ্ধত মনুষ্যত্ব যেন সব মিথ্যা করুণা ও সৌজন্যের ছলনাকে অবজ্ঞা করে আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

সিতা।—না আসবার কি কারণ থাকতে পারে?

শিশির।—এখানে আসবার কোন কারণ ছিল না সিতা। সোজা পথে হেঁটে এখানে কোনদিন আসতে পারি নি। চোরাপথে পালিয়ে এসেছিলাম এখানে। সে-কাহিনী কিছুই তোমার অজানা নেই।

সিতা চুপ করে শিশিরের কথাগুলি শুনছিল। মাথা হেঁট করে বসেছিল। শিশিরের কথাগুলিকে যেন অন্তত এই মুহূর্তটুকুর মত সে শান্ত ও স্বচ্ছন্দ অভিবাদনে বরণ করে নিতে পারছে।

মুখ তুলে সিতা বললো—তুমি একটু বসো শিশির। যাবেই তো, একটু বসলে সময় ফুরিয়ে যাবে না।

শিশির।—সত্যি আমার সময় ফুরিয়ে যেতে বসেছে সিতা।

সিতার কৌতূহল প্রখর হয়ে উঠলো।—কেন এরকম ছটফট করছো? কোথায় যাবে?

শিশির।—নিজের কাছে ফিরে যাব। আর যে আমার অন্য জায়গা নেই সিতা।

সিতা।—জাগৃতি সঙ্ঘ তোমার ওপর কোন কাজের ভার দেয়নি?

শিশির।—দিয়েছে। এক অতি মহৎ ও পবিত্র কাজের ভার দিয়েছে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমার, সে ভার নেবারও ক্ষমতা হলো না।

সিতা।—তুমি ঠাট্টা করছো।

শিশির।—একটা অভিশাপকে ঠাট্টা করছি, আর কাউকে নয়।

সিতা।—কোন কাজের ভার পেলে?

শিশির।—ইন্‌ফরমেশন নামে একটা কাজ। এটাও নাকি জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মযোগের একটা ফ্রণ্ট। অবনীনাথ নামে একটা দুর্বৃত্তের হাঁড়ির খবর যোগাড় করে এনে দিতে হবে সঙ্ঘকে। আর খুবই ভাল হয়, যদি অবনীনাথের স্ত্রীকে কোনমতে এনে জাগৃতি সঙ্ঘে ভর্তি করাতে পারি। বীটোফেন-তানসেনের চেয়ে বড় সুরশিল্পী কমরেড শিশির রায়ের ওপর এই স্ট্র্যাটেজিক কর্তব্যের দায় ন্যস্ত করা হয়েছে। এত বড় কাজ শিশির রায় ছাড়া আর কে করতে পারে?

সন্ত্রস্তের মত সিতা বলে উঠলো—তুমি একাজের ভার নিলে?

একটা আনন্দের জ্যোতি শিশিরের বিক্ষুব্ধ মুখের ওপর ঝিলিক দিয়ে গেল সিতার সন্ত্রস্ত স্বর কোন সুরের মীড়ের চেয়েও মধুময় হয়ে শিশিরের কানে যেন বেজে উঠেছে।

এই আনন্দের মাধুর্যকে আর একবার যাচাই করার জন্য বোধ হয় শিশির বললো—তুমি যদি বল, তবে একাজের ভার নিতে পারি।

সিতা।—না, একাজ নিতে হবে না।

শিশিরের সারা মুখে তার তৃপ্ত ও সুপ্রীত অন্তরের আভা যেন হাসি হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।—বাঁচালে সিতা। তোমার মনের এই মনুষ্যত্বের প্রতিধ্বনিকে আমি চিরকাল মনে রাখবো। তোমাকে ঘৃণা করার দুঃখ যেন জীবনে না পাই। তোমার কথাই সত্য হবে। শুধু একাজ নয়, জাগৃতি সঙ্ঘের কোন কাজ আমার সইবে না।

পরমুহূর্তে মাত্রাহীনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলো শিশির।—মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে তোমার বাড়িতে এসে ঢুকেছিলাম। তোমার বাড়ি থেকে জাগৃতি সঙ্ঘে গিয়েছিলাম। আমার সেই পলাতক মনুষ্যত্বের মাথায় লাঠির বাড়ি পড়েছে আজ। তাই আবার ফিরতি পথে যাত্রা

শুরু হয়েছে। জাগৃতি সঙ্ঘ থেকে চরম বিদায় নিয়ে তোমার বাড়িতে এসেছি। এখান থেকে চরম বিদায় নিয়ে আবার পথে গিয়ে দাঁড়াবো।

সিতা।—তারপর?

শিশির।—জানি না।

সিতা উঠে এসে শিশিরের হাত ধরলো। সিতার চেতনা যেন হঠাৎ ঘুমভাঙা অস্ফুট কাকলির মত ভাষা ধরে শিশিরের কানের কাছে গিয়ে সাগ্রহে অনুনয় করলো—তুমি শান্ত হয়ে বসো। যার কাছে বিদায় না নিয়ে তোমার চলে যাবার অধিকার নেই, সে তো এখনও তোমায় বিদায় দেয়নি শিশির!

শিশির বিচলিত হয়ে পড়লো।—বিদায় না করে দিয়ে তার উপায় নেই। তার দোষ নেই। ডোভার লেনের বসু-ভবনের সেফ ডিপজিট ভল্টে বন্দী হয়ে তার আত্মা ধুকধুক করছে। পথের ধুলোয় এসে দাঁড়াবার তার সাধ্য নেই। সে হয়তো কোন হাঘরে গানের মাস্টারকে ভুল করে ভালবাসতে পারে, কিন্তু তার জীবনে সঙ্গিনী হতে পারে না। বড়লোকী প্রেমে এ চুরিটুকু না থেকে পারে না সিতা। এটাই নিয়ম।

সব ভুল হয়ে গেল সিতার। দুহাতে শক্ত করে শিশিরের গলা জড়িয়ে সিতা যেন তার ভবিষ্যৎকে বন্দী করে ধরলো।—বিদায় নেবার ছুতো করে তুমি আজ আমায় অপমান করতে এসেছ শিশির? এত করেও তোমার সাধ মেটে নি? দাম্ভিক, নিষ্ঠুর, হিংসুক, রাগী, অকৃতজ্ঞ...।

শিশির একটু বিড়ম্বিতভাবেই বলে উঠলো—ভুল করো না সিতা। আমার সব আবার গোলমাল করে দিও না।

সিতা।—আমি তোমার সর্বনাশ করবো।

শিশির।—এসব কি বলছো তুমি?

সিতা।—হ্যাঁ, এখুনি এখান থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাব লাইব্রেরী ঘরে, বাবার সামনে। দেখি তুমি কত বাধা দিতে পার?

শিশির।—বাবার সামনে? কেন?

সিতা।—আজ প্রথম আমরা দু'জনে মিলে বাবাকে প্রণাম করবো।

শিশির।—কিন্তু...।

সিতা।—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই।

শিশির।—কিন্তু তারপর?

সিতা।—তারপর আর কিছু নেই।

শিশির।—তারপর যে অনেক কিছু রয়েছে সিতা। গানের মাস্টারের ছোট ঘর...।

সিতা যেন নিজের দুঃসাহসের গর্বে ও আনন্দেই শুধু হাসছিল। এ তার আত্মহত্যা না নবজন্ম, এই বোধটুকু যেন তার লুপ্ত হয়ে গেছে।—তুমি বৃথা ভয় দেখাচ্ছো শিশির। আর কি ভয় দেখাবে? দু'বেলা রান্না? হিসেব করে খরচ করা? সস্তা দেখে জিনিস কেনা? কাপড় কাচা, বাসন মাজা?

শিশির একটু বিরক্ত হয়ে বললো—আরও আছে সিতা? ডোভার লেনের বসু-ভবনের বাইরের পৃথিবীটা শুধু কাপড়-কাচা বাসন-মাজার পৃথিবী নয়।

সিতা।—বল।

শিশির।—আমাকে আবার গান গাইতে হবে। গানের একটি স্কুল খুলবো আমি। রামচন্দ্র নামে আমার একটি ছাত্র আছে এক দূর পাড়াগাঁয়ে। সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে আনতে হবে। গাঁয়ের পথঘাট খুঁজে রামচন্দ্রের মত যত ছাত্র পাব, সবাইকে এনে আমার স্কুল ভরে ফেলতে হবে। স্কুলের জন্য টাকা যোগাড় করতে হবে। তার জন্য যত কিছু দুঃখ ক্লেশ...।

সিতা।—বেশ তো, টাকা পাবে।

শিশির।—কে দেবে টাকা?

সিতা।—আমি।

তীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে সিতার দিকে তাকিয়ে শিশির বললো—তুমি টাকা দেবে কোথা থেকে সিতা?

সিতা কি একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করে থেমে গেল।

শিশির একটু রূঢ় হয়ে বললো—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, তুমি বোধ হয় ভবিষ্যৎটা এখনো অনুমান করতে পারছো না সিতা।

শিশিরের কথার আঘাতে সেই দীন ভবিষ্যতের রূপটা যেন মুহূর্তের মত সিতার বর্ণান্ধ কল্পনার চোখ দুটিকে খোঁচা দিয়ে গেল। সে ভবিষ্যৎ নিতান্তই গানের মাস্টারের ঘরনীর ভবিষ্যৎ। ডোভার লেনের বসু-ভবনের সোনার নাড়ীর সঙ্গে সে ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক নাই।

সকল প্রসঙ্গ প্রশ্ন ও উত্তরের আবর্তের মধ্যে পড়ে সিতার ভাবনার দুঃসাহস হঠাৎ কেমন নাকাল হয়ে যায়। নিতান্ত অবান্তরভাবেই হঠাৎ মনে পড়ে নিরুপমার কথা। সিতারই স্কুলের বন্ধু সহপাঠিনী নিরুপমা। নিরুপমা ছিল সবচেয়ে সুন্দর দেখতে, গানে সেলাইয়ে ও পড়ায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পেত নিরুপমা। এখনো নিরুপমাকে মাঝে মাঝে দেখতে পায় সিতা। হাজরা রোডের ফুটপাথ দিয়ে দুপুরের রোদে একটি ছোট ছেলে কোলে করে হেঁটে হেঁটে মাসিমার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে নিরুপমা। রিকশা দূরের কথা, বাসেও চড়ে না নিরুপমা। কোন এক কাপড়ের দোকানে কাজ করে নিরুপমার স্বামী। সিতার জানতে ইচ্ছে করে, এ ভবিষ্যৎ কি আগে বুঝতে পারেনি নিরুপমা? এবার পথে দেখা হলে একবার জিজ্ঞেসা করবে সিতা—এ দুঃখ কি করে সইতে পারছে নিরুপমা।

শিশির।—তুমি কি সত্যি ভাবনায় পড়লে সিতা?

সিতার মনের গোপনের কতকগুলি অপরাধী চিন্তার ছদ্মবেশ রূঢ়ভাবে ছিঁড়ে দেবার জন্য শিশিরের প্রশ্নটা বিদ্রূপের মত বেজে উঠলো। একটা শিথিল নিশ্বাসের শিহর কোন মতে সংবরণ করে সিতা যেন নিজেকে প্রেরণা দেবার জন্য বললো—না না। কোন ভাবনার ধার ধারি না আমি। তোমার গানের স্কুলের দিন দিন উন্নতি হবে। তার জন্য যদি আমাকে...।

শিশির।—তার জন্য আমার সঙ্গে সব দুঃখ কষ্ট শ্রম ভাগ করে নিতে হবে তোমাকে। আমি যখন থাকবো না, তখন তুমিই সব দায় তুলে নিয়ে স্কুলকে বাঁচাবে।

নিবিড়তর আবেগে শিশিরের গলা জড়িয়ে ধরে সিতা রাগ করে বললো—থাকবে না? এ-সব কী জঘন্য কথা বলছো শিশির? ভয়ানক দুর্মুখ হয়ে উঠেছো তুমি। তোমাকে চিরকাল এমনি করে আমার কাছে আড়ালে আড়ালে আপন করে রাখবো শিশির।

শিশিরের চোখের তারা দুটো বিস্ময়ে ও বেদনায় স্তব্ধ হয়ে রইল। এক শূন্য সংকেতকুঞ্জের প্রবঞ্চনার দিকে তাকিয়ে যেন শিশির বললো—এ কি বলছো সিতা? তোমার কাছে? আড়ালে আড়ালে? এর মানে?

আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শিশির বললো—তোমার কিছুতেই ভুল ভাঙছে না সিতা! আমি যে আবার কাজের জীবনে ফিরে যাব। তোমাকেই নির্ভুল হয়ে আমার সঙ্গে আসতে হবে। আমার কাজকে প্রিয় করে তুলবে যে, তুমি সেই প্রিয়া হবে...।

সিতা।—আবার তোমার কাজের নেশায় পেয়েছে শিশির। জীবনে কাজের চেয়ে কি বড় কোন আশা নেই?

শিশিরের মুখের ওপর ভাসা-ভাসা দুটো চোখের বিহ্বলদৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়ে সিতা তাকিয়ে রইল।

দুঃসাহসী লুণ্ঠকের মত সিতাকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরলো শিশির। সেই সঙ্গে যেন প্রচ্ছন্ন একটা হারিয়ে ফেলার ভয়ে ভীত হয়ে শিশিরের কথাগুলি করুণ আবেদনের মত বেজে উঠলো—আমি তোমায় জোর করে নিয়ে যাব সিতা। কোন বাধা আমি গ্রাহ্য করবো না।

সিতা।—কে বাধা দিচ্ছে তোমায়?

শিশির।—এই বসু-ভবনের মোহ। এই মোহ তোমার সব ভালবাসাকে ভুল করিয়ে দিচ্ছে সিতা। তোমার নিশ্বাসে মিথ্যা ভয় ছড়িয়ে দিয়েছে এই বসু-ভবনের মায়া। এই ভয় ভেঙে যাক তোমার। আমি বলছি তুমি সুখী হবে সিতা।

সিতা।—তা মিথ্যে বলনি শিশির।

ভয়ার্ত গুঞ্জনের মত সিতার কথাগুলি গুনগুন করে উঠলো।

শিশির।—যে পৃথিবীতে তোমায় নিয়ে যাব সিতা, সেখানে গিয়ে তুমি ঠকবে না। এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

সিতা।—কোথায় নিয়ে যাবে?

সিতার পরিচিত খেলার পৃথিবীটাকে কেড়ে নেবার জন্য যেন কেউ নিষ্ঠুরের মত টানছে। প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাসের সুরে সিতার কথাগুলি কাতর প্রতিবাদের মত শোনালো।

শিশির।—তোমাকে একেবারে নতুন দেশে নিয়ে যাব সিতা। আমার নতুন গান, আমার নতুন গানের স্কুল, নতুন সুখ-দুঃখ, নতুন প্রীতি স্নেহ বন্ধুত্ব, নতুন সংগ্রাম, নতুন সঙ্ঘ—সব দেখতে পাবে তুমি?

সিতা।—এত নতুন কোথায় পেলে তুমি?

দুর্লঙ্ঘ্য এক সংশয়ের প্রাচীরের ওপারে দাঁড়িয়ে সিতা যেন শিশিবের সকল আকাঙ্ক্ষাকে মিষ্টি ভাষায় তুচ্ছ করে উঠলো।

শিশির।—সব পেয়েছিলাম একদিন, আবার ফিরে পাব।

কোন উত্তর না দিয়ে নিঝুম হয়ে রইল সিতা। জীবনের একটি আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তকে আজ হাতের মুঠোয় পেয়েছে সে। জয় করা হয়ে গেছে। এক বিজয়িনীর প্রসন্নতা তাকে আত্মহারা করে যেন এই মুহূর্তটিকে ভিন্ন কোন গ্রহলোকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এখানে পৌঁছে শিশিরের কোন প্রশ্ন আর শুনতে পাচ্ছে না সিতা। আর যেন শোনবার প্রয়োজন নেই। মানুষের মত একটি মানুষকে পরাভূত করে বসু-ভবনের সিতা বসুর অভিজাতক প্রেমের আত্মা একদিনে তৃপ্ত হয়েছে।

শিশির ডাকলো।—কথা বল সিতা।

উত্তর দিতে ভুলে গেল সিতা। শিশিরের সাগ্রহ বাহুবন্ধন একটা দুঃসহ জ্বালার ছোঁয়া লেগে খুলে পড়লো।

শিশির আবার ডাকলো—তুমি আমার সব অনুরোধ এড়িয়ে গেলে সিতা।

এই ক্ষণিকের বিমনা আবেশ থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠে সিতা বললো—সবার কাছ থেকে কেড়ে, তুমি এত আপন করে কেন আমাকে নিয়ে যেতে চাও শিশির? আমাকে নিয়ে এত গর্ব করার কি পেলে তুমি?

এতদিনে অকপট হয়েছে সিতা। এইখানে এইভাবে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে সিতা। এই বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে চিরকাল এমনি করে মায়া ছড়াবে, ক্ষণে ক্ষণে তার ব্যক্তিত্বের মূল্যকে মদের পেয়ালার মত চুমুক দিয়ে আস্বাদ গ্রহণ করবে, হাসবে কাঁদবে, হা-হুতাশ করবে, তবু এক পা নড়তে পারবে না সে। তার জীবনের ধর্ম তাকে বাধা দেবে। সিতা যাবে না।

নিঃস্ব পথিককে হত্যা করে ডাকাত যেভাবে ব্যর্থতা-জর্জর দৃষ্টি নিয়ে পথিকের শূন্য থলির দিকে তাকিয়ে থাকে, শিশিরের চোখের দৃষ্টিটা তেমনি। সিতা তার বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

আছে—শুধু একটা মেয়েমানুষের শরীর। এত ক্লেশ ক্ষতি অপচয়ের বিনিময়ে এই তার পাওয়া! এরা শুধু ঐশ্বর্যের নারী, এদের নারীত্বে কোন ঐশ্বর্য নেই। প্রেমের অপমান করার সুখের জন্যই জীবনে এদের প্রেম প্রয়োজন। সোনার সুতোয় গাঁথা নকল ফুলের মালা মাত্র এরা।

শিশিরের মনের ভেতর এক প্রহরী যেন ডাক দিয়ে গেল, সাবধান করে দিল। তোমাকে সব দিক দিয়ে জয় করে এক কৈতবিনীর হৃদয় নিজের গরবে আত্মহারা হয়ে গেছে। তার কাজ ফুরিয়ে গেছে। ভেঙে চূর্ণ করার জন্যই সে তোমাকে এতদিন সোহাগে অনুরাগে, মানে অভিমানে, অনুরোধে আর প্রতিশ্রুতে বড় করে সাজিয়ে নিয়েছে। এই কীর্তির স্মৃতি এক অক্ষয় অহমিকা হয়ে সিতার জীবনের পথে আনন্দ যুগিয়ে যাবে চিরকাল। তোমার শ্রেণী সমাজ পৃথিবীর শ্রদ্ধা খর্ব করে দিয়ে এক লক্ষপতি ব্রোকারদুহিতার প্রেমের খেয়াল নির্লজ্জভাবে সরে পড়েছে। আর দেরি করা উচিত নয়। এইবার তাকে টেনে নামিয়ে দাও—একেবারে তুচ্ছ ক্ষুদ্র নগণ্য করে নাও। সুযোগ হারিয়ো না। সেই সব চেয়ে বড় সত্য কথাটি বলে দাও।

শিশির বললো—তোমাকে নিয়ে সত্যিই গর্ব করতে পারতাম সিতা, যদি আজ এখান থেকে...।

সিতা।—বল।

শিশির।—যদি আজ তোমায় হাত ধরে এখানে থেকে নিয়ে যেতে পারতাম, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, বলতে পারতাম যে আমিও...।

সিতা।—কোথায়?

শিশির।—অবনীনাথের কাছে। অবনী দেখতো, জীবনে আমি ব্যর্থ হয়ে যাইনি। মানুষের গান ও প্রেমকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে আমি ফিরে এসেছি। আমার সকল পরীক্ষার ক্লেশ শেষ উপহারের প্রসাদে ধন্য হয়ে গেছে। অবনী দেখতো, আমিও অরুণার মত একটি গর্বকে কুড়িয়ে পেয়েছি।

সিতা যেন এই দুঃখস্বপ্নের মধ্যে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলো—অরুণার মত? কে সে?

শিশির।—অরুণা,—অবনীনাথের স্ত্রী অরুণা।

এক ভয়ংকর প্রবঞ্চনার বিভীষিকাকে মিথ্যে করে দেবার জন্যে চোখ বুজে, উতলা নিশ্বাসের চাঞ্চল্য গুছিয়ে আস্তে আস্তে সিতা বললো—এতদিন কি অরুণার মত একটি গর্বকে শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছিলে?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—তুমি চাও, সিতা বসু প্রাণে রূপে গুণে অরুণার মত হয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবে?

শিশির।—হ্যাঁ।

সিতা।—জীবনে অরুণাকে না-পাওয়ার শূন্যতা সিতাকে দিয়ে পূর্ণ করতে চাও?

শিশির।—হ্যাঁ, তবে শুধু সিতাকে দিয়েই। আর কাউকে দিয়ে নয়।

সিতা।—কিন্তু সিতা যে কখনো অরুণা হতে পারবে না। সিতা সিতাই থাকবে চিরকাল।

শিশির।—আজ আমি তাই বিশ্বাস করছি সিতা।

সিতা দু'পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ালো। এতক্ষণে যেন সে একটা তপ্ত পাথরের মূর্তিকে ভুল করে জড়িয়ে ধরেছিল।

ডানা-ভাঙা পাখির মূর্তির মত করুণ হয়ে একটা চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে মাথা হেঁট করে বসেছিল সিতা। তার আকাশের আশা মিথ্যা হয়ে গেছে, মাটিতে বঞ্চনা। তার অনুতপ্ত চৈতন্য যেন এক মুহূর্তে শতবার মার্জনা ভিক্ষা করে বসু-ভবনের সোনার খাঁচার আশ্রয়টুকু প্রার্থনা করছে।

লাইব্রেরী ঘর থেকে গুরুদয়ালবাবু তখন চেঁচিয়ে ডাকছিলেন—সিতা সিতা।

ডোভার লেনের বসু-ভবনের বাইশ বছরের বাৎসল্যের ইতিহাস লুণ্ঠিতা সিতাকে বুকে তুলে নেবার জন্য যেন উল্লাসে আহ্বান করছিল।

সিতা সাড়া দিয়ে উঠলো—যাই বাবা।

শিশির বললো—আমিও এইবার যাই।

ব্যস্তভাবে দরজাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সিতা বললো—চলুন।

সিঁড়ির মুখে এসে অনাহূত অতিথির মত বিব্রত শিশিরের মূর্তিটা তরতর করে নিচে নেমে গেল। সিতা চলে গেল অন্যদিকে, তার চিরদিনের পরিচিত কার্পেট-পাতা বারান্দার পথে, লাইব্রেরী ঘরের দিকে।

যেন এক রাজদীঘির পচা পানা ছেঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। রাজধানী কলকাতায় যত পথ ও পার্কের অপহৃত শ্রী আবার ফিরে এসেছে। সেই আবর্জনার মত নিরন্ন জনতার বীভৎস সমারোহ আর নেই। হাভাতে মুমূর্ষুর হিক্কার শব্দ আর নেই, গলিত শবের উপদ্রব ক্ষান্ত হয়ে গেছে। ধনিকের নীড় শহর কলকাতার সভ্যতার পথে যেন এতদিন ব্যারিকেড তুলে উদ্বাস্তু উপার্জনহীন অন্নবঞ্চিত ও অর্ধোলঙ্গ গেঁয়ো অভাগা আর অভাগিনীর দল সবাকার শান্তি ক্ষুণ্ণ করছিল। সব চেয়ে বেশী হোঁচট খাচ্ছিল মিলিটারি লরির চাকাগুলি, বোধ হয় পদে পদে যুদ্ধোদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছিল। তাই তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্লেগের ইঁদুরকে যেভাবে খাঁচায় ভবে লোকালয়ের সীমার বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। শুধু মুক্তি দেওয়া হয়েছে জাত ভিখিরিদের, দুঃস্থ গেরস্থের শত দুঃখের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য বেছে বেছে ভিখিরি নামে অমানুষগুলিকেই লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু যারা মানুষ, যারা প্রজা, যারা রাজস্ব যোগায়—পথকর জলকর থেকে শুরু করে প্রতি নিশ্বাসের জন্য কর দিয়ে যারা রাজকোষের ঐশ্বর্য অটুট রাখে, তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু তাদেরই। পড়ো ভিটে, শস্যহীন মাঠ, বীজ-বলদ-লাঙলবর্জিত শূন্য খামার, মারী আর মড়কের উচ্ছন্নতার মুখে তাদের এক আইনের ঠেলায় ঠেলে নিয়ে গেছে। বাঁচবার হয় বাঁচবে, মরবার হয় মরবে, তার জন্য অবশ্য আইনের কোন দায়িত্ব নেই। রাজধানীর ছিরিটুকু বজায় থাকলেই হলো।

কিন্তু মড়ার বাংলা মনেপ্রাণে জানে যে সোনার কলকাতায় খাবার আছে। তাই তাড়িয়ে দিলেও তারা আবার ফিরে আসে। না এসে উপায় নেই। রেল লাইন ধরে, খালের পাশ দিয়ে, মাঠে, ঝোপ-ঝাপের আড়াল দিয়ে তারা আবার আসতে থাকে। হয়তো তারা আসতো না, কিন্তু কারা যেন তাদের কানে কানে মন্ত্র পড়ে দিয়ে গেছে—এস এস, সবাই এস। এই রাজধানী কলকাতার যত চুরি ফাঁকি আর ভণ্ডামি তোমাদের সর্বনাশের মূল। যত চোরের আড্ডা এই শহরে। তোমাদের ক্ষেতের ধান লুঠ করে নিয়ে তারা এইখানে লুকিয়ে রেখেছে। কলকাতাকে আরামে ঘুমোতে দিও না তোমরা। লোভী কলকাতার উজীরালি দালালি মজুতদারি, কলকাতার সাহিত্য শিল্প গান ফুর্তি হাসি—সব কিছুকে প্রতিমুহূর্তে বিব্রত কর, অতিষ্ঠ করে তোল। ভাতের দাবি ছাড়বে না কেউ। তোমরা কোন অপরাধ করনি, তোমাদের মেরে কারও বেঁচে থাকার অধিকার নেই! এস, দাবি কর, লড়াই কর, সত্যাগ্রহ কর—আইনের ফাঁকির বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াও।

অবনীর চাকরি নিয়ে পিসিমার নিত্য দুশ্চিন্তা আর গঞ্জনা মাঝে মাঝে বাড়ির আবহাওয়া বড় উত্যক্ত করে তোলে। অবনীর চেয়ে অরুণাকেই পিসিমার অনুযোগের আক্রমণ সইতে হয় বেশী। আজকাল নতুন একটা উদ্বেগ পিসিমাকে ব্যস্ত করে তুলেছে। অবনী বাইরে বের হয়ে গেলেই পিসিমা অরুণার কাছে প্রায়ই কথাটা একবার উত্থাপন করেন।—হিমাংশুর ছেলেমেয়েগুলো সদাসর্বদা দিদিমা দিদিমা করছে।

অরুণা বলে।—হিমাংশু কে?

পিসিমা।—আমাদের হিমাংশু আবার কে?

অরুণা মনে মনে অনেক চেষ্টা করেও তার তিনকুলের কুটুম্বিতার শেষ সীমানা পর্যন্ত খুঁজেও কোন হিমাংশুকে আবিষ্কার করতে পারে না।

পিসিমা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন।—তোমাদের পিসের মাসতুতো দাদার আপন খুড়োর ছেলে ক্ষিতীশ।

অরুণা যেন নিঃশব্দে হাঁ করে তাকিয়ে পিসিমার বংশতত্ত্বের বিশ্লেষণটা দেখতে থাকে।

পিসিমা বলেন—ঐ ক্ষিতীশের ছেলে হলো হিমাংশু, পাটনায় থাকে। হিমাংশু চিঠি দিয়েছে, তার ছেলেমেয়েরা শুধু দিদিমা দিদিমা করে। ছোটগুলো নাকি কান্নাকাটিই শুরু করে দিয়েছে!

অরুণা জানে, কদিন হলো পিসিমার একটি চিঠি এসেছে। ঠিক চিঠি নয়, খুব সম্ভব চিঠির উত্তর। আজ বোঝা গেল পাটনা থেকে হিমাংশুবাবুই লিখেছেন। পিসিমা এক এক সময় হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়েন, আক্ষেপ করতে থাকেন।—আমার নাতিরা কাঁদছে সেখানে, অথচ এমনি কপাল করেছি যে একবার যাবারও উপায় নেই।

এই অভিনব পাটনাই নাতিদের জন্য পিসিমার বিচ্ছেদবেদনা অরুণাকে শুধু হতভম্ব করে দেয়। একটা দীনতার লজ্জায় সারা মন ছোট হয়ে আসে। পিসিমার আচরণে তবু এক তিল ক্ষুব্ধ হয় না অরুণা। বুঝতে পারে, কোন দোষ নেই পিসিমার, কোন দোষ নেই।

শেষ পর্যন্ত পিসিমার ধিক্কার বড় কঠোর হয়ে বেজে ওঠে। অরুণাকে নিভৃতে পেলে, পিসিমা একটু উত্তেজিতভাবেই মালা হাতে সুমুখ দিয়ে একবার ঘুরে যান। যেতে যেতে বলেন—এ কি রকম সংসার তোমার অরুণা?

অরুণা বিবর্ণ মুখে প্রশ্ন করে—কি হলো পিসিমা?

পিসিমা।—বড় লক্ষ্মীছাড়া তোমার সংসার অরুণা। শুধু নেই নেই নেই। চাল নেই, ডাল নেই, পূজো পার্বণ নেই, অতিথি কুটুম নেই, একটা কচি ছেলের সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই তোমার বাড়িতে। এত নেড়া সংসারে কি আমার মত মানুষ বাঁচতে পারে অরুণা?

অরুণা মাথা হেঁট করে পিসিমার সব অভিযোগ আঘাত বিনা প্রতিবাদেই বরণ করে নেয়। একটু শান্ত হয়ে পিসিমা অন্য ঘরে চলে যান। শুধু শোনা যায়, জপ ছেড়ে দিয়ে পিসিমা উতলা হয়ে আপসোস করছেন, এক এক সময় ফুঁপিয়ে উঠছেন।—হিমাংশু, হিমাংশু, হিমাংশুর ছেলেমেয়েরা, আমার নাতিরা আমার নাতনীরা, আমাকে দেখতে চায়, আমার জন্য কাঁদছে। কচি কচি ছেলেগুলো, কোল জুড়ানো ছেলে, একটু দিদিমার আদর পেলে না আজও...।

তিন দিন তিন রাত্রি কোথায় কাটিয়ে দিয়ে আজ ভোরে ঘরে ফিরলো অবনী। ফিরে এসেই ধপ করে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়লো। অরুণা একটা পাখা হাতে করে এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ালো। মূর্ছার মত মনে হচ্ছে। বুকের ওপর হাত রেখে, চোখ বুজে, অসাড়ের মত পড়েছিল অবনী। আস্তে আস্তে নিশ্বাস টানছিল। অবনীর মুখের ওপর অরুণার সন্ত্রস্ত চোখ দুটো একেবারে ঝুঁকে পড়তেই, অবনী আস্তে আস্তে হাত তুলে অরুণার একটা হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো।

কোন কথা না বলে, শুধু কলের মত একটানা পাখার বাতাস করে চলেছিল অরুণা।

—অবু এসেছিস নাকি? পাশের ঘর থেকে পিসিমার ব্যগ্র প্রশ্নের স্বর কানে যেতেই অবনী একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলো। বাধা দিল অরুণা।—তুমি শুয়ে থাক, ঘুমোও।

পিসিমার প্রশ্নের উত্তর দিল অরুণা—হ্যাঁ পিসিমা।

মালা ছাড়াই মনে মনে নাম জপছিলেন পিসিমা। তাই সামনে উঠে আসতে পারলেন না। তবু তাঁর ভোরের ধ্যান থেকে থেকে ভেঙে যাচ্ছিল, প্রশ্ন না করে পারছিলেন না।

পিসিমার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল—চাকরি পেলি অবনী?

অরুণা উত্তর দিল না।

পিসিমা।—আশ্চর্য করলি বাবা। মুখ্খু নয়, পঙ্গু নয়, তবু চাকরি জুটবে না, এ কিরকম অদেষ্ট? আমার আর কি? আমার বাঁচলেই বা কি, মরলেই বা কি? কিন্তু তোরা? তোরা কেন এভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে...।

পিসিমার কথাগুলি দুঃসহ এক জ্বালা ছড়িয়ে আজকের ভোরের বাতাসের এত নীরব শীতলতাটুকু যেন শুষে নিচ্ছিল। পিসিমার শরীর ভাল নেই। কাল দুপুরে একবার মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। বড় কষ্ট হচ্ছে পিসিমার। বুড়ো মানুষ, একটুতে কাহিল হয়ে পড়েন। কাল সারাদিনের মধ্যে শুধু একমুঠো ভেজা মুগ খেয়েছেন। আগের দিনটা উপোসে গেছে। তার আগের দিন শুধু কয়েকটা কলা আর এক ঢেলা গুড়। অবনী এখনও জানে না যে, পিসিমা সেদিন হঠাৎ যুগলবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঐ কলা আর গুড় ওখান থেকেই এনেছেন। অরুণা অবশ্য পিসিমাকে এবিষয়ে কোন প্রশ্ন করেনি। তার যেটুকু বোঝবার সেটুকু সে বুঝেছে পিসিমার ক্ষুধালজ্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে। পিসিমা বলেছেন—যুগলবাবুর বউ জোর করে গছিয়ে দিল অরুণা।

অবনী নিঝুম হয়ে শুয়েছিল। পাশের ঘর থেকে পিসিমারও আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবনী একবার ছটফট করে পাশ ফিরতেই অরুণা জিজ্ঞেসা করলো—শরীরটা কি খুবই খারাপ বোধ করছো?

অবনী উত্তর দিল—না, একটু বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অরুণা বললো—আজ পনর দিনের ওপর হয়ে গেল, জোছুর একটা চিঠি এল না। একটা পৌঁছন সংবাদও পেলাম না।

উত্তর দেবার দায়িত্বটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই যেন অবনী অন্যদিকে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। অবনীর নিরুত্তরতায় শঙ্কিত হয়ে উঠল অরুণা।—জোছুর খবর পেলে কিছু? কথা বল অবন, আমার যে আর ভাল লাগছে না কিছু।

অবনী।—খবর পেয়েছি।

অরুণা।—কেমন আছে জোছু?

অবনী।—তা আমি জানি না।

দুর্বোধ্য একটা আতঙ্কে শিউরে উঠে অবনীর হাত দুটো চেপে ধরলো অরুণা। কি ভয়ঙ্কর কথা বলছো অবন, শীগগির বল জোছু কোথায়?

উঠে বসলো অবনী।—এত ভয় পাবার মত কিছু ঘটেনি। ভালই আছে জোছু।

অবনীর শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্বস্ত হলো অরুণা। অবনীর মুখ থেকে ধীরে ধীরে এই শান্ত গাম্ভীর্যের শেষ ছায়াটুকুও সরে গেল। চিন্তার অন্ধকার ঠেলে একটা গোপন পুলকের সুস্মিত আভা যেন ফুটে উঠছিল।

অবনী হেসে হেসে বললো—জোছু আমাদের সবার উপর টেক্কা দিয়ে গেল।

অরুণার আতঙ্ক তবু নিঃশেষ হয়নি। বললো—কেন?

অবনী।—জোছুর ঠিকানা এখন আর পাবে না। ঠিকানা হারিয়েছে জোছু।

অরুণা।—কিছু বুঝলাম না। মোরাদাবাদে যায়নি জোছু?

অবনী।—না। জোছু তার জীবনের কাজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছে। তাকে আমরা আর ফেরাতে পারবো না। ফেরারী হয়েছে জোছু। তাকে খুঁজতে গেলে সে আরও বেশি করে হারিয়ে যাবে।

জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিটা সঁপে দিয়ে অবনী যেন দূর দুর্নিরীক্ষ্য কোন গ্রহের উদ্ভাসিত রূপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। সারা মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল।

অবনী বললো—আমাদের জোছু এখন দেশের গাঁয়ের পথে পথে গোপন ঝড়ের ছায়ার মত ছুটে চলেছে। মুমূর্ষুরা উঠে দাঁড়াবে, হতাশেরা জয়ধ্বনি করবে। মৃত্যুর ষড়যন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের জোছু জীবনের বাণী ছড়িয়ে ফিরছে।

শুনতে শুনতে অরুণা যেন এতক্ষণ এক অবাস্তব রহস্যের আবর্তের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল। একটু সুস্থ হয়ে, মনে কৌতূহলগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে অরুণা বললো—কি কাজ করতে বেরিয়েছে জোছু?

অবনী।—কংগ্রেসের প্রচারে বের হয়েছে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে অবনী যেন এক দুর্দম অহংকারে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো—আমি বিশ্বাস করি অরুণা, যেপথ দিয়ে যাবে জোছু, দুপাশের যত মানুষের গাঁ গঞ্জ বস্তি কংগ্রেসের শিবির হয়ে যাবে। তারা লড়বে, তারা বাঁচবে। আমাদের মুক্তির মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। আমি তুমি সবাই বেঁচে যাব অরুণা।

দরজার কাছে পিসিমার মূর্তি দেখা দিল। অবনীর চেঁচানি শুনেই বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠে এসেছেন।

অরুণা একটু সরে বসলো। পিসিমা দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ঘরে এককণা চাল নেই, বার গণ্ডা পয়সা ফেলে রেখে তিন দিন ঘরের বাইরে কাটিয়ে এলি, একটা চাকরি যোগাড়ের চেষ্টা নেই, তোর কিসের আনন্দ রে অবু? এত বাজে কথা বকছিস কেন?

অরুণার হাতের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করে পিসিমা আবার বললেন—ঐ দেখ, চোখ দিয়ে দেখে নে। এমন কিছু সোনার কাঁড়ি রাখিস নি যে বেচে বেচে দিন চলবে।

হঠাৎ পিসিমার অনুযোগের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে অবনী আর অরুণার মূর্তি দুটোকে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। অবনীর বুকের হাড়, চোখের কোটর, ভাঙা গাল আর শীর্ণ গলার শিরাগুলি। অরুণার ফ্যাকাসে মুখ, ভেজা ভেজা চোখ আর হাতের ঢলঢলে নোয়াটা—কব্জির গিঁটটাও পার হয়ে একেবারে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত নেমে গেছে।

আর কোন কথা বলেন না পিসিমা। যেন প্রচ্ছন্ন একটা বিভীষিকার দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। দেশের বাড়িতে, ভরা মানুষের সংসারে এই ক্ষুধাহত বিভীষিকার ছায়াই না তাঁকে দেশছাড়া করে এইখানে এনে ফেলেছিল? আবার এখানেও সেই ছায়া? পিসিমার দুর্বল শরীর কাঁপছিল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। দেয়াল ধরে ধরে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এসে বসলেন পিসিমা। আর কোন কথা বললেন না।

অনেকক্ষণ ধরে একটা অস্বাভাবিক নীরবতার পর অবনী কথা বললো—আজ আমার কাছে টাকা আছে অরুণা, ধার করেছি।

অরুণা।—ভালই করেছ, তাড়াতাড়ি শোধ করার ব্যবস্থাটা করো।

অবনী।—এ-ধার আমি শোধ করবো না। যার কাছে এই ধার পেয়েছি, চিরকাল তার কাছে ঋণী হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে আমার।

অরুণা।—কে ধার দিলে?

অবনী।—শৈলেশ মিস্ত্রী দিয়েছে। স্বরূপরামের কারখানায় কাজ করে শৈলেশ।

অরুণা।—সেই জন্যেই বুঝি তার টাকা শোধ দেবে না?

অবনী।—আমি শৈলেশের ঘরের দাওয়ায় বসে সব শুনেছি, সব বুঝেছি।

অরুণা।—কি ?

অবনী।—বুঝলাম, শৈলেশ আর শৈলেশের বউ তাদের ছোট ছেলেটার হাত থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বালা জোড়া খুলে নিল। পেছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল শৈলেশ, বোধ

হয় বালা জোড়া বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে এল। সেই টাকা আমায় ধার দিয়েছে শৈলেশ।

অরুণার মনটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। প্রতিবাদ করলো অরুণা।—এটা ভাল কাজ করলে না অবন। ভাল হলো না। ও-টাকা ছুঁতে আমার ভয় করবে।

অবনী।—আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে অরুণা। জীবনে এভাবে এমন একটি সাহায্য এই প্রথম পেলাম। বড় শখ ছিল, কোন একটা বড় হৃদয়ের কাছে একবার মাথা নিচু করি। শৈলেশ আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। শৈলেশকে ঠকিয়ে তার কাছে ছোট হয়ে থাকতে আমার ভাল লাগবে। শোধ দিতে পারবো না।

অরুণা একটু সন্দিগ্ধভাবে বললো—শৈলেশ হঠাৎ এতটা উদার হয়ে...।

অবনী।—তা জানি না, কেন এত উদার হলো শৈলেশ। তবে শৈলেশ শুধু জানে, একজন দুঃস্থ কংগ্রেসের কর্মীকে সে সাহায্য করেছে। শৈলেশ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে—কংগ্রেস লড়বে, স্বরাজ হবে, সবার দুঃখ দূর হবে। লোক যেমন ধার করেও দেবতার মানত পূর্ণ করে পায়, শৈলেশ তেমনি...।

অবনীর স্বর হঠাৎ আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠলো।—লোকের নীচতা দেখে মাঝে মাঝে রাগ করে ভুল বুঝে ফেলি অরুণা। মনে হয় এই ভয়ংকর নীচতার শক্তিই বুঝি সবচেয়ে বেশী। কিন্তু হঠাৎ এমন এক-একটা ভরসা পাই যে, আনন্দের সীমা থাকে না, ভুল ভেঙে যায়। তখন দেখতে পাই পৃথিবীতে শৈলেশদের সংখ্যা কম নয়।

পরমুহূর্তে মন থেকে কতকগুলি ঘৃণ্য স্মৃতির বিরক্তিকর স্পর্শ ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্যই যেন অবনী বলতে লাগলো—জাগৃতি সঙ্ঘের নীচতার দাপট দেখে প্রথমে সত্যিই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম অরুণা। আজ আমি ঐ সঙ্ঘটিকে শুধু একটা ছারপোকার বাসা বলেই মনে করি।

অরুণা হেসে ফেললো।—গালগালি দিচ্ছ কেন? যে যার কাজ নিয়ে আছে, থাকুক। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাক।

মনের ভেতর কোন গোপন পরাজয়ের ক্ষত ও বেদনাকে চাপা দিতে গিয়েই বোধ হয় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লো অবনী। ছারপোকারা মানুষের রক্ত খেতে পারে, কিন্তু তবু তারা মানুষের চেয়ে বড় জীব হতে পারে না ; তারা পোকা মাত্র। তার জন্য কোন চিন্তা করি না। কিন্তু ইন্দ্রনাথের মত মানুষ কি করে ঐ সঙ্ঘ আর কম্যুনিস্ট পার্টি নামে একটা জোচ্চোরের দলের কদর্য ফাজলামির মধ্যে তার মনুষ্যত্বকে মানিয়ে নিতে পারছে, এ রহস্যের কোন হদিস খুঁজে পাই না আমি।

অরুণা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অবনীর এই আক্ষেপের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকবে, অনর্থক উত্তেজিত হতে থাকবে, যা মুখে আসে তাই বলবে—বেলা বাড়ছে, স্নানাহারের চিন্তাটাও চাপা পড়ে যাবে একেবারে। এইখানেই অবনীকে থামিয়ে দেওয়া উচিত। একটা অবান্তর প্রশ্ন করার জন্য অরুণা ডাকলো—শুনছো।

বলতে গিয়েই অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল অরুণা। অবনীর চোখ দুটো জলে ভিজে চিকচিক করছিল। ছেলেমানুষের মত ব্যর্থ অভিমানে অবনী যেন একবার ফুঁপিয়ে উঠলো।—ইন্দ্র, আমার ত্রিশ বছরের বন্ধু ইন্দ্র। ছেলেবেলায় ইন্দ্র আমায় ছুরি মেরেছিল। কিন্তু তার মধ্যে অপমান ছিল না। এবার ইন্দ্র আমায় অপমান করেছে। আমাকে ছোট করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ সেই অতি ক্ষুদ্রদের অহংকার বড় করে তুলেছে।

সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অরুণা।

অবনী।—আর শিশিরবাবুই বা কি কুৎসিত কাণ্ড করে বসলেন। ছি ছি ছি।

সন্ত্রস্তের মত চমকে উঠলো অরুণা।—শিশিরবাবু?

অবনী।—হ্যাঁ, শিশিরবাবু এখন জাগৃতি সঙ্ঘের সভ্য। সঙ্ঘের পত্রিকায় তাঁর নাম দেখতে

পেলাম।

অরুণা।—জাগৃতি সঙ্ঘের সভ্য শিশিরবাবু? কেন? কবে থেকে? কি হয়েছে শিশিরবাবুর? কবে ফিরে এলেন? জ্বর সেরে গেছে?

অবনী হেসে ফেললো।—কোন দুশ্চিন্তা করো না। শিশিরবাবুর সব জ্বর সেরে গেছে। তিনি এখন বেশ ভালই আছেন। বিপিনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন আর...।

অরুণা সাগ্রহে প্রশ্ন করলো—আর কি?

অবনী।—আরও কিছু শোনবার দরকার আছে কি? মোট কথা, তিনি বোধ হয় এখন জীবনে সুখী হবার আয়োজন করছেন। ডোভার লেনের এক দিদিমণির কথা শুনলাম বিপিনের কাছে। প্রকাণ্ড এক বড়লোকের মেয়ে। বোধ হয় তারই নাম সিতা বসু।

অরুণা যেন স্বগত বলে ফেললো—জীবনে কি এমন অসুখী ছিলেন তিনি যে, সুখী হবার জন্য হঠাৎ...।

অবনী।—সেসব খবর তো আমি কিছু বলতে পারছি না অরুণা। হয়তো অসুখী ছিলেন কোন কারণে।

ধীরে ধীরে অরুণার মাথাটা হেঁট হয়ে এল। এক পরাজয়ের দুঃসহ ভারে যেন নত হয়ে পড়েছে অরুণা। কোন অপমানের বেদনা অরুণার চোখ দুটোকেও হয়তো মুহূর্তের মত সজল করে ফেলেছিল। অবনীর মনে অবশ্য সে-দৃশ্য দেখার কোন কৌতূহল ছিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবনী আস্তে আস্তে ডাকলো—দুঃখ করো না অরুণা।

এক উদার আকাশের অন্তর থেকে এক ঝলক ঝিকমিক রোদের সান্ত্বনার মত অবনীর কথাগুলি অরুণার সকল চেতনার মেঘভার ঘুচিয়ে দিল। কী দুর্লভ সান্ত্বনা!

অরুণা হঠাৎ ছটফট করে উঠে অবনীর বুকের কাছে মাথাটা গুঁজে দিল। আমায় মাপ কর অবন। শীগগির আমার মাথায় হাত দাও নইলে আমার অমঙ্গল হবে।

অবনী।—মাপ করে দেবার মতো মহাপুরুষ তো নই আমি অরুণা। তাছাড়া তোমাকে মাপ করবো কেন? কি-ভয়ানক এমন অপরাধ করেছ যে মাপ করবো?

অরুণা মুখ তুলে তাকালো।—অপরাধ করিনি আমি? দেখতে পাচ্ছ না অপরাধ?

অবনী।—না।

অরুণা।—সত্যি বলছো?

অবনী।—তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলতে আমি জানি না অরুণা।

অরুণা।—অবন, তুমি অদ্ভুত মানুষ অবন...। অবনীর হাত দুটো ধরে যেন আরতির স্তবের মত সুতরল ছন্দে অরুণা আবৃত্তি করছিল।

অবনী।—শুধু দুঃখ রয়ে গেল অরুণা, শিশিরবাবু শেষ পর্যন্ত আমাদের এভাবে ঠকিয়ে হারিয়ে দিয়ে গেলেন।

অরুণা।—কেউ ঠকাতে পারবে না তোমাকে। কেউ তোমায় হারিয়ে দিতে পারবে না অবন।

মাঝরাত্রে বিছানা ছেড়ে অবনী আস্তে আস্তে ডাকলো—অরুণা।

ঘুমকাতর চোখে হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে অবনীর হাতটা শক্ত করে ধরে রইল অরুণা।

অবনী বললো—এইবার আমি যাই অরুণা। সময় হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে অরুণার হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এল। অবনীর হাতটা ছেড়ে দিল। নিঃশব্দে অবনীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো অরুণা।

অরুণাকে হাত ধরে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে এল অবনী। খিলটা খুললো। দরজার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েই অবনী বললো—চলি এবার, কপাট বন্ধ করে দাও।

একটা স্বপ্নের আবেশের মধ্যে যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অরুণা বললো—কপাট বন্ধ করতে পারবো না অবন। তুমি যে আবার ফিরে আসবে।

হাসতে হাসতে বারান্দা থেকে পথে নেমে পড়লো অবনী।

ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার রোডের এক পাশে ঘেসো মাঠের ওপর একটা লোকের হাতে প্রকাণ্ড এক পতাকা উড়ছিল। ত্রিবর্ণ পতাকা, যেন তিন রঙের তিনটি বহ্নিশিখার বেণী উড়ছে আকাশে। হাজার শহীদের শোণিতে ধৌত, ভারতের ইতিহাসের সংগ্রামী আত্মার প্রতীক এই পতাকা। কী অদ্ভুত শক্তি আছে এই পতাকায়! যে দেখে সেই সৈনিক হয়ে ছুটে আসে।

যার হাতে পতাকাটা দুলছে, সেই মজবুত কালো জোয়ান লোকটির নাম বিপিন।

মাঠের ঘাসের ওপর অবনী চুপ করে বসেছিল। দু-চারটে দল দূরে ও কাছে বসেছিল। রোড ধরে প্রতি দশ মিনিট পর পর এক-একটি গেঁয়ো নিরন্নের দল এসে মাঠের ওপর জমায়েৎ হচ্ছিল। আরও লোক আসবে, আর একটু বেলা বাড়বে, তারপর মিছিল বার হবে।

অদূরে স্বরূপরামের কারখানায় সিটি বাজছিল। মজুরেরা ছুটে চলেছিল দলে দলে। হঠাৎ তাদের চোখে পড়লো, মাঠের ওপর কংগ্রেস পতাকা উড়ছে।

পথ ভুল হয়ে গেলো তাদের। কারখানার শিঙারব আর যেন শুনতে পাচ্ছিল না তারা। কংগ্রেস জিন্দাবাদ! জয়ধ্বনি তুলে মজুরেরা মাঠের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

বেলা বাড়লো। জনতা যেন মাঠ ছাপিয়ে উপচে পড়ছে। অদ্ভুত এক নির্ভয়ের নেশায়, মরণজয়ের প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানের গৌরবে হাজার হাজার মাথা ভরাট হ্রদের ঢেউয়ের মত উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

কয়েকজন কর্মী চারদিকে ছুটাছুটি করে জনতার কাছে সংকল্পবাণী পড়ে শোনাচ্ছিল—এই যুদ্ধ আমাদের জীবনে অমঙ্গলের অভিশাপ নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে কোন সত্য নেই। আমাদের বিনাশের ওপর এই যুদ্ধের আয়োজন চলেছে। যে গভর্নমেণ্ট আমাদের কাছে যুদ্ধের সাহায্য চায়, সেই গভর্নমেণ্ট আমাদের অন্নবস্ত্রের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। আমাদের বাঁচাবার বেলায় কোন গভর্নমেণ্ট নেই। আমরা মরতে চলেছি। আমরা প্রতিবাদ করবো। আমরা প্রতিটি চালের আড়তে, মার্কেটের ফটকে আর ট্রাম লাইনের ওপর পথ জুড়ে বসে থাকবো। আমাদের মেরে রেখে যারা বাঁচতে চাইছে, তাদের জীবন আমরা অচল করে তুলবো। আমরা খাদ্য চাই, আমরা বাঁচতে চাই। যে-আইন আমাদের ফাঁকি দেয়, সে-আইন আমরা মানবো না।

মত্ত জলস্রোতের মত মিছিলটা যেন মাঠ ছেড়ে রোডের ওপর এসে গড়িয়ে পড়লো। তবু হঠাৎ যেন ছন্দভঙ্গ হয়ে মিছিলটা সেইখানে থমকে গেল কিছুক্ষণের জন্য। মিছিলের পথ রুখে কয়েকটা মোটরকার আর গোটা বিশেক ভদ্রগোছের লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মোটরকারের গায়ে ছোট ছোট লাল পতাকা গোঁজা রয়েছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে অবনী একবার উঁকি দিয়ে দেখলো, চিনতে পারলো—হ্যাঁ তারাই এসেছে।

মিছিলের অগ্রবর্তী জনতার সঙ্গে আগন্তুক লোকগুলির একটা বিতণ্ডা পাকিয়ে উঠছিল।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বললো—আমরা জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মী, কম্যুনিস্ট পার্টির তরফে আমরা বলছি...।

আর একজন জাগৃতিওয়ালা কর্মী এগিয়ে এসে বললো—খাদ্যের দরকার থাকে তো গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করুন। হাঙ্গামা করে কি লাভ হবে?

অপর একজন এসে আতঙ্কিতের মত চীৎকার করতে লাগলো—ভয়ানক ভুল করছেন

আপনারা। এভাবে খাদ্যের দাবি করলে যুদ্ধের সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে, জাপানীরা ঢুকে পড়বে।

ভিড় ঠেলে মিছিলের আগে এগিয়ে এল শৈলেশ মিস্ত্রী। জাগৃতিওয়ালা কর্মীদের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল—খুব সত্যি কথা বলছেন মশাইরা। আমাদের উচিত ছিল, না খেয়ে দাঁত ছিরকুটে পথে মরে পড়ে থাকা। তাহলেই জাপানীরা পালিয়ে যাবে।

পরমুহূর্তে বিপিনের দিকে তাকিয়ে শৈলেশ মিস্ত্রী উত্তেজিতভাবে হাত দুলিয়ে ইশারা করলো—এগিয়ে চল।

কংগ্রেস জিন্দাবাদ! জয়রোলে বাতাস আলোড়িত করে মিছিল এগিয়ে চললো। জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীরা তবু কিছুক্ষণ ঠেঁটা শেয়ালের মত যেন মিছিলের গা শুঁকে শুঁকে চললো। নানাভাবে আপত্তি করলো, প্রতিবাদ করলো, ঠাট্টা করতেও ছাড়লো না। একটি জাগৃতিওয়ালা কর্মী হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—এখনো সময় আছে, ভালয় ভালয় মিছিল ভেঙে দিয়ে সরে পড়ুন। নইলে পুলিস ডাকবো।

ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম অমানুষের রব এই প্রথম শোনা গেল আজ। জনতার ক্ষমার শক্তি যেন মুহূর্তের মধ্যে সংযম হারিয়ে ফেললো। সরকারী বিবরের বিষাক্ত অন্ধকারের আশ্রয়ে পুষ্ট এই সাপের মূর্তিগুলির দিকে মিছিলের একটা দল সরোষে তাড়া করে এল। শৈলেশ মিস্ত্রীই দৌড়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ জনতাকে বাধা দিয়ে অনুরোধ করলো—যেতে দাও। ছেড়ে দাও। ওদের কথায় কান দিও না।

অনেক দূরে একটা মোটরগাড়ির জানালা দিয়ে একটা লোক গলা বাড়িয়ে দেখছিল। জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীদের একটা ফ্যাসিস্তবিরোধী সংঘর্ষ যেন তদারক করছিল জয়ন্ত মজুমদার। হঠাৎ হাত তুলে ইশারায় কর্মীদের পরিত্রাহি ডাকতে লাগলো জয়ন্ত। মিছিলের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে কর্মীরা দৌড়ে চলে গেল।

মিছিল এগিয়ে চললো। বেলা বাড়লো। খিদিরপুরের পুলের কাছে পৌঁছে গেল মিছিল। একদল পুলিস আর দুজন সার্জেন্ট মিছিলের পথরোধ করে দাঁড়ালো।

দেখা গেল, জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীরাও আবার এসেছে। পুলিসদলের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক পরানুচালিত গাধাবোটের গর্বে গদগদ হয়ে ভাসছে।

কংগ্রেস জিন্দাবাদ! মিছিলের হর্ষ উদ্দাম হয়ে উঠলো। মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলছিল মাথার ওপর।

পিসিমার জন্য আজ আতপ চাল ঘি আর ফল আনিয়েছে অরুণা। কিন্তু পিসিমা সারা দুপুর অভিমান করে বসে রইলেন। শুধু মালা জপলেন, খেলেন না কিছুই।

সন্ধ্যেবেলা অনেক সাধাসাধি করার পর একটু ফল মুখে দিলেন পিসিমা। কোন কথা বললেন না। অরুণার দিকে একবার ভাল করে তাকাতেও চান না। অরুণা সামনে এসে দাঁড়ালে বরং কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। একটু সন্দিগ্ধ ও সতর্ক হয়ে ওঠেন।

সকাল থেকে শুধু বিভোরভাবে কাজ করেছে অরুণা। ঘরগুলি ধোয়ামোছা করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে, টেবিল আলমারি সাজিয়ে ব্যস্ত মৌমাছির মত তার একটা মন যেন সারা দিনটাকে কাজের গুঞ্জনের মধ্যে শেষ করে দিয়েছে। পিসিমা খেয়েছেন, তাই অরুণারও এতক্ষণে খাবার সুযোগ হলো, সারাটা দিন উপোসে কাটিয়ে এই সন্ধ্যেবেলা।

আলো জ্বালা হলো, সঙ্গে সঙ্গে সব কাজের খেলাও যেন শেষ হয়ে গেল অরুণার। আর কিছু করবার নেই।

এতক্ষণ জোর করে একটা কথা ভুলেছিল অরুণা—অবনীর কথা। অরুণা মন চায়, অন্যমনা ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ যেন সে চমকে উঠে দেখতে পায়—অবনী এসে গেছে। সেই

হঠাৎ দেখার আনন্দে একেবারে ডুবে যাবে অরুণা। এতক্ষণ সে তাই তার উদ্বিগ্ন মনের সব ভাবনাকে কাজের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। দোর খোলা আছে, সে ফিরে আসবেই। প্রতিমুহূর্তে ভেবে ভেবে আর কি লাভ হবে?

কিন্তু অবনী ফিরে আসেনি।

এক স্বপ্নের মধ্যেই যেন কোন ফাঁকে কাল রাতে সে পালিয়ে গেছে। তাকে ভাল করে বলা হলো না, শোনা হলো না, ছোঁয়া হলো না। একবার ফিরে আসুক, ফিরে এসে আবার যেন চলে যায়। কোন বাধা দেবে না অরুণা।

—দিদি আছেন? বারান্দায় উঠে কে যেন ডাকলো।

আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো অরুণা।—কে?

—আমি সুকুমার!

—কোন খবর শোনাতে এসেছ নিশ্চয়।

—হ্যাঁ দিদি।

—বল।

—অবনীদা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

—কখন?

—আজ বিকেলে। আজ সারাদিন ধরে সত্যাগ্রহ চলছে দিদি। এখনো থামেনি। আমি যাই। মন খারাপ করবেন না, ভয় পাবেন না। আমি আবার আসবো।

ব্যস্ত সুকুমার কথাগুলি শেষ করে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কপাটটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল অরুণা। মেঝের ওপর বসে রইল—মাটির প্রদীপের মতই একটা শান্ত-মূর্তি।

অরুণা যেন জোর করে বিশ্বাস করতে চায়, সে একা নয়, তার জগৎ ফাঁকা হয়ে যায়নি। তুমি আছ, তুমি আছ। চারদিকে আমার রয়েছ। নিজেকে একা মনে করলে ভুল হবে, তুমি দূরে সরে যাবে।

আলমারি থেকে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স তুলে নিয়ে আলোর সামনে বসলো অরুণা। নতুন পুরনো অনেকগুলি ফটো, অবনীর নানা বয়সের ফটো। একটা একটা করে ফটো চোখের কাছে তুলে দেখছিল। ছেলেমানুষের মতই চঞ্চল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য যেন এক দুঃখ ভোলার খেলাপাতি খেলছিল অরুণা। তার জীবনের মাত্র চারটি বছরের বান্ধব অবনী। তবু জীবনের প্রথম শুভদর্শন ত্রিশ বছর বয়সের অবনীকে যেমন আপন করে চেনা যায়, বাইশ বছরের অবনীও যেন তাই। আঠারো বছরের অবনীকেও কত চেনা মনে হয়। জীবনে কোনদিন, কোন অতীতেও সে যেন অচেনা ছিল না।

বাক্সের ফটোর ভিড় ঠেলে হঠাৎ হাতে উঠলো তের বছর বয়সের অবনীর একটি ফটো। দেখা মাত্র অরুণার বুক ছাপিয়ে একটা চুমোর ঝড় ঠেলে উঠলো। সারা মুখটা হাসির ছটায় মুগ্ধ হয়ে রইল। কংগ্রেসের এক কিশোর ভলাণ্টিয়ার তের বছর বয়সের অবনী—মাথায় গান্ধী টুপি, বুকে একটা ব্যাজ, গঙ্গাসাগরের মেলায় এক সেবা সমিতির ক্যাম্পে দাঁড়িয়ে আছে।

বাক্স হাতড়ে বার বার খুঁজলো অরুণা। এর চেয়েও ছোট অবনীকে যদি পাওয়া যায়।

এর চেয়েও ছোট অবনী? অরুণার রক্তের অন্ধকারে সুষুপ্ত একটি আবির্ভাব হঠাৎ স্পন্দনে সাড়া দিয়ে ওঠে। একেবারে নিঝুম হয়ে যায় অরুণা। এক নবমুকুলের আবেগের ছোঁয়ায় তার সকল ভাবনার ডালপালাগুলি যেন নিঃশব্দে মদির বাতাস পান করতে থাকে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে অরুণা। সাথীহীন উৎসবের দুঃখের মত আবার বড় ফাঁকা লাগে। বড় একা। আবার একটা ঝড়ের আতঙ্ক তার সব ভাবনার এই মধুর ঘুম পরমুহূর্তে শিউরে দিয়ে চলে যায়।

অরুণা ডাকলো—পিসিমা।

কোন উত্তর শোনা গেল না পিসিমার। অরুণা ব্যস্তভাবে উঠে এসে পিসিমার ঘরে ঢুকলো। পিসিমা নেই, পিসিমার নামাবলী, জপের মালা আর পেতলের ঘটিটিও নেই।

—যাবেন না পিসিমা। যাবেন না পিসিমা। ঘরের শূন্যতাকে করুণ করে দিয়ে অরুণার গলা থেকে একটা আর্তস্বর ঠিকরে পড়ছিল।

ভেতরের বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগলো অরুণা। খোলা খিড়কির দরজাটার দিকে তাকিয়ে অসহায়তার বেদনা চরম হয়ে উঠে যেন মনে মনে ডুকরে উঠলো। —যাবেন না পিসিমা, কচি ছেলের সাড়া শুনতে পাবেন, যাবেন না।

খিড়কির দরজা বন্ধ করে দিয়ে, চোখ মুখ ধুয়ে আবার বাইরের ঘরে এসে বসতেই অরুণা শান্ত হয়ে গেল। এক কঠিন অটলতার শক্তি যেন আবার খুঁজে পেল অরুণা।

রাত হয়ে গেছে। নির্জন পথের সাড়া শব্দ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

—দিদি আছেন?

জানালাটা খুলে অরুণা উত্তর দিল—কে?

—আমি শ্রীমন্ত।

—কি খবর?

—অবনীদা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

—শুনেছি।

—ইন্দ্রবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন।

জানালার গরাদটা শক্ত করে ধরে অরুণা বললো।—ইন্দ্রবাবু?

—হ্যাঁ। সন্ধ্যে পর্যন্ত ইন্দ্রবাবুই সত্যাগ্রহ চালিয়েছেন। বেচারা বিপিন বড় জখম হয়ে হাসপাতালে গেছে। বেপরোয়া গ্যাস আর লাঠি চার্জ চলছে দিদি।

বিচিত্র এক প্রসন্নতার প্লাবনে অরুণার সারা অনুভবের যত রিক্ততা, যত পরাজয়ের কাঁটা, আক্ষেপ অভিমান ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। শ্রীমন্ত তখনো দাঁড়িয়ে আছে। অরুণা বললো—আচ্ছা এস।

শ্রীমন্ত।—হ্যাঁ, আমি যাই। কোন ভয় করবেন না দিদি। আবার আসবো।

আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার কাছে একটা চেয়ার টেনে বসলো অরুণা। আজ আর ঘুম আসবে না কিছুতেই। এইখানে বসে বসে যেন আজ প্রহর গুনবে অরুণা।

একটা পুলিসের পেট্রল কড়া বুটের শব্দে পথের স্তব্ধতা মাড়িয়ে তড়বড় করে চলে গেল।

আবার কে ডাকলো।—দিদি আছেন?

—কে?

—আমি নৃপেন।

—কি ব্যাপার?

—শিশিরবাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন।

—কেন?

—সত্যাগ্রহ করেছেন।

—ঠিক বলছো? সেই শিশিরবাবু তো? না, অন্য কেউ?

—সেই শিশিরবাবু, আমাদের গানের শিশিরবাবু।

—আচ্ছা, এস।

নৃপেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললো—আজ বোধ হয় সারা রাত ধরপাকড় আর খানাতল্লাসী চলবে। আমি চললাম। ভাবনা করবেন না দিদি, ভয় নেই, আমরা আছি।

নৃপেন চলে গেছে। রাত গভীর হয়ে গেছে। তবু আজ রাতে কিছুতেই ঘুম আসতে পারে না। বসে বসে শুধু প্রহর গুনবে অরুণা।

নিঃশব্দ অন্ধকারের হৃদয়ের তন্তুতে এক আলোকের সুরের তম্বুরা বিভোর হয়ে বাজে—ভয় নেই, আমরা আছি। ভোর হতেই বা আর কত বাকি?

গল্প

এক একবার সত্যিই আজ মনে হয়, কী কুক্ষণে সেদিন সরযূদের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। সেদিন সরযূর ওই মিষ্টি অনুরোধের কথা শুনে আর খুশি হয়ে যদি সরযূদের বাড়িতে চা খেতে না যেত অলকা, তবে আজ আর এভাবে এই ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে মনের এই যন্ত্রণার সঙ্গে এত লড়াই করতে হতো না।

বেশ দূরে কাদের বাড়িতে রেডিওর গান বাজতে শুরু করেছে ; গানের ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটা বোঝা যায়। বেশ মিষ্টি সুর! অলকার মনের যন্ত্রণাটা তখনি যেন নিজেই লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে যায়। এই তিন বছর ধরে অলকার মনটা যে তৃপ্তিতে ভরে আছে, সেটা যে সেই সেদিনেরই ঘটনার দান। আজ হঠাৎ রাগ করে ওকথা ভাবলে চলবে কেন? এই তিন বছরের জীবনে অলকার মনের ভিতরে যে আলো হাসছে, সেটা যে সেই সুক্ষণেই জ্বলে উঠেছিল। সরযূর কাকা অবনীশের সঙ্গে যদি সেদিন দেখা না হতো, তবে অলকার মন আজ এই গর্বের সুখে ভরে উঠতে পারতো না যে তার মতো একটা কুরূপা মেয়েকে একজন সুন্দর মানুষ এত ভালবাসতে পারে। সেদিন সরযূর মনের কোন কল্পনাতেও এ সন্দেহ ছিল না যে, ওর কাকা অবনীশের চোখে বা মনে এমন ভুল কখনও সম্ভব হতে পারে। সন্দেহ হলে সরযূ নিশ্চয়ই সাহস করে অলকাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করতো না।

শুধু সরযূ কেন, পৃথিবীর যে কোন মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে দেবে, অবনীশের মতো ছেলের পক্ষে অলকাকে ভালবেসে ফেলা সম্ভবই নয়। সম্ভব হলে ওটা একটা নিয়ম-ছাড়া কাজ হবে, একটা দুর্ঘটনার মতো ব্যাপার হবে।

কিন্তু এমন অসম্ভবই তো সম্ভব হয়েছে। আজ সরযূও অস্বীকার করতে পারবে না, ওর কাকা অবনীশ অলকাকেই চিরকালের আপনজন করে ডেকে নেবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। সরযূ আর সরযূর মা, দুজনেই প্রথমে বোধহয় সন্দেহ করেছিল, না অবনীশ বোধহয় একটা খেয়ালের খুশিতে অলকার জন্মদিনে ফুল আর বই উপহার পাঠিয়েছে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অবনীশের বিয়ের জন্য বাড়ির মানুষের সব চেষ্টা যখন বিফল হয়ে গেল, তখন সকলেই বুঝতে পেরেছেন আর ভয়ানক আশ্চর্যও হয়ে গিয়েছেন, অলকা তাহলে অবনীশের কাছে একটা খেয়ালের খেলনা মাত্র নয়।

তবু সবাই আশা করেছিলেন, ভালবাসার মধ্যেও তো কোন ভুল থাকতে পারে। সে ভুল নিজেই একদিন ভালবাসার মোহটা ভেঙে দেবে। অলকা আব অবনীশের সঙ্গে দেখা করতে আসবে না, অবনীশও আর মাঝে মাঝে অলকার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার অভ্যাস বন্ধ করে দেবে।

কিন্তু তা হয়নি। আর অবনীশের বাড়ির কেউই যে তাতে খুশি হয়নি, এটাও বোঝা যায়। সরযূর সঙ্গে এই তিন বছরে আরও কতবারই তো দেখা হলো, কিন্তু সরযূ হেসে কথা বললেও সে হাসির মধ্যে যেন একটা গম্ভীর অভিযোগের ছায়া লুকিয়ে থাকে। সরযূ আর সরযূদের বাড়ির কেউই চায়নি যে, অবনীশ শেষে অলকাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠুক।

সরযূদের বাড়ির সবারই মনের এই ধারণা খুব ঠিক ধারণা নয়। অলকাকে বিয়ে করবার জন্যে অবনীশের ব্যস্ততা এখনও শুধু মনেরই একটা ব্যস্ততা। তিনটি বছর পার হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত সরযূর বাবাকে কিংবা মাকে, এমনকি সরযূকেও মুখ খুলে বলে দিতে পারেনি অবনীশ, এবার একটা দিন ঠিক করে ফেলতেই তো হয়।

সরযূরাও একটু আশ্চর্য হয়েছে বৈকি ; অবনীশ এখনও কথাটা বলে দিচ্ছে না কেন? কিসের বাধা? বাড়ির কেউ তো আপত্তি করবে না। আপত্তি করবার দিন পার হয়ে গিয়েছে। সকলেই জেনে গিয়েছে, অলকা ছাড়া আর কোন মেয়ে অবনীশের জীবনের কামনা হয়ে

ওঠেনি, উঠবেও না।

সরযূর বাবা অনন্তবাবু বলেছেন, অবনীশের মনের রকম-সকম আমার পছন্দ হচ্ছে না। যখন অলকাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন করে ফেললেই তো হয়। জীবনের এরকম একটা ইচ্ছার কাজ এভাবে তিন বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখার কোন মানে হয় না।

না হয় তো স্পষ্ট করে বলে দিলেই পারে অবনীশ, এ বিয়ে হবে না। তাহলে দুঃখিত হবেন না অনন্তবাবু, সরযূদের বাড়ির একটিও মানুষের প্রাণ ব্যথিত বা দুঃখিত হবে না। কারণ এ-বাড়িতে কেউই ঠিক অন্তর থেকে কোনদিনও অবনীশ ও অলকার এই ভালবাসার সম্পর্কটাকে পছন্দ করেনি, সমর্থনও করতে পারেনি।

অলকা একটি অসামান্যা মেয়ে নয়, আই-এ পরীক্ষায় ফেল করেছে, প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, আর ঘরে বসে আছে ; এমন মেয়ের অভাব পৃথিবীতে নেই। দেখতেও তো নিতান্ত একটি সাধারণ চেহারার মেয়ে ; আর গুণ বলতে যা আছে, সেটাও অসাধারণ রকমের কিছু নয়। কিছুদিন এক প্রাইমারী স্কুলের টিচার হয়ে চাকরি করেছিল। অলকার হাতের আঁকা কয়েকটা ছবি কলকাতায় বড়দিনের এগজিবিশিনে প্রাইজও পেয়েছিল। পাড়ার কোন সভায় উদ্বোধনের গান গাইতে হলে অলকাকেই ডাকাডাকি করে নিয়ে আসতে হয়। এসবও এমন বিরল কোন প্রতিভার কীর্তি নয়। সুলেখা, প্রতিমা আর উৎপলা আরও ভাল ছবি আঁকতে পারে, আরও ভাল গান গাইতে পারে, দেখতেও অলকার চেয়ে অনেক সুন্দর।

এই তিন মেয়ের সবারই সঙ্গে তো অবনীশের পরিচয় ছিল, আজও আছে। কিন্তু কই সেই পরিচয় তো ভালবাসার কোন সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি?

সরযূর মা বলেন, আমি কোন আপত্তিই করতাম না, যদি দেখতাম অবনীশ প্রতিমাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সরযূর ধারণা, সুলেখার সঙ্গে কাকা অবনীশের বিয়ে হলে ভাল হতো। আর অনন্তবাবুর ধারণা, সবচেয়ে ভাল হতো যদি উৎপলার সঙ্গে অবনীশের বিয়ে হতো।

অলকাকে কেন যে ঠিক মন থেকে পছন্দ হয় না, সেটা অবশ্য এ বাড়ির কেউ বুঝতে অথবা জানতে চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। অলকা একদিন চা খেতে এলো, সেদিনই অবনীশের সঙ্গে আলাপ হলো, আর সেদিনই অবনীশের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে চলে গেল ; শুধু এই সামান্য একটু চেষ্টার জোরেই অবনীশের মতো ছেলের মন জয় করে নিয়ে চলে গেল অলকা, ঘটনাটা প্রায় এইরকমের একটা বিস্ময়ের কাণ্ড বলে মনে হয়। সরযূর মা'র মনে আছে, ঠিক পরের দিনই দমদমে অলকাদের বাড়িতে গিয়েছিল অবনীশ। অলকার মতো মেয়ের জীবনে এটা যে প্রচণ্ড একটা জয়েরই গৌরব। কত সহজে বিজয়িনী হয়েছে দেবকীবাবুর এই মেয়ে, এই অলকা।

দেবকীবাবুর মতো মানুষকেও যে একটুকুও পছন্দ করে না-বাড়ির কোন মানুষ। অলকা কোন দিনও সরযূকে বাড়িতে চা খেতে ডাকতে পারেনি। কেন পারেনি, সেটা সরযূ ভাল করেই জানে। দেবকীবাবুর মতো কৃপণ স্বভাবের মানুষ খুব কমই আছে। আছে কিনা সন্দেহ! অলকা জানে, যদি বিনা আহ্বানেও কোনদিন অলকাদের বাড়িতে যায়, তবে সরযূকে এক পেয়ালা চা আর একটা সন্দেশও খাইয়ে বন্ধুত্বের একটা সামান্য ইচ্ছাকে সফল করতে পারবে না অলকা। এটা অনুমান নয় ; এটা চোখে দেখা একটা বাস্তব সত্য। একদিন উৎপলা আর সরযূ দুজনেই ইচ্ছে করে দমদমে অলকাদের বাড়িতে গিয়েছিল। দু'ঘণ্টা ধরে অনেক গল্প করেছিল। অলকার বাবা আর মা কাছে এসে উৎপলা আর সরযূর সঙ্গে হাসাহাসি করে অনেক গল্প করেছিলেন ; কিন্তু ওই পর্যন্ত। মুখ খুলে এমন একটা কথাও বলেননি যে, চা না খেয়ে চলে যেও না। নিজেদেরই মেয়ের দুটি বান্ধবী, যারা বিকেলবেলা বাগবাজার থেকে দমদম গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রইল, তাদের ওক পেয়ালা চা

খাওয়াবারও কোন আগ্রহ দেখা গেল না অলকার বাবা আর মা'র একটিও কথায় কিংবা একটিও আচরণে।

কিন্তু অলকাও তো মুখের কথায় একটা অনুরোধ করতে পারতো। তাও করেনি অলকা। শুধু অলকার মুখটা যেন দুঃসহ একটা লজ্জার বেদনা চাপতে গিয়ে করুণ হয়ে উঠেছিল। অলকার জন্যে একটু দুঃখ বোধ করতে হয়েছিল বটে, তবু মনে মনে অলকার এই অক্ষমতার চেহারাটাকে ক্ষমা করতে পারেনি উৎপলা আর সরযূ। বাপ-মার বাধ্য মেয়ে অলকা, কিন্তু বাপ-মার অভদ্রতার কাছেও এতটা বাধ্য না হলেই ভাল ছিল। না হয় একটু বিরক্তই হতেন অলকার বাবা আর মা, তবু চেষ্টা করা উচিত ছিল অলকার, যেন এক পেয়ালা চা না খেয়ে না চলে যায় ওরই পাঁচ বছরের চেনা-জানা দুটি বান্ধবী।

অনন্তবাবুর মনে এমন কোন স্পৃহা নেই যে, তাঁর ভাইয়ের বিয়েতে তিনি পাত্রীর বাপের ঘাড় মুচড়ে একগাদা দানসামগ্রী আর পণ আদায় করবেন। এমন ইচ্ছা থাকলে ক্ষিতীশবাবুর মেয়ের সঙ্গে অবনীশের বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। ক্ষিতীশবাবু শুধু বরপণ হিসাবে নগদ দশহাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন, তা ছাড়া দানসামগ্রীর বিপুল একটা ফর্দও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অনন্তবাবু কোন উৎসাহ বোধ করেননি। অবনীশ নিজেই ওর জীবনের সঙ্গিনী বেছে নিক, কোন আপত্তি নেই অনন্তবাবুর। তিনি খুশি হয়ে সেই মেয়েরই সঙ্গে অবনীশের বিয়ে দেবেন। এর মধ্যে টাকা আদায়ের কোন প্রশ্ন নেই। অলকার সঙ্গে বিয়ে হলেও যে কি ব্যাপার হবে সেটা অনুমান করতে পারেন অনন্তবাবু। বরযাত্রী হয়ে মেয়ের বাড়িতে যারা যাবে, তাদের হয়তো হোটেলে নিয়ে গিয়ে নিজেদেরই খরচে খাওয়াতে হবে। দেবকীবাবু কাউকে এক পেয়ালা চা দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন কিনা সন্দেহ।

তবু, অবনীশের যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন অলকার সঙ্গেই বিয়েটা হয়ে যাক। কোন আপত্তি নেই অনন্তবাবুর। কিন্তু কোন উৎফুল্লতাও নেই, খুশিও নেই। দেবকীবাবুর মতো মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, এটা অনন্তবাবুর পক্ষে নিতান্তই একটা অকাম্য দুর্ঘটনা।

যাই হোক, তিনটি বছর তো পার হতে চললো। এবার অবনীশ বলে দিলেই তো পারে; তাহলে বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলতে পারেন অনন্তবাবু।

২

অলকার মনেও আজ একটা দারুণ বিস্ময়ের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, কি ভাবছে অবনীশ? ভালবেসেও কারও প্রাণ কি এত অলস হয়ে তিনটে বছর শুধু ভেবে ভেবে পার করে দিতে পারে?

একটুও মিথ্যে নয়, নিজের মনের কাছে তো আর মিথ্যে কৈফিয়ত দেওয়া যায় না! ভুলেও যায়নি অলকা, সেদিন সরযূর কাকাকে প্রথম চোখে দেখতেই বুকের ভিতরে নিশ্বাসের বাতাসটা হঠাৎ কেমন এলেমেলো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে-কথা তো চেঁচিয়ে পৃথিবীর কোন মানুষের কানের কাছে বলে দেয়নি অলকা। ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে ; জীবনে কত মানুষেরই সঙ্গে তো দেখা হয়েছে। কিন্তু একদিনের হঠাৎ দেখার অনুভবও কখনও এমন করে সারা শরীরটাকে লজ্জা পাইয়ে দেয়নি, মনের গোপনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছাও জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

কিন্তু অবনীশের কাছে তো কোন দাবি জানায়নি অলকা। অবনীশকে এমন আহ্বানও করেনি যে, একদিন আমাদের বাড়িতে যাবেন। অবনীশ নিজেই হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিল। আর অলকাও আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিল এ কেমন করে সম্ভব? অবনীশ কি অলকার স্বপ্নের ভিতরে লুকানো ইচ্ছাটাকে চোখে দেখে ফেলেছে?

আশ্চর্য হয়েও কিন্তু বিশ্বাস করবার সাহস হয়নি। খুবই সন্দেহ হয়েছিল ; খুবই ভয় পেতে হয়েছিল। কেন, কিসের জন্য আর কী দেখে মুগ্ধ হয়ে অলকার মতো মেয়ের কাছে মনের কথা বলতে এসেছে অবনীশ? এত সুন্দর এত ভাল রোজগারের চাকরি করে, আর সাজে-পোশাকেও এমন একজন শখের মানুষ। অলকার মতো মেয়ের কাছে তার মনেরও বা কি দাবি থাকতে পারে? খুবই ভয় হয়েছিল, অবনীশ হয়তো অলকাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাইবে। চেনাজানা জগতের কোন এক ভয়ানক অন্তরালে নিয়ে গিয়ে ভয়ানক একটা অনুরোধ করে বসবে। অলকার স্বপ্নটাই আর্তনাদ করে উঠবে ; আর দেখতে পাবে অলকা, একটা নির্মম কৌতুক অলকার কাছ থেকে শুধু দুদিনের তৃপ্তি পেতে চাইছে। মনে মনে একটা অপমানের ছবি কল্পনা করে সেদিন অলকার প্রাণটা সত্যিই শিউরে উঠেছিল।

কিন্তু এই ভুল ধারণার জন্যেও কী লজ্জাই না অলকাকে পেতে হয়েছে! কোনদিনও অলকাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়নি অবনীশ। কেউ দেখতে পায়নি, এই ঘরেরই ভিতরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপ করে বসে অলকাকে কেঁদে ফেলতে হয়েছে। অবনীশ যে-কথা বলেছে, তার চেয়ে সম্মানের কথা জীবনে কোন দিনও শুনতে পায়নি অলকা। বলেছিল অবনীশ—তোমার সঙ্গে যদি আর কারও বিয়ে হয়েও যায়, তবুও আমি তোমার উপর রাগ করতে পারবো না।

সত্যি রাগ করে জবাব দিয়েছিল অলকা।—হঠাৎ এরকম একটা সাংঘাতিক বাজে কথা বলে ফেলতে পারলে কেমন করে?

—একটুও বাজে কথা নয়। আমার রাগ হবেই না।

—কেন?

—তোমাকে সত্যি ভালবাসি বলে।

—কোন দুঃখও হবে না বোধহয়?

—সেটা আর তোমাকে বলে লাভ কি? বললেও তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না।

—তখন আমাকে ঘেন্না করতেও পারবে না?

—না।

—তবু নিজে একটা বিয়ে করতে পারবে তো?

—তোমার তাই মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি পারবো না।

—কিন্তু যা কখনও হবে না, তাই নিয়ে এত কল্পনাই বা করছো কেন?

হেসে ফেলেছে অবনীশ—কল্পনা করতে একটুও ভাল লাগে না।

—তবে এসব কথা তুলছো কেন?

—না, আর তুলবো না।—তা হলে এবার দাদাকে স্পষ্ট করে বলে দিই, কেমন?

—কি বলবে?

—বলবো অলকাকে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখা ভাল দেখায় না।

অবনীশের এই প্রতিশ্রুতির কথাও তো প্রায় দুবছর আগের কথা। তারপর আরও একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এতদিনের মধ্যেও অবনীশ তার দাদার কাছে কথাটা স্পষ্ট করে বলে দিতে পারেনি। এমন ধৈর্য কি করে সম্ভব হয়?

তাই তো আজ হঠাৎ এক-একবার অলকার ভাবনার এক কোণে ভয়ানক নির্মম একটা কৌতুকের ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে অলকার মন। অবনীশ কি একটা হেঁয়ালি? ওর ভালবাসার ভাষাকেও যে সত্যিই হেঁয়ালি বলে মনে হয়। অলকার সঙ্গে আর কারও বিয়ে হবে, এমন একটা অসম্ভব ঘটনাকে কল্পনা করে কী আনন্দ পায় অবনীশ?

কিন্তু অবনীশকে সন্দেহ করবারও সাধ্যি নেই। সন্দেহ করবার মতো কিছুই যে হয়নি! অবনীশের অফিসের ঠিকানাতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটি চিঠি লিখতে হয়। অবনীশের চিঠি

প্রতি সপ্তাহে আসে। অলকার চিঠিগুলি যেমন নিশ্চিন্ত ভালবাসার একটা অপেক্ষার আনন্দ, তেমনি অবনীশের চিঠিগুলিও ভালবাসার অটুট প্রতিশ্রুতি! লিখেছে, অবনীশ, আমি ইচ্ছে করে অনায়াসে মরে যেতে পারি, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, অসম্ভব। আমি তোমাকে কোনদিন অপমান করতে পারবো না।

যেদিন অলকাদের বাড়িতে আসে অবনীশ, সেদিন চলে যাবার আগের মুহূর্তে অলকার মুখের দিকে নিবিড় আগ্রহের একটি দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে একটি কথা খুব মৃদুস্বরে, যেন চিরক্ষণের স্বপ্নে ধরে রাখা একটি অঙ্গীকারের সুরে বলে দিয়ে যেতে ভুলে যায় না অবনীশ— সামান্য একটা অসুবিধে আছে, সেই জন্যেই দেরি হচ্ছে অলকা। তুমি কিছু মনে করো না।

অলকার মন বলে, হোক দেরি, এমন দেরি অনন্তকাল ধরে চললেও ক্ষতি নেই, যদি তুমি এভাবে এসে আর এই কথা বলে অলকার ভালবাসার মনটাকে সুখী করে আর ধন্য করে দিয়ে চলে যাও।

কী অসুবিধে আছে, সেটা অবশ্য জিজ্ঞাসা করে জানবার জন্যে কোনদিন জেদ করেনি অলকা। বিশ্বাসও করেছে, নিশ্চয় কোন অসুবিধে আছে। অবনীশ যে জানে, অলকার কাছে মিথ্যে কথা বলবার দরকার নেই। অলকা যে কতবার বলেই দিয়েছে, তোমার জীবনের কোন অসুবিধে, কোন ক্ষতি, কোন দুশ্চিন্তা ঘটাতে আমি চাই না। সেজন্যে যদি আমাকে চিরকুমারী হয়ে থাকতে হয়, আমি তাতেও রাজি আছি। আমাকে বিয়ে করো না, তবু তুমি সুখী হও।

তবু জানতে ইচ্ছে করে, সত্যি কি অসুবিধে আছে? একটা অসুবিধের কথা জানাই আছে, কেউ চায় না অবনীশের সঙ্গে অলকার বিয়ে হোক। অবনীশ আর অলকার ভালবাসার উপর যেন এই পৃথিবীর কারও কোন আশীর্বাদ নেই, কোন মায়া নেই, সমাদর নেই। সরযূর বাবা, সরযূর মা আর সরযূ, কেউ খুশি নয়। আরও অনেকের মনের খবর কিছু না কিছু পেয়েই গিয়েছে অলকা, তারাও কেউ খুশি নয়। প্রতিবেশী কান্তিবাবু আর ভবতোষবাবু, যাঁরা অলকার বাবার বন্ধু, তাঁরা খুশি নন। তাঁদের ধারণা, তিন বছর ধরে দেবকীবাবুর মেয়ে একটা ছলনার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক বাধিয়ে বসে আছে।

হাওড়া থেকে অলকার মামা এসেছিলেন। তিনিও যে কথা বলেছেন, সে কথা বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছে অলকা। দেবকীবাবুর কাছে একেবারে গলা খুলে চেঁচিয়ে কথা বলেছেন মামা—মিথ্যে, মিথ্যে, একেবারে বাজে ব্যাপার। অবনীশকে আমি চিনি, বেশ ভাল ছেলে, কিন্তু তিন বছর ধরে শুধু অপেক্ষা করবার অর্থ এই যে, বিয়ে করতে সে রাজি নয়।

দেবকীবাবু খুবই গম্ভীর হয়ে আর বেশ কঠোরস্বরে কথা বলে মামার সন্দেহকে সমর্থন করেন—আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছি। কিন্তু আসল দোষ হলো অলকার। মূর্খ মেয়ে নিজেরই বুদ্ধির ভুলে একটা ব্লাফকে বিশ্বাস করে বসে আছে।

অলকার বুক কেঁপে ওঠে। চোখের সামনের সব কিছুই ঝাপসা হয়ে যায়। সত্যিই কি বুদ্ধির ভুল? অবনীশ একটা বঞ্চনা?

৩

দেবকীবাবু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাঁর মেয়ে ভুল করে জীবনের একটা অপমানের আঘাতের সঙ্গে ভালবাসার কাণ্ড করে বসে আছে। অবনীশের মতো ছেলে কেন যে অলকাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল, এ প্রশ্নের কোন জবাব তিনি অনেক চিন্তা করেও খুঁজে পাননি।

অবনীশের দাদা অনন্তবাবু উকিল মানুষ। কিন্তু তেমন কিছু রোজেগেরে উকিল নন। সংসার চালিয়ে যাবার মতো রোজগার আছে, এই মাত্র। বরং আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি! আর

বাগবাজারের যে বাড়িতে থাকেন অনন্তবাবু, সেটাও ভাড়া বাড়ি। তা ছাড়া নিজেরই মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাকি আছে। সুতরাং, অনন্তবাবুকেও সন্দেহ না করে পারেন না অলকার বাবা, সে ভদ্রলোক কি ভাইয়ের বিয়েতে কিছু টাকা আদায় করবার স্বপ্ন ছেড়ে দিতে পারেন?

অবনীশ একটি কারখানার ক্যাশ বিভাগের হেড। মাইনে মন্দ নয়। সাত বছরের চাকরিতে চারশো টাকা মাইনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অনন্তবাবু ও তাঁর এই ভাই, আর বাড়ির মেয়েরাও যে স্টাইলে থাকেন, সেটা দেখে মনে হবে, যেন মস্ত বড় এস্টেট আছে এঁদের। পয়সাতে বড়মানুষ নয়, কিন্তু বড়মানুষী চাল-চলন। এঁরা ফাঁকা মানুষ, শূন্য মানুষ। উপরে রঙ, ভিতরে ঘুণ।

অনন্তবাবুর সঙ্গে দেবকীবাবুর দূর সম্পর্কের কুটুম্বিতাও আছে। কাজেই অবনীশ দেবকীবাবুর কাছে একেবারে অচেনা-অজানা জগতের কোন মানুষ নয়। কিন্তু অবনীশের চাল-চলন দেখে অবনীশকে অচেনা-অজানা জগতের মানুষ বলে মনে না করে পারবেন কেন দেবকীবাবু? দু'হাতে যথেষ্ট পয়সা খরচ করা, তার মানে অপব্যয়ের ছন্নছাড়া আনন্দে ভরা একটা শখের জীবন। জানেন দেবকীবাবু, ট্যাক্সি ছাড়া এক-পা হাঁটে না অবনীশ. বছরে একবার শিলঙ-আলমোড়া বেড়াতে যাবেই অবনীশ। অবনীশ যখন দেবকীবাবুর এই বাড়ির বারান্দাতে বসে অলকার মার সঙ্গে গল্প করে, তখন অবনীশের জামা-কাপড়ের সুগন্ধ সারা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক বছরের মধ্যে চার রকমের ঘড়ি অবনীশের হাতে দেখতে পেয়েছে দেবকীবাবু।

দেখতে ভাল লাগেনি ; অবনীশকে নিতান্ত লঘু স্বভাবের একটি ছেলে সন্দেহ হয়েছে দেবকীবাবু। দেবকীবাবুর সাবধানী মন বিশ্বাসও করতে পারেনি যে, এ ধরনের ফ্যাশনবিলাসী ছেলের মনের কোন ইচ্ছের মধ্যে কোন বলিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা থাকতে পারে। অলকার মা অবশ্য মাঝে মাঝে বলেন, না, অবনীশের মনটা খাঁটি ; চালচলনে বিলাসিতা যতই থাকুক না কেন, অলকার জন্যেই অপেক্ষা করছে অবনীশ। তা না হলে, এতদিনে ক্ষিতীশবাবুর মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যেত।

কিন্তু দেবকীবাবুর পক্ষে বিশ্বাস করতে অসুবিধা আছে। তাঁর মনের সবচেয়ে বড় অভিযোগের প্রশ্ন এই যে, তবে এই তিন বছরের মধ্যে একদিনও আমার কাছে এসে একথা বলতে পারলো না কেন অবনীশ, অলকাকে সে বিয়ে করতে চায়, আর বিয়েটা হয়েই যাক?

দেবকীবাবু বেশ একটু অপমানিত বোধও করেছেন। এর জন্য অবনীশের বিরুদ্ধে তাঁর যতখানি অভিযোগ, তার চেয়ে বেশি অভিযোগ নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে।

তিন বছর আগে অলকার বিয়ের সব আয়োজন করে ফেলেছিলেন দেবকীবাবু। সে ছেলেও দেবকীবাবুর এক কুটুম্বের ছেলে। দেখতে শুনতে অবনীশের মতো একটা সুন্দরতা আর চমৎকার ফ্যাশন না হলেও হালিসহরের মঙ্গলবাবুর ছেলে সলিল একজন কৃতী ও গুণী ছেলে। মঙ্গলবাবুর কারবারের একমাসের রোজগার অনন্তবাবু আর অবনীশের এক বছরের রোজগারের সমান। সলিলের শুধু একটু বয়স হয়েছে, চল্লিশ বছর। বিয়ে হয়েছিল সলিলের ; বিয়ের তিনমাস পরেই স্ত্রী মারা গিয়েছে। এছাড়া সলিলের জীবনের আর কোন খুঁত আছে কি? অলকার মতো মেয়ের পক্ষে সলিলকে কোনদিনই অকাম্য মনে করবার যুক্তি নেই।

হালিসহরের মঙ্গলবাবু তাঁর ছেলের বিয়েতে একটি পয়সাও দাবি করবেন না, করেনও নি। তিনি দেবকীবাবুর মেয়ে অলকার সঙ্গে তাঁর ছেলে সলিলের বিয়ে দিতে খুবই আগ্রহ দেখিয়েছেন ; কারণ অলকাকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

কিন্তু অলকা কিছুই বুঝতে রাজি নয়। হালিসহরের মঙ্গলবাবুর মতো সজ্জন মানুষের একটা শুভ সদিচ্ছার আহ্বান অলকাকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। মঙ্গলবাবু নিজেও একদিন এসে অলকার কাছে হেসে হেসে তাঁর ইচ্ছের কথাটা বলে ফেলেছিলেন--তোমার মতো মেয়ে আমাদের আপন-জন হলে আমরা খুবই খুশিই হব অলকা।

দেবকীবাবু জানেন, এই মেয়ে ওর বাবার ইচ্ছারও কোন সম্মান দিতে রাজি নয়। মার

কাছে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, ওখানে বিয়ে হতে পারে না।

দেবকীবাবুর এই বাড়িও ভাড়া বাড়ি। জীবনের চল্লিশটি বছর পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করে পার করেছেন। হ্যাঁ, গায়ের রক্ত জল-করা কিছু টাকাও জমিয়েছেন। চারটে পয়সা খরচ করতে তাঁর বুক টনটন করে, এটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু অলকা কি মনে করে বিনা খরচে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন বলেই হালিসহরের মঙ্গলবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে তিনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন?

মঙ্গলবাবুর ছেলে সলিলের এখনও বিয়ে হয়নি। এখনও অলকা যদি রাজি হয়, তবে দশদিনের মধ্যে সলিলের সঙ্গে অলকার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। এই সেদিনও মঙ্গলবাবুর চিঠি পেয়েছেন দেবকীবাবু ; কি খবর দেবকীবাবু? আমরা কি আরও অপেক্ষা করবো?

দেবকীবাবু জানেন অলকার ভুল একদিন নিজেই ভয় পেয়ে চমকে উঠবে আর ভেঙে যাবে। কিন্তু ততোদিন কি অপেক্ষায় থাকবেন মঙ্গলবাবু?

বুঝতে আর কোন কি অসুবিধে আছে, অবনীশ কেন আজও নীরব হয়ে রয়েছে? অনন্তবাবু নীরব কেন? ওরা কি মনে করেছে যে, এভাবে অলকাকে ধৈর্যহারা করে দিলে শেষে অলকার বাবা দেবকীবাবু বাধ্য হয়ে থলেভরা বরপণের টাকা আর দানসামগ্রীর বিরাট ফর্দ নিয়ে অনন্তবাবুকে সাধাসাধি করবেন? দেবকীবাবু যে পাগল হয়ে গেলেও হাজার দশ-বারো টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেবেন না ; এই কঠিন সত্যটা অনন্তবাবু আর অবনীশের জানা উচিত ছিল।

অলকার মা'র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেবকীবাবু তাঁর প্রতিজ্ঞার অটলতার কথা আজও একবার বলে দিলেন।—অসম্ভব, অবনীশের মনে কিংবা ওর দাদার মনে যদি এরকমের কোন মতলব থেকে থাকে, তবে ওরা পশ্চিমদিকে সূর্য উঠবে বলে আশা করছে।

অলকার মা বেশ ভয়ে ভয়ে একটা যুক্তির কথা তুলতে চান—কিন্তু যেখানেই মেয়ের বিয়ে দাও না কেন, কিছু টাকা খরচ করতেই তো হবে।

—না, পারবো না। এখানে তো আরও পারবো না!

—তার মানে?

মঙ্গলবাবু যদি কিছু বরপণ দাবি করতেন, তবু তার একটা মানে হতো। হয়তো আমি রাজিও হতাম। কিন্তু এখানে রাজি হতে পারি না। এরা কপটতা করবে, ভালবাসার নাম করে একটা চক্রান্ত করবে, সে ফাঁদে পা দিতে আমি রাজি নই। তার চেয়ে ভাল, মেয়ের বিয়েই হবে না।

পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এঘরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠেছে অলকা। দেবকীবাবুর গলার ভয়ানক রুষ্ট স্বরের শব্দ শুনতে পেয়েছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে অলকা।

চেঁচিয়ে উঠলেন দেবকীবাবু।—ছিঃ, এর নাম ভালবাসা? তবে জোচ্চুরি আর কাকে বলে? তিন বছর ধরে মেয়েটাকে আশা দিয়ে দিয়ে হয়রান করেছে একটা চালাক ফাঁকি।

অলকার মা—আস্তে কথা বলো, অলকা শুনতে পাবে।

দেবকীবাবু—আমি যে কৃপণ, সে-কথা কে না জানে? কিন্তু সেজন্যে কি আমি মেয়ের বাপও নই? অবনীশ যে কাণ্ড করেছে, সেটা আমার পক্ষে যে কত অপমানের কথা,সেটুকু বোঝবার মতো মনুষ্যত্ব অবনীশের নেই।

দরজার আড়াল থেকে দেখতে পেয়েছে অলকা, দেবকীবাবুর চোখ দুটো ছলছল করছে।

অলকার চোখ ভিজে যায়। সারা শরীরটা ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে বলে দিতে ইচ্ছে করে—তুমি অবনীশের উপর রাগ করো না। ওর কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। আমাকে যত খুশি ঘেন্না করো, সে বেচারাকে ঘেন্না করো না।

চলে যায় অলকা। আর বাইরের ঘরে ঢুকেই দেখতে পায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে অবনীশ।

অলকার মনে আজ একটা প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত হয়েছে। চরম মীমাংসা হয়ে যাওয়াই ভাল। ভালবাসার নামে এমন ভয়ানক একটা গ্লানির উৎখাত সৃষ্টি করে রাখবার আর কোন মানে হয় না।

পৃথিবীর মুখে যত শক্ত কথা আছে, সবই মুখর হয়ে অলকাকে যত খুশি গাল-মন্দ করুক, চুপ করে সহ্য করতে পারবে অলকা। কিন্তু অবনীশকে যেন এমন অভিশাপ স্পর্শ করতে না পারে। অবনীশ একটা ফাঁকি, এই ধিক্কার যেন আর কানে শুনতে না হয়।

অলকা বলে—যদি রাগ না করো, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি!

অবনীশ হাসে—তোমার ওপর রাগ করতে পেরেছি কি কোনদিন?

অলকা—কবে বিয়ে হবে?

অবনীশের দুই চোখ সেই মুহূর্তে যেন সাদা হয়ে যায়।—আমিই নিজেই আজ একথা তুলতাম। সেজন্যই আজ এসেছি।

অলকা—বলো।

অবনীশ—বিয়ে হবে না।

—কেন?

—অসুবিধে আছে।

—কিসের অসুবিধে?

—তোমার না জানাই ভাল।

—না, জানতে হবে।

—আমি না বললেও দু'চার দিনের মধ্যে জানতে পারবে।

—তার মানে?

—তার মানে, আমি গ্রেপ্তার হব। আর জেলও হয়ে যাবে।

—কে বললে?

—আমি বলছি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি অফিসের প্রায় দশ হাজার টাকা নিজের দরকারে খরচ করে বসেছি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে অলকা।—তুমি একাজ করতে পারলে?

—আমার হাতেই তো সব হিসেব ; তাই কেউ জানতে পারেনি। প্রত্যেক বছর অনেক চেষ্টায় ধার-কর্জ করে দশ হাজার টাকার ঘাটতি পুরিয়ে হিসেব ঠিক করেছি। কিন্তু এবারে আর পারলাম না। আর পারবোও না। আর চেষ্টা করবার সময়ও নেই। কালই আমার সব হিসেবের খাতা অডিট হবে। অডিটার এসে সবার আগে ব্যাঙ্কের বই দেখবেন।

—তারপর কি হবে?

—আগেই তো বলেছি। গ্রেপ্তার হব আর জেল হবে।

—এই জন্যেই কি এতদিন...।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করো অলকা। এই জন্যেই এতদিন বিয়ের কথা বলতে পারিনি। বিশ্বাস ছিল, দেশের জমি বিক্রী করে হাজার পনেরো টাকা একসঙ্গে পেয়ে যাব আর হিসেবও ঠিক করে ফেলতে পারবো। কিন্তু দেশের জ্ঞাতিরা আপত্তি করে আর মামলা বাধিয়ে জমি বেচতে দিলো না। কাজেও আর কোন উপায় নেই।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় অবনীশ। তারপরেই চোখ ঢাকতে চেষ্টা করে। চোখ দুটোও যেন ভিজে রক্তমাখা হয়ে গিয়েছে।—তোমার কাছে ক্ষমা চাই অলকা। তোমার বাবা আর মা যেন ক্ষমা করেন।

অলকা—কেমন করে ক্ষমা করবে বলো?

অবনীশ—তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি।

অলকা—এখন আমি কি করবো?

অবনীশ—আমার অনুরোধ শুনবে?

অলকা—বলো।

অবনীশ—তুমি তোমার বাবার কথা মেনে নাও।

অলকা—তার মানে, মঙ্গলবাবুর ছেলেকে বিয়ে করবো?

অবনীশ—হ্যাঁ।

অলকা—কেন? যদি আরও অপেক্ষা করি?

অবনীশ—না। আমাকে আর বিশ্বাস করো না।

অলকা—ঠিক কথা, তোমার সবই অবিশ্বাস্য। তোমার ভালবাসাও একটি মিথ্যে।

অবনীশ—আমার আর কিছু বলবার নেই। বলবার মুখও নেই।

অলকা—আমারও আর কিছু বলবার নেই।

চলে গেল অবনীশ।

কিন্তু দেখতে পেলেন দেবকীবাবু, চালাক-ফাঁকি অবনীশ কেমন যেন ভয় পেয়ে আর একেবারে উপোসী ভিখারীর মতো একটা শুকনো করুণ মুখ নিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে। ট্যাক্সি নেই, অবনীশের পায়ে জরিদার নাগরাও নেই। পায়ে ধুলো-মাখা আর ছেঁড়া-ছেঁড়া চেহারার চটি, গায়ে একটা আধময়লা কামিজ ; অবনীশ যেন একটা কাঙালপনার আতঙ্কিত মূর্তি হয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই দেখতে পেলেন দেবকীবাবু, টেবিলের উপর মাথা ঠেকিয়ে দিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অলকা।

—অলকা! ডাক দিলেন দেবকীবাবু। তাঁর দু'চোখে নিদারুণ সন্দেহের ছায়া।

অলকা কথা বলে না। চেঁচিয়ে ওঠেন দেবকীবাবু—অবনীশ কেন এসেছিল? কী বলে গেল? ওভাবে চোরের মতো ছুটে পালিয়ে গেল কেন অবনীশ?

অলকা—বিয়ে হবে না।

দেবকীবাবু—এটা তো জানা কথা। কিন্তু কেন হবে না?

অলকা—ওর জেল হবে।

—কে বললে?

—নিজেই বললে।

—কি করেছে, যে জন্যে জেল হবে?

—অফিসের ক্যাশ খরচ করে ফেলেছে! কাল অডিট হবে।

—বেশ তো, আজই টাকা গিয়ে হিসেব ঠিক করে ফেলুক।

—টাকা নেই।

—ধার করুক।

—চেষ্টা করেছিল, ধার পায়নি।

—তা হলে জেলে যাক!

—হ্যাঁ।

—সে কথা তোমাকে জানাবার কি দরকার ছিল?

—জানি না।

—আর কি বলেছে?

উত্তর দেয় না অলকা। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন দেবকীবাবু—তোমার লজ্জা করবার কোন মানে হয় না।

অলকা—বলেছে—

—কি?

—ক্ষমা চেয়েছে।

—কার কাছে?

—আমার কাছে—তোমাদের সবারই কাছে।

—আর কি বলেছে?

উত্তর দেয় না অলকা, দেবকীবাবুর দুই চোখের তারা জ্বলতে শুরু করেছে। দেবকীবাবুর গলার স্বরও এইবার তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে।—কি বলেছে বলো?

অলকা—অনুরোধ করেছে।

—কিসের অনুরোধ?

—তোমার ইচ্ছে মেনে নিতে।

—তার মানে?

—বিয়ে করতে।

—কার সঙ্গে বিয়ে?

—হালিসহরের...।

—তুমি কি বলতে চাও, তোমারও তাই ইচ্ছে?

—হ্যাঁ।

চমকে ওঠেন দেবকীবাবু। অলকার কাছে এগিয়ে এসে, আর অলকারই মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন।—মন থেকে একথা বলছো?

—হ্যাঁ।

—মিথ্যে কথা। তুমি আমাকে ভয় করে আর নিজেকে ঘেন্না করে একথা বলছো। কিন্তু সবচেয়ে ভুল করবে যদি...।

দেবকীবাবুর চোখ দুটোর চেহারাও হঠাৎ অদ্ভুত হয়ে যায়।—খুব ভুল হবে যদি এমন ধারণা করো যে অবনীশ একটা ফাঁকি।

চমকে উঠে দেবকীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অলকা।

দেবকীবাবু বলেন—অবনীশ বেচারার মনে কোন ফাঁকি নেই। সাবধান, যাই করো, অবনীশকে ভুল বুঝবে না। অবনীশকে ঘেন্না করবে না।

ভিতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দেন দেবকীবাবু—শুনছো?

অলকার মা ব্যস্তভাবে ছুটে আসতেই দেবকীবাবু হেসে ফেলেন—আমার চেক বইটা দাও।

—কেন?

—এখনই একবার বের হতে হবে।

—কোথায় যাবে?

—পাগলা অবনীশকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কেন?

—হাতে হাতে বরপণ ধরিয়ে দিয়ে আসি। তা না হলে তোমার মেয়ে অলকা যে ভাবতেই লজ্জা করবে, ওর বাবাটা কি সাংঘাতিক কিপটে।

—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

—তবে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। এখন তাড়াতাড়ি চেক বইটা এনে দাও।

সুনীতিবালা বলেন—হোক অপমান, তবু আমি যাব।

বিপিনবাবু বলেন—না সুনীতি, তুমি একটু বুঝে দেখ।

সুনীতিবালা—না, চিরটা কাল অনেক বুঝেছি। আজ একটু অবুঝপনা করতে দাও।

বিপিনবাবু—এত জেদ করা তোমার একটু অন্যায় হয়ে যাচ্ছে সুনীতি। আবার বলছি, বুঝে দেখ।

সুনীতিবালা কেঁদে ফেলেন—জলজ্যান্ত বেঁচে থাকবো, অথচ নিজের চোখে মেয়ের বিয়েটা দেখবো না! এমন শাস্তি কি মানুষে সহ্য করতে পারে। তুমিই বুঝে দেখ।

বিপিনবাবু সান্ত্বনা দেন—বিয়ের সব গল্প আমার কাছেই শুনতে পাবে। আমি সব বলবো।

সুনীতিবালা—চোখ থাকতে, আর এত কাছে থাকতেও মেয়ের বিয়ে দেখবো না, তোমার কথা শুনে অন্ধ হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে।

বিপিনবাবু যেন আবেদন করেন—ওরকম করে বলো না সুনীতি। তোমার কষ্ট যে আমি বুঝতে পারছি না, তা নয়। কিন্তু উপায় নেই সুনীতি। তুমি ওখানে গেলে বিজয়া বড় বিশ্রী কাণ্ড করে বসবে। তোমার তো অপমান হবেই, আমারও অপমান হবে। দশজনের চোখের সামনে আমাকে অপ্রস্তুত না করে দিয়ে ছাড়বে না বিজয়া। বিজয়ার মেজাজের কথা তো তোমার অজানা নয়।

ক্ষুণ্ণ হন সুনীতিবালা—সবই বুঝি, কিন্তু ছাই মনটা যে বোঝে না। মিণ্টুর বিয়েটা দেখবো বলে যে আমি বড় আশা করেছিলাম গো।

ফুঁপিয়ে উঠেছেন যিনি, পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে যাঁর, হাতে শাঁখা-নোয়া আছে আর সিঁথিতে সিঁদুরও আছে যাঁর, তিনি এই এটর্নি বিপিনবাবুর জীবনের পঁচিশ বছরের সঙ্গিনী, স্ত্রী নন। কোন শুভলগ্নে অগ্নি সাক্ষী করে শঙ্খরব আর উলু-উলু-উলু কলরবের মধ্যে দুজনের জীবনের বন্ধন স্বীকৃতি হয়নি। পঁচিশ বছর আগে ঠিক স্বামী-স্ত্রী হয়ে নয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো একটা সম্পর্কের বন্ধন আহ্বান করে এই দুই মানুষের যে অধ্যায় শুরু হয়েছিল, সে জীবনকে আইনমত বিবাহিত জীবন বলা যায় না।

কিন্তু এটর্নি বিপিনবাবুর আইনসম্মত ঘর-সংসারও আছে। স্ত্রী আছেন, ছেলেমেয়ে আছে এবং মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে, সেই মিণ্টুরই আজ বিয়ে।

সুনীতিবালা আজ স্মরণ করতে পারেন, একটি পাঁচ বছর বয়সের মেয়ের কচি মুখের ছবিটা। তখন এক-একদিন মিণ্টুকে সঙ্গে নিয়েই বিপিনবাবু তাঁর এই অবৈধ সংসারের বাড়িতে আসতেন। এই সুনীতিবালাও মিণ্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কত গল্প করতেন। নিজের হাতে সন্দেশ ভেঙে মিণ্টুকে খাওয়াতেন। পাঁচ বছর বয়সের মিণ্টুর কপালে কুমকুমের ছোট টিপ পরিয়ে দিয়ে হাসতেন। মাঝে মাঝে রাগও করতেন।—কি আশ্চর্য, মেয়েটার চোখে একটু কাজল এঁকে দিতেও পারেনি কেউ? মেয়ের মা কি এতই ব্যস্ত কাজের মানুষ?

কাজলদানি তুলে নিয়ে এসে মিণ্টুর চোখে কাজল পরিয়ে দিয়ে তারপর আবার হেসে উঠতেন সুনীতিবালা।

সেই মিণ্টুর বয়স এখন বাইশ বছর হয়েছে। হিসেব করে দেখেছেন সুনীতিবালা। কিন্তু, গত সতের বছরের মধ্যে আর একটি দিনও এখানে আসেনি মিণ্টু। কারণ, বিপিনবাবু নিজেই মিণ্টুকে আর এখানে আনেননি। কারণ মিণ্টুর মা বিজয়া এক দিন রাগ করে বিপিনবাবুকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়েছিলেন—দিব্যি রইল, আর কোনদিন মিণ্টুকে ঐ অমঙ্গলের কাছে নিয়ে যাবে না। কথা দাও।

কথা দিয়ে দিলেন বিপিনবাবু—বেশ। কথা দিলাম।

সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন সুনীতি। কিন্তু সমস্যাটা বুঝেছিলেন, যেটা বিপিনবাবুর জীবনেরই একটা সমস্যা। বিজয়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তুচ্ছ করে মিণ্টুকে এখানে নিয়ে আসবার সাহস বিপিনবাবুর নেই। এমন সাহস করতে হলে যে বিপিনবাবুর জীবনের সামাজিক সম্মানটাও ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

প্রতিবেশী গগনবাবু একদিন তাঁর স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন—মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষিতাটার বাড়িতে যান বিপিনবাবু, এটা খুবই খারাপ ব্যাপার হচ্ছে। বিপিনবাবুর কাণ্ডজ্ঞান বোধহয় একটু কম। এবং, গগনবাবুর স্ত্রী এসে একদিন বিজয়ার কানের কাছে খবরটা জানিয়ে যেতে দেরী করেননি। এবং তার পরেই সাবধান হয়ে গেলেন বিজয়া। এবং তার পর বিপিনবাবুর ঐ প্রতিজ্ঞা।

ঘটনার এই ইতিহাসও জানা আছে সুনীতিবালার। সতের বছর আগের সেই কান্না আজ আর তাঁর চোখে নেই, কিন্তু মনে বোধহয় আছে। তা না হলে আজও বিপিনবাবুর কাছে বারবার এমন কথা বলবেন কেন, মিণ্টুটা এখন দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে বোধহয়?

বিপিনবাবুর সব ছেলেমেয়ের ফটো এখানেও আছে। সুনীতিবালার ঘরের টেবিলের উপর ফটোগুলি সাজানো আছে। শুধু নেই বিপিনবাবুর স্ত্রী বিজয়ার ফটো। বিপিনবাবু নিজে ইচ্ছে করেই বিজয়ার ফটো এখানে আনেননি, আর সুনীতিবালাও বোধহয় ইচ্ছে করেই কোনদিন বিজয়ার ফটো এখানে এনে রাখতে বিপিনবাবুকে অনুরোধ করেননি।

সুনীতিবালা নিঃসন্তান। কিন্তু আজ তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হবে যে, যেন এক ঘর ছেলেমেয়ে তাঁর চোখের সামনেই আছে। ফটোগুলির দিকে যখন তাকিয়ে থাকেন, আর ফটোর ঐ ছোট ছোট মুখগুলির বয়সের হিসেব করেন সুনীতিবালা, তখন মনে হবে, যেন সত্যিই তাঁর সারা মন জুড়ে একটা ভাবনা ছটফট করছে। এখন কে কত বড়টি হল? মেজটা আজকাল পড়ায় মন দিয়েছে তো? ছোটটা আর বেশি রোগা হয়নি তো? এরকম প্রশ্ন সুনীতিবালার মুখে যখন-তখন মুখর হয়ে উঠছেই. সব প্রশ্ন শোনেন বিপিনবাবু এবং উত্তর দিতে গিয়ে অনেক কথা বলতে হয়, তবে সুনীতিবালার দুর্ভাবনা থামে।

সেই সুনীতিবালা আজ অবুঝ হয়ে উঠেছেন। আর, শুধু গল্প শুনে মন জুড়োতে চায় না, শুধু ফটো দেখে চোখ জুড়োতে চায় না। আজ মিণ্টুর বিয়ের উৎসবের কাজে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন সুনীতিবালা।

বিপিনবাবু বলেন—মেয়ে আর জামাইয়ের ফটো তোমাকে এনে দেবো। কাজেই...।

সুনীতিবালা রাগ করে ওঠেন—ফটোতে কী হবে?

বিপিনবাবু—ওখানে গেলে যা দেখবে ফটোতেও তাই দেখবে।

সুনীতিবালা—না।

বিপিনবাবু বিব্রতভাবে চুপ করে বসে চিন্তা করেন। কিন্তু সত্যিই যে কোন উপায় নেই। বিজয়া যে আজও সাবধান করে দিয়েছেন। কথায় কথায় আভাসে একটু জানাতে চেষ্টা করেছিলেন বিপিনবাবু, সুনীতির ইচ্ছার কথাটা একটু ঢেকে-ঢুকে বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিজয়া স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—সাবধান! শুভ কাজের দিনে ওসব অলুক্ষণে অমঙ্গল যেন এখানে না আসে!

পঁচিশ বছরের মধ্যে এই অলুক্ষণে অমঙ্গলকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেননি বিজয়া। হোক না পঞ্চাশ বছরের বুড়ি, কিন্তু ভুয়ো শাঁখা নোয়া আর সিঁদুর নিয়ে ভালমানুষটির মতো সেজে থাকা ঐ পাপ যদি এখানেও আসবার সাহস করে, তবে সকলের সামনেই দারোয়ানকে দিয়ে...।

দুটো জ্বলন্ত চক্ষুর অভিযোগ বিপিনবাবুর ভীরু মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিজয়া আজই শুনিয়ে দিয়েছেন—ওকে সকলের চোখের সামনেই দারোয়ানকে দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দূর

করে দেওয়া হবে।

সুনীতিবালা গুণগুণ করে কাঁদেন--তোমার পায়ে পড়ি। একটা উপায় কর।

বিপিনবাবুর চোখও ছলছল করে—তুমিই বল, কি উপায় করতে পারি! আমি তো ভেবে কিচ্ছু পাচ্ছি না।

সুনীতিবালা—বিয়ে বাড়িতে কত লোক আসবে, সবাইকে নিশ্চয় চেনে না বিজয়া, আমাকেও একজন নেমন্তন্নের মানুষ মনে করে...।

বিপিনবাবু হাসেন—মহিলারা যাঁরা আসবেন, অন্তত তাঁদের সবাইকে সে চেনে। তোমার মতো একজন অচেনা মানুষকে দেখলেই সন্দেহ করবে।

সুনীতিবালা—বিজয়াকে একটা মিথ্যা কথা বলতে পারবে?

বিপিনবাবু চমকে ওঠেন—কি মিথ্যা কথা?

সুনীতিবালা—বিজয়াকে বলে দিলেই তো পার যে, তোমার কোন নতুন বন্ধুর স্ত্রীকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছ।

মাথা ভরা সাদা চুলের উপর অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে তারপর জোরে একটা শ্বাস ছাড়েন বিপিনবাবু—আচ্ছা, তাই বলবো।

সুনীতিবালা—কি বলবে?

বিপিনবাবু—বলবো, কেশববাবুর স্ত্রী।...যেয়ো তুমি। রাত ন'টায় বিয়ে।

রাত এগারোটায়, মিণ্টুর বিয়ের মন্ত্র পড়া অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়ে গেল, আর বাসরঘরে চলে গেল বর-কনে, তখন বিদায় নিলেন কেশববাবুর স্ত্রী।

বিজয়া বললেন—আপনি এতক্ষণ এত কষ্ট করে রইলেন, কিন্তু একটা মিষ্টিও মুখে না দিয়ে চলে যাবেন, এ কি ভাল হয়?

সুনীতিবালা হাসেন—মেয়েজামাই-এর মুখ দেখে মন মিষ্টি হয়ে গিয়েছে, আবার কোন মিষ্টির দরকার?

বিজয়াও কৃতার্থভাবে বলেন—যখন পরিচয় হয়েই গেল, তখন আসবেন মাঝে মাঝে।

সুনীতিবালার মুখের হাসিটা যেন হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। কি যেন ভাবেন। তারপর আনমনার মতো বিড়বিড় করেন—আসতে তো ইচ্ছে করেই, কিন্তু...।

বিজয়া—কি বললেন?

সুনীতিবালা—হ্যাঁ...মেয়েজামাই যাবে কখন?

বিজয়া—কাল বিকালে যাবে। আসুন না একবার দয়া করে, মেয়ে বিদায় দেখে যাবেন।

সুনীতিবালা--আসবো।

বিজয়া আর একবার খুশির স্বরে অনুরোধ করেন।—অবিশ্যি আসবেন, আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

বিজয়ার এই খুশির স্বর আর একবার আরও খুশি হয়ে বেজে উঠল, পরের দিন বিকাল হতেই যখন দেখলেন, কেশববাবুর স্ত্রী এসেছেন।—আসুন। আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারিনি যে সত্যিই আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন।

কেশববাবুর স্ত্রীর কথা আর ব্যবহার, দুই-ই অদ্ভুত। সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন বিজয়া। কোন সন্দেহ নেই। কাল বিয়ের রাতে যতগুলি শাড়ি উপহার পেয়েছে মিণ্টু, তার মধ্যে সবচেয়ে দামী শাড়ি হলো এই বিষ্ণুপুরীটা, যেটা কেশববাবুর স্ত্রী দিয়েছেন। অন্তত দু'শো টাকা দাম হবে।

যেন কতকালের চেনাশোনা। মিণ্টুর ঘরের দরজার কাছে একঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মিণ্টুর সাজ দেখেছেন কেশববাবুর স্ত্রী! মিণ্টুকে কনের সাজে সাজাবার কাজে ব্যস্ত ছিল মালতী,

অর্চনা আর ইভা, তাদেরও বার বার উপদেশ দিয়েছেন।--আঁচলটা ওরকম শক্ত করে টেনে দিও না। কানের কাছে চুলটা একটু চেপে দাও।

মিণ্টুর চোখে কাজল পরানো যখন হয়ে গেল, তখন কেশববাবুর স্ত্রীর চোখে অদ্ভুত একটা আহ্লাদের হাসি উথলে উঠেছিল।

--দেখি মা, মুখটি এদিকে ফেরাও তো।

মিণ্টু লাজুকভাবে মুখ ফিরিয়ে কেশববাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতেই যেন আনন্দে ডুকরে উঠেছিলেন কেশববাবুর স্ত্রী--আহা!

ঠিক কথা, বিশ্বাস করেন বিজয়া, একটু বাড়িয়ে বলেননি কেশববাবুর স্ত্রী। মেয়ে-জামাই-এর মুখ দেখে তাঁর মনটাই মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। এমন মানুষ আবার মেয়ে-জামাই-এর মুখ দেখবার লোভে ছুটে আসবেন বৈকি! বিপিনবাবুর কাছেই কতবার বলেছেন বিজয়া, বিয়ে বাড়িতে কত লোক এল, কিন্তু কেশববাবুর স্ত্রীর মতো এমন সুন্দর মন আর ব্যবহার...সত্যি, ওঁকে নেমন্তন্ন না করলে খুবই অন্যায় হতো।

আর কিছুক্ষণ পরেই, বিকালের রোদ একটু নরম হয়ে আসতেই, বিপিনবাবুর এত বড় বাড়ির মুখরতাও যেন হঠাৎ নরম হয়ে গেল। আর বেশি সময় নেই। এইবার মেয়ে-বিদায়ের সেই বিষাদের লগ্নটি আসন্ন হয়ে উঠেছে।

উপরতলার ঘরে মিণ্টুর কান্না শোনা যায়। বার বার চোখ মোছেন বিজয়া। আর, কেশববাবুর স্ত্রী সান্ত্বনা দেন, আপনি এসময় এরকম উতলা হয়ে পড়বেন না, তাহলে মেয়েটা যে আরও কাঁদবে।

--ঠিকই বলেছেন। শান্তভাবে মেয়ে বিদায় দেবার জন্য তৈরী হন বিজয়া, যদিও চোখ ছলছল করে।

আর দেরী করবারও সময় নেই। গেটের কাছে তিনটে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর হর্ণ বাজাচ্ছে। বরযাত্রীরা গাড়িতে উঠেছে। শুধু সেই গাড়িটা খালি, যে গাড়িতে মেয়ে-জামাই যাবে।

পাড়ার মহিলারাও এসে পড়েছেন। উপরতলা থেকে নেমে এল মেয়ে-জামাই। মেয়ে-জামাই-এর সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ মুখের একটা ভিড়ও অনেকদূর এগিয়ে এসে বারান্দার উপর থামলো।

বিপিনবাবু চোখ মোছেন। আর বিজয়ার ছলছল চোখের করুণতা সহ্য করতে না পেরে মহিলারাও চোখ মোছেন।

সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করলেন কেশববাবুর স্ত্রী। হঠাৎ মিণ্টুর কাছে এগিয়ে এসে আর মিণ্টুর চিবুকে হাত দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কেশববাবুর স্ত্রীর দু'চোখ থেকে জলের ধারা যেন অঝোরে ঝরে পড়তে থাকে।

ওদিক থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে কাছে এগিয়ে আসেন মিণ্টুর শ্বশুর। কেশববাবুর স্ত্রীর কাছে কি যেন বলতে চান। কিন্তু কথা বলবার আগে ভদ্রলোক নিজেই একবার ফুঁপিয়ে উঠলেন। তারপর চোখ মুছে নিয়ে বললেন—বুঝি, সবই বুঝি, মেয়েকে ছেড়ে দিতে মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠবেই তো।

বুঝতে পারেন বিজয়া, মিণ্টুর শ্বশুর ভুল করে কেশববাবুর স্ত্রীকেই মেয়ের মা বলে মনে করেছেন। এগিয়ে যান বিজয়া, বোধহয় মিণ্টুর শ্বশুরের ভুল অনুমান শুধরে দিয়ে দুটো কথা বলতে চান।

কিন্তু কি আশ্চর্য, কেশববাবুর স্ত্রী যেন মিণ্টুর শ্বশুরের ভুল ধারণাটাকে একেবারে প্রাণ দিয়ে লুফে নিয়ে আরও জোরে ফুঁপিয়ে ওঠেন।—এটা যে অনেকেই বোঝে না, সেই জন্যেই তো ভয় হয়...।

মিণ্টুর শ্বশুর হাতজোড় করে আশ্বাস দেন--আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। আপনার মেয়ের কোন কষ্ট হবে না। যখন মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হবে তখনই লিখবেন, মেয়েকে তখনই পাঠিয়ে দেব।

কেশববাবুর স্ত্রী—সে সৌভাগ্য কি হবে? আর কি দেখতে পাব?

এ কেমন প্রলাপ বকছেন কেশববাবুর স্ত্রী? বিজয়ার চোখের বিস্ময় হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। দু'চোখের জ্বলন্ত সন্দেহ নিয়ে বিপিনবাবুর মুখের দিকে তাকান বিজয়া।

মিণ্টুর শ্বশুর আবার বিনীত স্বরে সান্ত্বনা দেন।--ছিঃ, আপনি বেশী উতলা হয়ে পড়েছেন। মেয়েকে আর দেখতে পাবেন না, এ কি একটা কথা হলো? যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই মেয়েকে দেখতে পাবেন। কোন চিন্তা করবেন না।

কেশববাবুর স্ত্রী বললেন—বেঁচে থাকলেও যে দেখতে পাওয়া যায় না।

বিপিনবাবুর মুখে একটা আতঙ্ক থমথম করে। ভীরু মাথাটা হেঁট করেন বিপিনবাবু। বিজয়ার দুই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিটা এইবার কেশববাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে যেন নীরব ধিক্কারের আগুনের মতো জ্বলতে থাকে।

দারোয়ান ডাকতে হবে। অলক্ষুণে অমঙ্গলকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হবে, সবই মনে আছে বিজয়ার।

কিন্তু বিজয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টিটাও যেন হঠাৎ ভীরু হয়ে যায়। মিণ্টুর শ্বশুরের ভুল শুধরে দিতে পারা যাবে কি? উনি মেয়ের মা নন, কথাটা কি চেঁচিয়ে বলে দিতে পারা যাবে?

মাথা হেঁট করে, যেন মেয়ে-বিদায়ের শেষ মাঙ্গলিক সেরে দেবার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে মিণ্টুর কাছে দাঁড়ালেন বিজয়া। তারপরেই মিণ্টুর কানের কাছে ফিসফিস করেন বিজয়া—কেশববাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করেছিস?

—না।

—প্রণাম কর।

মহানাদ

এই কলকাতা শহরে আজও এমন পাড়া আছে, যে পাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখ বাজে। প্রতি বৃহস্পতিবারে ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা হয়। শাঁখের শব্দে পাড়ার বাতাস যেন গম্ভীর হর্ষের একটা উৎসব জাগিয়ে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাটাকে যেমন মুখর তেমনই চঞ্চল করে তোলে। পাড়ার নাম দেউলপাড়া।

দেউলপাড়া লেন পার হলেই হাটখোলা। তারপর গঙ্গার ঘাটে পৌঁছতে কতক্ষণই বা সময় লাগে? দেউলপাড়ার ভিতর দিয়েই অন্য অনেক পাড়ার মানুষ গঙ্গায় স্নান করতে যায়। সকাল দুপুর সন্ধ্যা, এমন কি রাত্রিতেও দেখা যায়, ভেজা কাপড়ে চবচবে হয়ে নারী আর পুরুষের এক একটা মূর্তি এই দেউলপাড়া লেনের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে।

দেউলপাড়াতে একটা দেউল ছিল ঠিকই এবং সেই দেউলটার অন্তিমকালের কিছু কিছু ইট এখনও নবীন মিত্রের বাগানের এক কোণে পড়ে আছে দেখা যায়। নবীন মিত্র বলেন, দেউলপাড়ার এই মিত্তিররাই হলেন এই পাড়ার আদিমতম অধিবাসী। নবীন মিত্রের বাড়িটার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এবং বিশ্বাস করতেও কোন আপত্তি হয় না, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন নবীন মিত্র। এই বাড়ির চেয়ে পুরনো চেহারার কোন বাড়ি দেউলপাড়াতে আর নেই। বাড়িটা যেন একটা পুরনো ইতিহাসের স্মৃতি গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। নবীন মিত্রের বাড়ির ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলেই প্রথমে যে ঘরের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে হয়, সেই ঘর বৈঠকখানা

নয়। সেই ঘর হলো ঠাকুরঘর। রাস্তার উপর থেকেই নবীন মিত্রের বাড়ির এই ঠাকুরঘর দেখা যায়। এবং ঠাকুরঘরের দরজা খোলা থাকলে বিগ্রহকেও দেখা যায়।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি। মূর্তিটা বেশ বড়। শ্বেতপাথরের যে বেদীর উপর মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই বেদীও বেশ উঁচু। শ্বেতপাথরের বেদীর উপর চকচকে কালোপাথরের বিষ্ণুমূর্তি। দেখতে বেশ ভালই দেখায়।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুর চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। পাথরের চক্র, পাথরের গদা ও পাথরের পদ্ম। কিন্তু শঙ্খটা সত্যিই শঙ্খ। এরকম ধবধবে সাদা এবং এতবড় আকারের শঙ্খ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

এই কালোপাথরের বিষ্ণুমূর্তি কেমন করে আর কোথা থেকে পাঁচপুরুষ আগের এক অতি গরীব মিত্তিরের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে গল্প আজকের নবীন মিত্রও ভুলে যাননি। তাছাড়া, আরও একটা ঘটনার মহিমা এই বিষ্ণুমূর্তির ইতিহাসে আছে ; এই বিষ্ণুর হাতের ঐ প্রকাণ্ড শ্বেতশঙ্খ একদিন বেজে উঠেছিল।

কে বাজিয়েছিল? স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুই বাজিয়েছিলেন। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ ছিল। সন্ধ্যার আরতির পর বাইরে থেকে দরজার কড়ায় তালা বন্ধ করে পূজারী রোজই যেমন চলে যেতেন, সেই সন্ধ্যাতে তেমনই চলে গিয়েছিলেন। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়; আজকের প্রৌঢ় নবীন মিত্র সেদিন দশ বছর বয়সের ছেলেমানুষ ছিলেন। রাত্রিবেলা হঠাৎ বেজে উঠলো শঙ্খ, সে শঙ্খের স্বরও অদ্ভুত। আজও স্মরণ করতে পারেন নবীন মিত্র, কি অদ্ভুতরকমের একটা গম্ভীর শব্দের শিহর ছড়িয়ে দিয়ে সেই শঙ্খ বেজেছিল।

বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এবং আশ্চর্য হয়েছিল সবাই। কোথায় বাজছে এই শঙ্খ! কে বাজাচ্ছে? শব্দটা যে ঠাকুরঘরের ভিতর থেকেই বের হয়ে আসছে। ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজার উপর কান পেতে বাড়িসুদ্ধ মানুষ, এবং দশ বছর বয়সের নবীন মিত্রও শুনেছিল। এবং কোনই সন্দেহ ছিল না যে, বিষ্ণুমূর্তির হাতের ঐ শঙ্খই বাজছে।

দরজা বন্ধ, ঠাকুরঘরের ভিতরে কেউ নেই। সুতরাং বুঝতে পারা গিয়েছিল, এবং সকলেই বিশ্বাস করতে বাধ্য না হয়ে পারেনি, স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু ছাড়া আর কে বাজাবেন ঐ শঙ্খ? ঠাকুরঘরের দরজা খুলে দেখতেও পাওয়া গিয়েছিল, শঙ্খের মুখের উপর যে ফুলটা ছিল, সে ফুলটা নীচে পড়ে গিয়েছে। পড়ে যাবেই তো! ঠাকুর যে নিজেই শঙ্খটাকে নেড়েছেন, মুখের কাছে তুলেছেন আর ফুঁ দিয়েছেন।

পরের দিনই বিলেত থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল। প্রিভি কাউন্সিলের রায় বের হয়েছে। নবীন মিত্রের বাপ মাধব মিত্রের চরম আপীল সার্থক হয়েছে। মামলায় জয়ী হয়েছেন মাধব মিত্র। জ্ঞাতিভাই গোষ্ঠ মিত্র এই দেউলপাড়ার সম্পত্তি দাবি করে যে মামলা করেছিলেন, সে মামলায় হেরে গেলেন গোষ্ঠ মিত্র। দেউলপাড়ার সব জমি, সব বাগান, দুটি পুকুর, আর পুরনো বাড়ির সব অংশের উপর নবীন মিত্রের বাপ মাধব মিত্রের মালিকানা একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে গেল।

গোষ্ঠ মিত্রের এক বংশধর আজও আছেন। তিনি থাকেন ঐ হাটখোলার একটা গলিতে। খবরের কাগজের ঠোঙার একটা দোকান করেন। তাঁর ঠাকুর ঘরে বেশ বড় একটা শিবমূর্তি দেখা যায়।

নবীন মিত্রের পারিবারিক জীবনের একটা নিয়মও সেই থেকে চলে আসছে, পিতা মাধব মিত্রের জীবনের সেই জয়ের ঘটনার পর থেকে। শাঁখ বাজানো নিষেধ। বাড়ির মানুষ আর কখনো শাঁখ বাজাবে না। যে বাড়ির বিগ্রহ-দেবতা নিজেই শাঁখ বাজিয়ে বাড়ির সুখ শান্তি আর পুণ্য আহ্বান করেছেন সেই বাড়ির মানুষের পক্ষে নিজের হাতে শাঁখ তুলে ফুঁ দেবার আর দরকার হয় না। সে অধিকারও নেই। নিজেরা শাঁখ বাজালে যে ঠাকুরের কৃপাতেই

অবিশ্বাস করা হবে! বিশ্বাস করেন নবীন মিত্র, যেমন বিশ্বাস করতেন তাঁর বাবা মাধব মিত্র, যেদিন ঠাকুর এই বাড়ির জীবনে, এই দেউলপাড়ার জীবনে, আবার নতুন করে কোন সুখ শান্তি আর পুণ্য দিতে চাইবেন, সেদিন তিনি নিজেই শঙ্খ বাজাবেন। নবীন মিত্রের ঠাকুরঘরের শ্রীবিষ্ণুকে পূজারী চক্রবর্তী মশাই শুধু ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করে চলে যান। শাঁখ বাজান না।

আজ দেউলপাড়া লেনের দু'পাশে ছোটবড় এতগুলি বাড়িতে যারা থাকে, তারা নবীন মিত্রের জ্ঞাতি নয়। তারা হলো বাড়িওয়ালা নবীন মিত্রের এতগুলি ছোটবড় বাড়ির ভাড়াটিয়া বাসিন্দা। কিন্তু এইসব বাড়িতে শাঁখ বাজে। যে-কোন উৎসবের দিনে, যে-কোন পুণ্যক্ষণে শাঁখ বাজে। নবীন মিত্র মোটেই পছন্দ করেন না যে, দেউলপাড়ার কোন বাড়িতে শাঁখ বাজুক। তাঁর বিশ্বাস, চকচকে কালোপাথরের এই শ্রীবিষ্ণু শুধু তাঁরই গৃহবিগ্রহ নন, সমস্ত দেউলপাড়ার বিগ্রহ। এই বিগ্রহ যে দেউলপাড়ার সুখ শান্তি আর পুণ্য নিরাপদ করে রাখবার ভার নিয়ে, সেই শ্বেতশঙ্খ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ কথা পাড়ার এইসব বাড়ির মানুষগুলি অবিশ্বাস করে না। কিন্তু তারা নবীন মিত্রের সেই ইচ্ছা আর অনুরোধের মূল্যও বোঝে না। নিজেরাই শাঁখ বাজায়।

শুধু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতে নয়, বছরের আরও কতগুলি বিশেষ বিশেষ দিনে দেউলপাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখের শব্দ বেজে ওঠে। এবং নবীন মিত্রের মনটা কেন যেন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

দেখতে পান নবীন মিত্র, পাড়ার এ-বাড়ির আর সে-বাড়ির যত কাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়ে শাঁখ বাজায়। যেন একটা ছেলেমানুষী উৎসবের আনন্দে মত্ত হয়ে শাঁখ বাজায় ওরা। এটা না হলেই ভাল ছিল। বাড়ির বুড়োরা যদি একটু বিবেচনাশীল হতো, তবে বোধহয় শাঁখ বাজিয়ে এক-একটা শুভদিন আর পুণ্যলগ্নে এরকম ফষ্টি করতে ওরা ভয় পেত, সাবধানও হতো।

নবীন মিত্রের আর একটা বিশ্বাস—দেউলপাড়ার ঘরে ঘরে এভাবে শাঁখ বাজে বলেই বোধহয় বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর হাতের শঙ্খ নীরব হয়ে গিয়েছে। আর তো, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর হাতের ঐ শ্বেতশঙ্খ বেজে উঠলো না। নবীন মিত্র সন্দেহ করেন, পাড়ায় মানুষ শাঁখ বাজিয়ে ধর্ম আর উৎসবের পুণ্যের সঙ্গে চটুলতা করে বলেই শ্রীবিষ্ণুর কৃপা কুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তা না হলে এত দিনের মধ্যে অন্তত কয়েকবার, এবং পাড়ার এতগুলি দুঃখ আর আপদের ঘটনার মধ্যে অন্তত অনেকবার এই বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর হাতের শ্বেতশঙ্খ বেজে উঠতো, আর দেউলপাড়ার বিপদ কেটে যেতো।

স্বাধীনতা দিবস নামে একটা রাজনীতিক পুণ্যের দিবস দেশের মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে। গবর্ণমেণ্টও খুব ঘটা করে এই দিনটিকে মাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। পনেরই আগস্ট দেউলপাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে।

কিন্তু কি লাভ হলো? খুব চিন্তা করে আর হিসেব করে দেখেছেন নবীন মিত্র ; পাড়ার দু'চার জন প্রবীণের কাছেও বলেছেন, কি লাভ হলো? এই স্বাধীনতা কি সত্যিই স্বাধীনতা হলো? দেশের সরকারকে এত পস্তাতে হচ্ছে কেন? দেশের মানুষের দুর্গতি এত বেড়ে গেল কেন? স্বাধীনতা যে ব্যর্থ হয়ে গেল।

নবীন মিত্র তাঁর বিশ্বাসের কথাটাকে অন্যভাবে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন। আমার ধারণা, এবং আপনারা বেঁচে থাকলে দেখতেই পাবেন, দেশ সত্যিকারের স্বাধীন হবে যেদিন, সেদিন দেউলপাড়ার বিগ্রহ এই শ্রীবিষ্ণুর হাতের শঙ্খ বেজে উঠবেই উঠবে।

স্বাধীনতা হবার আগে, এক একটা স্বরাজী হাঙ্গামার দিনে এই দেউলপাড়ার মানুষ শাঁখ বাজিয়েছে। শাঁখ বাজিয়ে বিলাতী কাপড় পুড়িয়েছে। শাঁখ বাজিয়ে একজন নেতার শোভাযাত্রাকে সম্মান জানিয়েছে। এমন কি, সেই উনিশশো বিয়াল্লিশের কয়েকটা দিনে, যখন গুলি চালিয়ে মানুষ মারবার জন্য ইংরাজ সরকারের পুলিশ দেউলপাড়ার এই সরু পথের দিকে বন্দুক হাতে ছুটে এসেছে, তখন ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে উঠেছে আর হুঁশিয়ার হয়ে

গিয়েছে পাড়ার ছেলেরা।

নবীন মিত্র হিসাব করে দেখেছেন, বুঝেছেন এবং পাড়ার প্রবীণদের কাছে বলেছেন, কি লাভ হলো মশাই? এত শাঁখ বাজানো হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সবই ব্যর্থ হলো।

সেই বিলাতি কাপড় আবার পরতে হয়েছে। সেই নেতা ভদ্রলোক জেলে গিয়েছে আর অসুখে মরেছে। উনিশশো বিয়াল্লিশের হাঙ্গামার ছেলেগুলো আজ আর চাকরি পায় না। সব পরিণাম এইভাবে হিসেব করে বুঝিয়ে দিতে পারেন নবীন মিত্র।

দেউলপাড়াতে আরও একটা বিশেষ ঘটনার দিবসে শঙ্খধ্বনির উৎসব জাগে। জন্মক্ষণের অভিনন্দন। পাড়ার কোন বাড়িতে নবজাতক মানুষের প্রথম কান্নার স্বর বেজে উঠতেই পাড়ার যত ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের অন্তরাত্মা যেন একটা হঠাৎ উৎসবের আবেগে একেবারে হুল্লোড় করে জেগে ওঠে। এক-একটা শাঁখ হাতে নিয়ে সকলেই নবজাতকের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়, আর শাঁখ বাজায়। টেনে টেনে, থেমে থেমে, কাড়াকাড়ি করে সকলেই শাঁখ বাজিয়ে একটা আগন্তুক নতুন প্রাণের ধ্বনিকে অভ্যর্থনা করে। এই মাসেও দেউলপাড়াতে এইরকম চারটে দিবসে শাঁখ বাজানো হুল্লোড় হয়ে গিয়েছে। ভোলাবাবুর একটি মেয়ে হয়েছে। জিতুর একটা ভাই হয়েছে। প্রমথবাবুর মেয়ের যমজ ছেলে হয়েছে। আর, বিয়ের পর পনের বছরের মধ্যেও যে প্রতিমা-বউদির কোন সন্তান হয়নি, তাঁর একটি ছেলে হয়েছে।

এই ধরনের ঘটনার উপর মন্তব্য করতে নবীন মিত্র একটু অসুবিধায় পড়েন। শাঁখ বাজাবার পরিণাম যে খুবই খারাপ হয়েছে, প্রমাণ করতে পারেন না নবীন মিত্র। কারণ, যে মানুষগুলি জন্মক্ষণের কান্নাকে দেউলপাড়ার শাঁখের শব্দ অভ্যর্থনা করেছে, সে মানুষগুলির সবারই প্রাণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমন নির্মম সত্য প্রমাণ করতে পারেন না নবীন মিত্র। কিন্তু আরও তলিয়ে বুঝেছেন এবং হিসেব করে দেখেছেন নবীন মিত্র। দেউলপাড়ার এইসব ছেলেমেয়ে বড় হয়ে মানুষ হতে পারেনি। অর্থাৎ সুখী হতে পারেনি, অর্থাৎ গরীব হতে হয়েছে।

গরীবের ঘরে জন্মালে গরীব হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। অন্তত কেউ-না-কেউ ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ পায়। কিন্তু দেউলপাড়ার কোন ছেলে, হিসাব করে দেখেছেন নবীন মিত্র, আশি টাকার বেশি মাইনের চাকরি করে না। সবাই আশি টাকার নীচে। তবে? জন্মক্ষণে শাঁখ বাজিয়ে সত্যিই কিছু লাভ হলো কি?

এই নবীনবাবুই সেদিন পরেশবাবুর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে ফেললেন, যদিও আস্তে একটা ভ্রূকুটিও করলেন।—এইবার বুঝুন।

পরেশবাবু সত্যিই একটা উদ্বেগের সংবাদ নিয়ে এসেছেন, এবং পাড়ার সব বাড়ির মানুষও বুঝতে পেরেছে, এইবার বেশ একটু সাবধান হতেই হয়। শাঁখ বাজানো উচিত নয়।

পরেশবাবুর বাড়ির পাশেই ছোট একতলা বাড়িতে এই একবছর হলো ভাড়াটিয়া হয়ে যে লোকটা সস্ত্রীক থাকতো, নাম যার জীবন মজুমদার, সেই লোকটা আজ প্রায় দশদিন হলো কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। ঘরের ভিতর শুধু একা একা মেঝের উপর গড়াচ্ছে আর কাঁদছে জীবন মজুমদারের স্ত্রী।

আজ জানতে পারা গিয়েছে, জীবন মজুমদার নামে লোকটা এতবড় পাড়ার এতগুলি মানুষের চোখের দৃষ্টিকে একেবারে বোকা করে দিয়ে ঐ বাড়িতে সস্ত্রীলোক থাকত। স্ত্রী নয়, সেই স্ত্রীলোকটাই আজ একা একা ঘরের মেঝের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদছে।

জীবন মজুমদারের সঙ্গে পাড়ার প্রায় সকল বয়স্ক ব্যক্তির আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। কেউ কোন মুহূর্তেও সন্দেহ করতে পারেনি যে, জীবন মজুমদারের জীবনটা ঠিক এই পাড়ার আর পাঁচজন ভদ্রলোকের জীবনের মতো নয়। বয়সে ত্রিশের বেশি হবে না, দেখতে শুনতে

ভদ্রলোকেরই মতো সেই জীবন মজুমদার স্টীফান ব্রাদার্সের অফিসে বেশ ভাল মাইনের চাকরি করতো। পাড়ার থিয়েটারে দশ টাকা চাঁদাও দিয়েছিল। সেই জীবন মজুমদার হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছে। এবং, আজই আরও জানতে পারা গিয়েছে যে, সেই জীবন মজুমদার আসলে জীবন মজুমদার নয়। স্টীফান ব্রাদার্সের অফিসে টেলিফোন করে জানতে পারা গিয়েছে, কোন জীবন মজুমদার সেই অফিসে চাকরি করে না।

পরেশবাবুর বাড়ির পাশের একতলা বাড়ির ঘরের ভিতর একা একা মেঝের উপর গড়িয়ে কাঁদছে যে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে সে-ই হলো নতুন কাকিমা। একবছর ধরে এই নামে যে মানুষটাকে ডেকে এসেছে দেউলপাড়ার প্রায় সব বাড়ির ছেলেমেয়ে, সেই মানুষটার পরিচয় জানতে পেরে আজ ভয় পেয়েছে প্রায় সব বাড়ির বাবা আর মা। সকলেই পরেশবাবুর মতো উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

একটা লোক তার স্ত্রীলোককে ছেড়ে দিয়ে আর একলা রেখে পালিয়ে গেল, সেইজন্য কি?

না, সেজন্য নয়। জীবন মজুমদারের মতো লোক এ রকম কাণ্ড করেই থাকে। এ রকম কাণ্ড করলে কোন ঐ ধরনের স্ত্রীলোকের পক্ষে সেটা এমন কিছু ভয়ানক বিপদও হয়ে ওঠে না। চুপচাপ আবার চলে যেতে হবে, এবং যে জায়গায় গেলে জীবন মজুমদারের মতো অন্য অনেক মানুষ পাওয়া যাবে, সে জায়গাতে চলে যাবে স্ত্রীলোকটা।

কিন্তু জীবন মজুমদারের পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকটা আজ এখনই চলে যেতে পারবে না। কাল রাত থেকে একটা ধাই সেই যে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে, এখনও আছে, চলে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ, স্ত্রীলোকটা এখনও প্রসববেদনায় কাতরাচ্ছে।

দেউলপাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সকলেই জানতো, নতুন কাকিমার ছেলে হবে। গত তিন-চারদিন ধরে রোজই ধাইকে আসতে দেখে ওদের উৎসাহ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। বুঝতে পেরেছে পরেশবাবুর মেয়ে চিনু আর মীনু এবং পাড়ার যত সন্তু, খুকু, কানু, বুলি, বিনু, জয়ন্তী, সুধা, নির্মল আর অরুন্ধতীও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কানামাছি খেলা থামিয়ে ওরা রোজই একবার-না-একবার এসে নতুন কাকিমার সঙ্গে গল্প করে গিয়েছে।

ওদের কাছ থেকেই পাড়ার প্রবীণারা জীবন মজুমদারের বউ-এর নানা খবর আর নানা পরিচয় আরও ভাল করে জানতে পেরেছিল। শুনে খুশিই হয়েছিল সবাই। ছেলেমেয়েগুলি জীবনবাবুর বাসাতে গেলেই জীবনবাবুর বউ ওদের কিছু না খাইয়ে ছাড়ে না। হয় বিস্কুট নয় বাতাসা, নয় রসবড়া, নয় মুড়কি। এক এক দিন কেক। নতুন কাকিমার চেয়ে ভাল কাকিমা এই পাড়াতেই নেই, চিনু আর মীনু একদিন এই কথা চেঁচিয়ে বলেছিল।

সুধার মা আর সন্তুর পিসিমাও আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, এই পাড়াতে ওরকম লাজুক স্বভাবের বউ দ্বিতীয়টি আর নেই। কি আশ্চর্য, কত আস্তে হাসে, কি রকম মুখ নামিয়ে কথা বলে আর, একটা কথা বলতে গিয়ে সাতবার মাথার কাপড় টানে জীবনের বউ।

কানুর বড়-বউদি আর জয়ন্তীর মেজদিও কত না প্রশংসা করেছে—জীবনবাবুর স্ত্রীর গুণ আছে অনেক, ঘরদোর একেবারে যেন মেজেঘষে তকতকে করে রাখে। জিনিসপত্র কী চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে জানে। যখনই যাও না কেন, দেখতে পাবে, জীবনবাবুর বাসার ঐ ছোট ঘর দুটোর ভিতরটা যেন ছবির মতো ঝকঝক করছে।

খুকুর ঠাকুমা আর নির্মলার মাসিমা একদিন ঐ বাড়ির রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে জীবনের বউ-এর রান্নাবান্নার রকম নিজের চোখে দেখেছেন। এবং পাড়া ঘুরে প্রশংসা রটিয়েছেন। রাঁধবার কী চমৎকার একটা লক্ষ্মীশ্রী! হাতা-খুন্তি নড়ে, কিন্তু শব্দ পর্যন্ত হয় না, এমনই পাকা হাত। নিজের হাতে নোড়া চালিয়ে শিলের উপর সব মশলা পিষে নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনরকম ঝোল আর ঝাল রেঁধে ফেললো, কিন্তু কাপড়ে এক ফোঁটা হলুদের

দাগও লাগলো না।

সেই মানুষটারই জীবনের ছদ্মবেশ আজ ধরা পড়ে গিয়েছে। দেউলপাড়ার প্রবীণারা যেমন শতমুখ হয়ে প্রশংসা করেছিলেন, আজ তেমনই সহস্রমুখ হয়ে তাঁরাই নিন্দা করেছেন। ছি, ছি, ছি, একটা পাপের জীব এতদিন ধরে পাড়ার এতগুলি মানুষকে কী ভয়ানক চালাকির জোরে ঠকিয়েছে! স্বামী-স্ত্রী সেজে দিব্যি একটি বছর কাটিয়ে দিলে দু-দুটো মানুষ, যারা স্বামী-স্ত্রী নয়। প্রবীণারা নিন্দে করতে করতেই হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু...

কিন্তু ওদের, ঐ চিনু, মীনু, সন্তু, বুলি, বিনু আর জয়ন্তীদের সামলানো যায় কি করে, আর বোঝানোই বা যায় কি করে? নতুন কাকিমা যে একটা কাকিমাই নয়, এ কথা চেঁচিয়ে আর ধমক দিয়ে বললেও ওরা বুঝবে কি? ওরা যে আজ সকাল থেকে বার বার যাচ্ছে, আর জানালায় উঁকি দিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে। মেঝের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে ছটফট করছে আর কাঁদছে নতুন কাকিমা। আজই নতুন কাকিমার ছেলে হবে। ধাইটার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়েছে ওরা।

পরেশবাবু বলেন—আপনার নাতনী মালতীকেও দেখলাম।

—অ্যাঁ? কোথায় দেখলেন? আর্তনাদ করে ওঠেন নবীন মিত্র।

—ঐ ঘরের জানলার কাছে।

—ভেতরে যায়নি তো?

—না।

শুনে নিশ্চিন্ত হলেন নবীন মিত্র। নবীন মিত্রের জীবনে সেই পুরনো আভিজাত্যের একটা অহঙ্কার আজও সজীব হয়ে আছে। দেউলপাড়ার কোন বাড়ির ভিতরে যায় না নবীন মিত্রের নাতি নাতনী। যেতে হলে বাড়ির কোন লোকের সঙ্গে কিংবা চাকরের সঙ্গে যায়। নবীন মিত্র পছন্দ করতেন না, তাঁর নাতি-নাতনী এইসব ভাড়াটিয়া বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশামেশি করুক।

সমস্যা এই নয় যে, একটা নারী অসহায়ভাবে একলা ঘরের মেঝের উপর পড়ে প্রসববেদনায় কাঁদছে! সমস্যা এই যে, এইসব চিনু, মীনু আর সন্তুর দল শাঁখ বাজাবার একটা নতুন সুযোগের লগ্ন আসন্ন হয়েছে বলে বুঝতে পেরে সারাটা দিন কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে রয়েছে। বার বার যাচ্ছে, জানালায় উঁকি দিয়ে ধাই-এর সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসছে, আর রাস্তার উপর কানামাছি খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে যেন চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে সেই বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

জীবন মজুমদার নামে লোকটার উপর ঘৃণা হয়, এবং ঘৃণার সঙ্গে রাগও হয় এই স্ত্রীলোকটার উপর। কেন মরতে ভদ্রলোকের পাড়ার ভিতর এসে ঢুকেছিলে? তোমার ছায়া দেখাও উচিত নয় যেখানে, সেখানে তোমার কাছে এগিয়ে যাবে কে? পুলিশে খবর দিয়ে স্ত্রীলোকটাকে হাসপাতালে পাঠানো যেত, যদি একটু আগে ওর পরিচয়টা ধরা পড়ে যেত। স্ত্রীলোকটা আজ সকালে ধাই-এর কাছে বলেছে যে, সাতদিন হলো ওর বাবুটা পালিয়েছে। ধাই-এর কাছ থেকে প্রথম খবরটা শুনতে পেয়েছেন পরেশবাবু, এবং এতক্ষণে পাড়ার প্রায় সব বাড়ির মানুষ জানতে পেরে গিয়েছে।

কিন্তু নবীন মিত্রের চোখের ভ্রূকুটি আস্তে আস্তে কঠোর হয়ে উঠতে থাকে।—আমার ঐ একতলা বাড়িতে নতুন ভাড়াটে আর আসতে চাইবে কি পরেশবাবু?

—আজ্ঞে?

—বলছি, বাড়িটার একটা দুর্নাম হয়ে গেল না কি? যে বাড়িতে বেশ্যে বাস করে গেল, সেই বাড়িতে সস্ত্রীক কোন ভদ্রলোকের থাকতে বাধো-বাধো ঠেকবে না কি?

পরেশবাবু—তা কি আর করবেন বলুন? নতুন চুনকাম করিয়ে, পরে একটা হোম-টোম

করে বাড়িটাকে শুদ্ধ করে নিলেই ভাল হয় বোধহয়।

নবীন মিত্র বলেন—দেউলপাড়াতে এরকম বিশ্রী অশুচিকর কাণ্ড এই প্রথম হলো পরেশবাবু।

যাই হোক, এইবার শুধু পরেশবাবু নন, পাড়ার প্রায় সকলেই একটু সাবধান হয়েছেন। বোকা অবুঝ ছেলেমেয়েগুলি হঠাৎ শাঁখ বাজিয়ে একটা অশুভ আবির্ভাবের প্রথম কান্নার স্বরকে যেন অভ্যর্থনা না করে ফেলে। লক্ষ্মীপূজার সন্ধ্যায়, এক-একটা মহাঘটনার আর মহাপুণ্যের লগ্নে যে শাঁখ বাজে, সে শাঁখ এরকম কুৎসিত একটা ঘটনার লগ্নে যেন বেজে না ওঠে।

পরেশবাবু বলেন—ছেলেমেয়েগুলোকে তো ঘরে ঘরে বন্ধ করে রাখা সম্ভব হবে না। তাই তো সমস্যা। কি করা যায় বলুন?

নবীন মিত্র বলেন—এইবার বুঝুন।

পরেশবাবু—কি?

নবীন মিত্র—আপনাদের ঘরে ঘরে যে-সব শাঁখ আছে, যেগুলি অনর্থক আর অকারণে বাজানো হয়ে থাকে, সেইসব শাঁখ এইবার লুকিয়ে ফেলুন।

পরেশবাবু মাথা হেঁট করেন। যেন দেউলপাড়ার এতদিনের একটা ভুল নিজের গ্লানি বুঝতে পেরে মাথা হেঁট করেছে। এই নবীন মিত্র কতবার অনুরোধ করেছিলেন, শাঁখ বাজাবার অভ্যাস বর্জন করুন মশাই, নইলে এই পাড়ার কোন মঙ্গল হতে পারছে না। নবীনবাবুর সেই অনুরোধের দাম যেন এতদিনে বুঝতে পারা গেল। পাড়াতে অমঙ্গলের ঘটনা ঘটেছে। অশুচি জীবনের ছায়া ঢুকেছে। এবং পূজার শাঁখগুলির আজ অশুদ্ধ হয়ে যাবার মতো বিপদ দেখাও দিয়েছে। সত্যিই তো, যে শঙ্খের ধ্বনি দিয়ে দেবতাকে আহ্বান করা হয়, সে শঙ্খ কি ঐ স্ত্রীলোকের প্রসববেদনার মুক্তির আনন্দকে জয়ধ্বনি দিয়ে বরণ করবে!

পরেশবাবু বলেন—অগত্যা...হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, শাঁখগুলি লুকিয়ে ফেলাই ভাল।

চলে গেলেন পরেশবাবু। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাড়ার সব বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাড়ির মানুষকে সচেতন আর সতর্ক করে দিলেন। স্বীকার করলেন সবাই, হ্যাঁ, সত্যিই তো, পূজার শাঁখ এরকম একটা বিশ্রী ঘটনায় বেজে উঠলে অমঙ্গল হবে। ছেলেমেয়েগুলোর দোষ কি? ওরা তো অবুঝ। ওরা তো পৃথিবীর সব আলো ছায়া আর শব্দকে বরণ করবার খেলা খুঁজছে। জীবন মজুমদারের স্ত্রীলোকটা যে কে এবং তার যে ছেলেটা হবে সেটাই বা যে কী হবে—এতটা বিচার করে বুঝবার মতো বুদ্ধি ওদের নেই।

সন্ধ্যা যখন হলো, যখন একটু নীরব হয়ে গেল দেউলপাড়া লেন, তখন চিনু, মীনু আর সন্তুর দল সেই বাড়ির জানালায় উঁকি দিয়ে নতুন কাকিমার কান্না শুনে আর ধাই-এর সঙ্গে অনেক আবোলতাবোল কথা বলে ঘরে ফিরে এল।

নিশ্চিন্ত হয়ে গেল দেউলপাড়া। এখন যদি জীবনের স্ত্রীলোকটার প্রসববেদনা চরম হয়ে ওঠে, এবং যদি একটা কচি কান্নার স্বর এই সন্ধ্যার নীরবতার মধ্যে কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে, তবু ভয় নেই। শাঁখ বাজবে না, সব শাঁখ লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। এই অবুঝের দল বড়জোর ছুটে যাবে আর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কান্না শুনে চলে আসবে।

সন্ধ্যাটা আর একটু নীরব হয় যখন, তখন জীবন মজুমদারের স্ত্রীলোকটার আর্তনাদ আরও স্পষ্ট হয়ে বেজে ওঠে। দেউলপাড়ার লেনের বাতাসে যেন বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছে একটা করুণ যন্ত্রণা।

নবীন মিত্রের বাড়িতে এসে, এবং সোজা নবীন মিত্রের বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা নিশ্চিন্ততার হাঁপ ছাড়েন পরেশবাবু, এবং নবীন মিত্রও খুশি হন।

পরেশবাবু বলেন—আপনার পরামর্শ মতো সকলেই খুশি হয়ে...

নবীন মিত্র—শাঁখ লুকিয়ে ফেলেছে?

পরেশবাবু—হ্যাঁ।

নবীন মিত্র—কিন্তু আর একটা কথা। এই শিক্ষা ভুলে যাবেন না। যদি শ্রীবিষ্ণুর করুণার উপর বিশ্বাস থাকে, তবে আপনাদের এই পাড়ার মঙ্গলের শান্তির আর সুখের শঙ্খ বাজাবার ভার স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর উপর ছেড়ে দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

কি যেন বলতে চেষ্টা করেন পরেশবাবু, কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠেন, এবং মুখের কথাটা মুখেই থেকে যায়।—ও কি? কিসের শব্দ?

নবীন মিত্র আস্তে আস্তে বলেন—হ্যাঁ, স্ত্রীলোকটা প্রসব করেছে বলে মনে হচ্ছে।

এই তো, নবীন মিত্রের এই বনেদী বাড়ির পাঁচিলের পাশেই পরেশবাবুর বাড়ি, এবং তার পাশেই সেই একতলা বাড়িটা, যেটা জীবন মজুমদার নামে সেই লোকটা ভাড়া নিয়েছিল। সেই বাড়ির একটা ঘরের ভিতর থেকে নবজাতকের কান্নার স্বর কেঁপে কেঁপে একটা বিদ্‌ঘুটে উল্লাসের শিহরের মতো ভেসে আসছে।

—কিন্তু ওকি! ওটা আবার কিসের শব্দ! শঙ্খের? চেঁচিয়ে ওঠেন পরেশবাবু।

—এ কেমন শঙ্খ? বলতে বলতে কেঁপে ওঠেন, এবং আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নবীন মিত্র। টান হয়ে দাঁড়িয়ে, সারা শরীরকে যেন কাঠ করে দিয়ে সেই অদ্ভুত শঙ্খের অদ্ভুত শব্দ শুনতে থাকেন।

—কে বাজালো এই শঙ্খ? বলতে বলতে পরেশবাবু এগিয়ে আসেন। বৈঠকখানার দরজা পার হয়ে বারান্দায়, শেষ পর্যন্ত ফটক পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে নবীন মিত্রও লাঠি ভর দিয়ে ব্যস্তভাবে, একটা বিস্ময়ের আবেশে কাঁপতে কাঁপতে পথের উপর এসে দাঁড়ান।

এ-বাড়ির আর সে-বাড়ির দরজা আর জানালাগুলিও খুলে যেতে থাকে। জানালায় মেয়েদের মুখ উঁকি দেয়, আর পুরুষেরা বের হয়ে পথের উপর এসে ভিড় করে। কেউ নীরবে তাকিয়ে এবং কেউ বা ফিসফিস করে বিস্ময় প্রকাশ করে—কি ব্যাপার? শাঁখ বাজলো কেমন করে? কে বাজালো?

এইবার একেবারে স্পষ্ট করে বোঝা যায়, একটা অদ্ভুত শঙ্খের অদ্ভুত শব্দ জীবন মজুমদারের স্ত্রীলোকটার সদ্য-প্রসূত সন্তানের কান্নাময় প্রাণটাকেই অভিনন্দিত করে বাজছে।

নবীন মিত্রের বাড়ির ফটকের কাছে একে একে সকলেই এসে জমা হতে থাকে। হীরুবাবু, পুলকবাবু, নৃপেনবাবু, যতীশবাবু এবং আরও অনেকেই। কি ব্যাপার? এ কিরকমের কাণ্ড হলো? সকলের মুখে এই প্রশ্নই ফিসফিস করে।

হঠাৎ ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠেন নবীনবাবু—অ্যাঁ, আমার শ্রীবিষ্ণুর হাতের শঙ্খ নয়তো মশাই?

একটা শোরগোল জেগে ওঠে।—সে কি সম্ভব? সে কি সম্ভব? আপনি একি বলছেন নবীনবাবু!

কিন্তু নবীনবাবু যেন ছটফট করে কাঁপতে কাঁপতে আর টলতে টলতে ঠাকুরঘরের দিকে ছুটে যান। ঠাকুরঘরের দরজা ঠেলে দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন।—একি! আমার শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খ গেল কোথায়?

ভিড়টাও ছুটে এসে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায় আর উঁকি দেয়। ঘি-এর প্রদীপ জ্বলছে। চকচকে কালোপাথরের শ্রীবিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন। গদা চক্র এবং পদ্ম আছে—কিন্তু, শুধু শঙ্খটি নেই। সেই প্রকাণ্ড শ্বেতশঙ্খ—মহাকল্যাণ আর মহাপুণ্যের প্রতিশ্রুতির শঙ্খ ; ঐতিহাসিক মহিমার শঙ্খ।

পাগলের মতো চোখ করে চিৎকার করে উঠলেন নবীন মিত্র—কোথায় গেল? কোথায়

গেল?

সেই মুহূর্তে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে ভিড়টাকে চমকে আর এলোমেলো করে দিয়ে একটি আট বছরের বয়সের মেয়ের ফুটফুটে চেহারা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। নবীন মিত্রের নাতনী মালতী। পথের দিক থেকে যেন নাচতে নাচতে ছুটে এসেছে মালতী।

ঠাকুরঘরের ভিতরে ঢুকে, চকচকে কালোপাথরের শ্রীবিষ্ণুর একটা শূন্যহাতে শঙ্খটাকে তুলে দিয়ে, আবার তেমনি খুশির উচ্ছ্বাসে ছুটে চলে গেল মালতী।

চেঁচিয়ে ওঠেন নবীন মিত্র--মালতী? মালতী?

উত্তর না দিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে যেতে থাকে মালতী।

--কি হলো মালতী? আবার চেঁচিয়ে ওঠেন নবীন মিত্র।

মালতীও চেঁচিয়ে ওঠে--নতুন কাকিমার ছেলে হলো।

মনোনয়ন

সবই জানেন, সবই বুঝতে পেরেছেন বড়দা আর বড়-বউদি। কোন আপত্তি নেই বড়দার, এবং বড়-বউদিরও, শিপ্রার সঙ্গে যদি নীহার মজুমদারের বিয়ে হয়ে যায়। শিপ্রার জীবনটা বিনাদোষে একটা দুর্ভাগ্যের আঘাত পেয়েছে। তিন বছর ধরে এই আঘাতের বেদনা সহ্য করেছে শিপ্রা। কিন্তু আর সহ্য করতে চায় না বোধহয়। বেশ তো! যে বিয়ে সুখের বিয়ে হলো না, যে বিয়ে একটা অভিশাপ হয়ে উঠলো, সেই বিয়ের মিথ্যা শাসন অস্বীকার করে শিপ্রা যদি এখন নীহার মজুমদারকে বিয়ে করে, তবে সেটা মোটেই অশোভন কিছু হবে না।

কোন সন্দেহ নেই, শিপ্রার মতো মেয়ের সঙ্গে নীহার মজুমদারের মতো মানুষকেই মানায়। এমনও মনে হয়, শিপ্রার সঙ্গে ভালবাসা হবে এবং শিপ্রাকে জীবনের সঙ্গিনী করে নিতে হবে বলেই যেন নীহার মজুমদারের জীবনটা একটা লগ্নের অপেক্ষায় ছিল, তাই পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলেও বিয়ে করেনি নীহার মজুমদার।

পাঁচ বছর আগে এই নীহার মজুমদারের সঙ্গেই শিপ্রার বিয়ের কথা উঠেছিল। অজন্তা স্পিনিং এণ্ড উইভিং-এর বার আনা মালিক নীহার মজুমদার। কিন্তু সেদিন এই শিপ্রাই নিজের মুখে বলেছিল—এমন কি পয়সাওয়ালা মানুষ নীহার মজুমদার, যার জন্যে তোমরা...।

শিপ্রার আপত্তি। কথাটা বেশ হেসে হেসে বলেছিল শিপ্রা। কিন্তু কারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি, শিপ্রার এই হাসিটাই একটা আপত্তি। বড়দা তারপর আর নীহার মজুমদারের নাম উচ্চারণ করেননি। শিপ্রার ইচ্ছার দাবিটা সেদিন আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিলেন বড়দা।

পয়সাওয়ালা মানুষেরই সংসারে গিয়ে ঠাঁই নিতে চায় শিপ্রা কিন্তু সে মানুষ অন্তত নীহার মজুমদারের চেয়ে বেশি পয়সার মানুষ হবে। শিপ্রার ইচ্ছাটা খুবই স্পষ্ট। বড়-বউদির কাছে আরও স্পষ্ট করে একদিন বলেই দিয়েছিল শিপ্রা, আমাকে লোভী বলো আর নির্লজ্জ বলো, সোজা কথা এই যে, বেশ বড়লোক পাত্র যদি না পাও তবে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টাই করো না।

শিপ্রার মতো মেয়ের জন্য বেশ বড়লোক পাত্র পাওয়াই বা যাবে না কেন?

বড়-বউদিও খোঁজ নিলেন, চেষ্টা করলেন। তারপর একদিন শিপ্রাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—স্টেভেডর হর্ষ রায়ের নাম শুনেছ শিপ্রা?

--শুনেছি বৈকি।

—তাঁর বাড়িটা দেখেছ?

—দেখেছি বৈকি। যোধপুর ক্লাবের কাছে নতুন রাস্তার পাশে।

—হর্ষ রায়ের একটা কেমিক্যাল ওয়ার্কসও আছে।

—হ্যাঁ, ইস্টার্ন কেমিক্যাল ওয়ার্কস।

—তা ছাড়া কয়েকটা চা-বাগানও আছে।

—হ্যাঁ, লোহাবাড়ি টি এসেস্ট।

—তুমি এত খবর জানলে কেমন করে?

—হর্ষ রায়ের ভাগ্নী যমুনা নিজেই বলেছে।

—যমুনার সঙ্গে তোমার চেনা হল কবে?

—যমুনা আর আমি যে এক কলেজের বান্ধবী।

—হর্ষ রায়ের ছেলে অরুণ। হর্ষ রায়ের একমাত্র ছেলে, সে খবর জান?

—তাও জানি।

—অরুণকে দেখেছ কখনও?

—একবার দেখেছি।

—কেমন?

—ভালই।

সেই অরুণ রায়ের সঙ্গে শিপ্রার বিয়েটা এতো আনন্দের উৎসব হয়ে উঠেও চারটি বছর যেতে না যেতে একটা আনন্দহীন অভিশাপে পরিণত হবে, এমন পরিণাম কল্পনা করতে পারেননি বড়-বউদি, এবং বড়দাও। বড়দার চেয়ে বড়-বউদি একটু বেশি লজ্জিত এবং দুঃখিত। শিপ্রার সৌভাগ্যের এতো সুন্দর ছবিটা যে একটা মরীচিকার ছবি, সেদিন একটুও সন্দেহ করতে পারেননি বড়-বউদি।

বিয়ের পর দেখতে পাওয়া গেল, হর্ষ রায়ের ঐশ্বর্যের সবই ভুয়া। ঐশ্বর্যের পিছনে বিপুল দেনার কালো-ছায়াও লুকিয়ে ছিল। যেন শিপ্রার এই বিয়ের আনন্দটাকে একটা নির্মম বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে একটা আবর্জনা করে পথের ধুলোর উপর ফেলে দেবার জন্য অপেক্ষায় ছিল কালো-ছায়া। বিয়ের পর তিনটি মাস যেতে না যেতে হর্ষ রায় মারা গেলেন। তারপর যেন ঝড়ের ফুৎকারে আহত তাসের ঘরের মতো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে গেল হর্ষ রায়ের সেই ফাঁকা ঐশ্বর্যের প্রাসাদ।

বেশি দিন লাগেনি, চার বছরের মধ্যে সবই দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল। যে অরুণ রায় সকাল বিকাল গাড়ি বদল করে বেড়াতো, সেই অরুণ রায় ট্রামে ওঠবার আগে পকেটে হাত দিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায়। পকেটের পয়সা গুনে দেখতে চেষ্টা করে।

তারপর একদিন, যেদিন যোধপুর ক্লাবের কাছে নতুন রাস্তার পাশে সেই বাড়ির দখল নেবার জন্য পাওনাদার ব্যাঙ্কের লোক এসে বাড়ির ফটকে দাঁড়ালো, সেদিন অরুণ রায়ের মুখের দিকে আর না তাকিয়ে, একটি কথাও না বলে, শুধু তিন বছর বয়সের নীতুর হাত ধরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল শিপ্রা।

তারপর আজ ; শিপ্রার বড়দা এবং বড়-বউদিও ভাবছেন, নীহার মজুমদারের সঙ্গে শিপ্রার বিয়েটা হয়ে গেলে ভালই হয়। কিন্তু...।

এর মধ্যে শুধু একটি কিন্তু আছে, যে জন্য বড়দা একটু ভাবছেন, আর বড় বউদিও বলছেন—বেশ তো বিয়েটা আগে হয়ে যাক না কেন ; কিন্তু শিপ্রা এখনই কেন বোকার মতো এতটা...।

বড়দা আরও গম্ভীর হয়ে বলেন—এতে আমারও আপত্তি আছে। একটু অশোভন বলে মনে হচ্ছে।...তুমি একবার বলে দেখ।

বড়-বউদি—বলেছি।

বড়দা—কি বলে শিপ্রা?

বড়-বউদি—আমাদের আপত্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে শিপ্রা।

বড়-বউদির কথা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে শিপ্রা। নীহার মজুমদারের সঙ্গে শিপ্রার বিয়ে হয়ে যাক, এই শুভ কামনা পোষণ করেন যে বড়দা আর বড়-বউদি, তাঁরা আবার হঠাৎ এত চিন্তিত হয়ে পড়লেন কেন?

শুধু বড়দা আর বড়-বউদি কেন, অরুণ রায়ও যে জানে এবং সে ভদ্রলোকও কোন আপত্তি না করে শিপ্রার জীবনের এই পরিবর্তনের আবির্ভাব স্বীকার করে নিয়েছে। বড়দার কাছে কথায় কথায় অরুণ রায় একদিন স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছে যে, না, শিপ্রার জীবনে আমি কোন বাধা হয়ে থাকতে চাই না।

সুতরাং নীহার মজুমদারের সঙ্গে আজ একবার বেড়াতে বের হবে শিপ্রা, এতে বড়দা আর বড়-বউদির আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? আশ্চর্য ! আর কিছুক্ষণ পরে নীহারের গাড়ি আসবে। এখান থেকে সোজা পানাগড়। রেস্টহাউসে কিছুক্ষণের জন্য রেস্ট। তারপরই ফিরে আসা। ফিরতে একটু রাত হবে, এই যা। হোক রাত। আপত্তি করবার কি আছে?

মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর মুখ আর সুগঠন দেহের সাজ ছাঁদ আর প্রসাধনের একটা উৎসবের মধ্যে যেন মত্ত হয়ে রয়েছে শিপ্রা। বেছে বেছে সেই ফিকে নীল বেনারসীকে গায়ে জড়িয়েছে শিপ্রা, যেটা পরলে শিপ্রার ফরসা চেহারা আরও ফুল্ল হয়ে ঢলঢল করে। শাড়ি পরবার ভঙ্গিমাটিও সুন্দর, একটু অদ্ভুত রকমের সুন্দর, যেটা শিপ্রার অদ্ভুত রকমের সুন্দর চেহারার সঙ্গে খুবই ভাল মানায়। কোমরের সঙ্গে শক্ত ও গ্রন্থিল বন্ধনে বাঁধা হয়ে থেকেও শাড়িটা খোলা-খোলা এলোমোলা একটা উৎফুল্লতা। ঠোঁট দুটি এমনিতেই লালচে, তবুও একবার লিপস্টিক বুলিয়ে নিতে ভুলে যায় না শিপ্রা। সুন্দর নন-স্মীয়ার রক্তিমতা। চোখের পাতা এমনিতেই বেশ বড় বড় আর বেশ কালো। তবু মাসকারা পেনসিল হাতে তুলে নিয়ে মিররের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ায় শিপ্রা। তার আগে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নেয়। মাত্র সন্ধ্যা ছ'টা। নীহার আসবে সাতটায়।

প্রায় রোজই আসে নীহার। যেদিন প্রথম এসেছিল নীহার, সেদিন নীহারের সঙ্গে এসে দেখাও দেয়নি শিপ্রা। বড়দার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কারবারের আর অনেক প্রফিটের গল্প বলে চলে গেল নীহার। কিন্তু ঘরের ভিতরে বসে, একটা আহত অহঙ্কারের বেদনায় তপ্ত হয়ে শিপ্রার মনটা নীহারের গল্পের আর হাসির দুঃসাহসকে একটু ঘৃণাই করেছিল। ভদ্রলোক যেন সুযোগ পেয়ে শিপ্রার দুর্ভাগ্যটাকে ঠাট্টা করতে এসেছে। বড় আশা আর উৎসাহ নিয়ে যে শিপ্রা বসু বড়লোক অরুণ রায়কে বিয়ে করেছিল, সেই শিপ্রা রায় স্বামীকে ঘৃণা করে, তিন বছর বয়সের ছেলের হাত ধরে একটা ট্যাক্সি করে আবার দাদার বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছে। নীহার মজুমদারের বুকের ভিতরটা যেন প্রতিশোধের তৃপ্তিতে হো হো করে হাসছে। নীহার মজুমদার যে জানে, এই শিপ্রা একদিন নীহার মজুমদারকে বিয়ে করতে চায়নি, কারণ সেদিন নীহার মজুমদার এমন কিছু পয়সাওয়ালা ছিল না।

কিন্তু নীহার মজুমদারের আগমন, গল্প আর হাসির উপর শিপ্রার আক্রোশও একদিন লজ্জা পেয়ে মুখ লুকোতে চাইলো। ড্রইংরুমে ঢুকে মাথা হেঁট করে একটা সোফার উপর বসে নীহার মজুমদারের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেছিল শিপ্রা। বড়দা চলে যেতেই, হঠাৎ বলে উঠলো নীহার—আমি সত্যিই দুঃখিত শিপ্রা!

—কেন?

—তোমার জীবনের দুঃখ দেখে। আমি ভাবতেই পারিনি যে, তোমার মতো মেয়েকে কখনও এরকম দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়তে হবে।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে নীহার মজুমদারের সেই বিষণ্ণ ও বিমর্ষ মুখের দিকে তাকায় আর আশ্চর্য হয়ে যায় শিপ্রা।

নীহার বলে—তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে আর আমি এখানে আসবো না শিপ্রা। বলো!

শিপ্রা বলে—কোন আপত্তি নেই। আসবেন বৈকি।

আজ আর কোন সন্দেহ নেই, নীহার মজুমদার শিপ্রাকে ভালবাসে, শিপ্রা নীহারকে ভালবাসে। আর, সেই অরুণ রায় আজ শিপ্রার জীবনে একেবারে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। অরুণ রায় এখন অতীতের একটা তিক্ত স্মৃতি মাত্র। অরুণ রায় এখন নিরর্থক সম্পর্কের একটা ছায়া মাত্র। কিন্তু...।

কিন্তু একটা অস্বস্তি এই যে, সেই ছায়া মাঝে মাঝে এখানে আসে। বড়দা আর বড়-বউদি একেবারেই পছন্দ করেন না যে, অরুণ এখানে আসে। শিপ্রা বিরক্ত হয়ে উপরতলার একটি ঘরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে, যখন শোনা যায় যে অরুণ এসে নীচের তলার বারান্দার চেয়ারের উপর বসে আছে।

সবচেয়ে বেশি দুঃসহ অস্বস্তি বুড়ো দারোয়ানটা এখনও চেঁচিয়ে হাঁক দিয়ে বলে—জামাইবাবু এসেছেন। আর, চার বছর বয়সের নীতু বলে—বাবা এসেছে।

শুধু নীতুকে একবার দেখবার জন্যই আসে অরুণ রায়। এই একটা স্বস্তি ; এবং এই জন্যই বড়দা খুব বেশি বিরক্ত হতে পারেন না। একদিকে বিরক্তি আর অপছন্দ, আর একদিকে কেমন-যেন একটা দুর্বলতা, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন বড়দা, আসুক না অরুণ, তাতে কি আসে যায়? শুধু ছেলেটাকে দেখবার জন্য আসে। এই মাত্র! এসে কোন তর্ক করে না, কারও সঙ্গে কোনও কথাও বলে না। বেহায়ার মতো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, আর নীতুকে একবার দেখে নিয়েই চলে যায়। এর জন্য ওর ওপর রূঢ় হবার কোন দরকারই হয় না। অরুণের এখানে আসা পছন্দ না করলেও সহ্য করেন বড়দা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

বড়দার বিরক্তি দেখে একদিন শুধু তর্ক করেছিল অরুণ।—আপনাদের যদি আপত্তি থাকে তবে আমি আসবো না।

বড়দা—আপত্তি ঠিক করছি না...তুমি তোমার ছেলেকে দেখতে আসবে তাতে...

অরুণ হাসে—আমার ছেলে বলে কোন দাবি আমার নেই।

বড়দা—কেন?

অরুণ—যে ছেলেকে আপনারা খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তার ওপর আমার অধিকার কেমন করে হবে বলুন?

বড়দা—বুঝলাম কিন্তু আসল কথাটা এই যে, শিপ্রা এটা পছন্দ করে না।

—কেন?

—শিপ্রা একটু ভয় পায় বোধহয়।

—কোন ভয় নেই। শিপ্রাকে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবেন!

—আর একটা কথা।

—বলুন।

—তুমি যদি শিপ্রার সঙ্গে কথাটথা বলবার জন্য কোন দিন...।

—কোনদিনও না। শিপ্রার সঙ্গে কথা বলবার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

রোজ নয়, বড় জোর মাসে একবার আসে অরুণ। প্রথম প্রথম প্রতি সপ্তাহে একবার আসতো। কলকাতায় নয়, চন্দননগরে থাকতে হয়, কোন এক কারখানার অফিসে কেরানীর

কাজ করে অরুণ। দারোয়ান একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিল বলে এই তথ্যটুকু জানতে পেরেছেন বড়দা। জানতে পেরেছে শিপ্রাও।

অস্তিত্বটা এই বাড়ির যেন গা-সহা হয়ে গিয়েছে। অরুণ আসে আর চলে যায়, সত্যিই ছায়ার মতো একটা বস্তু আসে আর চলে যায়। এমনকি অনেক সময় বাড়ির উপরতলার কোন মানুষ বুঝতেও পারে না যে, অরুণ এসে চলে গিয়েছে। উপরতলা থেকে নীতুকে নীচে নামিয়ে অরুণের কাছে নিয়ে আসে দারোয়ান ; তারপর আবার উপরে তুলে দিয়ে আসে। উপরের বারান্দায় ছুটে ছুটে খেলা করে নীতু।

অরুণ নামে একটা ছায়া দুদিন আগেও দুপুরে একবার এসেছিল। ঠিক কখন এসেছিল কে জানে। বড়দা জানেন, বড়-বৌদি জানেন, নীতু সেদিন দুপুরে কি কথা বলেছিল।

দুপুর বেলা উপরতলার হলঘরে তখন বড়দার সঙ্গে টেবিল টেনিস খেলছিল শিপ্রা। আর, বড়-বউদি গল্পের বই পড়ছিলেন। দৌড়ে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল নীতু।

—কী নীতু? নীতুকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খায় শিপ্রা।

নীতু বলে—বাবা বিচ্ছিরি।

হলঘরের মনটা যেন চুপ করে আর উৎকর্ণ হয়ে নীতুর মুখের আধ-আধ ভাষায় এক প্রচণ্ড বাস্তব সত্যের প্রতিধ্বনি শুনতে থাকে।

—বাবা একটুও ভাল নয়। ছেঁড়া জামা। ময়লা জুতো। পকেটে নস্যি। দাড়ি ঘষে।

নীতুর কাছে বাবা কথাটা একটা কথা মাত্র। একটা লোকের নাম। মাঝে মাঝে আসে আর চলে যায়, একটা মানুষের নীরব অস্তিত্ব। কিন্তু সন্দেহ হয় শিপ্রার, নীতুর গালে বোধহয় গাল ঘষেছে লোকটা!

এমন যে চার বছর বয়সের নীতু, যাকে দেখবার জন্য একটা লজ্জাহীন পাগলামির টানে এখানে আসে অরুণ, সেই নীতুও যে ওকে সহ্য করতে পারে না। নীতুর মুখের এই ঘোষণা যে অরুণ রায়ের চরম অদৃষ্টের ঘোষণা।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি যেন ভেবেছিলেন বড়দা। তারপরেই বলেছিলেন—তুই কি নীহারকে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না?

শিপ্রা—করেছি।

—কি বলে নীহার?

—যা বলবার তাই বলেছে।

—বিয়ে করতে চায়?

—হ্যাঁ।

—তুই!

—হ্যাঁ।

আবার কি যেন ভেবেছিলেন বড়দা। তারপর টেনিস-ব্যাট রেখে দিয়ে আর মাথার সাদা চুলের স্তবকে হাত বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ ধমকের সুরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।—অরুণকে এবার স্পষ্ট করেই বলে দিতে হবে, আর যেন এখানে না আসে।

ঘড়ির দিকে আবার তাকায় শিপ্রা। ছ'টা বেজে মাত্র দশ মিনিট হয়েছে। এখনও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

বাইরের বারান্দা থেকে ছুটে এসে ঘরের ভিতর ঢোকে নীতু। শিপ্রার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার পরেই শিপ্রার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে লোভীর মতো ছটফট করে লাফাতে থাকে—মা, চুমু।

নীতুকে বুকে জড়িয়ে ধরে নীতুর দু'গালে চুমো খেয়ে খেয়ে শিপ্রা ছটফট করে। নীতু

বলে—তুমি বেড়াতে যাবে?

—হ্যাঁ নীতু।

—কার সঙ্গে?

—নীহারবাবুর সঙ্গে।

দরজার দিকে একবার সাবধানে তাকায় শিপ্রা। তারপর গলার স্বর একেবারে মৃদু করে নিয়ে আরও সাবধানে ফিসফিস করে বলে—যাব নীতু?

—যাও।

—তুমি রাগ করবে না তো?

—না।

—কেন?

—নীহারবাবু খুব ভাল।

হাঁপ ছাড়ে শিপ্রা, আর মুখটাও হেসে ওঠে। কে জানে, হয়তো শিপ্রারই নিঃশ্বাসের ভিতরে একটা ভীরুতা হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছিল। সেই ভীরুতা যেন এই চার-বছর বয়সের নীতুর মিষ্টি কথার সান্ত্বনায় মুছে গেল।

মিথ্যে ভয় করছেন বড়দা, মিথ্যে চিন্তা করছেন বড়-বউদি। নীতুর মতো এই শিশুর চোখও যে ভুল করে না, সেই ভুল করছেন বড়দা আর বড়-বৌদি। যেন নীহার মজুমদারকে একটু অবিশ্বাস করছেন দুজনে। তা না হলে নীহারের সঙ্গে সামান্য একটা বেড়াতে যাবার ঘটনাকে বাধা দেবার কথা ওদের মনে হয় কেন!

আজই তো নীহার মনের ভিতরে কোন কুণ্ঠা না রেখে স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করেছে—মনের ভেতর কিছু চাপা না রেখে সোজা স্পষ্ট করে বলে দাও শিপ্রা।

—কি বলবো?

—যদি কোন সন্দেহ থাকে।

—কিসের সন্দেহ?

—কেউ কেউ যে সন্দেহ করে?

—কে করে?

—আমারই কোন কোন বন্ধু এবং হয়তো তোমার দাদাও। আমি নাকি আমার পুরনো রাগের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমার সঙ্গে একটা নকল ভালবাসার খেলা খেলছি।

নীহার মজুমদারের চোখে একটা অদ্ভুত কৌতুকের জ্বালা যেন জ্বলছে। শিপ্রাও যেন হঠাৎ কেমন হয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে।—একি অদ্ভুত সন্দেহের কথা বলছো নীহার? তুমি এমন ভয়ানক মতলব নিয়ে..একি কখনও সম্ভব?

—তাহলে স্পষ্ট করে বল, তুমি বিশ্বাস কর।

—কি?

—আমি তোমাকে ভালবাসি।

—নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

—বিশ্বাস কর কি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই?

—নিশ্চয় চাও নীহার, আমি একটুও অবিশ্বাস করি না।

—তাহলে চল আজ বেড়িয়ে আসি।

নীহার মজুমদারের গলার স্বরে একটা প্রচণ্ড মোহময় আবেদন আর দু'চোখের ঐ অপলক চাহনিতে একটা দুর্বার আকর্ষণ শিপ্রার মনের শেষ কুণ্ঠার প্রাণটাকেও যেন ধীরে ধীরে শিথিল করে দিচ্ছে। কুণ্ঠা করে লাভ কি? কিসের ভয়? এই ভয় ভয়ই নয়। শিপ্রার স্বামী হবে যে নীহার মজুমদার, তার কোন আশার দাবী শিপ্রার কাছে ভয়ের ব্যাপার হতে পারে না।

আজই সকালে ড্রইংরুমের ভিতরে সোফার উপর বসে আর নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে শিপ্রাও একেবারে স্পষ্ট করে শিপ্রার জীবনের চরম স্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে।—বেশ তো আমার কোন আপত্তি নেই।

নীতুকে ছেড়ে দিতেই চলে গেল নীতু। ঘড়ির দিকে তাকায় শিপ্রা। ছ'টা বেজে পনের মিনিট।

দরজার কাছে একটা ছায়া। বড়দা এসে দাঁড়িয়েছেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর বেশ একটু বিচলিতস্বরে বড়দা হঠাৎ বলে ওঠেন—নীহারের সঙ্গে আজই, এত রাত্রি করে, এত দূরে বেড়াতে যাওয়া ভাল দেখায় না শিপ্রা।

—কেন? শিপ্রা হাসে।

—এসব ব্যাপার বিয়ের পরেই ভাল দেখায়।

—তার মানে নীহারবাবুকে এখনও অবিশ্বাস করতে বলছো?

—ছি ছি, এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। শোভনতা আর অশোভনতার কথা।

—আমার ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগছে বড়দা।

—কি?

—তোমরা আজ কেন হঠাৎ এরকম একটা অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করেছ?

বড়দার মুখের ভাব অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, কিন্তু আর কোন কথা না বলে আবার শান্তভাবে চলে যান।

কিন্তু শিপ্রার মনের ভিতরে চার বছরের একটা বিদ্রোহের জ্বালা যেন নতুন করে জ্বলে ওঠে। আজ সব ভুলে গেলেন কেন বড়দা? বড়দা নিজেই কতবার যোধপুর ক্লাবের কাছে সেই বাড়িতে গিয়ে, অরুণের সামনেই আক্ষেপ করেছিলেন—তোমার ভাগ্যটা যেন শিপ্রাকে কষ্ট দেবার মতলব করে এত শীগগির দরিদ্র হয়ে গেল। এরকমটা আমি ভাবতেই পারিনি। ছিঃ!

সেই বড়দা আজ শিপ্রার মুক্তির লগ্নকে বাধা দিতে চান কেন? না, নীহার মজুমদারের সঙ্গে অভদ্রতা করে আবার ভুল করতে পারবে না শিপ্রা। কখনই না।

ঘড়ির দিকে তাকায় শিপ্রা। সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছে।

কি আশ্চর্য, বড়দা এবং সেই সঙ্গে বড়-বউদিও আবার এসে শিপ্রার ঘরের দরজার কাছে দুটি প্রশ্নের প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়ালেন।

বড়দা বলেন—না গেলেই ভাল হয় শিপ্রা।

বড়-বউদি—সামান্য একটা বেড়াতে যাবার ব্যাপার তো, না গেলে নীহার অখুশি হবে না।

বড়দা—তার চেয়ে অনেক খুশির ব্যাপার হবে, যদি এখন তুমি আর নীহার এখানেই টেবিল টেনিস খেলে আর গল্প করে...।

শিপ্রা—না। নীহারকে আবার অপমান করবার পরামর্শ আমাকে দিও না।

কোন কথা না বলে, বিরক্তি আর আপত্তির দু'টি হতাশ ছায়ার মতো নীরবে চলে যান বড়দা আর বড়-বউদি।

শিপ্রাও ঘর ছেড়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে টবের গোলাপের গায়ে হাত বোলায়। আবার ফিরে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে। মিররের সামনে দাঁড়িয়ে গলা ও ঘাড়ের উপর পাউডার পাফ করে। নিজেরই চোখের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় শিপ্রা। মাসকারা বোলানো চোখের পাতায় যেন নিবিড় মেঘের মায়া কালো হয়ে কাঁপছে।

আর কত দেরি? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এইবার একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে শিপ্রা। সাতটা

বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বাইরের পৃথিবীর আলোছায়াময় শোভার দিকে একবার তাকায় শিপ্রা। বাগানের ঝাউ-এর গায়ে আলো। সে ঝাউ-এর ছায়া ব্যাকুল হয়ে কাঁপে। যেন বুঝতে পেরেছে এই সন্ধ্যা সাতটার আলোছায়া, শিপ্রার জীবন আর সত্যিকারের সৌভাগ্যের দীক্ষা পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

ছোট ছোট পায়ের ছোট ছোট লাফানির শব্দ নাচতে নাচতে শিপ্রার কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। নীতু আসছে।

নীতুকে বুকের সঙ্গে সাপটে ধরে বার বার চুমো খায় শিপ্রা।

নীতু বলে--বাবা ভাল।

চমকে ওঠে শিপ্রা।--কে বললে?

নীতু--হ্যাঁ, খুব ভাল।

নীতুর মুখের ভাষাটাও কি বড়দার চিন্তার মতো হঠাৎ অকারণে এলোমেলো হয়ে গেল? আশ্চর্য হয়ে, নীতুর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে শিপ্রা—কেন নীতু?

নীতু—বাবার ছেঁড়া জামা, ময়লা জুতো, পকেটে কিচ্ছু নেই। দাড়ি ঘষে।

কি অদ্ভুত যুক্তি। অরুণ রায় নামে একটা লোকের জীবনের গ্লানিগুলিকেই যেন গৌরব বলে ঘোষণা করছে নীতুর মুখের আবোল-তাবোল ভাষা। ছেঁড়া জামা আর ময়লা জুতোও দেখতে ভাল লেগে গেল নীতুর? পকেটে কিছুই নেই, তাও যেন লোকটার জীবনের একটা মহিমা! নীতুর গাল জ্বালিয়ে দেয় যার খসখসে গালের ঘষা, তাকে ভাল বলে মনে হয় নীতুর? নীতুর চার বছর বয়সের প্রাণটা যেন একটা বিরাট অনুভবের মায়ায় বদলে গিয়ে ভয়ানক সুরের আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছে।

—কেন নীতু? কেন ভাল? ছেঁড়া জামা ভাল কেন হবে? ময়লা জুতো দেখতে ভাল লাগবে কেন?

যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে নীতুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ছটফট করে ওঠে শিপ্রা। নীতুকে চোখের সামনে রেখে যেন নিজের অদৃষ্টেরই একটা নির্মম কৌতুককে প্রশ্ন করে করে মাথা খুঁড়ছে শিপ্রার অন্তরাত্মা—কেন? কেন? কেন?

নীতু বলে--বাবা কাঁদে।

মাসকারা বোলানো, মধুর কালিমার প্রলেপ দিয়ে নিবিড় করা চোখের পাতা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। দু'চোখ বন্ধ করে শিপ্রা। ফিকে নীল বেনারসীর এলোমেলো উৎফুল্লতাও যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

ফুঁপিয়ে ওঠে শিপ্রা।--তুমি কি ভয়ানক, কি অদ্ভুত কথা বললে নীতু!

অদ্ভুত বটে' একটা লোক শুধু কেঁদে ফেলেছে বলেই তার জীবনের সব বিচ্ছিরি দীনতা একটা সুন্দরতার ঐশ্বর্য হয়ে গিয়েছে, নীতুর চোখে এ কোন অদ্ভুত ক্ষমা আর অদ্ভুত যুক্তি!

--নীতু! বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় শিপ্রা।

নীতু বলে—কি?

শিপ্রা--কোথায় তোমার বাবা?

নীতু--নীচে।

গেটের দিকে তাকায় শিপ্রা। শিপ্রার ভেজা চোখ দুটো একটা নীরব আর্তনাদের বেদনায় চমকে ওঠে। হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে সেই মানুষটা, অরুণ নামে একটা ছায়া, এক বছর আগে যার মুখের দিকে না তাকিয়ে আর কোন কথা না বলে চলে এসেছিল শিপ্রা।

আর এক মুহূর্ত দেরী করে না শিপ্রা। যেন একটা উতলা আক্রোশের আবেগে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যায়।

—শুনছো! ডাক দেয় শিপ্রা। গেটের কাছে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অরুণ রায়। কামিজের কাঁধের কাছে একটা ফুটো, আর আস্তিনের একটা জায়গা ছেঁড়া, অরুণ রায়।

এগিয়ে যায় শিপ্রা, আর, যেন এই চার বছরের সব আক্রোশের ও ঘৃণার একটা ভয়ানক পরাজয়ের বেদনায় ছটফট করে উঠে আস্তে আস্তে বলে—চলে যাচ্ছ কেন?

আশ্চর্য হয়ে শিপ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অরুণ রায়। শিপ্রা ডাকে—এস।

অরুণ—কিন্তু, তুমি যে কোথায় যাবে বলে তৈরি হয়েছ।

কটমট করে তাকায় শিপ্রা—কে বললে? নীতু?

অরুণ রায়—হ্যাঁ।

শিপ্রা—তাই কেঁদে ফেলেছো।

চমকে ওঠে অরুণ। মুখ ফিরিয়ে নেয়।

শিপ্রা বলে—ছিঃ।

নীহার মজুমদারের গাড়ি উতলা হয়ে ছুটে এসে গেটের কাছে থামে আর উল্লাসের হর্ণ বাজাতে থাকে।

অরুণ রায়ের একটা হাত ধরে ব্যস্তভাবে টান দেয় শিপ্রা।—ঘরে চল।

—তুমি? প্রশ্ন করে শিপ্রার মুখের দিকে তাকায় অরুণ।

হেসে ফেলে শিপ্রা।—আমি আবার কি? আমি শিপ্রা।

অরুণ—কিন্তু...

শিপ্রা—কোন কিন্তু নেই। আমি কোথাও যাচ্ছি না। কোন দিন যাবও না। বেশি আশ্চর্য হয়ে তাকিও না।

অব্যায়ামেষু

ঘুম থেকে উঠে একবার, আর স্কুল থেকে ফিরে এসে একবার, রোজই দিনে দু'বার ব্যায়াম চর্চা করে হাবুল। ডন আর বৈঠক, বৈঠক আর ডন।

পরেশবাবু নিজেই ছেলেকে উৎসাহিত করেছিলেন—এ ছাড়া পার্কের চারদিকে অন্তত দু-চক্কর দৌড়ে আসবি হাবুল। দৌড় প্র্যাকটিস করলে শরীরের খুব উপকার হয়। দম বাড়ে, খিদেও বাড়ে, হজম হয় ভালো।

শুধু ডন আর বৈঠকের কৃপাতেই হাবুলের শরীরের অনেক উপকার হয়েছে। যেমন খিদে, তেমনি হজম। গত বছরের তুলনায় এই বছরে প্রতি মাসে দশ সের বেশি আটা আনতে হয়েছে। আগে ছোলা আনা হতো মাসে এক সের। এখন আনতে হয় ছ'সের।

হাবুলের মা বলেন—শুধু পিণ্ডি পিণ্ডি রুটি আর ছোলা খাবে, এই জন্যেই কি কসরৎ?

পরেশবাবু বলেন—খাক না, ছেলেটার স্বাস্থ্যটা তো দিন দিন ভালো হয়ে উঠছে।

সেই পরেশবাবুই সেদিন অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের ভিতর চুপ করে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—বারান্দার ওদিকে ওরকম বিশ্রী ভোঁস ভোঁস করছিস কে রে?

হাবুল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আমি, আমি এক্সারসাইজ করছি বাবা।

—তা এতক্ষণ ধরে কেন?

—তুমিই যে বলেছিলে বাবা। আজকাল ডন পঞ্চাশটা আর বৈঠক একশোটা বাড়িয়েছি।

—না না, আর বাড়াতে হবে না। বরং একটু কম কর।

—আচ্ছা বাবা!

—তাছাড়া, পার্কে গিয়ে আর দৌড়াদৌড়ি করিস না।

হাবুলের মা শুনতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যান। আর এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন—কি হলো? আজ হঠাৎ ছেলেটার কসরৎ দেখে রাগ করছ যে?

খেঁকিয়ে ওঠেন পরেশবাবু—পনের টাকা মাইনে কমেছে যে। অফিসের প্রত্যেকের মাইনে শতকরা বিশ কাট হয়েছে।

হাবুলও পরেশবাবুর কথামত ডন-বৈঠক কমিয়ে দেয় ঠিকই। সারাদিনের মধ্যে মোট ত্রিশটা ডন আর পঞ্চাশটা বৈঠক।

পরেশবাবু বলেন—ব্যস্, এই ঢের। এর চেয়ে বেশি দরকার নেই।

কিন্তু তবু দেখা যায়, হাবুলের খোরাক এক ছটাকও কমে না। রুটির স্তূপের দিকে তাকিয়ে হাবুল বলে—আরও অন্তত চার-পাঁচটা বেশি না হলে পেটে পোষাচ্ছে না মা।

পরেশবাবু বলেন—কেন রে? ডন-বৈঠক তো কমিয়ে দিয়েছিস, তবু তোর খোরাক যে বেড়েই চলেছে।

হাবুল—ডন-বৈঠক কমিয়েছি কিন্তু মুগুর আর ডাম্বেল ধরেছি যে।

—অ্যাঁ? চমকে ওঠেন পরেশবাবু। তারপরই গম্ভীর হয়ে বলেন, মুগুর আর ডাম্বেল পেলি কোত্থেকে?

—মানিকদা এক মাসের জন্য ধার দিয়েছেন।

কিন্তু এক মাসও পার হয়নি। সেদিন অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের ভিতরে মেঝের উপর অসাড় হয়ে শুয়ে রইলেন পরেশবাবু।

বারান্দার ওদিকে ভোঁস ভোঁস শব্দ শুনেই এক লাফ দিয়ে উঠলেন। তারপর ছুটে গিয়ে হাবুলের হাত থেকে একটা মুগুর কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—আজ তোরই দফা রফা করে দেব!

হাবুল আশ্চর্য হয়ে তাকায়। ভয়ে ছুটে আসেন হাবুলের মা—কি হলো?

পরেশবাবু বলেন—ওকে তুমিই একটু বুঝিয়ে দাও।

হাবুলের মা—কি বুঝিয়ে দিতে বলছ?

পরেশবাবু—এক্সারসাইজ করতে নেই। শরীরের হাড়মাসগুলোকে অসভ্য করে তুলে কোন লাভ নেই। এক্সারসাইজ করলে মানুষ রাক্ষস হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলেন পরেশবাবু। হাবুলের মা বলেন—এইবার আসল কথাটি বলো তো, কি হয়েছে?

—ছাঁটাই-এর লিস্টে নাম চড়েছে। পরেশবাবু করুণস্বরে বিড়বিড় করেন।

তিলোত্তমা

ছাত্রীদের এই হোস্টেলে দুজন টিচারও থাকেন। মানসীদি আর মুগ্ধাদি। মানসীদি দেখতে যেমন সুন্দর, মুগ্ধাদি তেমনি আবার দেখতে একেবারে...অর্থাৎ মুগ্ধাদির সে মুখের দিকে তাকালে কেউ মুগ্ধ হবে না।

মানসীদির এখনও বিয়ে হয়নি, মুগ্ধাদিরও হয়নি। তবে একটা সত্য হোস্টেলের মেয়েরা এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে। পৃথিবীর কোন একটি মনের ভিতর একটি জায়গা তৈরি হয়েই

গিয়েছে, যেখান থেকে মালা-চন্দন আর শঙ্খের ডাক মানসীদিকে বার বার ডাকছে। আর, মুগ্ধাদি তাঁর নিজের মনের ভিতরে আলপনা এঁকে একটা জায়গা তৈরি করে রেখেছেন, পৃথিবীর কোন একজনকে বার বার ডাকছেন।

মানসীদিকে কেউ একজন ডাকছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ একই জায়গা থেকে মানসীদির কাছে একই রকমের নীল রঙের খামের চিঠি আসে, চিঠির গায়ে হাতের লেখাটা একই জনের। কিন্তু কী আশ্চর্য, মানসীদিকে আজ পর্যন্ত সেই এতগুলি চিঠির একটিও উত্তর দিতে দেখা গেল না। দিলে নিশ্চয়ই এতদিনে অন্তত পূরবী আর অনুপা বুঝেই ফেলত। বড় প্রখর ওদের দুজনের চোখ।

আর, কোন সন্দেহ নেই যে, মুগ্ধাদি কোন একজনকে চিঠি লিখে বার বার ডাকছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, মুগ্ধাদির লেখা সেই এতগুলি চিঠির একটিও উত্তর আজ পর্যন্ত এলো না। মালতী আর অণিমার কান বড় প্রখর। ওরা মুগ্ধাদির ঘরের দরজার কাছ দিয়ে যেতে যেতে এক-এক সময় শুনে ফেলে, মুগ্ধাদি বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ঠিকই, মুগ্ধাদির ঘরের ভিতরে ঢুকে অণিমা আর মালতী দেখতে পায়, স্যাঁতসেঁতে চোখ নিয়ে বসে আছেন মুগ্ধাদি আর একটি চিঠি লিখে প্রায় শেষ করে এনেছেন।

মানসীদির চিঠি আসে, কোন উত্তর দেন না মানসীদি এবং উত্তর দেন না বলে মনে বোধহয় বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। সব সময়েই হাসি-হাসি মুখ। এমনকি, এরকম ব্যাপারও দেখা গিয়েছে যে চিঠি আসা মাত্র পড়ে ফেললেন, আর পড়া শেষ হওয়া মাত্র চিঠিটাকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ডাকতে থাকলেন—তোমরা এসো অলকা, হিমানী, অনুপা আর...আর যার ইচ্ছে, সবাই এসো। আজ মেঘের ছবি আঁকতে হবে।

হোস্টেলেই ছবি আঁকার একটা ক্লাস করেন মানসীদি। এটা একটা শখের ক্লাস। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নীহারদি বলেছেন—এই ভালো, ছুটির দিনে বাইরে গিয়ে পিকনিকের ওসব হুল্লোড় ভালো নয়।

মানসীদিকে বেশ ভালো লাগে মেয়েদের। মানসীদি আসার পর থেকে এই একটা বড় লাভ হয়েছে যে, ঘরের জানালা খুলে বাইরের আকাশের দিকে একবার উঁকি দেবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নইলে নীহারদির শাসন এতদিনে জানালাগুলিতে একেবারে মাকড়সার ঝুল ঝুলিয়ে ছাড়ত। মানসীদি নিজে ছবি আঁকতে জানেন, ছবি আঁকা শেখাতেও জানেন, মেয়েরাও ছবি আঁকা শিখতে খুব উৎসাহিত। মানসীদির চেষ্টায় নীহারদির শাসনের শক্ত নিয়ম একটু নরম হয়েছে। ছবি আঁকার জন্য আকাশের দিকে আর গাছপালার দিকে একটু তাকাতে হয়, নইলে ছবি আঁকা শিখবে কেমন করে? মানসীদির যুক্তিটাকে অল্প বিশ্বাস করেও নীহারদি জানালা খুলতে অনুমতি দিয়েছেন। মানসীদি আসার আগে মাঝরাতের ঘুমন্ত আকাশের চাঁদও দেখবার উপায় ছিল না। মেয়েরা জেগে থাকলেও জানালাবন্ধ ঘরে শুধু অন্ধকার দেখত।

মুগ্ধাদিকেও মেয়েরা পছন্দ করে বৈ কি! মুগ্ধাদি আসার পর থেকে হোস্টেলের ভিতরের বাতাসে গানের সুরের শিহর জেগেছে। নীহারদির শাসনের শক্ত নিয়মে সিনেমা বা থিয়েটার দেখবার কোনো সুযোগ নেই। ভক্তের কীর্তন গান হোক বা অমুক গুণীর গানই হোক, হোস্টেলের বাইরে গিয়ে ওসব শোনাশুনির হুল্লোড়ের মধ্যে মেয়েদের যেতে দেওয়া হয় না।

কিন্তু মুগ্ধাদি অনেক বুঝিয়ে নীহারদিকে রাজি করিয়ে মেয়েদের অন্তত এই উপকারটুকু করেছেন যে, এখন হোস্টেলের মধ্যেই সপ্তাহের একটি দিনে মেয়েরা নিজেরাই গলা ছাড়বার সুযোগ পায়। গানের একটা ক্লাস করেন মুগ্ধাদি। হোস্টেলের ভিতরে যখন, তখন সপ্তাহে একটি দিন একটু সুরের হুল্লোড় না হয় হোক। অনুমতি দিয়েছেন নীহারদি।

নীহারদির শাসনের শক্ত নিয়মগুলি নরম হয়েছে, ছবির রঙ আর গানের সুর লেগেছে হোস্টেলের জীবনে। মানসীদি আর মুগ্ধাদিকে খুব ভালোও লেগেছে, তাই অণিমা মালতী অলকা পারুল পূরবী অনুপা আর সুলেখারাও ভালোই থাকে। ভালো লাগে না শুধু ওদের মনের ঐ দুটি খটকা। চিঠি আসে মানসীদির। কিন্তু সেই চিঠিকে এত অবহেলা কেন? চুলের তেলচিটে ফিতেটাকে এক-এক সময় যেমন হঠাৎ হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে একটা দলা করে নিয়ে তাকের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেন মানসীদি, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে ঐ চিঠিকেও মাঝে মাঝে ঐভাবে এখানে ওখানে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কেউ একজন ডাকছে, কিন্তু সেই ডাক শুনতে বোধহয় ভালো লাগে না মানসীদির। চিঠিগুলির শেষ পর্যন্ত কি দশা হয় কে জানে? হয়তো রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ করে আর একবার পড়েন, তারপর কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেন। চিঠিগুলিকে অবহেলা করতে একটুও দুঃখ বোধ করেন না মানসীদি। মনে হয়, অবহেলা করেই সুখ পাচ্ছেন। তা না হলে, সব সময় এত হাসবেন কেন?

মানসীদির দুর্বোধ্য হাসিটাকেও একটা সমস্যার মতো মনে হয়. কিন্তু ওটা হাসি বলেই মেয়েদের চোখে সহজে সহ্যও হয়ে যায়। মালতী আর অণিমা, কিংবা কেতকী আর অনুপা সেই হাসি দেখে মুখ কালো করে তাকায় না। ওদের মনের খটকা মনের ভিতরে শুধু কতকগুলি আবছা ধারণাকে নিয়ে খেলা করে, স্পষ্ট করে কিছু বুঝে উঠতে দেয় না।

কিন্তু মুগ্ধাদির ঐ স্যাঁতসেঁতে চোখ দেখলে আর ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে ভাবতেই হয়। অলকা ভাবে, হিমানী ভাবে. পূরবী কিছু ভাবতেই না পেরে শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

খুবই দুঃখের কথা মুগ্ধাদিকে আজ পর্যন্ত হাসতে দেখা গেল না। মুগ্ধাদির ছোট কপালের দুপাশটা কেমন উঁচু উঁচু, নাকের সামনের দিকটা বেশ একটু চাপা, তা ছাড়া মুগ্ধাদির গায়ের রঙটা বেশ একটু কালো। কথা বললে বোঝা যায়, দাঁতগুলিও বেশ বড় বড়। মুগ্ধাদিকে মেয়েরা ভালোবাসে, তাই ওরা মুগ্ধাদির চেহারা নিয়ে আলোচনা করবার সময় শুধু বলে মুগ্ধাদি দেখতে ভালো নয়। ভালোবাসে বলেই হয় তো মুগ্ধাদিকে কুৎসিত বলতে পারে না।

মনে হয়, মুগ্ধাদি তাঁর ঐ দেখতে ভালো নয় চেহারাটাকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। ঐ তো চেহারা, তবু মনের এক জায়গায় আলপনা এঁকে ফেলেছেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে পারছেন, ঐ আলপনা-আঁকা স্থানটিতে তাঁর চিঠির মানুষ কোনদিনও আসবেন না। বার বার ডাকছেন কিন্তু বার-বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সেই ডাক।

চিঠি লেখা শেষ করার পর সেই স্যাঁতসেঁতে চোখ নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন মুগ্ধাদি। হঠাৎ উঠে দাঁড়ান, ঘরের বাইরে এসে ডাক দেন—অণিমা, পারুল, পূরবী তোমরা কোথায় আছ? গানের ক্লাসে এসো।

গানের ক্লাসে এসে যখন গাইতে থাকেন মুগ্ধাদি তখন মনে হয় যেন তাঁর স্যাঁতসেঁতে চোখ দুটোকে তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কী মিষ্টি সেই সান্ত্বনার সুর! এমনিতে অন্যসময় মুখটাকে কেমন জড়োসড়ো করে রাখেন মুগ্ধাদি। কিন্তু গান গাইবার সময় চেহারার কথা বোধহয় ভুলে যান। দাঁতগুলি আরও বড় দেখায়, মুখটা কাঁপে আর বেঁকে যায়। দেখতে আরও বেশ একটু মোটেই ভালো নয় হয়ে যান মুগ্ধাদি।

মানসীদির হাসির আর মুগ্ধাদির স্যাঁতসেঁতে চোখের রহস্য স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। এই দুই রহস্যের মধ্যে যেন দু'টি ভিন্ন ধরনের সমস্যার ছায়া লুকিয়ে রয়েছে, এই মাত্র বুঝতে পারে মেয়েরা। কিন্তু বুঝলেও এই সব ব্যাপারে ওদের আর বলবার কি আছে? ওরা শুধু চায় যে মানসীদি যেন চিঠির উত্তর দেন, আর মুগ্ধাদির চিঠির উত্তর যেন আসে।

মানসীদি মাঝে মাঝে তাঁর মুখের সব সময়ের হাসিটা একটু কম করে নিয়ে আনমনা হয়ে একটু ভাবেন, আর ভাবতে গিয়ে মানসীদির চোখে যেন সামান্য একটু বাষ্পের ছায়া

দেখা দেয়। তা হলেও মানসীদিব সুন্দর মুখটা আরও ভালো দেখায। সব সময় হাসি হাসি মুখ দেখতেও তো একঘেয়ে লাগে।

মুগ্ধাদির কথা ভাবতে গিয়ে, এবং এক-এক সময়ে আড়ালে দল পাকিয়ে বসে আলোচনা করতে গিয়েও মালতী অণিমা হিমানী আর পারুলেরা ভাবে, মুগ্ধাদি কি সত্যিই কোনদিন একটুও হাসবেন না? সব সময় এত গম্ভীর হয়ে, বিষণ্ণ হয়ে আর স্যাঁতসেঁতে চোখ নিয়ে পড়ে থাকেন কেন মুগ্ধাদি? একে তো মোটেই দেখতে ভালো নন, তার উপর এত গম্ভীর। মনে হয়, মুগ্ধাদি যদি একটু হাসতেন, তবে নিশ্চয় মুগ্ধাদিকে একটু ভালোই দেখাত। সব সময় মুগ্ধাদির শুকনো মুখটা দেখতেও যে একঘেয়ে লাগে।

অন্তত দুটো জিনিস যদি দু'জনে ভাগাভাগি করে নিতেন, তবে বড ভালো হতো। মানসীদির এত বেশি হাসির কিছুটা যদি মুগ্ধাদি পেতেন, আর মুগ্ধাদির অত বেশি বিষণ্ণতার কিছুটা যদি মানসীদি নিতেন, তা হলে অন্তত এই হোস্টেলের এতগুলি মেয়ের চোখের ইচ্ছা মিটে যেত।

মানসীদি আর মুগ্ধাদি দুজনে যখন আলাপ করেন তখন সেই আলাপ শুনতে বেশ লাগে কিন্তু পারুল আর পূরবী আব অণিমারা শুনে খুব বেশি খুশি হয় না।

মানসীদি হেসে বলেন—আমি যদি তোমার মতো এরকম মিষ্টি গলা পেতাম, মুগ্ধা!

মুগ্ধাদি সেই রকম শুকনো মুখ নিয়ে বলেন—আমি যদি তোমার মতো অমন সুন্দর ছবি আঁকার হাত পেতাম, মানসী!

কিন্তু সত্যিই দুজনে যদি দুজনের ঐ বিশেষ দুটি সুন্দর গুণ পেয়েই যেতেন তবেই কি দুজনে সমান হয়ে উঠতেন? পারুল হিমানী আর অনুপা ভাবে—ওভাবে নয়, ওতে কিছু হবে না। মানসীদির মুখটা বড় বেশি সুন্দর। মানসীদির নাক মুখ চোখ আর রঙের ঐশ্বর্য থেকে কিছুটা তুলে নিয়ে যদি মুগ্ধাদির মুখে...

অলকা আর মালতী প্রতিবাদ করে বলে—তা নয়, মুগ্ধাদির ঐ কালো মুখের কিছুটা রঙ ও গড়ন যদি তুলে নিয়ে মানসীদির মুখে...তা হলে মন্দ হতো কি?

তা হলে একজনের মুখটা এত বেশি ভালো এবং আর একজনের মুখটা এত বেশি কম-ভালো দেখাত না। তা হলে মোটামুটি বেশ ভালোই দেখাত দুজনকে। সত্যি, রূপের দিক দিয়ে একজন বড় বেশি পেয়ে গিয়েছেন এবং আর একজন বড় কম পেয়েছেন। অবিচার বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে ভগবানের যদি একটু সুবিচার থাকত তবে সমস্যাটা মিটে যেত বোধহয়।

পারুল বলে—বল হিমানী, তা হলে সমস্যা মিটে যেত কি না?

হিমানী—নিশ্চয়।

অর্থাৎ, তা হলে নিশ্চয় মানসীদি ঐসব চিঠির উত্তর দিতেন, আর মুগ্ধাদির চিঠির উত্তর আসত।

মানসীদি আর মুগ্ধাদির জীবনের সমস্যাটা যে দুটো ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে, একটা পার্থক্য আছে, সেটা তো বুঝতেই পারা যায়। একজনের মুখে অবহেলার হাসি, এবং আর-একজনের চোখে আবেদনের অশ্রুসিক্ততা। কিন্তু কল্পনা করা যায়, দুই সমস্যা একই রকমের। মানসীদির মনকে ডেকে ডেকেও কাছে পাচ্ছেন না একজন। চিঠির ওপারে নিশ্চয় একটা বিষণ্ণ মুখ আর একজোড়া স্যাঁতসেঁতে চোখ রয়েছে। সেই মানুষ বোধহয় মুগ্ধাদির মতো তাঁর চিঠির সাড়া না পেয়ে অনেক দীর্ঘশ্বাস সহ্য করছেন।

আর, মুগ্ধাদি তাঁর ভেজা চোখ, শুকনো মুখ আর অনেক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যাঁকে ডাকছেন, তিনি নিশ্চয় অবহেলার হাসি হাসছেন, ঠিক মানসীদির মতো। মুগ্ধাদির ডাক তিনি শুনতে চাইছেন না। মুগ্ধাদির চিঠি পাওয়া মাত্র বোধহয় কুচি কুচি করে ছিঁড়েও ফেলে দিচ্ছেন।

মানসীদির বোধহয় মনে পড়ে যায় সেই মানুষটার মুখ, নিশ্চয় ভালো লাগে না সেই মুখকে। মানসীদির মতো সুন্দর মুখকে জীবনের মালাচন্দন দিয়ে সাজাবার জন্য কাছে পেতে হলে বেশ সুন্দর একটি মুখ থাকা চাই। সেই রকম মানুষ হওয়া চাই। কিন্তু মানসীদিকে যিনি চিঠি লেখেন, তিনি সেই রকম রূপের মানুষ নিশ্চয় নন। হলে, মানসীদি সেই মানুষের চিঠির আবেদন এত তুচ্ছ করতে পারতেন কি?

মুগ্ধাদির প্রাণ যাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য ছটফট করে ডাকছে, তাঁর কাছে মুগ্ধাদি বোধহয় একটি বিশ্রীরকম নারী মাত্র। মুগ্ধাদির মুখটা যদি একটু সুন্দর হতো, তা হলে কি সেই মানুষ মুগ্ধাদির এতগুলি চিঠির একটিতেও মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারতেন?

এইটুকু পর্যন্ত বুঝে নিয়ে তারপর পূরবী হিমানী ও অনুপা আর কিছু বুঝতে পারে না।

এইভাবেই চলছে। প্রতি সপ্তাহে একবার ছবির ক্লাস এবং একবার গানের ক্লাসে মানসীদি আর মুগ্ধাদি সেই একঘেয়ে মুখের ভাব নিয়ে আসেন আর চলে যান। একজনের মুখের একঘেয়ে হাসি, এবং আর একজনের চোখের একঘেয়ে স্যাঁতসেঁতে বিষাদ।

কিন্তু এর পর, ঠিক প্রথম কবে এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হয়ে গেল, সেটা জানতেই পারেনি পারুল আর অণিমা আর হিমানীরা। যেদিন দেখল, সেদিন দেখে কিছু বুঝতে না পেরে ওদের মনের খটকা আর-একটু জটিল হয়ে গেল।

মানসীদির মুখের সেই সদাচঞ্চল অবহেলার হাসি একটু কমে গিয়েছে। ছবি আঁকতে আঁকতে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবেন মানসীদি। চোখ দুটোও কেমন হয়ে ওঠে, যেন হঠাৎ একটা দূরের মেঘের ছায়া পড়েছে সেই চোখে।

আর, মুগ্ধাদির শুকনো মুখ আরও শুকনো হয়ে গিয়েছে। চোখ দুটো যেন সবসময় ধোঁয়ার জ্বালা লেগে জ্বলছে। মুগ্ধাদিকে এমন দেখলে এই কথাই মনে হয়, জীবনে কোনদিন যে ঐ মুখে আবার হাসি ফুটে উঠবে এমন আশা নেই। সব আশার শেষ করে দিয়েছেন মুগ্ধাদি, যেন অবহেলা পাওয়ার জন্যেও আশা করার অধিকার ফুরিয়ে গিয়েছে চিরকালের মতো।

কবে থেকে দুজনের মুখের চেহারার সেই একঘেয়ে নিয়ম বদলে গিয়েছে, সেটা ঠিক ঘটনার দিন থেকে দেখতে জানতে ও বুঝতে পারেনি পারুল, হিমানী আর অলকারা।

—এখনো বসে বসে কি করছ মুগ্ধা? বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে মুগ্ধার ঘরে ঢুকল মানসী। সবেমাত্র মানসীর যে চিঠিটা এসেছে, সেই চিঠিটা অবহেলার সঙ্গে হাতে ধরে রেখেছে মানসী।

প্রাণ ঢেলে দিয়ে এতক্ষণ ধরে যে চিঠিটা লিখেছিল মুগ্ধা, সেই চিঠিটাকে হঠাৎ হাত দিয়ে ঢেকে মুগ্ধা বলে—একটা চিঠি লিখছি।

মানসী মুখ টিপে হাসে—তুমি চিঠি লেখ নাকি?

মুগ্ধা বলে—হ্যাঁ ভাই, লিখি।

মানসী যেন ধমক দিয়ে হাসতে থাকে—লিখবে না কখখনো।

মুগ্ধা—না লিখে পারি না ভাই।

মানসী চোখ বড় করে বলে—এতদূর গড়িয়েছে। তাই বলো।

হঠাৎ চমকে ওঠে মুগ্ধার দুই চোখ, মানসীর হাতের চিঠিটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। যেন একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছে মুগ্ধা, এবং দেখতে পাচ্ছে—কত পরিচিত সেই হাতের লেখা ফুটে রয়েছে এই শূন্যতারই মধ্যে একটি খামের গায়ে। ঐ হাতের লেখার একটি চিঠি মুগ্ধার কাছে শেষ বারের মতো এসে কবেই আসা বন্ধ করে দিয়েছে। আর আসে না। তবু সেই হাতের লেখা চিঠির আসার আশা না ছেড়ে দিয়ে আজও তারই

কাছে চিঠি লিখেছে মুগ্ধা।

হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, সেই হাতেরই লেখা চিঠি এসেছে। স্তব্ধ দুটি চক্ষু নিয়ে দেখছে মুগ্ধা। তবে পার্থক্য এই যে, চিঠিটা তার নয়, চিঠিটা হলো মানসীর। খামের গায়ে কত স্পষ্ট করে আর কত যত্ন করে সেই হাতেরই লেখায় মানসীর নামটা লেখা রয়েছে।

মানসী বলে—আমাকে খুব সন্দেহ করে নিচ্ছ মুগ্ধা, না?

মুগ্ধা উদাসভাবে তাকিয়ে বলে—না ভাই, তোমাকে সন্দেহ করব কেন?

মানসী হাসে—তোমার বোধহয় সন্দেহ হচ্ছে যে, আমিও চিঠি লিখি।

মুগ্ধাদির শুকনো চোখ একটু বিস্মিত হয়—চিঠি লেখ না তুমি?

মানসী অবহেলার হাসি হেসে বলে—কখখনো না।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে মানসী। তারপর বলে—এ এক মহা উৎপাত হয়ে উঠছে। আমার মনে কোন ইচ্ছা নেই, তবু তিনি মন-প্রাণ ঢেলে লিখেই চলেছেন।

দেখতে পায় মুগ্ধা, চিঠিটাকে চিমটি দিয়ে অবহেলার ভঙ্গিতে ধরে রয়েছে মানসী, যেন সত্যিই একটা অস্পৃশ্য বস্তু।

মুগ্ধার হাত যে চিঠিকে রত্ন বলে মনে করে হাতে তুলে নিতে চায়, সেই চিঠিকে বোধহয় ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিতে চলেছে মানসী। জানে না মানসী, কল্পনাও করতে পারবে না রূপের সৌভাগ্যের সুন্দর এই মেয়ে, মন-প্রাণ ঢেলে লেখা চিঠির অপমান হলে মন কেমন পুড়ে যায়।

হেমন্তের হাতের লেখা চিনতে পৃথিবীর আর যারই ভুল হোক, মুগ্ধার চোখে ভুল হতে পারে না। ঐ হাতের লেখাতেই যে জীবনে প্রথম ভালোবাসার আশ্বাস এসেছিল মুগ্ধার জীবনে। মুগ্ধার কালো কুৎসিত মুখটাকে দুর্লভ সম্মানে হাসিয়ে দিয়েছিল জীবনের সেই মানুষটি, সেই হেমন্তের মুখের একটি কথা আর হাতের লেখা কয়েকটি কথা।

কিন্তু তারপর কেমন করে আর কেন জীবনের সেই আশ্বাস লুকিয়ে পড়ল হঠাৎ, বুঝতে পারেনি মুগ্ধা। কিন্তু আজ এতদিন পরে সেই না-বোঝা রহস্যকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মুগ্ধা। মুগ্ধার কুৎসিত মুখটাকে হয়তো এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে দেখে হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে...কিংবা এক সুস্বপ্নের মধ্যে মানসীর সুন্দর মুখটা হঠাৎ দেখতে পেয়ে সেই মানুষের জীবনের আহ্বান পথ বদল করে ফেলেছে। কবে হেমন্তের সঙ্গে মানসীর প্রথম দেখা হলো?

আর এই প্রশ্ন নিয়ে মনটাকে মাতিয়ে কাঁদিয়ে কোন লাভ নেই। হেমন্ত তার জীবনের স্বপ্ন খুঁজতে গিয়ে মানসীকে দেখে ফেলেছে আর ডাকছে মানসীকেই। হেমন্তের ওই সুন্দর স্বপ্নের জগতে একেবারে অবান্তর হয়ে গিয়েছে কুৎসিত মুখের মেয়ে মুগ্ধা। তবে আর কেন? হাতের আড়ালে লুকানো এই চিঠিটাকে এবার মানসীর চোখের সামনে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে দিয়ে এখনি মুক্ত হয়ে গেলেই তো পারে মুগ্ধা।

মানসীর সুন্দর মুখের জন্য আজ স্বপ্ন দেখছে হেমন্ত। কিন্তু মানসী তুচ্ছতার হাসি দিয়ে হেমন্তের সেই স্বপ্নকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ছে। বেশ হয়েছে। হেমন্তর মন-ঢেলে লেখা চিঠির অপমান দেখে এই মুহূর্তে ইচ্ছা করলেই হেসে উঠতে পারে মুগ্ধা।

কিন্তু কি আশ্চর্য, হেসে উঠতে ইচ্ছা করে না। মানসীকে ভালোবেসেছে হেমন্ত। খুব সুন্দর মেয়ের কাছে প্রেম আশা করছে এমন একজন, যে এমন কিছু সুন্দর নয়। মুগ্ধার কপালে যে অভিশাপের কামড় পড়েছে, সেই অভিশাপের কামড় পড়েছে হেমন্তর কপালে।

হেসে নিলেই তো পারে মুগ্ধা। কিন্তু হাসতে পারে না। মানসীর হাতের ঘৃণায় আধমরা হয়ে রয়েছে হেমন্তর চিঠিটা, দেখতে দেখতে মুগ্ধার চোখ দুটো যেন ধোঁয়ার জ্বালা লেগে ছলছল করে ওঠে। মানসীর মনটা কি সত্যিই কতকগুলি হাসির পাথর দিয়ে তৈরি, নিরেট আর নির্মম, সামান্য একটু বেনার দাগও লাগে না!

হঠাৎ বলে ওঠে মুগ্ধা—চিঠির উত্তর একটা দিতে দোষ কি মানসী?

মানসী হাসে—কি ছাই উত্তর দেব? যে চিঠির কোন দরকার নেই, সেই চিঠিকে...।

মুগ্ধা—অন্তত এইটুকু তো লিখতে পার যে, চিঠি চাই না, আর কখনো চিঠি লিখবেন না।

মানসী হেসে ওঠে—তা পারি।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে আরও কালো হয়ে যায় মুগ্ধার কালো মুখ। মুগ্ধা বিচলিতভাবে বলে—না, না, এত কঠিন করে না লিখলেই ভালো হয় মানসী।

মানসী বলে—কিন্তু লিখলে এছাড়া আর কি ছাই লিখব বলো? আমার মনের মধ্যে কিছু নেই যখন, তখন কেন স্পষ্ট কথা ছাড়া...।

মানসীর কথা থামবার আগেই আবার ভয় পেযে চমকে ওঠে মুগ্ধা, বোধহয় শুনতে পায় না, শেষ পর্যন্ত কি বললো মানসী।

কী ভয়ানক হাসির পাথর হয়ে রয়েছে মানসী! হেমন্তর মনের বেদনা কল্পনাও করতে পারে না। যদি দেখতে পেত মানসী, যদি মানসীকে এই মুহূর্তে মুগ্ধা তার বুকের ভিতরটা দেখিয়ে দিয়ে বলতে পারত, এই দেখ মানসী, যে মানুষটা ঘৃণা করে আমার ভেতরটা পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেই মানুষেরই বুকের ভেতরটা তুমিও ঠিক এমনিতর পুড়িয়ে কয়লা করে দিচ্ছ।

সেই গোপনের ইতিহাস চিরকালের মতো গোপনেই থেকে যাক। মানসী কোনদিনই জানতে পারবে না, ঐ হেমন্তই মুগ্ধাকে একদিন ঐরকমের নীলরঙের খামের চিঠিতে ভালোবাসার আশ্বাস জানিয়েছিল। এই একটি কথা মানসীকে বলে দিলেই তো এই মুহূর্তে মানসী ঘেন্না করে হেমন্তর চিঠির কোন উত্তর দেবে না কোনকালে। পুড়ে পুড়ে আরও কয়লা হয়ে যাবে লোকটার বড় স্বপ্নধরা মন। কিন্তু ছি, সে কি করে হয়!

সে তো হতেই পারে না, বরং মানসীকে দিয়ে একটি ছোট আশ্বাসের কথা কি লেখানো যেতে পারে না সেই মানুষটির কাছে? মানসীকে কি বোঝানো যায় না যে, মুখের রঙের দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার বিচার করতে নেই।

মানসী কল্পনা না করতে পারুক, মুগ্ধা যেন দেখতে পাচ্ছে, মানসীকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে মানুষটার প্রাণ দিন-রাত কেমন করে পুড়ছে।

চুপ করে আরও কিছুক্ষণ কি-যেন ভেবে নেয় মুগ্ধা। হাসির পাথর দিয়ে তৈরি মানসীর মনটাকে কি কোন উত্তাপ দিয়ে নরম করা যায় না?

হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় মুগ্ধা। অসমাপ্ত চিঠিটাকে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে আর বই দিয়ে চেপে রেখে ঘরের বাইরে চলে যায় মুগ্ধা—তুমি একটু বসো মানসী, আমি এখনি আসছি।

ঐ ছোট ঘরে, এই দুপুরের উত্তাপের মধ্যে যে ঘরের জানালার গায়ে বাইরের জামরুলের স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে, সেই ছোট ঘরের ভিতরে ঢুকে একবার এসরাজটা হাতে তুলে নিতে ইচ্ছা করে মুগ্ধার। কিন্তু থাক, নীহারদি আবার কি মনে করবেন। ভাবতে ভালোই লাগছে, পথ-চাওয়া জীবনটা প্রতীক্ষার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেল হঠাৎ। মানসীর হাতে হেমন্তর চিঠি দেখতে পেয়ে ভালোই হলো। শুকনো আর কুৎসিত মুখের মধ্যে তেমনি বিশ্রী স্যাঁতসেঁতে চোখ দুটো এতদিনে সব কৌতূহলের ব্রত সাঙ্গ করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এ আবার কি হলো? মনটা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয় না কেন? কেন বার বার মনে পড়ে মুগ্ধার—তারই মনের জ্বালার মতো একটা জ্বালায় পুড়ছে হেমন্তর মন। সেই হেমন্ত, যে-মানুষ জীবনে প্রথম ভালোবাসার চক্ষু নিয়ে তাকিয়েছিল মুগ্ধার কুৎসিত মুখের দিকে।

বোধহয় ঠিক হেমন্তর জন্য নয়, হেমন্তর বুকের হতাশার জ্বালাটারই জন্য বড় বেশি মায়া ছটফট করছে, মুগ্ধার মনের ভিতরে। সুন্দর মুখের মানসী বড় নিষ্ঠুর হয়ে হেমন্তর বুক

ভাঙছে। একটু কৌশল, একটু মনের জোর যেন আজ প্রাণপণে পেতে চাইছে মুগ্ধা, যেটুকু পেলে হেমন্তকে বুক ভেঙে যাবার বেদনা থেকে বাঁচাতে পারবে। একটু শক্তি খুঁজছে মুগ্ধা, যেন চোখে এক ফোঁটাও জল দেখা না দেয়। মানসীর কঠিন মনটাকে যদি ভালোবাসার ভাষা দিয়ে একটু ভাবিয়ে নিয়ে বেদনা দিতে পারা যায়, তবে হয়তো মিথ্যে হয়ে যাবে না হেমন্তর স্বপ্ন।

ভালোবাসার বদলে যদি ঘৃণা পায় মানুষ, তবে মানুষের মনের বেদনা কত দুঃসহ হতে পারে, তারই পরিচয় একবার জেনে নিক মানসী। মুগ্ধার ঐ চিঠির মধ্যেই ছত্রে ছত্রে সেই বেদনার জ্বালা যে পুড়ছে। মানসী কি হাতের কাছে সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দেবে, একবার পড়ে নেবে না মুগ্ধার ঐ চিঠির বুকের ভাষা? এমন শান্ত কৌতূহলের মেয়ে তো নয় মানসী।

মুগ্ধার ধারণা মিথ্যা নয়, এবং মুগ্ধার কৌশলও মিথ্যা হয়ে গেল না। মুগ্ধা ঘরের বাইরে চলে যাওয়া মাত্র, ঝিক করে হেসে ওঠে মানসীর চোখ। মুগ্ধার বইচাপা চিঠিটা চোরের মতো খপ করে হাতে তুলে নিয়ে পড়তে থাকে মানসী।

জীবনের চিরবিশ্বাসের এক দেবতাকে চিঠি লিখেছে মুগ্ধা, দেবতার নামটা অবশ্য লেখা নেই। অদ্ভুত এই গম্ভীর আর শুকনো মুখের মেয়ে মুগ্ধা! হেসে হেসে আর চিঠি পড়তে পড়তে আশ্চর্য হয় মানসী, এত ভাষাও লুকিয়ে থাকতে পারে মুগ্ধার মতো মেয়ের মনের ভিতরে! অদ্ভুত! পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে ওঠে মানসীর চোখ, মুখের হাসি এলোমেলো হয়ে যায়। কী ভয়ানক জ্বালা ছড়িয়ে রেখেছে মুগ্ধা!

—বুঝতে পারবে না তুমি, কেন তোমার কাছে থেকে কোন উত্তর না পেয়েও তোমাকে চিঠি লিখি। তুমি বুঝতে পারবে না, কেন লিখি! যদি বুঝতে, মানুষ কাউকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবেসে ফেললে কি হয়ে যায় তার মন আর জীবন, তবে তুমি চিঠির উত্তর দিতে। কিন্তু আমি তো না লিখে থাকতে পারি না। তোমাকে বার বার লিখি এইজন্য যে, তুমি বার বার আমার চিঠিকে তুচ্ছ করবে, ঘৃণা করবে আর উত্তর দেবে না। তোমারই কাছ থেকে বার বার এই আঘাতের জ্বালাটুকু পাওয়ার লোভ যে আমাকে পেয়ে বসেছে, তাই না লিখে পারি না।

ব্যস্তভাবে মুগ্ধার সেই জ্বালা-ভরা চিঠিটাকে আবার বই চাপা দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে মানসী। মুগ্ধা যখন আবার ঘরে ঢুকে মানসীর মুখের দিকে তাকায়, তখন মানসী দেখতে পায় না যে, মুগ্ধা ওরই দিকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। আনমনা হয়ে, সুন্দর মুখের হাসিটাকে একটু লুকিয়ে রেখে কি যেন ভাবছে মানসী, মুগ্ধা দেখতে পায় চিমটি দিয়ে অবহেলার সঙ্গে যে চিঠি ধরে রেখেছিল মানসী, সেই চিঠিকে বেশ একটু শক্ত করে খিমচে ধরে রেখেছে মানসী। যেন হঠাৎ হাত থেকে ফসকে মেঝের ধুলোর উপর না পড়ে যায়। খুশি হয় মুগ্ধার দুই চক্ষু। চলে যায় মানসী।

মুগ্ধার জীবনে তবু চিঠি লেখার ব্রত এখনো ফুরলো না, এই আর এক বিস্ময়। চিঠি লেখে মুগ্ধা, সেই এক চিরবিশ্বাসের দেবতার কাছে, কিন্তু শুধু লেখার জন্যই লেখা, সেই চিঠি খামে বন্ধ হয়ে সত্যি হেমন্ত নামে কোনো মানুষের ঠিকানায় চলে যায় না। এ যেন, সেই একই ব্রত, কিন্তু মানতটা ভিন্ন।

নিজের জন্য নয়, মানসীর জন্যই চিঠি লেখার ব্রত এখনও সাঙ্গ করতে পারছে না মুগ্ধা। কারণ, মানসী কোন না কোন অজুহাতে মাঝে মাঝে হঠাৎ মুগ্ধার ঘরে এসে ঢোকে, যেন কতকগুলি মন্ত্রের সন্ধানে। হাসির পাথর দিয়ে তৈরি মনটা নরম হয়েছে, ভয় পাচ্ছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মানসী। ভালোবাসার অপমান হলে মানুষ কি সত্যিই ঐ রকম ভয়ানক দুঃখ পায়? ঐ রকমই দুঃখ পাচ্ছে কি হেমন্ত?

হিমানী পারুল আর পূরবীরা একদিন অবাক হয়ে যায়, সত্যিই চিঠির উত্তর লিখেছেন মানসীদি। যেন দু'লাইন লিখে সব কথা শেষ করে দিলেন মানসীদি। তারপর একদিন. তারপর আবার। কোথা থেকে যেন সন্ধান করে মনের ভিতর নতুন ভাষা আর আগ্রহ, আর সেই সঙ্গে একটু বেদনাও যেন নিয়ে আসছেন মানসীদি। মানসীদির চিঠির লেখাগুলিও দিনে দিনে বড় হয়ে যাচ্ছে। দু'লাইনের লেখা আর নয়, পাতা ভরে চিঠি লিখতে শুরু করেছেন মানসীদি!

জানে না অনুপা মালতী আর অলকারা, কেন আর কেমন করে এক মাসের মধ্যেই ঘটনাটা এরকম আর-একটু দুর্বোধ্য হয়ে গেল।

চিঠি লিখছে মুগ্ধা, সে-চিঠি ডাকে আর যায় না। মানসীর দুই চক্ষু ভালোবাসার ভাষা খুঁজছে, ভালোবাসা বুঝতে চাইছে, তাই মুগ্ধার ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর সন্ধান করে. কোথাও আছে কি না মুগ্ধার লেখা কোন চিঠি। কী সুন্দর মনমাতানো ভাষায় ভালোবাসার কথা লিখতে পারে মুগ্ধা।

মুগ্ধাও জীবনে অদ্ভুত এক ব্রতের খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। তার কুৎসিত প্রাণের বেদনাগুলির ছোঁয়া দিয়ে সুন্দর প্রাণের মেয়ে মানসীর মনে পাথরের ফুলকে মোহ-মাখানো ঘুম থেকে জাগাতে হবে। হেমন্তর চিঠির উত্তর দিতে থাকবে মানসী, চিঠি এলেই হেসে উঠবে মানসীর চোখ, আর চিঠি না আসা পর্যন্ত হেমন্তর কথা ভাবতে ভাবতে মানসীর চোখে যেদিন বেদনার মেঘ দেখতে পাবে, সেদিন বুঝবে মুগ্ধা তার মানত পূর্ণ হতে চলেছে।

ইচ্ছা করেই মিথ্যা প্রেমের মানুষের উদ্দেশে একটি করে মিথ্যা চিঠি লিখেই চলেছে মুগ্ধা! ভালোবাসার ভাষাগুলি অদ্ভুত, যেন পাথর-চাপা ঝরনার কলরোল। মুগ্ধার ঘরের টেবিলে বই-চাপা হয়ে পড়ে থাকে এই চিঠি। মানসী ঘরে ঢুকলেই মুগ্ধা বলে—তুমি একটু বসো মানসী, আমি এখনি আসছি। ঘরের বাইরে চলে যায় মুগ্ধা।

পৃথিবীতে কেউ জানবে না কোনদিন, শুধু মুগ্ধা তার এই জানা নিয়ে পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নেবে যে হেমন্তর ভালোবাসাকে অপমান হতে রক্ষা করবার জন্য অদ্ভুত মানত করেছিল কুৎসিত এক মেয়ে, তার নাম মুগ্ধা। হাসির পাথর দিয়ে তৈরি এক সুন্দর মেয়ের মনকে নরম করে দিতে পেরেছে মুগ্ধা। মানসীর মনের জন্য ভালোবাসার ভাষা জুগিয়ে গিয়েছে মুগ্ধা। একটুও ক্লান্ত হয়নি, একটুও খারাপ লাগেনি মুগ্ধার।

মুগ্ধার মানত সফল হয়েছে। সেই সংবাদই একদিন শোনা গেল হোস্টেলের সব মেয়ের মুখে মুখে ধ্বনিত একটি মিষ্টি উল্লাসের মধ্যে। মানসীদির বিয়ে।

কল্পনায় আর-একটা সুন্দর ছবি দেখতে পায় মুগ্ধা। এই পৃথিবীর কোথাও এক উৎসবের আঙিনায় এক আলপনা-আঁকা জায়গার উপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে হেমন্ত আর মানসী। শাঁখ বাজছে, ফুলের মালা আর চন্দনের গন্ধে ঢলে পড়েছে বাতাস।

আজই হোস্টেল থেকে বিদায় নিচ্ছেন মানসীদি। ছবি আঁকার শেষ ক্লাস শেষ করতে এসে আজ মনের আনন্দে একটা নতুন কাণ্ডও করেছেন মানসীদি। ছাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে আর হেসে হেসে হুল্লোড় করে দেখছে সেই দৃশ্য।

মানসীদি কাগজ আর তুলি নিয়ে একটা ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। এই ছবিকেই ছাত্রীদের উপহার দিয়ে যাবেন মানসীদি।

মানসী বলে—সবাই এসে সামনে দাঁড়াও, আমি নতুন এক তিলোত্তমার মুখ আঁকবো।

—তার মানে?

মানসী বলে—তার মানে হলো, একটি সুন্দর মুখ এঁকে দিয়ে যাব—যার মধ্যে তোমাদের সবারই মুখের সুন্দরটুকু থাকবে।

উৎসবের মুখরতা আর হাসি উচ্ছল হয়ে ওঠে ছবি আঁকার ক্লাসে। সত্যিই আজ হাসবার

দিন। মানসী আঁকছে নতুন এক তিলোত্তমার রূপের ছবি! হিমানীর নাকের গড়ন বড় সুন্দর, সুতরাং...।

হেসে ডাক দেয় মানসীদি--তোমার নাক দেখাও হিমানী।

হিমানী সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে। হিমানীর নাকের সুন্দর ছাঁদ তুলি দিয়ে ছবির উপর আঁকতে থাকে মানসী। একে একে আর সবাইকেও এসে সামনে দাঁড়াতে হয়। হাসির তুফান জাগে। অলকার ঠোঁট দুটি চমৎকার। সুতরাং ছবির মুখে ঐরকম দুটি ঠোঁট আঁকতে হলো। যার যা সুন্দর, তাই দেখে নিয়ে ছবি এঁকে চলেছে মানসী। পূরবীর চুল, অনুপমার গলা, পারুলের কপাল, অণিমার চোখ, মালতীর ভুরু, আর কেতকীর চিবুক বড় সুন্দর।

ছবি আঁকা শেষ হয়। নতুন তিলোত্তমার ছবির দিকে তাকিয়ে শিউরে শিউরে হাসতে থাকে মানসী--অ্যাঁ, এ কী হয়ে গেল! কী কুৎসিত, এ যে দেখতে তোমাদের মুগ্ধাদির মতো।

পূরবী আর অণিমা চমকে ওঠে--সত্যিই যে তাই। এরকম বিশ্রী ছবি আমরা নেব না, মানসীদি!

কেউ জানতে পারেনি, এতক্ষণ ছবি আঁকার এই হুল্লোড়ের মধ্যে ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল মুগ্ধা। হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঢোকে মুগ্ধা। মানসীর দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলে--ছবিটা আমাকে দিয়ে যাও, মানসী।

হিমানী অলকা আর কেতকীরা দেখে আশ্চর্য হয়, হাসছেন মুগ্ধাদি, আর, সেই স্যাঁতসেঁতে চোখ দুটোকে যেন ভালো করে ধুয়ে এসেছেন। যেন এতদিন পরে একটা ভয়ঙ্কর কঠিন মানতের ব্রত সাঙ্গ করেছেন মুগ্ধাদি, তাই সফল আনন্দে বিজয়িনীর মতো হাসছেন।

সাধারণী

চেহারাটা সাধারণ, নামটা বেশ একটু সাধারণ। আর যে-বাড়িটাতে থাকে সেই মেয়ে, সেই বাড়িটা বড় বেশি সাধারণ।

সে-মেয়ের বয়সটাও সাধারণ। অর্থাৎ তাকে ঠিক মেয়েটি বলে মনে করা যায় না, আবার একেবারে একজন মহিলা বলে মনে করতেও ইচ্ছা করে না। সে আজ এক বছরেরও আগের কথা, প্রথম যেদিন মালতীর সঙ্গে কথা হয়েছিল অনিমেষ, সেদিনের সেই প্রথম কথাটি হল--কেমন আছেন মালতী রায়? আজকাল অবশ্য বলতে হয়, আমার কথাটি বোধহয় শুনতে পেলে না মালতী।

অনিমেষ এই বাড়িতে এলেই বাড়িটাও যেন এক অসাধারণ মানুষকে দেখবার আনন্দে শুধু বার বার আশ্চর্য হয়। ছেলে-বুড়ো সবারই মনে মুখে ও চোখে একটা বিস্ময় নীরবে আর সরবে গুঞ্জন করে। সেই গুঞ্জন শুনে খুশি হয়ে চলে যায় অনিমেষ।

এ-বাড়ির ওই বিস্ময়ের গুঞ্জন শুনতে ভাল লাগে, তাই আসে অনিমেষ। তা ছাড়া আর কি কোন কারণ নেই? থাকতে পারে। অনিমযে বোধহয় একটা সদিচ্ছার টানেও এখানে আসে। ত্রিলোকবাবুর সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে মালতীর সঙ্গেও অনিমেষের পরিচিত হবার প্রথম কারণটাই হল একটা সদিচ্ছার টান।

ভাগলপুর থেকে এখানে বদলি হয়ে এসে প্রায় পনেরোটা দিন সপরিবারে ধর্মশালাতে থেকে আর বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছিলেন ত্রিলোকবাবু। পঞ্চাশ টাকার মতো ভাড়ার একটি সাধারণ বাড়ি চাই।

লোকের উপকার করার মতো একটা সোসাইটি আছে এই ছোট শহরে এবং অনিমেষ

হল সেই সোসাইটির নতুন সেক্রেটারি। সেদিন ধর্মশালার এক কুঠুরিতে নিউমোনিয়ার মর-মর এক বিখ্যাত বৈদান্তিক সাধুর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মশালাতে এসেছিল অনিমেষ। সেই দিনটিই হল ত্রিলোকবাবুর সঙ্গে অনিমেষের প্রথম আলাপের দিন।

"আপনারা এখানে কেন? কিসের জন্য?"

ত্রিলোকবাবু বলেন, "একটা বাড়ি খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না। বড়ই অসুবিধেয় পড়েছি।"

"কত টাকা ভাড়ার বাড়ি হলে চলবে?"

"এই ধরুন পঞ্চাশ টাকা।"

"এই তো আমাকেও অসুবিধেয় ফেললেন।"

আশ্চর্য হয়েছিলেন, বুঝতে না পেরে একটু চমকেও উঠেছিলেন ত্রিলোকবাবু : "তার মানে?"

"তার মানে, হয় এক শো টাকা ভাড়া, নয় দশ টাকা ভাড়া, এই দু'রকমের ভাড়ার বাড়ি এই শহরে অনেক আছে। কিন্তু এদিকেও না ওদিকেও না, ওই পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার বাড়ি খুব কমই আছে, একরকম নেই বললেই হয়।"

"কিন্তু দশ টাকা ভাড়ার বাড়ি কি আমাদের মতো মানুষের পক্ষে থাকবার মতো..."

"তা তো বুঝতেই পারছি। এদিকে এক শো টাকা ভাড়া হলে আবার..."

"না না, সেটাও সম্ভব নয়।"

"তা তো বুঝতে পারছি। দেখি চেষ্টা করে।"

খুবই চেষ্টা করেছিল অনিমেষ, এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করে ও বাড়িওয়ালাকে অনেক বলে-কয়ে রাজি করিয়ে এই বাড়িটিকে ত্রিলোকবাবুর জন্য ভাড়া করিয়ে দিতে পেরেছিল।

এবং তার কদিন পরে, বোধহয় ছোট একটা ধন্যবাদ নেবার লোভে কিংবা বাড়ির মানুষগুলি কত খুশি হয়েছে দেখে একটু খুশি হয়ে যাবার জন্য, কিংবা আর কোন উপকারের দরকার আছে কি না জানবার জন্য যেদিন আবার এসে ত্রিলোকবাবুর সঙ্গে গল্প করেছিল ও এই বাড়িতে প্রথম চা খেয়েছিল অনিমেষ, সে-দিনই প্রথম জেনে গেল যে, ত্রিলোকবাবুর সঙ্গে অনিমেষের কী রকম একটা অনেক দূরের আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। ত্রিলোকবাবুর মামা হলেন অনিমেষের মেসোমশাইয়ের একেবারে নিকট আত্মীয়।

তারপর আর কি? আর একদিন এসে, সেদিনই প্রথম মালতীর সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল অনিমেষ, "কেমন আছেন মালতী রায়? স্টেশন রোডের মেয়েদের স্কুলে কী করতে গিয়েছিলেন? কোন কাজ ছিল বোধহয়?"

মালতীও অনিমেষের প্রথম প্রশ্নের উত্তর হাসিমুখে দিতে পেরেছিল, "হ্যাঁ, কাজ নিয়েছি।"

"টিচার হয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত মাইনে?"

"পঞ্চান্ন টাকা।"

"তাই বলুন। আমি কি ভাবলাম, আর আপনি কি বললেন!"

অনিমেষের মুখের ভাষাটা হঠাৎ যেন করুণ হয়ে আক্ষেপ করে উঠেছে। মালতীর মুখের হাসি আর চোখের সেই শান্ত ও সলজ্জ চাহনিতে প্রথম দিনের ওই একটি কথাতে চমকে দিয়েছিল অনিমেষের ওই আক্ষেপ। সত্যিই কি অনিমেষবাবুর গলার স্বরটা করুণ হয়ে কেমন করে উঠল, অথবা মালতীরই শোনার ভুল। ত্রিলোকবাবুর মেয়ে মালতীর অদৃষ্টের দাম পঞ্চান্ন টাকা শুনে ব্যথিত হয়ে উঠেছে, এমন মানুষ জীবনে এই তো প্রথম দেখতে পেল মালতী। সেদিন মালতীর মনের বিস্ময়টা বড় বেশি কথা বলে ফেলেছিল।

মনের ভাবনাগুলিকে বেশ একটু সন্দেহ করতেও ভুলে যায়নি মালতী। অনিমেষবাবু সবারই উপকার করেন। পৃথিবীর যে-কোন পঞ্চান্ন টাকার দুঃখ দেখলে এইরকম করুণ হয়ে যায় ভদ্রলোকের চোখ আর গলার স্বর। কী ভেবেছিলেন আপনি? ইচ্ছে থাকলেও মুখ খুলে প্রশ্নটাকে মুখর করে তুলতে পারেনি মালতী। কে জানে এই প্রশ্নের উত্তরে কি কথা বলে ফেলবেন এই ভদ্রলোক, তারপর প্রায়-অচেনা আর একেবারে অজানা এই ভদ্রলোকের কথার জালে জড়িয়ে হয়তো আর কোন উত্তরই দিতে পারবে না মালতী। সে যে একটা বড় বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার হয়ে উঠবে। বোধহয়, অনিমেষবাবু নামে এই ভদ্রলোকের সুন্দর মুখটিকে দেখতে খুব বেশি ভালো লেগেছে মালতীর। সন্দেহ করে মালতী। বুকের ভিতর যেন হঠাৎ একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ভয় পায়, লজ্জাও করে মালতীর।

অনিমেষ চলে যাবার পর নিজের মনের চেহারাখানা আর ভাবনাগুলির কাণ্ড-কারখানা দেখে সত্যিই বড় বেশি লজ্জা পেয়েছিল মালতী, আর মনে মনে ধমক দিয়ে মুহূর্তের একটা ভুল স্বপ্নের শোভাকে ভেঙেচুরে ধুলো করে দিয়েছিল। অনিমেষ এখানে আসে কিন্তু কারও মুখ দেখতে আসে না। খোঁজ করতে আসে, কোন উপকারের দরকার আছে কি না। এই তো, এর চেয়ে বেশি কোন কারণ থাকতে পারে না।

তার পরদিন নয়, এবং অনেক দিন পরে প্রায় তিনটে মাস পার হয়ে যাবার পর যেদিন এক সন্ধ্যায়, বাড়িতে আর-কেউ ছিল না, শুধু ছিল মালতী, যেদিন বাইরের বারান্দায় একটা আলো এনে রাখতেও ভুলে গিয়েছিল মালতী, শুধু আকাশ থেকে এক টুকরো চাঁদের আলো বারান্দায় রেলিংয়ের উপর পড়ে হাসছিল, সেদিন অনিমেষের মুখের ভাষা মুখর হতে হতে হঠাৎ একটা ভুল করে হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেল : তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে চলো মালতী।"

তুমি! আকাশ থেকে ওই টুকরো চাঁদের মায়া যেন হঠাৎ কাছে ছুটে এসে মালতীর জীবনের কাছে মধুর এক অনুরোধের গান গেয়ে উঠেছে।

না, ভুল স্বপ্ন নয়। সত্যিই যে মালতীর মনের ভিতর একটা ভীরু আশা-আকাশ হতে রাতের আঁধারের গুমোট হঠাৎ মুছে গেল। যেন ভোরের পাখির কলরব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। একেবারে নতুন একটা জীবন নিয়ে জেগে ওঠার লগ্ন এসে হঠাৎ মালতীর পঁচিশ বছর বয়সের এই কপালে চুমো খেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

রেলিংয়ের এক দিকে থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অনিমেষ, এবং অন্যদিকে রেলিংয়ের উপর দু' হাত রেখে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল মালতী। মালতীর মাথাটা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে, যেন আর-এক রকমের ঘুমে জড়িয়ে ধরেছে দু'চোখের পাতা। আস্তে আস্তে বলে মালতী : "বেশ তো, কিন্তু আপনি এসে নিয়ে যাবেন বলুন।"

"আমি এসে নিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ।"

হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ফেলে অনিমেষ : "আমার সময় কোথায়?"

মনে হয় মালতীর, অনিমেষের ক্ষণিকের ভুলো মনের ভাষাটা হঠাৎ সাবধান হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। অনিমেষের জীবনের গর্বটা হঠাৎ বোকা হতে হতে আবার হঠাৎ চালাক হয়ে হেসে ফেলেছে। নিজে এসে মালতীকে নিয়ে যাবে, তেমন মানুষই যে নয় অনিমেষ।

মালতীর চোখের পাতায় ঘুম-ঘুম অবসাদ ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। জ্বালা লাগে, বুকের ভিতর হাঁসফাঁস করে ঘুরে বেড়ায় সেই জ্বালাটা। ভুল, নিতান্তই ভুল স্বপ্ন, কিংবা স্বপ্নের ভুল। ত্রিলোকবাবুর মেয়ে পঞ্চান্ন টাকা মাইনের এক মাস্টারনির জীবন হঠাৎ লোভের ভুলে বোধহয় পাগলই হয়ে গিয়েছিল, নইলে হঠাৎ এত বেহায়া হয়ে অনিমেষের মতো মানুষের কাছে এতবড় একটা দাবি করে ফেলবে কেন?

তবু, বোধহয় এই ভুল স্বপ্নটাকে শেষবারের মতো ছিঁড়ে দেবার আগে আর-একবার জীবনের এই ভয়ঙ্কর বিদ্রূপের সঙ্গে লড়াই করে নিতে চায় মালতী। অনিমেষের ওই হাসি কি সত্যিই একটা ঠাট্টার হাসি? মালতীর দাবির কথা শুনে অনিমেষের মনটা কি দুঃসহ কৌতুকের আবেগে হেসে ফেলেছে?

মালতী বলে, "সময় হবে না আপনার, এ-কথার তো কোন মানে হয় না।"

অনিমেষ বলে, "আহা, সামান্য একটা কথা বুঝতে পার না কেন? সময় থাকলেও, আমি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাব কেন?"

মালতী বলে, "একদিন না একদিন, কাউকে তো নিশ্চয়ই নিজে গিয়ে নিয়ে আসবেন।"

উৎফুল্ল হয়ে, মনের খুশি দিয়ে গলার স্বর যেন আরও উচ্ছল করে নিয়ে অনিমেষ বলে, "হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলেছ মালতী, আজই মার কথা থেকে বুঝলাম, এইরকম একটা কাণ্ড ঘটাবার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে।"

একেবারে ধীর স্থির ও স্তব্ধ হয়ে যায় মালতী নামে সেই একটি সাধারণ জীবনের সাধারণ চেহারা। আকাশের এক টুকরো চাঁদের আলো যেন হঠাৎ অভিশাপ হয়ে ওর শরীরটাকে পাথর করে দিয়েছে।

বেশিক্ষণ নয়, হঠাৎ আশার ভুল প্রদীপ হঠাৎ নিভে গিয়েছে। তাই জ্বালাটাও যেন হঠাৎ মরে যায়, আর ধোঁয়া সরে যেতেও বেশি দেরি হয় না।

মালতী প্রশ্ন করে : "একটা কথা বলবেন?"

"কী কথা?"

"সেই যে সেদিন আপনি কি যেন ভেবেছিলেন, আর আমি কি যেন বলে ফেলেছিলাম। আমার কথা শুনে আপনি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন!"

"কবে?"

"সেই যে-দিন আমার পঞ্চান্ন টাকা মাইনের চাকরিটার কথা শুনলেন!"

"ও, মনে পড়েছে। সেই তো, মনে মনে বেশ একটু শক পেয়েছিলাম মালতী। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধহয় স্কুল কমিটির মেম্বার হয়েছ। ভাবতেই পারিনি যে, তুমি পঞ্চান্ন টাকা মাইনের একটা টিচার হয়ে বসে আছ।"

"তাতে আমার কোন অপরাধ হয়েছে?"

"না না, অপরাধ কেন হবে, ছি, আমি কি তাই বলেছি? আসল কথাটা হলো, ওটা একটা অতি সাধারণ কাজ। কত শত মেয়েই তো ওই কাজ করে।"

আর বুঝতে কিছু বাকি নেই, আর নতুন করে কিছু জানবার নেই। অনিমেষের মন পৃথিবীতে কোন এক অসাধারণীর জীবনের কাছে গিয়ে মুগ্ধ হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। রূপে চমক আছে, কথার গমক আছে, হাসিতে গানের মতো মিষ্টি সুরের জোয়ার কলকল করে, এমন একটি নারী। বিদ্বান মানুষ, মনটাও শৌখিন, অনেক টাকা-পয়সারও মানুষ নিশ্চয়।

মালতীদের উপকার করাও বোধহয় ভদ্রলোকের শৌখিন মনের একটা সুন্দর খেলা। এই মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। মালতীই ভুল বুঝেছে।

ক্ষমা চায় মালতী : "আপনি মাপ করবেন, আমিই কিছু না বুঝে-সুঝে হঠাৎ আপনাকে একটা বাজে অনুরোধ করে ফেলেছি।"

বিব্রত বোধ করে অনিমেষ, এবং একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "ছি ছি, তুমি এর জন্য আবার মাপ চাইছ কেন?"

পথের দিক থেকে একটা কলরব আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বারান্দার উপর ওঠে। এতক্ষণে বাড়ি ফিরলেন মালতীর বাবা আর মা, এবং সেই সঙ্গে মালতীর দুই ভাই পন্টু আর

মণ্টু। সবার হাতে বাজার থেকে কেনা নানা জিনিসের ছোট-বড় এক-একটা প্যাকেট।

ত্রিলোকবাবুর দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলে, "ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আজই সকালে গিয়েছিলুম, বলে-কয়ে মিশন স্কুলের হেডমাস্টারকে রাজি করিয়েছি। পল্টু আর মণ্টুকে ভর্তি করে নেবে, তা ছাড়া গত তিনমাসের ফীও নেবে না।"

শুনে খুশি হয়ে এবং প্রায় চমকে উঠে হাঁপ ছাড়েন ত্রিলোকবাবু : "ওঃ, তুমি আমাকে মস্ত একটা দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচালে অনিমেষবাবু।"

আশ্চর্য হয়েছে, চমকে উঠে কৃতজ্ঞতার আবেগে অনিমেষকে অভিনন্দিত করেছে এই বাড়িটা, ত্রিলোকবাবুর এই কথাগুলি, আর ওই মুক্ত নিঃশ্বাসের শব্দ। আজকের মতো আর এখানে বসে থাকবার কিংবা দেরি করবার দরকার নেই। যে স্তুতির উল্লাস শুনতে পেলে তৃপ্ত হয় অনিমেষের মনের শৌখিন আশা, সেই স্তুতি শুনতে পেয়েছে অনিমেষ। মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "যাই এবার, আর চা খাব না।"

চলে যায় অনিমেষ।

অনিমেষ বলে, "আমার কথাটা বোধহয় তুমি শুনতে পেলে না মালতী।"

মালতী হাসে, "শুনলাম তো।"

"কী শুনেছ?"

"আপনি স্কুল-কমিটির সেক্রেটারির কাছে গিয়েছিলেন, আর আমার মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কোন কাজ হল না। তা ছাড়া ওদেরই বা কী দোষ ধরব বল?"

মালতী আবার হাসে, "তা হলে দোষটা আমারই।"

অনিমেষ হাসে না, বরং বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "প্রায় তাই। তোমার কোয়ালিফিকেশনও যে তোমারই মতো সাধারণ। ম্যাট্রিক পাস নয়, ম্যাট্রিক ফেলও নয়, ম্যাট্রিক পর্যন্ত। বাঃ!"

ওই বাঃ, ওই ছোট্ট একটি কথা যেন ছোট একটি ধিক্কার, অনিমেষের কথার ফাঁকে ফাঁকে কত সহজে আর অনায়াসে শব্দ করে বেজে ওঠে।

অনিমেষেরই বা দোষ কী? ওর মুখের ভাষা থেকে শুরু করে ওর চলবার আর তাকাবার ভঙ্গি পর্যন্ত সবই যেন পৃথিবীর যত আলো-ছায়াকে চমকে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আর, নিজেও অদ্ভুত এক চমকে ওঠার পিপাসা নিয়ে ছটফট করছে। হয় একেবারে এদিক, নয় একেবারে ওদিক, মাঝামাঝি হয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। দেখে দু'চোখ চমকে উঠে মুগ্ধ হয়ে যাক, নয়তো ঘেন্না পেয়ে শিউরে উঠুক। দেখতে ভাল লাগছে না, খারাপও লাগছে না, এমন একটা মোটামুটিকে আর সাধারণকে সহ্য করতে তো ইচ্ছা করেই না, বরং একটু, কখনও বা বেশ একটু ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে, সাদা রঙকে লোকে মিথ্যাই একটা রঙ বলে। সাদা দেখে কখনও কারও চোখে রঙ ধরে না!

তবু মালতীদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে কেন অনিমেষ? ত্রিলোকবাবুর এই বাড়িটা বড় বেশি সাধারণ চেহারার বাড়ি নয় কি? চকমক করে না, কালিঝুলি মাখাও নয়। এসে চমকে উঠতে হয় না, বিরক্ত হতেও পারা যায় না। এই বাড়ির চেয়ার-টেবিলগুলিও যেন ওই মালতীর মতো। পালিশ ঝকঝক করে না, মিটমিটও করে না। একটা সাধারণ চিনে-মাটির পেয়ালাতে চা এনে একটা সাধারণ টেবিলের ওপর রেখে দেয় মালতী। অনিমেষও একটা সাধারণ চেয়ারে বসে সেই চা খায়। চা-টা বেশি মিষ্টি নয়, আবার একেবারে অমিষ্টিও নয়। বাঃ!

অনিমেষ বলে, "আমি কিন্তু বিনা চিনিতে চা খেতে ভালবাসি। আবার বেশি মিষ্টি হলে

খেতে ঘেন্নাই করে। কিন্তু তোমাদের বাড়ির এই চা, না এদিকে না ওদিকে... বাঃ।"

শুনে চমকে ওঠে মালতীর শান্ত ও সাধারণ একজোড়া চোখ, যে-চোখের তারা ঘন কালো নয়, আবার ফিকে কালোও নয়। অনিমেষের মনে হয়, বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে মালতী।

অনিমেষের বুকের গভীরে কোন এক নিরালা কোণে একটা তৃষ্ণার্ত অহংকারও এতক্ষণে তৃপ্ত হয়ে যায়। মালতীদের এই অতি সাধারণ বাড়িতে অনিমেষের সব অসাধারণত্ব যেন বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠবার সুযোগ পায়, এবং বড় বেশি চমক লাগে এই বাড়ির চোখে।

সরকারি অফিসে সাধারণ এক কেরানীর কাজ করেন ত্রিলোকবাবু। মাইনেটা অবশ্যই সাধারণ রকমের। মালতীর মা অনিমেষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন ঠিকই, আবার বার বার মাথায় কাপড়ও টানেন। না একেলে না সেকেলে, এও এক অদ্ভুত সাধারণ ব্যাপার।

অনিমেষ বলে, "আমার মা জ্যাঠামশাইয়ের সামনেও মাথায় কাপড় টানেন না, বাবা মা জেঠামশাই আর জেঠিমা রোজ একসঙ্গে বসে তাসও খেলেন। অথচ আপনাকে দেখছি, আমার সামনে এসে কথাও বলবেন, আবার মাথায় কাপড়ও টানবেন। আপনাদের এই এক অদ্ভুত...না মর্ডান না রঘুনন্দন—অদ্ভুত অবস্থা, বাঃ।"

মালতীর মা আশ্চর্য হয়ে বলেন, "কার সঙ্গে কার তুলনা করছ অনিমেষ? তোমার মার মতো শিক্ষিত মানুষ সারা দেশের মেয়ে-সমাজে ক'জন আছেন বলো দেখি? কী সুন্দর কী চমৎকার, সব সময় হাসি-খুশি মানুষটি!"

অনিমেষের বাড়ির জীবনের গর্ব আর গৌরবও যেন মালতীর মার এই রকমের এক-একটা বিস্ময়ের মধ্যে চমক লেগে জ্বলজ্বল করে। শুনতে ভালো লাগে, আরও শুনতে ইচ্ছা করে। এমন একটি দিনও গিয়েছে কি না যেদিন এই বাড়িতে এসে অনিমেষ বেশ চমৎকার একটা খুশির উপহার না নিয়ে চলে গিয়েছে।

পল্টু আর মন্টুও এইরকম চমকে উঠে অনিমেষদার মনটাকে খুশি হয়ে উঠবার সুযোগ দেয়। অনিমেষদাকে দেখে ওরা বড় বেশি আশ্চর্য হয়ে যায়। যেমন সাজপোশাক, তেমনই কথাবার্তা। একই স্টাইলের সাজে দুটি দিনও কখনও অনিমেষ এখানে এসেছে কি না সন্দেহ। কোনদিন ট্রাউজার আর নেক-টাই। কোনদিন ঢিলে পায়জামা আর নাগরা জুতো।

কোনদিন শার্টের সঙ্গে ধুতি। কোনদিন সন্ধ্যার পর ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরবার পথে টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে, কোনদিন বেশ একটু রাত করে লাইব্রেরি থেকে ফেরবার পথে মোটা মোটা ফিলজফির বই হাতে নিয়ে মালতীদের এই বাড়ির বারান্দার উপর এসে বসে অনিমেষ।

পল্টু ও মন্টু বলে, "এই বই আপনি কখন পড়েন অনিমেষদা?"

অনিমেষ বলে, "অফিসে। আমি অফিসের ফাইল বাড়িতে নিয়ে এসে কাজ করি, আর বাড়ির বই অফিসে নিয়ে গিয়ে পড়ি।"

পল্টু আর মন্টুর চোখে বিস্ময়ের হর্ষ চমকে ওঠে : "আশ্চর্য।"

আরও অনেক আশ্চর্যের কথা বলে পল্টু আর মন্টু : "উঃ, আপনি দেখতে কি চমৎকার অনিমেষদা! ওরে ব্যস, আপনি কত বড়লোক অনিমেষদা, পাঁচশো টাকা মাইনে পান। আপনি খুব বিদ্বান, অনেক, অনেক বিদ্বান, না অনিমেষদা?"

পল্টু আর মন্টুর এই আবোল-তাবোলও অনিমেষের শুনতে বেশ লাগে। হোক ছেলেমানুষ, তবু ওরা অনিমেষের জীবনের গৌরবগুলিকে তো ঠিকই ধরতে আর বুঝতে পেরেছে।

সব সন্ধ্যার আকাশে টুকরো চাঁদের আলো হাসে না, তারা-ছড়ানো অন্ধকারও থাকে। এক এক সময় এই বাড়ির বারান্দার রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে হঠাৎ আনমনা হয়ে

যেতে হয়।

সে-দিন এমনই এক আনমনা ভাবনা নিয়ে পল্টু আর মণ্টুর সঙ্গে যখন গল্প করছিল অনিমেষ, তখন মালতীর মা এসে বললেন, "মালতীর এই সম্বন্ধটাও ভেঙে গেল!"

"তার মানে?"

"মেয়ে পছন্দ হলো না।"

"কেন?"

"কেন পছন্দ করবে? ওই তো ছিরি, তার ওপর যদি বিদঘুটে মেজাজ আর জেদ নিয়ে আরও বিচ্ছিরি হয়ে যায়, তবে...।"

"কিসের মেজাজ আর জেদ?"

"কিছুতেই সাজবে না। অথচ সাজলে যে ওকে বেশ একটু ভাল না দেখাবে তা তো নয়।"

"সাজতেই জানে না বোধহয়।"

"খুব জানে। ভাগলপুরে থাকতে পাড়ার যে-কোন বাড়িতে যখনই মেয়ে দেখাবার দরকার হতো, তখন মালতীরই ডাক পড়ত মেয়েকে সাজিয়ে দেবার জন্য।"

বলতে বলতে হেসে ফেলেন মালতীর মা : "ওর হাতের সাজানো সব ক'টি মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখামাত্র পছন্দ করে ফেলেছে। কিন্তু নিজের বেলায়...ওই এক অদ্ভুত জেদ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অনিমেষ। বেশ গম্ভীর হয়। বোধহয় এই বাড়ির একটা বড় রকমের উপকার করে দেবার জন্য অনিমেষের মনের সেই শৌখিন আগ্রহটা একটা প্রবল নেশার ঝোঁকের মতো ছটফট করে উঠেছে। অনিমেষ বলে, "বলেন তো আমি একটা সম্বন্ধের খোঁজ করি।"

"করো, কিন্তু করে কি লাভ হবে তাও তো বুঝতে পারছি না। সেই কাণ্ডই আবার হবে। মেয়ে দেখবে আর অপছন্দ করে চলে যাবে। ওই জেদি মেয়ে সাজতেই রাজি হবে না।"

অনিমেষ হাসে : "আমি রাজি করাব।"

মালতীর মা হাসেন : "তোমাকে অবিশ্যি একটু ভয় করে। দেখ, যদি রাজি হয়।"

মালতীকে রাজি করাবার সুযোগও পেয়ে গেল অনিমেষ। মালতীর মা চলে যেতে মালতীই অনিমেষের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে, "এতক্ষণ ধরে মার সঙ্গে যে ষড়যন্ত্রের কথা বলছিলেন, তার সবই শুনে ফেলেছি।"

অনিমেষ হাসে, "তা হলে কথা রইল। এইবার সাজতে যেন একটুও আপত্তি না হয়।"

মালতী বলে, "আপনি তা হলে সত্যিই চান যে আমি...।"

"নিশ্চয়।"

"আচ্ছা।"

সেজেছে মালতী। সে সন্ধ্যায় টুকরো চাঁদের আলো দিয়ে এত বড় আকাশটাও নিজেকে সাজিয়ে নিল। ত্রিলোকবাবুর উপকার করবার জন্য, ত্রিলোকবাবুর মেয়ে মালতীর জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করে ভাল একটি সম্বন্ধ এনে ফেলেছে অনিমেষ, আর পাত্রপক্ষের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেও এসে এই অতি-সাধারণ বাড়ির বাইরের ঘরে বসেছে।

দেখতে পেল অনিমেষ, যে-দৃশ্য এই এক বছরের কোন সন্ধ্যায় এই সাধারণ বাড়ির ঘরে ও বারান্দায় কোন নিভৃতে দেখতে পায়নি। সেজেছে মালতী। কিন্তু কী আশ্চর্য, এ যেন সেই মালতীই নয়। কী অদ্ভুত আর কী সুন্দর একটা রঙিন রূপের চমক গায়ে জড়িয়ে মানুষের চোখের সামনে আজ ধরা দিয়েছে মালতী। চোখের কোলে সরু কাজলের টান, চোখ দুটোই

মেঘলা সন্ধ্যার ছবির মতো মায়াময় হয়ে গিয়েছে। খোঁপার উপর তিনটে সাদা ফুলের কুঁড়ি। কালো রেশমের একটা স্তবকের মতো আলগোছে যেন হেলে রয়েছে খোঁপাটা। ঢলঢল করছে মালতীর চুলের কালো। রঙিন শাড়িটা কোথাও লতার মতো পাক দিয়ে, আবার কোথাও যেন ঢেউ তুলে মালতীর সারা শরীরটাকে ছাঁদে ছাঁদে ঢেলে আর গলিয়ে একেবারে নতুন করে গড়ে তুলেছে। মোটেই গম্ভীর নয়, বেশ সুন্দর একটি হাসির আবছায়া শিউরে রয়েছে মালতীর ঠোঁটে, ঠোঁট দুটি ফুলের শোভার মতো যেন একটু ফুলে উঠেছে।

পছন্দ হয়েছে। বেশ স্পষ্ট করে এবং বেশ একটু উল্লাসের সুরে পছন্দের কথা ঘোষণা করে চলে গেলেন পাত্রপক্ষ।

এইবার অনিমেষকেও চলে যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগে মালতীকে একটা কথাও না বলে গেলে কি ভালো দেখায়? কী কথা? কথাটা তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিতে পারে না অনিমেষ ; অথচ চোখ দুটো ব্যাকুলভাবে খোঁজ করে, মালতী কোথায়? বারান্দায় কেউ নেই। বাইরের ঘরেও কি কেউ নেই?

বাইরের ঘরের দরজার কাছে তখন শুধু একজনই দাঁড়িয়ে ছিল, মালতী। তখনও সেই অদ্ভুত ফুলের হাসির চমক লেগে ফুলে রয়েছে মালতীর ঠোঁট।

ব্যস্তভাবে মালতীর কাছে এগিয়ে এসে হাসতে গিয়ে হঠাৎ গুমরে ওঠে অনিমেষের মুখের একটা কথা : "ওরা যে সত্যিই পছন্দ করে চলে গেল মালতী।"

মালতী হাসে : "আমার কপাল।"

"কিন্তু...তুমিও সত্যিই মানুষের চোখকে ভয়ঙ্কর ঠকাতে পার।"

"কাকে ঠকিয়েছি?"

"আমাকে। কোনদিন তো এমন অদ্ভুত সুন্দরটি হয়ে আমার চোখের কাছে..."

মালতী হাসে : "এটা তো একটা নকল চেহারা।"

স্তব্ধ হয়ে যায় অনিমেষের মনের সব প্রশ্নের উৎসাহ। ঠিকই বলেছে মালতী। মালতীর এই চেহারা একটা ছদ্মবেশ, এরই ভিতরে লুকিয়ে আছে সেই খড়ি দিয়ে আঁকা সাদাটে ছবির মতো চমকহীন একটা সাধারণ চেহারা। নাঃ, ভালোই হলো সত্যিই কথাটা সময়মতো স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছে মালতী।

মুখ ঘুরিয়ে আবার পথের দিকে তাকায় অনিমেষ। বুঝতে পারে না, কখন ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল মালতী। বারান্দার টেবিলের উপর একটা সাধারণ ল্যাম্প ; মিটমিট করে না, জ্বলজ্বলও করে না। এই পৃথিবীর কতকগুলি নিতান্ত সাধারণ আলো-ছায়ার নিষ্ঠুর কৌতুকের বন্ধনে যেন বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনিমেষ। বুঝতে চেষ্টা করে না, কতক্ষণ ধরে এইভাবে ত্রিলোকবাবুর বাড়ির এই বারান্দায় সে আজ দাঁড়িয়ে আছে।

"মালতী!" বেশ জোরে চেঁচিয়ে ডেকে ফেলেছে অনিমেষ। ডাকটা যেন হোঁচট-খাওয়া মানুষের আচমকা আর্তস্বরের মতো।

সেই মুহূর্তে ভিতরের ঘরের ভিতরে দরজার খিল খোলার শব্দে চমকে উঠে একটা আছাড় খায়। ছুটে আসে একটা উতলা আলোছায়া। কাছে এসেই চেঁচিয়ে ওঠে মালতী, "কী হয়েছে? আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

এ আবার কোন রূপ? মালতী যেন তার এতদিনের সেই চেহারাটাকে মনের মধ্যে হঠাৎ-ভুলে কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনিমেষের চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ধোওয়া বোধহয় সবেমাত্র সারা হয়েছিল, ভুরু দুটি এখনও জলে ভিজে রয়েছে। এলোমেলো খোলা চুল, প্লেনপাড় সাদা শাড়ি আর সাদা সায়া। শাড়িটার অর্ধেকও গায়ে জড়ানো হয়নি। সায়াটাকেই বেশি দেখা যায়, সায়ার লেস কুঁচকে রয়েছে। গালে পাউডার নেই, ঠোঁটে রঙ নেই, চোখে কাজলের একটা ছায়াও নেই। সাদা কাপড়ের ব্লাউজ, তার একটা বোতাম

খোলা, গায়ের সঙ্গে যেন আলগা ছোঁয়া লাগিয়ে ফুরফুর করছে ব্লাউজটা।

উত্তব দিতে ভুলে গিয়ে শুধু অপলক চোখেব নিবিড় বিস্ময় নিয়ে মালতীর দিকে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ। রাগ করে রয়েছে মালতীর ভুরু, সন্দেহ করছে চোখের তারা, ঠোঁটের উপর যেন একটা বিস্ময়ের জ্বালা দাঁত দিয়ে চেপে রয়েছে মালতী। ঘাড় হেলিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মালতী, তাই বোধহয় এত সুন্দর হয়ে চিকচিক করছে ওর গলার ওই বাজে একটা সোনার সরু হার। মনে হয়, মালতীর এই অদ্ভুত অসাধারণ চেহারাটা ওই বাজে শাড়ি-সায়া-ব্লাউজের সব সাদাকে রঙিন করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে হাঁপ ছাড়ে মালতী : "উঃ, আপনার ডাক শুনে কি ভয়ানক ভয় পেয়েছিলাম! মনে হলো, আপনি যেন হঠাৎ এই বারান্দা থেকে নীচে পড়ে গিয়েছেন।"

দু'চোখ ভরা মুগ্ধতা নিয়ে, আর বোধহয় বুক ভরা তৃপ্তির বিহ্বলতা ও চমক নিয়ে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ। এতদিন ধরে একটা সাদাটে সাধারণের নকল সাজ পরে এই রঙিন চেহারা লুকিয়ে রেখেছিল ওই মেয়ে। সত্যিই অনিমেষকে অনেক ঠকিয়েছে মালতী।

"ছি, এ কী করেছি আমি!" এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরে পেয়েছে মালতী। নিজেরই ভুলো মনের ভুল, আর এই পাগল চেহারাটাকে এতক্ষণে দেখতে পেয়ে হঠাৎ শিউরে ওঠে মালতী। কিন্তু ছুটে পালিয়ে যাবার আগেই বাধা পায়—মালতীর একটা হাত ধরে ফেলে অনিমেষ।

ছটফট করে মালতী : "এ কী কাণ্ড করছেন আপনি?"

অনিমেষ বলে, "এতদিনে তোমাকে ধরে ফেলতে পেরেছি।"

স্বপ্নাতীত

রাস্তার মোড়ে একই সারিতে পর পর অনেকগুলি দোকান। কোনটাতে আলু-পেঁয়াজ, কোনটাতে বেনেতী মশলা ; পাশাপাশি তিনটে দোকানে রকমারি মনোহারী জিনিস সাজানো। একটাতে সাদা আর হলদে গোল্লার স্তূপ, কাপড়কাচা সাবানের দোকান। রেডিমেড জামা, ছিটের পীস বিক্রি হয় একটা দোকানে। আর পাশেরটা হলো পিতল-কাঁসার বাসনের দোকান। এরই মধ্যে একটি দোকান হলো ফুলের দোকান।

সব দোকানের মধ্যে ক্রেতার ভিড় সবচেয়ে কম দেখা যায় এই ফুলের দোকানে। অথচ ফুলওয়ালা রমেশ এতগুলি ব্যস্ত দোকানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অব্যস্ত তার এই ফুলের দোকানে কাঠের পাটাতনের উপর সবচেয়ে বেশি অহংকারের মূর্তি নিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

কত রকমের বাহারে পাতার গুচ্ছ। বেল আর জুঁইয়ের ছোট ছোট দুটি পাহাড় আকারের স্তূপ। সাদা শালুক আর পদ্মের গাদাটা এই উঁচু একটা ঢিবির মতো সাদা। সাদা হলদে আর লাল গোলাপের তোড়া আছে। জবা করবী আর কাঠগোলাপ ছড়াছড়ি করে পড়ে আছে। এক ঝুড়ি দোপাটি। কাঁটাভরা এক রাশ কেতকীও জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। পথের মোড়ের যত ধুলো আর তেলেভাজা ধোঁয়ার কড়া ঝাঁজালো গন্ধের মধ্যে ফুলওয়ালা রমেশের দোকান যেন একটি স্নিগ্ধ সুরভিত ঠাঁই সৃষ্টি করে পড়ে আছে।

ক্রেতার ভিড় হয় না। না হোক, অন্তত দর্শকের ভিড় হোক। কিন্তু তাও যে হয় না। এত বড় ডাঁটাসুদ্ধ রজনীগন্ধার কুঁড়ির থোকা দোকানের পাটাতনের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে রয়েছে, মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে, তবু এমন খুব কমই দেখা যায়, যে একবার

থমকে না দাঁড়িয়েছে আর ওই তাজা রজনীগন্ধার বড় বড় কুঁড়ির থোকা দেখে আশ্চর্য না হয়েছে।

না কিনুক, এসে অন্তত একটু দরাদরি করুক। দর পছন্দ না করুক অন্তত ফুলের গন্ধ আর বাহার একটু পছন্দ করে চলে যাক। মাত্র এতটুকুই আশা করে রমেশ। কিন্তু রমেশের এই সামান্য আশাও যে সফল হয় না। দোকানের পাটাতনের উপর চুপ করে বসে দেখতে থাকে রমেশ, পথের কিনারায় বসে তোলা উনুন জ্বেলে পাঁপড় ভাজছে যে লোকটা, সে-লোকটা ক্রেতার দাবি সেরে উঠতে পারছে না। উনুন ঘিরে ক্রেতার ভিড় জমে রয়েছে, এক-আনার গরম গরম ভাজা পাঁপড় খেয়ে তখুনি মুখ মুছে আবার এক-আনার পাঁপড়ের জন্য অনেকেই হাঁক দিচ্ছে।

কিন্তু রমেশের দোকানের ফুলের স্তূপ শুধু পড়ে থেকে থেকেই শুকিয়ে যায়, মাঝে মাঝে জলের ছিটে দেয় রমেশ। কিন্তু তাতেই বা কী সুবিধা হবে? বাসী হতে হতে পচেই যাবে ফুলগুলি।

সামনেই কাঁচা বাজারের ছোট ছোট একচালা। দেখতে পায় রমেশ, সেখানেও লোকে একরকমের ফুল কেনে। সে-ফুল দেখতে সুন্দরও বটে। বকফুল, কুমড়োফুল, সজনেফুল। যে-ফুল খাওয়া যায়, সে-ফুলের আদর আছে বটে কিন্তু সে-আদর কি ফুলের আদর?

প্রতিদিন দোকান খুলবার সময় গাদা গাদা বাসী ফুল, শুকনো ফুল আর পচা ফুল ফেলে দিতে হয়। রমেশ নিজের হাতেই এইসব পচা গলা ফুলের বোঝা তুলে নিয়ে গিয়ে মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে গরুর মুখের কাছে ফেলে দেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, গরুতে শেষে ফুলটাও না খেয়ে ফেলে রেখে গেল না তো!

পাশের মসলার দোকানের নিকুঞ্জ বলে, "একটু দাম কমাও রমেশদা, দাম কমাও। এত চড়া দামে এ-সব অকাজের জিনিস মানুষে কিনবে কেন, বলো?"

হ্যাঁ, অকাজের জিনিস বটে। রজনীগন্ধা আর কেতকীকে মুগের ডালের বেশন দিয়ে মাখামাখি করে আর তেলে ভেজে তো খাওয়া যায় না। ঠিকই, কিন্তু দাম কমায় না রমেশ। গাদা গাদা ফুল বাসী হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যাক, গরুতে খাক, তবু পাঁপড়-খেকো মানুষের অনুগ্রহ লাভের জন্য ফুলের দাম কমিয়ে দিতে রাজী নয় রমেশ।

এক-একদিন রমেশের দোকানে বেশ একটু ভিড় দেখা দেয়। এই দিনগুলি হলো পূজা-পার্বণের দিন। কেউ দু পয়সার এবং কেউ বা এক আনার ফুল কেনে। তবু এই অল্প অল্প বিক্রির জের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে। মোটামুটি বেশ কিছু বিক্রিও হয়ে যায়, লাভও মন্দ হয় না। কিন্তু তেমন খুশি হয় না রমেশ। ঠিক ফুলের আদরের জন্য এই ক্রেতার ভিড় নয়। দেবতাকে আদর করবে আর খুশি করবে ফুল দিয়ে, এই মাত্র।

এমন কি, কোন কোন দিন যখন অনেকগুলি মোটা মোটা ফুলের মালা বিক্রি হয়ে যায়, তখন খোঁজ করে রমেশ : "শহরে আজ কোনও লীডার এসেছে নাকি নিকুঞ্জ?"

নিকুঞ্জ বলে, "হ্যাঁ, তিনজন লীডার এসেছেন।"

পথের উপর নতুন খাটিয়া নামিয়ে রেখে যখন খালি পায়ে একজন ক্রেতা এসে দাঁড়ায়, তখন রমেশ একটু গম্ভীর হলেও মনে মনে খুশি হয়। যাই হোক, মরা মানুষের সঙ্গে তবু কিছু ফুল দিয়ে দেবার কথা মানুষগুলোর মনে হয়েছে।

ক্রেতা হলো শ্মশানযাত্রী। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে কেউ একজন চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছেন। তাই ফুলের ডাক পড়েছে।

ফুলের দাম একটু কমিয়ে এবং কখনও বা বেশ একটু সস্তা করে দেয় রমেশ : "নিন নিন, আরও দুটো তোড়া নিন, যা হোক একটা দাম ধরে দিয়ে চলে যান।"

বলতে বলতে আরও গম্ভীর হয়ে যায় রমেশ : "পেটের দায়ে ফুল বেচতে হয় মশাই।

নইলে এ সব কাজে কি আর ফুলের দাম নিতাম! কখনই না। একটা মানুষ চলে যাচ্ছে, তাকে আমিও কিছু ফুল উপহার দিতে পারি।"

ফাউ হিসেবে এক গাদা দোপাটি আর গোটা চারেক পদ্ম ক্রেতার হাতে তুলে দেয় রমেশ।

ফুলের আদর আছে তা হলে। এবং যারা ফুলকে ভালোবাসে বলেই কিনতে আসে তাদেরই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে রমেশ। তা ছাড়া আরও এক রকমের মানুষ আছে, যারা জীবনের আনন্দকে ফুল দিয়ে সাজাতে ভালোবাসে। এদেরও খুব ভালোবাসে রমেশ। এ-রকম ক্রেতাও যে নেই, তা নয়। এই রকমের ক্রেতাদের মধ্যে দুজনের মুখ বড় বেশি চেনা হয়ে গিয়েছে। প্রায়ই এরা আসে। কখনও একসঙ্গে এবং কখনও বা একা একাই।

নিকুঞ্জ বলে, "আমি চিনি। এই মেয়েটিই হলো চাটুজ্জেবাবুর বড় মেয়ে।"

কাঁসার বাসন ওজন করতে করতে অনাদি বলে, "ওই ছেলেটিকেও আমি চিনি। নতুন রাস্তায় ওই যে কত বড় বাড়ি, সেই উকিল সনাতনবাবুর ছেলে। বিলেত থেকে ফিরেছে।"

কিসের জন্য ওই মেয়ে আর ওই ছেলে ফুলের আদর করে, সে-রহস্য বুঝতে রমেশের এতটুকু অসুবিধে হয় না। বুঝতেই তো পারা যাচ্ছে যে, দুজনের মধ্যে ভালোবাসাবাসির পালা চলছে। বেশ তো, ভালোই তো। ভালোবাসার রূপটিকে আরও সুন্দর, আরও রঙিন করবার জন্যই তো ওরা ফুল কিনে নিয়ে যায়।

রমেশের মূর্তিটা আরও একটু অহংকারের ভঙ্গি ধরে, এবং হেসে হেসে নিকুঞ্জকে ঠাট্টা করে রমেশ : "তোদের দোকানে খদ্দের আসে যত রাক্ষসের দল। শুধু খাই আর খাই। কিন্তু আমার দোকানে কারা আসে দেখছিস তো? হয় পুজো, নয় প্রেম, নয় ফুর্তি।"

হ্যাঁ, ফুর্তির বাবুরাও মাঝে মাঝে এসে বেল-জুঁইয়ের মালা কিনে নিয়ে যায়। বাইজী-বাড়ি গিয়ে গান শুনবে আর নাচ দেখবে ওরা। মনে মনে এদেরও উপর কোন ঘৃণা বোধ করে না রমেশ। তবু তো, ভেজে খাবার জন্য নয়, গান শোনার আর নাচ দেখবার আনন্দকেই রঙে আর গন্ধে একটু সুন্দর করে নেবার জন্য ওরা ফুল কিনতে আসে।

বিক্রি কম, লাভ কম, কিন্তু রমেশের অহংকারে কোন কমতি নেই। এবং ফুলের দোকানের এই পাটাতনের উপর বসে সে টিটকারি দিয়ে আশপাশের যত মসলা, বাসন, সাবান, ছিটের কাপড় আর মনোহারীকে তুচ্ছ করতে থাকে : "বেচলে সেরা জিনিস বেচব, যে জিনিসকে মানুষ আদর করে মাথায় তোলে, গলায় জড়ায় আর বুকে রাখে।"

রমেশ এই অহংকারে একেবারে মত্ত হয়ে উঠল সেদিন, যেদিন নতুন রাস্তার সনাতন উকিলের বাজার-সরকার মশাই নিজে ফুল কিনতে এলেন।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে রমেশ, "এত ফুল আজ হঠাৎ কিসের জন্য দরকার হলো?"

সরকারমশাই বলেন, "ফুলশয্যা।"

"কার বিয়ে হলো?" চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ।

"বাবুর মেজছেলে, বিলেত থেকে ফিরে এসেছে যে, তারই বিয়ে হয়ে গেল।"

"কার সঙ্গে?" আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ।

সরকারমশাই বলেন, "চাটুজ্জেবাবুর বড়মেয়ের সঙ্গে।"

খুশিতে আত্মহারা হয়ে ফুল বাছতে থাকে রমেশ। এতদিনে যেন রমেশের দোকানের একটি স্বপ্ন সত্য হয়েছে। বেছে বেছে টাটকা তাজা ফুল, গন্ধে আকুল চাঁপা আর রজনীগন্ধা রাশি রাশি তুলে নিয়ে কলাপাতায় জড়িয়ে বড় বড় প্যাকেট করে বাঁধতে থাকে রমেশ।

দশ টাকার ফুল বিক্রি হয়ে গেল। কিন্তু দশ টাকার নোটটার দিকে যেন তাকাতেই চায় না রমেশ। বার বার নিকুঞ্জকে ডাক দিয়ে বলে, "দেখলি তো, আমার ফুলের ঘটকালি দেখলি?"

নিকুঞ্জ হাসে : "হাঁ, দেখলুম বটে।"

রমেশও হাসে : "হাঁ, মনে রাখিস তা হলে। এ হলো ফুল। তোর ওই মসলা নয়, আর হরনাথের ওই কয়লাও নয়।"

দিন যায়। রমেশের গর্ব যেমন, তার ফুলের দোকানের দামও তেমন, আর তার দোকানের ওই একটা আনন্দের স্বপ্নও তেমনি মাথা উঁচু করে বসে থাকে। কোন ব্যতিক্রম হয় না।

মাঝে মাঝে শুধু মনে পড়ে, এবং ভাবতে একটু দুঃখও হয়, চাটুজ্জেবাবুর মেয়ে আর সনাতন উকিলের ছেলেব জীবনে ফুলের দরকার কি ফুরিয়ে গেল? যে ফুলের স্নেহ ওদের দুজনের জীবনকে মিলিয়ে দিল, মিলে যাবার পর সেই ফুলকে কি এমন করে ভুলে যেতে হয়?

দেড় বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে একটি দিনও ওই দুজনের কেউ আর এলো না। না আসুক। স্বামী-স্ত্রী হয়ে এখন সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওরা, উঠুক। তবু অন্তত চাকরকে পাঠিয়ে একটা-দুটো তোড়া কিনতে পারা যায় তো!

রমেশকে আশ্চর্য করে দিয়ে সেদিনই সকালে দেখা দিল সনাতন উকিলের সরকারমশাই: "কিছু ফুল চাই। নরম নরম অথচ বেশ রঙিন আর সুগন্ধ।"

"এই দিন না, কত নেবেন।" উৎফুল্ল হয়ে ফুল বাছতে থাকে রমেশ। তারপর কৌতূহল সামলাতে না পেরে প্রশ্ন করে, "কিন্তু ব্যাপারটি কী সরকারমশাই?"

সরকারমশাই বলে, "বাবুর নাতির অন্নপ্রাশন।"

"বলেন কী?" যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে দুলতে থাকে রমেশ : "ওই সে-বছর বাবুর যে ছেলের বিয়ে হলো, তারই বাচ্চার অন্নপ্রাশন বোধহয়?"

সরকার মশাই বলেন, "হ্যাঁ।"

ইচ্ছে হয় রমেশের, দোকানের সব ফুল তুলে নিয়ে সরকারমশাইয়ের হাতের কাছে ঢেলে দিতে।

রমেশের জীবন যে স্বপ্ন দেখে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, সেই স্বপ্নই যে একে একে সফল হয়ে চলেছে। গরিব রমেশ এখনও বিয়ে করেনি। বিয়ে করবার মতো কাঁচা বয়স থাকলেই বা কী? এবং মনে পড়ে, সেই গাঁয়ের একটি মেয়ের মুখ, যাকে বিয়ে করবার জন্য মনের ভিতর অনেক আশা আব ইচ্ছা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মনে পড়লেই বা কী? সে-মেয়ের সঙ্গে রমেশের বিয়ে হতে পারে না। মেয়ের বাবা রমেশের মতো এত গরিব পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিতে রাজি নয়।

ব্যস, জীবনের ওই ইচ্ছার পাট চুকিয়ে দিয়েছে রমেশ। ভালোবেসে বিয়ে করা, আর জীবনের সঙ্গিনী নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন সফল হলো না, কিন্তু তার এই ফুলের দোকানের স্বপ্ন তো সফল হয়ে চলেছে। চাটুজ্জেবাবুর বড় মেয়ের কোলে সংসারের সবচেয়ে বড় স্বপ্নের আনন্দ হাসছে। আজ তারই অন্নপ্রাশন।

সরকারমশাই চলে যেতে রমেশ আর-একবার কয়লাওয়ালা হরনাথ আর মসলাওয়ালা নিকুঞ্জকে টিটকারি দেয় : "দেখলি তো ফুলের কাণ্ড! তোদের মসলা আর কয়লার এই সাধ্যি আছে?"

"কী হলো?" প্রশ্ন করে হরনাথ।

রমেশ বলে, "মানুষের ভালোবাসার কোলে একটা বাচ্চা এনে দিয়েছে আমার ফুল। বিশ্বাস করছিস তো?"

হরনাথ বলে, "তা কাণ্ডকারখানা দেখে বিশ্বাস করতেই হচ্ছে।"

বেশি দিন পার হয়নি। চৈত্র মাসটা সবেমাত্র পার হয়েছে আর বৈশাখের বেলা একটু বেশি গরম হয়ে উঠেছে, এমনই একটি দিনে ঠিক দুপুরবেলা ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টি ঝরে পড়ল। ছাতা মাথায় দিয়ে হাজির হলেন সনাতনবাবুর সরকারমশাই : "কিছু ফুল চাই।"

খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ : "নিন নিন, সব রকমের ফুল আছে। মালা, তোড়া, তবক, ঝুঁটি, বাহারে পাতার গুচ্ছ। কী কী চাই?"

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে সরকারমশাই বলেন, "কুঁড়ি আছে? সাদা ফুলের কুঁড়ি?"

"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু কিসের জন্য সরকারমশাই?"

নতুন কেনা দু'গজ সাদা মলমলের কাপড় পেতে সরকারমশাই বলেন, "দিন এই কাপড়েই ঢেলে দিন।"

ছোট্ট এক টুকরো নতুন সাদা মলমল, তার মধ্যে শুধু কতকগুলি সাদা ফুলের কুঁড়ি বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়েছেন সরকারমশাই। কী ব্যাপার? এ কি বিশ্রী ভয়ানক ফুল কেনার শখ, থরথর করে কাঁপতে থাকে রমেশের আতঙ্কিত দুটি চোখ।

"কার জন্য এই সাদা কুঁড়ি?" চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ।

সরকারমশাই বলেন, "বাবুর নাতিটি এই কিছুক্ষণ হলো মারা গিয়েছে।"

সাদা ফুলের কুঁড়ি ঝুরঝুর করে সাদা মলমলের উপর ঢেলে দিয়ে কাঁপতে থাকে রমেশ। তাব পরেই ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ছুটে আসে নিকুঞ্জ। ছুটে আসে হরনাথ : "কী হলো রমেশদা?"

রমেশ চোখ মুছতে মুছতে বলে, "ফুল বড় ভয়ানক ; বড় সর্বনেশে জিনিস রে হরনাথ। এর চেয়ে তোদের কয়লাও অনেক ভাল। এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি নিকুঞ্জ।"

ভারত প্রেমকথা

"নতুন ক'রে পাব ব'লে"

[মুখবন্ধ]

আদিযুগ আর নবতম যুগ, রূপের দিক দিয়ে এই দুয়ের মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু এই ভিন্নতা নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ নয়। নবতমের মধ্যে হোক, আর পুরাতনের মধ্যে হোক, শিল্পীর মন সেই এক চিরন্তনেরই রূপের পরিচয় অন্বেষণ ক'রে থাকে। শিল্পীর সাধনা হলো নতুন ক'রে পাওয়ার সাধনা। শুধু পথ চাওয়াতেই আর চলাতেই শিল্পীর আনন্দ নয়, নতুন ক'রে পাওয়ার আনন্দও শিল্পীর আনন্দ। আদিযুগের রূপকে এই জগতে আর একবার পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু আদিযুগের রূপকে নতুন ক'রে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিল্পী ছাড়তে পারেন না। কারণ, সেই পুরাতনের রূপের সঙ্গে একটি অখণ্ড আত্মীয়তার ডোরে বাঁধা রয়েছে নবতম যুগের মানুষেরও জীবনের রূপ।

জীবনের রূপ সম্বন্ধে এই অখণ্ডতার বোধ হলো কবি শিল্পী ও সাধকের মহানুভূতি এবং এই মহানুভূতিই মানুষজাতির শিল্পে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ও সুন্দর আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে সেখানেই আমরা পেয়েছি ক্লাসিক গৌরবে মণ্ডিত সাহিত্য ও শিল্প। ক্লাসিক-এর রূপ ও ভাব খণ্ডকালের মধ্যে সীমিত নয়। কালোত্তর প্রেরণার শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে আছে কবি বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারত। বিশেষ কোন জাতির জীবনের রীতিনীতি ও ঘটনা অথবা বিশেষ কোন যুগের ইতিহাসের উত্থান-পতনের ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে রচিত হ'লেও বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে মানবজীবনের চিরকালীন আনন্দ হর্ষ ও বেদনার ব্যাকুলতা বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে। ভোরের সূর্যের মত এই মহাপ্রাণময় কাব্য ও শিল্পরীতিগুলি মানুষের মনের আকাশে নিত্য নতুন আলোকের প্রসন্নতা ছড়ায়। তাই প্রতি জাতির সাহিত্যে দেখা যায় যে, নতুন কবি ও শিল্পীরা জাতির অতীতের রচিত মহাকাব্য গাথা সঙ্গীত ও শিল্পরীতি থেকে প্রেরণা আহরণ করেছেন।

কিন্তু ক্লাসিকের রূপ ও ভাবের ভাণ্ডার থেকে আহৃত উপাদান দিয়ে রচিত এই নতুন সৃষ্টিগুলি সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতম নতুন সৃষ্টিরূপে পরিণতি লাভ করে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয় না। ইওরোপীয় সাহিত্যে ও শিল্পে বিভিন্ন কয়েকটি রেনেসাঁর ইতিহাস লক্ষ্য করলেও এই বিস্ময়কর নিয়মের সত্যতা আবিষ্কৃত হয় যে, আধুনিক কবি ও শিল্পীর হৃদয় পুরাতনেরই মহাপ্রাণময় কাব্য ও শিল্পের রূপগরিমার সাযুজ্য লাভ ক'রে বিপুল নূতনত্ব সৃষ্টির অধিকার লাভ করেছিল। এই সাফল্যের অন্তর্নিহিত রহস্য বোধ হয় এই যে, ক্লাসিকের অনুশীলনে কবি ও শিল্পী সহজেই সেই দৃষ্টিসিদ্ধি লাভ ক'রে থাকেন, যার ফলে জীবনের রূপকে যুগ হতে যুগান্তরে প্রবাহিত এক অক্ষান্ত ও অখণ্ড রূপের ধারা ব'লে সহজে উপলব্ধি করা যায়।

বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্য এই উপলব্ধির বাণীময় রূপ। তাই ক্লাসিক-এর অনুশীলন সহজে মানুষের চিত্তের ভাবনাকে প্রকৃত রূপসৃষ্টির রীতিনীতি ও পথ চিনিয়ে দেয়। এক কথায় বলতে পারা যায়, ক্লাসিক সাহিত্য ও শিল্পরীতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া জীবনের রূপকে নতুন ক'রে নিকটে পাওয়ার উপায়।

মহাভারতের মূলকাহিনী ছাড়া আরও এমন শত শত উপাখ্যানে এই গ্রন্থ আকীর্ণ যার মূল্য সহস্র বৎসরের প্রাচীনতার প্রকোপেও মিথ্যা হয়ে যায়নি। কারণ. ব্যক্তির ও সমাজের মন এবং সম্পর্কের যে-সব সমস্যা মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সে-সব সমস্যা বিংশ শতাব্দীর নরনারীর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয়নি। নরনারীর প্রণয় ও অনুরাগ, দাম্পত্যের বন্ধন বাৎসল্য ও সখ্য—শ্রদ্ধা ভক্তি ক্ষমা ও আত্মত্যাগ ইত্যাদি যে-সব সংস্কারের উপর

সামাজিক কল্যাণ ও সৌষ্ঠব মূলত নির্ভর করে, তার এক-একটি আদর্শোচিত ব্যাখ্যা এইসব উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার জীবনের সমস্যার ভিতর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। শত শত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের যে-সব কাহিনী মহাভারতে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে এই বিংশ শতাব্দীর যে-কোন মানুষ তাঁর নিজের জীবনেরও সমস্যার অথবা আগ্রহের রূপ দেখতে পাবেন। এই কারণে শতেক যুগের কবিদল মহাভারত থেকে তাঁদের রচনার আখ্যানবস্তু আহরণ করেছেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্লাসিক সাহিত্যের তুলনায় ভারতের ক্লাসিক এই মহাভারত কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। এই মহাভারতই বস্তুত ভারতের সাধারণ লোকসাহিত্যে পরিণত হয়েছে। ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষরের মনও মহাভারতীয় কাহিনীর রসে লালিত। ভারতীয় চিত্রকরের কাছে মহাভারত হলো রূপের আকাশপট, ভাস্করের কাছে মূর্তির ভাণ্ডার। গ্রাম-ভারতের কথক ভাট চারণ ও অভিনেতা, সকল শ্রেণীর শিল্পী মহাভারতীয় কাহিনীকে তার নাটকে সংগীতে ও ছড়ায় প্রাণবান ক'রে রেখেছে। মহাভারতের কাহিনী এবং কাহিনীর নায়ক-নায়িকার চরিত্র ও রূপ ভারতীয় ভাস্কর স্থপতি চিত্রকার নট নর্তক ও গীতকারের কাছে তার শিল্পসৃষ্টির শত উপাদান, ভাব, রস, ভঙ্গী, কারুমিতি ও অলংকারের যোগান দিয়েছে। মহাভারত গ্রন্থ প্রতিশব্দ উপমা ও পরিভাষার অভিধান। ভারতের জ্যোতির্বিদ মহাভারতীয় নায়ক-নায়িকার নাম দিয়ে তাঁর আবিষ্কৃত ও পরিচিত গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহের নামকরণ করেছেন। আকাশলোকের ঐ কালপুরুষ অরুন্ধতী রোহিণী চন্দ্র বুধ ও কৃত্তিকা, কতগুলি জ্যোতিষ্কের নাম মাত্র নয়—ওরা সকলেই এক-একটি কাহিনীর, এক-একটি প্রীতি ভক্তি ও রোমান্সের নায়ক-নায়িকা। গঙ্গা নর্মদা যমুনা ও কৃষ্ণবেণা—কতগুলি নদীর নাম মাত্র নয়, ওরাও কাহিনী। ভারতের বট অশোক শাল্মলী করবী ও কর্ণিকার উদ্ভিদ মাত্র নয়, তারাও সবাই এক-একটি কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা। নৈসর্গিক রহস্য ও মেরুজ্যোতির অভ্যন্তরে কাহিনী আছে, সামুদ্র বাড়বানলের অন্তরালে কাহিনী আছে, সপ্তাশ্বযোজিত রথে আসীন সূর্যের উদয়াচল থেকে শুরু ক'রে অস্তাচল পর্যন্ত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী আছে। মহাভারতীয় কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নাম হলো ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নদী ও হ্রদের নাম। ভারতীয় শিশুর নাম-পরিচয়ও মহাভারতীয় চরিত্রগুলির নামে নিষ্পন্ন হয়।

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানগুলির বৈচিত্র্য আরও বিস্ময়কর। উপাখ্যানগুলি যেন প্রণয়তত্ত্বেরই মনোবিশ্লেষণ। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ইত্যাদি লোকসমাজের অতিপরিচিত উপাখ্যানগুলি ছাড়াও এমন আরও বহু উপাখ্যান মহাভারতে আছে, যেগুলি লোকসমাজে তেমন কোন প্রচার লাভ করেনি। এইসব অল্প-প্রচারিত উপাখ্যানও প্রেমের রহস্য বৈচিত্র্য ও মহত্ত্বের এক একটি বিশেষ রূপের পরিচয়। ভারত প্রেমকথার বিশটি গল্প এই রকমই বিশটি মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের পুনর্গঠিত অথবা নবনির্মিত রূপ; উপাখ্যানের মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রেখে এবং মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর অভিব্যাক্তি দান করার জন্যই মাঝে মাঝে নতুন ঘটনা কল্পিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ

ইন্দু ও শ্রুবাবতী

আশ্রমবাসিনী এক তপস্বিনী নারীর ধ্যাননিমীলিত নেত্র বার বার চমকে জেগে ওঠে। সে তপস্বিনীর নাম শ্রুবাবতী।

আশ্রমের সম্মুখে বনবীথিকা, সেই বনবীথিকার ছায়াময় শান্তিকে যেন চমকে দিয়ে ঘুরে

বেড়ায় কোন এক রহস্যের কুণ্ডলদ্যুতি। শ্রুবাবতীর মনে হয়, অন্তরীক্ষের বক্ষ হতে একটি জ্যোতির্ময় কৌতূহল ভূতলে এসে বনবীথিকার নীপ চম্পক ও নীলাশোকের ছায়ানিবিড় স্নিগ্ধতার বক্ষ অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়।

ঋষি ভারদ্বাজ দুশ্চর এক তপশ্চর্যা গ্রহণ করবেন বলে হিমালয়ে চলে গিয়েছেন। আশ্রমকুটীরে একাকিনী বাস করে তাঁর তপস্বিনী কন্যা শ্রুবাবতী। পীতকৌশেয়বসনা ও একবেণীধরা শ্রুবাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গিয়েছেন পিতা ভারদ্বাজ। কঠোর ব্রহ্মব্রত যাপন ক'রে কুমারী শ্রুবাবতী তার কামনাময় মনোলোকের সকল কল্পনাকে ক্লিষ্ট করছে দেখে সুখী হয়েছেন ভারদ্বাজ। দেখে গিয়েছেন ভারদ্বাজ, প্রভাতকল্পা শর্বরীর মত সুন্দর যে-কুমারীর অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের উদ্ভাস ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সেই কুমারী স্বেচ্ছায় পাংশুলিপ্তা স্বর্ণরেখার মত নিষ্প্রভ হয়ে আশ্রমের ছায়াতরুতলে পড়ে থাকে।

চলে গিয়েছেন ঋষি ভারদ্বাজ। অতন্দ্রিত সবিতা কালচক্রে ধাবিত হয়ে অনেক দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেছেন। এবং তপস্বিনী শ্রুবাবতীও অনেক তপস্যা করেছে। ষড়ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত বনস্থলীর বক্ষে অনেক বর্ণচ্ছটা ও অনেক সৌরভ এসেছে আর চলে গিয়েছে। তপস্বিনী শ্রুবাবতীর দুই চক্ষুর ধ্যান কোন মুহূর্তেও বিচলিত হয়নি।

কিন্তু কে জানে, কি ছিল সেদিনের সেই আলোকে অনিলে ও সলিলে? এক প্রভাতে তপস্বিনী শ্রুবাবতীর জাগ্রত চক্ষুর দৃষ্টিকে যেন ক্ষণবিহ্বলতায় নিবিড় ক'রে দিয়ে এবং সেই বিহ্বল দুই চক্ষুতে নূতন এক ধ্যানের আবেশ সঞ্চারিত ক'রে চলে গেল নয়নমোহন এক রহস্যের কুণ্ডলদ্যুতি। এই প্রভাতের মত কত প্রভাতে বনস্থলীর বক্ষের নিভৃতে কলনাদিনী তটিনীর সলিলে স্নান করেছে শ্রুবাবতী. এবং মুক্তাময় সিকতার অজস্র দ্যুতিচ্ছবি দুই পায়ের উপেক্ষায় পিষ্ট ক'রে আশ্রমের কুটীরে ফিরে এসেছে। সিকতার সেই মুক্তার দ্যুতি কোনদিন যার দুই চক্ষুর কৌতূহল চমকিত করতে পারেনি, তারই দুই চক্ষু দুটি কুণ্ডলের দ্যুতি দেখে বিস্মিত হয়। কে ঐ পথিক, চমকিত চামীকরকিরণে রচিত কলেবর যেন যৌবনায়িত লাবণ্যের চলোচ্ছল ছবি বিচ্ছুরিত ক'রে চলে যায়? কোথা থেকে এল আর কোথায় চলে গেল সেই দীপ্তকান্ত রূপমান? মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতির চেয়ে কত নয়নাভিরাম তার নয়নদীধিতি!

তপস্বিনী শ্রুবাবতী যেন তার হৃদয়ের বিচলিত নিঃশ্বাসের মধ্যে ঐ প্রশ্ন আর বিস্ময়ের ধ্বনি শুনতে পায়। নিজ করকঙ্কণের শব্দে শঙ্কিতা অভিসারিকার মত চমকে ওঠে আর লজ্জিত হয় শ্রুবাবতী। তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভার যেন চূর্ণ হবার জন্য শিউরে উঠেছে। দ্রুত ছুটে চলে যায় শ্রুবাবতী। আশ্রমকুটীরের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃতের ভিতরে এসেও কি-যেন অন্বেষণ করে শ্রুবাবতী। তপস্বিনী তার ক্ষণবিহ্বল নেত্রের এক ভয়ঙ্কর উদ্‌ভ্রান্তিকে লুকিয়ে ফেলবার জন্য গভীরতর এক অন্ধকারের আশ্রয় চায়।

সুস্থির হয়ে ধ্যানাসনে উপবেশন করে তপস্বিনী শ্রুবাবতী। কিন্তু বুঝতে পারে, আজিকার প্রভাতের আলোক তপস্বিনীর দুই চক্ষুর উপর অতি কঠোর এক নিষ্ঠুরতার সাধ সফল ক'রে নিয়েছে। শ্রুবাবতীর নয়নপ্রান্ত হতে তপ্ত মুক্তাফলের মত দুটি অশ্রুবিন্দু স্খলিত হয়, ধ্যানহারা তপস্বিনীর কৌশেয় বসনের প্রান্ত সিক্ত ক'রে তোলে।

সত্যই তপস্বিনীর নেত্রে নূতন এক স্বপ্নের আবেশ সঞ্চারিত হয়। দুটি কুণ্ডলদ্যুতির স্বপ্ন। ভুলতে পারে না শ্রুবাবতী, এবং নিজের হৃদয়ের বিরুদ্ধেও আর বৃথা সংগ্রাম করে না। কে সে? কেন এল, কোথা হতে এল, আর কোথায় চলে গেল? সে পুরুষের দুই নেত্রে যেন অন্তরীক্ষের সকল নীলিমার পীযূষ নিবিড় হয়ে রয়েছে। কে জানে, ধূলিময় এই মর্ত্যলোকের কোন শ্যামলতার জন্য পিপাসা নিয়ে বনবীথিকার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় সেই বিপুল রূপের পুরুষ!

পীতকৌশেয় বসনে আবৃতা এক প্রেমিকার কামনা যেন প্রতিক্ষণ তপস্যা করে। বিশ্বাস করে শ্রুবাবতী, তার এই নূতন তপস্যা ব্যর্থ হবে না। আশ্রমের তরুলতা ও পুষ্পের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় শ্রুবাবতী, মর্ত্যলোকের কামনাগুলি যেন এক সুন্দর দয়িতকে জীবনে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রতিক্ষণ তপস্যা করছে। মনে হয়, তৃষ্ণার্ত ধূলিকণিকা অন্তরের সকল কামনা দিয়ে আহ্বান করছে বলেই আকাশচর জলদ ধারা-বিগলিত আবেগে ভূতলে এসে স্নেহ লুটিয়ে দেয়। লতিকার আহ্বান শোনে দক্ষিণসমীর, কিশলয়ের আহ্বান শোনে প্রভাতমিহির। মর্ত্যের পুষ্প লতিকা আর কিশলয়ের মত নীরব তপস্যায় এক মর্ত্যনারীর কামনা যদি অহরহ তার জীবনপ্রিয় দয়িতকে আহ্বান করে, তবে সে কি না এসে থাকতে পারে? নিমীলিত নেত্রে নিবিড় স্বপ্নের আবেশ ভয়ে দিয়ে সে হৃদয়দয়িতের কুণ্ডলদ্যুতিকে হৃদয়ের মধ্যে দেখতে পায় শ্রুবাবতী।

বুঝি সফল হবে আশ্রমবাসিনী এক মর্ত্যনারীর কামনার তপস্যা। ধ্যান-নিমীলিত চক্ষু হঠাৎ চমকে জেগে ওঠে এবং মনে হয় শ্রুবাবতীর, সেই কুণ্ডলদ্যুতি যেন নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে শ্রুবাবতী, আশ্রম-প্রাঙ্গণের প্রান্ত পার হয়ে ছায়াচ্ছন্ন বনবীথিকার নীরব পবনের বক্ষে মৃদুপুলকিত পদধ্বনির সঙ্গীত উপহার দিয়ে চলে গেল এক অধ্বনীন। শ্রুবাবতী তার স্বপ্নভারালস দুই নিমীলিত চক্ষুর দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে আশ্রমপ্রাঙ্গণের বাহিরে এসে দাঁড়ায়। বনবীথিকার দিকে দুই জাগ্রত চক্ষুর তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

ষড়ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত বনস্থলীর মত পীতকৌশেয়বসনা প্রেমিকা শ্রুবাবতীরও অন্তরলোকে বিচিত্র বাসনার উৎসব লীলায়িত হয়। পাটল কুসুমের গন্ধভার তপ্ত ক'রে নিয়ে গ্রীষ্মের সঞ্চার দেখা দেয়। পরুষ পবনবেগে বনস্থলীর শুষ্ক পত্ররাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে কাতর উচ্ছ্বাস ছড়ায়। শুষ্ক বেণুবনে যেন জ্বালা-বিমথিত পঞ্জরের ক্রন্দন বাজে। মধ্যাহ্নের নিদাঘার্ত বনবীথিকার বক্ষ হতে উৎসারিত ক্ষিপ্ত ধূলির মত্ততার দিকে দুই অপলক নয়নের উত্তপ্ত আগ্রহ প্রসারিত ক'রে তাকিয়ে থাকে শ্রুবাবতী। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, সেই রূপমানের কুণ্ডলের দ্যুতি অদূরের এক উদ্দালকের ছায়ার স্নেহ আহরণ করছে। শ্রুবাবতীর মন বলে, কাছে এস পথিক, তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভার এখনি বিগলিত হয়ে বিপুল চিকুরচ্ছায়া ছড়িয়ে দেবে। সে ছায়ার সব শীতলতা আর স্নেহ গ্রহণ ক'রে সুখী হও তুমি।

প্রাবৃষার মেঘারবে চাতকীর হর্ষ ধ্বনিত হয় আকাশে, আর শ্রুবাবতী তেমনি আশ্রমপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, পুলকাঙ্কুরে সঙ্কুলতনু ভুকদম্বের কাছে দাঁড়িয়ে আছে শ্রুবাবতীর তপস্যার আকাঙ্ক্ষিত সেই পথিক। নববারিস্নানে বনভূমির বক্ষের তৃণাঙ্কুর বৈদূর্যমণির মত ফুটে ওঠে ; জেগে ওঠে মদকলকণ্ঠ ময়ূরের কেকা। শ্রুবাবতীর জটায়িত বেণীভারের উপর ঝরে পড়ে সিক্ত স্নিগ্ধ অর্জুনের মঞ্জরী। দ্বিধা করে না, বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না, তপস্বিনী অবাধ আগ্রহে বাহু প্রসারিত ক'রে তুলে নেয় সেই মঞ্জরী। ইচ্ছা করে, স্নিগ্ধ অর্জুনের এই মঞ্জরীকে কর্ণভূষণ ক'রে নিয়ে এই মুহূর্তে এই তপস্বিনীর বেশ মিথ্যা ক'রে দিতে এবং ছুটে চলে যেতে তারই কাছে, যে প্রিয়দর্শনের কুণ্ডলদ্যুতি এখন ঐ ভুকদম্বের ছায়ার নিবিড়তার মধ্যে ফুটে রয়েছে। কিন্তু পারে না শ্রুবাবতী, আশ্রমের পুষ্প লতিকা ও কিশলয়ের মত মর্ত্যনারীর কামনাও যেন শুধু নীরবে তাকিয়ে বাঞ্ছিতকে আহ্বান করে, তুমি কাছে এসে সিক্ত অর্জুনের মঞ্জরী নিজ হাতে তুলে নিয়ে তাপসিকার দুই কানে দুলিয়ে দিয়ে যাও পথিক।

শারদ নভঃপটের অভ্রমালায় ও ভূতলের নবকাশবনের বক্ষে অমলধবল উৎসবের হর্ষ জাগে। অনিলপ্রকম্পিত বনান্তের সপ্তপর্ণ, কাননের কোবিদার ও উপবনের কুরুবকের যৌবন উল্লসিত হয়। নিবিড়তর হয়ে ফুটে ওঠে নীলোৎপলের নীলিমা আর বন্ধুজীবের রক্তিমা। সরোবরতটের হংসরুতানুনাদ আর শালিধান্যের সৌরভে বিচলিত ক্ষিতিরসরভস বায়ু

প্রেমতাপসিকা শ্রুবাবতীর অন্তরে যেন সুধ্বনিময় সঙ্গীতের মুখরতা ও নিবিড় সৌগন্ধ্যের আবেশ বর্ষণ করে। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, সেই পথিকের কুণ্ডলদ্যুতি নিকটতর হয়েছে। কোবিদার তরুর কম্পিত পল্লবের চঞ্চল ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পথিক। শ্রুবাবতীর মন বলে, কাছে এসে অনুভব ক'রে যাও পথিক, তোমারই জন্য কি দুঃসহ চঞ্চলতা সহ্য করছে ধ্যানহারা ধ্যানিনীর বক্ষের অনিল।

তপস্বিনীর কোমল কপোলে নবস্ফুট লোধ্রের রেণু ছড়িয়ে দেয় হেমন্তের কৌতুকসমীর। শিশিরস্নেহে শিহরিত অঙ্গ নিয়ে মৃগাঙ্গনা বনপথে ছুটে চলে যায়। প্রিয়ঙ্গুলতিকার দেহে পাণ্ডুর অভিমান শিহরিত হয়। ক্রৌঞ্চনাদে হৃদয় চমকিত হলেও তপস্বিনী শ্রুবাবতীর অপলক নয়নের দৃষ্টি তেমনি অবিচলিত আগ্রহ নিয়ে বনবীথিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। এসেছে, আরও নিকট হয়ে এসেছে শ্রুবাবতীর সকল ক্ষণের আশার বাঞ্ছিত সেই পথিকের মূর্তি। বনবীথিকার যে কিংশুকের রক্তিমা শিখা হয়ে জ্বলছে, সেই কিংশুকের কাছে জ্বলছে সেই কুণ্ডলদ্যুতি। তপস্বিনীব কোমল কপোলে লোধ্ররেণুর চুম্বন লিপ্ত হয়ে থাকে। রেণুময় সে চুম্বনের চিহ্ন মুছে ফেলতে চায় না, পারেও না শ্রুবাবতী। শ্রুবাবতীর মন বলে, কাছে এসে জেনে যাও পথিক, তপশ্চারিণীর কপোলের এই রেণুময় চিহ্ন চকিত চুম্বনে মুছে দেবার অধিকার শুধু তোমারই অধরের আছে।

হিমকণ্টকিত শীতবায়ুর নখরে আহত বনবীথিকার শাখী শ্যামপল্লবের সমারোহ হারিয়ে রিক্ত হয় ; কিন্তু রিক্ত হয় না তপস্বিনীর নয়নের কৌতূহল। ইক্ষুবনের সৌরভ বক্ষে ধারণ ক'রে অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে অলস শীতানিল, আর তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়নও চঞ্চল হয়ে শুধু লক্ষ্য করে, সেই পথিকের কুণ্ডলদ্যুতি আশ্রমপ্রান্তের সন্নিকটে নক্তমালকুঞ্জের ছায়াবিরল নিভৃতের কাছে এসে স্থির হয়ে রয়েছে। তপস্বিনীর পীতকৌশেয় বসনের অঞ্চল যেন নিজেরই শিথিলিত লজ্জার শিহর সহ্য করতে গিয়ে আরও বিবশ ও বিচলিত হয়। শ্রুবাবতীর মন বলে, কাছে এসে সুখী হও পথিক। ছিন্ন কর তপস্বিনীর এই পীতকৌশেয় আবরণের শাসন। রিক্ত হিমবায়ুর স্পৃহা মিথ্যা ক'রে দিয়ে তোমার তপ্ত ও মত্ত দুই বাহুর কামনা খরায়িত ক'রে নখবিলিখনে আলিম্পিত কর তোমারই প্রণয়কামিনী এই তাপসিকার বিবশ তনু।

আশ্রমপ্রাঙ্গণের নীলাশোকের আশা পল্লবিত ক'রে দেখা দিল পিকরবমুখর বসন্তের দিন। তাম্রপ্রবালের ভারে বিনম্র আম্রদ্রুমবাহু যেন আগ্রহভরে নিখিলের ভৃঙ্গগুঞ্জরণ আর বিহঙ্গরবের মধুরতাকে আপন ক'রে নেবার জন্য বুকের কাছে পেতে চাইছে। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, তাঁর জাগ্রত নয়নের তপস্যার বাঞ্ছিত সেই পথিক সত্যই স্মিতহাস্যের সুষমায় বসন্তদিনের সব সুন্দরতাকে মধুর ক'রে দিয়ে চক্ষুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

আগন্তুকের কুণ্ডলদ্যুতির হাস্য আরও প্রখর হয়ে ওঠে।—ঐ পীতকৌশেয় বসন আর জটায়িত বেণীভারের বন্ধনে জীবন ও যৌবন ব্যথিত ক'রে কোন সুখের জন্য তপস্যা করছ, ভারদ্বাজতনয়া?

শ্রুবাবতী বলে—এই পীতকৌশেয় বসন আর জটায়িত বেণীভার আপনারই প্রেমাভিলাষিণী এক নারীর দেহ মন ও প্রাণের কামনাকে গোপন ক'রে রেখেছে, মিথ্যা তপস্বিনীর মিথ্যা ক্লেশ বেশ ও কৃচ্ছ্র ক্ষমা করুন, অনঘ।

আগন্তুকের নয়নের বিস্ময় কৌতুকে দীপ্ত হয়ে ওঠে।—তুমি আমার প্রেমাভিলাষিণী?

শ্রুবাবতী—হ্যাঁ, প্রিয় অতিথি।

আগন্তুক—তুমি জান আমার পরিচয়?

শ্রুবাবতী—জানি না, জানবার সৌভাগ্য হয়নি কখনও, জানতে ইচ্ছাও করি না ধীমান। শুধু জানি, তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়ন হতে তার সকল ধ্যান কেড়ে নিয়ে সে-নয়নে এক

বিপুলমধুর স্বপ্নের আবেশ সঞ্চারিত করেছে যে প্রিয় মূর্তি সে-মূর্তি আপনারই মূর্তি। ব্রহ্মব্রতিনীর ভুল তপস্যায় তামসিত হৃদয়ের মিথ্যাকে মিথ্যা ক'রে দিয়ে আপনারই কুণ্ডলদ্যুতি আশ্রমবাসিনী শ্রুবাবতীর নয়নের স্বপ্নকে জ্যোৎস্নায়িত করেছে। তপস্বিনীকে করেছে প্রেমিকা।

আগন্তুক—ভুল বুঝেছ আশ্রমবাসিনী নারী, তোমার সাত্ত্বিত বা তামসিত, সত্য অথবা মিথ্যা, কোন তপস্যাকেই মিথ্যা ক'রে দেবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।

শ্রুবাবতী—আমার ভুল বুঝতে পারছি না, মহাভাগ। আপনি বলুন আপনার মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতি এই বনবীথিকার ছায়ায় ছায়ায় এতদিন ধ'রে কোন লতিকার শ্যামলতা আর স্নিগ্ধতা সন্ধান ক'রে ফিরেছে?

আগন্তুক—এই মর্ত্যের কোন শ্যামলতা আর স্নিগ্ধতার জন্য আমার বক্ষে ও নয়নে কোন তৃষ্ণা নেই, ঋষিকুমারী। শুধু আছে কৌতূহল।

শ্রুবাবতী—এ কেমন কৌতূহল?

আগন্তুক—শুধুই কৌতূহল। মর্ত্যের এক আশ্রমবাসিনী নারী কার জন্য অথবা কিসের জন্য তপস্যা করে, শুধু এই একটি কৌতূহলের তৃপ্তির জন্য ঋষি ভারদ্বাজের আশ্রমের দিকে তাকিয়ে দেখেছে সুরপতি ইন্দ্রের চক্ষু।

চমকে ওঠে শ্রুবাবতীর দুই চক্ষুর বিস্ময়।—আপনি সুরপতি ইন্দ্র?

হেসে ওঠে ইন্দ্র।—হ্যাঁ শ্রুবাবতী, স্বর্গাধীশ বাসবের নয়ন শুধু এইটুকু জানতে চায়, এই মর্ত্যের কোন তপস্বী তার কোন তপস্বিনীর ধ্যানে স্বর্গবাসনা আছে।

শ্রুবাবতী—তপস্বিনীরূপিণী শ্রুবাবতীর নয়নে আর কোন ধ্যান নেই, শুধু আছে একটি স্বপ্ন এবং সে স্বপ্নের বিন্দুমাত্র স্বর্গবাসনা নেই বাসব।

ইন্দ্রের দুই নয়নের কৌতূহল যেন ক্ষীণ বিদ্রূপের বিদ্যুতের মত শিহরিত হয়ে মর্ত্যনারীর এই মধুরভণিত অহংকারের ভুল ধরিয়ে দিতে চায়। ইন্দ্র বলেন—স্বর্গ চাও না, কিন্তু স্বর্গপতি বাসবের প্রণয় লাভের বাসনায় স্বপ্নায়িত ক'রে রেখেছ জীবন ও যৌবনের কামনা, কী অদ্ভুত তোমার স্বপ্ন শ্রুবাবতী!

শ্রুবাবতী—আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারীর স্বপ্নকে আপনি ভুল বুঝেছেন স্বর্গাধীশ। স্বর্গকে নয়, স্বর্গাধীশ ইন্দ্রকেও নয়, এই মর্ত্যেরই বনবীথিকাচারী এক সুন্দর পথিকের যৌবনবিমোহিত তনুশোভাকে ভালবেসেছে শ্রুবাবতী, উপবনের মাধবী যেমন নয়ন-নিকটের সহকারতরুর তরুণতনুর শোভাকে ভালবাসে। স্বর্গকে চাইনি, স্বর্গপতিকেও চাইনি। কোন দিনের কোন মুহূর্তে মনে হয়নি, বনতরুর ছায়ায় ছায়ায় যার কুণ্ডলদ্যুতি অপার্থিব এক জ্যোৎস্নায় হর্ষ সঞ্চার ক'রে ঘুরে বেড়ায়, সে হলো অমরলোকের বৃন্দারকবন্দিত বাসব। আমার নয়নের প্রতীক্ষা শুধু তাকেই চেয়েছে, যে আমার নয়নে এনে দিয়েছে প্রথম বিস্ময়, প্রথম মুগ্ধতা, অনুরাগে রঞ্জিত প্রথম ক্ষণবিহ্বলতা। বনবীথিকার এক পথিক আমার নয়নবীথির পথিক হয়েছে। সে পথিকেরই জন্য আশ্রমবাসিনী নারী এতদিন প্রতীক্ষার তপস্যা করেছে।

ইন্দ্র—এমন প্রতীক্ষার কোন অর্থ হয় না, শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আমার প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে, বাসব।

ইন্দ্র—কি বলতে চাও, ঠিক বুঝতে পারছি না।

শ্রুবাবতী—মর্ত্যনারী আমি, ষড়ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত এই মর্ত্যের সকল পুষ্প ও কিশলয়ের কামনার মত আমারও কামনা প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষায় তপস্যা করেছে। এবং সে প্রতীক্ষা সফলও হয়েছে। আমার জীবনের নিদাঘের নিঃশ্বাস আজ মধুময় বসন্তের সৌরভকে কাছে পেয়েছে। এসেছেন আপনি, মর্ত্যনারীর প্রতীক্ষাকে আপনি তুচ্ছ করতে পারেননি, স্বর্গাধীশ।

ইন্দ্র—স্বর্গাধীশ বাসবের চক্ষু কোন মুগ্ধতা নিয়ে তোমার সম্মুখে আসেনি, শ্রুবাবতী। তোমার প্রতীক্ষার টানে নয় ; আমি এসেছি আমার কৌতূহলের তৃপ্তির জন্য।

নিদাঘতাপিতা বনলতিকার মত ব্যথিতভাবে শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রুবাবতী। ইন্দ্র বলেন—মর্ত্যের প্রতীক্ষার টানে স্বর্গ কাছে নেমে আসে না, ঋষিকুমারী। এমন দুরাশার ভুল বর্জন কর, ভারদ্বাজতনয়া।

তেমনই নীরব হয়ে, যেন এই মিথ্যা দুরাশার লজ্জা সহ্য করবার জন্য নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রুবাবতী।

ইন্দ্র বলেন—স্বর্গপতি ইন্দ্রের কাছে প্রেম আশা করো না, মর্ত্যবাসিনী সুন্দরী মানবী। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আশা করো ইন্দ্রের অনুগ্রহ।

শ্রুবাবতী মুখ তুলে তাকায়—অনুগ্রহ?

ইন্দ্র—হ্যাঁ ঋষিতনয়া, স্বর্গ শুধু এই মর্ত্যকে করুণা করতে পারে, অনুগ্রহ করতে পারে, বর দান করতে পারে। তার বেশি কিছু পারে না। তার বেশি কিছু চাইবার অধিকারও এই মর্ত্যের কোন প্রেম প্রণয় ও কামনার নেই।

শ্রুবাবতী—আশ্রমবাসিনী এই মর্ত্যনারীর জীবনকে কিসের অনুগ্রহ করতে চান বাসব?

ইন্দ্র—যদি স্বর্গলোকে স্থিতি লাভের বাসনা থাকে, তবে তারই জন্য তপস্যা কর ভারদ্বাজতনয়া। যথাকালে এবং তপস্যার অন্তে তুমি স্বর্গলোকে স্থিতিলাভ করবে, দেবরাজ ইন্দ্রের এই অনুগ্রহের বাণী শুনে এখন প্রীত হও, শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আপনার অনুগ্রহের বাণী শুনে প্রীত হয়েছি বাসব কিন্তু আমার জীবনের কামনা আপনার এই অনুগ্রহ চায় না।

ইন্দ্রের মনের বিস্ময় ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে ওঠে—কি তোমার জীবনের কামনা?

শ্রুবাবতী—আশ্রমবাসিনী এই মর্ত্যনারীর দুই নয়নের সকল আগ্রহ ধন্য ক'রে দিয়ে এই নীলাশোকের ছায়ার কাছে আপনি আর একবার এসে দাঁড়াবেন, আর ভারদ্বাজতনয়া শ্রুবাবতী এই মিথ্যা তপস্বিনীর মূর্তি মুছে দিয়ে মধুবাসরিকা বধূর মত দয়িতের বক্ষ বরণ করবার জন্য আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে।

ইন্দ্র—ধন্য তোমার কামনার দুঃসাহস। কিন্তু শুনে রাখ দুরাশার নারী, মর্ত্যের আদেশ পালন করবার জন্য স্বর্গের মনে কোন আগ্রহ নেই।

অশ্রুসজল হয়ে ওঠে শ্রুবাবতীর চক্ষু। আদেশ নয় বাসব, মর্ত্যের প্রেম আশ্রমবাসিনী এই নারীর হৃদয়েয় পূজা হয়ে ফুটে উঠেছে ; এই ইচ্ছা পূজাচারিণীর হৃদয়ের ইচ্ছা।

ইন্দ্র—স্বর্গের কাছে যেতে চাও না, অথচ স্বর্গকে কাছে আনতে চাও, বিচিত্র এই পূজা পূজা নয় শ্রুবাবতী। স্বর্গের অপমান।

শ্রুবাবতী—স্বর্গের অপমান নয় বাসব, এই পূজা হলো পরাপূজা।

ইন্দ্র—সে কেমন পূজা?

শ্রুবাবতী—অমৃতত্ত্ববিহীন মর্ত্যনারী আমি, ক্ষণকালের মধুরতাকে অনন্ত ক'রে রাখি, চিরবিরহের বেদনাতে চিরমিলনের স্বাদ পাই, ক্ষণিক শুভদর্শনের জন্য মরজীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করি। আমার পরাপূজা বিরাজমানকে সতত আহ্বান করে, স্বচ্ছকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করে, নির্মলকে স্নান করায়, রম্যকে আভরণ দেয়, নিত্যতৃপ্তকে নৈবেদ্য দেয়, অনন্তকে প্রদক্ষিণ করে, বেদাধারকে স্তোত্রে বন্দনা করে, আর স্বপ্রকাশকে নীরাঞ্জন ক'রে সুখী হয়। বুকের কাছে পাওয়ার জন্যই মর্ত্যের প্রাণ স্বর্গকে মাটি মাখিয়ে একটু ছোট ক'রে নেয় স্বর্গপতি। শ্রুবাবতীর প্রেমও স্বর্গপতি বাসবকে এই ধূলিময় ভূতলের তরুচ্ছায়ার কাছে প্রিয় অতিথির মত নয়নের সম্মুখে দেখতে চায়।

ইন্দ্র—তা হয় না শ্রুবাবতী। তুমি তোমার এই প্রেমাভিলাষ বর্জন কর। স্বর্গপতির জীবনের

কোনক্ষণের কৌতূহল ভুলেও প্রেমাভিলাষ হয়ে তোমার আশ্রমের নীলাশোকের ছায়ার কাছে কোনদিন ফিরে এসে দাঁড়াবে না।

শ্রুবাবতী--কিন্তু আমি প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকব, বাসব।

কপট তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভার নূতন এক প্রতিজ্ঞার আবেগে শিউরে উঠেছে। দেখে বিস্মিত ও বিরক্ত হন ইন্দ্র। স্বর্গপতির অধরে অবিশ্বাসের মৃদু বিদ্রূপের রেখা হেসে ওঠে।--কতকাল প্রতীক্ষা করবে, মরজীবনের নারী?

শ্রুবাবতী বলে--এই মরজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

চলে গেলেন বাসব, নীলাশোকের ছায়া তেমনি সুস্থির হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে থাকে।

কালচক্রে ধাবিত হয়ে অতন্দ্রিত সবিতা দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেন এবং স্বর্গাধীশ বাসব একদিন তাঁর নিজেরই অন্তরের ভিতরে এক কৌতূহলের ধ্বনি শুনে চমকে ওঠেন ও বিস্মিত হন। মর্ত্যের এক আশ্রমবাসিনী নারী নীলাশোকের ছায়ার কাছে এখনও কি স্বর্গাধীশ বাসবের পদধ্বনি শুনবার জন্য প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? অসম্ভব, বিশ্বাস হয় না বাসবের, এবং এই মিথ্যা কৌতূহলের বিরুদ্ধে ভ্রূকুটি হেনে আশ্বস্ত হতে চেষ্টা করেন বাসব। মনে হয়, মৃত্তিকাময় জগতের সে-নারীর প্রেম ও প্রতীক্ষা বনব্রততীর ক্ষণপুষ্পিত শোভার মত সেই বসন্তেরই চৈত্রশেষের সমীরিত হাহাকারে শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু প্রতীক্ষার জন্য প্রতীক্ষা, আশ্রমবাসিনী নারীর এত বড় অহংকারের ঘোষণা নিজেরই মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

শুধু জানতে ইচ্ছা করে বাসবের, মধুরপ্রলাপিনী পরভৃতার মত কলভাষিণী সেই মানবীর প্রেম নূতন সঙ্গীত হয়ে আজিকার এই নববসন্তের প্রভাতে সেই নীলাশোকের ছায়ার কাছে কোন নূতন অতিথিকে বন্দনা করে? বনস্থলীর নিভৃতে পদ্মরাগে অরুণিত তটিনীতটের সরণিতে সে যৌবনবতীর অভিসার আজ-অলক্তের চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে কোন নূতন দয়িতের আলিঙ্গন লাভের জন্য ছুটে চলে যায়? বনসরসীর মুকরায়িত সলিলের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে লোধ্ররেণুলিপ্ত কোমল কপোলের উপর কোন প্রেমিকের দশনদানে রচিত চুম্বন-ক্ষতচ্ছবি দেখে হেসে ওঠে নারী? কৌতূহল, বড় তীব্র কৌতূহল, স্বর্গাধীশ বাসবের নয়ন যেন দূর মর্ত্যলোকের এক বনবীথিকার দিকে তাকাবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আর বিলম্ব করেন না বাসব। স্বর্গপতির স্যন্দননেমির হর্ষ মত্ত আবেগে ছুটে চলে এবং সেই বনবীথিকার নিকটে এসে শান্ত হয়। দেখতে পান বাসব, দূরান্তের সেই আশ্রমের প্রাঙ্গণে সেই নীলাশোকেরই কাছে ছায়াময়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অচঞ্চলা তপস্বিনীর রিক্তা ও নিরাভরণা মূর্তি।

বিস্মিত হন বাসব। সত্যই যে জীবনের প্রথম নয়নবিহ্বলতায় বন্দিত বনবীথিকাচারী এক পথিকের প্রেমের জন্য অফুরান প্রতীক্ষা সহ্য করছে শ্রুবাবতী! সত্যই কি স্বর্গের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই শ্রুবাবতীর মনে?

সুরপতি ইন্দ্রের কৌতূহল তাঁর এই চঞ্চলিত চিত্তের সব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। ভারদ্বাজতনয়া শ্রুবাবতীর প্রেম ও প্রতীক্ষার নিষ্ঠাকে একটি সুন্দর ছলনা দিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হন ইন্দ্র। লুকিয়ে ফেলেন দ্যুতিময় কুণ্ডলের মণি। বনবাসী ঋষিযুবার ছদ্মবেশ ধারণ করেন ইন্দ্র।

ধীরে ধীরে ছায়াচ্ছন্ন বনবীথিকার স্নিগ্ধতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন ইন্দ্র। সুন্দরদর্শন এক ঋষিযুবা। তার কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত, ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্রক, মস্তকে জটাভার, কর্ণে স্ফটিকমালা, হস্তে আষাঢ়দণ্ড ও স্কন্ধে কৃষ্ণাজিন। যেন এই বনলোকের এক পিপাসিত তপস্যার মূর্তি দূরান্তের আশ্রম-প্রাঙ্গণের এক নীলাশোকের ছায়ার দিকে তৃষ্ণার্ত দুই চক্ষুর কৌতূহল উৎসারিত ক'রে এগিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু চমকে ওঠে না নীলাশোকের ছায়া। পীতকৌশেয়বসনা তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভারে কোন বিস্ময়ের শিহরণ জাগে না। আগন্তুক ঋষিযুবার মুখের দিকে নিষ্কম্প শান্ত দৃষ্টি তুলে নীরবে সম্মান জ্ঞাপন করে শ্রুবাবতী।

ঋষিযুবা বলে—আমি তপস্বী বশিষ্ঠ।

শ্রুবাবতী—আমি ভারদ্বাজতনয়া শ্রুবাবতী।

বশিষ্ঠ—আমি তোমার আশ্রমের অতিথি শ্রুবাবতী ; অতিথির প্রাপ্য সকল সমাদর আমি তোমার কাছে আশা করি আশ্রমবাসিনী।

শ্রুবাবতী—অতিথির প্রাপ্য সকল সমাদর অবশ্যই পাবেন ঋষি।

তরুণ বশিষ্ঠের নয়নের হর্ষ অকস্মাৎ এক নিবিড়মদির আবেদনে মন্থর হয়ে ওঠে। তাপিত বনমৃগের মত ব্যাকুল হয়ে নীলাশোকের ছায়ার আরও নিকটে এগিয়ে আসেন বশিষ্ঠ। প্রণয়োচ্ছল স্বরে আহ্বান করেন বশিষ্ঠ—শ্রুবাবতী!

শ্রুবাবতী—আদেশ করুন ঋষি।

বশিষ্ঠ—শুধু অতিথির প্রাপ্য সমাদর নয়, আশ্বাস দাও শ্রুবাবতী, তোমার সমাদরে অতিথির সকল আশা তৃপ্ত হবে।

শ্রুবাবতী—ক্ষমা করুন ঋষি, ভারদ্বাজতনয়ার কাছে এমন আশ্বাস আশা করবেন না।

বশিষ্ঠ—আমার সকল পুণ্য তুমি গ্রহণ কর শ্রুবাবতী, বিনিময়ে শুধু আশ্বাস দাও, তুমি আমার জীবনের সকল আনন্দের সহচরী হবে।

শ্রুবাবতী—ক্ষমা করুন পুণ্যবান, বৃথা এমন ভয়ংকর অনুরোধ ক'রে আশ্রমবাসিনী নারীর হৃদয়ের শান্তি ব্যথিত করবেন না।

বশিষ্ঠ—অকারণে ব্যথিত হয়ো না, শ্রুবাবতী। বশিষ্ঠের প্রিয়া হয়ে, বশিষ্ঠের পুণ্যে পুণ্যবতী হয়ে স্বর্গলোকে গিয়ে চিরসুখের জীবনে স্থিতি লাভ কব। আমার তৃপ্তি তোমারই মুক্তি হয়ে উঠবে শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আমার মনে স্বর্গের জন্য কোন লোভ, কোন উল্লাস আর কোন ক্রন্দন নেই।

বশিষ্ঠ—স্বর্গের জন্য লোভ না হোক, মুক্তকণ্ঠে বল দেখি সুধাহীনা এই বসুধার নারী, তোমার হৃদয়ে আর প্রদোষমুদিতা কুমুদ্বতীর মত তোমার ঐ কুণ্ঠাসুন্দর যৌবনকলিকার শোণিতে প্রণয়বিহ্বল পুরুষের প্রেমের জন্য কোন লোভ নেই?

শ্রুবাবতী—আছে ঋষি, পীতকৌশেয়বসনা তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়ন হতে সব ধ্যান কেড়ে নিয়ে সে-নয়নে প্রণয়স্মিত স্বপ্ন ভরে দিয়েছে যে পুরুষ, শুধু তারই প্রেমের জন্য লুব্ধ হয়ে আছি।

বশিষ্ঠ—কে সে?

শ্রুবাবতী—বাসব।

কপট বশিষ্ঠের নয়নে যেন অস্ফুট অথচ দুঃসহ এক বিশ্বাসের বিস্ময় চমকে ওঠে এবং ধীরে ধীরে প্রখর নয়নের কৌতূহল শান্ত ও নম্র হয়ে যায়। প্রশ্ন করেন বশিষ্ঠ—বাসবকে ভালবেসেছ তুমি, মর্ত্যনারী?

শ্রুবাবতী—হ্যাঁ ঋষি।

বশিষ্ঠ—কিসের জন্য?

শ্রুবাবতী—ভালবাসার জন্য।

বশিষ্ঠ—কিন্তু তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর শ্রুবাবতী, স্বর্গাধীশ বাসব কখনও ধূলিময় মর্ত্যের কুটীরে এসে এক ঋষিতনয়ার প্রেমের প্রতিদানে প্রেম নিবেদন করবেন?

শ্রুবাবতী—মর্ত্যনারীর জীবনে এত বড় বিশ্বাসের কিবা প্রয়োজন ঋষি? মর্ত্যের প্রাণ শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসতে জানে। জানি না, স্বর্গের প্রাণ কেন আর কেমন ক'রে

ভালবাসে।

বশিষ্ঠ—স্বর্গের প্রাণ ভালবেসে শুধু সুখী হয়, আর সুখের জন্য ভালবাসে।

শ্রুবাবতী—মর্ত্যের প্রাণ ভালবেসে বেদনা পায়, তবু ভালবাসে।

কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষু যেন আবার এই মর্ত্যপ্রেমের অহংকারের আঘাতে কঠোর হয়ে ওঠে। আরও কঠোর এক পরীক্ষার ইচ্ছা কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। মর্ত্যনারীর এই প্রেমের অহংকারকে আর একটি কঠিন ছলনার আঘাতে চূর্ণ ক'রে দিয়ে, তারপর সহাস্য করুণা আর সান্ত্বনা দিয়ে প্রেমিকা মর্ত্যনারীকে প্রীত ক'রে আর ধন্য ক'রে স্বর্গধামে চলে যাবেন স্বর্গাধীশ।

ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ফেনিলোচ্ছল স্বরে আদেশ করেন বশিষ্ঠ—শুধু অতিথির প্রাপ্য সমাদর তোমার কাছ থেকে আশা করি শ্রুবাবতী। তার বেশি কিছু আশা করি না।

শ্রুবাবতী—বলুন, কোন সমাদরে আপনি প্রীত হবেন?

বশিষ্ঠ তাঁর কমণ্ডলু হতে পাঁচটি ক্ষুদ্র বদরিকা বের ক'রে শ্রুবাবতীকে বলে—এই পাঁচটি বদরিকা রন্ধন কর। সুরন্ধিত এই পাঁচটি বদরিকাই আমার দিনান্তের ভোজ্য। সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই আমি আমার ভোজ্য গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হতে চাই।

শ্রুবাবতী—তথাস্তু ঋষি।

বশিষ্ঠ—কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে।

শ্রুবাবতী—বলুন।

বশিষ্ঠ—যদি অতিথিকে এই সামান্য সমাদরেও তৃপ্ত করতে তুমি অক্ষম হও শ্রুবাবতী, তবে ক্ষুণ্ন ও অপমানিত অতিথির অভিশাপও তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে শ্রুবাবতী—অভিশাপ?

বশিষ্ঠ—হ্যাঁ। কল্পনা করতে পার, কি অভিশাপ দেব আমি?

শ্রুবাবতী—না। আপনি বলুন।

বশিষ্ঠ—তোমার প্রেমের আস্পদ সেই বাসবকে তুমি চিরকালের মত ভুলে যাবে।

—অকরুণ ঋষি! শ্রুবাবতীর শিহরিত কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত ধ্বনিত হয়। পরক্ষণে, যেন নীলাশোকের চঞ্চলিত পল্লবের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসের স্পর্শে শান্ত হয়ে যায় শ্রুবাবতীর ত্রস্ত হৃদয়ের আর্ততা। দূরের বনবীথিকার ছায়াচ্ছন্ন অন্তরের দিকে তাকিয়ে কি-যেন চিন্তা করে শ্রুবাবতী। ধীরে ধীরে শান্ত ও কঠিন এক সংকল্পের আনন্দ তার অধররেখায় সুস্মিত হয়ে ওঠে।

শ্রুবাবতী বলে—অপেক্ষা করুন ঋষি। সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষিত ভোজ্য পাবেন।

কুটীরে প্রবেশ করে শ্রুবাবতী এবং একাকী নীলাশোকের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে কপট বশিষ্ঠের নয়নে সেই কঠোর কৌতুক আরও প্রখর হয়ে জ্বলে ওঠে। ইন্দ্রজালের মায়া আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারীর প্রেমের অহংকারকে আর একবার আক্রমণ করেছে। পাঁচটি মায়াবদরিকা নিয়ে কুটীরের ভিতর চলে গিয়েছে শ্রুবাবতী, কোন অগ্নিতাপে সে মায়াবদরিকা রন্ধিত হবার নয়।

মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিম দিগ্‌বলয়ের দিকে এগিয়ে চলে। ধীরে ধীরে অপরাহ্ণের আলোক নিষ্প্রভ হয়ে আসে। অস্তাচলের শিখরে আসন্ন সন্ধ্যার রক্তিম সঞ্চার জাগে। ইন্দ্রমায়ার কৌতুকে আশ্রমকুটীর হতে সকল ইন্ধনকাষ্ঠ সেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। অপলক নয়নে কৌতুক নিয়ে কুটীরদ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকেন কপট বশিষ্ঠ। মায়াবদরিকা রন্ধনে ব্যর্থ হয়ে, ইন্দ্রের মায়াভিশাপে অভিভূত প্রেমিকা শ্রুবাবতীর হৃদয় তার প্রেমের আস্পদ বাসবকে বিস্মৃত হয়ে ঐ কুটীরের ভিতর হতে ধীরে ধীরে এইখানে এসে, এই কপট বশিষ্ঠের সুন্দর মুখের দিকে তাকাবে। আর কতক্ষণ? অস্তাচলচূড়ার অন্তরালে ক্লান্ত তপনের শেষ রশ্মি বিদায়

নেবার জন্য থরথর ক'রে কাঁপছে।

কিন্তু কই, ঐ নীরব কুটীরের বক্ষে কোন আর্তনাদ এখনও কেন জাগে না? কিংবা স্মৃতিহারা শূন্য হৃদয়ের নূতন কৌতূহল নিয়ে ধীরে ধীরে এখনও কেন নীলাশোকের ছায়ার দিকে এগিয়ে আসে না সেই নারী?

কপট বশিষ্ঠ তাঁর অন্তরের এই বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে কুটীরের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ান।

অকস্মাৎ দারুমূর্তির মত স্তব্ধীভূত হয়ে যায় বিস্ময়চঞ্চল কপট বশিষ্ঠের শরীর। অগ্নিজ্বালাময় আর-এক বিস্ময়ের স্পর্শে কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষু হতে সকল কৌতুক ঝরে পড়ে যায়।

দেখতে থাকেন কপট বশিষ্ঠ, সুস্মিত হয়ে উঠেছে প্রেমিকা শ্রুবাবতীর নয়ন ও অধর। ইন্ধন নেই, কিন্তু পীতকৌশেয়বসনা নারী যেন তার নিজ তনুকেই ইন্ধনরূপে উৎসর্গ করবার জন্য অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। মর্ত্যভূমির প্রাণের এক ব্রততী তার জীবনের এত প্রিয় ঐ যৌবনপুষ্পিত দেহকে যেন এক মুহূর্তের মদকৌতুকে ভস্ম ও অঙ্গার ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কপট বশিষ্ঠের অভিশাপকে চরম উপহাসের জ্বালায় ভস্মীভূত করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে শ্রুবাবতী। কী কঠিন এই মর্ত্যের মৃত্তিকার অহংকার!

শিউরে ওঠে কপট বশিষ্ঠের দৃষ্টি। দেখতে পান, সুস্মিত নয়নে ও অধরে এক শান্ত সংকল্পের অহংকার নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে শ্রুবাবতী। ত্বরিতপদে কুটীরের ভিতর প্রবেশ করেন কপট বশিষ্ঠ এবং শ্রুবাবতীর গতিরোধ করবার জন্য বাধা দিয়ে বলেন—থাম শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—থামতে পারি না ঋষি। বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।

বশিষ্ঠ—মর্ত্যের ক্ষণায়ুশাসিত জীবনের নারী, জীবনের মূল্য বিস্মৃত হও কেন?

শ্রুবাবতী—মর্ত্যের আশ্রমবাসিনী শ্রুবাবতী নামে এই নারীর জীবনের কোন মূল্য নেই, যদি সে জীবন তারই প্রেমের উপাস্য বাসবের কথা ভুলে গিয়ে বেঁচে থাকে। সে-জীবন এক মুহূর্তেরও জন্য সহ্য করতে চাই না ঋষি।

কপট বশিষ্ঠের নয়নের প্রখর কৌতূহল অকস্মাৎ স্নিগ্ধ এক বিশ্বাসের হর্ষ হয়ে ফুটে ওঠে। স্নিগ্ধ স্বরে বলেন—শান্ত হও, হৃদয়ের সব আক্ষেপ বর্জন কর শ্রুবাবতী। স্বর্গাধীশ বাসব আজ বিশ্বাস করে, মর্ত্যের আশ্রমবাসিনী এক পীতকৌশেয়বসনা ঋষিকুমারী তার জীবনের প্রতিক্ষণের কাম্য সেই পথিক বাসবকে ভালবেসেছে। প্রতিদান চায় না ; উপকার, উপহার ও উপঢৌকন আশা করে না, মর্ত্যনারীর এই বেদনাভরা প্রেমের মূল্য বেদনাহীন স্বর্গের মনও তুচ্ছ করতে পারে না।

শ্রুবাবতী—স্বর্গের মনের কথা আর বাসবের বিশ্বাসের কথা আপনি কেন ঘোষণা করছেন ঋষি?

কপট বশিষ্ঠের নয়নে স্নেহসিক্ত কৌতুকের এক সুন্দর হাস্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আমি ঋষি নই, বশিষ্ঠও নই, স্বর্গাধীশ বাসব।

প্রিয় বাসব! প্রেমতাপসিকার সফল প্রতীক্ষার আনন্দ প্রণয়সান্দ্র স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়। স্মিত নয়নের সকল বাসনা উৎসারিত ক'রে বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্রুবাবতী। আর কোন দ্বিধা নেই, এই মুহূর্তে অনায়াসে বরমাল্য হাতে তুলে নিয়ে প্রেমিকের কণ্ঠ স্পর্শ করতে পারে শ্রুবাবতী। যেন এক পৌর্ণমাসীর চন্দ্রিকার আশ্বাস দেখতে পেয়েছে শ্রুবাবতীর নয়ন। পীতকৌশেয় বসন আর জটায়িত বেণীভারের বন্ধনে ব্যথিতা এক সাধ্বয়ন্তী প্রেমিকার সলজ্জ সাধ্বস এই মুহূর্তে প্রেমিকের কণ্ঠ হতে উৎসারিত একটি প্রিয় সম্বোধনের স্পর্শে লুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু একটি আহ্বান। শুধু দয়িতকণ্ঠের একটি প্রিয়সম্ভাষণ শোনবার জন্য শ্রুবাবতীর

হৃদয়ের সকল পিপাসা উৎসুক হয়ে ওঠে। সেই আহ্বান ধ্বনিত হলেই সকল কুণ্ঠা হারিয়ে পীতকৌশেয়বসনা এক আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারী এই মুহূর্তে স্বর্গাধীশ বাসবের বক্ষে জটায়িত বেণীভার লুটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হবে।

শ্রুবাবতী, পৃথিবীর এক পুষ্পিতযৌবনা ঋষিকুমারী যেন এক ক্ষণস্বপ্নের মধুরতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছে, তার কোমল কপোলের লোধ্ররেণু ঝরে পড়ছে, কপালে পরিপীত পটীর রসের তিলক ফুটে উঠেছে। গলে গিয়েছে জটায়িত বেণীভারের ভার ; নূতন কুন্তলে কুরুবকের শোভা উত্তংসিত হয়ে প্রেমিকাকে মধুবাসরিকার সাজে সাজিয়ে দিয়েছে।

বাসব ডাকেন--শ্রুবাবতী!

শ্রুবাবতীর ক্ষণস্বপ্নের মধুরতা হঠাৎ ব্যথিত হয়। এ কেমন আহ্বান? শ্রুবাবতী, শুধুই শ্রুবাবতী, যেন মর্ত্যবাসিনী শত কোটি নারীর মধ্যে একটি নারীর নাম উচ্চারণ করছেন বাসব। সে আহ্বানে প্রেমিকের ব্যাকুলতা মদিরস্বরে মন্দ্রিত হয় না।

আবার বলেন বাসব--আশ্বস্ত হও ভারদ্বাজতনয়া, স্বর্গাধীশ বাসবের কাছ থেকে একটি বরবাণী শুনে প্রীত হও।

আর্তস্বরে প্রশ্ন করে শ্রুবাবতী।--বরবাণী?

বাসব--হ্যাঁ শ্রুবাবতী। আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমাকে ভালবাস। তাই এই বর দান করি, তুমি তোমার মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়ে আমার পরিণীতা পত্নী হবে।

করুণা করছে স্বর্গের মন। মর্ত্যের প্রেমকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রীত ক'রে চলে যেতে চায় স্বর্গধামের অধীশ্বর। প্রিয়া শ্রুবাবতী, স্বর্গের মুখে এই স্বীকৃতি আর ধ্বনিত হলো না। শ্রুবাবতী তার ইহজীবনের কোন ক্ষণে এমন সম্বোধন শুনতে পাবে না।

মৃত্যুর পর! যেন উচ্চভাষিত এক কঠোর বিদ্রূপের প্রতিশ্রুতি। শ্রুবাবতীর আহত মনের বেদনা তার মনেরই ভিতরে নীরবে হেসে ওঠে। স্বর্গের পুরুষ মৃত্তিকাময় এই ভূতলের কুটীরবাসিনী নারীর প্রেমবিহ্বল নয়নের প্রার্থনায় বন্দিত হয়েও এখনও এ-কথা বলতে পারছে না--আমি ভালবাসি। স্বর্গের সুধা কি এতই হিমাক্ত? বেদনাহীন স্বর্গের সবই কি শুধু শিলা?

শ্রুবাবতী বলে--আপনার বরবাণী আমার প্রতীক্ষার মৃত্যুবাণী, বাসব।

বাসব--কি বলতে চাও, ঋষিকুমারী?

শ্রুবাবতী--আপনি আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকতে বলছেন বাসব, কিন্তু এমন প্রতীক্ষার আর কোন অর্থ হয় না।

বাসব--কেন?

শ্রুবাবতী বলে--আমার মৃত্যুর পর, এই মর্ত্যনারীর ইহজীবনেব অন্তে স্বর্গাধীশ যে বাসব আমার বরমাল্য গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দান করছেন, সে বাসব আমার বাসব নয়।

অমরপুরের অধীশ্বর, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্ন অন্তরের শান্তি আবার এক মর্ত্যনারীর কুটিল প্রেমের অহংকারের আঘাতে ক্ষুব্ধ হয়।

বাসব বলেন--এক শুভক্ষণে স্বর্গলোকের নন্দনবনবীথিকায় পারিজাতের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে স্বর্গাধীশ বাসবের কণ্ঠে পরিণয়মাল্য অর্পণ করবে তুমি শ্রুবাবতী, মর্ত্যের বেদনাধূলিমলিন ইহজীবনের অন্তে এই পরমবরণীয় পরিণাম লাভের জন্য সশ্রদ্ধচিত্তে তপস্বিনীর মত প্রতীক্ষায় থাক।

শ্রুবাবতীর নয়নে অদ্ভুত এক সজল হাস্যদ্যুতি স্পন্দিত হতে থাকে।--আমার জীবন হতে প্রতীক্ষার সবেদন আনন্দটুকুও আপনি ছিন্ন ক'রে দিলেন বাসব! পারিজাতের ছায়া স্বর্গের নন্দনবনবীথিকাকে স্নিগ্ধ ও সুরভিত ক'রে রাখুক, মর্ত্যের প্রেমিকা নারী তার প্রতীক্ষাহীন ইহজীবনের শূন্যতা নিয়ে এই নীলাশোকের ছায়ার কাছে বিলীন হয়ে যাবে। মর্ত্যের বক্ষে শেষ নিঃশ্বাস সঁপে দেবার আগে শুধু বলে যাব, চাই না স্বর্গ, স্বর্গাধীশকেও চাই না, আমি

আমার মর্ত্যের বনবীথিকার বাসবকে ভালবাসি।

বাসব—বড় উদ্ধত তোমার প্রতীক্ষাময় প্রেমের অহংকার, তার চেয়ে বেশি উদ্ধত তোমার প্রতীক্ষাহীন প্রেমের অহংকার। স্বর্গের প্রতিশ্রুতিকে তুচ্ছ ক'রে মৃত্তিকালিপ্ত মলিন মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছ মর্ত্যনারী, স্বর্গাধীশের কাছে আর কোন করুণা আশা করো না। বিদায় দাও শ্রুবাবতী।

চলে গেলেন বাসব।

অতন্দ্রিত সবিতা কালচক্রে ধাবিত হয়ে দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেন। আর মর্ত্যের এক আশ্রমপ্রাঙ্গণে নীলাশোকের ছায়ার কাছে অমাহৃতা কৃশ চন্দ্রলেখার মত প্রতিদিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয় অনশনব্রতিনী এক ব্রততীর দেহ। নীলাশোকের ছায়াস্নিগ্ধ মৃত্তিকার শয্যায় মৃত্যুবরণ করবার আগে যেন দুই নয়নের প্রিয় এক স্বপ্নের সঙ্গে বাসকোৎসব যাপন করছে প্রেমিকা শ্রুবাবতী। যে ইহজীবনের কুটীরদ্বারে দয়িতের পদধ্বনি কোনদিন শ্রুত হবে না, প্রতীক্ষাহীন সে ইহজীবনের একটি মুহূর্তও সহ্য করা যায় না।

তপস্বিনীর মূর্তি নয়। শ্রুবাবতী যেন তার শেষ স্বপ্নের সুষমায় নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে মর্ত্য অভিলাষের নৈবেদ্যের মত মাটিরই উপর বর্ণ ও সৌরভের পুষ্প হয়ে পড়ে আছে। পীতকৌশেয় বসন নয় ; জটায়িত বেণীভারও নয়। এক প্রেমিকা নারী যেন শেষ অভিসারে এই নীলাশোকের ছায়াতলে এসে দয়িতের সাথে মিলন লাভ করেছে। কবরীতে কুরুবক আর কপোলে লোধ্ররেণু নিয়ে রক্তাংশুকে শোভিতা এক মধুবাসরিকা যেন ক্লান্ত হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে আছে।

প্রজাপতির পক্ষপরাগ মৃত্যুমুখিনী সে নারীর কবরী সুরভিত ক'রে দিয়ে যায়। রক্তাংশুকের লুণ্ঠিত অঞ্চলে রাজীব রেণু ছড়িয়ে দিয়ে যায় ভৃঙ্গ। মৃত্যুমুখিনী নারীর আননে কখনও প্রাভাতিকী আভা আর কখনও বা শুক্লা শর্বরীর জ্যোৎস্না হাসে।

আর, স্বর্গলোকের নন্দনবনবীথিকার পারিজাতের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে বজ্রায়ুধ বাসবের হৃদয়ে দুঃসহ এক কৌতূহল চঞ্চল হয়ে ওঠে। মর্ত্যের এক নীলাশোকের ছায়ায় লিপ্ত এক আশ্রমের প্রাঙ্গণ যেন স্বর্গাধীশের বক্ষে এক মুষ্টি ধূলির জ্বালা নিক্ষেপ করেছে। তাই বার বার মনে পড়ে, এবং বার বার অন্তরের দুঃসহ কৌতূহল শান্ত করতে চেষ্টা করেন বাসব। স্বর্গের প্রতিশ্রুতিকে তুচ্ছ ক'রে স্বর্গাধীশ বাসবের বামাঙ্কশোভা হবার গৌরব তুচ্ছ ক'রে জীবনের প্রথম প্রণয়ে বিস্মিত নয়নের ক্ষণবিহ্বলতাকে চিরক্ষণময় স্বপ্নের মত নয়নে ধারণ ক'রে সত্যিই কি মৃত্তিকার ক্রোড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মৃত্যুব্রতিনী নারী?

মর্ত্যের জন্য স্বর্গের কৌতূহল! বড় দুঃসহ এই জ্বালাবিচলিত কৌতূহল। স্বর্গাধীশ বাসবের মনে হয়, সুধাহীনা বসুধার নারী যেন হেলাবহসিত লীলাভঙ্গে মৃত্যুর বেদনা বরণ ক'রে সুধানিষিক্ত স্বর্গের সকল সুখের অমরতাকে অসুখী ক'রে দিতে চাইছে। দেখতে ইচ্ছা করে, মর্ত্যপ্রেমের সুন্দর অহংকারের সেই বিচিত্র গৌরবচ্ছবি। কৃপা করুণা ও মহত্ত্বের দু'টি স্বর্গীয় নয়ন লুব্ধ হয়ে ওঠে। মর্ত্যলোকের এক নীলাশোকের ছায়ার জন্য তৃষ্ণার্ত হয় স্বর্গাধীশের তাপিত মনের কৌতূহল।

অন্তরীক্ষের অন্তর মথিত ক'রে ধ্বনিত হয় স্বর্গাধীশ বাসবের স্যন্দননেমির শিহরিত আর্তস্বর। মর্ত্যের বনস্থলীর শিরে সন্ধ্যার চন্দ্রলেখা কিরণ সম্পাত করে, যেন বিচলিত দ্যুলোকের অন্তর স্নেহ লাভের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ভূতলের শ্যামলতার বক্ষ অন্বেষণ করছে। স্বর্গাধীশ বাসবের রথ দুরন্ত কৌতূহলের মত ছুটে এসে বনবীথিকার ধূলির উপর দাঁড়ায়। নীরব ও নিস্তব্ধ আশ্রমপ্রাঙ্গণের পুষ্পিত নীলাশোকের দিকে তাকান বাসব। বাসবের কুণ্ডলদ্যুতি যেন ব্যথিত জ্যোৎস্নার মত বনবীথিকার ছায়ার বক্ষে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকে। শ্রুবাবতী পীতকৌশেয়বসনা সেই প্রেমিকা নারী কি সত্যিই মৃত্যু বরণ ক'রে এই মর্ত্যের

ধূলিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে? তবে এই সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় এখনও কেন দগ্ধ হয়ে অঙ্গার হয়ে যায়নি ঐ নীলাশোকের কুসুম?

শ্রুবাবতী! প্রিয়া শ্রুবাবতী! বজ্রায়ুধ স্বর্গাধীশের সুধাসিক্ত কণ্ঠ সুধাহীনা বসুধার এক নারীকে আহ্বান করতে গিয়ে আর্তস্বর উৎসারিত করে। জ্যোৎস্নায়িত সন্ধ্যার মর্ত্যভূমি দ্যুলোকের ক্রন্দন শুনতে পেয়েও কী কঠিন নিষ্ঠুরতায় নীরব হয়ে আছে! স্বর্গের আশাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে এই মর্ত্যের মৃত্তিকা?

ধীরে ধীরে নীলাশোকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন বাসব। স্বর্গের মন এতদিনে বেদনার স্বাদ পেয়েছে। স্বর্গের গর্বিত কামনা আজ নত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে তার স্তোত্রের পাত্রীকে দেখতে পেয়েছে। বনবীথিকাচারী সেই পথিক তার জীবনের বাঞ্ছিতাকে আর একবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সেই নীলাশোক। মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন বাসব, নীলাশোকের ছায়ার ভূতলে লুটিয়ে রয়েছে মর্ত্যপ্রেমের এক চন্দ্রলেখা। রক্তাংশুকে শোভিতা এক মধুবাসরিকা তার কবরীর কুরুবক, সুকোমল কপোলের লোধ্ররেণু, কপালের পটীরসতিলক আর বক্ষের পত্রলিখা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। সত্যই, মরে গিয়েছে জটায়িত বেণীভারের বেদনায় বন্দিনী সেই তপস্বিনীর মূর্তি। আজ নীলাশোকের ছায়ায় শুধু এক ভূতললীনা প্রেমিকার মূর্তি তার নয়নের স্বপ্নের সঙ্গে বাসকোৎসব যাপন করছে।

ভূতললীনা শ্রুবাবতীর আরও কাছে এগিয়ে আসেন বাসব, এবং প্রেমিকা মর্ত্যনারীর মঞ্জরীবলয়িত একটি বাহু সাগ্রহে বক্ষে গ্রহণ করেন। প্রেমিকার কণ্ঠাসক্ত পুষ্পমাল্য আর মৃদু নিঃশ্বাসের সৌরভ স্বর্গাধীশ বাসবের বক্ষের সকল অনুভব সুরভিত ক'রে দেয়। মর্ত্যের প্রেমিকা নারী প্রতীক্ষাহীন জীবনের শূন্যতা হতে চিরকালের মত মুক্ত হবার জন্য মৃত্যু আহ্বান করেছে, এবং কী অদ্ভুত এই সুধাহীনা বসুধার মৃত্তিকা, মৃত্যুরই বেদনা সুস্মিত জ্যোৎস্নারেখার মত শ্রুবাবতীর অধরে ফুটে রয়েছে।

—প্রিয়া শ্রুবাবতী! আহ্বান করেন বাসব।

শ্রুবাবতীর নিমীলিত নয়নের স্বপ্ন সেই আহ্বানের মধুর মন্দ্রে চমকিত হয়। মৃত্যুমুখিনী নারীর হৃদয়ের কাছে প্রেমিকের ব্যাকুলতা মধুপগুঞ্জনের মত ধ্বনিত হয়েছে, শ্রুবাবতীর নিমীলিত নয়ন কমলকলিকার মত ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

—এসেছ, প্রিয় বাসব! শ্রুবাবতীর সফল বাসনার আনন্দ দূরান্তের কলবেণুক্বণিত গীতধ্বনির মত সুস্বরিত হয়।

—এসেছি, প্রিয়া শ্রুবাবতী।

—মর্ত্যনারীর ধূলিলীন হৃদয়ের কাছে কেন এসেছেন স্বর্গাধীশ বাসব?

আবার প্রশ্ন করেছে মর্ত্যের মৃত্তিকা? এই প্রশ্ন যেন সুধাময় স্বর্গলোকের একটি রিক্ততার দিকে সন্দেহের ব্যথা নিয়ে এখনও তাকিয়ে আছে। কিন্তু আর ভুল করবেন না স্বর্গের বাসব। যে-কথা শুনতে পেলে স্বর্গকে বিশ্বাস করতে পারবে এই মর্ত্যের প্রাণ, সেই কথা মর্ত্যেরই ধূলি আর তৃণের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত হন বাসব।

বাসব বলেন—একটি কথা বলতে এসেছি, শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—কী?

বাসব—আমি ভালবাসি।

বনস্থলীর সমীর হঠাৎ হর্ষে অশান্ত হয়, চঞ্চল হয় পুষ্পিত নীলাশোক। ভূতললীনা চন্দ্রলেখাও যেন চঞ্চলিত এক উৎসবের আনন্দে লীন হয়ে যাবার জন্য বাসবের আলিঙ্গনে আত্মদান করে।

বাসব বলেন—চল, প্রিয়া শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—কোথায়?

বাসব—স্বর্গলোকে চল।

শ্রুবাবতী—আমি তো স্বর্গ চাইনি বাসব।

বাসব—কিন্তু স্বর্গ যে তোমাকে চায়।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা

বনভূমির নিভৃতে কলস্বনা এক স্রোতস্বিনীর নিকটে রক্তপাষাণের বুকের উপর কুহেলিকালীনা প্রতি সন্ধ্যায় পল্লবিত দ্রুমবাহু হতে পুরটকণিকার মত পীতমঞ্জরীর পুঞ্জ লুটিয়ে পড়ে। নিবিড় অধরবন্ধ রচনা ক'রে কেলিশ্রমালস মৃগদম্পতি সেই পুঞ্জীভূত কোমলতার ক্রোড়ে নিশীথের প্রহর যাপন করে। আর, প্রভাত হতেই মৃগদম্পতি যখন নবতৃণের গন্ধামোদে চঞ্চল হয়ে স্রোতস্বিনীর কূলে ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়, তখন বনপথের দুই দিক হতে উৎসুক নয়ন নিয়ে কীর্ণ মঞ্জরীর কোমলতায় আবৃত সেই রক্তপাষাণের নিকটে দেখা দেয় বরযৌবনা এক ঋষিকুমারী, কণ্ঠে তার গন্ধে আকুল স্ফুটকেতকীর মালিকা, এবং মদাঞ্চিত-তনু এক তরুণ ঋষি, বক্ষে তার মৃগমদবাসিত কুঙ্কুমের অঙ্কন। মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা ও ঋষি অষ্টাবক্র।

যেন দুর্বহ এক তৃষ্ণার বেদনা উৎসুক নয়নে বহন ক'রে ছুটে আসে মিলনোম্মুখ দুই জীবনের যৌবনান্বিত দুই স্বপ্নভার। কিন্তু ছুটেই আসে শুধু, আর এসেই সেই ক্ষুদ্র অথচ কঠোর রক্তপাষাণের বাধায় হঠাৎ আহত হয়। নিকটে এসেও যেন এক দুরূহ সুদূরতার শাসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুলতে পারে না অষ্টাবক্র, সুপ্রভাও ভোলে না, দু'জনেরই জীবনের একটি কঠিন অঙ্গীকার দু'জনের মাঝখানে এই ব্যবধান আজও রচনা ক'রে রেখেছে।

দরোৎফুল্ল সরোরুহের মত সুপ্রভার বিকচ আননশোভার দিকে ঋষি অষ্টাবক্র সস্পৃহ নয়নে তাকিয়ে থাকে। আর, বিমুগ্ধা বনকুরঙ্গীর মত সমুত্তান নয়নভঙ্গীর নিবিড়সান্দ্র বিহ্বলতা নিয়ে অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষঃপটের দিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা। তরুণ ঋষির সেই মৃদুশ্বাসকম্পিত বক্ষের তরঙ্গিত আবেদনের উপর মাথা লুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে সুপ্রভা। এবং সুপ্রভার ফুল্ল আননের রক্তিম সুষমা অধরাশ্লেষে পান ক'রে নিয়ে তৃপ্ত হতে ইচ্ছা করে অষ্টাবক্র, বনবিটপীর কিশলয় যেমন প্রভাতের অরুণিত মিহিরলেখার রাগসুষমা পান ক'রে তৃপ্ত হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু এই ইচ্ছা নিতান্তই ইচ্ছা। বাসকতল্পের মত সুন্দর ঐ পুঞ্জায়িত মঞ্জরীর মদাকুল ইঙ্গিতে এই ইচ্ছা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলিত হয়, কিন্তু এই চঞ্চলতা কোনক্ষণে জীবনের সেই অঙ্গীকারকে বিচলিত করতে পারে না।

অঙ্গীকার ক'রে কঠোর এক পরীক্ষা জীবনে স্বীকার ক'রে নিয়েছে প্রেমিক অষ্টাবক্র ও তার প্রেমিকা সুপ্রভা। কে জানে কোন বিশ্বাসের দুঃসাহসে মহর্ষি বদান্যের কাছে এই অঙ্গীকার নিবেদন করেছে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, শুধু স্বেচ্ছার অধিকারে কখনই পরিণয় বরণ করবে না ওদের দু'জনের জীবন। যদি কোন শুভ লগ্নে স্বয়ং মহর্ষি বদান্য সাগ্রহে সানন্দে ও সমন্ত্রসংস্কারে সুপ্রভাকে অষ্টাবক্রের কাছে সম্প্রদান করেন, তবেই সেই লগ্নে জগতের স্বীকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাল্যবিনিময় ক'রে মিলিত হবে ঐ কুঙ্কুম আর কেতকীর সুরভিত ইচ্ছা। তার আগে নয়, এবং জগতের কোন গোপন নিভৃতেও নয়।

তাই সুপ্রভা আর অষ্টাবক্র, দুই উৎসুক আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা প্রতি প্রভাতের জাগ্রত আলোকের পথে এক স্বপ্নাভিসারে আসে, বননিভৃতের এই কলস্বনা স্রোতস্বিনীর নিকটে এক

সুরভিত সান্নিধ্যের ছায়াটুকু মাত্র অনুভব ক'রে চলে যায়।

ঋষি অষ্টাবক্র ও কন্যা সুপ্রভার প্রণয়কলাপে বিস্মিত বিরক্ত ও ব্যথিত হয়েছেন মহর্ষি বদান্য। তিনি মনে করেন, এই প্রণয় প্রণয় নয়। বনেচর মৃগ ও মৃগীর মত নিতান্ত এক আসক্তির তাড়নাকে জীবনের প্রেম বলে বিশ্বাস করেছে এক ঋষিকুমার ও এক ঋষিকুমারী। ঐ আগ্রহ আকালিক ঝটিকার মত বিচলিত যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি মাত্র ; দক্ষিণমলয়ের মৃদুবিধূত নিঃশ্বাসের মত স্নিগ্ধ স্থিরসৌহার্দ্যের সঞ্চার নয়। ঐ চাঞ্চল্য লোষ্ট্রাহত সরসীসলিলের ছন্দোহীন উচ্ছলতা মাত্র ; সুতরঙ্গিত ভঙ্গিমার মঞ্জুল বিঙ্গোলী নয়। ওদের মুখের ভাষা আসঙ্গ কামনার মুখরতা মাত্র ; প্রেমমহিমার কল্লোল নয়। দুই জনের দুই মুগ্ধ মুখচ্ছবি ও অধরবিসর্পিত রক্তোচ্ছ্বাস দু'টি দাবানলদ্যুতি মাত্র ; সুশান্ত জ্যোৎস্নারাগ নয়। আসক্তি সত্য হলেই পরিণয় লাভের অধিকার সত্য হয় না। এই আসক্তি প্রেম নয়, অনুরাগ নয়, দাম্পত্যের মিলনসূত্রও নয়।

স্মরণ করেন মহর্ষি বদান্য, অঙ্গীকার করেছে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা। কিন্তু ঐ অঙ্গীকারে কোন সত্য নেই। মনে করেন বদান্য, ঐ অঙ্গীকার হঠামোদে উদ্ধত দুই যৌবনের কৌতুকরঙ্গ মাত্র, মহর্ষি বদান্যের রোষ প্রশমিত করবার জন্য যৌবনচটুল দুই অভিসন্ধির চাটুভাষিত স্তুতি। বিশ্বাস হয় না, যে দুই আকাঙ্ক্ষা প্রতি প্রভাতে বননিভৃতের ক্রোড়ে গোপনাভিসারে এসে সান্নিধ্য লাভ করে, সেই দুই আকাঙ্ক্ষা কখনও কোন সংযমের অঙ্গীকারকে শ্রদ্ধা করতে পারে। আসক্তি কেমন ক'রে পাবে এই শক্তি? সন্দেহ করেন মহর্ষি বদান্য, কপট অঙ্গীকারের অন্তরালে কৌতুকমদে মদায়িত এক ঋষিকুমারী এবং এক তরুণ ঋষির দেহ ক্ষণপুলকিত উদ্‌ভ্রান্তির অনাচারকলুষে ক্লিন্ন হয়েছে। লোকসমাজের আশীর্বাদের জন্য সেই দুই অবিধিপ্রগলভ আসক্তির প্রাণে কোন মোহ আর শ্রদ্ধা নেই।

অভিশাপ বর্ষণের জন্য মহর্ষি বদান্যের কোপপীড়িত দুই চক্ষু খর দৃষ্টিবর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন বদান্য, তাঁর আশ্রমভবনের দ্বারোপান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র।

মহর্ষি বদান্য বলেন—আমি জানি, তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ অষ্টাবক্র। কিন্তু শুনে যাও, সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবারও অধিকার তোমার নেই।

অষ্টাবক্র—কেন মহর্ষি?

বদান্য—কেতকীগন্ধবাসিত একটি কণ্ঠের আর কুঙ্কুমাঙ্কিত একটি বক্ষের আসক্তিময় প্রগলভতা আমার আশীর্বাদ পেতে পারে না।

অষ্টাবক্র—প্রগলভতা বলে ধারণা করছেন কেন, মহর্ষি?

অষ্টাবক্রের প্রশ্নে আরও কুপিত হয়ে শ্লেষাক্ত স্বরে উত্তর দেন মহর্ষি বদান্য।—শিলাখণ্ড যেমন তরল হতে পারে না, শিশিরবিন্দু যেমন কঠিন হতে পারে না, আসক্তিও তেমনি কখনও অপ্রগলভ হতে পারে না।

অষ্টাবক্র—কিন্তু আপনারই ইচ্ছাকে সম্মানিত ক'রে আমরা দু'জনে যে অঙ্গীকার জীবনে গ্রহণ করেছি, সেই অঙ্গীকার কোন মুহূর্তেও আমাদের আচরণে অসম্মানিত হয়নি।

চমকে ওঠেন মহর্ষি বদান্য, তাঁর সন্দেহ ও বিশ্বাসের কঠিন হৃৎপিণ্ডের উপর যেন এক উদ্ধতের হঠভাষিত গর্বের আঘাত পড়েছে।

বদান্য বলেন—কিন্তু আমি জানি, একদিন না একদিন তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত আসক্তির কাছে তোমাদের অঙ্গীকার মিথ্যা হয়ে যাবে।

অষ্টাবক্র—কখনই হবে না।

তীব্রতর উষ্মায় তপ্ত হয়ে ওঠে বদান্যের কণ্ঠস্বর।—তবে শোন অষ্টাবক্র, বৎসরকাল পূর্ণ হবার পর আজিকার মত এমনই এক প্রভাতে আমার কাছে এসে যদি এই সত্য ঘোষণা

করতে পার যে, তোমাদের অঙ্গীকার ঐ বননিভৃতের ভৃঙ্গগীতগুঞ্জরিত কোন মুহূর্তেও বিচলিত হয়নি, তবেই আমি বিশ্বাস করব, সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবার অধিকার তুমি পেয়েছ।

অষ্টাবক্র—তারপর?

মহর্ষি—তারপর, আমি বিচার করব, সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তোমার আছে কি না।

অষ্টাবক্র—আপনার ইচ্ছাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার ক'রে নিলাম।

হ্যাঁ, সত্যই আসক্তি। মনে মনে স্বীকার করে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা. মহর্ষি বদান্যের অনুমানে কোন ভুল নেই। কুমারী সুপ্রভা তার উষ্ণ নিঃশ্বাসবায়ুর চঞ্চলতার মধ্যে বক্ষের গভীর হতে উৎসারিত এক তৃষ্ণার মর্মররোল শুনতে পায়। যেন তার শোণিতে সঞ্চারিত এক স্বপ্নের প্রাণ দোহদবেদনা বরণের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস করে সুপ্রভা, পিতা বদান্যের অভিযোগ মিথ্যা নয়। স্ফুট প্রসূনের নবপরাগের মত এক সুরভিত মোহ তার সকলক্ষণের ভাবনাকে অবশ ক'রে রেখেছে। উদ্দলকুসুমসুরভির মত কি-এক বাসনার শিহর তার অধরপুটে ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত প্রলোভ সঞ্চারিত ক'রে যায়। বিশ্বাস করে সুপ্রভা, এই তৃষ্ণার পরম তৃপ্তি দাঁড়িয়ে আছে তারই সম্মুখে, নাম যার অষ্টাবক্র, তরুণতরুর মত স্নিগ্ধদর্শন যে ঋষির কণ্ঠে কেতকীমালিকা অর্পণের জন্য সুপ্রভার মন তার স্বপ্ন জাগর ও সুষুপ্তিরও প্রতিক্ষণে উৎসুক হয়ে রয়েছে।

অষ্টাবক্রও সুপ্রভার কাছে অকপট ভাষায় নিবেদন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না—হ্যাঁ ঋষিনন্দিনী. ঐ বনমৃগদম্পতির জীবনের প্রতি সন্ধ্যার উৎসবের মত অধরবন্ধ রচনার জন্য আমার ধমনীধারায় এক স্বপ্নাতুর আকাঙ্ক্ষা ছুটাছুটি করে। আমি জানি, আমার সেই আকাঙ্ক্ষার সকল তৃপ্তির আধার তোমার ঐ সুন্দর অধর। পরিমলগ্রাহিণী সমীরিকা তুমি, আমার যৌবনোত্থ বাসনার সৌরভভার তোমারই সমাদরে ধন্য হতে চায়। এই ক্ষিতিতলের এক নিভৃতের স্নেহে লালিত স্নিগ্ধ কেকা তুমি. আমার প্রাণের সকল তৃষ্ণার নীলাঞ্জন তোমারই আহ্বান অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়। নিবিড়সলিল নিকুঞ্জসরিৎ তুমি, আমার সকল আনন্দের হিল্লোল তোমারই কান্তিসুধারসের অভিষেক নিতে চায়। স্বীকার করি সুপ্রভা, আমার বক্ষের কুঙ্কুমে আমার আসক্তিরই প্রাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

কুণ্ঠাহত স্বরে প্রশ্ন করে সুপ্রভা।—কিন্তু এই কি প্রেম?

বিস্মিত হয় অষ্টাবক্র।—জানি না, প্রেম নামে কোন আকাশসম্ভব আকাঙ্ক্ষার কথা তুমি বলছ, ঋষিতনয়া।

সুপ্রভা—ক্ষমা করবেন ঋষি, আমি পিতা বদান্যের দুর্বহ এক চিন্তার প্রশ্ন আপনাকে নিবেদন করছি। শুধু তাই নয়. এই প্রশ্ন আমার নিজেরই জীবনের প্রতি আমার সংশয়কাতর মনের প্রশ্ন। বলাকার প্রাণ যে আকাঙ্ক্ষায় বিদ্যুন্ময় জীমূতের ধ্বনিত শিহর নিজ দেহের শোণিতধারায় বরণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আমার প্রাণ সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনার দীপ্ত যৌবনের হর্ষ বরণ করতে চায়। কোন সন্দেহ করি না ঋষি, আমার কণ্ঠমালিকার কেতকীতে আমার আসক্তিই সুরভিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আসক্তি কি জীবনের কোন সুন্দর আকাঙ্ক্ষা?

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তি অবশ্যই জীবনের সুন্দর আকাঙ্ক্ষা।

সুপ্রভা বিস্মিত হয়।—সুন্দর আসক্তি?

অষ্টাবক্র—হ্যাঁ, সে আসক্তি দেহজ বাসনারই প্রসূত প্রসূন, কিন্তু দেহজ বাসনার নিঃশ্রীক উল্লাস নয়। সে আসক্তি কখনও প্রগলভ হয় না। মহর্ষি বদান্য বৃথাই বিশ্বাস করেছেন, আমাদের কামনা ক্ষণোদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমাদের অঙ্গীকারের গৌরব নাশ ক'রে দেবে।

বুঝতে না পেরে প্রশ্নাকুল দৃষ্টি তুলে নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা

অষ্টাবক্র বলে—ভুলে যাও কেন কুমারী, তোমাকে আজও আমি স্পর্শ করিনি? এইখানে

কতবার ক্ষণে ক্ষণে বনসমীরণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তোমার চিরঘনসঙ্কাশ চিকুরের সুচারু স্তবক আর নিবিড় নীবিতটের নবীনাংশুক মেখলা কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি। যেন শতকুম্ভের কান্তি দিয়ে রচিত দু'টি কুম্ভ, পুষ্পহারের সলজ্জ শাসন তুচ্ছ ক'রে ললিত লাবণ্যভঙ্গে স্তবকিত হয়ে রয়েছে তোমার অভিরাম উরজশোভার বিহ্বলতা। তবু আমার লুব্ধ বক্ষ ও বাহু দস্যু হয়ে উঠতে পারে না সুপ্রভা। এই সংযম বরণ ক'রেই তোমার ও আমার আসক্তি সুন্দর হতে পেরেছে।

সুপ্রভা—আপনি এই যুক্তি দিয়ে কোন সত্য প্রমাণ করতে চাইছেন ঋষি?

অষ্টাবক্র—তুমি আমার এবং আমি তোমার ; আমার ও তোমার জীবন পরিণয়ে মিলিত হবার অধিকার পেয়েছে।

অষ্টাবক্রের ভাষণে সুপ্রভা যেন তার জীবনের এক মধুর বিশ্বাসের জয়ধ্বনি শুনতে পায়। তবু, এই বিশ্বাসের আনন্দ অনুভব করতে গিয়েও হঠাৎ আর-এক ক্ষীণ সংশয়ের বেদনা সুপ্রভার আয়ত নয়নের কোণে বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে।—সুপ্রভা ব্যথিত স্বরে বলে—তবু সংশয় হয়।

অষ্টাবক্র—বল, কিসের সংশয়?

সুপ্রভা—বদান্যতনয়া সুপ্রভার চেয়ে সুন্দরতর অধরের নারী এই জগতে কতই তো আছে।

অষ্টাবক্র—আছে, অস্বীকার করি না সুপ্রভা।

সুপ্রভা—ভয় হয় ঋষি, আপনার এই সুন্দর আসক্তি, আপনার বাসনাবিহ্বল দুই চক্ষু যে-কোন ক্ষণে যে-কোন বিম্বাধরার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ ও লুব্ধ হয়ে উঠতে পারে।

অষ্টাবক্র—পারে, অস্বীকাব করি না প্রিয়া।

সুপ্রভা—সবচেয়ে বড় ভয় ঋষি, আপনারই প্রিয়াতিপ্রিয়া এই সুপ্রভার মনও ঠিক এই ভুল ক'রে ফেলতে পারে।

অষ্টাবক্র—অসম্ভব নয়।

সুপ্রভা—এত ভঙ্গুরতা দিয়ে রচিত যে আসক্তির প্রাণ, সেই আসক্তি সুন্দর হলেই বা কি আসে যায় ঋষি? স্থিরতাবিহীন সেই আসক্তি আমাদের জীবনে পরিণয়ের বন্ধন হতে পারে না।

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তির প্রাণ তৃণশীর্ষের শিশিরের মত ভঙ্গুর নয়, সুন্দরাননা। সেই আসক্তি নিষ্ঠায় কঠিন। পৃথিবীর কোন বিম্বাধরার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নয়ন মুগ্ধ হলেও আমার সেই মুগ্ধ নয়ন যে তোমাকেই অন্বেষণ করবে, সুপ্রভা।

সুপ্রভা—তা হলে এই কথা বলুন ঋষি, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষার উৎসবে প্রয়োজনের এক প্রেয়সী মাত্র।

অষ্টাবক্র—তুমি শ্রেয়সী ; আমি বিশ্বাস করি, তুমিই আমার আকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি। আমার এই বিশ্বাস মিথ্যা নয় বলেই আমার জীবনে তোমাকে আপন ক'রে নেবার অধিকার আমি পেয়েছি।

পূর্ণশশিপ্রভার মত পূর্ণ এক বিশ্বাসের জ্যোৎস্না সুপ্রভার প্রীত নয়নের নীলিমায় উদ্ভাসিত হয়। সুপ্রভা বলে—আর কোন সন্দেহ নেই ঋষি। আমার প্রশ্নের সকল কুটিলতা ক্ষমা করুন। আমার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই।

অষ্টাবক্র হাসে—কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে, সুপ্রভা।

সুপ্রভা—বলুন।

অষ্টাবক্র—তুমিও কি বিশ্বাস কর যে, এই জগতীতলের সকল যৌবনাঢ্য সুন্দরতার মধ্যে আমার কুঙ্কুমাঙ্কিত বক্ষ তোমারও বক্ষের ঐ বিপুলপীবর অভিলাষের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি? যদি জানি, তোমার মন এই ধরণীর যে-কোন রমণীয়চ্ছবি মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেও শুধু আমারই

আলিঙ্গনে তৃপ্ত হতে চায়, তবেই আমি তোমাকে আমার জীবনে আহ্বান করতে পারি, সুপ্রভা।

চকিত জ্যোৎস্নার মত হেসে ওঠে সুপ্রভার নয়ন। চন্দ্রকিরণে বিমুগ্ধ হয়েও চক্রবাকী কখনও চন্দ্রমার বক্ষ অন্বেষণ করে না ঋষি, অন্বেষণ করে তার একান্তের সহচর সেই প্রিয়কান্ত চক্রবাকেরই কণ্ঠ। বিশ্বাস করুন ঋষি, আমিও এই সত্যে বিশ্বাস করি যে, আমার কেতকীমালিকার আরাধ্য আপনি, স্বপ্ন আপনি, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি আপনি। কিন্তু...।

সুপ্রভার কেতকীবাসিত জীবনের স্বপ্ন যেন এক অন্তহীন প্রতীক্ষার শঙ্কায় হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কবে সমাপ্ত হবে এই ব্যাকুলতার অভিসার? কেতকীমালিকার তৃষ্ণা কি চিরকাল এই ভাবে এক রক্তপাষাণের বাধায় স্তব্ধ হয়ে থাকবে? কবে শেষ হবে কঠোর অঙ্গীকারে শাসিত এই বেদনাবহনের ব্রত?

—কিন্তু আর কতদিন? প্রশ্ন ক'রেই সুপ্রভার অভিমানভীরু যৌবনের বেদনা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই নয়নের প্রান্তে দু'টি জললবমায়া রচনা করে।

—আজই শেষ দিন সুপ্রভা। অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর উচ্ছল এক আশ্বাসের ভাষা হর্ষায়িত হয়। মনে পড়ে সুপ্রভার, পূর্ণ হয়েছে বৎসরকাল। এবং মনে পড়তেই দুই নয়নপয়োবিন্দুর বেদনা জ্যোতিরুদ্ভাসিত রত্নকণিকার মত সুস্মিত হয়ে ওঠে। আজ এই প্রভাতে পিতা বদান্যের কাছে গিয়ে সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবে সুপ্রভারই কেতকীমালিকার বাঞ্ছিত অষ্টাবক্র।

বদান্য বলেন—সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তোমার নেই।

অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর হঠাৎ দুঃসহ বিস্ময়ে ব্যথিত হয়ে ওঠে—অঙ্গীকার পালন করেছি, এই সত্য জেনেও আমার প্রার্থনা কেন প্রত্যাখ্যান করছেন মহর্ষি?

বদান্য—নিতান্তই দেহসুখ লাভের অভিলাষে ব্যাকুল হয়েছে তোমাদের উভয়েরই মন, তাই তোমরা বিবাহিত হবার সংকল্প গ্রহণ করেছ।

অষ্টাবক্র—আপনার ধারণা মিথ্যা নয় মহর্ষি।

ঈষৎ শিহরিত ভ্রূকুটি সংযত ক'রে বদান্য বলেন—এই অভিলাষকেই আসক্তি বলে।

অষ্টাবক্র—স্বীকার করি।

বদান্য—আসক্তি সত্য হলেই পরিণয় লাভের অধিকার সত্য হয় না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরীক্ষা সহ্য করতে পারলেও আসক্তিকে কখনও প্রেম বলে স্বীকার করতে পারি না। মানব ও মানবীর জীবন বনেচর মৃগ ও মৃগীর জীবন নয়। আসক্তি দম্পতির মিলিত জীবনের প্রকৃত বন্ধনও নয়।

অষ্টাবক্র—প্রকৃত বন্ধনেরই প্রথম গ্রন্থি।

বদান্য—সে গ্রন্থি নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর।

অষ্টাবক্র—স্বীকার করি না।

বদান্য—আসক্তির নিষ্ঠা কয়েকটি মুহূর্তের পরীক্ষায় মিথ্যা হয়ে যায়, খর নিদাঘের কয়েকটি মুহূর্তে যেমন শুষ্ক হয়ে যায় ক্ষুদ্রজল গোষ্পদ।

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তি কখনও মিথ্যা হয় না।

বদান্য—কি বললে অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—ঠিকই বলেছি মহর্ষি। সুন্দর আসক্তি তপস্বীর সংকল্পের মত নিষ্ঠায় অবিচল। সে আসক্তি সদানীরা তটিনীর বক্ষের মত চিররসে উচ্ছল, নীলাকাশের ক্রোড়ের মত বিপুল মায়ায় অভিভূত। সে আসক্তি পরিচুম্বনচতুর বাসন্ত দ্বিরেফের মনোবাসনার মত পুষ্পে পুষ্পে অবিরল তৃপ্তির উৎসব সন্ধান করে না। সে আসক্তি শুধু তার শ্রেয়সীকে, তার মহত্তমা তৃপ্তিকে সন্ধান করে। সূর্যসুখিনী জলনলিনীর কামনা কোনক্ষণেই দিক্‌ভ্রান্ত হয় না।

অষ্টাবক্রের মুখের দিকে জ্বালালিপ্ত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন বদান্য। সহ্য করতে পারেন না অষ্টাবক্রের এই অবিরল হঠভাষণ। দেহজ কামনার চাঞ্চল্যে উদ্‌ভ্রান্ত এক

যৌবনবানের আসক্তি যেন গর্বে আত্মহারা হয়েছে, এবং প্রলাপ বর্ষণ ক'রে ঋষি জীবনের এক পরম নীতিকে বিদ্রূপ করছে!

নীরব হয়ে বসে থাকেন, এবং ভ্রূকুটিখিন্ন ললাটের রুক্ষতাকে নিজেরই হস্তের রূঢ় স্পর্শে পিষ্ট ক'রে চিন্তা করতে থাকেন বদান্য, যেন তাঁর মনের গোপনের এক প্রতিজ্ঞার কঠিনতা স্পর্শ ক'রে দেখছেন। না, এই তরুণ ঋষির চিন্তার ভয়ংকর ভুল এবং সেই ভুলের দর্প আর-এক পরীক্ষায় চূর্ণ ক'রে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কী রূঢ় বিশ্বাস! মানব ও মানবীর জীবনে পতি-পত্নী সম্বন্ধের প্রকৃত বন্ধনের গ্রন্থি হলো আসক্তি! হঠবিশ্বাসের দুঃসাহসে মুখর হয়ে উঠেছে চটুলচিন্তক এক ঋষিযুবা, এবং সেই দুঃসাহসকেই প্রেমাভিলাষের চেয়েও পরতর আকাঙক্ষা বলে বিশ্বাস করেছে তাঁরই কন্যা সুপ্রভা। মিথ্যা বিশ্বাসে উদ্‌ভাসিত এই অন্ধতা দগ্ধ না ক'রে দিলে জীবনে প্রকৃত প্রেমের পথ ওরা কখনই চিনে নিতে পারবে না।

আর-এক পরীক্ষা, কিরাতরচিত লতাজালের মত নয়নরম্য ও মায়বিকরাল এক পরীক্ষা। সে পরীক্ষাকে স্বয়ং মহর্ষি বদান্যই বহুদিন আগে আয়োজিত ক'রে রেখেছেন। অষ্টাবক্রের সুন্দর আসক্তির উদ্ধত নিষ্ঠা চূর্ণ করবার জন্য দূরান্তরের এক নিভৃতে রচিত প্রবল ও প্রগলভ এক ছলনা। কেলিকুতুকিনী প্রমদার কটাক্ষে শিহরিত, অবিধিবশা অবধূর লোল প্রলোভে লসিত, অনধীনা স্বৈরিণীর শীৎকারে শ্বসিত এক জগৎ, যে জগতের একটি মুহূর্তের উদ্দামতার কাছে নতশির হয়ে লুটিয়ে পড়বে যে-কোন মানবের আসক্তির নিষ্ঠা।

এখান হতে অনেক দূরে, নগাধিপ হিমবানের তুহিনধবল শৈলপ্রদেশ ও রত্নাধীপ কুবেরের অলকাপুরীর অলকাবলিমোহিত মহীধরমালারও উত্তরে, মেঘসন্নিভ এক রমণীয় নীলবনে বাস করে প্রবীণা উদীচী। শুক্লাম্বরা, বিবিধ রত্নাভরণে ভূষিতা, এবং অপাররঙ্গপারঙ্গমা সেই বর্ষীয়সীর নিবিড় ভ্রূভঙ্গ যেন মদনমনোন্মদ বিভ্রম ধারণ ক'রে রয়েছে। উত্তর দিগভূমির অনল অনিল ও সলিল হতে উদ্ভূত সকল মোহ প্রতিপালনের জন্য এই নীলবনে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছে স্বতন্ত্রা স্ববশা ও চিরকন্যকা উদীচী। সেই নীলবনের পল্লবমর্মরে আসক্তির সঙ্গীত, বিহঙ্গের কলরবে আসঙ্গবাসনার আহ্বান ; যেন অবিরল লিপ্সার নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বসিত দ্বিতীয় এক অনঙ্গনিকেতন পথিকনয়নে মোহ সঞ্চারের জন্য মেঘসন্নিভ নীলবনের রূপ ধারণ ক'রে রয়েছে।

প্রবীণা উদীচী মহর্ষি বদান্যের অনুরোধ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছে। শুনেছে উদীচী, তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র বদান্যতনয়া সুপ্রভাকে তার আকাঙক্ষার শ্রেয়সী বলে বিশ্বাস করে। আসক্তির একনিষ্ঠা সম্পর্ধকণ্ঠে ঘোষণা করেছে তরুণ এক ঋষি, শুনে হাস্য সংবরণ করতে পারেনি উদীচী। সেই ঋষির কামনাকে একটি মদবিভ্রমের আঘাতে নিষ্ঠাহীন ক'রে দিতে কতক্ষণ? বহুদিন থেকে প্রস্তুত হয়েই আছে এবং প্রতীক্ষায় দিন যাপন করছে নীলবনচারিণী উদীচী। কবে আসবে অষ্টাবক্র? সেই ভুল স্বপ্নের স্তাবক অষ্টাবক্র?

দূর উত্তরের গগনবলয়ের দিকে দৃক্‌পাত ক'রে মহর্ষি বদান্য যেন তাঁর সংকল্পিত পরীক্ষার ভয়ংকরতাকে দেখছিলেন। একবার সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আর ফিরে আসবে না অষ্টাবক্র। উদীচীর নীলবনঘন বিভ্রমনিলয়ের মত্তসুখের অবিরল আলিঙ্গনে চিরকালের নির্বাসন লাভ করবে এই গর্বিত ঋষিযুবার আসক্তি। এবং মূঢ়া কন্যা সুপ্রভাও এই সত্য উপলব্ধি করবে যে, আসক্তি খলশিখ অনলের মত নিজের নিষ্ঠা নিজেই দগ্ধ করে। আসক্তিকে জীবনের এক দিব্য প্রেমাভরণ বলে মনে ক'রে যে ভুল করেছে সুপ্রভা, ভেঙ্গে যাবে সেই ভুল।

দূরান্তরের নভঃপটে কুবেরগিরির ধবলিত শিখর আপন শোভায় উদ্ধত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তারও চেয়ে যেন বেশি উদ্ধত তরুণ অষ্টাবক্রের মস্তকে ফুল্লমল্লিকামোদে পুলকিত ধম্মিল্লের

শোভা। অষ্টাবক্রের দিকে একবার সহেল ভ্রূকুটি নিক্ষেপ ক'রে উদ্ধত এক আসক্তির প্রতি যেন নীরবে ধিক্কার বর্ষণ করলেন বদান্য।

বদান্য বলেন—আমার একটি প্রস্তাব আছে, অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—আদেশ করুন, মহর্ষি।

বদান্য—কুবেরগিরির উত্তরে রমণীয় এক নীলবনে বাস করেন প্রবীণা উদীচী, চিরকন্যকা উদীচী। আমার ইচ্ছা, তুমি সেই নীলবনে উদীচীর নিলয়ে কয়েকটি দিবস ও রাত্রি যাপন ক'রে ফিরে এস।

অষ্টাবক্র—তারপর?

বদান্য—যে-দিনের যে-ক্ষণে তুমি ফিরে আসবে, সে-দিনেরই সে-ক্ষণে আমি কন্যা সুপ্রভাকে তোমার কাছে সম্প্রদান করব।

অষ্টাবক্রের নয়ন চকিত হর্ষে উজ্জ্বল হয়—আশীর্বাদ করুন।

বদান্য—এখনি আশীর্বাদ আশা কর কেন অষ্টাবক্র? সম্প্রদত্তা সুপ্রভার পরিণয়মাল্য গ্রহণ ক'রে তোমরা দু'জনে যে-ক্ষণে আমার সম্মুখে দাঁড়াবে, সেই ক্ষণে তোমাদের মিলিত জীবনকে আমি আশীর্বাদ করব, তার আগে নয়।

অষ্টাবক্র শ্রদ্ধাভিভূতস্বরে নিবেদন করে।—স্বীকার করি মহর্ষি, আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে সেই ক্ষণে ধন্য হবে আমাদের জীবনের পরিণয়। একটি অনুরোধ, এখনি আপনার আশীর্বাদ দান না করুন, একটি প্রার্থিত বর দান করুন।

বদান্য—আমার কাছ থেকে এই মুহূর্তে কোন শুভেচ্ছা আশা করো না অষ্টাবক্র, সেই অধিকার এখনও তুমি পাওনি। যে-ক্ষণে আমার আশীর্বাদ লাভ করবে তোমাদের পরিণীত জীবন, সেই ক্ষণে আমি তোমাদের মিলিত জীবনের প্রার্থিত বর দান করব, তার আগে নয়।

অষ্টাবক্র—তথাস্তু মহর্ষি, আপনার এই প্রতিশ্রুতি আমার আজিকার যাত্রাপথের মাঙ্গল্য।

উত্তর দিগ্‌দেশের অভিমুখে চলে গেল হৃষ্টমানস অষ্টাবক্র। মহর্ষি বদান্যের মনে হয়, এক যৌবনবানের গর্বান্ধ আসক্তি নূতন এক মূঢ়তার আনন্দে চঞ্চলিত হয়ে চলে যাচ্ছে। এক মূর্খ শিশুসর্পের অহংকার নিজ বিষের জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নকুল-বিবরের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। আর ফিরে আসবে না অষ্টাবক্র। আশ্বস্ত হয়েছেন বদান্য।

কিন্তু তারপর? আশ্রমের প্রাঙ্গণের উপর অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বদান্য, যেন তাঁর তাপিত চিন্তার ক্লেশগুলি আর একটি আশ্বাসময় ছায়া খুঁজছে। মূঢ়া কন্যা সুপ্রভার পরিণামের কথা চিন্তা করেন বদান্য। নয়নমোহে উদ্‌ভ্রান্তা ঐ কেতকীরেণুকুতুকিনী কুমারীও যে তার আকাঙ্ক্ষার ভুল বুঝতে পারে না। কি হবে ওর জীবনের পরিণাম?

দেখতে পেলেন বদান্য, লতাগৃহের দ্বারোপান্তে দাঁড়িয়ে নববসন্তাগমে পুলকিত বনস্থলীর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে সুপ্রভা। শাল রসাল ও শাল্মলীর কান্তিসমারোহের দিকে তাকিয়ে একটি তৃষ্ণা যেন সুস্মিত হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, উপায় আছে, মহর্ষি বদান্য দুঃখিতচিত্তে তাঁর চিন্তার মধ্যে আর-এক পরিকল্পনা আবিষ্কার করেন। তৃষ্ণাচারিণী নারীর সম্মুখে এমনই এক শোভাময় নয়নোৎসব এনে দিতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই।

চলেছে অষ্টাবক্র। সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে ধর্মদায়িনী বাহুদ্ নদীর পূতসলিলে স্নান করে অষ্টাবক্র। তারপর ধনপতি কুবেরের কাঞ্চনময় পুরদ্বারে এসে দাঁড়ায়। গন্ধর্বের বাদিত্রনিঃস্বন আর নৃত্যপরা অপ্সরার অবিরল মঞ্জীরশিঞ্জনে মুখরিত যক্ষভবনের সমাদর গ্রহণ করে। তারপর কৈলাস মন্দার ও সুমেরু, একের পর এক সমুদয় পর্বতপ্রদেশ অতিক্রম ক'রে উত্তর দিগ্‌ভূমির প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বিস্মিত হ'য়ে দেখতে পায় অষ্টাবক্র, অদূরে এক নীলচ্ছায়াঘন কাননে স্ফুট কুসুমের উৎসব যেন মত্ত হয়ে বিচিত্র বর্ণরাগচ্ছটা উৎসারিত করছে। বিহগকূজনে কম্পিত হয়েও বায়ু যেন এক যৌবনময় বনলোকের

নাভিসুরভির ভার ধারণ ক'রে মন্থর হয়ে রয়েছে।

কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে এবং অরণ্যক্রোড়ের নিভৃতে কুবেরনিলয়ের চেয়েও দীপ্ততর রত্নপ্রভায় ভাস্বর এক নিকেতন দেখতে পেয়ে আরও বিস্মিত হয় অষ্টাবক্র। নিকেতনের সম্মুখে মণিভূমিনিখাত সরোবর। পার্শ্বদেশে মন্দাকিনীর কলনিনাদিত প্রবাহের তটরেখা মন্দারকুসুমে অলংকৃত। স্তব্ধ নিকেতনের প্রবেশপথে মুক্তাজালময় তোরণের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত অষ্টাবক্র ডাক দেয়—আমি অতিথি।

অষ্টবক্রের সেই আহ্বানে উদ্দীপ্ত ফণিমণিরাগের মত চমকে ওঠে সেই অদ্ভুত নিকেতনের প্রভাময় শোভা। শুনতে পায় অষ্টাবক্র, নিকেতনের নীরবতা হতে হঠাৎ ঝংকার দিয়ে জেগে উঠেছে সুপ্তিবিবশ কাঞ্চী কেয়ূর আর মঞ্জীরের উল্লাস। অকস্মাৎ, তন্বী তড়িল্লতার চেয়েও চকিতলাস্যচপলা, মন্দাকিনীর জলমালাভঙ্গিমার চেয়েও তরলতর তনুভঙ্গে ছন্দায়িতা, সান্দ্রসিন্দূররেণুময়ী নবোষার চেয়েও সুনিবিড়স্মিতা সাতটি যৌবনবতী দেহিনী যেন অলক্ষ্য এক স্মরতূণীরের ভিতর হতে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়ে সাতটি পুষ্পবিশিখের মত অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ অষ্টাবক্রের দুই নেত্রে বিচিত্র এক সুখের বর্ণালী নর্তিত হতে থাকে। মায়ানিকেতনবাসিনী সাতটি সুযৌবনা যেন সাতটি অঙ্গমাধুরীর অধীশ্বরীর মত অষ্টাবক্রের বিস্ময়কে ধন্য করবার জন্য সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অপলক নয়নে দেখতে থাকে অষ্টাবক্র।

ক্ষামকটিতটে ক্ষীণনিনাদিনী কিঙ্কিণী যেন মণিত রণিত করে, নিধুবনোৎসুকা কে এই বনিতা?

প্রিয় প্রাগলভ্যে অভীরু ভ্রূলতা বিলোল লালসা হানে ; পীনপয়োধরভারে অলসা, কে এই ললনা সুরসা?

বদন যেন সুষমাসদন, মদয়িত স্মরামোদনিদান, বিবশ বাসনা হানে ; রাকাশশিমুখী রুচিরময়ী কে এই নারী?

অপাঙ্গে ভঙ্গিমা ঝরে, অনঙ্গে উন্মাদ করে, আসঙ্গ আহবে উন্মুখিনী ; রভসরঙ্গিনী কে এই অঙ্গনা?

কিবা গ্রীবাগৌরিমা, সিতমলয়জে অভিরামা, অনুপ রূপের অনল গোপন করে ; কে এই রামা?

ক্ষণ ঈক্ষণে বহ্নি শিহরে, রাতুল অধরে তনুশোণিমার স্ফার জ্যোৎস্না স্ফুরে মুনিমনোবনে প্রালেয়কারিণী কে এই কামিনী?

অশাসিত যৌবন অশেষ উল্লাসে লসিত করে নিঃশ্বাস, নীবিবন্ধবিহীনা বিশ্লথবেণী ব্রীড়াবিরহিতা তনুকা, কে এই ভামিনী?

তরুণ ঋষির নয়নে বিস্ময়! যেন বিগলিত ইন্দ্রধনুর মায়ানুরাগে রঞ্জিত কাদম্বিনীর সুষমা ভূতলে লুটিয়ে পড়েছে, এবং সেই সঙ্গে সাতটি খরবাসনার বিদ্যুৎ। লীলাভঙ্গে চঞ্চল সেই সাত রূপসীর অবয়বশোভার দিকে তাকিয়ে অষ্টাবক্রের বিচলিত বক্ষের সমীর মুগ্ধ হয়ে যায়।

মণিবলয়ের চকিত ঝংকারে তরুণ ঋষির দুই উৎসুক শ্রবণ বন্দিত ক'রে সাত সুন্দরী অভিবাদন জানায়।—উত্তর দিগ্‌ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী উদীচীর এই নিকেতনে প্রবেশ করুন, বরেণ্য।

বংশীনিনাদে মোহিত তরুণ কুরঙ্গের মত দুর্নিবার কৌতূহলে অভিভূত অষ্টাবক্র সাত সুন্দরীর মঞ্জীরিত চরণের ধ্বনি অনুসরণ ক'রে নিকেতনের ভিতরে প্রবেশ করে, এবং দেখতে পায়, রত্নপর্যঙ্কের উপরে সমাসীন হয়ে রয়েছেন শুক্লাম্বরা এক বর্ষীয়সী। সীমন্তে সিন্দূরের রেখা নেই, কিন্তু দেহ বিবিধ হেমময় আভরণে বিভূষিত। দেখে মনে হয়, প্রবীণার আভরণের মধ্যে জগতের সকল কলধ্বনির মুখরতা যেন এক উৎসবের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে।

বর্ষীয়সী বলে—আমি চিরকুমারী উদীচী।

অষ্টাবক্র—আমি ঋষি অষ্টাবক্র, মহর্ষি বদান্যের আদেশে আপনার ভবনের অতিথি হতে চাই।

উদীচী—আমার সৌভাগ্য। আমি ধন্য হব ঋষি, যদি এই ভবনের অতিথি হয়ে আপনি আমার সমাদর গ্রহণ করেন।

অষ্টাবক্র—গ্রহণ করতে চাই।

উদীচী—আমি প্রীত হব ঋষি, যদি আমার সমাদরে আপনি প্রীতি লাভ করেন।

অষ্টাবক্র—প্রীতি লাভ করতে ইচ্ছা করি, উত্তরদিগ্‌দেবী।

গ্রীবাভঙ্গে ঝংকৃত হয়ে, স্মিতায়িত অধরের স্পন্দন মুক্তাপংক্তিরও চেয়ে খরোজ্জ্বল দশনরেখার মৃদু দংশনে আহত ক'রে উদীচী বলে।—আদেশ করুন ঋষি। বলুন, কি চায় আপনার ঐ সুন্দর নয়নের বিস্ময়? আপনার প্রীতি সম্পাদনের জন্য উত্তরদিগ্‌ভূমির সকল প্রীতির সুধাসাররসিতা উদীচী আপনারই কণ্ঠস্বরের একটি নির্দেশ শুধু শুনতে চায়।

অষ্টাবক্রের নিমেষবিহীন দুই নেত্রের নিবিড় বিস্ময় অকস্মাৎ চঞ্চল হয়। নারীর দুই ভ্রূবল্লী যেন দুটি বিলোল অলজ্জা, আসক্তির এক অভিনব ভঙ্গিমনোহর রূপচ্ছবি। বর্ষীয়সীর সেই ভ্রূভঙ্গীর মধ্যে যেন কোদি মদিরাক্ষীর কটাক্ষপীযূষ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

নীরব অষ্টাবক্রের দুই নেত্রের কৌতূহল চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে উদীচী—বলুন ঋষি, কি চায় আপনার বক্ষের ঐ ঝঞ্ঝায়িত নিঃশ্বাস, পুলকাঞ্চিত কপোল আর অধীর অধরসন্ধি?

অষ্টাবক্র বলে ক্ষণকালের মত আপনার সান্নিধ্য চাই।

বিভ্রমসঞ্চারিণী বর্ষীয়সীর ভ্রূকৌতূকে যেন এক স্বপ্নের আনন্দ বিপুল হর্ষে উৎসারিত হয়। উচ্চকিত স্বরে প্রশ্ন করে উদীচী।—শুধু আমারই সান্নিধ্য?

অষ্টাবক্র—হ্যাঁ, চিরকুমারী।

সেই মুহূর্তে সাত সুন্দরীর চরণমঞ্জীরের ঝংকারিত ধ্বনিও যেন ব্যালবধূচিত্তের উল্লাসের মত হর্ষায়িত হয়। অষ্টাবক্রের অভিভূত মুখচ্ছবির দিকে, যেন এক পাশবদ্ধ বনকুরঙ্গের অসহায় মূর্তির দিকে সহেলচ্ছুরিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হেসে ওঠে উদীচীর অনুচারিণী সাত সুন্দরী, পর মুহূর্তে কক্ষ হতে চলে যায়।

মণিজ্যোতিবিহুল মায়াভবনের একটি একান্ত, যেন জগতের সকল লোকলোচনের শাসন হতে মুক্ত একটি নিভৃত, এবং সেই নিভৃতের অন্তরে মীনকেতুর নূতন কেতনের মত বিজয়াবহ আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে লীলাসঙ্গচতুরা এক বর্ষীয়সীর মসিনিবিড় ভ্রূপতাকা। উদ্‌ভ্রান্তির বন্ধনে রচিত একটি সান্নিধ্য। শুধু অষ্টাবক্র ও উদীচী, আর কেউ নয়। এই নিভৃতের আকাঙ্ক্ষাকে কোন প্রশ্নের স্পর্শে ব্যথিত করতে পারে, এমন কোন ছায়াও এখানে নেই।

উদীচী বলে—আমার সান্নিধ্য পেয়েছেন ঋষি, এইবার বলুন, কি অভিলাষে বিহুল হয়েছে আপনার কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষের স্বপ্নভার?

অকস্মাৎ, যেন নিজেরই বক্ষের তপ্ত নিঃশ্বাসের আঘাতে চঞ্চল হয়ে, পাবকতাপে উত্তাপিত শিশুভুজঙ্গের মত ব্যথিত হয়ে নিবেদন করে অষ্টাবক্র।—স্নানোদক চাই।

কলোচ্ছলা স্রোতস্বতীর মত তরলহাস্যে শিহরিত হয় উদীচীর কণ্ঠস্বর।—স্নানোদকে শীতল হতে পারবেন না ঋষি। বলুন, কি চায় আপনার জ্বালা-নিঃসারী নিঃশ্বাসের ঝঞ্ঝা, স্ফুর অধরের সুশোণ রৌদ্র, আর বহু কেতকীর গন্ধে পীড়িত ভুজভজঙ্গের হিল্লোল?

নীলবনের ছায়াঘন রহস্যের কুহরে লুক্কায়িত সেই মণিময় মায়াভবনের বাহিরে নীড়াগত বিহগের ক্লান্ত কূজনস্বর শোনা যায়। সন্ধ্যা হয়েছে। অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর শিহরিত হয়ে আবেদন করে।—সন্ধ্যা পূজার জন্য আসন চাই।

হেসে ওঠে ঝংকারময়ী উদীচী—এই রত্নপর্যঙ্কে উপবেশন করুন ঋষি।

চমকে ওঠে অষ্টাবক্র, এবং অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। উদীচী বলে—এই তো যথার্থ আসন। উত্তর দিগ্‌ভূমির নীলবনের ছায়ায় আবৃত এই সুখময় জগতে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য কর্কশ কুশতৃণে রচিত আসনের প্রয়োজন হয় না ঋষি। এই জগতের সন্ধ্যাও মন্ত্র স্তব আর জপমালায় বন্দিত হতে চায় না।

রত্নপর্যঙ্কের উপর উপবেশন করে অষ্টাবক্র। আরও সুন্দর হয়ে ওঠে উদীচীর দুই ভ্রূবল্লীর বিলোল অলজ্জা। বর্ষীয়সী উদীচীর কজ্জলমসিমদির দৃষ্টিও নিবিড় সমাদর বর্ষণ ক'রে অষ্টাবক্রের বিচলিত চিত্তের তৃষ্ণাকে আশ্বাস দান করতে থাকে।

বিমুগ্ধ অষ্টাবক্র। নীলবনঘন অভিনব লালসার জগতে এক মায়াভবনের মণিপ্রদীপের প্রখর দ্যুতিনখরের স্পর্শে যেন উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে অষ্টাবক্রের স্মরণপথের সব আলো-ছায়া। মনেও পড়ে না অষ্টাবক্রের, ত্রিলোকের কোন উপবনের লতাচ্ছায়ে সুযৌবনা এক অনুরাগিণী নারীর অভিলাষ অষ্টাবক্রের জন্য নয়নে অমেয় মায়া সঞ্চিত ক'রে প্রতীক্ষায় রয়েছে। ভুলেই গিয়েছে অষ্টাবক্র, জীবনের কোন প্রভাতবেলায় কোন বননিভৃতের একান্তে তরুণ তপনের আলোকে শ্রেয়সীর যৌবনগরীয়সী কান্তির কল্লোলিত সুষমাকে মহত্তমা তৃপ্তি বলে চিনতে পেরেছিল অষ্টাবক্র। অষ্টাবক্রের দুই চক্ষু হতে কেতকীরেণুবাসিত এক ভঙ্গুর স্বপ্ন এই বর্ষীয়সী লালসাময়ীর মদির ভ্রূলাস্যের একটি কঠোর আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

আর একবার চমকে ওঠে অষ্টাবক্র। উল্লাসচপল অথচ নিবিড়কোমল এবং হর্ষায়িত এক স্পর্শের উৎসব হঠাৎ এসে অষ্টাবক্রের বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে। উদীচীর উদ্যত দুই বাহু অকস্মাৎ মত্ত হয়ে আভরণমুখর মাল্যের মত ঝংকার দিয়ে কঠিন আলিঙ্গনে গ্রহণ করেছে অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমবাসিত কণ্ঠ, যেন গরলপ্রগলভা ব্যালবধূর সন্তাপিত দেহ চন্দনতরুর দেহ জড়িয়ে ধরেছে। অষ্টাবক্রের দুই চক্ষুর বিবশ বিস্ময়ের সম্মুখে শুধু ভাসতে থাকে প্রবীণা কেলিকলানিপুণার মসিমদির ভ্রূভঙ্গীর বিলোল অলজ্জা।

উদীচী বলে—বল ঋষি, সকল কুণ্ঠা অপহত ক'রে মুক্তকণ্ঠে বল, উত্তর দিগ্‌ভূমির সুন্দর সন্ধ্যার এই মধুরক্ষণে কি চায় তোমার যৌবনাঞ্চিত জীবনের আকাঙক্ষা?

অষ্টাবক্র—তৃপ্তি চায়।

উদীচী—সে তৃপ্তি এখানেই আছে। এই রত্নপর্যঙ্কের পুষ্পশয্যায় কোন নিশীথবিহ্বলতার বক্ষে সে তৃপ্তিকে অবশ্যই দেখতে পাবে, প্রতীক্ষায় থাক, ঋষি।

অষ্টাবক্র—প্রতীক্ষায় থাকতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দাও, আমার আজিকার আকাঙক্ষার তৃপ্তিকে আমার চক্ষুর সম্মুখে এনে দেবে তুমি।

কুটিল হাস্য বিচ্ছুরিত ক'রে উদীচীর অধরপুট শিহরিত হতে থাকে।—প্রতিশ্রুতি দিলাম ঋষি। কিন্তু শপথ ক'রে বল, তোমার আকাঙক্ষার তৃপ্তিকে সম্মুখে পেলে তাকে জীবনের চিরসহচরী ক'রে নেবে।

অষ্টাবক্র—নেব, শপথ ক'রে বলছি।

দূর উত্তরের দিগ্‌বলয়ে অলক বলাহকে বিভ্রাজিত আকাশপথের দিকে তাকিয়ে মহর্ষি বদান্যের দুই চক্ষুর আক্ষেপ হঠাৎ হাস্যায়িত হয়। সুন্দর আসক্তির গর্বে উদ্ধত সেই অষ্টাবক্র আর ফিরে এল না। অনুমান করতে পারেন বদান্য, এতদিনে সেই হঠভাষী ঋষির সুখকামুক অভিলাষের একনিষ্ঠা এক কজ্জলমসিমদিরার ভ্রূভঙ্গের গরলে প্রলিপ্ত হয়ে নীলবনের একান্তে নির্বাসন লাভ করেছে।

দিবসের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবস, একের পর এক বহু দিবস-রাত্রি অতীত হয়েছে। বহু কুহেলিকালসা সন্ধ্যার পুলকবন্ধুর বনদ্রুমদেহ হতে শিথিল মঞ্জরীর ভার ভূতলে

লুটিয়ে পড়েছে। যেমন রাকেন্দুবন্দিত রজনীর, তেমনি তরুণ তপনে নন্দিত প্রভাতের রশ্মিরাশি কলস্বনা স্রোতস্বিনীর দুই তটের শিশিরসিক্ত তৃণভূমির বক্ষে হেসেছে। কিন্তু সেই সুন্দর আসক্তির মানুষ, সুপ্রভার কেতকীমালিকার স্বপ্ন সেই অষ্টাবক্র সেই বনপথে আর আসে না। শুধু আসে আর ফিরে যায় সুপ্রভা। বৃথা প্রতীক্ষায় ব্যথিত হয় কেতকীমালিকার সুরভি। কোথায় গেল, কেন গেল, এবং কবে ফিরে আসবে সুপ্রভার কামনার বাঞ্ছিত সেই কুঙ্কুমিততনু ঋষি সুকুমার? কল্পনাও করতে পারে না সুপ্রভা, এবং বুঝতেও পারে না, সেই একনিষ্ঠ অভিলাষ কেমন ক'রে তারই শ্রেয়সীর অধরসুষমা না দেখতে পেয়েও শান্তচিত্তে দূরে সরে থাকতে পারে?

বদান্যের তপোবনস্থলীর উপান্তে এক লতাবৃত কুটীরের নিভৃতে মৃদুদীপশিখার দিকে তাকিয়ে বিহগের সান্ধ্য কূজন শোনে সুপ্রভা। কেতকীমালিকার সুরভি সুপ্রভার চিন্তাপীড়িত নয়নের মত জাগরণে যামিনী যাপন করে। প্রিয়বিচ্ছেদভীরু চক্রবাকীর মত চকিতশ্বসিত বক্ষের সন্দেহ শান্ত করবার জন্য কুটীরের দ্বারোপান্তে দাঁড়িয়ে সুপ্রভার সমগ্র অন্তর যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু বৃথা ; কোন প্রিয় পদধ্বনি, কোন গুঞ্জন, মৃদুতম কোন মর্মরও শোনা যায় না। কুঙ্কুমাঙ্কিত কোন বক্ষের বিহ্বল নিঃশ্বাস বদান্যতনয়ার কবরীসৌরভ অন্বেষণের জন্য মৃদুল নিঃস্বন সঞ্চারিত ক'রে লতাগৃহের দিকে আসে না।

অষ্টাবক্রের রহস্যময় অন্তর্ধান সুপ্রভার সকলক্ষণের ভাবনার আকাশে যেন এক মেঘমেদুরতা ঘনিয়ে রেখেছে। সবই সহ্য করতে পারে সুপ্রভা, শুধু সহ্য করতে পারে না একটি সংশয়। তীক্ষ্ণমুখ কুশসায়কের মত সেই সংশয় যখন সুপ্রভার কল্পনাকে বিদ্ধ করে, তখনই সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয় সুপ্রভার অন্তরের প্রশান্তি। মনে হয়, সুন্দর অথচ কপট এক আসক্তির হঠভাষিত প্রতিশ্রুতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপে সুপ্রভার কণ্ঠের কেতকীকে তুচ্ছ ক'রে চলে গিয়েছে। নয়নোপান্তে অদ্ভুত এক জ্বালাময় সিক্ততা অনুভব করে সুপ্রভা। মনে হয়, অশ্রু নয়, তারই যৌবনের প্রথম অনুরাগে উদ্দীপ্ত বিশ্বাস যেন নিষ্ঠাহীন এক পৌরুষের চটুল কৌতুকলীলার আঘাতে মথিত হয়ে রুধিরবিন্দুর মত ফুটে উঠেছে।

এইভাবে প্রতিক্ষণ সংশয়খিন্ন ভাবনার ভার নীরবে সহ্য ক'রে, আর সুপ্তিহীন নয়নের কৌতূহল নিয়ে প্রতি নিশান্তের আকাশে ও বনতরুশিরে নবোষার অরুণিত সঞ্চার লক্ষ্য করে সুপ্রভা। দীপ নিবিয়ে দেয়, স্নান সমাপন করে। পুষ্পে ও পরাগে প্রসাধিত তনুতে যেন এক নূতন আশার আবেশ ভরে ওঠে। বননিভৃতের রক্তপাষাণের নিকটে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভা। দেখতে পায়, রক্তপাষাণের বক্ষের উপর কোমল দ্রুমমঞ্জরীর পুঞ্জ ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছে, যেন পদাঘাতে পীড়িত এক বাসকশয্যা। আসেনি অষ্টাবক্র, কে জানে ত্রিজগতের কোন বনলোকের নিভৃতে কোন স্রোতস্বিনীর কাছে এখন তৃষ্ণার্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই আসক্তির পুরুষ অষ্টাবক্র?

চলে যায় সুপ্রভা, এবং এক নিশান্তে লতাগৃহের দীপ নিভিয়ে দিয়েও চুপ ক'রে বসে থাকে। ব্যর্থ অভিসারে শুধু চরণ ক্লান্ত ক'রে আর লাভ কি? অতনুতাপিত তনুর দুর্ধর তৃষ্ণা অধরে ধারণ ক'রে ঐ রক্তপাষাণের কাছে ছুটে যাবার আর কিবা প্রয়োজন? সুপ্রভা যেন কল্পনায় তার হতমান আকাঙ্ক্ষার শোণিত বেদনার দিকে অমেয় মায়ায় অভিভূত নয়নের করুণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, ব্যর্থ অভিসারে আহত তার যৌবনময় জীবন যেন অধঃপতিত জ্যোৎস্নার মত ধূলিপুঞ্জের উপর পড়ে রয়েছে।

এই অবহেলার ধূলিময় মালিন্য হতে মুক্ত হবার জন্য হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সুপ্রভার মন। আকাশের শেষ তারকা নিভেছে, বনতরুশিরে প্রভাময় ঊষাভাষ দেখা দিয়েছে। স্নিগ্ধস্নানোদকের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে সুপ্রভার তাপিত দেহের তৃষ্ণা। লতাগৃহ হতে বের হয়ে আশ্রমতড়াগের নিকটে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভা।

তড়াগসলিলে দেহ নিমজ্জিত ক'রে স্নান করে সুপ্রভা। সুতনুকা সুপ্রভার অনাবরণ অঙ্গ-শোভা যেন মৃণালবন্ধনচ্যুত স্ফুট কোকনদের মত সলিলের শীতল সিক্ততায় লিপ্ত হয়ে তড়াগের বক্ষে হিল্লোলিত হতে থাকে। অকস্মাৎ চমকে ওঠে সুপ্রভা, বিস্ময়ে বিকশিত নূতন এক কৌতূহল দুই নেত্রে অপলক হয়ে তড়াগতটের পুষ্পময় বীথিকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অরুণিত তটবীথিকায় অপরিচিত পথিকের মূর্তি দেখা যায়। একজন নয়, দুই জনও নয়, অনেক জন। একে একে আসে আর আশ্রমস্থলীর প্রাঙ্গণের দিকে চলে যায়। সুন্দরদর্শন এক এক জন ঋষিযুবা। দেখতে পায় সুপ্রভা, কোন আগন্তুকের কপোলমণ্ডল যেন ঊষালোকে লিপ্ত ঐ পূর্বাকাশের মত নবীনযৌবনরাগে উদ্ভাসিত। কোন জনের বিশাল বক্ষঃপটে রক্তচন্দনের আলিম্পন, যেন পুষ্পহাস শাল্মলীর কান্তিচ্ছটা রম্যতর আশ্রয় লাভের লোভে সেই উন্নতকায় ঋষিযুবার বক্ষের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে। ইন্দীবরবিনিন্দিত দুই নীলনিবিড় নয়নে কম্র কামনার কল্লোল, কে ঐ তরুণ ঋষি? কুসুমস্রগাসক্ত কণ্ঠ আর স্মিত দশনদ্যুতি নিয়ে চলে যায়, কে ঐ পুরুষপ্রবর, ঋতুরাজনীরাজিত রতিরাজোপম সুকান্ত?

সলিলহীন দেহের স্নানোৎসুক চাঞ্চল্য সংযত ক'রে তড়াগকমলের মৃণাল আলিঙ্গন করে সুপ্রভা, যেন হিল্লোলিত কোকনদের প্রাণ এক আকস্মিক বিস্ময়ে বিবশ হয়ে গিয়েছে। কমলবনের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কমলাননা ঋষিকুমারী যেন সূর্যালোকিত এক স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে এক তৃষ্ণার কুসুম। কিংবা, সুপ্রভার সিক্তোজ্জ্বল ঐ দুই আভমেয় নয়ন যেন যামিনীচারিণী এক চক্রবাকীর চক্ষু, চন্দ্রালোকে লিপ্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিজেরই বক্ষের উষ্ণশ্বাসময় অথচ মধুরায়িত এক বেদনার উৎসব লক্ষ্য করছে। দুঃসহ এই বেদনা, স্ফুট কোকনদের সৌরভময় আকাঙক্ষার বক্ষে তৃষ্ণাকুল ঝঞ্ঝানিলের নিঃস্বন সঞ্চারিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ সুপ্রভার দেহ-মন যেন এক অভিনব স্বপ্নের সলিলে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ দেখতে পায় সুপ্রভা, তটবীথিকা জনহীন হয়ে গিয়েছে। নূতন এক বিস্ময় ও বিমুগ্ধতার ভার বক্ষে বহন ক'রে লতাগৃহের দিকে ফিরে যায় সুপ্রভা।

—প্রস্তুত হও কন্যা।

লতাগৃহের দ্বারোপান্তে এসে আর-এক আকস্মিক রহস্যের আহ্বান শুনে চমকে ওঠে সুপ্রভা। প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন মহর্ষি বদান্য।

বদান্য বলেন—প্রস্তুত হও সুপ্রভা, তুমি আজ পতি বরণ ক'রে ধন্য হবে। এই প্রভাতের শুভক্ষণে তোমার জন্য স্বয়ংবরসভা আহূত হয়েছে। জ্ঞানী গুণী ও প্রিয়দর্শন বহু ঋষিযুবা আমার আহ্বানে আশ্রমোপবনে সমবেত হয়েছেন।

সুপ্রভার বিস্মিত ও বিমুগ্ধ নয়নের তৃষ্ণালস দৃষ্টি চকিত তড়িল্লেখার মত ক্ষণলাস্যে দীপ্ত হয়ে পরক্ষণে সলজ্জ ঘনপক্ষ্মভারে অবনত হয়। মহর্ষি বদান্যের নেত্রে বিচিত্র এক শ্লেষের ছায়া ফুটে ওঠে। সুপ্রভার উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে এই সত্যই দেখতে থাকেন বদান্য, আসক্তির কেতকীও কেমন ক'রে আর কত সহজে নিষ্ঠা হারায়। জয়ী হয়েছে মহর্ষির চিন্তার সেই রক্তপাষাণসদৃশ কঠিন তত্ত্ব, আসক্তি কখনও একনিষ্ঠা স্বীকার করে না।

কেতকীমালিকা হাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে সুপ্রভা। বনস্পতিময় উপবনের কাছে গিয়ে প্রিয়দেহ সন্ধানের জন্য আগ্রহের শিহর সহ্য করছে এক যৌবনবতীর দেহলতিকা। বনমৃগীর মত শুধু দেহজ অভিলাষের আবেশে জীবনসঙ্গী বরণ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে এক ঋষিতনয়ার চিত্ত। দুঃখিত হন বদান্য। ঋষির আশ্রমের শিক্ষায় লালিত হয়েও প্রেম ও অপ্রেমের প্রভেদ অনুভব করবার মত মনের অধিকারিণী হতে পারেনি তাঁর কন্যা। মনোময়ী নয়, নিতান্ত নয়নময়ী। যার মুখ দেখে মুগ্ধ হয় নয়ন, তারই কণ্ঠে জীবনের বরমাল্য দান করে।

দুঃখিত হয়েও চিন্তার গভীরে একটি হর্ষের সঞ্চার অনুভব করছিলেন বদান্য। আসক্তি কখনও একনিষ্ঠা স্বীকার করে না, এই সত্য আজ স্বীকার করবে সুপ্রভা। সুপ্রভার জীবনের একটি মিথ্যা বিশ্বাসের মোহ সুপ্রভা আজ নিজের হাতেই চূর্ণ ক'রে দিতে চলেছে। আর সময় নেই, শুভলগ্ন উপস্থিত।

বদান্য বলে—এস কন্যা।

মরালীর মত মৃদুলগতি, অথচ নয়নে খঞ্জনবধূর চঞ্চলতা, সুপ্রভা ধীর-সঞ্চারিত চরণে মহর্ষি বদান্যের ছায়া অনুসরণ ক'রে স্বয়ংবরসভার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কেতকীমালিকার সুরভিত ও বিমুগ্ধ তৃষ্ণা তৃপ্তি লাভের জন্য নূতন এক জগতের দিকে চলেছে।

নীলবনের মায়াভবনের মণিদীপিত কক্ষে রত্নপর্যঙ্কের উপর নিদ্রাভিভূত ঋষি অষ্টাবক্র। বাহিরে নিবিড় সন্তামসী রাত্রির অন্ধকার। পিকরবের শেষ ঝংকারও ক্লান্ত হয়ে নীলবনের অন্ধকারে সুপ্তিময় স্তব্ধতার মধ্যে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সুপ্ত অষ্টাবক্র যেন এক জ্যোৎস্নাময় উপবনের শোভা দেখছে, আর শুনছে মধুর পিকধ্বনির সঙ্গীত। বক্ষঃপুটে সঞ্চিত সকল কামনার পরাগ ধমনীধারায় উচ্ছলিত সকল অনুরাগের শোণিমা এবং নিঃশ্বাসে আকুলিত সকল তৃষ্ণার সমীর যেন তৃপ্তিরসরভসা এক অধরশোভাকে নিকটে পেয়েছে। দেখছে অষ্টাবক্র, চঞ্চল দক্ষিণসমীরের প্রবল কৌতুকে শিথিলিত হয়েছে এক নিবিড় নীবিতটের নীলাংশুক মেখলা। বহুলচিকুরচ্ছায়া ও বিপুলনয়নমায়ায় এক উচ্ছ্বাসময়ী ছবি। সে নারীর পুষ্পহারের সলজ্জ শাসন দীর্ণ হয়ে গিয়েছে ; এক অশান্তা অভিসারচারিণীর বক্ষোজ বাসনা যেন সুপীণ বিহ্বলতা উৎসারিত ক'রে উৎসবের উৎসর্গ হবার জন্য উৎসুক হয়ে অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অষ্টাবক্রের স্বপ্নই সুরভিত হয়ে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, সেই সুরভি যে এক কেতকীমালিকার সুরভি! অষ্টাবক্রের আকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি! সেই তৃপ্তিকে বক্ষোলগ্ন করবার জন্য সাগ্রহে বাহুপ্রসারিত করে অষ্টাবক্র। ভেঙ্গে যায় স্বপ্নের আবেশ, চমকে জেগে ওঠে অষ্টাবক্র।

সেই মুহূর্তে এক হাস্যধরার সুস্বর ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে।—আমি এসেছি ঋষি।

কে তুমি? বিস্ময়ে কম্পিতকণ্ঠে অষ্টাবক্র প্রশ্ন ক'রেই দেখতে পায় রত্নপর্যঙ্কের উপর তারই বক্ষের সন্নিধানে এসে বসে রয়েছে উদীচী। বর্ষীয়সীর মূর্তি নয়, যৌবনরুচিরা ও সুচারুদেহিনী এক নবীনার নয়নমনোহারিণী মূর্তি। সেই ঝংকারমুখর মণিময় আভরণের ভার যেন ঝরে পড়ে গিয়েছে। তড়িল্লতার মত নিরাভরণা সুন্দর এক বহ্নির লতিকা অনাবরণ তরুণতনুর লাস্য স্ফুরিত ক'রে অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছে। যেন খরকামনার সুবর্ণকশা।

—তুমি উদীচী? অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বরে আহত স্বপ্নের বেদনা কম্পিত হতে থাকে।

—হ্যাঁ ঋষি, আমিই তোমার তৃপ্তি। অষ্টাবক্রের মুখের দিকে নয়নকিরণ বর্ষণ করে নীলবনের মায়া দিয়ে রচিত কামনাময়ী তরুণী।

অষ্টাবক্র বলে—তুমি মিথ্যা বিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছ, উদীচী। তুমি আমার তৃপ্তি হতে পার না।

উদীচীর খরনয়নের হর্ষ হঠাৎ আহত হয়।—সত্য স্বীকার কর ঋষি। তোমার ঐ তৃষ্ণাকাতর দুই চক্ষুর দৃষ্টি আমার এই দেহচ্ছবির দিকে নিবদ্ধ ক'রে বল দেখি, বিচলিত হয় না কি তোমার আসক্তিময় বক্ষের নিঃশ্বাস?

অষ্টাবক্র—বিচলিত হয়, অস্বীকার করি না।

উদীচী—মুগ্ধ হয় না কি?

অষ্টাবক্র—মুগ্ধ হয়, স্বীকার করি। কিন্তু আমার এই বিচলিত নিঃশ্বাসের শান্তি তুমি নও। আমার এই বিমুগ্ধ চিত্তের তৃপ্তি তুমি নও! আমার তৃপ্তি কেতকীরেণুপরিমলে সুরভিত হয়ে আমারই প্রতীক্ষায় এই জগতের এক আশ্রমস্থলীর লতাবৃত কুটীরের নিভৃতে রয়েছে।

উদীচী—কে সে?

অষ্টাবক্র—মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা।

উদীচী—সে কি এই উদীচীর চেয়েও সুন্দরতর অধরের, মদিরতর ভ্রূভঙ্গের, আর খরতর নয়নপ্রভার নারী?

অষ্টাবক্র—না উদীচী, তবু এই সত্য তোমারই নীলবনঘন মায়ালোকের এই মণিদীপ্ত ভবনের কক্ষে, তোমারই সমাদরে কোমলীকৃত এই রত্নপর্যঙ্কে সুশয়ান এক স্বপ্নময় অনুভবের মধ্যে উপলব্ধি করেছি, সেই বদান্যকন্যা সুপ্রভাই আমার আকাঙক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি!

উদীচীর দৃষ্টি যেন বহ্নি উৎসারিত করে।—আমি অতৃপ্তি?

অষ্টাবক্র—তুমি বান্ধবী।

অভাবিত বিস্ময়ে নম্র হয়ে যায় উদীচীর দৃষ্টি।—কি বললে ঋষি?

অষ্টাবক্র—তৃষ্ণাকে তৃষ্ণায়িত কর, বাসনাকে দাও বহ্নি, অয়ি কেলিকটাক্ষলক্ষ্মী তন্বী, তুমি মনোভবভবনের খরদ্যুতিময়ী দীপ্তি। কামিজনচিত্ত কর পুলকিত বিপুল হর্ষে, তুমি ভ্রূভঙ্গীময়ী প্রীতি। অভিলাষে কর উল্লসিত, নিঃশ্বাসে দাও ঝঞ্ঝা, তুমি মদবিলসিত উৎসব। তোমারই সমাদরে মদিরায়িত আমার স্বপ্ন কেতকীরেণুর সুরভি বক্ষে ধারণ করবার জন্য বাহু প্রসারিত করেছে। ব্যাকুল করেছ, বিহ্বল করেছ, আমার তৃষিত নয়নপথে তুমিই তাকে ডেকে এনে চিনিয়ে দিয়েছ, যে আমার আসক্তির উপাসনা, মহত্তমা তৃপ্তি, শ্রেয়সী। তুমি আমার বান্ধবী, অষ্টাবক্রের কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ কর উদীচী।

উদীচীর দুই নয়নের পক্ষ্মপল্লবে যেন কুহেলিকাপীড়িত এক শীতসন্ধ্যার বেদনা শিশির সঞ্চারিত করে। উদীচী বলে—নীলবনলোকের এই চিরকুমারীকে যদি বান্ধবী বলে মনে ক'রে থাক ঋষি, তবে তাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী ক'রে নাও। তোমাকে পতিরূপে বরণ করুক উদীচী।

অষ্টাবক্র—তা হয় না, ক্ষমা কর উদীচী।

উদীচীর কণ্ঠস্বর তীব্র আর্তনাদের মত বেজে ওঠে—তোমার আসক্তিময় বক্ষের কঠিন নিষ্ঠার নিষ্ঠুরতা অন্তত এই মুহূর্তে বর্জন কর ঋষি। আমাকে ক্ষণকালের প্রেয়সীরূপে গ্রহণ কর। তার পরে চলে যেও যেথা যেতে চায় তোমার আকাঙক্ষা, আশ্রমবাসিনী সেই সুপ্রভাময়ী এক অমেয় মায়ার পূর্ণিমার কাছে।

অষ্টাবক্র—অসম্ভব, ক্ষমা কর, বিদায় দাও বান্ধবী।

—যাও! জ্বালাধ্বনির মত তীব্রস্বরে ধিক্কার দিয়ে সরে যায় খরকামনার সুবর্ণকশা।

নীরবে এবং মাথা নত ক'রে চলেই যাচ্ছিল অষ্টাবক্র। কক্ষের অবারিত দ্বারের প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই, পিছন হতে যেন চমকে ওঠে একটি অনুরোধ।—একবার থাম ঋষি।

দেখে বিস্ময় অনুভব করে অষ্টাবক্র, দাঁড়িয়ে আছে উদীচী, এক শান্তা স্নিগ্ধা স্মিতরুদিতার মূর্তি। প্রখর প্রগলভা অলজ্জার মূর্তি নয়, যেন হিমবায়ুলাঞ্ছিতা এক বনলতিকা। নতমুখিনী উদীচীর কপোলে অশ্রুসলিলের রেখা। যেন অমল ধারাসলিলে গলে গিয়েছে সেই কজ্জলমসিমদির ভ্রূভঙ্গী।

অষ্টাবক্রের বিস্ময়কেই বিস্মিত ক'রে হেসে ওঠে উদীচী।—ব্যথিত হয়ো না ঋষি, উদীচীর এই নয়নবারি বেদনার অশ্রু নয়, আনন্দের অশ্রু।

অষ্টাবক্র—আনন্দ?

উদীচী—হ্যাঁ ঋষি, নিষ্ঠায় সুন্দর এক আসক্তির কাছে জীবনে এই প্রথম পরাভূত হয়েছে

নীলবনলোকের এক লালসাময়ীর অনিষ্ঠা। আমি তোমার পরীক্ষা।

অষ্টাবক্র--তুমি আমার শিক্ষা।

উদীচী—জয়ী তুমি।

অষ্টাবক্র—জয়দাত্রী তুমি।

জাগ্রত বিহগের ক্ষীণস্ফুট কলরব শোনা যায়। শেষ হয়েছে সন্তামসী রাত্রি। কক্ষের অবারিত দ্বারপথ অতিক্রম ক'রে বনপথের উপরে এসে দাঁড়ায় অষ্টাবক্র ; এবং দূর দক্ষিণের গগনবলয়ের দিকে নেত্র সম্পাত ক'রে পথ অতিক্রম করতে থাকে।

কার কণ্ঠে মাল্য দান করবে সুপ্রভা? শত প্রিয়দর্শনের মধ্যে প্রিয়তম বলে মনে হয় কার মুখ? কার কণ্ঠলগ্ন হলে তৃপ্ত হবে সুপ্রভার কেতকীমালিকার সুরভিত স্পৃহা?

শুভক্ষণ উপস্থিত। স্বয়ংবরসভায় পাণিপ্রার্থী বহু ঋষিযুবার সমাবেশ। যেন শত তরুণ তরুবরের বরতনুশোভায় বিনোদিত বাসন্ত প্রভাতের এক উপবন। সুপ্রভার কেতকীমালিকার সুরভিত স্পর্শ কণ্ঠসক্ত করবার জন্য বিচলিত চিত্তের আগ্রহ সহ্য করছে প্রবল পৌরুষে পেশল শত অভিলাষ। সেই শোভার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় বদান্যকন্যা সুপ্রভার নেত্রোত্থিত হর্ষ।

তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুপ্রভা। তার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি যেন হঠাৎ এক স্বপ্নের আবেশে অন্য জগতে চলে গিয়েছে। সুপ্রভার কবরী কপোল আর অধরের উপর যেন কুঙ্কুমবাসিত একটি বক্ষ হতে তরঙ্গিত বাসনার নিঃশ্বাস এসে লুটিয়ে পড়ছে ; সুপ্রভার স্বপ্নের বক্ষে মৃগমদামোদিত কুঙ্কুমের উৎসব ঝরে পড়ছে ; কেতকীমালিকার উৎসারিত পিপাসার সুরভি তার পরমা তৃপ্তির আধার এক বক্ষের পৌরুষোচ্ছল স্পর্শ নিকটে পেয়েছে। অষ্টাবক্র, আর কেউ নয়, মল্লিকাপুলকিত ধম্মিল্লের গুরুগৌরবে গরীয়ান্ সেই অষ্টাবক্রের মূর্তি যেন ঋজুকান্ত বনস্পতির মত কামনাবিধুরা এক মাধবীলতিকার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই তো সুপ্রভার যৌবনের সকল আকাঙ্ক্ষার উপাস্য, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি। সেই তৃপ্তির কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণের জন্য সাগ্রহে বাহু প্রসারিত করে সুপ্রভা। ভেঙে যায় স্বপ্নময় আবেশ। স্বয়ংবরসভা হতে ছুটে চলে যায় সুপ্রভা, দাবানলভীতা মৃগবধূ যেমন কাননের লতাজাল ছিন্ন ক'রে ছুটে যায়।

লতাগৃহের নিভৃতে ফিরে এসে কেতকীমালিকার উপর অশ্রুসিক্ত নয়নের চুম্বন অঙ্কিত ক'রে ক্ষণোদ্‌ভ্রান্ত নয়নের জ্বালা শান্ত করতে চেষ্টা করে সুপ্রভা। কিন্তু হঠাৎ বাধায় ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে। শান্ত লতাগৃহের নীরবতা চূর্ণ ক'রে দিয়ে মহর্ষি বদান্যের ভর্ৎসনা গর্জিত হয়।—এ কেমন আচরণ সুপ্রভা? আমারই ইচ্ছায় আহূত স্বয়ংবরসভাকে কেন তুমি এইভাবে অপমানিত করলে, রীতিদ্রোহিণী কন্যা?

সুপ্রভা--ক্ষমা করুন পিতা, আমার জীবনে স্বয়ংবরসভার কোন প্রয়োজন নেই।

বদান্য—কেন?

সুপ্রভা—আমার কেতকীমালিকা জানে, কে আমার জীবনের সহচর হলে সবচেয়ে বেশি সুখী হবে আমার জীবন।

বদান্য—কে সে?

সুপ্রভা—আপনি জানেন পিতা, তার নাম অষ্টাবক্র।

তবু তারই নাম! বিস্মিত বদান্যের চিরকালের বিশ্বাসের সেই কঠিন তত্ত্বের গর্ব যেন কুলিশকঠোর একটি আঘাতে শিহরিত হতে থাকে। সেই অষ্টাবক্রের নাম উচ্চারণ করছে সুপ্রভা। নিতান্তই দেহজ অভিলাষে ব্যাকুল এক কেতকীমালিকার সৌরভে কি এত নিষ্ঠার গৌরব থাকতে পারে?

বদান্যের ভর্ৎসনাময় ভ্রূকুটি হঠাৎ হেসে ওঠে। জানে না সুপ্রভা, তার কেতকীমালিকার

কামনার আস্পদ সেই অষ্টাবক্রের আসক্তির নিষ্ঠা যে এতক্ষণে নীলবনচারিণী এক লালসাময়ীর ঘনমসিময় ভ্রূভঙ্গের আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কল্পনাও করতে পারে না সুপ্রভা, কেতকীমালিকার আশা মিথ্যা হয়ে এক দুঃস্বপ্নের জগতে মিলিয়ে গিয়েছে। সুপ্রভার কামনার এই নিষ্ঠা নিষ্ঠাই নয়, কঠিন মোহ মাত্র। সত্য অবহিত হলে এই কঠিন মোহ এখনি আর্তনাদ ক'রে ভেঙে যাবে।

বদান্য বলেন—শোন কন্যা, তোমার মোহবিমূঢ় নয়নতৃষ্ণার বাঞ্ছিত সেই অষ্টাবক্র এক বর্ষীয়সী স্বৈরিণীর বিলাসলীলার বান্ধব হয়ে উত্তরদিগ্‌ভূমির নীলবনের নিভৃতে এক মায়াভবনের কক্ষে দিবস ও রাত্রি যাপন করছে। সে আর ফিরে আসবে না ফিরে আসবার সাধ্য তার নেই।

—পিতা! সুপ্রভার কণ্ঠ ভেদ ক'রে করুণ আর্তনাদ উৎসারিত হয়, যেন অকস্মাৎ এক কিরাতের বিষসায়ক ছুটে এসে বনমৃগীর হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করেছে।

পর মুহূর্তে, বনমৃগীর বাষ্পমেদুরিত করুণ নয়নের দৃষ্টি স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়, এবং মহর্ষি বদান্যের ভ্রূকুটি অকস্মাৎ এক বিস্ময়ের আঘাতে যেন নীরবে আর্তনাদ ক'রে ওঠে। লতাগৃহের দ্বারোপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এক আগন্তুক, মস্তকে মল্লিকামোদিত ধম্মিল্লের সেই উদ্ধত শোভা অনাহত, তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্রের স্মিতোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় দুই অপলক চক্ষু তুলে সত্যই দেখতে থাকেন বদান্য, তাঁর এতদিনের বিশ্বাসের কঠিন তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। সত্যই জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পেরেছে এক আসক্তির গর্ব। সত্যই পরাভূত হয়েছে নীলবনের সন্তামসী রাত্রির মসি। সত্যই তপস্বীর তপস্যার মত অবিচল নিষ্ঠায় কঠিন এই আসক্তি। সত্যই সুন্দর এই আসক্তি। কিন্তু...।

কিন্তু এই আসক্তি কি সত্যই প্রণয়ের প্রথম সঙ্কেত, পতিপত্নী সম্বন্ধের প্রথম হেতু, মিলনের প্রথম গ্রন্থি? মহর্ষি বদান্যের নেত্রে আর একটি কঠিন প্রতিজ্ঞার ছায়া দেখা যায়। যেন শেষবারের মত নির্মমতম এক পরীক্ষায় তাঁর এতদিনের বিশ্বাসের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে দেখতে ইচ্ছা করছেন বদান্য, সে বিশ্বাস সত্য না মিথ্যা। জানতে ইচ্ছা করছে, দেহজ অভিলাষের সৌরভের মত ঐ আসক্তির বক্ষে কোন সত্যের গৌরব আছে কি না আছে।

মহর্ষি বদান্য বলেন—স্বীকার করি অষ্টাবক্র, সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তুমি পেয়েছ। এবং আমার প্রতিশ্রুতিও স্মরণ করি। সুপ্রভাকে তোমার কাছে এই ক্ষণে সম্প্রদান করতে চাই।

সুপ্রভা ও অষ্টাবক্রের নয়নে স্নিগ্ধ এক হর্ষের জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে। মহর্ষি বদান্যের সম্মুখে এগিয়ে আসে প্রীতিভারে বিনত দু'টি মূর্তি।

মহর্ষি বদান্য বলেন—কিন্তু তোমারই আর একটি প্রতিশ্রুতির কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—বলুন মহর্ষি।

বদান্য—তোমরা আমার মন্ত্রসংস্কারে পরিণীত হবার পর আমার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে ধন্য হবে।

অষ্টাবক্র—অবশ্যই গ্রহণ করব, এবং ধন্য হব মহর্ষি।

বদান্য—কল্পনা করতে পার, কি আশীর্বাদ আমি দান করতে চাই?

অষ্টাবক্র—পারি না মহর্ষি।

বদান্য—আমি এই আশীর্বাদ দিতে চাই, তোমাদের দেহ মন ও প্রাণ হতে আসক্তির শেষ লেশও লুপ্ত হয়ে যাক। বল, প্রস্তুত আছ, গ্রহণ করবে এই আশীর্বাদ?

—মহর্ষি! অষ্টাবক্রের কণ্ঠে অভিশাপভীরু শঙ্কিতের সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর শিহরিত হয়। শিহরিত

হয় সুপ্রভার শান্ত কবরীভার, যেন তার সীমন্তের উপর দংশন দানের জন্য ফণা উদ্যত করেছে এক দুর্ভাগ্যের ভুজঙ্গ।

বদান্য বলেন—প্রতিশ্রুতির অবমাননা করতে চাও অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—চাই না মহর্ষি, কিন্তু এ কেমন আশীর্বাদ? আপনি ভুল ক'রে আশীর্বাদের নামে অভিশাপ দান করতে চাইছেন। আপনার কাছ থেকে অভিশাপ গ্রহণ করব, এমন প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দান করিনি মহর্ষি।

বদান্য—তুমি বুঝতে ভুল করছ, অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—আমার ভুল বুঝতে পারছি না মহর্ষি। আমি জানি অপরের জীবনে সুখ ও কল্যাণ আহ্বান করে যে বাণী, সেই বাণীই হলো আশীর্বাণী। কারও জীবনকে অসুখী করবার জন্য যে বাণী উচ্চারিত হয়, সে বাণী আশীর্বাণী নয়।

বদান্য—আমার এই আশীর্বাণীও তোমাদের জীবনকে সুখী করবার জন্য শুভ ইচ্ছার বাণী। তোমাদের জীবনে আসক্তি থাকবে না, তার জন্য অসুখী হবে না তোমাদের জীবন। তৃষ্ণা না থাকলে তৃষ্ণাহীনতার জন্য কেউ দুঃখ অনুভব করে না, অষ্টাবক্র। ইচ্ছা না থাকলে অক্ষমতার ব্যথা কেউ বোধ করে না। অননুভূত অভিলাষ কখনও অতৃপ্তির ক্লেশ সৃষ্টি করে না। আসক্তিহীন জীবন সুখেরই জীবন।

অষ্টাবক্র—কল্পনা করতে পারি না মহর্ষি, সে কেমন সুখের জীবন।

বদান্য—জলমীনের মনে মহাকাশের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, যেহেতু মহাকাশের নীলিমা তার অনুভবে নেই। বনমধুকরের প্রাণে সুরলোকের পারিজাতের জন্য কোন তৃষ্ণার গুঞ্জরণ নেই, যেহেতু সে পারিজাত তার অনুভবে নেই। অরণ্যমৃগের মনে সমুদ্রস্নানের জন্য কোন ক্রন্দন নেই, যেহেতু সলিলোচ্ছল সমুদ্রের রূপ তার স্বপ্নের অনুভবে ও কল্পনায় নেই। যার জন্য আসক্তি নেই, তার অভাবের জন্য অতৃপ্তিও নেই। আসক্তিহীন এই জীবন এক বেদনাহীন সুখের জীবন। বিশ্বাস করতে পারছ কি অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—বিশ্বাস করছি।

বদান্য—তবে আমার আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও অষ্টাবক্র, দেহ মন ও প্রাণ হতে আসক্তিকে চিরজীবনের মত বিদায় দান করবার জন্য প্রস্তুত হও।

অষ্টাবক্র—কেন মহর্ষি? আপনি তো আজ এই সত্যেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন যে, আসক্তিও নিষ্ঠায় সুন্দর হতে পারে।

বদান্য—আসক্তি সুন্দর হলেই বা কি আসে যায় অষ্টাবক্র? বিষসলিল স্নিগ্ধ হলেই বা কি? সে সলিল প্রাণের পানীয় হতে পারে না। খলপাবক হেমবর্ণ হলেই বা কি? সে পাবক গৃহদীপের আলোক হতে পারে না। মরুসমীর উচ্ছ্বসিত হলেই বা কি? সে সমীর নিকুঞ্জের হিরন্ময় আনন্দের বান্ধব হতে পারে না।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার জীবন পরিণয়োৎসুক দুই সুন্দর বাসনা যেন আসন্ন এক শুভ বাসকোৎসবের দিকে তাকিয়ে চিতানলের উৎসব দেখতে থাকে। দুর্বহ অঙ্গীকারের বন্ধনে আবদ্ধ দুই অসহায়ের মূর্তি। বদান্য প্রশ্ন করেন।—নিরুত্তর কেন অষ্টাবক্র? বল, কি তোমাদের ইচ্ছা?

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, অপলক স্নেহে অভিষিক্ত দুটি দৃষ্টি। অষ্টাবক্র যেন তার জীবনের আলিঙ্গন হতে স্খলিত এক কেতকীরেণুবাসিত স্বর্গের দিকে মায়াময় নেত্রে তাকিয়ে আছে। সুপ্রভার নয়নের শিশিরেও সেই অমেয় মায়ার সুষমা অভিনব এক মদিরতায় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষের উপর অলক্ষ্য চুম্বনধারার মত ঝরে পড়ে সুপ্রভার সিক্ত নয়নের দৃষ্টি। আসন্ন এক মৃত্যুর বজ্রনাদ শুনতে পেয়েছে, তাই যেন শেষবারের মত ভালবেসে বিদায়

নেবার জন্য প্রস্তুত হয় এক কুঙ্কুম আর কেতকীর আসক্তি।

মৃত্যু হবে আসক্তির, সত্য হবে শুধু মিলন, অদ্ভুত এই আশীর্বাদ সহ্য করবার জন্য হৃদয় কঠিন করতে চেষ্টা করে নবীন রসালময় যৌবনধর অষ্টাবক্র ; চেষ্টা করে উপবনের সমীরপ্রিয়া লতিকার মত সরসতনুকা সুপ্রভা। কিন্তু পারে না।

বদান্যের আশীর্বাদ যেন দক্ষিণ পবনের বক্ষ হতে চন্দনগন্ধভার কেড়ে নিতে চায়। প্রজাপতির পক্ষ্মপতাকার বর্ণায়িত আলিম্পন থাকবে না? গোধূলি হারাবে আভা? আকাশ হারাবে নীলিমা, পুষ্প হারাবে সৌরভ, সমুদ্র হারাবে তরঙ্গ, যৌবন হারাবে আসক্তি? আসক্তিহীন সেই মিলন যে দুই নিঃস্ব রিক্ত চলকঙ্কালের বেদনাহীন সুখের মিলন। সে মিলন মিলনই নয়, সে জীবন জীবনই নয়। আসক্তিহীন সেই মিলনের বেদনাহীন সুখ এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা যাবে না। তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

সুপ্রভার সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে অষ্টাবক্র, এবং অষ্টাবক্রের সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে সুপ্রভা। সুস্মিত হয়ে ওঠে উভয়ের ক্ষণবিষাদমেদুর নয়নের দৃষ্টি, সে দৃষ্টি নূতন এক সংকল্পের আলোকে উদ্ভাসিত।

অষ্টাবক্র বলে—আপনিও একটি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করুন মহর্ষি। বলুন, আপনার মন্ত্রসংস্কারের পুণ্যে পরিণীত আমাদের জীবনে আপনার ঐ আশীর্বাদ দানের পর আপনি আমাদের প্রার্থিত বর প্রদান করবেন।

বদান্য—হ্যাঁ, মনে আছে। বল, কি বর প্রার্থনা করতে চাও তোমরা?

অষ্টাবক্র—আপনার আশীর্বাণী ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের মৃত্যু হয়, এই বর পেতে চাই মহর্ষি।

চিৎকার ক'রে ওঠেন মহর্ষি বদান্য।—মৃত্যু চাও তোমরা?

অষ্টাবক্র—হ্যাঁ, মহর্ষি।

নীরব, স্তব্ধ, শিলীভূত বৃক্ষের মত সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বদান্য, যেন এইবার তাঁর সেই বিশ্বাসের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আর, আসক্তির গৌরব ঘোষণা ক'রে তাঁরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মিলনোৎসুক কেতকী আর কুঙ্কুমের অপরাভূত দুই সংকল্প।

মহর্ষি বদান্যের দুই চক্ষুর কঠিন দৃষ্টি হঠাৎ বাষ্পাসারে প্লাবিত হয়। সুপ্রভার কণ্ঠস্বর ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে।—পিতা?

বিস্মিত অষ্টাবক্র ডাকে।—এ কি মহর্ষি?

মহর্ষি বদান্য বলেন—নির্মম পরীক্ষার প্রাণ আনন্দে গলে গিয়েছে অষ্টাবক্র, এই অশ্রু আনন্দেরই অশ্রু। স্বীকার করি সুপ্রভা, তোমাদের সুন্দর আসক্তিই সত্য। স্বীকার করি অষ্টাবক্র, আসক্তিই এই মর্ত্যের মানব ও মানবীর মিলিত জীবনের মালিকা, প্রকৃত বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি।

সস্নেহ আগ্রহে সুপ্রভা ও অষ্টাবক্রের দুই পাণি সমন্বিত ক'রে মন্ত্র পাঠ করেন মহর্ষি বদান্য। তার পরেই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন।—কুঙ্কুম ও কেতকীর জীবন চিরসুখী হোক।

অষ্টাবক্র—বর প্রদান করুন মহর্ষি।

বদান্য—বল, কি বর চাও?

অষ্টাবক্র—চাই আপনার পদধূলির স্পর্শ।

মহর্ষি বদান্যের চরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা। অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার শির চুম্বন করেন মহর্ষি বদান্য।

কিম্বদন্তীর দেশে

ভূমিকা

রূপকথায় আছে হট্টমালার দেশের কথা। সেই দেশের জীবনের রূপ এবং হাসিকান্নার রীতিনীতি অদ্ভুত। কথক তাঁর কাহিনীকে বিশেষ এক বিস্ময় কৌতূহল ও কৌতুকের রসে রসিত করার জন্য এক অবাস্তব দেশের রূপ কল্পনা ক'রে নিয়েছেন। পৌরাণিকেরও এই রকমের এক-একটা অবাস্তব দেশ অথবা জগৎ আছে। ইন্দ্রলোক আছে, গন্ধর্বলোক আছে, বরুণালয় আছে। এসব জগতের প্রকৃতি ভিন্নতর এবং জীবনের রূপও ভিন্নতর। কোথাও চিরবসন্ত বিরাজিত, কোথাও চিরযৌবন। উপকথার কথকও এই ধরনের কাল্পনিকতার কৃতিত্বে কম যান না। তাঁরও 'পরীর দেশ' আছে। লৌকিক সুখ-দুঃখের ঘটনার সঙ্গেই বহু ও বিচিত্র অলৌকিক রহস্য মিশিয়ে কাহিনীকে আলো-ছায়ার মতো একটা মিশালী রূপ ও বিস্ময়ের রস দান করে উপকথা। আধুনিক যুগের আশ্চর্য-কাহিনীর রচয়িতারাও নানারকমের 'আজব দেশ' কল্পনা করেছেন। কেউ সৃষ্টি করেছেন লিলিপুটের দেশ, কেউ বা অন্য কোন অদ্ভুতের রাজ্য।

'কিংবদন্তীর দেশ' অবশ্য এই ধরনের নিছক কল্পনাসম্ভব কোন দেশ নয়। কিংবদন্তীর দেশটা খুবই বাস্তব ও সত্য, কারণ কিংবদন্তীর ঘটনাস্থল স্বচক্ষে দেখা যায়। কিংবদন্তীগুলি হলো অর্ধেক ইতিহাস আর অর্ধেক কল্পনা, অবশ্য কল্পনামিশ্রিত পৌরাণিকতার রূপ ও পরিচয় নিয়ে এক বিশেষ শ্রেণীর কিংবদন্তীও আছে। প্রত্যেক দেশেরই জনসমাজে শত সহস্র কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিংবদন্তীও জাতির বিশেষ এক শ্রেণীর কথা-সাহিত্য, যদিও পুরাণ রূপকথা ব্রতকথা ও উপকথার মতো বিশেষ কোন ধরনের বর্ণনভঙ্গী কিংবদন্তীর মধ্যে পাওয়া যায় না। অরণ্যের নিভৃতে সমাশ্রিত পুষ্পকুঞ্জের মতোই কিংবদন্তীগুলির রূপ, যেন প্রাণের এক সহজ আবেগে নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাগানের পুষ্পকুঞ্জের অনুরূপ কোন পারিপাট্য এদের নেই, কারণ এরা কোন দক্ষ মালীর হাতের সেবায় ও যত্নে লালিত নয়। কিন্তু বর্ণ ও সৌরভের কোন অভাব নেই। এমন বহু কিংবদন্তী আছে যেগুলি যথার্থ রসোপেত ও পূর্ণগঠিত এক একটি কাহিনী।

পুরাণ, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, এমন কি আষাঢ়ে গল্পেরও মতো বিশেষ কোন একটি সাহিত্যোচিত প্রকাশভঙ্গী কিংবদন্তীগুলির নেই। মিথ, লেজেণ্ড, ফেব্‌ল্ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর কথাসাহিত্য তাদের কাহিনীগত বিষয় এবং কল্পনাধর্মের বৈশিষ্ট্যের কারণে শুধু নয়, কালক্রমে বিশেষ এক একটি গঠনরীতি লাভ করার কারণেও বিশেষ বিশেষ সাহিত্য-রূপ অর্জন করেছে। কিংবদন্তী এরকম কোন বিশেষ গঠনরীতি আজও লাভ করেনি এবং কোনকালে লাভ করবে বলেও মনে হয় না। কিংবদন্তীগুলি হলো বাস্তব ও কল্পিত ঘটনার খণ্ড খণ্ড অবয়ব, অবিন্যস্ত অগ্রথিত ও সৌষ্ঠববিহীন, কথাশিল্পের কাঁচা মাল। কিংবদন্তীর সৃষ্টিরও বিরাম নেই। কিংবদন্তী অতীতের বিশেষ কোন যুগের সৃষ্টিও নয়। ঘটনা অতীত হ'য়ে যায়, ইতিহাস তার দাগ রেখে দিয়ে যায় ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের একটি ইষ্টকখণ্ডে, একটি দীর্ঘিকার সোপানে অথবা প্রাসাদের ভগ্নস্তূপে। কোথাও বা সে চিহ্নও থাকে না। কিন্তু ইতিহাসের সেই সব ঘটনার একটি অশরীরী রূপ জীবন্ত ক'রে রাখে কিংবদন্তী।

প্রকাশভঙ্গী নেই, কিন্তু কল্পনাভঙ্গী আছে কিংবদন্তীর, তবে সে কল্পনাভঙ্গী সর্বক্ষেত্রে এক ধরনের নয়। কোনটি রূপকথার মত, কোনটি উপকথার মত এবং কোনটি আবার নিছক একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার মত। তা ছাড়া, এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন কিংবদন্তীর কল্পনাভঙ্গীর মধ্যে রূপকথা, উপকথা ও পুরাণ একই সঙ্গে আশ্রিত ও মিশ্রিত

হয়েছে।

কিংবদন্তীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই কথাশিল্পটি বিশেষ কোন ব্যক্তির কল্পনাকুশল প্রতিভার সৃষ্টি নয়। কিংবদন্তী বস্তুত সাধারণ সমষ্টিমনের সৃষ্টি। সেই জন্য কিংবদন্তীকে স্বচ্ছন্দবনজাত পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সাধারণ মানুষের কল্পনাভূমিতে সাধারণ মানুষেরই ভাবনা ও আগ্রহের রূপ বিকশিত করেছে কিংবদন্তী। কিংবদন্তীর বহিরঙ্গে পরিবর্তনও ঘটে, কালে কালে তার অবয়বে নতুন কল্পনার রং লাগে।

কিংবদন্তী বিশেষ একটি সাহিত্যোচিত প্রকাশরীতি লাভ করেনি, কিন্তু গুণী শিল্পী ও কবিরা কিংবদন্তীকে বিভিন্ন ও বিশেষ গঠন দান ক'রে থাকেন। ঔপন্যাসিক কিংবদন্তীকে উপন্যাসে পরিণত করেছেন, নাট্যকার পরিণত করেছেন নাটকে। রসিক কবি ভাব ভাষা অলংকার ও ছন্দের সজ্জা লাভ ক'রে কত কিংবদন্তী বিশুদ্ধ কাব্য ও গাথায় পরিণত হয়েছে। তরু দত্তের 'শাঁখারী' কবিতা বাংলা দেশের এক পল্লীর স্থানিক বিশ্বাসের কিংবদন্তী অবলম্বনে লেখা। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' বরিশাল জেলার একটি স্থানের নাম। বাংলা সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত উপন্যাস ইতিহাসের তথ্যের চেয়ে ঐতিহাসিক কিংবদন্তীকেই বেশি পরিমাণে গ্রহণ করেছে।

জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। জনসমাজে মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী মাত্রকেই কিংবদন্তী বলা ঠিক হবে না। ঐতিহাসিক অথবা প্রাকৃতিক কোন বাস্তব নিদর্শনকে আশ্রয় ক'রে যে কাহিনী জনমনের কোন কল্পনায় রূপ গ্রহণ করে, সেই কাহিনীকেই যথার্থ কিংবদন্তী বলা যায়। অনেক জনশ্রুতি আছে, যেগুলি ঠিক জনমনের কল্পনার মৌলিক সৃষ্টি নয়। ইংলণ্ডের টেমস নদীর উপত্যকা অঞ্চলে আগে ড্রাগন হিল। গ্রামের বৃদ্ধ ঐ পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে যে কাহিনী বর্ণনা করে, সেটা ঠিক গ্রাম্যমনের রচনা নয়। কাহিনীটা অপরের এবং অতীতের কোন কাহিনীকারের সৃষ্টি। বার্কশায়ারের শেষ ড্রাগনকে যে-স্থানে হত্যা করেছিলেন সেন্ট জর্জ, সেই স্থানটিই হলো ঐ ড্রাগন হিল। গ্রামের মানুষ আজও দেখিয়ে দেয় পাহাড়ের নিকটে এক ধূসর ভূমিখণ্ডকে, যেখানে কোন তৃণ পর্যন্ত জন্মায় না। বক্তব্য এই যে, নিহত ড্রাগনের রক্তে ঐ ভূমিখণ্ডই একদিন সিক্ত হয়েছিল, তাই সেখানে আজও কোন বৃক্ষ, লতা ও তৃণ জন্মায় না। এই অনুর্বর ভূমিখণ্ডটি অবশ্যই কোন না কোন ভূতত্ত্বগত কারণে ঊষর হয়ে রয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের কোন ধারণা নেই। কিন্তু মানুষের মন একটা ব্যাখ্যা খুঁজবেই। সে ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে অজ্ঞ গ্রামবাসীর অন্তরে অবস্থিত সেই চিরকালের কল্পনাপ্রবণ সত্তাটি। গ্রামবাসীর কল্পনাকলার প্রশংসা করতে হয়, তারা পৌরাণিক রচিত অতীতের একটি আখ্যায়িকাকে একটি বাস্তব পটভূমি দান করেছেন। যা নিছক কল্পনা কিংবা নিতান্ত কাহিনী অথবা দূর অতীতের একটি ঘটনা মাত্র, তা'কে একটা চক্ষুগোচর বাস্তব আধারে রেখে নিদর্শনীয় ক'রে তোলার আগ্রহ পৃথিবীর সকল দেশের এবং সকল যুগের মানুষের আচরণে ও ভাবনায় দেখা যায়। নাগপুরের উত্তরে আছে রামটেক পাহাড় এবং সে পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ হ'তে মাটির একটা চাপড়া তুলে ফেললেই দেখা যাবে যে, ভিতরের মাটি যেন আলতার মত লাল রং-এর রঙীন ও সিক্ত হয়ে রয়েছে। কিংবদন্তী বলে, এই পাহাড়ে তপস্যা করতেন রামায়ণের সেই শম্বুক। রামচন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে নিহত শম্বুকের শোণিতে আজও সিক্ত হয়ে রয়েছে এই স্থানের মাটি। বাল্মীকির কল্পনার সঙ্গে মিল রেখে বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটা স্থান খুঁজে বের ক'রে নিয়েছে কিংবদন্তী। রামায়ণের আখ্যানভাগেরই একটি অংশকে বস্তুত শরীরী ক'রে তোলা হয়েছে। মূল কাহিনীটির রচয়িতা হলেন বাল্মীকি ; কিন্তু সাধারণের কল্পনা ঐ কাহিনীকে আর একটু বিস্তারিত করেছে। এই কিংবদন্তী যেন ঐ কাহিনীর এক অলিখিত সমালোচনা। অনুমান করলে ভুল হবে না যে, রাজা রামচন্দ্রের হৃদয়বত্তার সকল গৌরবের

বিরুদ্ধে যেন একটি কঠিন প্রশ্ন সৃষ্টি ক'রে রেখেছে এই কিংবদন্তী।

প্রচলিত অনেক কিংবদন্তীর মধ্যে এই ধরনের প্রশ্নের ও সমালোচনার আগ্রহ খুবই পরিস্ফুট। ইতিহাসকে এবং ঘটনাকে প্রশ্ন করে কিংবদন্তী। যেখানে লিখিত ইতিহাস চুপ ক'রে থাকে, সেখানে কিংবদন্তী মুখর হয়ে ওঠে। ঘটনা অতীত হয়ে যায়, ঘটনার জের মিটে যায়, কিন্তু কিংবদন্তী ঘটনাকে সহজে রেহাই দেয় না। বিচারকের মত রায় দান করে কিংবদন্তী। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাঁর অনুচর শের আফগানকে হত্যা ক'রে সুন্দরী মেহের উন্নিসাকে একদিন বর্ধমান থেকে আগ্রায় নিয়ে গেল। মেহের উন্নিসা নুরজাহানে পরিণত হলেন, নিহত শের আফগানের পত্নী বাদশা জাহাঙ্গীরের প্রণয়ভাগিনী হয়ে সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠলেন। প্রশ্ন উঠবে, বর্ধমান থেকে চলে যাবার সময় সুন্দরী মেহেরের চক্ষে কি এক ফোঁটাও জল দেখা দেয়নি? লিখিত ইতিহাস কোন উত্তর দেয় না। কিংবদন্তী কিন্তু উত্তর দেয়। কিংবদন্তী সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ক্ষমা করেনি এবং জাহাঙ্গীরের প্রেম-প্রণয়ের এই ভয়ংকর পদ্ধতিকে কোনো গৌরব দান করেনি। নিহত শের আফগানের সমাধি আজও বক্ষে ধারণ ক'রে রেখেছে যে বর্ধমান, সেই বর্ধমানের কিংবদন্তী আজও আগ্রার বাদশাহী প্রেমকে অবজ্ঞা ক'রে চলেছে। বৃদ্ধ কৃষক বলে, আজ' নাকি গভীর নিশীথের অন্ধকারে রত্নখচিত ওড়নায় জড়ানো এক সুন্দরীর মূর্তি শের আফগানের কবরের কাছে এসে দাঁড়ায়। কাছে গেলে দেখা যায় না, কিন্তু দূর থেকে দেখা যায়, ওড়নার গায়ে সোনার চুমকি ঝিকঝিক করছে কবরের প্রদীপের ক্ষীণরশ্মির স্পর্শে। আর ভোর হতেই দেখা যায়, কবরের উপর প'ড়ে রয়েছে কতগুলি গোলাপের পাপড়ি। কিংবদন্তী বলে মেহের উন্নিসাই আসেন।

বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে না কিংবদন্তী। নিষ্ঠুরকে শাস্তি দান করে, আর সৎ ও সাধুকে সম্মানিত ক'রে রাখে কিংবদন্তী। মানুষের কত আত্মত্যাগের ঘটনাকে মহনীয় করেছে কত মন্দিরের কাহিনীতে এবং কত অর্থগৃধ্নুর জীবনকে যখের দীর্ঘশ্বাসে পরিণত ক'রে রেখেছে কিংবদন্তী কত পুরাতন সায়রের গভীরে। পদার্থতত্ত্ব বলবে, ঐ আলেয়া হলো একরকমের দীপ্যমান গ্যাস, কিন্তু গ্রাম্য কল্পনা বলবে, অমুক পাপিষ্ঠা নারীর অনুতাপার্ত মনের জ্বালা। কিংবদন্তীতে অলৌকিকতার প্রশ্রয় থাকে, অতিরঞ্জনও আছে। কিন্তু মিথ, ফেব্‌ল্‌, লেজেণ্ড ইত্যাদি কথাসাহিত্যের তুলনায় কিংবদন্তীর বিশেষ একটি গুণ এই যে, এর বক্তব্য কোন না কোন নিদর্শনীয় বস্তুতে আশ্রিত। লিপি সৃষ্টির পূর্বে পুরাণ উপকথা ও রূপকথা ছিল মুখে-মুখে প্রচলিত কাহিনী। সেই শ্রুতিগত ঐতিহ্যের যুগ পার হয়ে এইসব প্রাচীন কথাসাহিত্য এখন আধুনিকের রচিত সাহিত্যের মতই পুঁথি পুস্তকে আশ্রিত ও রক্ষিত। কিংবদন্তীর কিন্তু একটা অতিরিক্ত গৌরব ও বৈশিষ্ট্য আছে। কিংবদন্তী জনশ্রুতির রূপেও লিপিবদ্ধ কাহিনীর রূপে প্রচলিত হ'তে পারে এবং হয়েও চলেছে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যেক কিংবদন্তীর একটা স্বতন্ত্র নীড় আছে, যা অন্য কোন শ্রেণীর কথাশিল্পের নেই। সমাধি, মন্দির, দীর্ঘিকা, প্রাচীন কোন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ অথবা কোন নৈসর্গিক পরিদৃশ্য কিংবা কোন প্রাকৃতিক শব্দ বর্ণ ও গতির বৈচিত্র্য, এই রকমের বাস্তব একটা নিদর্শন সম্মুখে না রেখে কিংবদন্তী তার কাহিনী রচনা করে না। নিদর্শনের কোন চিহ্ন পাওয়া গেলে কিংবদন্তী নিদর্শন খুঁজে বার করে।

পৌরাণিক কিংবদন্তী আর ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর গঠনতত্ত্বের মধ্যে একটা পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। পৌরাণিক কবির কল্পিত কাহিনীকে জনসাধারণ প্রাকৃতিক কোন ঘটনা অথবা ভৌগোলিক কোন সংস্থানের উপর আরোপ করে। সারা ভারতে নানাস্থানে বহু ও বিভিন্ন সীতাকুণ্ড, পাণ্ডবগুহা, বশিষ্ঠ আশ্রম আর রামবন দেখতে পাওয়া যায়। এই স্থানগুলি সাধারণ লোকের কল্পনায় পৌরাণিক ঘটনার আধারভূমি হয়ে উঠেছে। লোকমন পৌরাণিক কবির রচিত কাহিনীর এক একটি ঘটনাস্থল কল্পনা ক'রে নিয়েছে। কাহিনী হলো পৌরাণিকের, শুধু ঘটনাস্থল নির্ণয় করা হলো আধুনিকের কাল্পনিকতার ব্যাপার। পৌরাণিক

কাহিনীর সূত্র ধ'রে জনসাধারণের আর একটু বেশি কল্পনা-স্বাধীনতার উদাহরণ হলো আর এক শ্রেণীর কিংবদন্তী। যেমন, হিমালয়ের শৈলপ্রদেশের নিভৃতে উষ্ণপ্রস্রবণের জলে যে সাদা-সাদা সোহাগার রেণু উৎসারিত হয়, সেই সোহাগা-রেণু লোককল্পনা অনুসারে হলো ভস্মাসুরের অস্থিচূর্ণ। সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামবাসী দূরের কামান গর্জনের মত যে শব্দ শুনে থাকেন, সেটা বৈজ্ঞানিকের মতে সমুদ্রগর্ভেরই অভ্যন্তরের কোন প্রবল জলনাদের রহস্য হলেও গ্রামবাসী মনে করেন যে, লঙ্কাপতি রাবণের সুবিশাল প্রাসাদের দ্বারের কপাট সশব্দে বন্ধ হচ্ছে আর খুলে যাচ্ছে। এই ধরনেরই কল্পনার প্রকোপে ভারতের নানা স্থানের শিলাখণ্ড আকারবৈশিষ্ট্যের কারণে 'ভীমের গদা' আখ্যা লাভ করেছে, আর শিলীভূত বৃক্ষকাণ্ড হয়েছে বকরাক্ষসের অস্থি। এ ক্ষেত্রে কল্পনাটি জনসাধারণের নিজস্ব, কিন্তু কল্পনা প্রকাশ লাভ করেছে পৌরাণিক কোন ঘটনা কাহিনী ও চরিত্রের উপাদান আশ্রয় ক'রে।

কিন্তু ঐতিহাসিক কিংবদন্তী হলো বাস্তব নিদর্শনকে অবলম্বন ক'রে কল্পনার আত্মপ্রকাশ, কল্পনাকে কোন বাস্তব নিদর্শনের উপর আরোপ করা নয়। ঘটনাগুলি স্মরণীয় ঐতিহাসিক কালেরই এক-একটি অধ্যায়ের ঘটনা এবং তার সাক্ষী হয়ে ইঁট পাথর প্রাকার পরিখা সমাধি ও সরোবর রয়েছে। আর, এই সব নিদর্শনেরই দিকে লক্ষ্য রেখে জনসাধারণ অতীতের বাস্তব ঘটনাকে কাহিনীর রূপ দান করে।

অস্পষ্ট ঐতিহাসিকতার একটা মায়াবরণ যেন এই শ্রেণীর কিংবদন্তীকে রহস্যনিবিড় রোমান্সে আবৃত ক'রে রেখেছে। তাই অতিরঞ্জন এবং অলৌকিকতার কুহেলিকা সত্ত্বেও এই সব কিংবদন্তীর বিশেষ এক ধরনের বাস্তবিকতা আছে, যার জন্য কথাসাহিত্যে এই সব কিংবদন্তী বিশেষ এক শ্রেণীর কাহিনী হিসাবে মর্যাদা দাবি করতে পারে।

বিভিন্ন দেশের জনমানসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন দেশের প্রচলিত কিংবদন্তীর মধ্যে প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায়। কোন কোন দেশের প্রচলিত কিংবদন্তীগুলির অধিকাংশই যত সব প্রতিশোধের কাহিনী। কোন দেশের কিংবদন্তীতে ক্ষমা দয়া ও মায়ার আধিক্য। মানবজীবনের সত্য সততা ও প্রেম যে-ঘটনায় আহত হয়েছে, সেই ঘটনার ইতিবৃত্তকে এক চিরন্তন বেদনাভারের মতো ধারণ ও বহন ক'রে চলেছে কিংবদন্তী। আবার অশুভের পরাভব এবং সত্যনিষ্ঠ মানবজীবনের পরিণামজয়ী শক্তির কথাও ঘোষণা করে কিংবদন্তী। কোথাও অসমাপ্ত কাহিনীর সুষ্ঠু উপসংহার রচনা ক'রে দেয় কিংবদন্তী। ঘটনার নাটকীয়তাকে সম্পূর্ণতা দান করার জন্য কিংবদন্তী মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুঃসাহসিকভাবেই অপ্রাকৃত ঘটনাকেও কল্পনায় আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হয় না। কলকাতার হেস্টিংস হাউসের অভ্যন্তরে আজও গভীর রাত্রে রহস্যময় এক মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের পায়ের শব্দ। একটি হারানো দলিল খুঁজতে আসেন হেস্টিংস, যে দলিল পেলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সহজে খণ্ডন করতে পারবেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খৈবার বরাবর সড়কে আজও শেষরাত্রির আবছা অন্ধকারে ও কুয়াশায় দ্রুত গ্যালপে ধাবমান অশ্বের পদধ্বনি এক একদিন বেজে উঠতে শোনা যায়। উপজাতীয় আফ্রিদির কাছে পরাভূত হবার অপমান ভুলতে পারেননি জেনারেল নিকলসন। তাই গভীর রাত্রির স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে নিকলসন আজও তাঁর ঘোড়সওয়ার ফৌজ নিয়ে শত্রু আফ্রিদির শিবির আক্রমণের জন্য মত্ত আক্রোশে ছুটে যান। খৈবার রোডের আশে পাশে কোন অদ্ভুত প্রতিধ্বনির রহস্যই হয়তো এই কিংবদন্তীকে সৃষ্টি করেছে। শুধু লক্ষ্য করতে হয় যে, কিংবদন্তী ঘটনার নাটকীয়তা পূর্ণ করার জন্য কিভাবে নূতন ঘটনা কল্পনা ক'রে নিতে পারে। কিংবদন্তী কোথাও দুঃখে ম্রিয়মান, কোথাও মিলনে প্রসন্ন। ট্র্যাজেডি এবং কমেডি, মানবীয় জীবন-নাট্যের দুই রূপই প্রকাশ করে কিংবদন্তী।

আধুনিকতম কিংবদন্তীর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় যে, তার মধ্যে যেন আদিমানবিক বিস্ময় ও কৌতূহল আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে, জড় প্রকৃতি ও জীবনের মধ্যে অভিব্যক্ত সকল

দুর্জ্ঞেয়তাকে জানবার ও বুঝবার প্রয়াস। অনেক কিংবদন্তী বস্তুত মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সৃষ্টি। প্রাচীন অ্যাসিরিয়ার মেষপালক আকাশের জ্যোতিষ্কপুঞ্জের রহস্য বুঝবার চেষ্টায় তাঁদের কল্পনাকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, তাতে জ্যোতির্বিদ্যা তাঁরা যতটা লাভ করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে লাভ করেছিলেন কাহিনী। যেমন ভারতের তেমনি অন্যান্য দেশের মানুষের চক্ষে রাত্রির তারা-ছড়ানো আকাশ গল্প-ছড়ানো আকাশও বটে। নক্ষত্রসভার ঐ অগস্ত্য ধ্রুব বশিষ্ঠ অরুন্ধতী ও রোহিনী এক-একটি কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা। জ্যোতির্বিদ আকাশের তত্ত্বকে গণিত-বিজ্ঞানে পরিণত করলেও আকাশ তার গল্পের ঐশ্বর্য ছেড়ে দিতে পারেনি। মানুষের জ্ঞানসন্ধিৎসারও প্রথম ফল হলো কাহিনী। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী বলবেন, অমুক রোগের কারণ হলো অমুক জীবাণুর ক্রিয়া। অতি প্রাচীনকালের মানুষও আধি-ব্যাধি ও রোগজ্বালার কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন এবং সেই কৌতূহল ও অনুসন্ধানের ফল হলো কতগুলি কাহিনী। কেমন ক'রে এবং কোথা থেকে জ্বর এল পৃথিবীতে, এবিষয়ে নানা দেশের উপকথায় নানা রকমের কাহিনী প্রচলিত আছে। আজ সেগুলি অবশ্য নিছক কাহিনী, কিন্তু এককালে ছিল বহু জিজ্ঞাসার ও কৌতূহলের প্রেরণায় প্রাপ্ত তত্ত্ববিশেষ।

মানুষের নির্জ্ঞান মনের গভীরে যেন সেই আদিকালের মানুষের এক শিশু-কৌতূহল আজও লুকিয়ে রয়েছে। আজকের জ্ঞানপ্রবীণ মানুষের মনও স্বপ্নের মধ্যে সেই আদিকালীন শিশুতার পরিচয় প্রকাশ ক'রে থাকে। বহু কিংবদন্তী এইরকম শিশু-কৌতূহলের সহজ প্রকাশ। তাই কিংবদন্তীর আখ্যানবস্তু ও বক্তব্যে অনেক সময় অপ্রাকৃত ধারণা এবং অতিশয়োক্তি সহজেই স্থান লাভ করে। কোন কোন কিংবদন্তী নিতান্ত ফ্যান্টাসি ছাড়া আর কিছু নয়। আবার কোনটি যেন ছেলে-ভুলানো ছড়ার রূপের মত এলোমেলো কতগুলি ভাবচ্ছবি মাত্র।

পেশোয়ার শহরের পুরনো অঞ্চলে একটা বাজার আছে, তার নাম 'কিস্‌সা কহানি' বাজার। চলতি কথায় বলে 'কিস্‌সা খানি' বাজার। এ বাজারে নানা রকম বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের মতই বিশেষ একটি পণ্য বিক্রীত হতো। সেই পণ্য হলো কিস্‌সা অর্থাৎ গল্প। গল্পকার একখানি রেজাই পেতে বসতেন এবং আগন্তুক শ্রোতার দল বসতেন তাঁর সম্মুখে। এক আনা বা দু'আনার বিনিময়ে একটি কাহিনী বলতেন সেই গল্পব্যবসায়ী। এরকম গল্পের দোকান পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। শোনা যায়, প্রাচীন য়ুরোপের 'ইন' বা পান্থশালায় এই ধরনের গল্প-বলিয়ে বৃদ্ধ থাকতেন, অভ্যাগতদের গল্প শোনানোই ছিল তাঁর জীবিকা। পেশোয়ার শহরের কিস্‌সা কহানি বাজারেও বোধ হয় আর গল্পের দোকান নেই। কিন্তু এ ঘটনা থেকে এই সত্যটুকুও প্রমাণিত হয় যে, গল্প সৃষ্টি করা যেমন মানুষের অন্তরের স্বভাবধর্ম, তেমনি গল্প শোনাও অন্তরের স্বভাবজাত ক্ষুধা বিশেষ। তাই আজও দেখা যায় যে, জংলী অঞ্চলের নিভৃতে অবস্থিত কোন ডিহির অথবা ক্ষুদ্রতম গণ্ডগ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষও তার জীবনের চারদিকে কাহিনীময় এক পরিবেশ রচনা ক'রে রাখে। স্থানিক ঘটনা অথবা স্থানিক নদী দীঘি অরণ্য পাহাড় ও জলকুণ্ড অথবা একটি বটবৃক্ষ কিংবা একটি প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রকে আর শ্মশানভূমিকে প্রসঙ্গ ক'রে নিয়ে সে বহু কাহিনী সৃষ্টি করে। তার মন তার নিজেরই রচিত এই কিংবদন্তীর দেশে ঘুরে ফিরে তার বিস্ময় ও কৌতূহলের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এই ধরনের এক একটি 'কিংবদন্তীর দেশ' আছে। আমাদের বাংলা দেশেও আছে।

এই গ্রন্থে ত্রিশটি ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক 'সুপান্থ' নাম নিয়ে এই কাহিনীগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয় আলোচনী'তে লিখেছিলেন।

লেখক

স্বয়ং মাতা গঙ্গাই বোধ হয় মানুষের সেই অদ্ভুত বিশ্বাসের নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে সেদিন শিউরে উঠেছিলেন। বিচলিত হয়েছিল গঙ্গার জলের ঢেউ। মানত রক্ষা করতে এসে এক নারী তার ক্রোড়ের সন্তান নিক্ষেপ করেছিল গঙ্গার জলে, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর উপহার গ্রহণ করেনি গঙ্গার জল।

সেই গঙ্গা সেখানে আজ আর নাই। কিন্তু বিচলিত গঙ্গাতরঙ্গের সেই শিহরণের চিহ্নটি আজও সেখানে মাটির বুকে আঁকা রয়েছে। আজও আছে সেই জনপদ, কিন্তু গঙ্গার ধারা সরে গিয়েছে দূরে। আজকের কলকাতা থেকে মাত্র উনিশ ক্রোশ দূরে চাকদহের যে ধানের ক্ষেতে গঙ্গার প্রাচীন খাতের চিহ্ন দেখা যায়, সেখানেই আজ থেকে প্রায় চার শত বছর আগে এক মাতার আর্তনাদে শিউরে উঠেছিল গঙ্গার জলের ঢেউ।

চাকদহ থেকে শিমুরালি পর্যন্ত, অতি প্রাচীন এক জনপদের ধ্বংসাবশেষ আজও এখানে-ওখানে ঘন বন্যগুল্মের আবরণে অতীতের বহু ঘটনার স্মৃতিকে নীরব সমাধির মত লুকিয়ে রেখেছে। প্রাচীন দীর্ঘিকার জলে যদিও শত শত বছর আগের মত আজও শালুক আর পদ্ম ফোটে, কিন্তু তার ভাঙা ঘাটের ইট এক প্রাচীন গৌরবের বেদনাদীর্ণ ইতিহাসের কতগুলি তুচ্ছ অস্থিখণ্ডের মত পড়ে আছে। আজ আর দেখে বিশ্বাস হবে না, উৎসবের দিনে এই ঘাটের সোপানই জনপদবধূর পায়ের আলতায় রঙীন হয়ে উঠতো।

তাঁর নাম ছিল প্রদ্যুম্ন রায় এবং তিনিই ছিলেন এই জনপদের শাসক ভূস্বামী। বড়ই গঙ্গাভক্ত ছিলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায় এবং গঙ্গার তটে এই মন্দির নির্মাণ ক'রে মকরবাহনী গঙ্গার এক শিলাময় মূর্তিও স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেবী গঙ্গার কৃপাতেই তিনি এই জনপদের রাজা হতে পেরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেবী গঙ্গার কৃপাতেই তাঁর বংশধরেরা চিরকাল এই জনপদের রাজগৌরব উপভোগ করবার সৌভাগ্য লাভ করবে। রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের নির্দেশে জনপদের ঘরে ঘরে গিয়ে গঙ্গামাহাত্ম্য পাঠ ক'রে বেড়াতেন কথকের দল। নিঃসন্তানা নারী সন্তান লাভের আশায় মানত করতো—সন্তান দাও মাতা গঙ্গা, প্রথম সন্তান তোমাকেই উপহার দেবো।

প্রজার গঙ্গাভক্তির পরিচয় পেয়ে আরও হৃষ্ট এবং আরও নিশ্চিন্ত হন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়। গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জনের অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। পুষ্প ও নবপত্রিকার মালা হাতে নিয়ে শত শত নরনারী এসে ভিড় করে গঙ্গার তটে। প্রমত্ত রবে বাদ্য বাজে। শিশু-সন্তানকে ক্রোড়ে নিয়ে গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গের নিকটে এসে দাঁড়ায় মানতকারিণী নারী। উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করেন পুরোহিত। প্রসীদ, প্রসীদ মাতা গঙ্গা, পুণ্যবতীর সন্তানকে গ্রহণ কর। তার পরেই রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও মত্ত স্বরে প্রার্থনা করেন পুরোহিত—এই রাজ্যের পুণ্য ও রাজার পুণ্য শতগুণ বর্ধিত হোক।

নারীর বুক কেঁপে ওঠে, চক্ষু সজল হয় এবং দুই ওষ্ঠ কম্পিত ক'রে ক্ষীণ আর্তনাদও ধ্বনিত হয়। কিন্তু প্রচণ্ড বাদ্যরবে, জনতার উল্লাসে আর পুরোহিতের উচ্চকণ্ঠ প্রার্থনার শব্দে নারীর বেদনা-বিচলিত বক্ষ ওষ্ঠ আর চক্ষু যেন স্তব্ধ হয়ে যায়. নিজ ক্রোড় হতেই স্নেহসুপ্ত শিশুকে ছিন্ন ক'রে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে নারী। জনতা পুষ্প নিক্ষেপ করে নারীর মাথায়। রাজা প্রদ্যুম্ন রায় আনন্দিতচিত্তে নারীর স্বামীকে স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। বিশ্বাস করেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, প্রসন্ন হয়েছেন দেবী গঙ্গা এবং আর একটু পুণ্য বাড়লো এই রাজ্যের।

একটিমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের মনে, এবং একদিন এক সংবাদ শুনে সেই দুশ্চিন্তা আরও প্রবল হয়ে রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের মনের শান্তি নষ্ট ক'রে দিলো।

সংবাদ শুনলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, তাঁরই ভ্রাতা জয়কৃষ্ণ একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছে।

প্রাসাদের বাতায়নের নিকটে দাঁড়িয়ে বিমর্ষভাবে তাকিয়ে দেখলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, অদূরে ভ্রাতা জয়কৃষ্ণের ভবনদ্বারে ভিখারীর ভিড় লেগেছে। হৃষ্টচিত্তে আর হাসিভরা মুখ নিয়ে প্রার্থীদের নূতন বস্ত্র দান করছে জয়কৃষ্ণ। বাজছে শঙ্খ। অন্তঃপুরের ভিতর হতে উলুধ্বনির রেশ ভেসে আসছে।

ঠিক এই ভয়ই ছিল রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের মনে, এবং বুঝলেন, এতদিন সত্যই সত্য হয়ে উঠলো সেই ভয়। অপুত্রক ভ্রাতা জয়কৃষ্ণের গৃহে একটি শিশুর আবির্ভাব যেন তাঁরই নিজ পুত্রের ভবিষ্যতের রাজগৌরবের অংশীদার এক শত্রুর আবির্ভাব। এই রাজ্যের ও রাজসম্পদের ভাগ নিয়ে এবং হয়তো এই রাজ্যেরই প্রভুত্বের অধিকার নিয়ে একদিন কাড়াকাড়ি করবে যে, সেই শত্রুই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যে অপুত্রক জয়কৃষ্ণের মনে এতদিন কোন রাজ্যবাসনা ছিল না, পুত্রবান হয়ে এখন সে-ও কি আর চুপ ক'রে থাকবে? সন্দেহ করেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, এতদিনে ভ্রাতা জয়কৃষ্ণ সত্যই তাঁর সম্পদের ও ক্ষমতার কণ্টক হয়ে উঠলো।

বিমর্ষ প্রদ্যুম্ন রায়ের নিকটে এসে দাঁড়ালেন রাণী ললিতা। রাজা প্রদ্যুম্নের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেন ললিতা। বললেন—বিমর্ষ হয়ো না।

প্রদ্যুম্ন রায়—কেন?

ললিতা—তোমার পুত্রের ভবিষ্যতের শত্রু বলে যাকে মনে করছো, তার আয়ু বড় জোর ছয় মাস।

—কেমন ক'রে জানলে?

—আমি জানি, তোমার নিঃসন্তানা ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতী তার প্রথম সন্তান গঙ্গাজলে বিসর্জন দেবার সংকল্প ক'রে গঙ্গাদেবীর মন্দিরে গিয়ে মানত করেছিল।

আনন্দে চিৎকার ক'রে ওঠে রাজা প্রদ্যুম্ন রায়।—ইন্দুমতীর এই মানতের সাক্ষী আছে কেউ?

ললিতা বলেন—আছেন, গঙ্গাদেবীর মন্দিরে গিয়ে রাজ-পুরোহিতের সম্মুখেই ইন্দুমতী এই মানত করেছিল।

প্রদ্যুম্ন রায়—কিন্তু জয়কৃষ্ণ কি জানে যে...।

ললিতা বলেন—জানে না, ইন্দুমতীর এই মানতের কথা এখনো জানতে পারেননি তোমার ভ্রাতা, তাই তার এত আনন্দ।

জয়কৃষ্ণের ভবনের দিকে তাকিয়ে এইবার রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ও তাঁর আনন্দের হাসি সংবরণ করতে পারেন না। মূর্খ জয়কৃষ্ণ হাসিভরা মুখ নিয়ে বস্ত্র দান করছে আশীর্বাদমুখর দরিদ্রদের হাতে। কি সুন্দর এক কৌতুকের দৃশ্য! নিশ্চিন্ত হলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, জয়কৃষ্ণের মুখের ঐ হাসি আর লোভী দরিদ্রদের ঐ আশীর্বাদের বয়স মাত্র ছয় মাস। তার পরেই দেবী গঙ্গার কৃপায় পুত্রহীন হয়ে যাবে তাঁর পুত্রের ভবিষ্যৎ।

ছয় মাস পূর্ণ হতে আর একটি দিন মাত্র বাকি আছে। রাজা প্রদ্যুম্ন রায় তাঁর ভবনের নিভৃতে আর একবার দুশ্চিন্তাহতের মত ছটফট ক'রে উঠলেন এবং রাজপুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন।

বিস্মিত হয়ে দেখলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, রাজপুরোহিতের সঙ্গে ভ্রাতা জয়কৃষ্ণও উপস্থিত হয়েছে। রাজা প্রদ্যুম্ন রায় পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—মাঘী পূর্ণিমা কবে?

পুরোহিত—আগামী কাল।

ভ্রাতা জয়কৃষ্ণের মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে প্রদ্যুম্ন রায় বলেন—তোমার পুত্রের জন্মলাভের পর ছয় মাস পার হতে আর একটি দিন মাত্র বাকি আছে। কিন্তু মানতের কথা ভুলে গিয়েছো বোধ হয়।

শিউরে ওঠেন জয়কৃষ্ণ।—আপনার ভ্রাতৃজায়া মানত ভঙ্গ করবে বলেই ঠিক করেছে।

চিৎকার ক'রে প্রতিবাদ করেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়।—তা হয় না ভ্রাতা। এক নারীর দুর্বলতার জন্য রাজ্যের পুণ্য বিনষ্ট হতে দিতে পারি না। যদি ধর্মভ্রষ্ট হতে না চাও, তবে দেবী গঙ্গার প্রাপ্য উপহার দেবীর ক্রোড়েই ডালি দেবার জন্য প্রস্তুত হও।

জয়কৃষ্ণও বেদনার্ত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে বলেন—তাই হবে।

এবং তার পরের দিনেই গঙ্গার তটে দেখা দিলো উৎসবের দৃশ্য। জনতার উল্লাস, প্রমত্ত বাদ্যের রব আর পুরোহিতের মন্ত্রমুখরতা। রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ও দেখে নিশ্চিন্ত হলেন, শান্ত হয়ে এই দৃশ্য সহ্য করছে ভ্রাতা জয়কৃষ্ণ এবং ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতীও শিশু-পুত্র ক্রোড়ে নিয়ে গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গের দিকে শান্তচক্ষে তাকিয়ে আছে।

মন্ত্রোচ্চারণ সমাপ্ত হলো এবং একটি তরঙ্গও যেন ব্যাকুলভাবে ছুটে এল। সেই মুহূর্তে ক্রোড়ের সন্তানকে তরঙ্গের বুকে নিক্ষেপ করলেন ইন্দুমতী, তারপরেই উন্মাদিনীর মত চিৎকার ক'রে উঠলেন।

কিন্তু উপহার গ্রহণ করলো না গঙ্গার জল। গঙ্গার তরঙ্গই যেন সেদিনের সেই নারীর আর্তকণ্ঠের চিৎকারে শিউরে উঠে চূর্ণ হয়ে গেল। ছিন্নমৃণাল পদ্মপুষ্পের মত সেই শিশুর দেহ তরঙ্গের প্রবাহভঙ্গে তাড়িত হয়ে তটভূমির উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। উন্মাদিনী মাতা ছুটে এসে কুড়িয়ে নেয় তার সন্তানকে। চুম্বনে চুম্বনে উত্তপ্ত ক'রে তোলে শিশুর দুই সিক্ত ওষ্ঠ-কিশলয়। কেঁদে ওঠে শিশু এবং সেই প্রাণময় ক্রন্দনকে বুকের উপর নিবিড় আগ্রহে চেপে ধ'রে পীযূষস্নিগ্ধ সান্ত্বনা দান করেন জয়িনী মানবমাতার মত ভঙ্গী নিয়ে রাজা প্রদ্যুম্নের ভ্রাতৃজায়া ইন্দুমতী।

পুরোহিত কঠোর স্বরে আপত্তি করেন—ধর্মভ্রষ্ট হয়ো না নারী, ও সন্তান তোমার সন্তান নয়। দেবী গঙ্গার প্রাপ্য উপহার গঙ্গাকে নিবেদন কর।

রাজা প্রদ্যুম্ন গর্জন ক'রে ওঠেন, জনতা ধিক্কার দেয়, কিন্তু ইন্দুমতী কঠিন ও অবিচলিত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সকলের রুষ্ট ক্ষুব্ধ ও প্রচণ্ড প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে ইন্দুমতী বলেন—স্বয়ং দেবী আমার ক্রোড়ে আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের কোন নির্দেশ আমি মানবো না, কখনই না।

পুরোহিত বলেন—তুমি পাতকিনী, তোমার এই অধর্মের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

রাজা প্রদ্যুম্ন রায় ঘোষণা করলেন—এই নারীর পাপে রাজ্যের পুণ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই রাজ্যে আর ওর স্থান নেই।

জনতা ধিক্কার দিয়ে বলে—এই রাজ্যের কোন প্রজার কাছ থেকে এক মুষ্টি অন্ন-ভিক্ষারও অধিকার ওর নেই।

ভ্রাতা জয়কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রাজা প্রদ্যুম্ন বলেন—তুমিও ধর্মভ্রষ্ট হবে, যদি এই পাতকিনীকে তোমার সংসারে স্থান দাও।

জয়কৃষ্ণও উন্মাদের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই বলেন—আমি এই সংসার বর্জন ক'রেই চললাম, আপনার এই রাজ্যের পুণ্য অক্ষুণ্ণ থাকুক।

শূন্য হয়ে গেল গঙ্গাতটের ভিড়। শিশু-পুত্রকে বক্ষে নিয়ে গঙ্গাতটের নিভৃতে একাকিনী দাঁড়িয়ে থাকেন ইন্দুমতী। সূর্য অদৃশ্য হলো অস্তাচলের অন্তরালে। নামলো সন্ধ্যা আর গঙ্গাবক্ষের স্তবকিত কুয়াশার উপর ছড়িয়ে পড়লো মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না।

কিন্তু শিশু-পুত্রকে ক্রোড়ে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হলো ইন্দুমতীর সেই বাৎসল্যবিধুর সুন্দর মাতৃমূর্তি? কেউ জানে না, কেউ খোঁজ করে না, কোথায় গেলেন ইন্দুমতী।

নিশ্চিন্ত ছিলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়। অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়েছে, কিংবা সেই মাঘী পূর্ণিমার আলোকে হয়তো গঙ্গার জলেই চিরকালের মত ভেসে গিয়েছে সেই অধর্মচারিণী

নারী আর তার শিশু-পুত্র।

একদিন সারা জনপদের মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত প্রবল এক কাহিনী শুনে চমকে উঠলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়। নতুন এক মূর্তির আবির্ভাবের কাহিনী। রাতের পথিক দেখেছে সেই মূর্তিকে। বৃক্ষতলে ঘুমন্ত সন্ন্যাসী হঠাৎ চোখ মেলতেই দেখেছে সেই মূর্তিকে। অন্ধকারে নিস্তব্ধ দেবালয়ের সোপানে, জ্যোৎস্নারাতে নির্জন দীর্ঘিকার কিনারায় পুষ্পতরুর নীচে এবং কখনো বা ভোরের কুয়াশায় গঙ্গাতটের নিভৃতে সেই মূর্তিকে দেখা যায়। গণেশজননীর মূর্তি। অনুপম তাঁর রূপ, স্নেহসিক্ত তাঁর চোখের দৃষ্টি, আর ক্রোড়ে ধারণ ক'রে রয়েছেন শিশু গণেশ।

মিথ্যা! মিথ্যা! এই কাহিনী সর্বৈব মিথ্যা। রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের আতঙ্কিত মন যেন নীরবে চিৎকার ক'রে নিজেকে আশ্বাস দান করে। রাজার নির্দেশে জনপদের সর্বত্র ঘুরে ফিরে জনতাকে বুঝিয়ে বেড়ান রাজ-পুরোহিত—কেউ বিশ্বাস করো না এই কাহিনী। গণেশজননী নয়, ঐ মূর্তি আলো-আঁধার আর কুয়াশা দিয়ে গড়া অলীক একটা ছায়া মাত্র। চোখের দেখার ভুলে, মনের কুসংস্কারে আর বুদ্ধির বিকারে এই মূর্তি দেখতে পায় মানুষ। রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের দূত প্রজাদের ঘরের দুয়ারে এসে রাজার নির্দেশ ঘোষণা ক'রে যায়—কেউ বিশ্বাস করো না এই কাহিনী।

কিন্তু ব্যর্থ হয় রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের নির্দেশ। গ্রামের মানুষ পথের পাশে সবুজ ঘাসের উপর প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে চলে যায়, আর সারা রাত জেগে বসে থাকে ঘরের আঙিনায়। তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে। গভীর রাতে ঐ প্রদীপের কাছেই দেখা দেবে গণেশজননীর মূর্তি। দীঘির কিনারায় পুষ্পিত তরুর তলে পাত্র পূর্ণ ক'রে দুধ আর ফল রেখে যায় গৃহস্থের বধূ। যদি আসেন গণেশজননী, তবে নিশ্চয় গ্রহণ করবেন এই উপহার।

আরও আতঙ্কিত হলেন এবং প্রতিজ্ঞায় আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন প্রদ্যুম্ন রায়। রাজ্য জুড়ে এই ভয়ানক বিশ্বাসের উপদ্রব কেমন ক'রে ধ্বংস করবেন, অহোরাত্রি সেই চিন্তাতেই নিদ্রাহারা হয়ে গেলেন প্রদ্যুম্ন রায়। কে এই ছায়া, গণেশজননীর মূর্তি ধরে জনপদের নিভৃতে যে ছলনা সৃষ্টি ক'রে বেড়ায়?

কল্পনায় একটি মাত্র মূর্তিকে দেখতে পান রাজা প্রদ্যুম্ন রায়। চারদিকে অভিশাপ ধিক্কার আর হুংকারের মধ্যে অটল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে এক নারী, ক্রোড়ে একটি শিশু। কিন্তু সেই ধিকৃতা আর অভিশপ্তা কি আজও বেঁচে আছে? তবে কি সেই নারীরই গোপন আনাগোনার রহস্যে এই জনপদের পথে পথে ঐ ভয়ানক কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে? অসম্ভব! নিজের কল্পনাকেই সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ ক'রে ওঠেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়।

সন্দেহ করেন প্রদ্যুম্ন রায় ; হয়তো তাঁরই রাজ্যের কোন অরণ্যের গভীরে আশ্রয় নিয়েছে সেই নারী, আর সেই নারীর ক্রোড়ে বড় হয়ে উঠছে তাঁর পুত্রের ভবিষ্যৎ রাজগৌরবের শত্রু।

অনেক সন্ধান করলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, কিন্তু ব্যর্থ হলো তাঁর সকল সন্ধান। অরণ্যের গভীরে কোন বৃক্ষকোটরে আর কোন ভগ্ন মন্দিরের নিভৃতে কোন নির্বাসিতার জীবনের কোন চিহ্ন খুঁজে পেলেন না প্রদ্যুম্ন রায়।

তবু বিশ্বাসে আর বিস্ময়ে ধন্য জনপদের চিত্তে হর্ষ জাগে প্রতিদিন। প্রতিদিন কেউ না কেউ দেখতে পায় সেই গণেশজননীর মূর্তি। এবং একদিন জনপদের এক শত বিশ্বাসী গৃহস্থ সিদ্ধান্ত করে—এক নতুন মন্দির নির্মাণ ক'রে গণেশজননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রাজা প্রদ্যুম্ন রায় এসে বাধা দেন—কি হবে—নতুন মন্দির নির্মাণ ক'রে?

—আমাদের বিশ্বাস, তাহ'লে গণেশজননী স্বয়ং স্বেচ্ছায় এসে ঐ মন্দিরের মূর্তির মধ্যে সঞ্চারিত হবেন।

ঘৃণ্য বিশ্বাস! ক্রোধে মত্ত হয়ে প্রতিবাদ করেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়। বলেন--ও মূর্তি হলো এই রাজ্যের অভিশাপ। রাজ্যের পুণ্য বিনষ্ট হবে যদি ঐ মূর্তি ঠাঁই পায় এই রাজ্যের কোন মন্দিরে।

—কেন?

প্রদ্যুম্ন রায় বলেন--ঐ মূর্তি হলো দেবী গঙ্গার শত্রু।

—কেমন ক'রে?

—ঐ মূর্তি দেখলে কোন নারী আর গঙ্গার জলে সন্তান বিসর্জন দেবে না।

বিমূঢ়ের মত রাজা প্রদ্যুম্নের দিকে তাকিয়ে থাকে গৃহস্থ প্রজার দল। মিথ্যা বলেননি রাজা প্রদ্যুম্ন। বাৎসল্যবিধুর ঐ মূর্তি যে সন্তানকে কোলে ধ'রে রাখার ধর্ম শিক্ষা দেয়।

--গণেশজননীর পূজা চলবে না এই রাজ্যে। শেষ সাবধানবাণী শুনিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন রাজা প্রদ্যুম্ন, আর প্রজার দল সেই আদেশের আঘাতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

কিন্তু মানুষের মন বুঝতে ভুল করেছিলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়। আর একদিন তাঁর ভবনকক্ষের নিভৃতে বসেই আতঙ্কে শিউরে উঠলেন প্রদ্যুম্ন রায় এবং বাতায়নের কাছে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে শুনলেন, যেন এক উৎসবের হর্ষ উঠেছে সারা জনপদের বুকে। দলে দলে নরনারী চলেছে কোন এক নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের দিকে, যে মন্দিরে স্থাপিত হয়েছে গণেশজননীর মূর্তি। রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের হুংকার সতর্কবাণী আর নির্দেশ তুচ্ছ ক'রে জেগে উঠছে এক ভয়ংকর বিশ্বাস।

সকাল হতে মধ্যাহ্ন, তারপর অপরাহ্নের আলোকও নিভে গিয়ে দেখা দিলো সন্ধ্যা এবং তারপরেই দেখতে পেলেন প্রদ্যুম্ন রায়, মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ জেগেছে আকাশে, আর মাঠের কুয়াশার উপর লুটিয়ে পড়েছে সেই শীতল চাঁদের আলোক।

কিন্তু সেই সুহাসিনী শীতসন্ধ্যার বাতাসে শান্ত হলো না রাজা প্রদ্যুম্নের হৃদয়ের প্রদাহ। তাঁরই রাজ্যের এই নতুন বিশ্বাসের আবির্ভাবকে সেই রাত্রেই ধ্বংস ক'রে দেবার এক হিংস্র সংকল্প নিয়ে যেন একটি সুযোগের লগ্নের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন প্রদ্যুম্ন রায়।

সুযোগ পেলেন প্রদ্যুম্ন রায়। রাত তখন গভীর হয়েছে, আর জনপদের উৎসব এবং হর্ষও শেষ হয়ে গিয়েছে। নিদ্রিত জনপদের পথ মাড়িয়ে ছুটে চললেন প্রদ্যুম্ন রায় এবং থামলেন নতুন মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে এসে। এই মুহূর্তে গণেশজননীর ঐ মূর্তি তুলে নিয়ে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করবেন প্রদ্যুম্ন রায়।

গণেশজননীর মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই কেঁপে উঠলো প্রদ্যুম্ন রায়ের নিশ্বাস। হ্যাঁ, শিলা দিয়ে গড়া গণেশজননী এবং ক্রোড়ে তাঁর শিলা দিয়েই গড়া এক শিশু-গণেশ। কিন্তু বার বার চোখ মোছেন রাজা প্রদ্যুম্ন। ক্ষণে ক্ষণে যেন একবছর আগের গঙ্গাতটের এক নারী ও তার ক্রোড়ের শিশুর মুখের ছায়া ভেসে উঠছে ঐ মূর্তির মুখের উপর। দেবী গঙ্গা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ওর সন্তানকে ; দেবী গঙ্গাও কি তবে ভয় করেন ঐ মূর্তিকে?

অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গরোল শুনতে পেলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায় এবং সেই মহূর্তে এক দুঃস্বপ্নের ছবির মত কল্পনায় দেখতে পেলেন, যেন তাঁর এই রাজ্যের মাটিকেই ঘৃণা ক'রে দূরে সরে যাচ্ছে গঙ্গার তরঙ্গ। চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাঁর রাজপ্রাসাদ। এত কঠিন হিংসা আর অভিসন্ধি দিয়ে রক্ষা করা এতদিনের রাজ্য আর সম্পদ ধুলো হয়ে ঝরে পড়ছে করাল ঝঞ্ঝার মত কোন এক প্রতিশোধের দেবতার অট্টহাসির শব্দে।

ভয় পেলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, তারপরেই ভূমিতে মাথা লুটিয়ে গণেশজননীর উদ্দেশে প্রণাম ক'রে ফিরে চললেন। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রির কুয়াশা ভেদ ক'রে মানুষের রাজ্য হতে পলাতক এক অপচ্ছায়ার মত অনেক দূরে চলে গেলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়, এবং থামলেন এসে তাঁরই রচিত এক দীর্ঘিকার কিনারায়। সেই দীঘির জলই জানে, তারপর কোথায় চলে

গেলেন রাজা প্রদ্যুম্ন রায়।

রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের রাজত্বের গর্ব কাঁটার বনে ঢাকা পড়ে গেল কবে, তার ঠিক হিসাব কেউ জানে না। কিন্তু পালপাড়ার মন্দিরের নিকটে 'প্রদ্যুম্ন সরোবর' আজও স্মরণ করিয়ে দেয় চার শত বছর আগের এক রাজার নাম। আর মনে হয়, সত্য হয়েছে রাজা প্রদ্যুম্ন রায়ের জীবনের শেষ দিনের আতঙ্কিত কল্পনার ছবি। গঙ্গা সরে গিয়েছে দূরে এবং গণেশজননীর আবির্ভাবে চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে গঙ্গাজলের সন্তান বিসর্জনের প্রথা। সবই গিয়েছে সেই প্রাচীন প্রদ্যুম্ন নগরের, আছে শুধু গণেশজননীর পূজা। প্রতি মাঘী পূর্ণিমায় চাকদহের আনন্দগঞ্জ বাজারে আজও গণেশজননীর পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। এই উৎসব যেন চার শত বছর আগের এক জনপদের হৃদয়ে বাৎসল্য প্রতিষ্ঠার উৎসব।

রাণী শিরোমণি

আজ আর সে গ্রামের কোন চিহ্ন নেই। কাঁসাই-এর জল একেবারে ধুয়ে-মুছে শেষ ক'রে দিয়েছে সেই গ্রামের শেষ দেউলের ভিত। কাঁসাই-এর তীরে বালুমাখা মাটির উপর ছড়ানো কাশবনের দিকে তাকিয়ে আজ আর কল্পনাও করা যায় না যে, কোন কালে সেখানে কোন গ্রাম ছিল, আর সে গ্রামে কমলাসনা এক দেবীর মন্দির ছিল এবং মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারদিকে ফুটে থাকতো সেঁউতি চাঁপা ও শিউলি, আর পূজার দিনের ভোরে সেই ফুলবনেরই কাছে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতো সেই গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে সেই গ্রামের এক ছেলের।

একদিন সেই গ্রামের মেয়ে সত্যই রাণী হয়ে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে, আর সেই ছেলে চলে গেল সন্ন্যাসী হয়ে। যাবার আগে সিঁদুর-রাঙা সীমন্ত আর হাসি-হাসি মুখ নিয়ে গ্রামের সেই মেয়ে গ্রামের সেই ছেলের কাছে এসে বিদায় চাইতে গিয়ে বলেছিল—আশীর্বাদ কর।

গ্রামের ছেলে বলে—আশীর্বাদ করি, তোমার সর্বনাশ হোক।

শিউরে ওঠে গ্রামের মেয়ে। হতবাক হয়ে, বিষণ্ণ মুখে, ব্যথিত চোখে আর বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখতে পায়, যেন দুঃসহ এক জ্বালা জ্বলছে সেই ছেলের দুই চোখে। কিন্তু কেন, কিসের জন্য এই জ্বালা? এতদিনের পরিচয়, কিন্তু কোনদিনও যে গ্রামের এই ছেলের কোন কথার মধ্যেও এরকম অভিমানের ছায়া দেখতে পায়নি গ্রামের মেয়ে। স্বপ্নেও ভাবেনি যে, ঐ ছেলের মনের ভিতরে থেকে একটা স্বপ্ন গোপনে এতদিন ধরে তাকিয়ে ছিল তারই মুখের দিকে।

গ্রামের মেয়ে বলে—আজ হঠাৎ এভাবে রাগ করার কোন অর্থ হয় না।

গ্রামের ছেলে বলে—হ্যাঁ জানি, কোন অর্থ হয় না।

—তবে আশীর্বাদ কর।

—আশীর্বাদ করেছি।

গ্রামের শান্ত মেয়ের চোখ হঠাৎ জ্বলে ওঠে।—তোমার আশীর্বাদই মাথা পেতে নিলাম। এইবার খুশি মনে বিদায় দাও।

গ্রামের ছেলে বলে—তুমিও আমাকে বিদায় দাও।

—কেন? কোথায় যাবে তুমি?

—চললাম এই সংসার ছেড়ে।

গ্রামের মেয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে—যেও না।

কিন্তু গ্রামের মেয়ের সেই অনুরোধ তুচ্ছ ক'রে সেই মুহূর্তেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল

গ্রামের সেই ছেলে।

সেই গ্রামের সেই মেয়েই হলো কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি, আর সেই ছেলেই হলো কাঁসাই-এর তীরের শালবনের গভীরে এক জীর্ণ শিবালয়ের পূজারী সাধু জনার্দন। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগের সেই সর্বনেশে আর্শীবাদের অনেক স্মৃতি ধুয়ে-মুছে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে কাঁসাই-এর জল, আর অনেক স্মৃতি আজও নীরবে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে মেদিনীপুর হতে মাত্র এক মাইল উত্তরে এক প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষের ইট-পাথরের গায়ে আর দীঘির জলে। মেদিনীপুর হতে রাণীগঞ্জ যাবার সড়কের পাশে আবাসগড় যেন প্রায় দু'শ বছর আগের এক বেদনার ভগ্নস্তূপ। রাণী শিরোমণির সে আবাসগড়ের দীঘি আজও আছে। সেই নবরত্ন মন্দির আজও আছে। সেই জয়দুর্গা রাধাশ্যাম শ্যামসুন্দর ও রাজরাজেশ্বরীর বিগ্রহ আজও আছে।

আবাসগড়ের হতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে শালবনি থানার অধীন আধুনিক কর্ণগড়ে অতীতের এক পরাক্রান্ত ভূস্বামীর রাজগৌরবের নিদর্শন আজ অনেক জীর্ণ হয়েও জেগে আছে। রাজা মহাবীর সিংহের দুর্গ দীঘি আর প্রস্তরের প্রাসাদ যেন বহুকাল আগের এক মুখর ইতিহাসের স্তব্ধ মলিন ও ভূলুণ্ঠিত সাক্ষী। লোকে বলে এই প্রাসাদ হলো দাতাকর্ণের প্রাসাদ। কেউ বলে, ভোজরাজার রাজধানী। বঙ্গভূমির এক কীর্তিমান সামন্তের কীর্তি-স্মৃতি লোকপ্রবাদের আবরণে একেবারে পৌরাণিক হয়ে গিয়েছে।

দাতাকর্ণ নয়, রাজা ভোজও নয়, সিংহবংশীয় এক সামন্তের রাজধানী ছিল এই কর্ণগড়ে। গড়ের দক্ষিণে দণ্ডেশ্বর শিব আর মহামায়ার মন্দির। শিবায়ণপ্রণেতা রামেশ্বর মহামায়ার এই মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী যোগাসনে বসে সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মন্দিরের তোরণদ্বারে আজও রয়েছে পাথরের ত্রিতল যোগমণ্ডপ, যার নাম 'যোগীঘোপা'। কর্ণগড়েরই রাজবংশের পঞ্চম রাজা রামসিংহের রচিত এই আবাসগড়ে যেদিন রাজগৌরবের শেষ দীপশিখা নিভে গেল, সেই দিনটি হলো আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগের একটি দিন।

কর্ণগড় রাজ্যকে নিশ্চিন্তচিত্তে শাসন করেছিলেন রাণী শিরোমণি, কিন্তু তখন ইংরাজের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যগ্রাসের জন্য দিকে দিকে বাহু বিস্তার করেছে এবং কর্ণগড়ের গৌরব ও ক্ষমতাও এক আসন্ন সংকটের ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে। মেদিনীপুরের জঙ্গলমহালের সকল জায়গীরদারী লুপ্ত ক'রে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। জঙ্গলমহালের সকল ভূস্বামীর কাছে শেষ সাবধানবাণীর নোটিশ প্রেরণ করেছে কোম্পানি, ভূস্বামীদের সামন্তিক ক্ষমতা আর থাকবে না। দুর্গ শূন্য ক'রে দিতে হবে, ভেঙে দিতে হবে সৈন্যবল, আর কোম্পানির নতুন বন্দোবস্ত মেনে নিয়ে নতুন খাজনাপ্রথা স্বীকার ক'রে নিতে হবে। জমির প্রভু হবেন ইংরাজের কোম্পানি, আর সামন্তিকেরা হবেন কোম্পানির ভূমিব্যবস্থা-আইনের সর্ত সুবিধা ও করুণায় বাঁধা জমিদার।

কোম্পানির এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সামন্তিক ভূস্বামী আর ভূস্বামীদের প্রজা। প্রজাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি আক্রোশ নিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহোন্মত্ত হয়ে উঠেছে জঙ্গলমহালের প্রজার দল। বিনা বাধায় জঙ্গল ভোগ করতে এবং বিনা করে ভূমি চাষ করতে অভ্যস্ত নানা শ্রেণীর বন্যজাতি, যাদের নাম চুয়াড়।

সামন্তিক ভূস্বামীরা ইংরাজের কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং কোম্পানি ও সামন্তিকের সেই সংঘর্ষে কাঁসাই-এর দুই তীরে ইংরাজ সৈনিকের তোপের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে বন্য বলিষ্ঠ দরিদ্র ও নির্ভীক চুয়াড় প্রজার দল।

কিন্তু ইংরাজের আক্রমণে অভিভূত ও সন্ত্রস্ত এক একজন ভূস্বামী হঠাৎ একদিন গড়ভবনের কক্ষের নিভৃতে তাঁর সিন্দুকের সোনা আর রূপোর দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয়ে ওঠেন। তার পরেই গোপনে ইংরাজ শিবিরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কোম্পানির বন্দোবস্ত-

নামায় বাধ্যতার স্বাক্ষর এঁকে দিয়ে জমিদারিত্ব স্বীকার ক'রে নেন এবং বিদ্রোহী চুয়াড় প্রজার দল বিব্রত হয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে পালিয়ে গিয়ে হতোদ্যম হয়ে বসে থাকে, আর ভাগ্যের পরিহাস বুঝবার চেষ্টা করে।

একে একে আত্মসমর্পণ করেন ভূস্বামীর দল এবং ক্রোধোন্মত্ত চুয়াড় প্রজার দল ভূস্বামীদের এই বিশ্বাসভঙ্গের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। যে ভূস্বামী ইংরাজের জমিদারি নিয়ে, ইংরাজেরই আইনের কৃপায় শান্তিতে সুখ ভোগের জন্য নতুন ক'রে তৈরি হয়, তার শান্তি ও সুখ মশাল দিয়ে পুড়িয়ে আর বল্লমে বিদ্ধ ক'রে বেড়ায় উন্মত্ত বন্য বিদ্রোহীর দল। ইংরাজের সৈনিক আবার ছুটে আসে কৃপাশ্রিত জমিদারের প্রাণ আর সম্পত্তিকে বিদ্রোহী চুয়াড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য।

ইংরাজের কোম্পানির ভ্রূকুটি যতই উগ্র হয়ে উঠুক, কিন্তু কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি শেষপর্যন্ত অবিচলিত হয়েই রইলেন। প্রত্যাখ্যান করলেন কোম্পানির প্রস্তাব। কোম্পানির ভূমি-বন্দোবস্তের কাছে নতি স্বীকার করার চেয়ে বর্ষার কাঁসাই-এর মত্ত স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও শ্রেয়। অরণ্যের স্বভাবস্বাধীন দৃপ্তা সিংহীর মত রাণী শিরোমণি তাঁর জঙ্গলমহালের স্বাধীনতার শত্রু কোম্পানির সৈনিককে আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করার জন্য প্রস্তুত হন।

জয়মাতা শিরোমণি! চুয়াড় প্রজার দল রাণী শিরোমণির আবাসগড়ের দুয়ারে এসে একদিন জয়ধ্বনি তুলে অভ্যর্থনা জানায়। রাণী শিরোমণিও তাদের উৎসাহ জানিয়ে বলেন— আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। জঙ্গলমহালের মাঠঘাট ক্ষেত আর নদীতীর থেকে কোম্পানির সৈনিককে দূর করার জন্য প্রস্তুত হও।

বিদ্রোহী চুয়াড়ের সকল প্রেরণার অধীশ্বরী রাণী শিরোমণি। কর্ণগড় আর আবাসগড়ের দুর্গের অভ্যন্তরে দলে দলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে বিদ্রোহী চুয়াড় প্রজার দল এবং প্রতি নিশীথে চুয়াড় বিদ্রোহীর বিষাক্ত শরে বিপর্যস্ত হয় কাঁসাই-এর দুই তীরে কোম্পানির নিদ্রাহীন শিবিরের সৈনিক। আহত হয়ে কলকাতার ফোর্টে ফিরে চলে গেলেন লেফটেন্যাণ্ট ফার্গুসন। নতুন সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেন কর্নেল ইলবার্ট।

কিন্তু কিছুমাত্র আতংক নেই কর্ণগড়ের সিংহী সেই রাণী শিরোমণির শান্ত অথচ দৃপ্ত দুই চোখের দৃষ্টিতে। রাণী শিরোমণির প্রশ্রয়ে উৎসাহে ও নির্দেশে লালিত বিদ্রোহী চুয়াড় প্রজার দল অমাবস্যার অন্ধকারে কর্নেল ইলবার্টের ছাউনি আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত ক'রে সগর্বে ফিরে এসে আবার আবাসগড়ের নিভৃতে বিশ্রাম করে।

মূর্খ চুয়াড় বিদ্রোহীকে অন্ন-বস্ত্র ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য ক'রে আর উৎসাহ দিয়ে দুঃসাহসে মত্ত ক'রে তুলছে কে? প্রশ্ন জাগে কর্নেল ইলবার্টের মনে। কোন সিংহীমাতার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে এত বুদ্ধিপটু হয়ে উঠেছে পশুর মত নির্বোধ ঐ জংলীর দল?

ইংরাজ কোম্পানির চর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় কর্ণগড় আর আবাসগড়ের আশেপাশে। কিন্তু ধরা পড়ে যায় চরের ছদ্মবেশ। রাণী শিরোমণির পাইকের দল প্রায় প্রতিদিনই ধরে নিয়ে আসে ইংরাজের উৎকোচে অনুপ্রাণিত এক একটি চর। সন্ন্যাসী, ফকির, ভিখারী ও ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী এক একটি চর রাণী শিরোমণির নির্দেশে বন্দী হয়ে গড়ের গুপ্তগৃহের নিভৃতে অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

সেদিন বাসন্তী পঞ্চমী, সারাদিন উপবাস ক'রে ব্রত পালন করবেন রাণী শিরোমণি। তারপর সন্ধ্যা হলে রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে গিয়ে নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালবেন আর পূজা করবেন।

গড়ভবনের নিভৃতে বসে পূজার নৈবেদ্য রচনা করছিলেন শিরোমণি। গড়ের দুয়ারের দিকে হঠাৎ এত কলরব জেগে উঠতেই কক্ষের বাইরে এসে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালেন।

দেখতে পেলেন শিরোমণি, এক সন্ন্যাসীকে নিষ্ঠুরভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে পাইকের দল। চর চর চর! ইংরাজের কোম্পানির চর! কলরবের ভাষা বুঝতে পেরে কঠোর দৃষ্টি তুলে আগন্তুক সেই চরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকেন শিরোমণি।

পাইকের দল সন্ন্যাসীবেশী চরকে রাণী শিরোমণির সম্মুখে নিয়ে আসে--আদেশ করুন রাণীমাতা, কি শাস্তি দেবো এ পশুকে?

আগন্তুক চরের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন রাণী শিরোমণি। তাঁর দু'চোখের কঠোর দৃষ্টি যেন এক ভয়ানক বিস্ময়ের আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়, হতবাক হয়ে শুধু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন।

তারপরেই পাইকদের নির্দেশ দান করেন শিরোমণি--ওর বাঁধন খুলে দাও। আর, তোমরা চলে যাও। ওর শাস্তি যা দেবার আমিই নিজের হাতে দেবো।

বাঁধন খুলে দিয়ে চলে গেল পাইকের দল। রাণী শিরোমণি সন্ন্যাসীর রুক্ষ জটা আর জ্বালাভরা দুই চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন--তুমি?

সন্ন্যাসী বলে--হ্যাঁ, আমি।

হ্যাঁ, সেই গ্রামের ছেলেই এসে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের মেয়ে শিরোমণির সম্মুখে। আজ তার নাম সাধু জনার্দন। ত্রিশ বছর আগের সেই জ্বালা এখনো তার চোখ থেকে মুছে যায়নি। শালবনের গভীরে জীর্ণ শিবালয়ের নিভৃতে বসে যেন এতদিন ধ'রে শুধু এক প্রতিশোধের ধ্যান করেছে জনার্দন। তার জীবনের স্বপ্ন পুড়িয়ে দিয়ে আর রাণী হয়ে চোখের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল গ্রামের যে মেয়ে, সেই মেয়ের জীবনের সুখ পুড়ে না যাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না তার চোখের জ্বালা।

ইংরাজের শিবিরে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে সাধু জনার্দন--জংলী চুয়াড় বিদ্রোহীর সকল বুদ্ধি ও উৎসাহের নেত্রী হলেন এই কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি। রাণী শিরোমণিকে বন্দী না করা পর্যন্ত শান্ত হবে না জংলী চুয়াড়ের বিদ্রোহ।

কর্নেল সাহেব বলেন--আপনি রাণী শিরোমণিকে বন্দী করতে সাহায্য করুন।

সাধু জনার্দন--সাহায্য করতে পারি, কিন্তু বিনিময়ে কি পুরস্কার দেবেন?

কর্নেল--কি পুরস্কার চাও?

জনার্দন--বন্দিনীকেই চাই, আর কিছু চাই না।

কর্নেল হাসেন--তাই হবে।

তাই এসেছেন সাধু জনার্দন, উপায় সন্ধানের জন্য। কর্ণগড়ের সিংহীকে ইংরাজ সৈনিকের সাহায্যে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাবার উপায় আর সুযোগ জানবার জন্য। কত সৈন্য আছে আবাসগড়ের দুর্গে। কোথায় এই বিরাট গড়ের গুপ্ত দ্বার? গড়-ভবনের কোন নিভৃতে নিদ্রা যাপন করে সুখের সিংহী শিরোমণি? সকল তথ্য জেনে নিয়ে ইংরাজের শিবিরে চলে যাবেন সাধু জনার্দন, আর তাঁর ত্রিশ বছরের চোখের জ্বালাও শান্ত করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

শিরোমণি বেদনার্তভাবে প্রশ্ন করেন--কি জানতে এসেছো তুমি এখানে?

জনার্দন বলেন--কিছুই না।

শিরোমণি--তবে কি দেখতে এসেছো? তোমার সর্বনেশে আশীর্বাদ সফল হলো কি না?

জনার্দন--না। তোমাকেই দেখতে এসেছি।

শিরোমণির দুই কালো চোখের পাতা হঠাৎ ভিজে যায়। না, চর নয়। বিশ্বাস করেন এবং বিস্মিত হন শিরোমণি। সংসার হতে অনেক দুঃখে পালিয়ে যাওয়া একটা স্বপ্নই ব্যাকুল হয়ে আজ ছুটে এসেছে ত্রিশ বছর আগেকার একটি ভালোবাসার মুখ দেখবার জন্য।

শিরোমণি--দেখা তো হয়ে গেল। এবার চলে যাও।

জনার্দন হাসেন--নিজের হাতে কি শাস্তি দেবে, দাও। কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির কথা

মিথ্যে হওয়া উচিত নয়।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন রাণী শিরোমণি। তারপর বলেন—এসো।

আবাসগড়ের দীঘির কিনারা ধ'রে এগিয়ে চলেন রাণী শিরোমণি। সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকেন সাধু জনার্দন। তারপর এসে দাঁড়ান গড়ের এক প্রাচীরের নিকটে। প্রাচীরের গাত্রে একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার। শিরোমণি বলেন—চলে যাও। আর কখনো এসো না।

গুপ্তদ্বারের কপাট নিজের হাতে খুলে দিলেন রাণী শিরোমণি। সাধু জনার্দন এক সফলকাম চক্রান্তের সরীসৃপের মত সেই মুহূর্তে গুপ্তদ্বার পার হয়ে চলে গেলেন এবং থামলেন গিয়ে ইংরাজের শিবিরে।

এবং সেই রাত্রেই গড়ের এই গুপ্তদ্বারের কপাট অতি সহজেই দীর্ণ ক'রে ভিতরে প্রবেশ করলো কতগুলি ছায়া, এক শত সশস্ত্র ইংরাজ সৈনিক। আবাসগড়ের অন্ধকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছায়াগুলি। চোখে চোখে শ্বাপদের মত দৃষ্টি জেগে থাকে।

তখন গড়ের ভিতরে রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে জ্বলছিল একটি প্রদীপ। বিগ্রহের সম্মুখে পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়ে বসেছিলেন রাণী শিরোমণি। দুয়ারের নিকটে একটা ছায়ার চাঞ্চল্য দেখতে পেয়ে চমকে ওঠেন শিরোমণি। তার পরেই দেখতে পান, ছায়া নয়, একজোড়া জ্বালাভরা চোখ তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে। দাঁড়িয়ে আছেন সাধু জনার্দন।

—এ কি? প্রশ্ন ক'রেই রুষ্টা সিংহীর মত উঠে দাঁড়ালেন শিরোমণি। সেই মুহূর্তে ছুটে আসে অতি ধূর্ত এবং হিংস্র আরও কতগুলি ছায়া। কর্নেল ইলবার্ট ও ইংরাজ সৈনিকের দল।

বন্দিনী রাণী শিরোমণিকে নিয়ে আবাসগড়ের গুপ্তদ্বার দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ইংরাজ সৈনিক, আর সাধু জনার্দন চলে যান তার অরণ্যনিভৃতের শিবালয়ে। তারপরেই আবাসগড়ের সম্মুখদ্বারের উপর ইংরাজের তোপের আগুন প্রচণ্ড উল্লাসে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বল্লম আর তীর ধনুক নিয়ে চুয়াড় বিদ্রোহীর দল হুংকার দিয়ে গড়ের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। ইংরাজের তোপে ছিন্নভিন্ন চুয়াড় বিদ্রোহীর রক্ত ও মাংস ছিটকে পড়ে চারদিকে।

—আদেশ করুন রাণীমাতা! চিৎকার করে চুয়াড় বিদ্রোহী। কিন্তু, কোন আদেশ ধ্বনিত হয় না। কোথায়, এই আবাসগড়ের কোন পাথরের আড়ালে নীরব হয়ে আর অদৃশ্য হয়ে রয়েছেন রাণীমাতা শিরোমণি? আবাসগড় তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও রাণী শিরোমণির সন্ধান পায় না বিদ্রোহীর দল।

মরলো বিদ্রোহীর দল। যারা বাঁচলো, তারা পালিয়ে গেল। ইংরাজ সৈনিক সেই রাত্রেই আবাসগড়ের রাজপ্রাসাদের সব সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে তারপর আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সূর্য উঠলো কাঁসাই-এর জলে আলো ছড়িয়ে দিয়ে। অদৃশ্য হয়েছে জঙ্গলমহালের সিংহী, কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি। কিন্তু কোথায় গেল?

একদিকে চোখের জল মুছে জঙ্গলের নিভৃত হতে বের হয়ে আসে পলাতক চুয়াড় বিদ্রোহীদের দলপতি। আর ওদিকে, দুই চোখের জ্বালা নিয়ে শালবনের নিভৃতের শিবালয় হতে সেই ভোরের আলোকে বের হয়ে আসেন সাধু জনার্দন।

নিস্তব্ধ ও নির্জন আবাসগড়ের ইট-পাথরের সকল অন্তরাল আর সকল নিভৃত সন্ধান ক'রে ঘুরে বেড়ায় মাতৃহারা অসহায় বালকের মত বিদ্রোহী চুয়াড় দলের দলপতি। নেই, রাণীমাতা শিরোমণি কোথাও নেই।

আর, কোম্পানির সৈনিকের ছাউনির কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সাধু জনার্দন। সদলবলে চলে গিয়েছেন কর্নেল ইলবার্ট। ভাঙা হাটের মত পড়ে রয়েছে নীরব ও নির্জন শিবির। নেই, ত্রিশ বছর আগের এক স্বপ্ন, সেই শিরোমণি কোথাও নেই।

কোথায় গেলেন স্বাধীন কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোমণি?

এই প্রশ্নের উত্তর কাঁসাই-এর স্রোতের কুটার মত দু'শ বছর আগে হারিয়ে গিয়েছে

নিশ্চিহ্ন হয়ে। কিন্তু সেদিন সেই ভোরের আলোকে কাঁসাই-এর উপকূলে তখনো পড়েছিল কতগুলি চিহ্ন। প্রান্তরের একস্থানে এসে হঠাৎ সেই চিহ্ন দেখতে পেয়ে একই সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো বিদ্রোহীদের দলপতি আর সাধু জনার্দন। একজোড়া জলভরা চোখ, এবং একজোড়া জ্বালাভরা চোখ। মাতৃহারা শিশুর মত একটি ব্যথিত মূর্তি আর ব্যর্থকাম ব্যাধের মত একটি ক্ষুব্ধ মূর্তি।

ইংরাজের হাতে বন্দিনী হয়ে রাতের অন্ধকারে চলে যাবার সময় গলার পদ্মকুঁড়ির মালা ছিঁড়ে পথের উপর পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন রাণী শিরোমণি, যেন ভোর হতেই এই চিহ্ন দেখে বুঝতে পারে বিদ্রোহীর দল, কোন দিকে এবং কোন পথে তিনি গিয়েছেন।

পদ্মকুঁড়ির পাপড়ি দিয়ে আঁকা সেই চিহ্নরেখার দিকে তাকিয়ে দুই সন্ধানীর মনে সেই প্রশ্নই আর একবার বেজে ওঠে—কোন দিকে গেলেন রাণী শিরোমণি?

শুরু হয় সন্ধান। চুয়াড় বিদ্রোহীদের দলপতি সেই ফুলের পাপড়ি ছড়ানো চিহ্নরেখা ধ'রে ধীরে ধীরে পিছন দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং উপস্থিত হয় রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরের দুয়ারে। আর, সাধু জনার্দন সেই চিহ্নরেখা ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে উপস্থিত হন কাঁসাই-এর কর্দমাক্ত তটের নিকটে।

সেই ভোরে, জ্বালাভরা চোখ নিয়ে কাঁসাই-এর জলের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলেন সাধু জনার্দন, ঐ জলের গভীরেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে রাণী শিরোমণি। কাদার উপর পড়ে আছে সেই নারীর অন্তর্ধানের শেষ সাক্ষী, পদ্মকুঁড়ির একটি ছিন্ন অংশ। এখানে এসেই শেষ হয়েছে পলাতকার পথচিহ্নরেখা। কাঁসাই-এর জলের দিকে তাকিয়ে হতাশ্বাসের আগুনে আরও হিংস্র হয়ে জ্বলতে থাকে সাধু জনার্দনের চোখ।

আর, মন্দিরের রাজরাজেশ্বরীর মূর্তির দিকে সজল চোখে তাকিয়ে মূর্খ চুয়াড় বিদ্রোহীদের দলপতি বুঝেছিল, রাণীমাতা শিরোমণি মিলিয়ে গিয়েছেন ঐ মূর্তির মধ্যে। কারণ, ছেঁড়া পদ্মকুঁড়ি দিয়ে আঁকা পথচিহ্ন যে ফুরিয়ে গিয়েছে ঠিক এখানেই এসে। জ্বলছে প্রদীপ আর হাসছেন রাজরাজেশ্বরী। কোন সন্দেহ নেই, ঐ মূর্তির মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন কর্ণগড়ের মাতা রাণী শিরোমণি।

আবাসগড়ের রাজরাজেশ্বরী আজও আছেন এবং আজও দেখা যায়, দূর দুরান্তর হতে মাঝে মাঝে আদিম জাতির নরনারী পূজা দেবার জন্য এই মন্দিরের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য, দুয়ারের সম্মুখে পথের উপর পদ্মের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়ে রাজরাজেশ্বরীর উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে তারা। কিন্তু পদ্মের পাপড়ি ছড়াতে হয় কেন, তা কেউ জানে না, বলতেও পারে না।

অতীতেরই এক বেদনাকর ঘটনার স্মৃতি আজ মাত্র এই প্রথার মধ্যে যেন মাঝে মাঝে এবং হঠাৎ এক একদিন ছটফট ক'রে ওঠে।

নীলাম্বরের রাজপাট

কালিকা পুরাণের মতে যে-স্থানের নাম শৌমার পীঠ, ইতিহাসের মতে তারই নাম হলো কামতা রাজ্য। পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে খেন বংশীয় নীলধ্বজ স্থাপন করেছিলেন এই কামতা রাজ্য। নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ, তারপর নীলাম্বর এবং তারপর আর কেউ নয়। মাত্র একশত বৎসরের মধ্যেই স্বাধীন কামতাপুরের রাজসিংহাসন অদৃশ্য হয়ে গেল চিরকালের মত, আর কামতাপুরের দুর্গের চূড়ায় দেখা দিলো গৌড়-সুলতান হুসেন শাহের জয়পতাকা।

তান্ত্রিক রাজা নীলধ্বজের উপাস্যা ছিলেন দেবী কামদা। দেবী কামদার নাম অনুসারেই নীলধ্বজের স্থাপিত সে রাজ্যের নাম হয়েছিল কামতাপুর। এক মন্দির নির্মাণ ক'রে দেবীব মূর্তিও স্থাপিত করেছিলেন রাজা নীলধ্বজ। তান্ত্রিক রাজার উপাস্যা সেই দেবী কামদা আজও আছেন এবং আজ ধূপে দীপে ও গন্ধপুষ্পে নিত্য পূজিত হন। বিশাল কামতাপুরের কলেবর পাঁচ শতাব্দী ধ'রে ধ্বংস হয়ে আসছে ধরলা নদীর প্লাবনে আর ভাঙনে। ধ্বংসীভূত সেই কামতাপুরের বেদনার সাক্ষীর মত এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন গৌরবের ধূলিমলিন কতগুলি স্মৃতিচিহ্ন। শেষ রাজা নীলাম্বরের প্রাসাদ ও গড়ের মৃন্ময় প্রাকারের খণ্ড খণ্ড অংশ আর দুটি ভাঙা মন্দির আজও আছে, যেন পাঁচ শত বৎসর পূর্বের এক রাজগৌরবের বিষণ্ণ সমাধির কতগুলি জীর্ণ অবশেষ। শেষ রাজা নীলাম্বরের নির্মিত সেই রাজপথের ধুলো মাড়িয়ে আজও গ্রামের মানুষ আনাগোনা করে, আর এই পথের পাশেই আজও আছে জীর্ণ প্রাচীর স্তম্ভ চত্বর আর পরিখার চিহ্ন নিয়ে রাজা নীলাম্বরের অনেক গর্বের সেই দুর্গ। এবং কি আশ্চর্য, এই দুর্গের অভ্যন্তরে সন্ধ্যার অন্ধকারে আজও একটি প্রদীপ জ্বলে ওঠে। অন্তর্হিত হয়েছে সেই কামতাপুর, কিন্তু কামতাপুরের শেষ প্রার্থনা যেন এই প্রদীপের শিখার মধ্যে আজও প্রতি সন্ধ্যায় জেগে ওঠে।

সত্যই কামতাপুরের শেষ প্রার্থনার দীপশিখা। রাজা নীলাম্বরের জীবনের শেষ অনুরোধ আজও আলোকের রূপে ফুটে ওঠে তাঁরই রচিত দুর্গের অভ্যন্তরে। পাঁচ শত বছরের পুরাতন এক বেদনাকে যেন আজও সান্ত্বনা জানায় এই প্রদীপ।

সেই রাজা নীলাম্বর একদিন বিচারসভায় বসে এক পাতকীর মুখের দিকে ক্রোধবহ্নিদীপ্ত দুই চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিলেন। তারপরেই ঘোষণা করেছিলেন—মৃত্যুদণ্ড।

জহ্লাদকে আহ্বান ক'রে নির্দেশ দিলেন রাজা নীলাম্বর।—আমার প্রজার কুমারীকন্যার ধর্মনাশক এই লম্পট যুবককে আজই রাত্রির দ্বিপ্রহরে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে শিরচ্ছেদ করবে এবং সেই ঘৃণ্য শির ধরলার জলে নিক্ষেপ করবে।

পাতকী যুবকের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের বাণী ঘোষণা ক'রে রাজা নীলাম্বর তাকালেন তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী শচীপাত্রের দিকে। বললেন—এই দণ্ডাজ্ঞা সমর্থন করুন মন্ত্রী।

মন্ত্রী শচীপাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে ওঠে পাতকী যুবক—পিতা!

কঠোরভাবে দুই চক্ষু তুলে রাজা নীলাম্বরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শচীপাত্র, যেন দুই প্রচণ্ড দাবদাহ পীড়িত মরুভূমির জ্বালা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সেই দুই শান্ত চোখের দৃষ্টিতে। মন্ত্রী শচীপাত্র শান্ত স্বরে বললেন—এই দণ্ডাজ্ঞা সমর্থন করতে পারি না রাজা নীলাম্বর। ব্রাহ্মণ অবধ্য, কিন্তু এক ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদণ্ড দান ক'রে আপনি শাস্ত্র ও ধর্মের অবমাননা করেছেন।

রাজা নীলাম্বর বললেন—আপনার যুক্তি গ্রহণ করলাম না মন্ত্রী শচীপাত্র।

এই পাতকী যুবক হলো মন্ত্রী শচীপাত্রেরই পুত্র। একমাত্র পুত্রের প্রতি রাজার মুখের উচ্চারিত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা সহ্য করতে গিয়ে প্রতিহিংসার তৃষ্ণায় উন্মত্ত হয়ে উঠতে চায় মন্ত্রী শচীপাত্রের দুই চক্ষুর দৃষ্টি। তবু, শুধু তাকিয়েই রইলেন মন্ত্রী শচীপাত্র এবং জহ্লাদও তাঁর চক্ষের সম্মুখেই পাতকী যুবকের হস্ত রজ্জুবদ্ধ ক'রে টেনে নিয়ে গেল দুর্গের ভিতরে এক বন্দীকক্ষের দিকে।

শান্ত পাথরের মত নিষ্কম্প বক্ষ, রুদ্ধ নিঃশ্বাস আর শুষ্ক চক্ষু নিয়ে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শচীপাত্র। পর মুহূর্তে বিচারসভার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

রাজা নীলাম্বর ভ্রূকুটি ক'রে বলেন—আপনি মন্ত্রী হয়েও আমার ন্যায়নীতি সমর্থন করলেন না শচীপাত্র, তবু আপনাকে ক্ষমা করলাম।

কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন শচীপাত্র। সেই শান্ত পাথরকে বুঝতে ভুল করেছিলেন রাজা নীলাম্বর। বুঝতে পারেননি যে, ঐ পাথর তার বুকের ভিতর এক ভয়ানক প্রতিহিংসার আগুন লুকিয়ে রেখে নিঃশব্দে আর ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।

নিজ গৃহে ফিরে এসে পত্নী ক্ষেমা দেবীর পূজাকক্ষের দুয়ারে এসে দাঁড়ান শচীপাত্র।

স্বামীর পদধ্বনি শুনতে পেয়েই উতলা ঝড়ের মত কক্ষের নিভৃত হতে ছুটে বের হয়ে আসেন ক্ষেমা দেবী। ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করেন—বল, পুত্রের প্রাণরক্ষা করতে পেরেছো কি?

শচীপাত্র বললেন—না।

আবার আর্তনাদ ক'রে উঠলেন ক্ষেমা দেবী।

শচীপাত্র বলেন—সাবধান! আর্তনাদ করো না, চোখের জল ফেলো না, বল প্রতিশোধ চাই।

নিঃশব্দে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্ষেমা দেবী।

শচীপাত্র বললেন—প্রতিজ্ঞা কর, অবধ্য ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছে যে অধর্মচারী নীলাম্বর, সেই নীলাম্বরের রাজগর্ব ধ্বংস করতে হবে। নীলাম্বরের ছিন্ন শির স্বচক্ষে দেখে এই বুকের জ্বালা দূর করতে হবে।

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের কাছে পত্র লিখলেন মন্ত্রী শচীপাত্র।—আমার সাহায্য গ্রহণ করুন সুলতান। আপনার সৈন্যবল নিয়ে কামতাপুর আক্রমণ করুন। রাজা নীলাম্বর ব্রাহ্মণের পুত্রের প্রাণ হরণ করেছে। আপনি এসে এই অধর্মচারী নীলাম্বরের সিংহাসন পদাঘাতে চূর্ণ করুন। নীলাম্বরের এই দুর্গ অধিকারের কৌশল আমি জানি। আপনাকে জয়ী করার ভার আমার। বিনিময়ে শুধু একটি অধিকার আমাকে দিতে হবে। বন্দী নীলাম্বরের অপরাধ বিচার করবার অধিকার।

শচীপাত্রের গুপ্তচর সেই মুহূর্তে পত্র নিয়ে চলে গেল গৌড়ের অভিমুখে।

সেই সন্ধ্যাতেই রাজা নীলাম্বর তাঁর দুর্গদ্বার হতে বাইরে বের হতেই আগন্তুক এক অপরিচিতা নারীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। ক্ষণিকের মত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শুধু নারীর চোখ দুটির দিকেই তাকিয়ে রইলেন রাজা নীলাম্বর। যেন কোন মন্দিরবাসিনী মাতৃকামূর্তির দুটি চক্ষু। স্নিগ্ধ ও মমতাকোমল।

রাজা নীলাম্বর প্রশ্ন করেন—কে আপনি?

—আমি ক্ষেমা, আপনার মন্ত্রীর পত্নী।

—কি প্রয়োজনে এসেছেন?

—এসেছি পুত্রের প্রাণরক্ষার প্রার্থনা নিয়ে।

—আপনার পুত্র জঘন্য অপরাধী।

—এ অভিযোগ সত্য।

—আমি সুবিচার করেছি ক্ষেমা দেবী।

—তা'ও সত্য।

—তবে আর আপনার কি বলবার আছে?

—আমার প্রতি সুবিচার করুন।

—আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না ক্ষেমা দেবী।

—এক পাতকীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আপনি এক মাতাকে মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও ভয়ানক পুত্রশোক শাস্তি দান করছেন মহারাজ।

রাজা নীলাম্বরের ওষ্ঠে ক্ষীণ একটি হাস্যরেখার সঙ্গে কঠোর এক সুবিচারকের যুক্তি ধ্বনিত হয়।—আপনি এক পাতকীর মাতা।

ক্ষেমা দেবী বলেন,—হ্যাঁ, আমি পাতকীর মাতা। কিন্তু আপনি ক্ষমা করুন মহারাজ।

নীলাম্বর বলেন—ক্ষমা করুন দেবী কামদা। ক্ষমা করবার অধিকারী আমি নই।

দেবী কামদার উপাসক রাজা নীলাম্বর দেখলেন, একথা শুনেও ক্ষেমা দেবীর অদ্ভুত সেই দুটি চোখের দৃষ্টি চমকে উঠলো না, বাষ্পায়িত হয়েও উঠলো না। মন্দিরবাসিনী মাতৃকার মত স্নিগ্ধ ও মমতাময় সেই দুটি চক্ষু আরও কিছুক্ষণ রাজা নীলাম্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফিরে চলে এলেন ক্ষেমা দেবী।

পরদিন প্রভাতেই সংবাদ শুনলেন রাজা নীলাম্বর, তাঁর আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করেছে জহ্লাদ। পাতকীর ছিন্নমুণ্ড ধরলার জলে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার পরেই সংবাদ শুনলেন নীলাম্বর, পাতকীর পিতা ও মাতা উভয়েই অদৃশ্য হয়েছে। মন্ত্রী শচীপাত্রের ভবন শূন্য। শচীপাত্র নেই, তাঁর পত্নী ক্ষেমা দেবীও নেই।

তারপর আর বেশিদিন নয়। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের সৈন্য ছুটে এল কামতাপুরের দুর্গ লক্ষ্য ক'রে। সুলতান হুসেনের সৈন্য চারদিক থেকে কামতাপুরের জীবন অবরোধ ক'রে দাঁড়ালো। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, কামতাপুরের প্রান্তরে প্রান্তরে গৌড়-সৈন্য আর রাজা নীলাম্বরের সৈন্য প্রবল সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়। কিন্তু দুর্গ জয় করতে পারে না সুলতানের সৈন্য।

রাজা নীলাম্বরও বুঝলেন, এ শুধু গৌড়-সুলতানের আক্রমণ নয়। শান্ত পাথরের মত একটি বুকের এবং দেবীচক্ষুর মত স্নিগ্ধ দুটি চক্ষুর লুকানো প্রতিহিংসাই আজ তাঁর রাজগর্বের প্রাণ হরণ করার জন্য এই অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। শচীপাত্রের অভিসন্ধি ক্রূর নাগপাশের মত আজ জড়িয়ে ধরেছে কামতাপুরের রাজবংশের ভাগ্য আর ভবিষ্যৎকে।

কিন্তু হতাশ হয়ে পড়েন সুলতান হুসেন শাহ ও হুসেন শাহের সেনাপতি। রাজা নীলাম্বরের দুর্গদ্বার ভেদ করতে গিয়ে শুধু গৌড়-সৈন্যের শব স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে দুর্গদ্বারের সম্মুখে। রণদুর্মদ নীলাম্বরের তরবারি শংকা জানে না, ক্লান্তি মানে না। কামতাপুরের দুর্গরক্ষী সৈনিকের নিক্ষিপ্ত অগ্নিশরের বাধায় দুর্গের প্রবেশপথে অগ্রসর হ'তে পারে না সুলতানের সৈনিক।

ধরলার অপর পারে শিবিরের নিভৃতে ব'সে সুলতান হুসেন শাহ শচীপাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—বলুন বন্ধু শচীপাত্র, এখন কি করি?

শচীপাত্র বলেন—এখন কৌশল ছাড়া আর কোন উপায় নেই সুলতান।

হুসেন শাহ—আপনিই বলুন, কোন কৌশলে রাজা নীলাম্বরের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করা সম্ভব?

চিন্তা করেন শচীপাত্র, তারপর বলেন—রাজা নীলাম্বরের বীরত্বের স্তুতি ক'রে তাঁর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করুন সুলতান।

—তারপর?

তারপর দূত পাঠিয়ে রাজা নীলাম্বরের কাছে প্রস্তাব করুন, আপনার বেগম এক শত শিবিকায় তাঁর দুই শত সহচরী সঙ্গে নিয়ে রাজা নীলাম্বরের রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার বাসনা পোষণ করেন। কামতাপুরের রাণীকে প্রীতি জ্ঞাপন করতে এবং উপঢৌকনে সম্মানিত করতে চান গৌড়-সুলতান হুসেন শাহের বেগম।

—তারপর?

—আমি জানি, গর্বিত রাজা নীলাম্বর এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দান করবেন।

—কিন্তু তারপর?

—ঐ এক শত শিবিকার ভিতরে পাঁচ শত রণদক্ষ ও সশস্ত্র গৌড়-সৈনিক লুকিয়ে থেকে

দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হবে এবং নিমেষের মধ্যেই আক্রমণ ক'রে দুর্গদ্বার অধিকার ক'রে ফেলবে। এই কৌশলেই কামতাপুরের দুর্গ জয় করতে হবে সুলতান।

হেসে ফেলেন সুলতান—আপনার প্রস্তাবিত কৌশলটি ভালোই, কিন্তু রাজা নীলাম্বরকে এত মূর্খ ব'লে বিশ্বাস হয় না শচীপাত্র। আমার সন্দেহ হয়...।

—বলুন, কিসের সন্দেহ।

—শত্রু সুলতান হুসেন শাহের প্রেরিত শিবিকাগুলিকে এত সহজে বিশ্বাস ক'রে এবং বিনা পরীক্ষায় ভিতরে প্রবেশ করতে কখনই দেবেন না রাজা নীলাম্বর।

হতাশ হন শচীপাত্র—তবে উপায়?

হুসেন শাহ বলেন—যদি আপনার পত্নী বেগমের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে অগ্রবর্তী প্রথম শিবিকার ভিতরে থাকেন, তবেই কৌশলটি ছলনায় চমৎকার হয়ে উঠতে পারে শচীপাত্র।

শচীপাত্র বলেন—তাই হবে।

ক্ষেমা দেবীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব জানালেন শচীপাত্র, কিন্তু প্রস্তাব শুনে চমকে উঠেন ক্ষেমা দেবী। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেদনার্তভাবে বলেন—এ কি ভয়ানক প্রস্তাব!

ক্রুদ্ধস্বরে প্রতিবাদ করেন শচীপাত্র—প্রতিশোধের প্রস্তাব।

ক্ষেমা দেবী—কার উপর প্রতিশোধ?

—রাজা নীলাম্বরের উপর।

—কিন্তু। বলতে গিয়ে বিচলিত হয় ক্ষেমা দেবীর কণ্ঠস্বর।—কিন্তু রাজা নীলাম্বরের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কামতাপুরের স্বাধীনতা আর সম্মানকে এমন ক'রে মাটিতে লুটিয়ে দেবেন না স্বামী।

শচীপাত্র বলেন—তোমার কোন আপত্তি শুনবো না দুর্বলা নারী। ব্রাহ্মণের হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হও।

প্রস্তুত হলেন ক্ষেমা দেবী। রাজা নীলাম্বরও সুলতানের প্রেরিত দূতের নিকট হতে প্রস্তাব শুনে প্রীত হলেন, গর্বিতাও হলেন এবং একদিন গৌড়-সুলতানের শিবির হতে এক শত শিবিকা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে থামলো কামতাপুরের দুর্গদ্বারে।

বিচক্ষণ রাজা নীলাম্বর দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে শিবিকাশ্রেণীর দিকে সন্দিগ্ধ চক্ষে তাকিয়ে থাকেন। তারপর এগিয়ে এসে হঠাৎ প্রথম শিবিকার বদ্ধদ্বার উন্মুক্ত ক'রে শিবিকার অভ্যন্তরে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে এক পা পিছিয়ে সরে আসেন রাজা নীলাম্বর। মিথ্যা হয়েছে তাঁর সন্দেহ। শত্রুসৈনিক নয়, শিবিকার অভ্যন্তরে সত্যই ব'সে রয়েছেন সুসজ্জিতা ও রত্নালঙ্কারে ভূষিতা এক নারী, সুলতানের অন্তঃপুরের নারী। অনুতপ্ত অপরাধীর মত দুঃখিত স্বরে নীলাম্বর বলেন—ক্ষমা করুন মাতা।

আরও বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলেন রাজা নীলাম্বর, সুলতানের অন্তঃপুরচারিণী সেই নারীর দুই চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। দেবীচক্ষুর মত স্নিগ্ধায়ত ও মমতাকোমল দুটি চক্ষু যেন ছলছল করছে নির্বাক বেদনায়। কবে, কোথায়, কোন এক সন্ধ্যায় যেন এই চক্ষু দুটি দেখতে পেয়েছিলেন, স্মরণ করতে চেষ্টা করেন কামতাপুরের রাজা নীলাম্বর।

নারী বলে—ক্ষমা করুন দেবী কামদা।

আতংকে চিৎকার ক'রে ওঠেন রাজা নীলাম্বর—কে তুমি?

সেই মুহূর্তে এক শত নীরব শিবিকাও যেন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ক'রে ওঠে। শিবিকার ভিতর থেকে ক্রুদ্ধ বিষধরের মত পাঁচ শত শত্রুসৈনিক বের হ'য়ে সেই মুহূর্তে অধিকার ক'রে ফেলে দুর্গদ্বার।

দুর্গদ্বারেই গৌড়-সৈনিকের হাতে বন্দী হলেন রাজা নীলাম্বর এবং চারদিক থেকে

শত্রুসৈন্য দুর্বার স্রোতের মত মত্ত বেগে এগিয়ে এসে অসহায় দুর্গদ্বারের কপাটের বাধা ভাসিয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। শৃংখলিত নীলাম্বর দেখলেন, তাঁর মন্ত্রী শচীপাত্রের পত্নী ক্ষেমা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাকিয়ে আছেন তাঁরই দিকে. প্রতিহিংসার সর্পী, কিন্তু তবু কেন ছল ছল করে ঐ নারীর দুই চক্ষু, দেবীচক্ষুর মত দুটি চক্ষু?

গৌড়-সুলতান হুসেন শাহের বিজয়কেতন উড়লো কামতাপুরের দুর্গের চূড়ায়. আর, এক লৌহপিঞ্জরের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হলেন বন্দী রাজা নীলাম্বর।

পরের দিনের সন্ধ্যা। কামতাপুরের দুর্গ পিছনে ফেলে রেখে সবার আগে গৌড়-অভিমুখে চলে গিয়েছেন সুলতান হুসেন শাহ। শচীপাত্র এবং ক্ষেমা দেবীর শিবিকা অন্য এক সৈন্যদলের আগে আগে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে প্রহরীবেষ্টিত আর একটি পিঞ্জরশিবিকা, তার মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে কামতাপুরের সিংহ, রাজা নীলাম্বর।

ধরলার কিনারায় এসে রাত্রির বিশ্রামের জন্য থামলো সৈন্যদল। গভীর হয় রাত্রি, জ্যোৎস্নালোকে অভিভূত ধরলার ভাঙা ঢেউ শুধু ক্ষীণ শব্দে কাঁদে। আর কোন শব্দ শোনা যায় না। ধরলার কিনারায় ঘুমিয়ে পড়ে শিবির এবং ঘুমন্ত শচীপাত্রের প্রতিশোধের সংকল্প স্বপ্নের মধ্যে ছটফট করে।

আর, পিঞ্জরাবদ্ধ রাজা নীলাম্বর শেষ রজনীর জ্যোৎস্নালিপ্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। কামতাপুরের মাঠে এত জ্যোৎস্না, কিন্তু কামতাপুরের ঐ দুর্গের ভিতরে আজ অন্ধকার, নিভে গিয়েছে এক শত বছরের গর্বের দীপ।

ছটফট ক'রে ওঠে নিদ্রাহীন সিংহের মত পিঞ্জরাবদ্ধ নীলাম্বর। প্রার্থনা করেন--আর একবার সুযোগ পেতে চাই মাতা কামদা। মুক্ত ক'রে দাও এই পিঞ্জরের দ্বার। কামতাপুরের দুর্গ আর সিংহাসন জয় করবার সুযোগ আর একবার পেতে চাই দেবী।

সত্যই কি প্রার্থনা শুনলেন দেবী কামদা? কিন্তু সত্যই সেই মুহূর্তে খুলে গেল পিঞ্জরের দ্বার এবং দেখলেন রাজা নীলাম্বর, যেন জ্যোৎস্না দিয়েই গড়া এক নারীর মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে পিঞ্জরের নিকটে। এবং পিঞ্জর হ'তে বাইরে এসে দাঁড়িয়েই দেখলেন, মন্দিরবাসিনী মাতৃকার দুই চক্ষুর মত দুটি স্নিগ্ধায়ত ও মমতাময় চক্ষু তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে। পুত্রহন্তাকেই পিঞ্জর হতে মুক্ত ক'রে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ক্ষেমা দেবী।

রাজা নীলাম্বর ভক্ত পূজারীর মত ব্যাকুলস্বরে বলেন--আপনার পুত্রহন্তাকে কেন ক্ষমা করলেন মাতা?

ক্ষেমা দেবী--এক পুত্রশোকের শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু আর এক পুত্রশোকের শাস্তি পেতে চাই না।

ক্ষেমা দেবীকে প্রণাম ক'রে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রাজা নীলাম্বর বলেন--আপনি আদেশ করুন মাতা।

ক্ষেমা দেবী বলেন--হৃত রাজ্য উদ্ধার করুন।

কিন্তু জ্যোৎস্নালিপ্ত প্রান্তরের শেষ প্রান্তের অরণ্যের দিকে উদাস দৃষ্টি তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন রাজা নীলাম্বর। তারপর বলেন--বিদায় দিন মাতা।

ক্ষেমা দেবী--কোথায় যাবেন আপনি?

নীলাম্বর--সংসারের বাইরে।

ক্ষেমা দেবী--কেন?

নীলাম্বর--এই কামতাপুরের রাজপাটের সর্বাধীশ্বরী আপনি। আমি কেউ নই।

চলে গেলেন রাজা নীলাম্বর। জ্যোৎস্নালিপ্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে রাজা নীলাম্বরের ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে সেই যে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর কোনদিন দেখা যায়নি সেই ছায়া। গৌড়-সুলতান হুসেন শাহের সৈন্য আর চর ধরলার তীর হ'তে করতোয়ার তীর পর্যন্ত তন্ন

তন্ন ক'রে সন্ধান ক'রেও কোনদিন দেখতে পায়নি সেই ছায়াকে।

শচীপাত্রের মৃত্যু হয়েছিল শেষ আক্ষেপের বেদনা সহ্য করতে না পেরে। রাজা নীলাম্বরের জীবন-মরণের বিচার করবার সুযোগ পাননি শচীপাত্র। আর, গৌড়-সুলতান অনুরোধ জানিয়েছিলেন ক্ষেমা দেবীকে--নূতন কামতাপুরের রাজপাটের ভার নিন আপনি।

ক্ষেমা দেবী উত্তর দিয়েছিলেন—কামতাপুরের অধীশ্বরী হলেন দেবী কামদা। আমি কেউ নই।

দেবী কামদার মন্দিরে সেবিকা হয়ে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেছিলেন ক্ষেমা দেবী। রাণী নামে নয় ; কামতাপুরের গোস্বামিনী নামে খ্যাতা হয়েছিলেন ক্ষেমা দেবী।

পাঁচ শত বছর আগে কামতাপুরের দেবী কামদার মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন যে গোস্বামিনী, তাঁর নামটিই আজ দেবীত্বে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কে জানে কবে আর কেমন ক'রে গোস্বামিনী ক্ষেমা দেবীর পূজিতা কামদা দেবীরই নাম হয়ে গেল গোসানি দেবী এবং স্থানের নাম গোসানিমারি।

কোচবিহারের দিনহাটা হতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে ধরলা নদীর তীরে রাজা নীলাম্বরের দুর্গের জীর্ণ বক্ষে গোসানি দেবীর মন্দিরে আজও প্রদীপ জ্বলে। তারই অদূরে ধ্বংসীভূত প্রাসাদের ইটপাথরে আকীর্ণ স্থানটির নাম 'রাজপাট'। সন্ধ্যার অন্ধকারে আজও রাজা নীলাম্বরের রাজপাট যেন ঐ প্রদীপের আলোকের মধ্যেই দেখতে পায় তার সর্বাধীশ্বরীর ক্ষমা আর সান্ত্বনা।

শরৎখানার দহ

একদিন অরণ্য ছিল এখানে। সে অরণ্যকে সরিয়ে দিয়ে এক প্রতাপী রাজা একদিন সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। তারপর অদৃশ্য হলো সেই রাজধানী। আবার এল অরণ্য। সেই অরণ্যকে আবার অল্পে অল্পে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠলো মানুষের গ্রাম জনপদ ও বসতি। এবং দেখা গেল, মাত্র একশত বছরের মধ্যেই হেঁতাল গরান আর সুঁদরির বন্য আক্রোশে মাটি হয়ে গিয়েছে সেই রাজধানী। মানুষ জাগলো, কিন্তু সে রাজধানী আর জাগলো না।

আজও কাছে গেলে দেখতে পাওয়া যায়, নিতান্তই মাটি হয়ে পড়ে আছে সেই প্রতাপীর সব প্রতাপের ইতিচিহ্ন। দক্ষিণবঙ্গের খুলনা জিলার গড়মুকুন্দপুর হতে চার ক্রোশ দক্ষিণে 'যমুনেচ্ছা-প্রসঙ্গমে'র নিকটে, যমুনা ও ইচ্ছামতীর জলধারা যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে, মাত্র কয়েকটি মাটির স্তূপ হয়ে পড়ে আছে সেই প্রতাপীর দুর্গ ধুমঘাট। শিবানন্দ গুহের পৌত্র গোপীনাথ গুহ সত্যই প্রতাপে এবং সত্যিকারের প্রতাপে অবশ্যই আদিত্যসম হয়ে ওঠেননি। তবু তিনি নাম ধারণ করেছিলেন প্রতাপাদিত্য। এই ধুমঘাট দুর্গের স্থাপয়িতা হলেন মোগল দরবারের সনদের দ্বারা অনুগৃহীত সেই জায়গীরদার প্রতাপাদিত্য, কবির কল্পনাতে যিনি হলেন 'ভবানীর বরপুত্র' প্রতাপাদিত্য, বাহান্ন হাজার ঢালী আর ষোড়শ হলকা হাতী যাঁর ছিল এবং 'ভয়ে যত ভূপতি' যাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন, সেই মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

ধুমঘাট দুর্গের ভগ্নাবশেষের কাছে, দুর্গের পূর্বদিকের পরিখার বাইরে ইট ছড়ানো ক্ষেত আর মাঠের নাম হলো 'রাজবাড়ি'। রাজা প্রতাপাদিত্যের নির্মিত সেই পথের চিহ্ন আজও এখানে ওখানে জেগে রয়েছে, ঐ রাজবাড়ি থেকে শুরু ক'রে দেবী যশোরেশ্বরীর মন্দিরদুয়ার পর্যন্ত। দেবী আছেন, চার শত বছর আগে যেখানে ছিলেন সেখানেই আজও দেবী অধিষ্ঠিতা

রয়েছেন। পশ্চিমাস্যা কালিকা। কল্পনাশীল কবি যা-ই বলুন, লোকে বলে রাজা প্রতাপাদিত্যের মূঢ়তা আর অন্যায়ে কুপিতা হয়ে দেবী সেই যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পশ্চিমাস্যা হয়েছিলেন, আজও সেইভাবেই রয়েছেন। ঐ তো সেই প্রতাপাদিত্যের বুরুজখানা, সারি সারি কতগুলি মাটির ঢিপি মাত্র। আজ গ্রামের কলু তার ঘানির চাকা তৈরী করার জন্য এই বুরুজখানা আর দুর্গের মাটি সরিয়ে সে প্রতাপাদিত্যের গর্বের পাথর তুলে নিয়ে চলে যায়। কষ্টিপাথরের কালিকা মূর্তি আজ চার শত বছর ধ'রে এই কাললীলা লক্ষ্য ক'রে আসছেন।

ধুমঘাট দুর্গ হ'তে যশোরেশ্বরীর মন্দির দুয়ার—পুরাতন-পথচিহ্নের পাশে প্রতাপাদিত্যের বারদুয়ারী ভবনের ভগ্নাবশেষ। তার দক্ষিণে পদ্মপুকুর। যশোরেশ্বরীর মন্দির হ'তে অদূরে ঈশান কোণে প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডভৈরবের ত্রিকোণ মন্দির। বন্যগুল্মে সমাচ্ছন্ন আর শত জীর্ণ এই মন্দিরে চণ্ডভৈরব আজ আর বিরাজ করেন না। বিগ্রহ ঠাঁই নিয়েছে যশোরেশ্বরীর মন্দিরের আঙিনায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটু দূরেই আছে পাঁচ গম্বুজ মসজিদের জীর্ণ কলেবর, আর বার ওমরা'র কবর। মসজিদের উত্তরে ইচ্ছামতীর কিনারায় এক অরণ্যখণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে পর্তুগীজ-রচিত গির্জার অবশেষ। ধুমঘাটের দুই ক্রোশ উত্তরে 'দুধলি' আজও স্মরণ করিয়ে দেয়, এখানেই বাস করতেন পর্তুগীজ ফ্রেডরিক ডুডলি, প্রতাপের নৌ-কারখানার অধ্যক্ষ।

প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর অবশেষ, কিন্তু সত্যই কি কোন প্রতাপের ইতিবৃত্তের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় এর মধ্যে? ঐ বুরুজখানার উপরে সজ্জিত কামানশ্রেণী কি ধুমঘাটের সম্মান রক্ষার জন্য অনল বর্ষণ করেছিল কোনদিন? ধুমঘাটের এই দুর্গের দুয়ারে প্রতাপাদিত্যের সৈনিক কি কোনদিন সংগ্রামের প্রতিজ্ঞায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? ঐ জাহাজঘাটার শুষ্ক পরিখার মধ্যে আজও যে যুদ্ধতরণীর অস্থি খুঁজে পাওয়া যায়, সে যুদ্ধ-তরণীর মাস্তুলে কি শৌর্যময় সংগ্রামের আর জয়ের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল কোনদিন? প্রতাপাদিত্যের সেই ঈশ্বরীপুরীর জীর্ণ ভগ্ন ও মাটিমাখা এই চিহ্নরাজির মধ্যে বৈভবের স্মৃতি আছে, কিন্তু শৌর্যের স্মৃতি আছে কি? পথিকের কৌতূহলী মনে ক্ষণে ক্ষণে এই প্রশ্নই জাগে।

বিগলিতদেহ ধুমঘাট দুর্গের দিকে তাকালে আজও দেখতে পাওয়া যাবে, একটি খাল দুর্গের অভ্যন্তর হ'তে বের হয়ে এসে কামারখালি নামে একটি বড় খালের সঙ্গে মিশেছে। এখানে, ঠিক এখানেই আজ থেকে চার শত বছর আগে ঈশ্বরীপুরীর ইতিহাসে একটি মাত্র গৌরবের দীপ জ্বেলে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন যিনি, তাঁর নাম শরৎকুমারী। রাজা প্রতাপাদিত্যের মহিষী শরৎকুমারী। প্রতাপের স্মৃতি নয়, শরৎকুমারীর স্মৃতি বক্ষে ধারণ ক'রে যেন আজও তৃপ্ত হয়ে রয়েছে প্রাচীন ঈশ্বরীপুরীর মাটি।

ধুমঘাট হতে কিঞ্চিৎ উত্তরে গোপালপুরের কাছে নাগবাড়ি নামে এক গ্রামে আজও দীঘির জলে পদ্ম ফোটে। আজও মনে হবে, জিতামৃত নাগের কিশোরী কন্যা শরৎকুমারী হয়তো একদিন এই দীঘিরই কিনারায় দাঁড়িয়ে গ্রামপথের প্রান্তে হঠাৎ-উত্থিত বাদ্যরব শুনে চমকে উঠেছিল। বিস্মিত হ'য়ে দেখেছিল, লোক-লস্করের শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে একটি পালকি এগিয়ে আসছে। পর মুহূর্তে লজ্জারক্ত মুখে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সেই কিশোরী। বুঝতে পেরেছিল কুমারী শরৎকুমারী, পালকি এসেছে বসন্তপুর হ'তে। বরবেশে উপস্থিত হয়েছেন রাজকুমার প্রতাপ, রাজা বসন্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপ!

ঐ তো গোপালপুরের সেই গোবিন্দদেবের মন্দির, রাজা বসন্ত রায়ের নির্মিত যে মন্দিরে একদিন সুন্দর গোবিন্দের বিগ্রহ বিরাজিত ছিল। আজও কল্পনা করা যায়, বধূবেশে প্রতাপের পাশে বসে পালকি চড়ে বসন্তপুর যাবার পথে ঐ গোবিন্দ মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে, সজল চক্ষে আর স্মিতমুখে যে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন শরৎকুমারী, সে প্রণাম যেন মিশে

রয়েছে চারদিকের বাতাসে।

ঐ তো সেই ডামরেলীর পঞ্চরত্ন সমাজমন্দির, নববধূ শরৎকুমারী যে সমাজমন্দিরের প্রাঙ্গ ণে সমাগত জ্ঞাতি ও কুটুম্বসমাজের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বাস করতে পারা যায়, ডামরেলীর এই ধ্বংসীভূত সমাজমন্দিরের কোন একটি ইষ্টকখণ্ডের গায়ে নববধূ শরৎকুমারীর আনন্দধন্য হৃদয়ের আর প্রণামের স্পর্শ গোপন হয়ে রয়েছে।

বসন্তপুরের নিকটে কালিন্দীর বুকে আজও জলের তরঙ্গ দোলে। নববধূ শরৎকুমারীও একদিন বসন্তপুরের রাজভবনের এক কক্ষের বাতায়নে দাঁড়িয়ে কালিন্দীর ঐ জলতরঙ্গ দেখেছিলেন। অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল নববধূর চোখ। শুভবিবাহের পর তৃতীয় দিনেই এক অশুভ ইঙ্গিত দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন নববধূ। উৎসবের হর্ষ যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। স্তব্ধ ক'রে দিয়েছেন রাজকুমার প্রতাপ। নববধূর মুখের হাসি নিভিয়ে দিয়ে শিকার উৎসবে চলে গিয়েছেন স্বামী। নববধূর মনের প্রীতি আর মুখের শোভা অনায়াসে তুচ্ছ ক'রে চলে যেতে পেরেছিলেন প্রতাপ। সন্দেহ হয় শরৎকুমারীর, এ কেমন প্রতাপ, গৃহজীবনের প্রিয়ার চেয়ে বনের পশু ও পাখির মৃত্যুযন্ত্রণা যার কাছে বেশি প্রিয়?

মোগল দরবারের চাকুরি নিয়ে যেদিন আগ্রা চলে গেলেন প্রতাপ, বধূ শরৎকুমারী সেদিন ঐ বসন্তপুরের রাজভবনের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সে রাজভবনের দুয়ার এখন ধানের ক্ষেতের মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কে জানে, সেই রাজকুমার প্রতাপ বিদায়ের ক্ষণে তাঁর অশ্রুমুখী পত্নীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিলেন কি না!

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঐ বসন্তপুরের রাজভবনের এক কক্ষে ব'সেই আর একদিন ভয়ে চমকে ওঠার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হয়েছিল বধূ শরৎকুমারীকে। আগ্রা হতে ফিরে এসেছেন স্বামী। মোগল দরবার থেকে সনদ আদায় ক'রে পিতৃব্য বসন্ত রায়ের জায়গীরদারীর অধিকার কেড়ে নেবার জন্যই বিদ্রোহীর মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন প্রতাপ।

রাজা হলেন প্রতাপাদিত্য। ধুমধাটে নতুন দুর্গ ও প্রাসাদ রচিত হলো। এবং একদিন কল্পতরু দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন প্রতাপাদিত্য।

সেদিন কল্পতরু হয়েছেন প্রতাপাদিত্য। যে প্রার্থী যা চাইবে, অক্লেশে এবং অনায়াসে তিনি আজ তাই দান করবেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, শস্য ও ভূমি দান করছেন প্রতাপ।

অকস্মাৎ এক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করলেন—স্বর্ণ রৌপ্য চাই না, আমি প্রার্থনা করি মহারাজ, আপনি আপনার মহিষী শরৎকুমারীকে আমার কাছে দান করুন।

প্রতাপাদিত্য বলেন—তথাস্তু।

রাণী শরৎকুমারী বিস্মিতভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন—এ কি কথা বললেন স্বামী?

প্রতাপাদিত্য—প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা করেছি।

শরৎকুমারী—আমিও কি আপনার এই প্রাসাদভাণ্ডারের একটি সামগ্রী মাত্র?

প্রতাপাদিত্য কঠোরভাবে রাণী শরৎকুমারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না ক'রে, কোন প্রশ্ন না ক'রে ঐ ব্রাহ্মণের শরণ লও। আমার দানযজ্ঞের গৌরব নষ্ট করবার চেষ্টা করো না।

প্রার্থী ব্রাহ্মণই বিব্রতভাবে আপত্তি করেন—এমন দানে প্রয়োজন নেই মহারাজ, আমি আপনার সংকল্পের শক্তি পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম। আপনার মহিষী আমার কন্যাস্বরূপা।

প্রতাপ বলেন—না, তা হয় না। আমি দান ক'রে ফেলেছি এবং এই দান আমি ফিরিয়ে নিতে পারি না।

ব্রাহ্মণ বলেন—আমিই আমার কন্যাসমা এই রাজরাণীকে আপনারই কাছে দান করলাম মহারাজ।

প্রতাপ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলেন—না, দানের কাঙাল আমি নই। আমি রাজা। আমি অর্থের বিনিময়ে ক্রয় ক'রে নিতে পারি।

বিব্রত ব্রাহ্মণ হলেন—তবে ক্রয় ক'রেই নিন মহারাজ।

সহস্র মুদ্রা ব্রাহ্মণকে মূল্যস্বরূপ দিয়ে রাণী শরৎকুমারীকে ক্রয় করলেন রাজা প্রতাপাদিত্য। রাণী শরৎকুমারী তাঁর অশ্রুপ্লুত চক্ষু অঞ্চলে আবৃত ক'রে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ধুমঘাট দুর্গের পরিখার পার্শ্বে প্রতাপের সেই রাজবাড়ির ইট আজও ক্ষেত ও মাঠের বুকে গড়াগড়ি যায়। রাণী শরৎকুমারীর সেদিনের বুকভাঙা বেদনা আর আক্ষেপগুলিই যেন প্রশ্ন হয়ে এই মাটিমাখা ইটগুলির আড়ালে আজও নীরব হয়ে রয়েছে। এই কি স্বামীর হৃদয়? এই কি প্রতাপের পরিচয়?

দেবী যশোরেশ্বরীর কাছে মনের কান্না নিবেদন ক'রে দিন যাপন করছিলেন রাণী শরৎকুমারী। রাজবাড়ির এই ইটগুলিই সেই দুঃখের সাক্ষী। পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা ক'রে আর তাঁর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে যেদিন এই ভবনে প্রবেশ করেছিলেন প্রতাপ, সেদিনের রাণী শরৎকুমারীর আর্তনাদেরও সাক্ষী এই নীরব ইটগুলি।

মনের বেদনা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সেদিনও শান্তভাবেই রাণী শরৎকুমারী প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীকে—এই হত্যা, এই কি তোমার শক্তির পরিচয়?

প্রতাপ—হ্যাঁ, আমি সংকল্পের মানুষ এবং আমার সংকল্পের সিদ্ধির জন্য আপন-পর, মানুষ-অমানুষ, প্রাণী-অপ্রাণী কিছুই আমি বিচার করি না।

আর প্রতিবাদ করেননি রাণী শরৎকুমারী। কঠোর সংকল্পের মানুষ রাজা প্রতাপাদিত্যের এক একটি বিচিত্র ও ভয়ংকর প্রতাপের পরিচয় সহ্য করতে গিয়ে নীরবে অনেক চোখের জল ফেলেছিলেন এবং অনেক আর্তনাদ লুকিয়ে দিন যাপন করেছিলেন শরৎকুমারী। শুধু একটি দিন সহ্য করতে পারেননি এবং সেই দিনেরই স্মৃতি ধারণ ক'রে রয়েছে ঐ কামারখালির খাল।

বাংলার মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ'র সেনাপতি এনায়েৎ খাঁ এগিয়ে আসছেন ধুমঘাটের দিকে। প্রতাপাদিত্যের নৌবহর প্রথম আক্রমণেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে গিয়েছে। বিষণ্ণ ও বিচলিত প্রতাপাদিত্য ধুমঘাট দুর্গের অভ্যন্তরে এক কক্ষের নিভৃতে বসে আছেন।

ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এলেন রাণী শরৎকুমারী। প্রশ্ন করলেন—শত্রুর সৈন্য এগিয়ে আসছে, কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনি নীরব ও নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছেন এখানে?

প্রতাপাদিত্য উঠে দাঁড়ালেন—না, আর বসে থাকবার উপায় নেই। যেতেই হবে।

শরৎকুমারী—কোথায়?

প্রতাপ—এনায়েৎ খাঁ'র শিবিরে।

রাণী শরৎকুমারীর দুই চক্ষু দপ ক'রে জ্বলে ওঠে।—কিসের জন্য?

প্রতাপ—আত্মসমর্পণের জন্য।

চিৎকার ক'রে ওঠেন রাণী শরৎকুমারী—আত্মসমর্পণ? এত কঠোর, এত বড় সংকল্পের মানুষ আজ আত্মসমর্পণের কথা বলে কোন মুখে? আপনার সেই অনেক গর্বের, অনেক রক্ত পিপাসার ও অনেক প্রতিজ্ঞার তরবারি আজ কোথায় মহারাজ?

রাজা প্রতাপাদিত্যের পদপ্রান্তে পতিত হয়ে সিক্তচক্ষে আবেদন করেন রাণী শরৎকুমারী—শত্রুকে বাধা দিন মহারাজ। মরবার আগে যেন এই গর্ব নিয়ে মরতে পারি...।

প্রতাপ—কিসের গর্ব?

শরৎকুমারী—আমি বীর স্বামীর ঘরনী শরৎকুমারী, এই গর্ব।

উত্তর দিলেন না রাজা প্রতাপাদিত্য এবং ধীরে ধীরে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, তারপর

ধুমঘাট দুর্গের দ্বার পার হয়ে এগিয়ে চললেন।

আত্মসমর্পণ করেছিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য। কিন্তু মোগলের সেনাপতি এনায়েৎ খাঁ'র শিবিরে গিয়ে মার্জনা ভিক্ষা ক'রেও অব্যাহতি লাভ করেননি। অবনত মস্তকে বন্দিত্বের শৃংখল ধারণ করতে হয়েছিল তাঁকে।

সংবাদ শুনলেন শরৎকুমারী, রাজা প্রতাপাদিত্য বন্দিত্ব বরণ করেছেন। সংবাদ শুনলেন, মোগল সৈন্য উল্লাসে এগিয়ে আসছে ধুমঘাট দুর্গ লুণ্ঠনের জন্য।

লুণ্ঠিত এবং বিধ্বস্ত হয়েছিল প্রতাপের ধুমঘাট দুর্গ। কিন্তু সে অপমানের আঘাত আসবার আগেই প্রস্তুত হয়েছিলেন রাণী শরৎকুমারী।

দুর্গদ্বারে শত্রুর উল্লাস ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি নৌকায় রাজপরিবারের সকল নারীকে সঙ্গে নিয়ে গুপ্ত খাল দিয়ে বের হয়ে এলেন রাণী শরৎকুমারী। কামারখালির জলে এসে কিছুক্ষণের জন্য ভেসে রইল নৌকা। দেবী যশোরেশ্বরীর উদ্দেশে একবার প্রণাম জানালেন শরৎকুমারী। তারপরেই অদ্ভুত এক হাসি ছড়িয়ে পড়লো তাঁর মুখে। নিজের হাতেই নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে সকল কুলনারীকে সঙ্গে নিয়ে মরণ বরণ করলেন রাণী শরৎকুমারী।

ঈশ্বরীপুরীর প্রতাপ স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করেছিলেন সেদিন, কিন্তু ঈশ্বরীপুরীর যে প্রাণ সেদিন পরাভব স্বীকার করেনি, তার সাক্ষী ঐ কামারখালির খাল। ঐখানে, যেখানে ডুবে গিয়েছিল রাণী শরৎকুমারীর নৌকা, তারই নাম 'শরৎখানার দহ'।

পুতুলের চিঠি

অশোকের শিলালিপি কাঁদলো

ঘুম ভেঙে দেখি, পয়লা বৈশাখের সূর্য নারকেল গাছের পাতার ঝালর সরিয়ে ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে একটা ভোরের ট্রেন খুব আস্তে এগিয়ে চলেছে। তার পর থেমে গেল, ইঞ্জিনটা খুব জোরে একবার হাঁসফাঁস করে, যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একেবারে চুপ করে গেল।

এখন শুধু শুনতে পাই সেই পাখীর ডাক। কাঁকুলিয়ার নতুন বছরের প্রভাতে সবচেয়ে আগে জেগেছে পাখীর দল। কি মিষ্টি গলা পাখীগুলির। মনে হয় ওরা শুধু মিছরি খায়। যেন গান গেয়ে গেয়ে অন্ধকার তাড়ায় ওরা। ফুলে ফুলে এত মধু ভরে ওঠে কেন? ওরা ডেকে ডেকে বাতাস মিষ্টি করে দেয় তাই তো!

নইলে, পৃথিবীতে শুধু থাকতো রাত্রি—রাত্রি রাত্রি অফুরাণ রাত্রি! অন্ধকার আর পেঁচার ডাক, ভোর হোত না, আলো ফুটতো না। আর কী হতো? সারা রাত্রি পেঁচার ডাকে যত তিতকুটো কষা ফলের গাছে ফুল ফুটতো। অন্ধ মৌমাছির দল সেই তিতকুটো ফুলের রস লুটে নিয়ে যেত। মৌচাকও হতো নিশ্চয়, কিন্তু সে মৌচাক থেকে আমরা যে-জিনিস পেতাম, তার নাম মধু নয়, তার নাম তিতু!

তাই ভাবছিলাম, ভাগ্যিস নববর্ষ আসে, সূর্য ওঠে, পাখি ডাকে। পাখির ডাক মিষ্টি—তাই ফুল মিষ্টি, তাই মৌচাক মিষ্টি। ওঁ মধু মধু মধু।

আজও নতুন বছরের প্রথম সকালে উঠে পাখীর ডাক শুনছি। লক্ষ লক্ষ বছর আগে, যেদিন প্রাণের গায়ে শুধু স্পন্দন নয়, শব্দের সাড়া জাগলো—তারই প্রথম সুরের গৌরব যেন পাখীর ডাকে বেঁচে রয়েছে। পশ্চিমের বাগানটার দিকে একবার তাকাই। সেখানে এখনো একটু ফিকে অন্ধকারের ছোঁয়া যেন রয়ে গেছে। গাছগুলির ঘুমঘোর বোধহয় এখনো ভাঙেনি। পাখীগুলিকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু তাদের গানের শব্দ শুনছি। কতগুলি অদেখা নূপুর যেন গাছের মাথায়, পাতার আড়ালে, মাঠের ঘাসে লুটোপুটি করছে।

একটু বিমনা হয়ে যাই। হঠাৎ কেমন জানি একটু ভয় হয়—এই রূপকথার আবেশ এখুনি মুছে যাবে।

তাই হলো। আর একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি, দরজার বাইরে সিঁড়ির ওপর। নতুন বছরের সূর্যের লাল আলো কালো হয়ে এল! এই পাখীর ডাকের সুর যেন কতগুলি কিচিরমিচির শব্দ। এমন সুন্দর একটা সকাল বেলার সব আনন্দ মাটি করে দেবার জন্য কে যেন এসে শত্রুর মত দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে! বড় কর্কশ আর বীভৎস তার গলার স্বর।

ওপরের সূর্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, এইবার নীচের দিকে তাকালাম।

দেখলাম। আমার শত্রুটি দেখতে খুব ছোট্ট। ন্যাংটো রোগা রুক্ষ রুগ্ন। তার হাতে একটা টিনের মগ। কান্নার সুরে কঁকিয়ে কঁকিয়ে ভিক্ষে চাইছিল ছেলেটা। পয়সা চায় না, পোশাক চায় না, মিষ্টি সন্দেশ-টন্দেশ কিছু চায় না সে। দুটি ভাত দাও, কিম্বা ভাতের ফেন। খাই খাই খাই—শুধু খেতে চায়। কোন বড়লোকের বমি পেলেও চেটেপুটে খেয়ে ফেলবে।

জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। নতুন বছরের সূর্য ওঠা দেখার আনন্দটুকু আর ভোগ করতে দিল না। তবু কি বিদেয় হবে শীগগিরি? ঠায় বসে থাকবে, চেঁচাবে কাঁদবে। পরম পুণ্যদিনের প্রথম মুহূর্তটাকে বিষিয়ে দিয়ে, আরো কত প্রতিশোধ নেবার জন্য কতক্ষণ বসে থাকবে কে জানে!

নাঃ, সব নষ্ট করে দিল। এখন কান পাতলে শুধু ওরই কান্না শুনতে হবে, উঁকি দিলে

শুধু ওরই মূর্তি চোখে পড়বে। সব ব্যর্থ হয়ে গেল! ওঁ তিতু তিতু তিতু।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ জানি না। পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল। প্রথমেই চোখে পড়লো, পোস্টকার্ডের চিঠি, মোটা মোটা আস্ত আস্ত অক্ষরে লেখা। পড়লাম চিঠি ঃ

"হাজারিবাগ। সংক্রান্তি। শ্রীচরণেষু। মেজকাকু। কতদিন হয় তুমি কলকাতায় চলে গেছ। আমরা আর গল্প শুনতে পাই না। এবার থেকে চিঠিতে গল্প লিখে পাঠাবে। মিথ্যে গল্প লিখবে না। সত্যি গল্প লিখবে। তোমার নিজের গল্প। প্রণাম। ইতি পুতুল।

পুনশ্চ। দুঃখের গল্প হলে মিথ্যে করে লিখবে।"

পুতুলের চিঠির উত্তর দিতে হবে। তখুনি কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। হঠাৎ মনে পড়লো, সেই ভিখিরী ছেলেটা আছে না গেছে। কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না? যদি সত্যিই এখনো বসে থাকে, যদি আবার কেঁদে কেঁদে ভাতের জন্য বায়না ধরে, তবে কি উপায় হবে?

তাহলে চিল-কোঠায় গিয়ে বসবো। একটি মাত্র জানালা আছে সেই ঘরে। সেটাও বন্ধ করে দেব। ভিখিরী ছেলেটার গলার স্বর আর কানে পৌঁছবে না। বেশ আরামসে চিঠি লিখবো।

জানালাটা খুলে একবার ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ছেলেটা রয়েছে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। মসৃণ সিমেন্টের সিঁড়িতে গুটিসুটি হয়ে, একটা হাতের ওপর মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা, টিনের মগটা একটু দূরে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা কাক চোরের মত চুপিচুপি এসে ঠুক ঠুক করে মগটাকে ঠুকরোচ্ছে। শুধু তাই নয়, ধূর্ত কাকগুলো মগটাকে অনেকদূর হেঁচড়ে নিয়ে গেছে। বোধ হয় একেবারে গাব করে দিতে চায়।

আবার টেবিলের কাছে এসে বসলাম। পুতুলের চিঠির উত্তর দিতে হবে। লিখতে হবে, কলম তুলে ধরছি, কাগজ ভাঁজ করছি, এক লাইন লিখে তিনবার করে কাটছি, মিছিমিছি ব্লটিং পেপার চাপছি বার বার। মনে আসছে কত কথা, লেখার কিছু আসছে না।

শুধু মনে পড়ছে দুর্ভিক্ষের কথা, যুদ্ধের কথা। বৃথা মনের ভেতর কতকগুলি টর্পেডো ফাটছে, আর বড় বড় জাহাজ ডুবছে। তার মধ্যে পুতুলের পড়ার মত গল্প আর খুঁজে পাচ্ছি না।

নীচে নেমে যেতে হলো। চোর কাকগুলোকে তাড়িয়ে ভিখিরী ছেলের টিনের মগটা বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলাম। মগের ভেতর কিছু খাবার ভরে দিয়ে আবার ওর মাথার কাছে রেখে দিলাম, ঘুম ভাঙালাম না।

ঘুমিয়ে থাকুক। পয়লা বৈশাখের ভোরের আলোতে দুঃখী মানুষের প্রাণ ঘুমিয়ে থাক। কোন এক দূর পাড়াগাঁর একটা কচি মানুষের প্রাণ পথহারা হয়েছে। বৈশাখী ভোরের স্বপ্ন ওকে এখন দু'হাত ধরে কোন এক গাঁয়ের আমবাগানের ছায়ার আর অপরাজিতার ঝোপে ঝোপে লুকোচুরি খেলিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘুমাক ঘুমাক। হাঁ, এইবার চিঠিটা লিখে ফেলি।

পয়লা বৈশাখ। কাঁকুলিয়া। স্নেহের পুতুল।

একটা গল্প লিখে পাঠাচ্ছি। মিথ্যে না সত্য, তা বলবো না। আরো গল্প পাঠাবো। আমার কাছে যেমন অনেক দুঃখের গল্প আছে, তেমনি সুখের গল্পও আছে, ছেলেবেলার গল্প আছে, বুড়োবেলার গল্পও আছে। আজ ভোরবেলাতেই তোমারই মত ছোট্ট চেহারার একটা গল্প আমাদের বাসার দরজায় এসে বসেছিল। সে কিন্তু বড় দুখের গল্প। বাংলা দেশে এখন দুর্ভিক্ষ। এই ছেলেটির বাড়ি হয়তো কোন দূর পাড়াগাঁয়ে। খেতে না পেয়ে শহরে এসেছে। দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে চাইছে। ছিল চাষার ছেলে, নিজের ঘরের আঙিনায় একদিন হেসেখেলে লাফিয়ে দিন কাটিয়েছে। কুঁড়ে ঘরের ভেতরেও একদিন বাপ মায়ের বুক ঘেঁসে

আরামে ঘুমিয়েছে এই ছেলেটা, আজ ওর ঘর নেই। বাপ-মা কোথায় গেছে ঠিক নেই। ওর জীবনে আর কোন খেলা নেই। আজ সে ভিখিরী হয়ে গেছে।

আর একটা ভিখিরী ছেলের গল্প বলি। আর একটু বড় হয়ে তুমি যখন আরও অনেক বই পড়বে, তখন মহাপুরুষদের কত বিচিত্র জীবন ও জন্মকাহিনী জানতে পারবে। গৌতম বুদ্ধ যেদিন জন্মালেন, তার আগের দিন রাত্রে বুদ্ধ মাতা মায়া দেবী স্বপ্নে একটি সুন্দর হাতির মুর্তি দেখেছিলেন। সেই হাতির শরীরটা যেন আলো দিয়ে গড়া। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার আগে যেরুজালেমের পথিকেরা সন্ধ্যার আকাশে একটি নতুন নক্ষত্র দেখতে পেয়েছিল। সব মহাপুরুষদের জন্মকাহিনীর মধ্যে এইরকম নানা অসাধারণ ঘটনার কথা আছে। পুরাণের দেবতাদের জন্মকাহিনী তো আরও বিচিত্র। কোন দেবশিশু বা মহামানব জন্ম নেবার সময় নাকি আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতো, হঠাৎ নতুন রকমের একটা সুগন্ধে বাতাস ভরে উঠতো, বীণা বেজে উঠতো চারদিকে।

অনেকদিন আগের কথা। পরীক্ষাটা কোনমতে সেরে দিয়ে হাজারিবাগ থেকে আমি চলে গিয়েছিলাম। জানতাম পাস করতে পারবো না। তখন আমি ট্রেনে চড়ে বেড়াতে ভালবাসতাম না। হেঁটে হেঁটে দেশ ঘুরে দেখতেই ভাল লাগতো। ভাগ্যিস, এত হেঁটে ঘুরেছিলাম পুতুল। তাই না এত গল্প পথ থেকে কুড়িয়ে আনতে পেরেছি।

সেদিন হেঁটে হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সারাদিন হেঁটেছি, সারাপথ শুধু ময়ূরের ঝাঁক দেখতে দেখতে আর একটা উদার বেড়াশূন্য বাগানের পেয়ারা খেতে খেতে চলেছি। বিশ্বাস ছিল, ঠিক সন্ধ্যা হতে হতেই সাসারাম পৌঁছে যাব।

কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল। সাসারাম আরও কতদূর আছে জানি না। নিকটে কোন গ্রাম দেখছি না। পথের দুপাশে শুধু সীমাহীন অন্ধকারের মাঠ পড়ে রয়েছে। কাছে বা দূরে কোন গেরস্থালীর একটি ছোট দীপের আলোও দেখতে পাই না।

বিমর্ষভাবে পথের উপর চুপ করে দাঁড়ালাম। শুধু খুঁজছিলাম আজকের রাত্রিটার মত একটু পরিচ্ছন্ন জায়গা। কাঁটা ধুলো পোকা মাকড় নেই, এইরকম একটু জায়গা পেলেই ধন্য হয়ে যাই। ক্লান্ত শরীরটাকে রাত্রিটার মত একা ঘুমের কবরে পুঁতে দিয়ে আবার ভোরে জেগে উঠবো।

চোখের সামনেই কি যেন দাঁড়িয়ে আছে। গাছ নয়, মানুষ নয়। তবে কি? ভাল করে তাকিয়ে রইলাম।

ভয় ভেঙে গেল। ওটা একটা কাঠের খুঁটি। খুঁটির মাথায় একটা সাইন বোর্ড। অনুমানে বুঝে নিলাম, এটা একটা রাস্তার নিশানা। ঠিক তাই, খুঁটির বাঁ পাশ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে নিশ্চয় কোন লোকালয়ের দিকে। হয়তো কোন বস্তি বা বাজার বা কোন থানা।

এই কাঁচা রাস্তা কতদূর গেছে জানি না, তবু কপাল ঠুকে পথ ধরলাম আবার। কিন্তু পথে নেমেই আবার একটা আশঙ্কা জাগলো মনে। পথে ধুলো নেই। ঘাসে ছেয়ে আছে রাস্তাটা। গরুর গাড়ির চাকার কোন ক্ষত চিহ্ন নেই। বেশ ভরাট আর নরম রাস্তা। তবে কি এপথে লোক চলাচল নেই?

তবু এগিয়ে গেলাম। খুব বেশী দূর যেতে হলো না। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটি সাদা কুটীরের মূর্তি ভেসে উঠলো। কাছে গিয়ে দেখলাম একটি সাদা চুনকাম করা পাকা দেওয়ালের ঘর। কপাটের শিকলে তালা দেওয়া আছে। একটি কুয়ো রয়েছে সামনেই, জল তোলার জন্য একটি ডোল আর দড়ি রাখা আছে।

বোধ হয় কোন জলসত্র। কোন পুণ্যবান দানী মানুষের দয়ার কীর্তি। তৃষ্ণার্ত পথিকের জন্য তবু দুটো পয়সা খরচ করে মাটি ফুটো করে রেখেছেন। এতটুকুই বা কজন করতে চায়!

কুয়ো থেকে একটু দূরেই একটা দোমহল বাড়ির মত একটা কিছু দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অন্ধকারে বাড়িটার চেহারা ভাল মত কিছুই ঠাহর হয় না।

আমার অনুমান ভুল। দোমহল বাড়ি নয়। একটা প্রকাণ্ড পাথর। নিরেট ভোঁতা বধির একটা পাথরের চাপ যেন একলা অকারণে এখানে পড়ে আছে।

ভালই হলো। পাথরটার খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠলাম। কম্বল পাতলাম। শুয়ে পড়লাম।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। কৃষ্ণা তিথির চাঁদ উঠেছে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ধূলির পৃথিবী ভরে গেছে। মাঠগুলিকে আর মাঠ বলে চেনা যায় না। হ্রদের জলের মত মাঠের বুকটা যেন তরল হয়ে টলমল করছে। রাত্রির সান্ত্বনায় বাতাসের জ্বালাও একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। তাই ঝড়ো বাতাসের দাপাদাপি ফুরফুরে হাওয়ার চেয়ে ভাল লাগছিল।

তারপর কি হলো, শোন পুতুল। আজকের সকালবেলার পাখীর ডাকে মুগ্ধ হয়ে আমি পথ ভুলে রূপকথার দেশে চলে গিয়েছিলাম, কিছুক্ষণের জন্য। দরজার বাইরে ভিখিরী ছেলের কান্না আমার সেই রূপকথার দেশ নষ্ট করে দিয়েছিল। সাসারামের পথে পথ ভুলে এই অজানা পাথরটার মাথার উপর শুয়ে আছি। জ্যোৎস্না রাত্রির ঝড়ো বাতাস আবার আমাকে এক নতুন রাজ্যে বসিয়ে দিয়েছে। এখানে বসে বসে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা এখনো সব তৈরি হয়ে ওঠেনি। চারদিকের সব বস্তু এখনো গলে নরম হয়ে ঝাপসা হয়ে আছে। আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গড়ে উঠবে, এখনো অনেক দিন বাকী আছে। শুধু আমি একা সবার আগে সেই যুগের প্রথম মুহূর্ত হতে একটি কঠিন পাথরের ভেলায় ভাসছি।

কান্নার শব্দ। কে যেন কাঁদছে। থেকে থেকে, টেনে টেনে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, গুমরে।

এখানেও কান্না? এখানে মানুষ নেই, রূপালী বাষ্পে ভরা এই পৃথিবীতে এখনো যে মানুষ জন্ম নেয়নি। তবু মানুষের দুঃখটা আগে আগে চলে এসেছে। কী আশ্চর্য!

বড় করুণ হয়ে কান্নার শব্দটা বাজছিল। মাঝে মাঝে ঝড়ো বাতাসের ঝাপটে কান্নার শব্দটাকে যেন অনেক দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই শুনছিলাম একেবারে কাছে, বাঁয়ে ডাইনে, নীচে—চারদিকে। ঠিক কোনদিকে বুঝা যায় না।

নতুন রাজ্যের প্রথম রাজা হওয়ার সুখ ঘুচে গেল। কান্নাটা কমছিল না। বাকী রাতটা ছটফট করে ভয়ে ও অস্বস্তিতে কাটালাম।

তখন শেষ রাত্রি। পূবের আকাশ একটু ফর্সা হয়ে উঠেছে। পশ্চিমে লাল চন্দনের মত ঠাণ্ডা চাঁদ একেবারে মাঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। পাথরের ওপর থেকে নীচে নেমে পড়লাম।

কান্নার শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছি জানি না। তখন ভোর হয়ে গেছে। আজকের মতই কাঁচা লাল রোদ ছড়িয়ে সূর্য উঠছিল।

পাথরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো—একটা শিলালিপি লেখা রয়েছে। চমকে উঠলাম। তবে কি এটা মহারাজ অশোকের শিলালিপি? সেই প্রিয়দর্শী সন্ন্যাসী মহারাজ, যিনি লিখে গেছেন—মানুষ সুখী হবে সুখী হবে।

কান্নার শব্দটা বাজছে পাথরের অপর দিকে। কান্নাটাকে যেন গ্রেপ্তার করার জন্য পাথরটিকে পাক দিয়ে দুবার দৌড়লাম।

এতক্ষণে তাকে দেখলাম। পাথরটার দক্ষিণ কোণে একটা বড় গহ্বর। ছোট গুহার মত যেন একটি আশ্রয়, ওপরে পাথরের ছাদ। সেই গহ্বরে এক ভিখিরী মেয়ে বসে রয়েছে, তার কোলে একটি শিশু। সেই রাত্রে শিশুটির জন্ম হয়েছে। ভিখিরী মেয়েটা একটু ভয় পেয়ে আর লজ্জিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

নবজাত একটি মানুষের প্রাণের কান্না আবার অস্থির হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম। আমি জোর করে ভাববার চেষ্টা করলাম—কালকের রাত্রের জ্যোৎস্নায় এই

পুণ্য পাথরের আশ্রয়ে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন।

কিন্তু আমার বার বার মনে পড়ছিল—একটা ভিখিরী জন্ম নিয়েছে। ভিখিরী মায়ের ছেলে একটা ভিখিরী।

আজকের চিঠি এইখানে শেষ করলাম, পুতুল। এর পরের চিঠিতে আর একটা গল্প পাঠাবো বেশী দেরী করবো না। ঠিক সময়মত পাবে। ইতি মেজ-কাকু।

আকাশ থেকে মিষ্টি ঝড়ে পড়লো

কাঁকুলিয়া। পয়লা জ্যৈষ্ঠ। স্নেহের পুতুল।

কদিন থেকে মনটা বড় ফুর্তিতে আছে। কেন জান? মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আমরা যখন বয়সে তোমার সমান ছিলাম, তখন থেকেই আমরা মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছি। আমাদের ছেলেবেলা থেকেই তিনি আমাদের মনের সাথী হয়েছিলেন। আজও তিনি তাই আছেন। তিনি আমাদের নেতা। তিনি বলেছেন, স্বরাজ হবে, আমরা স্বাধীন হব, সব মানুষ মুক্তি পাবে, পৃথিবী থেকে হিংসা দূর হবে। মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়লেই আমাদের দেশের ইতিহাসের আর এক বিরাট পুরুষের নাম মনে পড়ে--মহারাজ অশোকের কথা। তিনিও ঠিক এই কথা বলেছিলেন এবং কাজে করেওছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, পাটলিপুত্রের এক পাথরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সেই সন্ন্যাসী মহারাজা অশোক যে-কথা বললেন, সারা পৃথিবীতে সেই কথার মায়া ছড়িয়ে গেল! মানুষে, দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব করে কত বড়ো সুখী ও সুন্দর সভ্যতা তৈরি করা যায়, মহারাজা অশোকের ধর্মরাজ্য তারই প্রমাণ। পৃথিবীতে এরকম রাজ্য আর তৈরী হয়নি। আজ আমাদের মহাত্মা গান্ধী আবার সেই কথা বলছেন।

আমি তখন বাংলা স্কুলে পড়ি। তখনকার সব কথা আমার মনে আছে। বড় ভাল লাগতো স্কুলটাকে। গরমের ছুটির সময় স্কুল বন্ধ হ'লে আমরা সবাই খুশী হতাম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী খুশী হতাম যেদিন আবার স্কুল খুলতো। দেড় মাস পরে আবার ক্লাসে ফিরে গিয়ে সেই পরিচিত ডেস্কটিকে নতুন করে দেখতে কত ভাল লাগতো। ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা খড়ির লেখা পুরনো অঙ্কগুলি স্কুলের শিবুমালী ভাল করে মুছে রাখেনি। দেড় মাস পরে ফিরে গিয়ে আমরা ব্ল্যাকবোর্ডের সেই আবছা অঙ্কটাকে নিয়ে আবার হৈ-চৈ করতাম। দেড় মাস আগে এই ভালুকের নখের মত শক্ত বাঁকা অঙ্কটা আমাদের কী ভীষণ ভয় দেখিয়েছিল। অঙ্কটাকে তুচ্ছ করে আমরা সেই ভয়ের প্রতিশোধ নিতাম। বার বার নতুন করে লিখতাম আর মুছে ফেলতাম। দেখতাম, স্কুলের আলমারীর ভেতর সেই ছোট গ্লোবটি নিঃশব্দে স্থির হয়ে আছে। তালাবন্ধ আলমারীর দরজাটা টেনে একটু ফাঁক করে আমাদের ছোট হাত আলমারীর ভেতর জোর করে ঢুকিয়ে দিতাম। গ্লোবটাকে ঘুরিয়ে দিতাম। আবার দেড় মাস পরে আমাদের ছোট্ট পৃথিবীটা বন বন করে লাট্টুর মত ঘুরতে থাকতো, সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা বিভোর হয়ে যেতাম।

দলে দলে স্কুলের বাগানটাকে একবার টহল দিয়ে দেখে আসতাম আমরা, আমাদের সেই আমড়া গাছ, সেই কতবেল গাছ। দড়িতে ঘটি বেঁধে স্কুলের কুয়ো থেকে অনবরত জল তুলতাম আর খেতাম। শিবুমালীর ধমক গ্রাহ্য করতাম না। দেড় মাস পরে আবার স্কুলের কুয়োটাকে হাতের কাছে পেয়েছি, আমরা যেন কুয়োর কাছ থেকেও এই কদিনের বকেয়া পাওনা সুদসুদ্ধ আদায় করে ছাড়তাম।

স্কুলের সামনে রাস্তার ওপারে এক দক্ষিণী পণ্ডিত থাকতেন। বড় কঠিন পণ্ডিত। রোজ মাথা কামাতেন, নিজের হাতে রান্না করতেন আর দাওয়ায় বসে পুঁথি লিখতেন। এই পণ্ডিতের ঘরের পাশে একটি ফলের গাছ ছিল। এই ফলের ভাল নামটা যে কি, তা আজও আমি জানি না। আমরা বলতাম আঠাফল। দেখতে অনেকটা লটকা ফলের মত, খেতে মিষ্টি অথচ আঠায় ভরা। তাতে আমাদের খুব সুবিধাই হয়েছিল। রাস্তার চলন্ত রিক্সাগুলির গায়ে মুঠো মুঠো আঠাফল ছুঁড়ে মারতাম। ফলগুলি শামুকের মত রিক্সাগুলিকে যেন কামড়ে লেগে থাকতো। রিক্সাগুলি শেষকালে এপথে আসাই ছেড়ে দিল।

কিন্তু ঐ মোটা দক্ষিণী পণ্ডিত। আঠাফল গাছের দিকে আমরা এক পা এগিয়ে যেতেই চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন, তার পরেই একটা গর্জন করতেন এবং শেষে মারমূর্তি হয়ে একখণ্ড সর্বদর্শনসংগ্রহ তুলতেন ছুঁড়ে মারবার জন্য। গরমের ছুটির পর, দেড় মাস পরে আবার আমরা সেই নেড়ামাথা দক্ষিণী পণ্ডিতকে বড় খুশী হয়েই দেখতাম। আবার আঠাফল পাড়তাম। দক্ষিণী পণ্ডিত আবার গর্জন করে সর্বদর্শনসংগ্রহ তুলতেন ছুঁড়ে মারবার জন্য। দেড় মাস পরে আবার তাঁকে রাগিয়ে আমাদের পুরোনো আনন্দকে আবার ফিরে পেতাম।

সেই ছোট বাংলা স্কুল, কিন্তু আমাদের কাছে আকাশের চেয়েও বড়। এখানে এসেই আমরা সারা পৃথিবীর খবর শুনতাম। এই স্কুলের গল্পভরা আঙিনায় আমরা প্রথম শুনলাম, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মাথা এক লক্ষ টাকা দিয়ে গবর্ণমেন্ট কিনে রেখেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মাথা। এই বাংলা স্কুলের প্রতিধ্বনির মধ্যেই আমরা প্রথম শুনতে পেলাম মোহনবাগানের কথা, যারা চোখে গামছা বেঁধে ফুটবল খেলতে পারে, গুনে গুনে একশোটা গোল না দিয়ে থামে না। এই ছোট বাংলা স্কুলের কানাকানির মধ্যেই আমরা প্রথম ভয়ে ভয়ে শুনলাম গোপিয়া ডাকাতের কথা—দানুয়া জঙ্গলের বাঘকে ট্রেনিং দিয়ে ডাকগাড়ি লুট করিয়েছে। আমরা শুনলাম, বেলিয়ান পাহাড়ে একজোড়া নতুন নাগ-নাগিনী দেখা দিয়েছে। এক বাটি দুধ রেখে দিলে চুপচাপ এসে খেয়ে চলে যায়। আমরা শুনলাম, ইচাক গ্রামে এক ধানক্ষেতের মাটির নীচে একটি শ্বেত পাথরের তীর্থঙ্করের মূর্তি পাওয়া গেছে, চোখ দুটো হীরের তৈরী।

হঠাৎ শুনলাম, আজ মহাত্মা গান্ধী আসছেন। আমাদের শহরের পাশ ছুঁয়ে গয়ারোড ধরে মোটর গাড়িতে চলে যাবেন। দলে দলে লোক চলেছে গয়ারোডের দিকে। আমাদের ছোট বাংলা স্কুলের বুকটা দুলে উঠলো। সেই মহাত্মা গান্ধী আসছেন। মহাসমুদ্রের ঝড়ের গল্পের মত তাঁকে আমরা শুধু শুনেছি। আজ তাঁকে দেখবো।

ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা বাজলো। আমরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম, এখুনি ক্লাসে গিয়ে বসতে হবে। অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ড্রিল আর স্তোত্র--একে একে সারা দুপুরটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মহাত্মা গান্ধী ততক্ষণে চলে যাবেন।

ক্লাসে বসে জানালা দিয়ে বার বার তাকিয়ে আমরা দেখছিলাম—দলে দলে লোক জয়ধ্বনি করে চলেছে। দেখলাম, সেই কঠিন নেড়ামাথা দক্ষিণী পণ্ডিতও পুঁথি গুটিয়ে রেখে চললেন মহাত্মা গান্ধীকে দর্শন করতে। আমরাই শুধু বন্দী হয়ে পড়ে রইলাম।

আজ প্রথম আমাদের মনে হলো, স্কুলটার হৃদয়ে কোন মমতা নেই। আমাদের বাংলা স্কুল এই প্রথম আমাদের ঠকালো।

হেড মাস্টার কৃষ্ণধন গুপ্তকে আমরা কেষ্ট স্যার বলতাম। কেষ্ট স্যার বড় কঠোর মানুষ। একদিনের জন্য তাঁকে স্কুল কামাই করতে দেখিনি। কখনো ছুটি নিতেন না। জ্বর হলেও কম্বলমুড়ি দিয়ে এসে ক্লাস করতেন।

রোগা লম্বা কালো লাল-চোখ কেষ্ট স্যার। মহাত্মা গান্ধীর কোন ধার ধারেন না। তিনি

পৃথিবীতে বোধ হয় কাউকে চেনেন না, শুধু সেক্রেটারী মিত্তির বাবুকে ছাড়া।

তবু আমরা ক'জন সাহস করে অঙ্ক পণ্ডিতের কাছে হুকুম নিয়ে কেষ্ট স্যারের ঘরের দিকে চললাম। নিজের ঘরে বসে কেষ্ট স্যার তখন তামাক খাচ্ছিলেন।

আমরা ভয়ে ভয়ে বললাম—স্যার, ছুটি চাই স্যার।

কেষ্ট স্যার তাঁর হুঁকোর মতই গরগর করে উঠলেন—ছুটি? ছুটি কিসের রে হতভাগা?

আমরা—স্যার গান্ধী আসছেন স্যার। আমরা স্যার দেখতে যাব স্যার।

মুহূর্তের মধ্যেই রেগে গিয়ে কেষ্ট স্যার চিৎকার করে উঠলেন—বেরো, বেরো এখান থেকে। ঠ্যাং খোঁড়া করে ছেড়ে দেব, মুখ থেকে যদি আবার এসব জঘন্য কথা শুনেছি।

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেষ্ট স্যার মুখ ভেংচে বলতে লাগলেন—মহাত্মা? নেংটি পরলে সব ব্যাটাই মহাত্মা হয়, আর চাকরি না পেলে সব ব্যাটাই নেংটি পরে।

আমাদের মধ্যে অজিতের ভয়ডর একটু কম ছিল। অজিত গম্ভীর হয়ে বললো—গালাগালি দিচ্ছেন কেন স্যার।

অজিতের মন্তব্যটা যেন স্যারকে বোলতার মত কামড়ে দিল। রাগের জ্বালায় পাগল হয়ে একটা লাফ দিয়ে উঠে এলেন। অজিতের চুলের ঝুঁটি ধরে দমাদম মারতে লাগলেন। তার পরেই একটা হাঁপ ছেড়ে কেষ্ট স্যার চিৎকার করলেন—বেরো, বেরো এখান থেকে শীগগির।

অজিতের মার খাওয়া দেখে আমাদের ভয় বরং ভেঙে গেল। আমি বললাম—স্যার, হাফ-ডে চাইছিলাম স্যার, আজ স্যার, ড্রিলটা থাক স্যার।

কেষ্ট স্যার আবার ক্ষেপে উঠলেন। খপ করে আমার কানটা শক্ত করে ধরে ওপর দিকে টানতে লাগলেন। আমি দু'পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে হালকা হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কেষ্ট স্যার দাঁত চিবিয়ে বললেন—কেন রে শুয়ার? মহাত্মা গান্ধী তোদের কে?

হঠাৎ তারাপদ বলে ফেললো—নেতা স্যার।

সেই মুহূর্তে আমার কানটা কেষ্ট স্যারের থাবা থেকে মুক্ত হলো। তারাপদর কানটাকে চিমটি দিয়ে ধরলেন কেষ্ট স্যার—নেতা? তাতে তোর কি রে নরাধম? গান্ধীকে দেখে তোর পেরমায়ু বাড়বে রে।

প্রভাত বললো—পুণ্যি হবে স্যার।

তারাপদকে ছেড়ে দিয়ে কেষ্ট স্যার প্রভাতের গলা টিপে ধরলেন। তার পরেই ঘাড় ধরে একে একে সবাইকে ধাক্কা দিতে লাগলেন—বেরো, বেরো এখান থেকে।

আমরা ফিরে গিয়ে চুপ করে অঙ্কের ক্লাসে বসলাম। কি আর করতে পারি আমরা! প্রতিশোধ? প্রতিশোধ নেবার কোন দুঃসাহস আমাদের ছিল না। আমাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু?

কিন্তু ঘটনাটা ক্লাসে ক্লাসে রটে গেল। কোন ক্লাসে আর ভাল করে পড়া জমছিল না। হঠাৎ সমস্ত স্কুলটা একেবারে শান্ত শব্দহীন হয়ে রইল। পণ্ডিতমশাইরাও চুপ করে ছিলেন। টিফিনের ছুটিটাও নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে, আমাদের ইতিহাসের ক্লাসে ঢুকে প্রথম শব্দ করলেন কেষ্ট স্যার।

পড়াতে পড়াতে কেষ্ট স্যার এক একবার থেমে যাচ্ছিলেন। গম্ভীরভাবে রাস্তার জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলেন, শেষে পড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন—গান্ধী আসছে, সেখানে তোমাদের যেতে নেই। গবর্ণমেণ্ট রাগ করবে।

আমরা কিন্তু তখন আর ছটফট না করে চুপ করেই বসে ছিলাম। কেষ্ট স্যারই একটা খড়ির টুকরো তুলে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর জোরে ছুঁড়ে মারলেন। বললেন—সাবধান! আবার হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন—কী এমন একটা লোক গান্ধী, যাকে দেখবার জন্যে ছটফট করতে

হবে।

কেষ্ট স্যারের ওপর রাগ করবার কথাও মনে ছিল না আমাদের। আমরা শুধু ইতিহাসের পাতা খুলে তখন মনে মনে দেখছিলাম—কাতারে কাতারে লোক গয়ারোডের দু'পাশে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি করছে। মহাত্মা গান্ধীর মোটর গাড়ি আসছে। হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

ঘণ্টা বাজলো। বিকেলের রোদে স্কুলের উঠোনে আমরা ড্রিল করার জন্য দাঁড়ালাম। কেষ্ট স্যার ছাতা মাথায় দিয়ে ছড়ি হাতে হাঁক দিলেন—অ্যাটেন্‌সন্‌!

শিবুমালী হঠাৎ কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অজিতের কানে কানে কি একটা কথা বললো। কেষ্ট স্যার ধমক দিয়ে উঠলেন—এই, কি হচ্ছে? অ্যাটেন্‌সন্‌!

অজিত চিৎকার করে উঠলো—স্যার মহাত্মা গান্ধী এক্ষুনি চলে গেলেন স্যার।

কেষ্ট স্যার লাল চোখ পাকিয়ে তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন—তাতে, তাতে তোর কি রে বন্যগর্দভ?

অজিত—আকাশ থেকে মিষ্টি বৃষ্টি হয়েছে স্যার। শিবু দেখে এসেছে। ছোট ছোট এলাচ দানার মত মিষ্টি।

কেষ্ট স্যার—অ্যাঁ, কি বললি?

অজিত—মিষ্টি বৃষ্টি স্যার। গয়ারোডের দু'দিকে মাঠের ওপর স্যার। ঝুর ঝুর করে শুধু মিষ্টি ঝরে পড়ছে!

মিষ্টি বৃষ্টি! মিষ্টি বৃষ্টি! মিষ্টি বৃষ্টি! একশো ছাত্রের হঠাৎ উল্লাসে স্কুলের বাড়িটা অস্থির হয়ে উঠলো। সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বই খাতা শ্লেট পড়ে রইল। ছেঁড়া জালের মাছের মত আমরা এক সঙ্গে দৌড় দিলাম গয়ারোডের দিকে।

কেষ্ট স্যার তারস্বরে চিৎকার করছিলেন—ওরে যাসনি, যাসনি। শিবুমালী গাঁজা খায়, এসব গুজবে বিশ্বাস করিসনি।

মাঠের ওপর দলে দলে ভাগ হয়ে আমরা মিষ্টি খুঁজছিলাম। ঘাসের ওপর সাদা সাদা কিছু দেখতে পেলেই আমরা সেদিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছিলাম। মহাত্মা গান্ধী চলে গেছেন, তাঁকে দেখতে পেলাম না। যাক, আকাশ থেকে মিষ্টি বৃষ্টি হয়েছে। এই মিষ্টি আমাদের চাই। দৌড়ে দৌড়ে লাফালাফি করে, চেঁচিয়ে, শিষ দিয়ে আমরা ঘাসের ওপর মিষ্টি খুঁজছিলাম, ছোট ছোট এলাচ দানার মত মিষ্টি।

—পেলি নাকি রে কিছু? অ্যাঁ?

হঠাৎ চমকে, উঠে পেছন তাকিয়ে দেখলাম, কেষ্ট স্যারও এসে গেছেন। আমাদের আনন্দের চিৎকারে মাঠের বাতাস মাতিয়ে তুলছিল, দলে দলে চিৎকার করে আমরা উত্তর দিলাম—হ্যাঁ স্যার, পাওয়া যাচ্ছে স্যার।

কেষ্ট স্যার ব্যস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—কই, কোথায় কোন দিকে?

অজিত এক দৌড়ে মাঠের দক্ষিণ দিকে একটা জায়গা লক্ষ্য করে ছুটে যেতে যেতে বললো—এই দিকে স্যার! আসুন স্যার।

কেষ্ট স্যার অজিতের পেছু পেছু দৌড়লেন।

পরমুহূর্তে আমি পশ্চিম দিকে দৌড়ে যেতে যেতে চিৎকার করলাম—এদিকে স্যার, ঐ যে দেখা যাচ্ছে, আসুন স্যার।

কেষ্ট স্যার অজিতকে ছেড়ে দিয়ে আমার পেছু পেছু দৌড়ে আসতে লাগলেন।

ওদিকে তারাপদ প্রচণ্ড চিৎকার করে উত্তর দিকে দৌড়ে গেল—আসুন স্যার, এইদিকে আমার সঙ্গে স্যার।

কেষ্ট স্যার থমকে দাঁড়ালেন। পরমুহূর্তে আমার দিকটা ছেড়ে দিয়ে দম টেনে টেনে

তারাপদর পেছু ধরে ছুটে চললেন।

প্রভাত চেঁচিয়ে উঠলো—পেয়ে গেলাম স্যার।

কেষ্ট স্যার হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে তাকালেন—কই, কোন দিকে রে?

প্রভাত সোজা পূব দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করলো—এইদিকে স্যার।

কেষ্ট স্যার একেবারে ক্লান্ত শরীর নিয়ে জোর করে কষ্টেসৃষ্টে প্রভাতের পেছু পেছু খোঁড়া জিরাফের মত লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে কোনমতে দৌড়ে যেতে লাগলেন—কই? কই? কোন দিকে রে?

আজকের মত চিঠি শেষ করলাম পুতুল। কেষ্ট স্যারের কথা আর কী বলবো! তিনি বোধ হয় তখনো বুঝতে পারেননি যে আমরা তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছি।

প্রভাতের পেছু পেছু হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়চ্ছিলেন, রোগা লম্বা কালো লালচোখ কেষ্ট স্যার। তখনো তিনি বিশ্বাস করে মাঝে মাঝে সবার দিকে করুণভাবে তাকাচ্ছিলেন। আমার মনে হলো, কেষ্ট স্যার এখন নিশ্চয় মনে মনে বলছেন—এইবার ছেড়ে দে রে বাবা, যা পাওয়ার পেয়ে গেছি। ছোট ছোট এলাচ দানার মত মিষ্টি! কিন্তু কী ভয়ানক মিষ্টি!

বলাসুরের হাড় খুঁজে পেলাম

কাঁকুলিয়া। পয়লা আষাঢ়। স্নেহের পুতুল।

আজ কিসের গল্প শুনতে তোমার ভাল লাগবে, পুতুল? আষাঢ়ে গল্প? কিন্তু এই মাত্র আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আষাঢ়ের কোন চিহ্ন নেই। এখনো আকাশে বৈশাখ মাসের রাগ জ্বলছে। বেশ গরম পড়েছে। লোকের মুখে শুধু শুনছি—ধান পুড়ে গেল, ধান পুড়ে গেল। একেই বলে, গঙ্গা শুকু শুকু, আকাশে ছাই। বাংলা দেশের জল মাটি বাতাস কেন জানি বিগড়ে যাচ্ছে। তোমার মত কত শত শত মেয়ে, কত আশা করে, কত বসুধারা ব্রত করলো, নেচে নেচে ছড়া গাইলো, গাছের মাথায় জল ঢাললো। তবু আজও মাঠের বুকে একটা জলভরা মেঘের ছায়া পড়লো না। এস বৃষ্টি, এস বৃষ্টি—সারা দেশের প্রাণ অসহায়ের মত শুধু প্রার্থনা করছে। তাই, আজ আষাঢ়ে গল্প কিছু মনে আসছে না। অনেক বছর আগের আষাঢ় মাসের একটা দিনের গল্প বলতে পারি, আমাদের ধরণী পণ্ডিত যেদিন একেবারে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বড় গম্ভীর আর বড় উদাস ছিলেন ধরণী পণ্ডিত। সব সময় কি যে ভাবতেন। অম্বলের রোগীর মত তাঁর চেহারাটা সব সময় বড় শুকনো দেখাতো।

স্টীফান সাহেবের বাগানের পাশে তখন আমাদের নতুন বাংলা স্কুল তৈরী হয়েছে। টীচারদের থাকবার জন্য ছোট একটি কাঁচা গাঁথুনির ব্যারাক তৈরী হয়েছে। আমাদের গরীব স্কুলটার বোধ হয় কিছু টাকা জমেছিল। দেখলাম, আমাদের খেলার মাঠে আলকাতরা-মাখা বাঁশের গোলপোস্টও তৈরী হয়ে গেল। খুব খুশী ছিলাম আমরা। দেখে আরও খুশী হলাম, নতুন কুয়ো তৈরী আরম্ভ হয়েছে। ঠিকেদারের কুলিরা এসে রোজ মাটি কাটে, ঝুড়ি ঝুড়ি দুধিয়া মাটি, কাঁকর আর রঙবেরঙের পাথর ওঠে। জল বের হতে তখনো অনেক দেরী।

নতুন স্কুলে ক'জন নতুন টীচার এলেন। প্রথম এলেন ধরণী পণ্ডিত তারপর এলেন চিত্তদা। টীচারদের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে ছোট ছিলেন এঁরাই দুজন। আমরা দেখতাম, ধরণী পণ্ডিত আর চিত্তদা, দুই সমবয়সীতে মিলে একই উনুনে আর হাঁড়িতে রান্নাবান্না করেন, একই

সঙ্গে দু'জনে হাটে জিনিস কিনতে বের হন। একসঙ্গে বসে দু'জনকে গল্প করতেও শুনেছি। গল্প করার সময় চিত্তদা খুব হাসতেন। কিন্তু ধরণী পণ্ডিত কখনো হাসতেন না। চিত্তদা খুব জোরে জোরে কথা বলতেন, ধরণী পণ্ডিত এত আস্তে বলতেন যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বললে আমরা শুধু তাঁর মুখনাড়াটুকুই দেখতে পেতাম।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম, ধরণী পণ্ডিত আর চিত্তদা ভিন্ন হয়ে গেলেন। দু'জনেই ভিন্ন উনুনে রান্না করেন। একসঙ্গে বসে গল্প দু'জনকে করতেও আর দেখিনি।

পড়াতে পড়াতে একদিন ধরণী পণ্ডিত হঠাৎ শরতের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন—তোমার আঙুলে ওটা কি?

আমরা তাকিয়ে দেখলাম, শরতের আঙুলে একটা সোনার আংটি, তার মধ্যে একটা দামী পাথর বসানো।

ধরণী পণ্ডিত আবার বললেন—ওটা কিসের পাথর?

শরৎ—পোখরাজ, পণ্ডিতমশাই।

ধরণী পণ্ডিত—খুলে রেখে দিও। ওসব পরতে নেই। ভয়ানক খারাপ জিনিস।

শরৎ—বড়দি উপহার দিয়েছেন, পণ্ডিত মশাই।

ধরণী পণ্ডিত বেশ গম্ভীর হয়ে শক্ত করে বললেন—যেই উপহার দিক ওসব পরে স্কুলে এস না।

শরৎ—কেন, পণ্ডিত মশাই?

ধরণী পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে বললেন—অমঙ্গল হয়।

ঘণ্টা বাজলো। ধরণী পণ্ডিতের ক্লাস শেষ হলো। এইবার এলেন চিত্তদা।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা জিজ্ঞেস করলাম—আংটিতে দামী পাথর থাকলে অমঙ্গল হয় নাকি, চিত্তদা?

চিত্তদা একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন—কেন? কি হয়েছে?

আমরা উত্তর দিলাম—ধরণী পণ্ডিতমশাই বলছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চিত্তদা বললেন—মিথ্যে কথা। আমি জানি, খুব মঙ্গল হয়।

পরের দিন ক্লাসে আবার শরতের আংটির দিকে তাকালেন ধরণী পণ্ডিত। তাঁর মুখটা হঠাৎ আরো বিমর্ষ হয়ে উঠলো। আমরা ভাবছিলাম, তিনি হয়তো রাগ করে আবার ধমক-ধামক করবেন। কিন্তু অবাধ্যতার জন্য শরৎকে কিছুই বললেন না ধরণী পণ্ডিত। নিজের মনে পড়িয়ে যেতে লাগলেন—দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে...।

আমাদেরই অস্বস্তি হচ্ছিল। মায়া হচ্ছিল। রাগ করে একটা কথাও কেন বললেন না ধরণী পণ্ডিত?

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করার জন্য যেই পড়া থামিয়েছেন ধরণী পণ্ডিত, অমনি আমরা বলে ফেললাম—চিত্তদা বলছিলেন...।

ধরণী পণ্ডিত একটু আগ্রহ করে বললেন—কি বলছিলেন?

—তিনি বলছিলেন যে, দামী পাথরটাথর পরলে খুব মঙ্গল হয়।

বই বন্ধ করে ধরণী পণ্ডিত আর একবার কেশে নিলেন। তারপর বললেন—শোন।

আমরা শুনতে আরম্ভ করলাম—'অনেক যুগ আগে পৃথিবীতে বল নামে এক অসুর ছিল। এই বলাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত হারিয়ে দিয়েছিল। শেষকালে দেবতারা একটা যজ্ঞের আয়োজন করলেন। কয়েকজন দেবতা বলাসুরের কাছে গিয়ে বললেন যে—আমাদের যজ্ঞে উৎসর্গ করার জন্য কোন পশু খুঁজে পাচ্ছি না, আপনার শরীরটা আমাদের ভিক্ষে দিন। বলাসুর খুশী হয়ে পশুরূপ ধারণ করে দেবতাদের যজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করে। দেবতারা বলাসুরের মৃতদেহটা নিয়ে আনন্দে আকাশপথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময়

বলাসুরের শরীর খণ্ড খণ্ড হয়ে পৃথিবীর নদী সমুদ্র পর্বত ও জঙ্গলের ওপর পড়তে লাগলো। সে বলাসুরের হাড়ই হলো রত্ন। মণিমুক্তা পদ্মরাগ, মরকত, নীলা, যত রকম রত্ন বা দামী পাথর পৃথিবীতে আছে, সবই হলো বলাসুরের হাড়।'

এত গম্ভীর ভাবে ও এত শান্ত হয়ে গল্পটা বললেন ধরণী পণ্ডিত যে অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। গল্পটার মধ্যে যেমন আশ্চর্য, তেমনি একটা আবছা ভয়ও লুকিয়েছিল। বলাসুরের হাড়, দেবতাদের যজ্ঞে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর টুকরো টুকরো হয়ে আকাশ থেকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। হীরা নীলা পদ্মরাগ মরকত হয়ে মাটি আর পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে বলাসুরের হাড়। সত্যিই ছুঁতে একটু ভয় হয়।

আমরা বললাম—পণ্ডিতমশাই, তাহলে শরতের আংটির এই পোখরাজটাও বলাসুরের হাড়।

ধরণী পণ্ডিত মাথা নেড়ে বললেন—নিশ্চয়।

ঘণ্টা বাজলো। ধরণী পণ্ডিতের ক্লাস শেষ হলো। চিত্তদা পড়াতে এলেন।

আমরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলাম—বলাসুরের হাড় দেখছেন চিত্তদা? বলাসুরের হাড়?

চিত্তদা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে তারপর বললেন—না, আমি কখনো দেখিনি।

—এই যে রয়েছে চিত্তদা। শরৎ একলাফে চিত্তদার সামনে গিয়ে আংটিটা দেখালো। আমরা চিত্তদাকে একটা নতুন বিদ্যা যেন শেখাচ্ছিলাম। সবাই মিলে বলতে লাগলাম—এই যে চিত্তদা, এই পোখরাজটাই হলো বলাসুরের হাড়।

চিত্তদা—কে বললে?

—ধরণী পণ্ডিতমশাই বললেন।

চিত্তদা যেন ধমক দিয়ে বললেন—মিথ্যে কথা। বলাসুরের হাড় নয়। ওটা একটা দামী পাথর।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—পৃথিবীতে কোত্থেকে এই পাথর এল, চিত্তদা?

চিত্তদা বললেন—শোন।

আমরা শুনতে লাগলাম—'কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীটা ছিল যেমন নরম তেমনি গরম। সেই তরল পৃথিবী টগ বগ করে ফুটতো, ওপরটা দুধের সরের মত জুড়িয়ে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা ও শক্ত হতো, আবার ভেঙে পড়তো। আবার উথলে উঠতো। সেই বিরাট গলিত বস্তুর ক্ষীরে কখনো ঘূর্ণি জাগত, কখনো স্রোতের গড়ানি লাগত। তাপে চাপে আর আঘাতে কখনো দানা বেঁধে, কখনো চূর্ণ হয়ে, কখনো বা থাকে থাকে পাট হয়ে সেই বস্তুর ক্ষীর শক্ত হয়ে উঠলো। তারই মধ্যে আমাদের পৃথিবীর পাথরের খনিটি তৈরী হয়ে গেল। সব পাথরই এভাবে তৈরী হয়েছে। পথের খোয়া পাথর বা শরতের আংটির এই পোখরাজ পাথর, ঐ একই ইতিহাস. একই জিনিস। কোনটা খুব বেশী করে পাওয়া যায়, কোনটা খুব কম।'

চিত্তদার গল্পের শেষটা আমাদের ভাল লাগলো না। গল্পের শেষের দিকে একটু চমকে না উঠলে বড় খারাপ লাগে। কিন্তু চিত্তদা বড় সাদাসিধে ভাবে গল্পের শেষটা এবং সেই সঙ্গে শরতের পোখরাজটাকেও যেন মাটি করে দিলেন। সোজা কিনা বলে দিলেন—রাস্তার পাথর আর পোখরাজ একই জিনিস! আমাদের সন্দেহ হলো।

আমরা বললাম—সত্যিই কি একই জিনিস চিত্তদা? তবে হীরের দাম কেন...।

চিত্তদা বললেন—একেবারে এক জিনিস। চুন, কয়লা, কালি আর হীরা, নীলা, ফিরোজা, পোখরাজ, ওসব একই জিনিস। সবই কাজের জিনিস, সবই ভাল জিনিস, সবই মঙ্গলের জিনিস। যেটা কম করে পাওয়া যায় তার দাম বেশী, আর যেটা বেশী করে পাওয়া যায়

তার দাম কম।

ধরণী পণ্ডিত আর চিত্তদা যদিও নতুন টিচার, তবু আমরা কিছুদিনের মধ্যে অনেক খবর জেনে ফেললাম। একটু দুঃখ হতো ধরণী পণ্ডিতের জন্য। খুব বড়লোকের ছেলে ছিলেন ধরণী পণ্ডিত, কিন্তু আজ তাঁর দেশের ভিটে পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেছে দেনার দায়ে। রোগ নেই, তবু ভয়ানক রোগীর মত দেখতে। কারও সঙ্গে মেশেন না, হাসেন না। কোন মেলামেশা বা উৎসবে তাঁকে দেখতে পাই না। শুধু ভেবে ভেবেই যেন রুগিয়ে গেছেন ধরণী পণ্ডিত মশাই।

সপ্তাহের মধ্যে মাত্র একটি দিন ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের মুখটা বেশ হাসি হাসি দেখাতো। প্রত্যেক শনিবার বিকেল বেলায় তিনি স্কুলের ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়াতে বের হতেন। সোজা চলে যেতেন ইংলিশ রোড ধরে, কতগুলি বই আর ফুল হাতে নিয়ে।

আমরা জানতাম, তিনি কোথায় যেতেন। ইংলিশ রোডের ওপরেই ছোট একটা বাংলোর মত বাড়ি ছিল, নাম ছায়াবীথি। বাড়িটার ফটকে দুটো ফর্সা চেহারার কচি ইউকালিপ্‌টাস্ ছিল। আমাদের বই খাতা সুগন্ধ করার জন্যে আমরা মাঝে মাঝে ছায়াবীথির ইউকালিপ্‌টাসের পাতা ছিঁড়ে আনতে যেতাম। বাড়িটার একটা জানালা দিয়ে প্রায় সব সময় খুব সুন্দর সেতার বাজনার শব্দ শোনা যেত। আমরা জানতাম, নিভাদি সেতার বাজাচ্ছেন। ইউকালিপ্‌টাসের পাতা ছিঁড়তে দেখেও নিভাদি কখনও আমাদের বকতেন না। বরং জিজ্ঞাসা করতেন—তোমাদের ধরণী পণ্ডিত মশাই কেমন আছেন?

প্রত্যেক শনিবারে এই ছায়াবীথিতেই বেড়াতে আসতেন ধরণী পণ্ডিত মশাই। হঠাৎ একটা খবর শুনে আমরা একদিন ছায়াবীথিতে এসে একেবারে জানালার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম—নিভাদি!

নিভাদি বললেন—কি?

আমরা বললাম—এবার থেকে আপনাকে গুর্বী বলে ডাকবো নিভাদি।

নিভাদি বললেন—কেন?

আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম—আপনি একটুও বাংলা ব্যাকরণ জানেন না নিভাদি!

কানু বলে ফেললো—ধরণী পণ্ডিত মশাই যদি আমাদের গুরু হন, তবে আপনি হলেন...।

নিভাদি গম্ভীর হয়ে বললেন—এরকম কথা বলতে নেই।

কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না, বলতে দোষ কি? হেড মাস্টার মশাইকেই তো আমরা বলতে শুনেছি, ধরণী পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে নিভাদির বিয়ের কথা হচ্ছে। হলেই তো ভাল।

চিত্তদার জন্য আমাদের কোন দুঃখ নেই, যদিও খুব গরীব লোকের ছেলে চিত্তদা। অল্পদিনের মধ্যে শহরের সবাই তাঁকে চিনে ফেলেছে। শুনলাম, এইবার বড়দিনে নববান্ধব সমিতি যে চন্দ্রগুপ্ত থিয়েটার করবে, তাতে চিত্তদাই সেকেন্দারের পার্ট নিয়েছেন। চিত্তদার খ্যাতি শুনে আমরা খুশীই হতাম। কিন্তু ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের জন্য মায়া হতো। চন্দ্রগুপ্তের প্লে'তে ধরণী পণ্ডিত মশাইকেও ইচ্ছে করলে একটা পার্ট নিশ্চয় দেওয়া যায়। চাণক্যের পার্টে খুবই ভালো মানাতো তাঁকে, যদি শুধু তিনি একটু রাগতে জানতেন। কিন্তু ধরণী পণ্ডিত মশাই বড় উদাস, বড় বিষণ্ণ আর বড় আস্তে আস্তে কথা বলেন। একেবারে রাগতে পারেন না, চেঁচাতে পারেন না।

চন্দ্রগুপ্ত থিয়েটার হয়ে যাবার কিছুদিন পর আমরা একটা উলটো খবর শুনলাম। নিভাদির সঙ্গে নাকি চিত্তদারই বিয়ে হবে। সনাতনের বাবা হেড মাস্টার মশাইকে এই কথা বলছিলেন।

আবার আমরা একদিন ছায়াবীথির জানালার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম—নিভাদি!

নিভাদি বললেন—কি খবর?

আমরা বললাম—এবার থেকে আপনাকে মিস্‌ট্রেস্‌ বলে ডাকবো নিভাদি।

নিভাদি খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন—কেন?

আমরা বললাম—আপনি একটুও ইংরিজী গ্রামার জানেন না নিভাদি।

কানু বলে ফেললো—চিত্তদা যদি আমাদের মাস্টার হন, তাহলে আপনি হলেন...।

নিভাদি প্রথমে হেসে ফেললেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—ধরণী পণ্ডিত আর চিত্তদা, এ দু'জনের মধ্যে কে ভাল বল তো?

আমরা সবাই বললাম—চিত্তদা! চিত্তদা!

শুধু ইউকালিপ্‌টাসের পাতা নয়, ছায়াবীথির কতগুলি নতুন পপি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে এলাম আমরা। নিভাদি একটুও আপত্তি করলেন না।

সেদিন মাইকেলের কবিতা পড়াচ্ছিলেন ধরণী পণ্ডিত মশাই—মাটি কাটি লভি কোহিনুর...।

হঠাৎ পড়া বন্ধ করে ধরণী পণ্ডিত বললেন—এইখানে হঠাৎ একটা মিথ্যা কথা বলে ফেলেছেন মাইকেল। মাটি কেটে কখনও কোহিনুর পাওয়া যায় না, কোনো রত্নই কখনো পাওয়া যায় না। কত লোকে সারা জীবন ধরে রত্ন খুঁজে খুঁজে শেষে পাগল হয়ে গেছে। লোকে ভুল করে বলাসুরের সুন্দর সুন্দর হাড় ঘরে এনে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখে। কিন্তু একদিন না একদিন সেই রত্ন হারিয়ে যায়। রত্ন কারো আপন হয় না। তাকে পাওয়া যায় না, পেলেও থাকে না! যে জিনিসকে রত্ন বলে মনে করবে, সেই জিনিসই হারিয়ে যাবে। রত্ন কথাটাই অমঙ্গলের কথা।

কথা বলার সময় ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের চোখ দুটো কেমন যেন ছলছল করছিল। ঘণ্টা বাজলো। ধরণী পণ্ডিত মশাই ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন।

ক্লাসে ঢুকলেন চিত্তদা। আমরা বললাম—মাইকেল মিথ্যে কথা লিখে গেছেন চিত্তদা। 'মাটি কাটি লভি কোহিনুর' হয় না। রত্ন কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না।

চিত্তদা—কে বললে?

—ধরণী পণ্ডিত মশাই বলছিলেন।

চিত্তদা—মিথ্যে কথা। আমি জানি, খুঁজলেই রত্ন পাওয়া যায়। কিন্তু খোঁজবার মত মন, বুদ্ধি ও সাহস থাকা চাই।

আমরা বললাম—আমাদের মন, বুদ্ধি, সাহস সবই আছে চিত্তদা, আমরাও খুঁজলে রত্ন পাব তো?

চিত্তদা বললেন—হ্যাঁ। তবে তার সঙ্গে একটা কৌশলও জানা চাই।

আমরা বললাম—কৌশলটা আমাদের বলে দিন চিত্তদা।

চিত্তদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—শোন।

আমরা শুনতে লাগলাম—একটা জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। এর নাম আল্‌ট্রা-ভায়লেট ল্যাম্প। টর্চের কাঁচ খুলে ফেলে সেখানে একটি নীলরঙা কাঁচ বসিয়ে নেবে। রাত্রিবেলা অন্ধকারে যেখানে ভাঙা পাথর নুড়ি দেখবে, তার ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখবে। এইভাবে খুঁজতে থাকবে। হঠাৎ হয়তো দেখবে কোন একটা নুড়ি থেকে সবুজ আলো ঠিকরে পড়েছে। তখুনি সেই সবুজ আলোটাকে গিয়ে চেপে ধরবে। এই সবুজ আলোর নুড়িটাই হয়তো মরকত। আবার হঠাৎ দেখবে একটা খুব শান্ত পাতলা নীল আলো...।

বাস্‌, আর কোন সন্দেহ নেই, চিত্তদাকে আজ আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছিলাম! চিত্তদার কথায় আজ যত অবহেলার মাটি নুড়ি আর পাথর যেন রত্ন হয়ে গেছে। উপদেশটা

আমাদের ধ্যানের মত হয়ে উঠলো। সকলেই এক একটা টর্চের মুখে নীল কাঁচ জুড়ে দিয়ে আল্‌ট্রা-ভায়লেট ল্যাম্প তৈরী করে ফেললাম। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম, যদি কোনো মতে একটা রাত্রিতে অন্তত দু'ঘণ্টার জন্য বাইরে বের হবার সুযোগ পাই, তবে...।

সুযোগ পেয়ে গেলাম আমরা জন্মাষ্টমীর দিন সন্ধ্যাবেলা। হরিসভায় কীর্তন শুনবার অনুমতি পেলাম বাড়ি থেকে। বিধু বলাই মন্টি কানুও এল। আমরা ছোট একটি রত্ন শিকারীর দল, নীল কাঁচের টর্চ নিয়ে বড় ঝিলের পাশ দিয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে দৌড়ে চলে গেলাম। মাঠে নামলাম। আরও কিছুদূর এগিয়ে একটা দেবদারুর বাগান পার হলাম। তার পরেই গিয়ে দাঁড়ালাম কোনার নামে একটা পাহাড়ী নদীর বালিয়াড়ীর ওপর। ঝিরঝির করে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। অজস্র কালো কালো নুড়ি ছড়িয়ে আছে, যেন গাদা গাদা অন্ধকারের কুঁড়ি ঝরে পড়ে রয়েছে চারদিকে।

এক সঙ্গে পাঁচটা নীল কাঁচের টর্চের আলো ফেলে পা টিপে টিপে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলছিলাম। কেউ কথা বলছিলাম না। শব্দ করে ফেললে, রত্নগুলি যেন নিভে যাবে। পায়ে মশা কামড়াচ্ছিল, চোখে পোকা উড়ে এসে পড়ছিল, কাঁকর বিঁধছিল, হোঁচট খাচ্ছিলাম। তবু আমাদের ধৈর্য ঠিক ছিল। রত্ন শিকার করতে চলেছি, আর এতটুকু কষ্ট সইতে পারবো না?

একটি ঘণ্টা হেঁটে হেঁটে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। পায়ের তলায় নুড়িগুলি বেশ জোরে শব্দ করে মড়মড় করছিল। সামনে পেছনে দু'পাশে, ভোঁতা ভোঁতা ভাঙা ভাঙা বিশ্রী বেরসিক যত নুড়ি স্থির হয়ে পড়ে আছে। আমাদের হাতের নীল কাঁচের টর্চগুলি সেই নিঃস্ব নুড়ির পৃথিবীতে এক অপ্রাপ্যের আশায় বৃথাই ঘুরে মরতে লাগলো।

কানু হঠাৎ রাগ করে বলে ফেললো—ঘেঁচু, চিত্তদা ভয়ানক মিথ্যাবাদী।

মন্টি হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে সাপের মত শুধু নিঃশ্বাস দিয়ে হিস্‌হিস্‌ করে বললো—ঐ যে, ঐ যে, চুপ চুপ চুপ।

সবাই চুপ করে গেলাম, আমাদের বুকের ভেতর নিঃশ্বাস লাফাতে আরম্ভ করলো। একটু দূরে জলে ভেজা একটা নুড়ির গাদার ওপরে ঝকঝকে সবুজ একটা আলো ফুটে রয়েছে! শিকারীর বন্দুকের মত লক্ষ্য ঠিক রেখে মন্টি তার টর্চ ধরে আনন্দে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। বিধু বললো—মরকত মরকত! সবুজ আলো!

বলাই ধমক দিয়ে বললো—চেঁচিয়ো না।

এক পা দু' পা করে সেই সবুজ দ্যুতিময় মরকতকে বন্দী করার জন্য আমরা হাত তুলে এগিয়ে চললাম। বিধু পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে প্রস্তুত হয়ে রইল।

সবুজ আলোটাকে খপ করে ধরতে গিয়েই চমকে গিয়ে হাত সরিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সবাই তাকিয়ে রইলাম সেই সবুজ রহস্যের দিকে। কেন্নোর মত চেহারা, দু' ইঞ্চি লম্বা একটা পোকা। গায়ে আঠার মত কি লেগে আছে। পোকাটা শান্ত হয়ে গুটিয়ে পাকিয়ে পড়েছিল। আমাদের সব কৌতূহলকে ধন্য করে দিয়ে পোকাটা ছোট্ট একটা শুঁড় তুলে একবার নড়ে উঠলো।

তখুনি ফিরে গেলাম আমরা। অন্ধকারে দৌড়ে ফিরবার সময় আমাদের বেশ ভয় করছিল। বার বার ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের গল্প মনে পড়ছিল। 'বলাসুরের হাড়। খুঁজে খুঁজে লোকে পাগল হয়ে যায়।' মনে পড়তেই খুব জোরে দৌড়তে লাগলাম আমরা। ছেলেমানুষ পেয়ে চিত্তদা আমাদের মিছিমিছি একটা বাজে কথা বলে এত কষ্ট দিলেন। আর বিশ্বাস করছি না চিত্তদাকে। ধরণী পণ্ডিত মশাই সত্যি খাঁটি লোক। যা বলেন, ঠিকই বলেন। তাই তিনি এত গম্ভীর।

পরদিন স্কুলে গিয়েই আমরা একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। একদল পুলিস এসেছে।

চিত্তদাকে কোমরে দড়ি বেঁধে দু'জন পুলিস আগলে রেখেছে। দারোগাবাবু নতুন কুয়োর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কুলিরা কুয়োর তোলা মাটি আর পাথরের ঢিবিগুলি খুঁড়ছে। তল্লাসী হচ্ছে।

আমরা দল বেঁধে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটাকে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ ঠুং করে একটা শব্দ হলো। কুলিরা আর পুলিসেরা চেঁচিয়ে উঠলো--পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে। সেই ভীড়ের ফাঁকে মুহূর্তের মধ্যেই আমরা দেখলাম, দারোগাবাবু একটা চকচকে জিনিস হাতে তুলে নিলেন। একটা কুলি আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখ বড় বড় করে বলে গেল--পিস্তল! পিস্তল!

চিত্তদাকে নিয়ে দারোগাবাবু আর পুলিসেরা চলে গেল। ঘণ্টা বাজলো। ক্লাস বসলো। ধরণী পণ্ডিত মশাই তেমনি শান্ত আর গম্ভীর হয়ে পড়িয়ে গেলেন। আবার ঘণ্টা বাজলো। ধরণী পণ্ডিত চলে গেলেন। এবার হেড মাস্টার মশাই ক্লাসে ঢুকলেন। আজ আর চিত্তদা নেই।

আমরা ভাবছিলাম চিত্তদার কথা। কাল রাত্রে আমাদের ব্যর্থ রত্ন শিকারের কথাও আর মনে ছিল না। চিত্তদার ওপর সব রাগ ভুলে গেলাম আমরা।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, খেলা শেষ হয়ে গেলেও স্কুলের মাঠে আমরা চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। মণ্টি পকেট থেকে নীল কাঁচের টর্চ বের করে হঠাৎ সুর করে বললো--মাটি কাটি লভি কোহিনুর। আবার রত্ন শিকার করবো আজ।

আবার আমাদের রত্ন-অভিযান আরম্ভ হলো। সন্ধ্যের অন্ধকারে নতুন কুয়োর তোলা মাটি আর পাথরের ওপর নীল কাঁচের টর্চের আলো ফেলে, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলাম। আজ আমাদের কেন জানি বিশ্বাস হচ্ছিল, চিত্তদার কথা মিথ্যে নয়। আর একটু ভাল করে খুঁজলেই হয়তো একটা সবুজ নুড়ির আলো ফিক করে হেসে উঠবে এইখানে। কিম্বা ঠুং করে একটা শব্দ হবে, অথবা চকচক করে উঠবে মুহূর্তের মধ্যে একটা...।

একটা কালো ছায়ার মূর্তি আচমকা আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে কর্কশ স্বরে বললো--এখানে কি করছো তোমরা?

ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের গলার স্বর প্রথমে বুঝতে পারিনি। তাই চমকে অপ্রস্তুত হয়ে বললাম--রত্ন-শিকার খেলা করছি, পণ্ডিত মশাই।

ধরণী পণ্ডিত আরও কর্কশ স্বরে বললেন--কি বললে--

--আল্‌ট্রা-ভায়লেট ল্যাম্পের খেলা, পণ্ডিত মশাই।

হঠাৎ ধরণী পণ্ডিতের কর্কশ স্বর দুর্বল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললেন--রত্ন-শিকার?

--আজ্ঞে হ্যাঁ, পণ্ডিত মশাই।

ধরণী পণ্ডিত--তা, এখানে কেন?

আমরা কোন উত্তর দিলাম না। ধরণী পণ্ডিত মশাইয়ের গলার স্বর যেন কাঁদ-কাঁদ হয়ে কেঁপে উঠলো--এত জায়গা থাকতে এখানে কেন খুঁজতে এসেছ তোমরা? কে বললে তোমাদের এখানে রত্ন পাওয়া যায়? সত্যি করে বল, এখানে কেন এসেছ? আমি জানতে চাই।

আমরাই বেশী আশ্চর্য হলাম। এত গম্ভীর ধরণী পণ্ডিত, কেন এত ছটফট করছেন? একটু চুপ করে থেকেই আবার হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন ধরণী পণ্ডিত--আমি তোমাদের বার বার বলেছি, রত্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। ওসব একটা কথার কথা। কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। বলাসুরের হাড়ের গল্প বললাম, তবু তোমাদের বিশ্বাস হলো না? কি খুঁজতে এসেছ এখানে? কি খুঁজতে?

আমরা ভয়ে ভয়ে বললাম--পিস্তল খুঁজতে, পণ্ডিত মশাই!

ধরণী পণ্ডিত চেঁচিয়ে উঠলেন--পিস্তল? পিস্তলও কি একটা রত্ন হয়ে গেল? ভুল ভুল

ভুল...।

ধরণী পণ্ডিত মশাই যেন একটা যন্ত্রণার মধ্যে ছটফট করছিলেন। তাঁর ছায়ামূর্তিটা ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলে গেল।

এর তিনদিন পরেই ৫ই আষাঢ়ের একটা সন্ধ্যায় আমরা ধরণী পণ্ডিত মশাইকে একেবারে শেষ বিদায় দিয়ে এলাম পাকুড় তলার শ্মশানে। আত্মহত্যা করেছিলেন ধরণী পণ্ডিত। গঙ্গাস্তোত্র গাইবার জন্য হেড মাস্টার মশাই আমাদের সবাইকে শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্মশানের সিঁড়িতে বসে সনাতনের বাবা হেড মাস্টারের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমরা সবাই শুনতে পেলাম, ধরণী পণ্ডিত মশাই পুলিসে খবর দিয়ে চিণ্ডদাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যে হতেই চিতাটা পুড়ে পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে এল। জল ছিটিয়ে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ শেষ করে আমরা চলে আসছিলাম। মণ্টি হঠাৎ পকেট থেকে নীল কাঁচের টর্চটা বের করলো।

নিভন্ত চিতার ওপব টর্চের নীল আলো ছড়িয়ে পড়তেই ছোট ছোট লাল জ্বলন্ত অঙ্গারগুলি স্নিগ্ধ সবুজ আলোকের টুকরোর মত শোভাময় হয়ে উঠলো। বলাসুরের টুকরো টুকরো হাড় সত্যিই রত্ন হয়ে গেছে। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

একদিন লাটসাহেব হয়েছিলাম

কাঁকুলিয়া। পয়লা কার্তিক। স্নেহের পুতুল ঃ

অনেকদিন আগে আমি একবার লাটসাহেব হয়েছিলাম...।

এই চিঠিটা পেয়ে, প্রথম লাইনটা পড়েই তুমি নিশ্চয় হেসে ফেলবে। মনে মনে বলবে— মেজকাকুটা আবার যা-তা লিখতে আরম্ভ করেছে! বার বার বলেছি যে মিথ্যে গল্প শুনতে চাই না, তবু কেন যে...।

কিন্তু বিশ্বাস কর পুতুল, সত্যিই আমি একদিন লাট সাহেব হয়েছিলাম। এখন এখানে কাঁকুলিয়ার বাতাসে গাছপালায় আর পাখির ডাকে একটু একটু শীতের আমেজ লেগেছে। ভোর বেলার নতুন রোদ বেশ মিষ্টি হয়ে উঠছে। এখন তোমায় চিঠি লিখছি। এই সময় কি মিথ্যে গল্পটল্প মনে আসে? আজকের হেমন্তের চোরা শীতের মত ধূর্ত একটা কাহিনী মনের ভেতর সিরসির করে উঠছে। সেই কাহিনী শোন।

এর নাম ঠগীকাহিনী। ভাবছো, তোমাকে ঠকাবার জন্য এই কাহিনীটা তৈরী করেছি? না, তা নয়। কাহিনীটা খুবই সত্যি, সত্যিই আমি একবার লাট সাহেব হয়েছিলাম।

ঠগীদের কাহিনী কি আগে কখনো শোননি? ভারতবর্ষের ইতিহাসের বই পড়লেই জানতে পারবে যে, উত্তর ভারতে ঠগী নামে একটা খুনী মানুষের দল ছিল। পথে ঘাটে এরা ভাল মানুষের মত ঘুরে বেড়াতো। ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী, বরযাত্রী বা গেরস্থ, যেকোন পথিকের সঙ্গে পথের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে মেলামেশা করতো। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে...।

কি করতো জান? মেরে ফেলতো। আগে মেরে ফেলে, তারপর পথিকের টাকাকড়ি নিয়ে সরে পড়তো।

ঠগীদের চেহারা দেখে কিন্তু কারও চেনবার উপায় ছিল না যে মানুষটা কে? ছুরি ছোরা তলোয়ার দূরে থাক একগাছি লাঠিও এরা হাতে রাখতো না। শুধু কাঁধে একখানি গামছা ঝুলতো। কপালে একটা তিলক।

কিন্তু ঐ নিরীহ তুচ্ছ গামছাটি যে কত হিংস্র হতে পারে, ঠগীরা পৃথিবীতে সেই সত্য

হাতে হাতে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। বেচারা তীর্থযাত্রী হয়তো গাছতলায় রান্না চড়িয়ে আনমনা হয়ে কি ভাবছে, বন্ধুবেশী ঠগী অমনি আলগোছে তার পেছনে গিয়ে মাথায় একটা ফাঁস লাগিয়ে ঘাড়টা উল্টো দিকে মুচড়ে নামিয়ে দিল।

এইরকম ছিল ঠগীদের খুন করার আর্ট। এরা ভবানী বা দেবী মাতার পূজো করতো। হিন্দু মুসলমান সব জাতেরই ঠগী ছিল। এদের একটা গুপ্ত সাঙ্কেতিক ভাষা ও ইসারা ছিল, সেই জন্য একজন ঠগী অনায়াসে আর একজন অচেনা-ঠগীকে চিনে নিতে পারতো। কাক যেমন কাকের মাংস খায় না, এক ঠগী তেমনি কখনো অন্য ঠগীকে মারতো না। অনেক বড় বড় জমিদার ও পণ্ডিত লোকেও ঠগী ছিল। ঠগীগিরি একটা ব্যবসা ছিল মাত্র। উঃ, কী ভয়ানক ব্যবসা!

ঠগীদের মধ্যে একটা রীতি ছিল, যে-মানুষকে তারা খুন করতো তার লাস তুলে নিয়ে একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে বড় একটা গর্তে ফেলে দিত। ঠগীরা নিজের নিজের এলাকায় এই সব গর্ত নিজেরাই তৈরী করে রাখতো।

ঠগী গড়্হা অর্থাৎ ঠগীদের তৈরী এই ধরণের গুপ্ত কবরের গর্ত খোঁজ করলে অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের হাজারিবাগ শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা ঠগী গড়্হা আছে। অনেক দিন আগে সেই ঠগী গড়্হা আমি একবার দেখতে গিয়েছিলাম। আজকের মতই হেমন্তের একটি সকাল বেলায় মোটর বাসে চড়ে জায়গাটার কাছে পৌঁছলাম।

জায়গাটার নাম রবার্টগঞ্জ। নামটা শুনে বড় আশ্চর্য লাগলো। ঠগী গড়্হার জায়গায় রবার্টগঞ্জ! সেদিনে আর আজকের দিনে কত তফাত! সেই ঠগীর দল সাবাড় হয়ে গেছে অনেকদিন। সব ঠগী গড়্হার চিহ্নও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখানেও দেখলাম, গড়্হাটা প্রায় বুজে গিয়ে ভরাট হয়ে এসেছে। শুধু রবার্টগঞ্জের চেহারাটাই বড় হয়ে চোখে পড়ে। কাছেই একটা ডাক বাংলো। আর একটু দূরে একটা গির্জার চূড়া। কে জানে কতদিন আগে এক রবার্ট সাহেব এসে এখানে একটা গালার কুঠি খুলেছিলেন। তাই এর নাম রবার্টগঞ্জ। কিন্তু শুধু নামে নয়, সমস্ত জায়গাটাই কেমন যেন সাহেব সাহেব হয়ে গিয়েছে।

সড়ক থেকে মাঠে নেমে খানিক দূর এসেই ঠগী গড়্হা দেখতে পেলাম। সেইখানে মাঠের ঘাসের ওপর বসে মুগ্ধ হয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখছিলাম। অনেক দূরে ছোট পাহাড়ের ঢালুতে একটা গাঁয়ের চেহারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঢং ঢং ঢং, গির্জার ঘণ্টা একটানা বেজে চলেছে। উঁচু নীচু মাঠটা আকাশের কোল পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। কোথাও এক টুকরো শালবন, কোথাও বা ঘেসো ফুলে ছাওয়া। আবার কোথাও বা কাঁকুরে মাটির লাল প্রলেপ। সড়কের দু'পাশে সাদা সাদা লম্বা ইউকালিপ্‌টাস্ দু'সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রবার্ট সাহেবের ভাঙা কুঠির স্তূপের ওপর একটা পপলার গাছ চুপচাপ যেন গলা উঁচু করে চারদিকের নিঃশব্দতাকে পাহারা দিয়ে আগলে রেখেছে। ডাক বাংলোর গড়নটাও বিলেতের কোন গেঁয়ো সরাইয়ের মত। লাল টালির চালার ওপর সবুজ আলপনার মত আইভি লতাগুলি এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে আছি, দুটি গাঁয়ের মেয়ে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে কি-একটা জিনিস বেচবার জন্য এগিয়ে এসে বললো--ফরাঁস বিনি আছে, নেবেন বাবু?

ফরাঁস বিনি অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ বীন। রবার্টগঞ্জের পাহাড়ী ক্ষেতে এই ফরাঁস বিনি ফলেছে। স্টেশনের বাজারে বিক্রি করার জন্য চাষী মেয়ে দুটি চলেছে। দু'জন লোক কাঁধে কুডুল নিয়ে কাঠ কাটতে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। একজনের নাম আর্থার আর একজনের নাম ইম্যানুয়েল। বাঃ খাসা ইংরেজী নাম। ওরা সবাই খৃষ্টান।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ছিল। কতগুলি ছন্নছাড়া মেঘের টুকরো আকাশে ভেসে চলেছিল।

মেঘের ছায়াগুলি মাঠের ওপর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যাচ্ছিল। বাতাসও একটু জোরে বইতে শুরু করে দিল। একদল নেংটিপরা কালো কালো ছোট ছেলে ডাক বাংলোর সামনে চোরধরা খেলছিল। বসে বসে শুনছিলাম, ছেলেরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছড়া গেয়ে চোর গুনছে, কে চোর হবে?

"হু হান্‌ড্রেড টেরিটারি এসি বেসি বয়
টিপ্ টাপ্ গামলা সাফ্"

ছড়ার ভাষাটাও যে ইংরিজী হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য! আর কি বাকী রইলো?

না, সত্যিই ঠগী গড়্‌হা ভরাট হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। ঠগী গড়্‌হার দিকে তাকিয়ে সমস্ত মনটা যেন দেড়শো বছর আগেকার একটা পুরনো পাপকে নিঃশব্দে ঠাট্টা করে উঠলো —কই, আজ কোথায় তোমার সেই ভণ্ড ধূর্ত নিষ্ঠুর গামছার গর্ব? ভেবেছিলে, চিরদিন নিরীহ পথিকের লাস গিলে গিলে...।

বেশ নিশ্চিন্ত মনে, যেন ক্লান্ত হয়ে বসেছিলাম। আকাশের মেঘের ছায়াটা আরও ঘন হয়ে উঠছিল। ছোট ছেলেরা কখন খেলা সেরে চলে গেছে জানি না। একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে চোখ বুঁজে নিঝুম হয়ে বসেছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠে চোখ খুলে তাকালাম, কে যেন বেশ জোরে জোরে কাশছে।

তাকানো মাত্র বুকের ভেতর যেন দম ফুরিয়ে গেল! হঠাৎ একটা আতঙ্কে আমার হাত-পায়ের গাঁটগুলিও ঢিলে হয়ে ভেতরে ভেতরে খুলে গেল। দৌড়ে পালিয়ে যাবার বুদ্ধিও হলো না, ক্ষমতাও বোধ হয় ছিল না। একটা লোক, ভয়ানক চিমড়ে চেহারা, মাথার চুলগুলি সাদা, চোখ দুটো জবার কুঁড়ির মত লাল আর ভেজা ভেজা। ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল। লোকটা বেশ বুড়ো হয়েছে, মুখের রং খুব ফর্সা, নাকের রং সিমেন্টের মত। ঠিক নাকের ডগার ওপর একটা কালো আঁচিল, যেন একটা ডাগর ভীমরুল কামড় দিয়ে বসে রয়েছে।

লোকটা পলকহীন চোখে আমাকে দেখতে দেখতে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটার গায়ে কোন জামা নেই। মোটা মোটা রগ আর জিরজিরে হাড়ের তৈরী বুকটা ঢিপ ঢিপ করে হাঁপাচ্ছে! একটা নোংরা ছেঁড়া পায়জামা, দু'হাঁটুর কাছে দু'টো বড় ফুটো, ভেতর থেকে হাঁটুর চাকতি দুটো উঁকি দিচ্ছে। দেখলাম, কাঁধে একটা গামছা ঝুলছে।

সর্বনাশ! সেই গামছা! না, আর দেরী করা উচিত নয়। তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে একটা সেলাম জানালো। ঘড় ঘড় করে ঘেয়ো গলার স্বরে বললো—হুজুর।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে তুমি?

—আমি আপনার খিদ্‌মত্‌গার হুজুর, আপনার সেবার জন্য যা করতে হবে হুকুম করুন। আমি এই ডাকবাংলোর খানসামা।

—কি নাম তোমার?

—ভঁদু ওস্তাদ।

—তা আমার কাছে কি দরকার?

—আমার কোন দরকার নেই হুজুর। আপনার দরকারের জন্যই আমি এসেছি।

তখনো ভঁদু ওস্তাদের কাঁধে গামছাটা ঝুলছে। আমার মনের ভেতর সন্দেহটাও দুলছে! জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিলো—সত্যি করে বল, তুমি সত্যিই ভঁদু ওস্তাদ তো? না, দেড়শো বছর আগেকার সেই ভয়ানক গামছা বাহিনীর একটি বিশিষ্ট নেতা?

ভঁদু ওস্তাদ গদগদ ভাবে বললো—আপনার লাঞ্চ রেডি আছে হুজুর। শুধু একবার কষ্ট

করে চলে আসুন।

—লাঞ্চ কি?

ভাত খাবার ভঙ্গীতে মুখে হাত দিয়ে ভঁদু আমাকে বুঝিয়ে বললো—লাঞ্চ লাঞ্চ।

বুঝলাম, লাঞ্চ অর্থাৎ লাঞ্চ অর্থাৎ সাহেবী খানা।

ভয় ভেঙে গেল, ক্ষিদেও পেয়েছিল। ভঁদু ওস্তাদকে এতক্ষণে চিনতে পারলাম। নিজের ভুল বুঝে মনে মনে হাসলাম।

একটু পরেই খুব ব্যস্ত হয়ে এসে ভঁদু ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করলো—একটা দশ টাকার নোটের বদলে চেঞ্জ দিতে পারেন হুজুর?

আমি বললাম—না।

ভঁদু ওস্তাদ—তাহলে একটা পাঁচ টাকার নোটের চেঞ্জ দিন।

আমি বললাম—না, তাও নেই।

ভঁদু ওস্তাদ বিমর্ষ ভাবে বললো—একটু চেষ্টা করে দেখুন না হুজুর, নিশ্চয় হবে।

আমার ভয়ানক রাগ হলো। পকেটের ভেতর টাকা পয়সা যা ছিল সবই বের করে নিয়ে ভঁদু ওস্তাদকে দেখিয়ে বললাম—এই তো যা আছে, এতে পাঁচ টাকার চেঞ্জ হয় না। বার বার বলছি, তবু কেন তুমি...।

ভঁদু ওস্তাদ হাত জোর করে বললো—মাপ করবেন হুজুর। আমার নাতিরা পুতুল কিনবে বলে বায়না ধরেছে, তাই অন্তত চারটে টাকা ওদের হাতে দেব ভেবেছিলাম। আমার সবসুদ্ধ চারটি নাতি-নাতিনী হুজুর, প্রত্যেককে অন্তত একটি করে টাকা না দিলে আমার মান থাকে না। যাক, অগত্যা দশ টাকার নোটটাই ওদের দিয়ে দেব।

ডাক-বাংলোর বারান্দায় উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম, দরজা জানালাগুলি ঘন মাকড়সার জালে ছেয়ে আছে। অন্তত দশ বছরের মধ্যে কোন অতিথি নিশ্চয় এখানে আসেনি। ভঁদু ওস্তাদ বললো—অনেক দিন পরে আপনার মত এক সাহেবের সেবা করার সুযোগ পেলাম।

নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে ভঁদু ওস্তাদ হঠাৎ সগর্বে বলে উঠলো—কত কাপ্তেন কার্ণাইল আর নিস্পিটার জেনারেলকে পাঁচ মিনিটে লাঞ্চ তৈরী করে খাইয়েছে এই ভঁদু ওস্তাদ। স্বয়ং লাটসাহেব এই বারান্দায় ঠিক এইখানে বসে আমার তৈরী মুর্গীর রোস্ট খেয়ে গেছেন।

ঘরের ভেতর থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল ভঁদু ওস্তাদ। গামছা দিয়ে চেয়ারের ধুলো ঘসে ঘসে মুছলো। চেয়ারের একটা পায়া ভাঙা ঠ্যাং-এর মত বেঁকে ছিল। পাঁচ মিনিট ধরে ঠোকাঠুকি করে, একটা দড়ি দিয়ে পায়াটাকে শক্ত করে বেঁধে, ভঁদু ওস্তাদ চেয়ারটাকে আমার দিকে এগিয়ে দিল—বসুন হুজুর। এই চেয়ারেই লাট সাহেব বসেছিলেন।

সেই চেয়ারের ওপর আমি আস্তে আস্তে খুব সাবধানে বসলাম। লাট সাহেব হতে আরম্ভ করলাম।

ভঁদু ওস্তাদ আবার বললো—একটু অপেক্ষা করুন হুজুর। লাট সাহেবকে যেসব খাবার খাইয়েছিলাম, ঠিক সেই সব খাবার আজ আপনাকে খাওয়াব।

আমার পকেটে মাত্র তিন টাকা দু'আনা পয়সা ছিল। ভঁদু ওস্তাদের কথা শুনে তাই একটু ঘাবড়ে গেলাম। বললাম—না হে খানসামা, সামান্য একটু ডাল ভাত তরকারী হলেই হবে।

ভঁদু ওস্তাদ মাথা নেড়ে বললো—তা হয় না। অনেক দিন পরে আপনার মত সাহেবকে পেয়েছি, আজ মনের সুখে রান্না করে খাওয়াবো, ঠিক লাট সাহেবকে একদিন যেসব খাবার খাইয়েছিলাম।

ভঁদু ওস্তাদ কিছুক্ষণ চুপ করে বিশ্রীভাবে আমার দিকে তাকিয়ে কি জানি কি ভাবতে লাগলো। তারপর পেছন ফিরে বেশ জোরে চেঁচিয়ে ডাকলো—পালোয়ান, পালোয়ান!

ভঁদু ওস্তাদের ডাক শুনে একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এসে বারান্দায় আমার সামনে দাঁড়ালো। ষণ্ডামার্কা চেহারার একটা লোক, হাত দুটো কাদামাখা, বোধ হয় ক্ষেতে কাজ করছিল। লোকটার ভুরু দুটো একজোড়া শুঁয়োপোকার মত, খোঁচা খোঁচা রোঁয়ায় ভরা। তাকালেই মনের ভেতরটা যেন কট কট করে জ্বলতে আর চুলকোতে থাকে।

ভঁদু ওস্তাদ বললো--আমি যাই, আপনার লাঞ্চ তৈরি করি। পালোয়ান রইল আপনার কাছে।

একটু বিরক্ত ও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম--কেন?

ভঁদু ওস্তাদ উত্তর দিল--আপনাকে টেনসন করার জন্য।

টেনসন! কী ভয়ানক দুর্বোধ্য কথা! এ যে সাঙ্কেতিক ভাষা! আবার সন্দেহ জাগলো, কে এরা, এই ভঁদু ওস্তাদ আর পালোয়ান?

আবার ভয় পাবার আগেই ভঁদু ওস্তাদ বললো--এই পালোয়ান লাট সাহেবকেও টেনসন করেছিল।

চিন্তিত ভাবে পালোয়ানের দিকে তাকাতেই পালোয়ান মিলিটারী কায়দায় পা দুটো জোড়া করে, বুক টান করে, হাত তুলে একটা স্যালুট করলো।

এতক্ষণে বুঝলাম, পালোয়ান আমার সম্বন্ধে অ্যাটেন্সন্ হয়ে থাকবে। কখন কি দরকার হয়, বলা তো যায় না। ভঁদু ওস্তাদের ব্যবস্থা ভালই।

ভঁদু ওস্তাদ লাঞ্চ তৈরি করতে চলে গেল। একটু পরেই চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোথা থেকে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগলো। বড় রোগা ও শুকনো শুকনো চেহারার ছেলেমেয়ে। ইসারা করে তাদের কাছে ডাকলাম ও জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ওরা ভঁদু ওস্তাদের নাতিনাতনি। বড় লাজুক ও ভীতু ছেলেমেয়েগুলি।

ভঁদু ওস্তাদের সবচেয়ে ছোট্ট নাতিটাই একটু দুষ্টু গোছের চেহারা। ছেলেটার পেটে আস্তে একটা চিমটি কেটে জিজ্ঞাসা করলাম--কি সাহেব, আজ কি খেয়েছ?

ছেলেটা বললো--কুছ্ নেহি।

আবার প্রশ্ন করলাম--কাল কি খেয়েছ?

ছেলেটা আবার বললো--কুছ্ নেহি।

সঙ্গে সঙ্গে ভঁদু ওস্তাদের ছোট নাতনিটি বলে ফেললো--না বাবু, ও মিথ্যে কথা বলছে। কাল আমরা ইয়া বড় একটা পেঁপে খেয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম--শুধু পেঁপে খেলে কেন?

ভঁদু ওস্তাদের নাতনি বললো--বাড়িতে চাল নেই, আটাও নেই, খাবার জিনিস কিছু নেই।

চারটে পয়সা ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে বললাম--যাও, মিঠাই কিনে খেও।

খুশীতে ব্যস্ত হয়ে ছেলেমেয়েগুলি চলে গেল। বুড়ো ভঁদু ওস্তাদের সংসারটা কত গরীব, তাই যেন স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। বেচারা ভঁদু ওস্তাদ! পায়জামার হাঁটু দুটো পর্যন্ত ফুটো হয়ে গেছে। বড় দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্যও লাগছিল, এত দশ টাকার আর পাঁচ টাকার লম্বা লম্বা মিথ্যেকথাগুলি কেন বলছিল ভঁদু ওস্তাদ?

তখুনি চোখে পড়লো, দূরে বারান্দার এক কোণে নিঃশব্দে বসে পালোয়ান আমার ওপর নজর রাখছে। টেনসন করছে। উঃ, কী বিশ্রী রকমের দৃষ্টি! আবার একসঙ্গে রাগ ও ভয় হতে লাগলো। একটু ছটফট করে উঠলাম। চেয়ারটার ভাঙা পায়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো। আরও ভয় পেয়ে এক লাফে বারান্দা থেকে নেমে সামনের বাগানের ঝাউগাছটার তলায় ঘাসের ওপর গিয়ে বসে রইলাম! পালোয়ানও সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা থেকে একটা লাফ দিয়ে বাগানে নামলো। একটু দূরে একটা আতা গাছের তলায় গিয়ে বসলো। তারপর সেই খোঁচা খোঁচা ভুরুর দৃষ্টি দিয়ে আমাকে টেনসন করতে লাগলো।

নাঃ, আর উদ্ধারের আশা নেই। আবার সন্দেহ হচ্ছে। এখনো সরে পড়ার কি কোন উপায় নেই?

অনেকক্ষণ এই চিন্তার মধ্যেই অস্বস্তিতে ছটফট করছিলাম। হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে দেখলাম, ভঁদু ওস্তাদ একটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে উদ্বিগ্ন ভাবে আর ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে। আমাকে দেখতে পেয়েই আশ্বস্ত হয়ে একেবারে একগাল হেসে বললো—এখানে বসে আছেন হুজুর! বসুন বসুন, কী সুন্দর হাওয়া! চেয়ার ছেড়ে লাট সাহেবও ঠিক এইখানে উঠে এসে বসেছিলেন।

একটু আশ্বস্ত হয়ে ভঁদু ওস্তাদ চলে গেল। তার একটু পরেই এসে বললো—খানা তৈরী হুজুর, আসুন।

আবার উঠে গিয়ে সেই চেয়ারের ওপর শক্ত হয়ে বসলাম। ভঁদু ওস্তাদ গিয়ে ঠেলে ঠেলে একটা নড়বড়ে নোংরা টেবিল নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে দিল। তারপর এল লাঞ্চ। কলাই করা লোহার থালায় মোটা লাল চালের ভাত। ভঁদু বললো—রাইস।

একটা হাতলভাঙা পেয়ালার ঘোলা গঙ্গাজলের মত ডাল নিয়ে এল ভঁদু—এই, আমার হাতের তৈরি সুপ, একবার টেস্ট করে দেখুন হুজুর।

তারপর এল একটা বাটিতে ঢেঁড়সের ঝোল। ভঁদু বললো—এই হলো স্টু। কাস্টার্ড পাউডার ফুরিয়ে গেছে হুজুর, তাই রান্নাটা একটু পাতলা হয়ে গেছে। নইলে দেখতেন...।

সব শেষে একটা মাটির খুরিতে কিছু চটকানো আলুসেদ্ধ নিয়ে এসে ভঁদু টেবিলের ওপর রাখলো—এই নিন হুজুর, এটা হলো ইস্‌মাস্ পোটাটো। অনেক কষ্ট করলাম হুজুর, মেহেরবানি করে একটা সার্টিফিকেট আপনাকে দিতেই হবে হুজুর।

মনের হাসি মনেতেই চেপে রেখে খাওয়া শেষ করলাম। তবু ভাল, খুব সস্তায় সেরেছি।

এইভাবে মাত্র তিনটি ঘণ্টার জন্য আমি লাট সাহেব হয়েছিলাম, পুতুল। খাওয়া শেষ হলো, আর আমার লাট সাহেবীও ফুরিয়ে গেল।

শহরে ফিরবার মোটর বাস আসবার সময় হয়ে গেছে। ব্যস্ত হয়ে ভঁদু ওস্তাদকে বললাম—কই, তোমার কত বিল হয়েছে বল। আমি এইবার উঠবো।

হাত ধুয়ে এসে ভঁদু ওস্তাদ সামনে দাঁড়ালো। একটা লম্বা সেলাম দিয়ে বললো—বিল আর কত হবে হুজুর, খুব সামান্যই হয়েছে। শুধু আপনি খুশী হয়েছেন জানতে পারলেই আমার মেহন্নত ধন্য হবে।

বললাম—কত দিতে হবে বল? আর দেরী করার সময় নেই আমার।

ভঁদু ওস্তাদ বললো—তিন টাকা এক আনা হুজুর।

মনে মনে চমকে উঠলাম। ঐ যাচ্ছেতাই ডাল ভাত আলুসেদ্ধ আর ঢেঁড়স, তার দাম তিন টাকা এক আনা!

কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য, তিন টাকা এক আনা বলে কেন? কি করেই বা বুঝলো যে, আমার পকেটে শুধু তিন টাকা এক আনাই আছে? তিন টাকা দশ আনা হতে পারতো, দু'আনা হতে পারতো। তা নয়, ঠিক গুনে গুনে তিন টাকা এক আনা!

বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেন জানি ভয়ে সির সির করে উঠলো। কে এরা? পকেটময় সংসারের অন্তর্যামী, এরা কে?

দেখলাম, ভঁদু খানসামার কাঁধের গামছাটা দুলছে, দূরে দাঁড়িয়ে পালোয়ান তার খোঁচা খোঁচা ভুরুর দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে আমাকে টেনসন করছে।

তিন টাকা এক আনা, পকেট থেকে সর্বস্ব বের করে দিয়ে, একরকম হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে দৌড়ে সড়কের ওপর এসে দাঁড়ালাম। মোটর বাসে যদি দয়া করে তুলে না নেয়, তবে

হেঁটেই রওনা হতে হবে। অতীতের ঠগী গড়্হা প্রায় ভরাট হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। দেখে একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু আধুনিক রবার্টগঞ্জের নতুন গামছা কী সাংঘাতিক! আর এক মুহূর্ত এখানে নয়!

তারপর মোটর বাসের আশায় অনেকক্ষণ সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার ঘাড়ের কাছটা থেকে থেকে টন টন করে উঠছিল!

তোমার কি মনে হয় পুতুল? জিরজিরে হাড়ের তৈরি যার বুকটা টিপ টিপ করছে, যার নোংবা ছেঁড়া পায়জামার হাঁটুর কাছে দুটো বড় বড় ফুটো, যার নাতি-নাতনি দু'দিন ধরে না খেয়ে রয়েছে, ঐ বুড়ো ভঁদু ওস্তাদ—সে কি সত্যিই ঠগী? কেন সে আমাকে ভাত আর ঢেঁড়সের ঝোল খাইয়ে তিনটি টাকা আর একটি আনা ঠকিয়ে আদায় করে নিল?

বৃষকেতু ক্যাসাবিয়াংকা আর আমাদের গবু

কাঁকুলিয়া। পয়লা অগ্রহায়ণ। স্নেহের পুতুল ঃ

তোমার চিঠি পেলাম। কিছুক্ষণ আগে পাশের বাড়ির ছাদের ওপর একটা মুখপোড়া হনুমান বেশ ভদ্রভাবে বসেছিল। পাড়ার যত দুষ্টু ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে, চীৎকার করে আর পিচকারী দিয়ে জল ছিটিয়ে হনুমানটাকে ভয়ানক বিরক্ত করেছে। হনুমানটা চলে গেছে। দুষ্টু ছেলেদের হল্লা এখন আর নেই।

তাহলে একটা দুষ্টু ছেলের গল্পই আজ লিখি। কেমন?

আচ্ছা থাক, দুষ্টু ছেলের গল্প না হয় আর একদিন বলবো। কত লোকেই তো দুষ্টু ছেলেদের নিন্দে করে কত গল্প লিখেছে। কিন্তু দুষ্টু বাবাদের গল্প কেউ লেখে না কেন? পৃথিবীতে কি বাবারা দুষ্টু হয় না? অম্বিকে মাস্টার পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে দুষ্টু ছেলের বিরুদ্ধে চুগলি করেছেন—

> "শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো।
> পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
> এমন নিরেট বুদ্ধি।
> পাতাগুলি দুষ্টুমি করে কেটে রেখে দেয়,
> বলে ইঁদুরে কেটেছে।
> এত বড় বাঁদর।"

শুনলে তো পুতুল, অম্বিকে মাস্টার কী ভয়ানক খারাপ খারাপ কথা বলেছে দুষ্টু ছেলের নামে? কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ অম্বিকে মাস্টারের কথা একেবারে গ্রাহ্য করেননি ; বরং তিনি বলেছেন—শিশুপাঠে লেখা ঐ কবিতাগুলো দুষ্টু ছেলে পড়বে কেন? দুষ্টু ছেলেদের নিজেদের যদি একটি কবি থাকতো, তার লেখা নিশ্চয় পড়তো ওরা।

বুড়ো কবিরা যা লেখে, তার মধ্যে দুষ্টু ছেলের হাসি-কান্নার কথা নেই। তাই আমারও বলতে ইচ্ছে করে, হে অম্বিকে মাস্টারের দল, দুষ্টু ছেলেকে কখনো বকুনি দিও না বরং যারা ভাল ছেলে, তাদের বকে দিয়ো।

লব কুশ দু'ভাই দুষ্টু ছিল। বনের ভেতর অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটক করে বেঁধে রেখেছিল। লক্ষ্মণকে হারিয়ে দিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু বাবা রামচন্দ্রই বা কি কম দুষ্টু ছিলেন? তিনিই তো সীতাকে বনে পাঠিয়েছিলেন। সব দুঃখ সহ্য করে দুষ্টু দু'ভাই বনের মধ্যেই মানুষ হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে যদি লব-কুশের সমবয়সী কোন ছোট্ট বাল্মীকি

থাকতো, তবে রামচন্দ্রের এই অপরাধকে কখনো সে ক্ষমা করতো না। রামচন্দ্র কত হাজার রাক্ষস মেরেছেন, সে-গল্প হাজার হাজার শ্লোক দিয়ে কখনোই লিখতো না সে। রামায়ণের নামটাই হয়তো সে বদলে দিয়ে লিখতো ছোট্ট একটি ছড়ার বই—"এক দুষ্টু বাবার কাহিনী"।

পুরাণে ও মহাকাব্যে অনেক মহৎ ছোটছেলের গল্প আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, সেগুলি সবই দুষ্টু বাবাদের গল্প। বুড়ো কবিরা অবশ্য খুব ঘটা করে এই সব মহৎ ছোট ছেলের প্রশংসা করছেন। কিন্তু খুব ঘটা করে দুষ্টু বাবাদের নিন্দে করেননি। শুধু প্রহ্লাদে আর ধ্রুবের বাবা সামান্য একটু গালমন্দ খেয়েছেন কবিদের হাতে। হিরণ্যকশিপু আর উত্তানপাদ—কী ভয়ানক দুটি দুষ্টু বাপ! কোন দুষ্টু ছেলে আজ পর্যন্ত এত ভয়ানক হতে পারেনি। তবু পৃথিবীতে শুধু দুষ্টু ছেলেদেরই নিন্দে বেশী।

বাবাদের নিন্দে করছি না, পুতুল। কত বাবা ছেলের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু ছোট ছেলেরাও বাবার জন্য প্রাণ দিয়েছে। এই রকমের দুটি ছোট ছেলের পিতৃভক্তির কথা আমার সব সময় মনে পড়ে—কর্ণের ছেলে বৃষকেতু, আর ক্যাসাবিয়াঙ্কা। ছোট ছেলেরা শুধুই যে দুষ্টু হয়, তা নয়। শুধু যে তারা বাবার চশমা ভাঙে, তা নয়। ছোট ছেলেরা মহৎও হয়।

কিন্তু এ সবই পুরনো গল্প। পুরনো গল্প তুমি শুনতে চাও না, আমিও পুরনো গল্প বলবো না। আমি আজ যার গল্প বলবো, সেই ছোট ছেলেটির নাম গবু।

বৃষকেতু, ক্যাসাবিয়াঙ্কা আর গবু। এই তিনজনের মধ্যে আমি কাকে সবচেয়ে বড় বলবো, বল দেখি পুতুল?

এদের মধ্যে পিতৃভক্তির গুণে সবচেয়ে বড় হলো গবু। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা, আগে গবুর গল্পটা শুনে নাও, তারপর আমায় জানাবে যে গবুর মত পিতৃভক্ত কোন ছোট ছেলের গল্প কখনো শুনেছ কি না।

ছেলেবেলায় গবু আমাদের সঙ্গে পড়তো। দুষ্টুমির জন্যই সে বিখ্যাত ছিল। যত অম্বিকে মাস্টারের দল সব সময় গবুর নিন্দে করতো। আমাদের সাবধান করে দিত—গবুর সঙ্গে মিশবে না কেউ।

আমি, কানু, হীরু, ভুতো, বলাই, সবাই অবশ্য কাকা বাবা আর মাস্টারদের সামনে কান ধরে প্রতিজ্ঞা করতাম—না, গবুর সঙ্গে কখখনো মিশবো না।

এখন ভাবতে হাসি পায়। কাকা বাবা আর মাস্টারেরা শুধু বড় বড় বুড়ো কবির লেখা মহাকাব্যের তত্ত্বটুকু বুঝেছেন। আমাদের করুণ মুখের ধূর্ত কাব্যের ছলনাকে এক বর্ণও বুঝতে পারেননি তাঁরা। আমাদের প্রতিজ্ঞাটাকে একেবারেই চিনতে পারতেন না। স্কুলের বাইরে আসা মাত্র এবং ঘরের বাইরে যাওয়া মাত্র আমরা গবুর সঙ্গেই মিশতাম।

গবুর বাবা ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। গবুর মা ছিল না, অন্য ভাইবোন কেউ ছিল না। ঐ অদ্ভুত মানুষটিই ছিল গবুর একমাত্র আপন জন।

গবুর বাবা শহর থেকে দূরে একটা পিঁজরাপোলে ম্যানেজারের কাজ করতেন। সব সময় গাঁজা খেতেন। গবুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখারও বোধ হয় অবসর পেতেন না। স্কুলে আসতো গবু শুধু একটা শ্লেট বগলে নিয়ে। বই খাতা কিছুই ছিল না। স্কুলের মাইনে, পরীক্ষার ফী, কিছুই দিত না গবু। শুধু স্কুলে আসতো, ডাকগাড়ির মত একেবারে নিয়মমত, কোনদিন কামাই হতো না। মাস্টারেরা বারণ করে করে হায়রান হয়ে গেছেন, তবু স্কুলে আসতো গবু, কোন বারণ শুনতো না।

গবুর গায়ের জামাটা নোংরা হয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একেবারে ন্যাকড়া হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ একদিন একটা নতুন কোট দেখতাম গবুর গায়ে। পরে শুনতে পেতাম, কানুর মা দয়া করে দিয়েছেন।

ঘোর বাদলার দিনেও সকাল নটার মধ্যে শহরে চলে আসতো গবু। শ্লেট বগলে নিয়ে

পথে পথে ঘুরে বেড়াতো যতক্ষণ না স্কুলে যাবার সময় হয়। কোনদিন আমাদের পাড়ায় আসতো, কোনদিন হীরুদের পাড়ায়, আবার এক-একদিন বলাইদের পাড়ায়।

হয়তো সকাল বেলা ঘরের ভেতর তখনো পড়ছি, বাড়ির বাইরে রাস্তার ওপর একটা ভাসা-ভাসা ডাক শুনতে পেতাম—ডেহ্‌রি-অন্‌-শোন্‌!

এটা আমাদের বাংলা স্কুলের দলের একটা সাঙ্কেতিক ভাষা। কারও বাড়ির সামনে গিয়ে অসময়ে নাম ধরে ডাকবার উপায় ছিল না। কারণ অসময়ে কাউকে ডাকলে তার কাকা বাবা বা মাস্টার তখুনি তেড়ে আসবেন, বাইরে আসা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তাই এক একদিন হঠাৎ শুনতে পেতাম, বাইরে থেকে গবুর আহ্বান ভেসে আসছে—ডেহ্‌রি-অন্‌-শোন্‌...।

অর্থাৎ, একবার শুধু শুনে যা, বাইরে আয়, সামান্য একটা কথা আছে, খুব গুরুতর কিছু নয়, কোথাও যেতে হবে না।

পড়া ছেড়ে দিয়ে চট করে একবার বাইরে আসতাম।—কি রে গবু?

--কিচ্ছু না, কি করছিস?

--পড়ছি।

—আচ্ছা যা।

ঘরে ফিরে এসে পড়া শেষ করলাম। মাত্র সাড়ে নটা বেজেছে। কাকার সাইকেলটাকে নিয়ে উঠোনের মধ্যে একটু শ্লো-রেস প্র্যাকটিস করছি। আবার বাইরে গবুর ডাক শোনা গেল -গোলোক ধাম! গোলোক ধাম!

অর্থাৎ একটা কাজের কথা আছে। অত্যন্ত জরুরী কথা, এখুনি না শুনলে নয়।

ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলাম, গবু রাস্তার ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।—কি খবর রে গবু?

--স্কুলে যাবার সময় কাগজে মুড়ে খানিকটা নুন নিয়ে যাবি, বুঝলি? ভুলিস না।

--আচ্ছা।

ঘরে ফিরে এসে স্নান সেরে নিলাম। দশটা বেজেছে, খেতে বসবো এখুনি। আবার বাইরে ডাক শোনা গেল—বহুব্রীহি! বহুব্রীহি!

অর্থাৎ বহু বিপদ, বহু কাজ। এক মুহূর্ত দেরি করলে চলবে না। এখুনি বাইরে চলে এস, হয়তো অনেক দূরে এক জায়গায় যেতে হবে। হয়তো মিশন স্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পুলের কাছে, একটা মারামারি হবে, এক্ষুনি তৈরী হতে হবে।

দৌড়ে বাইরে চলে এলাম। গবু বললো—তোর খাওয়া হয়ে গেছে?

—না।

—আচ্ছা, তুই খেয়ে নে, আমি ততক্ষণ দাঁড়াচ্ছি। আজ আমার আর খাওয়া হলো না। আর সময়ও নেই।

রাগ হলো গবুর ওপর। এই সামান্য একটা কথা বলবার জন্য বহুব্রীহি দেবার কোন দরকার ছিল না। মিছামিছি কী ভয়ানক চমকে উঠেছিলাম!

কিন্তু ঘরে ফিরেই মা'র কাছে গিয়ে চুপিচুপি বলতাম--মা, গবুর এখনও খাওয়া হয়নি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মা আশ্চর্য হয়ে বলতেন--ডেকে নিয়ে আয় গবুকে। ভাত খেয়ে যাক।

এই ভাবে ডাক দিয়ে দিয়েই জীবন চলছিল গবুর। সেজন্য গবুর এতটুকু দুঃখ ছিল না। কী তেজই ছিল ওর রোগা হাড়ে! এক টাট্টু ঘোড়ার চাট খেয়ে গবুর হাঁটুটা ফুলে উঠলো একদিন। তার পর কটা দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলো গবু। তারপর যে-কে-সেই।

গাঁজা খেয়ে খেয়েই গবুর বাবার চাকরিটা গেল। গবুর বাবা দস্তুর মত ভিক্ষে করতে

আরম্ভ করলেন। সবার কাছেই হাত পাততেন গবুর বাবা।—শুধু ছেলেটার জন্যই ভাবছি, স্যার। মাতৃহারা ছেলে। শুধু ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার ছাড়তে পারি না। নইলে সন্ন্যাসী হয়ে যেতাম, স্যার। কিন্তু এই মাতৃহারা ছেলেকে মানুষ করতে হবে স্যার। তাই প্রার্থনা, একটা টাকা যদি দয়া করে দিতেন তবে...।

যত সব মিথ্যে কথা। তবুও প্রথম প্রথম সবাই সত্যি দয়া করে টাকাটা দিয়ে দিতেন। গবুর বাবাও গাঁজা খেয়ে টাকাটার সদ্ব্যবহার করতেন। কিন্তু গবুর বাবার চালাকি বেশী দিন চলেনি। কেউ আর গবুর বাবাকে বিশ্বাস করতেন না। কেউ তাঁকে আর সাহায্য করতেন না।

মাঝে মাঝে গবুর কাছেই গবুর বাবার নামে আমরা নিন্দে করতাম—তোর বাবা খুব গাঁজা খায়, না রে গবু?

গবু বলতো—মিথ্যা কথা।

আমরা হেসে ফেলতাম, গবুর ওপর রাগও হতো। কী পিতৃভক্ত ছেলে!

গবুর মিথ্যা কথা শুনতে আমাদের খুব আশ্চর্য লাগতো। ভূতো জিজ্ঞাসা করতো—তোর বাবা কি কাজ করে রে গবু? চাকরি করে না কেন? তোকে জামা কাপড় কিনে দেয় না, স্কুলের মাইনে দেয় না, পড়ার বই দেয় না, কেন রে গবু?

গবু বলতো—বাবার একটুও সময় নেই, এত কাজ। সমস্ত দিন ম্যানেজারী করতে হয়, কত জায়গা যেতে হয়। সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে হয়, রাজাদের সঙ্গে দেখা করতে হয়...।

মিথ্যে কথা বলতে বলতে শেষ দিকে একটুখানি সত্য কথা বলে ফেলেছে গবু। হ্যাঁ, গবুর বাবা তখন সত্যিই রোজ এক রাজার সঙ্গে দেখা করতেন। এই রাজাটি শহরে নতুন এসেছেন নিজের রোগের চিকিৎসার জন্য। খুব খারাপ একটা রোগ, পেটের ভেতরে বিষ-ঘা না কি-একটা হয়েছে। সব ডাক্তার কবরেজ হাকিম জবাব দিয়ে দিয়েছেন—এ রোগ সারবার নয়। রাজাসাহেবের আয়ু আর বেশী দিন নয়।

রাজাসাহেবের বাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসে যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন। আমরা শুনতে পেলাম, ঐ সন্ন্যাসী রাজাসাহেবকে সারিয়ে তুলবেন মন্ত্রের জোরে।

গবুর বাবা রোজই যেতেন রাজাসাহেবের বাড়ি। বারান্দার সিঁড়িতে বসে থাকতেন। যতক্ষণ না অন্তত একটা সিকি বা আধুলি ভিক্ষে পেতেন, ততক্ষণ নড়তেন না। কি আর করবেন গবুর বাবা? এ ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। শহরে সবাই গবুর বাবাকে ভাল করে চেনেন, গেঁজেলকে কেউ সাহায্য করতে চান না। এখন তাঁর একমাত্র ভরসা এই রাজাসাহেবের বাড়ি।

কদিন পরই আমরা ভয়ানক একটা খবর পেলাম। আমাদের স্কুলের মালী শিবু একটা খবর দিল।—ঐ বেটা রাজাসাহেব চলে না গেলে এ-শহরে ভয়ানক একটা অমঙ্গল হবে।

—কেন শিবু?

—রাজাসাহেবের ঐ সন্ন্যাসীটাই হলো সবচেয়ে ভয়ানক জীব।

—কেন?

—বেতালসিদ্ধ সন্ন্যাসী।

—তাতে কি হয়েছে?

—অনেক টাকা দিয়ে একটা মানুষ কিনতে চাইছেন রাজাসাহেব। ঐ সন্ন্যাসী মন্ত্রের জোরে রাজার রোগ চালান করে দেবেন অন্য একজনের শরীরে। তাই মানুষ খুঁজছেন রাজাসাহেব।

চোখ দুটো আতঙ্কে বড় বড় করে শিবু শেষে আপসোস করলো—দেখা যাক, কার কপালে কি আছে? খুব সাবধানে থাকবে খোকারা, খুব সাবধান।

হ্যাঁ, খুব সাবধানে থাকা উচিত। কেন জানি আমাদের সবারই চট করে মনে পড়ে গেল

গবুর কথা। সবচেয়ে আগে গবুরই সাবধান হওয়া উচিত।

গবুকে আমরা সবাই মিলে খুব ভাল করে বুঝিয়ে বললাম—বিশ্বাস নেই রে গবু। তোর বাবা রোজ রাজাসাহেবের বাড়ি যাচ্ছেন, টাকা নিয়ে আসেন। শেষকালে সন্ন্যাসীটা তোর ওপরেই...।

আমরা ভয়ে-ভয়ে, কেঁপে-কেঁপে, ফিস-ফিস করে এত বড় একটা বিপদের কথা বললাম, সব কথা চুপ করে শুনলো গবু। তার পরেই একটা কাঁচা তেঁতুল পকেট থেকে বের করে চুষতে আরম্ভ করলো, একটুও ভয় পেল না, একটা কথা বললো না।

রাগ করেই আমরা গবুকে বললাম—তোরই কপালে বিপদ আছে, জেনে রাখিস!

গবুর জন্য তোমারও নিশ্চয় খুব দুঃখ হচ্ছে, না পুতুল? হ্যাঁ, দুঃখ হবারই কথা। বৃষকেতুর গল্প পড়ে আমারও একদিন এই রকম দুঃখ হয়েছিল। কী ভয়ানক গল্প! শ্রীকৃষ্ণ একদিন এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণের ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন—ব্রাহ্মণের ক্ষুধা শান্তি কর। যা-তা খাবার হলে চলবে না। তারপরে, বৃষকেতুর দিকে তাকিয়ে সেই ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ বললেন—এই ছোট ছেলেটির কচি মাংস খাব।

কর্ণ কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বৃষকেতু নিজেই তার বাবাকে ভরসা দিল—অতিথি সেবা কর বাবা, ধর্মভ্রষ্ট হয়ো না। আমাকে মেরে আমার মাংস খেতে দাও ব্রাহ্মণকে।

পিতৃভক্ত বৃষকেতু! বাপের ধর্মের জন্য নিজেকে খুশী মনে বলি দিতে রাজী হলো। কিন্তু বাবা হয়েও কী বোকা এই কর্ণ? মানুষ-খেকো ব্রাহ্মণটার নাকে একটা ঘুসি মারতে পারলো না। ছোটছেলে বৃষকেতুকে কাটতে গেল নিজের ধর্মের জন্য? ছি ছি! থাকতো যদি একটি ছোট বেদব্যাস, একটি ছোটভারত নিশ্চয় সে লিখে ফেলতো। তাহলে বুঝতো ঠেলা মহাবীর কর্ণ।

ক্যাসাবিয়াঙ্কার কথাও মনে পড়ছে। বাবা বলে গেছেন, যতক্ষণ তিনি না ফেরেন, ততক্ষণ যেন ক্যাসাবিয়াঙ্কা কোথাও না যায়! জাহাজে আগুন লাগলো। ক্যাসাবিয়াঙ্কা তবু এক পা নড়ে না, বাবা যে বারণ করে গেছেন। সেইখানে দাঁড়িয়ে পুড়ে মরে গেল ছোট ছেলে ক্যাসাবিয়াঙ্কা।

ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে একটু বোকা-বোকা ছেলে মনে হয় না কি পুতুল? আমার তো তাই মনে হয়। ক্যাসাবিয়াঙ্কার বোঝা উচিত ছিল যে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে না মরে যদি দূরে সরে গিয়ে সে বাঁচতো, তবে তার বাবা নিশ্চয় দুঃখিত হতেন না। তবু তাকে পিতৃভক্ত বলতে পারি। শুধু বাবার একটা কথা রাখতে গিয়ে নিজেকে বলি দিল। কিন্তু ক্যাসাবিয়াঙ্কার বাবাটাই বা কি কম বোকা? বুড়ো হয়েও স্পষ্ট করে কথা বলতে জানেন না। কথাগুলি একটু ভেবেচিন্তে বলা উচিত ছিল তাঁর।

আর আমাদের গবু? তিন চারদিন ধরে গবুর কোন খোঁজ না পেয়ে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। সেদিন রবিবার ছিল। গবু নেই, গুলি-ডাণ্ডা তেমন করে জমে উঠছিল না। গবুকে খুঁজতে বের হলাম আমরা।

আমি, হীরু, কানু, ভুতো, বলাই, ঘুরতে ঘুরতে রাজাসাহেবের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলাম।

রাজাসাহেবের বাড়ির ফটকটা বন্ধ রয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভেতরের কোন লোককে দেখা যায় না।

বলাই বললো—আমি দেখছি।

একটা গাছে চড়ে একবার রাজাসাহেবের বাড়ির বারান্দার দিকে তাকালো বলাই। তারপরেই যেন ভয় পেয়ে সর সর করে নেমে এসে বললো—গবু বসে রয়েছে চুপ করে, মুখ চুন করে। গবুর বাবা দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করছে।

আর কিছু বুঝতে বাকী নেই আমাদের। গবুর বাবা টাকা নিয়ে গবুকে বিক্রী করে দিয়েছেন রাজাসাহেবের কাছে। এইবার সেই ভয়ানক সন্ন্যাসীটা মন্ত্র পড়ে রাজাসাহেবের রোগ চালান করবে গবুর শরীরে। সত্যি সত্যিই গবু এবার রোগে ভুগে ভুগে মরে যাবে।

কটা মিনিট আমরা রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছটফট করলাম, ভুতোর চোখ ছলছল করছিল। কি করে গবুকে বাঁচানো যায়? কি উপায়? একবার যদি বাইরে আসতে পারতো গবুটা, তাহলে...।

ফটকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ভুতো একবার টেনে টেনে ছলছল স্বরে ডাক দিল—ডেহ্‌রি-অন্‌-শোন...।

বোধ হয় শুনতে পেয়েছে গবু। কিন্তু বৃথাই আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আমাদের সামান্য একটা কথা শোনার জন্য গবু আর বাইরে এল না।

কানু বললো—ওতে হবে না। আমি ডাকছি।

চেঁচিয়ে জোর গলায় কানু একটা গর্জন ছাড়লো—গোলোক ধাম, গোলক ধাম...!

কিছুক্ষণ একটা স্তব্ধতা। ফটকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, এই গবু এল বুঝি! কিন্তু এল না। কী বোকা ছেলে গবু! তবু বোকাটাকে বাঁচাতেই হবে। ফটকের কাছে রাস্তার ওপর দৌড়ে দৌড়ে হীরু চরম বিপদের সঙ্কেত হাঁক দিয়ে শোনাতে লাগলো—বহু ব্রীহি! বহু ব্রীহি! বহু ব্রীহি...!

এ ডাক নিশ্চয় গবুর কানে পৌঁছেছে। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, বহু বিপদ, ভয়ানক বিপদ, এখুনি বাইরে এস, এখুনি অনেক দূরে পালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আমরা শুধু ডেকে ডেকে হাঁপিয়ে পড়লাম পুতুল। গবু বাইরে এল না।

কেন আসবে গবু? ও যে বৃষকেতু আর ক্যাসাবিয়াঙ্কার চেয়ে অনেক বড়। বাপের ধর্মের জন্য নয়, বাপের মুখের কথার জন্য নয়, শুধু বাবার গাঁজার জন্য প্রাণ দিতে তৈরী হয়ে এসেছে গবু।

গবুর হৃদয় বুঝবার মত কোন কবি নেই। গবুর কথা কেউ জানে না। কবিরা মস্ত বড় আর মস্ত বুড়ো। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—"থাকতো ওর নিজের জগতের কবি...।"

প্রবন্ধ

বুদ্ধবাণী—গণমুক্তির প্রথম অঙ্গীকার

সেই মহান পরিনির্বাণ যেন সত্যই এক মহান অভিযাত্রার সমাপ্তি। চলেছেন তথাগত। শুধু এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গে শিষ্য আনন্দ। রাজগৃহের গৃধ্রকূট, নালন্দার পাবারিক আম্রবন, তারপর বৈশালীর চাপাল চৈত্য। গঙ্গাতটের পথরেখা ধরে আরও দূরে, যেন কোন এক পরম গন্তব্যের অভিমুখে এগিয়ে চললেন তথাগত। জম্বুগ্রাম, আম্রগ্রাম এবং ভোগনগর। তারপর পাবাপুরী, কাকুত্থ নদীর শীতল জলে স্নান করলেন তথাগত। চুন্দের উপহার সেই শূকরকন্দকেই ভোজ্যরূপে গ্রহণ করে নিলেন। তারপর নদী হিরণ্যবতী, অপর পারে কুশিনারা। হিরণ্যবতী পার হয়ে এসে প্রান্তরের এক তরুকুঞ্জের নিভৃতে যমক শালতরুর ছায়াতলে সিংহভঙ্গীতে শরীর এলিয়ে দিলেন। শালতরুতে তখন পুষ্পের উৎসব জেগে উঠেছে। আজ হতে আড়াই হাজার বছর আগে শালপুষ্পের সুরভিপূত একটি লগ্নে পরিনির্বাণ লাভ করলেন তথাগত বুদ্ধ।

সেই জীবন এবং সেই জীবনের বাণী, উভয়ই মানুষ জাতির ইতিহাসেরই এক বিরাট বিস্ময়। সেই বিস্ময় আজও পৃথিবীর মানুষের চিন্তায় বিপুল এক জিজ্ঞাসার প্রেরণা সঞ্চারিত ক'রে চলেছে। প্রশ্ন জাগে মনে, ভারতের সেই বুদ্ধের বাণী কেন এবং কেমন করে মন্ত্রময় সৌরভের মত এশিয়া মহাদেশের মন জয় করে নিয়েছিল? জরা জন্ম মরণের বন্ধন ক্ষয় করে দুঃখ হতে পরম মুক্তির পথের পরিচয় এবং নির্বাণসুখের আনন্দতত্ত্ব যিনি জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর জীবন ও বাণীর মহত্ত্বের 'বিচার' করবার দুঃসাহস প্রকাশ করতে চাই না, সেই মহত্ত্বকে শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছা করে। 'লাইট অব এশিয়া'র রচয়িতা এডুইন আরনল্ড তাঁর কাব্যের উপসংহারে বলেছেন--ফরগিভ দি ফীব্‌ল্ স্ক্রিপট্, এই দুর্বল রচনাকে ক্ষমা কর! 'মেজারিং উইথ লিট্‌ল্ উইট দাই লফ্‌টি লভ্!' সামান্য ধারণাশক্তি নিয়ে তথাগত বুদ্ধের সেই অলোকসাধারণ প্রেমের মহিমাকে পরিমাপ করতে গিয়ে নিজের দুঃসাহসে নিজেই লজ্জিত হয়েছিলেন এডুইন আরনল্ড। বুদ্ধের জীবন ও বাণীর মর্ম বিচার করতে গিয়ে অনেকেরই লেখনীর পক্ষে এই ভীরুতা স্বাভাবিক।

কবি এডুইন আরনল্ড তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ ঐ লাইট অব এশিয়ার ভূমিকাতেই নানা কথার মধ্যে বিশেষ যে একটি কথা বলেছেন, সেই কথাটারই গুরুত্ব গৌরব ও তাৎপর্য স্মরণ করতে চাই। বুদ্ধের জীবন ও বাণীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আরনল্ড বলেছেন, সেই বাণীর মধ্যে এমন এক ঘোষণা আছে, যা হলো—দি প্রাউডেস্ট আসার্সন এভার মেড অব হিউম্যান ফ্রীডম, মানবিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে পৃথিবীতে এযাবৎ যত ঘোষণা হয়েছে, তার মধ্যে বুদ্ধবাণীই হলো মহত্তম ঘোষণা।

সত্যই তো, মহাবগ্‌গ যে অমৃতের অধিকার গ্রহণ করবার জন্যই মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছে—অপারূতাং তেসা অমত্তস্‌স দ্বারা, যে সোতবন্তে পমুঞ্চন্ত সদ্ধং! অমৃতের দ্বার খুলে গিয়েছে, যার কান আছে সে এই প্রেরণাবাণী শ্রবণ কর, এই আহ্বানে জেগে উঠবার, উঠে দাঁড়াবার এবং এগিয়ে গিয়ে এক পরম প্রাপ্যকে অধিগত করবার আহ্বান। এই বাণী দুঃখ জয়ের বাণী, দুঃখের আধিপত্যকে ভীতচিত্তে স্বীকার করে নেবার জন্য অনুরোধ নয়। এই বাণী নির্ভয় আনন্দের আহ্বান।

বুদ্ধ তাঁর সাধনার প্রতি পদক্ষেপেই এই নির্ভয়ের বাণী দিয়ে নিজেকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অজেয় তাঁর সংকল্প। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থি মাংস প্রলয়ঞ্চ যাতু' ; শরীর শুকিয়ে যাক, ত্বক অস্থি মাংস ক্ষয় হয়ে যাক, কিন্তু এই আসন থেকে কেউ আমাকে টলাতে পারবে না। এই প্রতিজ্ঞা ভাগ্যবাদীর প্রতিজ্ঞা নয়, জন্ম-মৃত্যু এবং কর্ম ও সংস্কারের অমোঘ শাসনের প্রতি অসহায়ের আবেদন নয়। এই সংকল্প শৌর্যময় বিদ্রোহের সংকল্প।

মারের ছলনাকে পাল্টা এক প্রতিজ্ঞার ঘোষণা দিয়ে তুচ্ছ করলেন সত্যানুসন্ধানী গৌতম। পর্বতরাজ সুমেরুও যদি স্থানচ্যুত হয় এবং আকাশের সর্ব তারকাসংঘও যদি ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ঈপ্সিত সত্যের সন্ধান হতে নিবৃত্ত হবেন না তিনি।

নৈরঞ্জনা তীরে উরুবিল্ব বনে সম্বোধি লাভ করার পরেও তাঁর মুখে সেই আত্মশক্তির ঘোষণা—গহকারক দিট্‌ঠোহমি পুন গেহং ন কারসি ; রে গৃহকারক, আমি সবই দেখতে পেয়েছি, কিন্তু তুমি আর বন্ধনগৃহ রচনা করতে পারবে না। সব্বা তে ফাসুকা ভগগা গহকূটং বিসঙ্ঘতং, তোমার সব স্তম্ভ জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে, গৃহকূট চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কারণ, বিসঙ্খারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা। আমার চিত্ত প্রমাদরহিত হয়েছে এবং তৃষ্ণার শেষ হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতমের জীবনের প্রথম ঘোষণা হলো, দুঃখহেতুর পরাভব সাধক এক বীরের ঘোষণা।

গৌতম বুদ্ধের জীবনের এই উদাত্ত ভঙ্গীটিই লক্ষ্য করতে হয়। পরিনির্বাণের মুহূর্তেও তিনি সিংহভঙ্গীতে ভূতলশয্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দুঃখনিবৃত্তির তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, মানবজাতির সে এক পরম লাভ। সেই সঙ্গে তিনি যে মানসপ্রকৃতির একটি রূপ নিজের জীবনের ঘটনায় অঙ্কিত করেছিলেন, তাই বা মানুষের জীবনের প্রয়োজনের দিক দিয়ে কি কম লাভ? কল্পনা করতে হয়, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে মানুষের চিন্তার প্রকৃতিকেই কী অভিনব এক গঠন দান করেছিলেন গৌতম। মনের এই প্রকৃতিই মানুষের ব্যক্তিত্বকে কুণ্ঠিত অবস্থার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। আকস্মিকের কাছে শুধু পরাভবের ক্রীড়নক হয়ে থাকতে চাই না, আপন পরিণাম আপন প্রয়াসের পুণ্যে গড়ে তুলতে হবে। সে প্রয়াস কোন ভঙ্গুর সুখের ছলনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয় না। সে প্রয়াস যেন এক উদাত্ত বিদ্রোহের ভঙ্গী দিয়ে রচিত একটি অনুসন্ধানের ধর্ম।

বুদ্ধের জীবন ও বাণী মানুষের কাছে তাঁর আত্মশক্তিরই প্রতি বিশ্বাসের এক বিপুল জাগৃতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে বুদ্ধবাণীর প্রেরণাকে আর একটি প্রথম গৌরবের অধিকার দেওয়া যেতে পারে। তাঁর বাণী সাধারণ মানুষেরই জীবনে নির্ভয়, বিশ্বাস এবং আত্মশক্তিনিষ্ঠ কর্মপ্রেরণার অভ্যুদয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সফলতার অধ্যায় রচনা করেছে। তাঁর বাণীতে গণমুক্তির প্রথম অঙ্গীকার উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। একজন দুজন নয়, একটি শ্রেণী বা দুটি সমাজ নয়, বুদ্ধবাণীর আবেদন স্বীকার করেছিল জনসাধারণ। গৌতম বুদ্ধের প্রচার পরিব্রজ্যার রীতিতেও লক্ষ্য করা যায় যে, যেন তিনি বিশেষভাবে সাধারণ মানুষেরই ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সব চেয়ে বেশি আগ্রহ স্বীকার করেছিলেন। এবিষয়ে আর্য ও অনার্যের অধিকারভেদ তিনি মেনে নিতে পারেন নি। ধনী-দরিদ্র ও জ্ঞানী-মূর্খের অধিকারভেদ স্বীকার করেন নি। এমন কি পুণ্যবান ও পাতকী বলে পরিচিত মানুষের মধ্যেও তিনি অধিকারের প্রভেদ স্বীকার করেন নি। অমৃতের দ্বার সকলেরই জন্য মুক্ত, তিনি সকলকেই সেই পরম প্রাপ্যের পথে এগিয়ে যেতে এবং তার আহ্বান শুনতে উৎসাহিত করেছেন। সাধারণ মানুষের ব্যক্তি-জীবন এবং সমাজ-জীবনকেই তিনি এক অখণ্ড আশাময় প্রকৃতি দিয়ে অভিমণ্ডিত করেছিলেন। আড়াই হাজার বছর আগে মানবজীবনের ইতিহাসে সেই ঘটনাকে জনচেতনারই এক বিপ্লবের সূচনা বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

সন্তান লাভের আশায় ব্রত পালন করবার জন্য সুজাতা বনদেবতাকে পায়সান্ন নিবেদন করবার জন্য অরণ্যের নিভৃতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তপঃক্লিষ্ট গৌতমের শীর্ণ অথচ সুন্দর মুখচ্ছবি চোখে পড়তেই সুজাতার মনে হলো, এই তো বনদেবতা, তার নিবেদিত পায়সান্ন গ্রহণ করার জন্য এই নিভৃতে প্রত্যক্ষ রূপে মূর্ত হয়ে রয়েছেন। পায়সান্ন গ্রহণ করে গৌতম বললেন, আমি দেবতা নই ভদ্রে, আমি তোমারই মত মানুষ।

দেবত্বের প্রতি নয়, আভিজাত্যের প্রতি নয়, সাধারণ মানুষের মানবতার প্রতি গৌতমের এই শ্রদ্ধার ঘোষণা মানুষের ইতিহাসে গণমুক্তির প্রথম সঞ্চারিত মন্ত্রের মত সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল। থেরগাথার কাহিনীগুলিও যেন মানবিক মর্যাদার অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী। আনন্দিত চিত্তে থের বলছেন, আমি সকলের অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র হয়ে সমাজের নীচের স্তরে এক কোণে পড়েছিলাম। কিন্তু তথাগতের বাণী আমার জীবনকে সেই দীনতা থেকে টেনে তুলে এই মহৎ অধিকারে সুপ্রসন্ন করেছে। থেরী গাথার কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়, বুদ্ধবাণীর আহ্বান পতিতাকেও সাধিকায় পরিণত করে শ্রদ্ধার আসনে তার ঠাঁই করে দিয়েছিল। গণিকা আম্রপালীর আতিথ্য গ্রহণ করে বিস্মিত লিচ্ছবিদের তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, মহত্ত্বের অধিকারে ছোট-বড় ভেদ নেই। বুদ্ধ শিষ্য উপালি ক্ষৌরকারের সন্তান। স্থবির শীলবান চণ্ডাল ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ তৎকালীন সমাজের বর্ণ ও বৃত্তির আভিজাতিকতার দাবী সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে সকলের সমান অধিকার এবং সমমর্যাদার যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন, সেই আদর্শ কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাসে নূতন এক শ্রী শক্তি ও প্রতিভার অভ্যুদয় সত্য করে তুলেছিল। ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতিভা সব চেয়ে বৃহৎ ও মহৎ হয়ে এবং বিচিত্রতায় সুন্দর হয়ে কোন যুগে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বৌদ্ধ ভারতেরই ইতিহাসের অধ্যায়গুলির দিকে তাকাতে হয়।

বেদের অপৌরুষেয়তা এবং যাজক-যজমান সম্বন্ধে রচিত ধর্মানুশীলনের রীতি, এই দু'য়ের বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধের বাণীতে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বুদ্ধের এই সিদ্ধান্তের সম্পর্কে প্রশ্নমুখর প্রতিবাদও ভারতের ধর্মগত ইতিহাসের একটি বৃহৎ অধ্যায়। সেই ইতিবৃত্ত ও বাদ-বিসম্বাদের প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও স্বীকার করা যায় যে, বুদ্ধের ঐ দুই ঘোষণা বস্তুত ব্যক্তি-মানবের চিন্তার অধিকার মর্যাদার ও স্বাধীনতার ঘোষণা।

গৌতম বুদ্ধের পরিব্রজ্যা যেন সাধারণ মানুষের হৃদয়জগৎ পর্যটনের জন্য জনজীবনের পথে পথে এক অভিযাত্রিকের যাত্রা। বড় বড় রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে সাধারণ গ্রামজনপদের কুটিরের দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর বাণী-প্রচারের ভাষা, এবং ত্রিপিটকের ভাষাও পালি-প্রাকৃত ; যে-ভাষা মগধের সর্বসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের মুখের ভাষা। সাধারণের কথিত ভাষার প্রতি গৌতম বুদ্ধের এই সম্মান, শুধু সাধারণের মানবিক মর্যাদার প্রতি তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় নয়, সাধারণের কথিত ভাষাকে ধর্মতত্ত্বে প্রচারের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে তিনি জনসাধারণেরই প্রতিভাকে একটি কঠোর প্রতিবন্ধকের আঘাত থেকে মুক্তি দান করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তার শ্রেষ্ঠ চিন্তাকে তারই নিজের ভাষায় প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে, তার প্রতিভাকে সাহিত্যে ও শিল্পে সত্য করে তুলবার সুযোগ পেয়েছিল। পুরোহিত ও পণ্ডিতের অধিকারের অধীনে সংস্কৃত ভাষা জনসাধারণের প্রতিভাকে সাহিত্যগত সৃষ্টিতে সার্থক হবার সুযোগ দান করতে পারে নি। সাধারণের কথিত ভাষাকে অমান্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বুদ্ধ এবং বুদ্ধবাণীই ভারতের ইতিহাসে গণ-অধিকারের একটি শ্রেষ্ঠ সত্যকে প্রথম স্বীকৃতি দান করেছিল।

বৌদ্ধ ভারত জনসাধারণের ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদায় গৌরবান্বিত ভারত। স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং সাহিত্য শ্রেণীবিশেষের প্রতিভা ও অনুশীলনের সঙ্কীর্ণ বৃত্ত থেকে মুক্তিলাভ করে জনসাধারণের প্রতিভা এবং অনুশীলনের সংস্পর্শ লাভের সুযোগ পেয়েছিল। শুধু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাই নয়, জনসাধারণের মানবিক অধিকার ও মর্যাদা যদি বাধামুক্ত হয়, তবে সমাজ ও জাতির রাজনীতিক সংহতিও যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রমাণ বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাস। বৌদ্ধ ভাবনার ব্যাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠার যুগে ভারতের বাইরে থেকে যে-সব বৈদেশিক শক্তি প্রভুত্বের স্পৃহা নিয়ে সশস্ত্র অভিযানের আবেগে ভারতে প্রবেশ করেছে, হয় তারা

বিতাড়িত হয়েছে, নয় ভারতীয়তা স্বীকার করে নিয়ে ভারতের সঙ্গে দেহে-মনে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। শক কনিষ্কের পরিণাম বৌদ্ধ ভারতের সেই রাষ্ট্রীয় শক্তির ঐতিহাসিক উদাহরণ। ভারতের অভ্যন্তরে বহিঃশত্রুর প্রবেশ, এবং তাদের পক্ষে বহির্ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি ও আভিজাত্য নিয়ে শাসক সমাজরূপে অবস্থানের ঘটনা, ঠিক বৌদ্ধ ভারতের ইতিহাসের ঘটনা নয়। ভারতের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সব চেয়ে বড় যুগ বৌদ্ধ ভারতেরই একটি বিপুল কালের অধ্যায়। ভারতের বাইরে, সুদূর মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দ্বীপময় দেশ ও মহাদেশের জনসমাজের জীবনে ভারতের যে সাংস্কৃতিক প্রভাব সত্য হয়ে উঠেছিল, সে সংস্কৃতি বিশেষভাবে বৌদ্ধ ভারতেরই সংস্কৃতি। ভারতের জন-জীবনের ঔপনিবেশিক অভিযাত্রার উৎসাহ, এবং অ্যাডভেঞ্চার বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ দান। সংঘ গঠনের নিয়মতন্ত্রে নির্বাচনী রীতির প্রবর্তন করে ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণসংঘই গনতন্ত্রবাদের একটি পদ্ধতিকে প্রথম ঐতিহাসিক কৃতিত্ব প্রদান করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় নামে প্রচলিত বিদ্যা-নিকেতনের প্রথম আবির্ভাবের রূপ বৌদ্ধ জ্ঞানের নিকেতন নালন্দা বিক্রমশীলা তক্ষশীলা ও ওদন্তপুরীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার 'থেরাপিউসটস্ এবং প্যালেস্টাইনের 'এসেনেস' ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের পরিচালিত শিক্ষা-কেন্দ্র ও প্লিনি ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের লিখিত বিবরণীর এই তথ্য বৌদ্ধ ভারতের সেই মিশনারী আগ্রহের সত্যতা স্মরণ করিয়ে দেয়, যে আগ্রহ জাতির প্রাণশক্তি এবং সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের স্বাভাবিক সৃষ্টি। বিশ্বের কথাসাহিত্য বৌদ্ধ ভারতের কাছে ঋণী। বাইবেলোক্ত কতগুলি কাহিনী যেন বৌদ্ধ সাহিত্যের এবং বুদ্ধজীবনীরই কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি। সিডেল এবং ভ্যান ডেন বার্গ মনে করেন, প্রাচীন প্যালেস্টাইনের ইহুদী সভ্যতার কাছে ভারতের বৌদ্ধ-চিন্তা অপরিচিত ছিল না। বাইবেলের সামারিয়ার নারী এবং দিব্যাবদানের অস্পৃশ্যা মেয়ে প্রকৃতির কাহিনী একই আবেদনের ছায়া বহন করে। তৃষ্ণার্ত ভিক্ষু আনন্দ মাতঙ্গকন্যা প্রকৃতিরই হাতের ছোঁয়া জল চেয়ে নিয়ে পান করে মানবীয় প্রেমের মহত্ত্বকে অভিনন্দিত করেছিলেন। বৌদ্ধ ভারতের শ্রেষ্ঠ গরিমা এই মানব প্রেমের অভ্যুত্থান। অসাম্যে ও অপ্রেমে কুণ্ঠিত গণজীবনকে মুক্তির অঙ্গীকারে উদ্বোধিত করবার সাধনা।

সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা! বৌদ্ধ প্রার্থনার এই লক্ষ্যও যে মানবতার উদারতম আদর্শের প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করে। সম্মুখে যাদের দেখছি, যাদের দেখতে পাচ্ছি না, যারা নিকটে, যারা দূরে, ভুতো বা সম্ভবেসী বা, যারা ছিল এবং যারা আসবে, তারা সকলেই সুখী হউক! মৈত্রী-ভাবনার এত বড় আদর্শের স্বরূপ বৌদ্ধ ভারতেরই চিন্তার সৃষ্টি।

রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই সব প্রত্যয়জ অনুভূতিগুলির দুঃখ হতে মুক্তি লাভের যে ধর্ম তথাগত বুদ্ধের বাণীতে প্রচারিত হয়েছে, সে ধর্ম মানুষ জাতির জীবনে পারমার্থিক তত্ত্বের ইতিহাসে অত্যুচ্চ এক গৌরবের নিদর্শন। আড়াই হাজার বছর আগে পরিনির্বাণ লাভের পূর্ব মুহূর্তে বুদ্ধ তথাগত তাঁর শিষ্য আনন্দকে শেষবারের মত যে-বাণী শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই বাণী কিন্তু মানবিক গৌরবেরই বাণী। তুমি নিজেকেই নিজের প্রদীপ কর আনন্দ—এই বাণী যে মানুষের মনুষ্যত্বেরই গৌরবের স্বীকৃতি।

ভারতের ভাবনার জগৎ হতে বুদ্ধবাণীর প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, একথা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন না। সেই মৈত্রী, সেই করুণা ও সেই অহিংসার আবেদন আধুনিক ভারতের কর্ম ও চিন্তার মধ্যে অনাহত স্রোতোধারার মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মনে পড়ে, গৌতম বুদ্ধের ভূমিস্পর্শ মুদ্রার ইতিহাস। মার যখন বললেন, তুমি যে এত বড় অপ্রমাদের কীর্তি দেখালে, তা কি জগতের কেউ বিশ্বাস করবে? বিফলে গেল তোমার কৃতিত্ব, কারণ কেউ তার সাক্ষী নেই ; বুদ্ধ বললেন—সাক্ষী আছে। এক হাত দিয়ে ভূমিস্পর্শ করলেন বুদ্ধ, সাক্ষী এই পৃথিবী। বুদ্ধবাণীর প্রভাব এবং বুদ্ধজীবনের মহিমা ভারতের সাধারণ জনজীবনের মর্মে ও কর্মে সত্য হয়েই আছে। তার আনুষ্ঠানিক রূপ চোখে না দেখা যাক,

তাতে কি আসে যায়? বুদ্ধের ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় পার্থিব ইতিহাসেরই এক সত্যের প্রতীক অঙ্কিত হয়ে আছে। বুদ্ধের বাণী ও জীবনীর মহিমা এই ভারতের জনজীবনের ইতিহাসে মিশে আছে। ভারতের মনের মাটির পৃথিবী তার সাক্ষী।

ভারতের দেশীয় রাজ্য

মহারাজ রণজিৎ সিংয়ের ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে সারা ভারতবর্ষের মানচিত্রের রং সত্যি সত্যি একদিন লাল হয়ে গেল। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পর সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন এক টুকরোও মাটি রইল না, যা বস্তুত ব্রিটিশ অধিকৃত নয়।

তবুও নেটিভ স্টেট বা দেশীয় রাজ্য নামে ছোট বড় ৫৬২টি ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এগুলিও "স্টেট" অর্থাৎ রাজ্য এবং এর অধিপতিরা রাজা। মুসলিম দেশীয় রাজ্যও আছে, অধিপতিরা নবাব। অধিপতিদের আধুনিক মর্যাদা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রকারভেদে উপাধির তারতম্য আছে। হিন্দু দেশীয় রাজ্যের গদিতে মহারাজা, রাণা, রাজা, রাজাসাহেব, ঠাকুর-সাহেব ইত্যাদি এবং মুসলিম রাজ্যের গদিতে নবাব, আমীর ও খান ইত্যাদি প্রজাপালক সমাসীন রয়েছেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট সরকারীভাবে এঁদের 'হিজ হাইনেস্' বলে সম্বোধন করেন ; ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার কপালে অবশ্য এত উচ্চ সম্বোধন জোটে না। রায়, কুমার, সর্দার ইত্যাদি হ্রস্ব মর্যাদার সম্বোধন নিয়েই এদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের দরবারী গর্ব আর একটু পরিচিত, তিনি হলেন 'হিজ এগজলটেড হাইনেস্।' এদের পোশাক-পরিচ্ছদের ঐশ্বর্য দেবেন্দ্রোপম এবং কটিবদ্ধ তরবারীর দিকে তাকালে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নরপাল বলে মনে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সরকারী খাতায় এইসব দরবার খচিত রাজ্যগুলির মুড়ি-মিছরি দরভেদ নেই--সবাই "বাদররাজ্য" (সাবসিডিয়ারী স্টেটস্) মাত্র।

ব্রিটিশের আমন্ত্রিত এই ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যের অপর নাম "ভারতীয় ভারত" (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া)। সাম্প্রতিক কালে, ১৯৪৩ সালে সম্রাটের প্রতিনিধি (ক্রাউন রিপ্রেসেনটেড) যে অন্তর্ভুক্তি (মার্জার) পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, সেই অনুসারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যকে বড় বড় কয়েকটা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বরোদা ও নবনগর প্রভৃতি কয়েকটি বড় রাজ্যর সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যকে যুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে ধরলে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ৫৬২টির কিছু সামান্য কম হবে, কিন্তু রাজার সংখ্যা ৫৬২টিই আছে।

এই রাজ্যগুলির মধ্যে আকার প্রকার ও ঐশ্বর্যের কত তারতম্য, নিম্নে উল্লিখিত তালিকা থেকেই সে সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে। মি. কে এম পানিক্কার তাঁর লিখিত "দেশীয় রাজ্য" নামক গ্রন্থে (ইণ্ডিয়ান স্টেটস্ : এম পানিক্কার) দেশীয় রাজ্যগুলির মর্যাদাগত তিনটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

রাজ্যের সংখ্যা	রাজ্যের আয়তন বর্গমাইল	রাজ্যের জনসংখ্যা
১। ১৩৫	৫, ৭২, ৯৯৭	৭, ৫১, ০৩, ৪৪৯
২। ১০৮	২০, ৫৭৪	২৫, ১৯, ৯৮৯
৩। ৩১৯	৪, ৫৬৭	১৩, ৬৭, ৫২১
৫৬২	৫, ৯৮, ১৩৮	৭, ৮৯, ৯৬, ৮৫৪

১। সত্যিকারের রাজ্য বা স্টেট রাজারা 'শাসক' (রুলার) আখ্যাপ্রাপ্ত এবং মর্যাদা বলে নরেন্দ্র মণ্ডলের সদস্য।

২। কতগুলি এস্টেট যার ভূস্বামীবর্গ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সরকারী সংখ্যা অনুসারে "প্রধান" (চীফ) আখ্যাপ্রাপ্ত, এঁদের শুধু নরেন্দ্র মণ্ডলের নির্বাচিত হবার যোগ্যতা আছে।

৩। ক্ষুদ্র তালুক, জায়গীর প্রভৃতি।

দেখা যাচ্ছে যে, দেশীয় রাজ্য নামে এতগুলি রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে ঐশ্বর্যগত অত্যন্ত মর্যাদা ভেদ রয়েছে। এমন কয়েক শত রাজ্য রয়েছে যেগুলি "রাজা" নামেরই যোগ্য নয়। বড় বড় ২০টি রাজ্য নিয়েই আয়তন হয়ে ওঠে ৩, ৯৬, ২৯১ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫, ৫৫, ০৯, ৬৭৫—এই কয়েকটিই যথার্থ "দেশীয়রাজ্য" আখ্যা পেতে পারে। সমস্ত দেশীয় রাজ্যের (৫৬২টি রাজ্যের) রাজস্বের পরিমাণ হয়ে ৪৫ কোটি টাকা, এর মধ্যে বড় বড় ২৩টি রাজ্যের রাজস্ব হলো ৩৫ কোটির ওপর। সুতরাং বাকী ৫৩৯টি রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটিরও কম।

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যই আয়তনে ক্ষুদ্র। কি রকমের ক্ষুদ্র? একটা তুলনা করলেই এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সম্ভব হতে পারে। হায়দরাবাদ রাজ্য একটি বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্য এবং জনসংখ্যা হলো ১ কোটি ৪০ লক্ষ।

কাথিয়াবাড় রাজ্যগুলির মোট সংখ্যা হলো ২৮৩, এব মধ্যে ৯টি সত্যিকারের পদস্থ রাজ্য আছে--ভবনগর, কচ্ছ, ধরংগধরা, গোণ্ডাল, ইডার, জুনাগর, মোরভি, নবনগর ও পোরবন্দর। এই কয়টি বিশিষ্ট রাজ্য বাদ দিলে কাথিয়াবাড় বাজ্যবর্গের মধ্যে থাকে মোট ২৭৪টি রাজ্য, কর রাজস্ব হলো ১৩৫ লক্ষ টাকা মাত্র। কল্পনাতেও কোন ধারণা করা সম্ভব নয়, কি করে ১৩৫ লক্ষ টাকায় ২৭৪টি রাজ্যের রাজপরিবাবের ও রাজ্য পরিচালনাব খরচ সঙ্কুলান হতে পারে? অকল্পনীয় হলেও ব্যাপারটা বস্তুত সত্য।

ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যগুলির আকৃতি ও আয়তন কি রকমের, কাথিয়াবাড় রাজ্যগুলির তার দৃষ্টান্ত। এই ২৮৩ রাজ্যের মোট আয়তন হলো ৩২ হাজার বর্গমাইল। এবং জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ। অর্থাৎ অঙ্ক করে হিসাব করলে মোটামুটি ২৫ বর্গমাইল ভূমি ও ৫ শত লোক নিয়ে এক একটি বাজ্য। আর বাস্তব ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় ১৭৮টি রাজ্য আছে! যার আয়তন ১০—১০০ বর্গমাইল, তা ছাড়া ২০২টি রাজ্যের আয়তন হলো ১০ বর্গমাইলের কম। এই মধ্যে ১৩৯টি রাজ্যের আয়তন হলো ১ বর্গমাইলেরও কম।

১৯৩৫ সালের ভারত গবর্নমেন্ট আইনে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। বলা হয়েছে "ভারতের সেই সব অঞ্চলকেই দেশীয় রাজ্য বলে মনে করা হয় যা ব্রিটিশ ভারতের অংশ নয়, এবং যাকে মহামান্য সম্রাট এই ধরনের একটা "রাজ্য" বলে স্বীকার করেন, অঞ্চলগুলো রাজ্য (স্টেট) এস্টেট, জায়গীর বা অন্য যে-কোন নামে অভিহিত থাকুক না কেন।"

দেখা যাচ্ছে যে, শুধু "মহামান্য সম্রাটের স্বীকৃতি" ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনৈতিক মর্যাদার আব কোন ভিত্তি নেই। আইনত ছোট বড সব রাজ্যেরই আয়ু এবং অস্তিত্ব মহামান্য সম্রাটের স্বীকৃতির নথিপত্রে নীরবিন্দুবৎ লেগে রয়েছে। সম্রাট স্বীকার না করলে যে কোন দেশীয় রাজ্য ধুলো হয়ে যাবে, সম্রাট স্বীকার করলে যে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তালুক বা জায়গীরের ধুলো 'রাজ্য' হয়ে উঠবে।

কিন্তু এর জন্যে দেশীয় রাজারা মোটেই চিন্তিত, লজ্জিত বা দুঃখিত নন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুগ্রহ দিয়েই যে তাঁদের ঐতিহাসিক সত্তা তৈরী, সে সত্য তারা ভুলতে পারেন না। তাঁদের বিশ্বাস, এ অনুগ্রহের নড়চড় হবে না। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টও বহু ঘোষণায় তাঁদের বরাবর এই একই আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট দেশীয় রাজ্যগুলিকে ঘরে-বাইরের আক্রমণ থেকে অথবা লুপ্তির আশঙ্কা থেকে রক্ষা করবেন। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশের (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর) সম্পর্ক কতগুলি সন্ধি (ট্রিটি) অথবা ফারমান

(এনগেজমেন্ট) কিংবা সনদ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছিল। এই সব সন্ধি, ফারমান ও সনদে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট যে সব অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলিই দেশীয় রাজ্যের জীবনকাঠি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে সম্রাটের হাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসন বদলি হবার সময় (১৮৫৮) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ঃ

এই সন্ধিগুলি আমাদের দ্বারা গৃহীত হলো এবং ভবিষ্যতে নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলি অক্ষুণ্ণ রাখাও হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শক্তির আশ্বাসে লালিত ৬০১টি গদি এবং দরবার, দেশীয় ভারত নামে একটি বিরাট সামন্ততন্ত্র ভারতের প্রায় ৯ কোটি প্রজার ভাগ্যবিধান করে চলেছে। দেশীয় রাজ্যের ইতিহাস বলতে গেলে ভারতে বিগত দু'শত বৎসর ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস। নামধাম ও রাজবংশ বিচার করলে এই দেশীয় রাজ্যগুলির সকলেই সমবয়সী নয়, অনেকে অতি প্রাচীন এবং অনেকে নিতান্ত অর্বাচীন, ভারতের ইতিহাসের বিভিন্নকালে ও অধ্যায়ে এদের আবির্ভাব।

বর্তমান দেশীয় রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক কুলপঞ্জী বিচার করলে দেখা যায় এর মধ্যে আছে—

(ক) কতকগুলি হিন্দুস্থানের রাজ্য।

(খ) কতগুলি মোগল-পাঠান যুগের রাজ্য।

(গ) কতগুলি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগের রাজ্য।

(ঘ) একটি মাত্র খাস সম্রাট-শাসিত যুগের রাজ্য—ভোপাল।

এগুলি বিভিন্ন যুগের সামন্তরাজ্য ব্রিটিশ অনুগ্রহে আজও রয়েছে। এর মানে এ নয় যে, এসব রাজ্য খাঁটি হিন্দু সামন্ততন্ত্রের আদর্শ অনুসারে চলছে। রাজ্যগুলির কুল, গোত্র ও বয়েস যাইহোক, বর্তমানে সবাইকে একটি নতুন আদর্শে দীক্ষিত হতে হয়েছে—ইংরাজী সামন্ততন্ত্রে। এই সামন্ততন্ত্র যেমন অদ্ভুত তেমনি অভিনব, এর নজীর নেই।

বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এই দেশীয় রাজ্যগুলি সমস্যা হিসাবেও বিদঘুটে ; এরা কেন আছে, পৃথিবীর কোন উপকার করছে—এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। কোম্পানীর আমলের ইংরাজ সেনাপতিদের রাজ্য প্রসারের সাধনায় কতগুলি তাঁবেদার মিত্রপক্ষ ও পঞ্চমবাহিনী তৈরী করার প্রয়োজনে যে ৬০১টি কূটনৈতিক নীড় তৈরী করা হয়েছিল তারাই আজ দেশীয় রাজ্য নামে আখ্যাত।

ব্রিটিশের সামরিক প্রয়োজনে এদের তৈরী করা হয়েছিল। ব্রিটিশের ভারত অধিকার করেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আজ আর ভারত জয়ে সামরিক প্রয়োজন বলে কিছু নেই। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি রয়ে গেছে। ভারত শাসনের জন্য দেশীয় রাজ্য নামে কিছু থাকবার প্রয়োজন ছিল না। যারা নিতান্ত যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিল : শান্তিকালীন অবস্থায় তাদের কোন সার্থকতা থাকবার কথা নয়। কিন্তু ব্রিটিশের অনুগ্রহে তবু তারা রয়েছে, এবং এটাই সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা প্রচণ্ড জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। নিষ্প্রয়োজনে একটা অতীতের ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছেন। সাইমন কমিশনও দেশীয় রাজ্যগুলিকে একটা জটিল সমস্যা বলেই মনে করেছিলেন—"যার কোন নজীর বা তুলনা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।"

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

ভারতভূমির মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির ভৌগোলিক সংস্থানের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

ভারতের মানচিত্রের উত্তর পূর্বে লক্ষ্য করা যাক। ভৌগোলিক বাংলার মধ্যেই এখানে তিনটি রাজ্য দেখা যাচ্ছে—কোচবিহার, সিকিম ও ত্রিপুরা, আর দেখা যাচ্ছে ভৌগোলিক আসামের মধ্যে মণিপুর।

পূর্ব ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে একটু পশ্চিম দিকে সরে আসা যাক। গড়জাত এলাকায় অরণ্যময় মূর্তি চোখে পড়ে। এখানে পরস্পর সংলগ্ন একগুচ্ছ দেশীয় রাজ্য রয়েছে। ব্রিটিশ-ভারতের তিনটি প্রদেশকে এই রাজ্যগুলি যেন মাঝখানে পড়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মধ্যপ্রদেশের এক একটা প্রান্তে এই রাজ্যাকীর্ণ অঞ্চল স্পর্শ করে রয়েছে।

আরও দক্ষিণে সত্যিকারের দাক্ষিণাত্য যেখানে আরম্ভ, সেখানে পড়ে রয়েছে সুবিস্তৃত হায়দরাবাদ, এর উভয় প্রান্ত প্রায় পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। হায়দরাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সীমারেখা স্পর্শ করে প্রায় পর্তুগীজ গোয়ার কাছাকাছি পৌঁছেছে। দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোকোনাড়ার প্রায় গায়ের উপর দিয়ে চলে এসেছে।

হায়দরাবাদের দক্ষিণে মহীশূর রাজ্য, মাঝখানে মাত্র মাদ্রাজের বেলারি জেলা উভয় রাজ্যের মধ্যে একটা ব্যবধান রেখেছে এরও দক্ষিণে কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুর সিন্ধুধৌত বিস্তীর্ণ উপকূল যার একদিকের সীমারেখা রচনা করে রেখেছে। নিকটেই আছে ক্ষুদ্র রাজ্য পুড্ডু কোঠাই চারিদিকে কয়েকটি মাদ্রাজি জিলার দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ভারতের পশ্চিম উপকূল রেখা ধরে উত্তরে অগ্রসর হওয়া যাক। এই পথেও অনেকগুলি রাজ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কয়েকটি হলো উপকূল সংলগ্ন এবং অধিকাংশ স্থলভাগের অভ্যন্তরে সবই মারাঠা যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন। এর মধ্যে বৃহত্তম হল কোলহাপুর, ছেঁড়া মালার মত এই দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থান ঠিক পরস্পর সংলগ্ন নয়। কিছুটা ব্রিটিশ-ভারত ; তার পরেই আবার একটা দেশীয় রাজ্য। এইভাবে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একেবারে উত্তরে এসে পাওয়া যায় বরোদা রাজ্য। এর আর একটু উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই আরব সমুদ্র সংলগ্ন উপদ্বীপকার কাথিয়াবাড় রাজ্যাবলী যার সঙ্গে একটি দেশীয় দ্বীপরাজ্যও আছে—কচ্ছ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর-পূর্ব রাজ্যে প্রধান মধ্য ভারত এজেন্সি—গোয়ালিয়র, ইন্দোর, রেওয়া প্রভৃতি। এই দেশীয় রাজ্যগুলি সকলে মিলে বোম্বাই প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশকে যুক্তপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বোম্বাই প্রদেশ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত এবং পাঞ্জাবের দক্ষিণ প্রান্ত উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে রয়েছে, মরুপ্রধান রাজপুতানার রাজ্যসমূহ—বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর ও জয়শলমীর প্রভৃতি।

যুক্তপ্রদেশের মধ্যে তিনটি দেশীয় রাজ্য বিক্ষিপ্তভাবে যেন একা একা পড়ে আছে রামপুর, বেনারস ও টেহরি গাড়োয়াল।

ভারতরে উত্তর-পশ্চিমাংশে শুধু, ভৌগোলিক পাঞ্জাবের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট শিখ রাজ্য দেখা যায়—পাতিয়ালা, নাভা ইত্যাদি। তাছাড়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে।

হিমালয়ের সানু প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য নীড়ের মতও কতকগুলি রাজ্য দেখা যায়। ভারতের উত্তর-সুবিস্তৃত কাশ্মীর রাজ্য দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে বৃহত্তম ৮৯ হাজার বর্গমাইল। কাশ্মীরের একদিকে তুষরাবৃত পামীর, অপরদিকে তিব্বত। উত্তরের মধ্য এশিয়ার অধিত্যকা ও দক্ষিণে ভারতভূমি—তারই মাঝখানে কাশ্মীর তার ভূ-স্বর্গ নিয়ে অবস্থিত। কিছুটা রুশ সীমান্ত কাশ্মীরের গা ঘেঁষে চলে গেছে।

পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ধরে একেবারে সিন্ধু প্রদেশের সীমান্তের কাছাকাছি নেমে আসলে বাহাওয়ালপুর রাজ্য—পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সঙ্গে দুই প্রান্তে সংযুক্ত। সিন্ধু

প্রদেশের মধ্যে একটি দেশীয় রাজ্য খৈরপুর, যার সীমার একটা দিক রাজপুতানার দেশীয় অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত।

ভারতভূমির সর্বত্র হরিলুঠের বাতাসার মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থান দেখে অনেকগুলি প্রশ্ন ও সন্দেহ মনে জাগে। দেশীয় রাজ্যগুলির যে এইভাবে অসংবদ্ধ ও অবিন্যস্তভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, এটা কি একটা আকস্মিক ঘটনাগত পরিণাম মাত্র? অথবা এর পিছনে কারও একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার উদ্যোগপ্রবণ হাত আড়ালে আড়ালে কাজ করেছে?

সমস্ত ঘটনাটার বিশ্লেষণ করলে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের রূপ বিশ্লেষণ করলে একটা তাৎপর্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শক্তি ঠিক এইভাবে কতগুলি দেশীয় রাজ্য সৃষ্টি করবার জন্যই কোন পরিকল্পনা করেছিল, একথা না বলে অন্যভাবে বলা যায়—ব্রিটিশশক্তি ভারতবর্ষে তার প্রতিপত্তি দৃঢ়মূল করার জন্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখলের পরিকল্পনা করেই অগ্রসর হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিই হল বর্তমান ব্রিটিশ ভারত বা প্রদেশগুলি। এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি দখল করবার জন্য ভারতের সর্বপ্রান্তে ব্রিটিশের সামরিক অভিযান উদ্দামভাবে ছোটাছুটি করেছে।

এই অভিযানের পথে কূটনৈতিক সহায় হিসাবে, পঞ্চমবাহিনী হিসাবে, উৎকোচপুষ্ট বন্ধু হিসাবে, মিত্রপক্ষ হিসাবে যাদের পাওয়া গেছে, ব্রিটিশ শক্তি যেন দয়া করে তাদের মাত্র অর্ধগ্রাস করেছে। এই অর্ধগ্রাসভুক্ত অঞ্চলগুলিই দেশীয় রাজ্য। ব্রিটিশের সামরিক অনুকম্পার এক একটি পকেট। অন্যভাবে বলা যায়। ব্রিটিশের প্রতি ভারতীয় দাসত্বের এক একটি ঐতিহাসিক পকেট।

দেশীয় রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য থেকে আরও কতগুলি বিশিষ্ট তাৎপর্য ধরা পড়ে।

(১) রাজ্যগুলি যেন তাঁবেদার (বাফার) রাজ্যের মত ব্রিটিশ-ভারত অর্থাৎ প্রদেশগুলিকে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

(২) রাজ্যগুলি নিজেরাই পরস্পর থেকে এত বিচ্ছিন্ন যে, তাদের নিজেদের মধ্যে সত্যিকারের একটা রাষ্ট্রিক ঐক্য অথবা আঞ্চলিক সংহতি সৃষ্টি করা অসম্ভব।

(৩) রাজ্যগুলির অধিকাংশই স্থলবেষ্টিত সীমাসংলগ্ন সমুদ্রোপকূলের (সী বোর্ড) ঐশ্বর্য নেই। এ বিষয়ে কোচিন ত্রিবাঙ্কুর ও কাথিয়াবাড় (কচ্ছ সহ) রাজ্যগুলি যেমন অনেক ব্রিটিশ প্রদেশকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তেমনি অধিকাংশ রাজ্য আবার ব্রিটিশ প্রদেশগুলি দ্বারা বেষ্টিত।

দেশীয় রাজ্যগুলির এই তৃতীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নয়। ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য প্রসারণের নীতি যা ছিল তার ফলেই এই ব্যাপার হয়েছে। কয়েকটি বন্দর এবং গঙ্গা ও সিন্ধুর উর্বর উপত্যকা অঞ্চলমাত্র এই অংশকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারে এনেই প্রথম প্রথম সন্তুষ্ট ছিল। এছাড়া ব্রিটিশশক্তি তার স্ট্যাটিজিক সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য ভারতের সমগ্র সমুদ্রোপকূল ভাগ দখল করে নেয়। ভারতের এই সব অঞ্চল ছাড়া আর সব অঞ্চলে পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক অধিকার কায়েম করার জন্য ব্রিটিশশক্তি খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন না, কারণ গঙ্গা-সিন্ধুর উপত্যকা ও উপকূল ভাগ করায়ত্ত রাখা হলো। এই কারণেই দেখতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই হলো উপকূলভাগ এবং গঙ্গা-সিন্ধু উপত্যকার বাইরে।

(৪) দেশীয় রাজ্যগুলি সাধারণত অনুর্বর, গিরিপ্রধান অঞ্চল। ব্রিটিশের এই ভৌগোলিক স্ট্যাটিজিক নীতির একটু ব্যতিক্রম হয়েছিল ডালহৌসির শাসনকালে। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত 'তামাদি নীতি' প্রয়োগ করে অযোধ্যা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য খাস করে নিয়েছিলেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির অনেকে ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের এক একটি সাক্ষ্য। তবে সাক্ষ্যই মাত্র, বলতে পারা যায়, প্রতীকগত এক একটি নিদর্শন, কোন ঐতিহাসিক সজীবতা এদের মধ্যে আজ আর নেই। বর্তমানে সকলেই ব্রিটিশের অনুকম্পাশ্রিত রাজ্য মাত্র।

কিন্তু এদের অতীতের দিকে তাকালে ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিতান্তই গৌরবহীন নয়। অতীতে এক একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এদের অনেকের আবির্ভাব। সব দেশীয় রাজ্যে ঐতিহাসিক অতীত একই রকম নয়। সে দিক দিয়ে এদের মধ্যে লঘু-গুরু তারতম্য আছে।

হিন্দুযুগ ঃ—প্রাচীনতার দিক দেখতে গেলে বাংলার উত্তরে কোচবিহার রাজ্যের দিকে তাকাতে হয়। কোচবিহার দাবী করে মহাভারতের কাল থেকেই অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের সময় থেকেই এই রাজ্য ও রাজবংশ চলে আসছে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর লিখিত বৃত্তান্তে কোচবিহার রাজ্যের ও রাজার উল্লেখ করেছেন।

কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুর প্রাচীন হিন্দু রাজ্য। এই দুই রাজ্যের বর্তমান নৃপতি চের রাজবংশের সন্তান বলে দাবী করেন। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে এসে কোচিন রাজ্যের বর্তমান রাজার পূর্বপুরুষের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করেছিলেন। ব্রিটিশেরা ভারতে আসবার পর প্রথম যাঁর সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন তিনি হলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সেই সন্ধি বস্তুত দুই স্বাধীনের সন্ধি, পরবর্তী সন্ধিগুলির মত এক পক্ষের নির্দেশ প্রধান চুক্তি নয়। ভারতে আগত প্রাচীন আরব পর্যটকেরা কচ্ছ রাজ্যের বিবরণ লিখে গেছেন।

বর্তমান রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকে হিন্দুযুগের রাজত্বের নিদর্শন : মুসলমান অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিরোধ বলে যতটুকু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল তার অধিকাংশই রাজপুত রাজ্যের কীর্তি। মেবারের রানা (উদয়পুর) সূর্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়, রাজা রামচন্দ্রের সমগোত্রের, রানাদের কাহিনী দেশপ্রেমের ও হিন্দুবীরত্বের উদাহরণরূপে আজও কীর্তিত রয়েছে।

বর্তমান মহীশূর রাজ্য ও প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরেরই একটি সামন্ত রাজ্য ছিল মহীশূর। এই রাজত্বের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসের মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে—হায়দার আলির রাজত্ব।

মারাঠার অভ্যুত্থানে এবং মোগলের অধঃপতনের অধ্যায়ে ভারতের বাইরে থেকে দুটি আক্রমণকারীর অভিযান হয়—একটি হলো পারস্যদেশীয় নাদির শাহের অভিযান (১৭৩৯ সন), অপরটি দুরানী বংশীয় আফগান আহমদ শার অভিযান (১৭৪৮)। নাদির শাহের অভিযানে লুণ্ঠনটাই প্রধান বিষয় ছিল। তিনি এলেন, লুট করলেন, আর চলে গেলেন, ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে কোন স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাননি। দুরানী আফগান আহমদ শার অভিযানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র পাঞ্জাবে আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পানিপথে (১৭৬১ সন) মারাঠার সঙ্গে তাঁকে শক্তি পরীক্ষাও করতে হয়। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা রাজশক্তি জয়লাভ করেনি সত্যি, কিন্তু বিজয়ীরূপে কথিত আফগান আহমদ শা'ও তাঁর যুদ্ধ জয়ের কীর্তিকে স্থায়ী রাজনৈতিক কীর্তিতে পরিণত করতে পারেন নি। যুদ্ধজয়ী আহমদ শা, উত্তর ভারতে রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, ববং অভ্যুত্থিত শিখশক্তি অল্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাব থেকে আফগান শাসনকে উৎখাত করে শিখ-শাসন প্রতিষ্ঠা করে। উল্লিখিত অল্পকালীন আফগান আধিপত্যের সময় আফগান সামন্তাধীন

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পাঞ্জাবে এবং যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমে উদ্ভূত হয়েছিল। পাঞ্জাবের সেই সব আফগান সামন্তরাজ্যের কোন চিহ্ন আজ আর নেই। যুক্তপ্রদেশের রামপুর রাজ্য একটি উদাহরণরূপে রয়ে গেছে। জনৈক রোহিলা আফগান সামন্ত এর প্রতিষ্ঠাতা।

শিখ রাজ্য ঃ—মোগল সাম্রাজ্যিক শক্তির প্রতিষ্ঠা দুর্বল হতে আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে শিখদের মধ্যে রাজনৈতিক উৎসাহ প্রবল হতে থাকে। কতকগুলি শিখ সামন্ত রাজ্যের আবির্ভাব হয় এবং মোগল সম্রাটদেরও ফারমান দিয়ে তাদের স্বীকার করে নিতে থাকে। এই সব শিখ সামন্ত রাজ্যগুলিই পরে সঙঘবদ্ধ হয়ে পাঞ্জাব থেকে মোগল রাজশক্তির শেষ অস্তিত্বকে উচ্ছেদ করে এবং তারপর আফগান শক্তিকে পরাভূত করে। সেই শিখ রাজসঙেঘর (শিখ কন্‌ফেডারেশী) নির্দেশরূপে কতকগুলি রাজ্য রয়েছে—পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, কর্পূরতলা, ফরিদকোট ইত্যাদি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ ঃ—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এসে রাজ্য বিস্তারের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি নতুন দেশীয় রাজ্যের পত্তন করে। কোম্পানীর শাসনকে শেষদিকে যখন পাকাপাকিভাবে রাজনৈতিক রূপ দেবার সময় আসে, তখনও।

খাস পার্লামেন্টী শাসনের যুগ ঃ—১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে সমগ্র ভারত শাসনের দায়িত্ব সম্রাটের তথা খাস পার্লামেন্টীয় অধিকারে বদলি করা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যতগুলি দেশীয় রাজ্যকে স্বীকার করেছিল, সম্রাটের গবর্নমেন্টও তাদের স্বীকার করে নেয়। দেশীয় রাজ্য সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াও এই সঙ্গে সমাপ্ত হয়। সম্রাটের শাসনকালে একটি মাত্র দেশীয় রাজ্য তৈরী করা হয়েছে—বেনারসে (রামনগর)।

সংক্ষেপে এই হলো দেশীয় রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক কালপঞ্জী, কেউ বয়সে অতি প্রাচীন ও কেউ অতি অর্বাচীন, কেউ আকারে অতি বৃহৎ ও কেউ অতি ক্ষুদ্র, কেউ সম্পদে অতিরিক্ত ও কেউ একেবারে রিক্ত—সব রকমেরই দেশীয় রাজ্য আছে। নামে তালপুকুর অথচ ঘটি ডোবে না—এই ধরনের দেশীয় রাজ্যের সংখ্যাই বেশী।

আজ সবাই ব্রিটিশের সামন্ত রাজ্য, কিন্তু অতীত ইতিহাসের যেটুকু বিবৃত করা হলো তাতে দেখা যায় যে, এর মধ্যে কোন কোন রাজ্য তার প্রথম জীবনে প্রায় একটা সাম্রাজ্যোচিত মর্যাদা অর্জন করেছিল। তার বর্তমান রূপ অতীত মর্যাদার একটা বামনতাপ্রাপ্ত রূপ মাত্র। কোন কোন রাজ্য অতীতে হয়ত একটা জাতীয় রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যার অধীনে অনেকগুলি আঞ্চলিক সামন্ততন্ত্রও ছিল। আজও হয়ত সেই রাজ্যের নাম নিয়ে একটি দেশীয় রাজ্য আছে, কিন্তু তার রাষ্ট্রাশ্রিত সেই সামন্ততন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। মহীরুহের পত্রপুষ্প ও শাখাপ্রশাখা কেটেছেঁটে শুধু একটুকরো গুঁড়ি বা শিকড় রেখে দেওয়ার মত। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট অনেকগুলি জাতীয় রাষ্ট্রকে এইভাবে অতি হ্রস্ব আকারে এক একটা দেশীয় রাজ্যে পরিণত করেছেন।

মারাঠা রাজ্যগুলির অতীতে ও বর্তমানের রূপে এই পার্থক্য। কোন কোন রাজবংশের যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়ত ব্রিটিশের বিরাগভাজন হয়েছে, তখনই তাকে উচ্ছেদ করে রাজবংশের কুটুম্বগোষ্ঠীর কাউকে ধরে এনে সেই গদিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। আবার কোন কোন রাজ্যের প্রকৃত অধিকারীকে বঞ্চিত করে, উৎসাহী ইংরাজ এক বিশ্বাসঘাতককে এনে গদিতে বসিয়ে দিয়েছে। অনেক রাজ্যের ভৌগোলিক সত্ত্বা পাল্টে গেছে, রাজবংশের শোণিতও বদলে গেছে—কিন্তু নতুন ভূমি ও নতুন বংশের রাজা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রাচীন নামটিকে অনর্থক আঁকড়ে ধরে রাখা হয়েছে। এটা বস্তুত ঐতিহাসিক গৌরবকে তচ্ছরূপ করবার মত ব্যাপার।

কোন কোন রাজ্যকে ইংরেজ শক্তি বস্তুত আনুষ্ঠানিকভাবে "জয়" করেনি (দৃষ্টান্ত

ত্রিবাঙ্কুর) এবং যার সঙ্গে সমমর্যাদাশক্তি হিসাবে সন্ধি করেছিল। লিখিত ভাবে সেই সন্ধি আজও আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এহেন স্বতন্ত্র রাজ্যও স্বাধীন ব্রিটিশের সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই হলো বৈচিত্র্য। সুদুর অতীতের কিংবদন্তীর অস্পষ্ট জগৎ থেকে কেউ চলে আসছে, অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রবিপ্লবে কারও অভ্যুত্থান, আগন্তুক বহিঃশত্রুর রণনির্দেশের প্রতিক্রিয়ায় কারও আবির্ভাব। গৃহযুদ্ধের প্রকোপ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হানাহানির সংঘাতে, ভাঙাগড়ায় এক ঘটনাবহুল অধ্যায়ে কারও জন্ম ; কেউ বা কেন্দ্রিয় রাজশক্তির অবসন্নতার দুর্বল মুহূর্তে দুহাতে গুছিয়ে নিয়ে রাজ্যপত্তন করে ফেলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাসের প্রতি পুরস্কার হিসাবে, কোন আপোষের সূত্রে এবং কোথাও বা নিছক অর্থের বিনিময়ে সম্পত্তি বিক্রয় হিসাবে প্রভুশক্তি এক একটি দেশীয় রাজ্য সৃষ্টি বা পুনর্গঠন করেছেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির অতীত ইতিহাসে যত কিছুই গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, বর্তমানে ব্রিটিশ সামন্তরাজ্যের এক নতুন ছাঁচে সবাই একভাবে ঢালা। পরস্পরের মধ্যে ঐশ্বর্যগত পার্থক্য যাই থাকুক, রাজনৈতিক মর্যাদার প্রকারভেদ সামান্য, বরং এ ক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য ও সমধর্মিতা আছে। সমধর্মিতার সূত্রগুলি হল ঃ–

(১) দেশীয় রাজ্যগুলি আইনত 'ব্রিটিশ অঞ্চল' (ব্রিটিশ টেরিটরি নয়)। দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও 'ব্রিটিশ প্রজা' (ব্রিটিশ সাবজেক্ট) নয়। তারা হল 'ব্রিটিশ রক্ষিত ব্যক্তি' (ব্রিটিশ প্রটেক্টেড পারসন্‌স)।

(২) কোন দেশীয় রাজ্যের পক্ষে বৈদেশিক সম্পর্ক (রিলেশন্‌স) স্থাপনের ক্ষমতা নেই। বিদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কোন অধিকার নেই। এই ক্ষমতা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজের খাস করে রেখেছেন।

(৩) প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের নৃপতি তাঁর রাজ্যের শাসনঘটিত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যথেচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু অধিরাজক (প্যারামউন্ট) শক্তির সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলি সন্ধি ও সনদ দ্বারা যেমন সর্ত চুক্তি ও নির্দেশ মেনে নিয়েছে, তার দ্বারা আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে দেশীয় নৃপতির যথেচ্ছ ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট। শুধু সন্ধিগত এবং সনদগত নির্দেশ ও সর্তগুলির দ্বারা নয়।

(৪) এ ছাড়া প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট প্রতিশ্রুতবদ্ধ।

(৫) প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যকে লুপ্তি থেকে রক্ষা করতে ও তার অখণ্ডতা বজায় রাখতে (গ্যারান্টি সারভাইভ্যাল এণ্ড ইন্‌ট্রিগ্রিটি) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ।

(৬) দেশীয় রাজ্যের এলাকার মধ্যে কোন ব্রিটিশ আইন প্রযোজ্য নয়।

(৭) ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রিয় এবং প্রাদেশিক আইন সভাগুলির পক্ষে দেশীয় রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়নের কোনো ক্ষমতা নেই।

(৮) ব্রিটিশ ভারতের হাইকোর্ট বা চীফ কোর্টগুলির পক্ষে দেশীয় রাজ্যের কোন মামলা বিচার করার অধিকার নেই।

ব্রিটিশ অধিরাজক শক্তির বিধানানুযায়ী অনুশীলনের দ্বারা এক মর্যাদার স্তরে দাঁড়াতে হয়েছে। এদিক দিয়ে তার মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।

কিন্তু আর এক দিক দিয়ে বর্তমান দেশীয় রাজ্যগুলির পরস্পর বৈসাদৃশ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। যথা ঃ আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী। এমন দেশীয় রাজ্যও আছে, যার পক্ষে একটিমাত্র পুলিস অথবা একটি শিক্ষককে বেতন দিয়ে পোষণ করার ক্ষমতা নেই। অপরদিকে এমন দেশীয় রাজ্যও রয়েছে, যার সুগঠিত আধুনিক ফৌজ আছে, সুপ্রিম কোর্ট আছে। আধুনিক সভ্য শাসনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, সঙ্গতি ও উপকরণ সবই আছে।

বৈসাদৃশ্যের রকমটা নিম্নোদ্ধৃত হিসাব থেকেই কতকটা ধারণা করা যায়--(ক) ৩০টি দেশীয় রাজ্য আছে, যেখানে আইন সভা কায়েম করা হয়েছে

৫২ রিপন স্ট্রীট।

রিপন নার্সিং হোম।

এই সব আইন সভার কয়েকটির মধ্যে নির্বাচিত সদস্যরাই সংখ্যাধিক এবং বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে তাদের ভোট দেবার ক্ষমতা আছে।

(খ) কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে 'উচ্চতম বিচারালয়' (সুপ্রিম কোর্ট অব জাস্টিস) আছে, প্রত্যক্ষ শাসনকার্যের (এক্সিকিউটিভ) সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই।

(গ) ৩৪টি দেশীয় রাজ্য আছে, যেখানে প্রত্যক্ষ শাসনকার্যের ব্যবস্থাকে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা থেকে পৃথক করা হয়েছে।

(ঘ) কতকগুলি দেশীয় রাজ্য আছে, যার প্রত্যক্ষ শাসন প্রণালী (এক্সিকিউটিভ) ও বিচার ব্যবস্থা (জুডিসিয়ারী) উভয়ের মধ্যে বিভাগীয় পার্থক্য নেই। যিনি শাসন কর্মচারী, তিনিই হয়ত একই সঙ্গে বিচারের কাজও করে থাকেন।

উন্নত শাসন প্রণালীর যে কয়েকটি ব্যবস্থাগত উদাহরণ উল্লেখ করা হল তা অল্পসংখ্যক কয়েকটি রাজ্যেই প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু শাসন ব্যাপারে মাত্র এই ধরণের কিছু কিছু উন্নত প্রণালীর নিদর্শন আছে বলেই একথা মনে করবার কারণ নেই যে, এই সব দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্নমেন্ট (রেসপন্সিবল্ গবর্নমেন্ট) প্রতিষ্ঠিত। আদৌ তা নয়। এই সব প্রগতিশীল দু'একটি দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে বড় জোর 'সীমাবদ্ধ স্বেচ্ছাতন্ত্র' (লিমিটেড অটোক্রেসী) বলা যেতে পারে। অধিকাংশ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা বস্তুত পূর্ণ অটোক্রেসী বা স্বেচ্ছাতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এই অটোক্রেসী বা স্বেচ্ছাতন্ত্রের রূপ আবার সকল রাজ্যে একই রকমের নয়। তা হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ, শিক্ষায় শক্তিতে ও সঙ্গতিতে সব দেশীয় রাজ্য সমান নয়। এমন রাজ্য আছে, যেখানে অটোক্রেসী বিশুদ্ধ লাঠিতন্ত্ররূপেই বিরাজিত, কারণ লাঠি ছাড়া রাজামহাশয়ের আর কোন সঙ্গতি নেই। আবার এমন সঙ্গতিসম্পন্ন রাজ্যও আছে, যেখানে সর্বময় ক্ষমতাব অধিকারী রূপে হিজ্ হাইনেজ তাঁর শাসন পরিষদ বা উজীর সভার সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেও অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন। মূলত উভয়ই অটোক্রেসী, রূপে ও রীতিতে যা কিছু পার্থক্য বা বৈচিত্র্য।

পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের আর একটি দিক আছে। ব্রিটিশের দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক "সন্ধি" অথবা সনদদ্বারা স্থিরীকৃত আছে। কিন্তু এই সব সন্ধি ও সনদের সর্ত তাৎপর্য নির্দেশ, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে একই রকমের নয়। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি ও সনদ ভিন্ন ভিন্নভাবে করা হয়েছে। তথাকথিত "সন্ধি" (ট্রিটি) নামক চুক্তিপত্রগুলি সবই যে বড়দরের ব্যাপার এবং সনদগুলি ছোটদরের ব্যাপার, তা নয়। এমন চুক্তিপত্রের দৃষ্টান্তও আছে, যেটা নামে "সন্ধি" হলেও, সর্তের দিক দিয়ে অতি নিম্নমর্যাদার নির্দেশে পরিপূর্ণ, অপরদিকে "সনদ" নামে চুক্তিপত্রটি শুনতে ছোট দরের জিনিস হলেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে সনদের সর্তগুলি বেশী উদার ও মর্যাদাপূর্ণ। অনেক ছোট রাজ্য সনদের জোরে যেমন অধিকার পেয়েছে (গদির উত্তরাধিকার, আভ্যন্তরীণ শাসন ইত্যাদি ব্যাপারে), অনেক বড় রাজ্য "সন্ধি" করেও ব্রিটিশের কাছে সে ধরণের অধিকার পায়নি এবং অনেককে (সন্ধিওয়ালা রাজ্যকে) বহু আবেদন-নিবেদনের কাঠখড় খরচ করে পরবর্তীকালে ব্রিটিশের কাছ থেকে নতুন অনুগ্রহের দলিলের দ্বারা সেই অধিকার লাভ করতে হয়েছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, বড় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক "সন্ধির" দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ছোট রাজ্যগুলির সম্পর্ক সনদ ও ফরমান ইত্যাদি দ্বারা নির্দিষ্ট। দেশীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে আর একটি বৈসাদৃশ্য আছে। এটা সংস্কৃতিগত বৈসাদৃশ্য। ভাষা, সমাজ ও

বংশ হিসাবে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরা বিভিন্ন। কেউ হিন্দু, ক্ষত্রিয়, কেউ হিন্দু অন্ত্যজ, কেউ আদিবাসী, কেউ মোগল বংশোদ্ভব, কেউ পাঠান ও আফগান বংশের মানুষ, এছাড়া শিখবংশীয় নৃপতিও আছেন। এর স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবেই বিভিন্ন রাজ্যের শাসন ব্যাপারের মধ্যেও কিছু কিছু সমাজগত ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছে। নিজাম হায়দরাবাদের শাসন-ব্যবস্থায় আধুনিক পাশ্চাত্য প্রথা ও প্রণালী গৃহীত হয়েছে, তেমনিই রাজপুত ও মারাঠা রাজ্যগুলিতেও হয়েছে। হিন্দু রাজ্য মহীশূর-ত্রিবাঙ্কুরেরও তাই। কিন্তু প্রত্যেকের শাসনতন্ত্রের মধ্যে কিছু কিছু নিজস্ব ঐতিহ্যগত রীতিনীতিও মিশে রয়েছে। কোথাও সাবেককালের মোগলাই রীতি, কোথাও ক্ষত্রিয় রাজপুত পদ্ধতি এবং কোথাও বা মহারাষ্ট্রীয় রীতি। এর ফলে প্রত্যেকের শাসনতন্ত্রের ইংরেজীয়ানাব সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের মত কিছু কিছু নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও রাখা হয়েছে।

দেশীয় নৃপতিরা অনেকেই আধুনিকতা-সম্পন্ন, বিলাতিয়ানাও অনেকের মধ্যে প্রবল। কিন্তু আচারে ও আচরণে এই আধুনিকতার পেছনেও একটি প্রাচীন মনের পরিচয় অনেক সময় ধরা পড়ে যায়। অনেকে মনে মনে তাঁর প্রাচীন কৌলিন আভিজাত্যের জন্য গর্বিত; অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের এবং "ছোট" জাতের রাজাকে একটু ছোট ভাবে দেখতেই তাঁদের ভাল লাগে। অনেকে যেন আবার তিনশ বছর আগেকার পুরনো ইতিহাসের সংস্কার অজ্ঞাতসারে স্মরণ করে দেখেছেন—অতীতে কার পূর্বপুরুষ কবে কার পূর্বপুরুষের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, বর্তমান দেশীয় রাজাদের অনেকের মনে যেন সেই ঘা এখনও শুকোয়নি। নৃপতিদের সম্মেলনে এই সব প্রাচীন ক্ষোভের জের নিয়ে এখনও অনেকে পরস্পরের প্রতি একটি আড়ির ভাব দেখিয়ে থাকেন। অবশ্য এটা একটা ঢং (পোজ) মাত্র। সামান্তিক (ফিউডাল) গর্বের সেই প্রাচীন বনিয়াদ এখন আর নেই, সত্যি করে কোনো শত্রুতার ভাবও নেই। আভিজাতিক চালিয়াতি করার একটা সাধ মাত্র।

যিনি ভারতের গবর্নর জেনারেল তিনিই দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে 'সম্রাটের প্রতিনিধি' হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। যেহেতু দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত গবর্নমেণ্টের অধীনে নয় সেহেতু ভারতের গবর্নর জেনারেল আনুষ্ঠানিকভাবে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্রাটের অধীন সুতরাং সম্রাটের প্রতিনিধিই এক্ষেত্রে একমাত্র নির্দেশদাতা।

(১) মিঃ কে এম পানিক্কর উল্লিখিত হিসাব ও তালিকা রচনা করেছেন। কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টের শেষ লিপিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী হিসাবের একটু পার্থক্য দেখা যায়। ভারত গবর্নমেণ্টের বিবরণ অনুযায়ী (মেমোরেণ্ডাম অব ইণ্ডিয়ান স্টেটস ১৯৪০) সবশুদ্ধ ৬০১টি দেশীয় রাজ্য আছে। এই দেশীয় রাজ্যের আয়তন সমগ্র ভারতের আয়তনের পাঁচভাগের দুভাগ এবং জনসংখ্যা হলো ৮১,৩১০,৮৪৫—এটা ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাব। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুসারে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা হলো ৯২,৯৭৩,০০০—৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৩ হাজার।

(২) ইণ্ডিয়ান স্টেটস ইন এ ফ্রী ইণ্ডিয়া—কে আর আর শাস্ত্রী।*

[* প্রাক-স্বাধীনতাকালে রচিত এই নিবন্ধ।]

ভারতের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক ঘটনা হলো ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। সেই স্বাধীন ভারতই আজ থেকে দুবছর আগের এক ছাব্বিশে জানুয়ারীতে তার রাষ্ট্রীয় কায়া প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করে বিংশ শতাব্দী রাজনীতিক ইতিহাসে এক নতুন পরিণামের সূচনা করেছে। এই প্রজাতন্ত্র পৃথিবীর ছত্রিশ কোটি মানুষের পরিণাম গঠনের এক নতুন অধ্যায় আহ্বান করে বস্তুত আন্তর্জাতিক জগতের রীতি-নীতি ও আদর্শে এক বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা জাগ্রত করেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রায় সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়েছে। দুই মহাযুদ্ধের উৎপীড়নে জর্জরিত বিংশ শতকের প্রথমার্ধ তার অন্তিমে বিশ্ব রাজনীতিতে বোধ হয় এই একটিমাত্র অথবা শ্রেষ্ঠ মাঙ্গলিক উপহার রেখে দিয়ে বিদায় নিয়েছে।—ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভে পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রথম বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক গুরুত্বে পরিপূর্ণ যে ঘটনাকে দেখা যায়, সেই ঘটনা হলো ভারতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসেই প্রথম যে অভিনবত্বের উদাহরণ ভারতের এই প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠায় সত্য হয়ে উঠলো, সেই কথাই আজ সবার আগে মনে পড়ে। পৃথিবীর তথা মানুষজাতির ইতিহাসেই প্রাচীনতম সভ্যতার দেশ বলতে যে-কয়টি দেশকে বোঝায়, ভারত তাদের অন্যতম। মিশর, গ্রীস, মেসোপটেমিয়া ও ভারত সভ্যতার প্রাচীনতম আধারভূমি হলো এই কয়টি দেশ। চীনের সভ্যতা বয়সে প্রাচীন হলেও এত প্রাচীন নয়। লক্ষ্য করার বিষয় একমাত্র ভারত ও চীন ছাড়া আর কোন দেশে প্রাচীন সভ্যতার রূপ আর জনজীবনে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ফ্যারোয়ার মিশর, হেলেনিক গ্রীস, আর সুমেরীয় মেসোপটেমিয়ার মৃত্যু হয়ে গেছে অনেককাল আগেই। আজকের মিশর, গ্রীস ও মেসোপটেমিয়া সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম, নতুন ভাষা ও নতুন সংস্কৃতির দেশ। কিন্তু ভারতের জনজীবনে তার প্রাচীন সভ্যতারই রূপ আজও সজীব। ভাষা ধর্ম শিল্প সাহিত্য আচার সংস্কার ও রীতি-নীতির চার হাজার বছরের ঐতিহ্য আজও ভারতের জনজীবনে জাগ্রত রয়েছে। এহেন প্রাচীনতম সভ্যতারই এক দেশ এবং ছত্রিশ কোটি মানুষ তার চার সহস্রাধিক বৎসরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত থেকেও আধুনিকতম গণতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। বিশ্বের সভ্যতারই ইতিহাসে এক নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। বলা যায় সভ্যতায় পৃথিবীর প্রাচীনতম এক মানব সমাজ এই প্রথম আধুনিকতম গণতন্ত্রে তার সমাজজীবন এবং রাষ্ট্রীক জীবন গঠনের সাধনা গ্রহণ করলো। অতি পুরাতন কখনো এভাবে অতি নূতনের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে, এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে দেখা যায়নি। আধুনিক প্রজাতন্ত্রবাদ আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতারই সৃষ্টি। সুতরাং, ভারতের প্রজাতন্ত্র যেন যুগসমন্বয়েরই এক অভূতপূর্ব ঘটনার উদাহরণ।

বললে বোধহয় অতিরিক্ত হবে না, যদি বলা যায় যে, প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারত ব্রিটিশের সাম্রাজ্য গরিমার স্তাবক সেই কিপলিংয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়েছে। 'Twain shall never meet'—পূর্ব হলো পূর্ব, এবং পশ্চিম হলো পশ্চিম ; এই দুই বিপরীতের মধ্যে কখনই মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাচ্যভূমির ভারত পাশ্চাত্যভূমির প্রতিভাপ্রসূত রাজনীতিক গঠনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রীতি তার রাষ্ট্রীক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এই সত্য প্রমাণিত করেছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের ঐতিহ্যে স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর মিলন সম্ভবপর। গণতন্ত্রের আদর্শ অতীতের ভারতে নিতান্ত অকল্পিত অথবা অপরিচিত ছিল না। শুক্রনীতিসারে বর্ণিত শাসন সংবিধান, সমষ্টির ইচ্ছার অধিকার, বিচার প্রণালী, নির্বাচনপ্রথা, শ্রম সমবায়, "গ"-পরিচালিত অর্থব্যবস্থার ইত্যাদি বহু এবং বিবিধ বিষয়ের মধ্যে প্রাচীন ভারতের যে চিন্তার পরিচয় পাওয়া

যায়, সে চিন্তা প্রজাসাধারণের অধিকারের তথা গণতন্ত্রেরই মর্যাদার স্বীকৃতি। ভারতের গ্রাম জনপদের অর্থনীতি জীবনে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনে পঞ্চায়েত নামক রীতির যে নিদর্শন আজও দেখা যায় তাকেও প্রাচীনকালের গ্রামীন গণতন্ত্রের ভগ্নাবশেষ বলা যায়। কিন্তু আধুনিক কালের প্রজাতন্ত্রের মত উন্নত ও সুপরিণত কোন রাষ্ট্রিক আদর্শ কোন কালে অতীতের ভারতের সমগ্র রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আধুনিক পশ্চিমেরই রাজনীতিক জীবনের বহু ঘটনা ও পরীক্ষার অভিজ্ঞতা হতে এই প্রজাতন্ত্রের আদর্শ উদ্ভাবিত হয়েছে। ভারতের ঐতিহাসিক গৌরব, এই যে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম এই রাষ্ট্রিক আদর্শে জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান চীন এবং এশিয়ার সোভিয়েট অঞ্চলেও "যথার্থ" গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ঐ দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ দাবী করে থাকেন। তাঁদের চিন্তা ও রুচি অনুযায়ী হয়তো চীন ও রুশীয় গণতন্ত্রই যথার্থ গণতন্ত্র। কিন্তু যে গণতন্ত্রে প্রজার ইচ্ছানুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা দেশের সরকার গঠনের কোন নিয়ম নেই, প্রজার সেই অধিকারও নেই, এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ছাড়া নির্বাচন করবার মত দ্বিতীয় কোন দলের অস্তিত্বও নেই। সরকারের কোন কাজের সমালোচনা করবার অধিকার জনসাধারণের নেই। এই ধরণের "যথার্থ" গণতন্ত্র নয়, ভারত সাধারণ ও সহজ অর্থের গণতন্ত্রই গ্রহণ করেছে। এই গণতন্ত্রের সংবিধান ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিনে প্রচলিত সংবিধানের যদিও অনুরূপ কিন্তু হুবহু প্রতিরূপ নয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের এবং অবাধ ইচ্ছায় ও বিবেচনায় বহু দলের বহু ব্যক্তির ভেতর থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গই জনপ্রতিনিধি হয়ে বিরাট ভারত রাষ্ট্রের শাসনিক পরিচালকমণ্ডলী গঠন করে থাকেন। এই প্রজাতন্ত্র এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ভারতই গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্র হলো ভারত ; কারণ কোন গণতন্ত্রের দেশে ভারতের মত ছত্রিশ কোটি মানুষ এবং আঠার কোটি ভোটাধিকার নেই।

ভারতে প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবের ইতিহাসও পৃথিবীর রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক নৈতিক পরীক্ষার প্রথম সাফল্যের ইতিহাস। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামের ফলেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। পৃথিবী জানে গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস এক অভিনব পন্থায় সংগ্রাম করেছে। শান্তিপূর্ণ এবং অহিংসাপন্থা, জাতীয় কংগ্রেস যদিও পন্থা হিসাবে পূর্ণ অহিংসাকে তার গঠনতন্ত্রে স্থান দেন নি, কিন্তু প্রত্যেক সংগ্রাম আন্দোলনের সময় বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস গান্ধীজীকেই সংগ্রামের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতেন। এবং গান্ধীজী তাঁর নিজের বিবেক-সম্মত সেই অহিংস পদ্ধতিতেই সংগ্রাম পরিচালনা করতেন। দেশবাসী অবশ্যই পূর্ণ অহিংস পন্থার মর্যাদা সংগ্রামের উত্তেজনায় সব সময় রাখতে পারে নি। কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, মোটামুটিভাবে দেশের মানুষ গান্ধী নেতৃত্বে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বে অহিংস পন্থায় সংগ্রাম করেছে। পৃথিবী অন্তত এইটুকু দেখে বিস্মিত হয়েছে যে গান্ধী নেতৃত্বে নিরস্ত্র ভারতবাসী এক সশস্ত্র সাম্রাজ্যিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছে এবং লড়তে গিয়ে হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছে। কোথাও কোথাও, এবং কখনো কখনো হিংসার ঘটনা হয়ে থাকলেও কংগ্রেস পরিচালিত সংগ্রাম ছিল মুক্তিকামী দেশবাসীর আত্মবলিদানেরই ঘটনা। নিরস্ত্র এক বিরাট দেশ, বিনা অস্ত্রেই সংগ্রাম করে। স্বাধীনতা লাভ করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতই তার একমাত্র সার্থক দৃষ্টান্ত। মানবীয় জীবনদর্শনের এক আদর্শগত সম্প্রীতি এইভাবে ভারতের রাজনীতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সফলতা লাভ করায় আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্বের এক শুভ রূপান্তরের ঐতিহাসিক সম্ভাবনা এখন আর দুরাশনা বলে কেউ মনে করবে না। বরং এই ঘটনা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীকে যে নতুন এক নৈতিক প্রেরণায় অহিংস পন্থায় যৌক্তিকতা, শ্রেষ্ঠতা এবং মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করবে ; এমন আশা বিশ্ববাসীর মনে এখন বাস্তবোচিত আশা বলেই মর্যাদালাভ করতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক মানস গগনে অবশ্য এই আশা এখন অস্পষ্ট ঊষালোকের মত মাত্র দেখা দিয়েছে। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথম আলোকাভাস যে পূর্ণ অরুণোদয়ের রূপ নিয়ে দেখা দেবে, মানুষের ইতিহাস এই আশাবাদ পোষণের এক ঐতিহাসিক অবলম্বন লাভ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের পথে নৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠারই প্রথম সার্থক দিক্‌চিহ্ন।

ভারত যদি স্বাধীন না হতো, এবং প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত না হতো, তা হলে বর্তমানের বিশ্ববাসীর এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই শাসকসমাজের মনে শান্তির আগ্রহ এতটা স্পষ্টভাবে জাগ্রত এবং অভিব্যক্ত হতে পারতো কিনা সন্দেহ। লেক সাকসেসে রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনা-আসরের তর্কতত্ত্বের মধ্যেও উষ্মা ও বিরোধপ্রাণতার যথেষ্ট চাঞ্চল্য থাকলেও তার অন্তরালে শান্তিবাদিতারই এক প্রচ্ছন্ন অথবা অস্পষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যতম সদস্য স্বাধীন ভারত তার একটিমাত্র ভোটের শক্তিতেই ষাটটি রাষ্ট্রের মনোভাব প্রভাবিত করেছে, এটা নিশ্চয়ই সত্য নয়। সত্য হলো ভারত রাষ্ট্রের নৈতিক প্রভাব ; এবং এই প্রভাব কখনই সত্য হয়ে উঠতে পারতো না, যদি স্বাধীন ভারত আজ কোন বিশেষ প্রকারের টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রাদর্শ গ্রহণ করতো, প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ভারতই শান্তিপূর্ণ পন্থার শ্রেষ্ঠত্ব এবং যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তথা শান্তিবাদ আন্তর্জাতিক মতদ্বন্দ্বের আসরেও একটা মহৎ আদর্শরূপে উপস্থিত করবার এবং তার প্রতি রাষ্ট্রসমূহকে সচেতন করবার দায়িত্ব পালন করতে পারছে।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অলিখিত গঠনতন্ত্রও পরিবর্তিত হয়ে গেছে ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রভাবে। ডোমিনিয়ন নয়, রিপাব্লিক হয়েও কমনওয়েলথে কোন রাষ্ট্রের সদস্যতা লাভের প্রথম দৃষ্টান্ত হলো ভারত। 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথে'ও তার ব্রিটিশ নামটি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে। কমনওয়েলথ এখন শুধু "কমনওয়েলথ অব নেশনস্', কমনওয়েলথ এখন আর শ্বেতাঙ্গের অথবা ইংরাজীভাষীর সংখ্যা প্রাধান্যে গঠিত রাষ্ট্রসমবায় নয়। কমনওয়েলথের বর্ণও বদলে গেছে, কমনওয়েলথে এখন অশ্বেতাঙ্গ মানবসমাজই হলো সংখ্যায় গরিষ্ঠ। ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটের প্রতি আনুগত্যের সম্বন্ধ স্বীকার না করে যে রাষ্ট্র সর্বপ্রথম কমনওয়েলথের সদস্য হয়েছে ; সে রাষ্ট্র হলো ভারত।

এশিয়া ও আফ্রিকা হতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অপসারণপর্ব প্রথম সূচিত হয়েছে ভারতেরই স্বাধীনতা এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। এশিয়াতে বর্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকাতে লিবিয়া রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ করেছে। পরশাসিত এইসব দেশ হতে সাম্রাজ্যিকের স্বাধিপত্য যে-সব ঐতিহাসিক কারণে অপসৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম কারণ হলো ভারতের ছত্রিশ কোটি মানুষের স্বাধিকার লাভের ঘটনা। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো যেখানে য়ুরোপীয় জাতি ও রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিদায় গ্রহণ করেনি, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেইসব স্থানেও ঔপনিবেশিক আধিপত্য তার অন্তিম অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রজাতন্ত্র ভারতের রাজধানী দিল্লীই আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র। বিশ্বের সমুদয় রাষ্ট্রের দূত এবং কূটনীতিক প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে দিল্লী এক্ষণে পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক অভিমত সৃষ্টির দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রজাতন্ত্র ভারতই আজ বিশ্বের দুই বিরোধী শক্তিব্লকের মধ্যে কাজে, নীতিকে এবং প্রভাবে বস্তুত যোগসূত্রেরই মত পরস্পরের সংশয়ে বিব্রত রাজনৈতিক অপ্রশান্তিকে সশস্ত্র সংঘর্ষবাদের উত্তেজনায় ভয়াবহ হয়ে উঠতে দিচ্ছে না। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক উভয় কারণেই প্রজাতন্ত্র ভারতকে আজ শক্তিদ্বন্দ্বের রূঢ়তাকে বিনম্র করবার এবং বিশ্বযুদ্ধ নামক এক বিরাট হঠকারিতার প্রকোপ থেকে আন্তর্জাতিক চিত্তকে মুক্ত করবার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে।

ইংলণ্ডের মত, মার্কিনের মত অথবা ফ্রান্সের মতও ভারত এক ভাষা, এক ধর্ম এবং একই সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কারের দেশ নয়। ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ও মার্কিনের রাষ্ট্রিক জীবনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অধিবাসীর ভাষা ধর্ম ইত্যাদি সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা অথবা বৈচিত্র্য কোন সমস্যার কারণ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করবার জন্য নেই। এই সব দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তেমন কিছু দুরূহ নয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে বাইশটি ভাষা এবং শত শত বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের বিভিন্নতা নিয়ে কোন দুরূহ পরীক্ষায় পড়তে হয়নি। কিন্তু ভারতের প্রজাতন্ত্র ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-সংস্কারের এই বহু বিচিত্রকে সমন্বিত করবারই এক মহান পরীক্ষার প্রথম সার্থক নিদর্শন। বস্তুত ক্ষুদ্র এক বিচিত্র পৃথিবীরই মত যাবতীয় ভাষা-ধর্ম-বর্ণের বৈচিত্র্যগত সমস্যাকে এক ভাবগত ঐক্যের সূত্রে সুসংযুক্ত করে প্রজাতন্ত্র ভারত মানব ইতিহাসের এমন একটি ব্রত গ্রহণ করেছে, যে ব্রতকে ভবিষ্যতের পৃথিবীর সেই বাঞ্ছিত 'এক-বিশ্ব' আদর্শেরই প্রথম ভূমিকা রচনার প্রচেষ্টা বলা যায়। ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কার—,'শ্বেতাঙ্গের উচ্চাধিকারবাদ', নাৎসীর 'হেরেনফোক' এবং আর্যামি ইত্যাদি জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কার, এমন কি ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিস্ট চিন্তার স্থূল সৃষ্টি একনায়কতন্ত্র নামক সামগ্রিক আধিপত্যবাদের সংস্কার এই প্রজাতন্ত্র ভারতেরই জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক পরীক্ষায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে চলেছে।

ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় জাতিসমূহ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীতে য়ুরোপীয় শক্তির প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং এশিয়ার শক্তিগত এবং অর্থনীতিগত ক্রমাবনতির সূচনাও হয়েছিল। সেই সঙ্গে ইতিহাসের বিগতপ্রায় তিনশত বৎসর হলো য়ুরোপীয় অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং এশিয়ার জীবনে দুর্বলতা ও অপমানের একটি অধ্যায় ; ভারতের স্বাধীনতা এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা য়ুরোপ এবং এশিয়ার এই শক্তিগত বৈষম্যের অন্তর্ধানের প্রথম ইঙ্গিত। এশিয়া আজ অর্থনীতিক শক্তিতে এবং সামাজিক সাম্যে অগ্রসর এবং য়ুরোপ ও মার্কিন বিশেষভাবেই উন্নত। উভয় ভূখণ্ডের মধ্যে এই ব্যবধান বিগত তিন শত বৎসরের সৃষ্টি হয়েছে, এবং এই ব্যবধান তথা অসামঞ্জস্যই বিশ্বের সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব জাতিগত শোষণ এবং আরও বহু অশান্তি ও অনর্থের কারণ। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা এশিয়ার জীবনে নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা আহ্বান করেছে। অদূর ভবিষ্যতে দুই ভূখণ্ড যেভাবে মিলিত হবে, সে মিলন হবে দুই সমানের এবং যোগ্যের মিলন, শক্তিমান ও দুর্বলের দুর্বল মিলন নয়। তারই সম্ভবনার প্রথম সার্থক আভাস, ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার মধ্যে ঐতিহাসিক লক্ষণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সেই সব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলিরই উল্লেখ করা হলো, যার প্রভাব বিশ্বের জীবনের এক নতুন পরিণামের ধারা উৎসারিত করবে। প্রজাতন্ত্র ভারতের আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কয়েকটি দিক মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় জীবনেরই বহু শুভ সম্ভাবনার মধ্যে একটি সম্ভাবনার কথাই আজকের দিনে বেশী করে মনে পড়ে। প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে ভারতবাসীর যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে, সে পথে বহু পরীক্ষা এবং সঙ্কটও আছে। অপরাহত সংকল্প সৎসাহস এবং সত্যনিষ্ঠাই ভারতের এই নবজীবন পথের পাথেয়। ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোন 'অভিযানের' প্রয়োজন হয়, সে অভিযান হবে কল্যাণ লাভের অভিযান। ভারতের শান্তির জন্যই বিশ্বশান্তির প্রয়োজন, এবং বিশ্বশান্তির জন্যই ভারতজীবনে শান্তির প্রয়োজন।

এই শান্তিবাদ ঐতিহাসিক শক্তিতে পরিণত করতে পারে ভারতের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক শক্তি। প্রজাতন্ত্র ভারতে সাধারণ মানুষ তার মানবিক অধিকার লাভ করেছে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তার আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়েছে মাত্র। এই সুযোগ সমূহভাবে সার্থক হলে ভারতের সাধারণ মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার যে স্ফুরণ সত্য হয়ে উঠবে তার রূপ আজ

শুধু কল্পনা করতে পারি। মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন বুঝি সফল হতে চলেছে। 'এক মুঠা ছাতু খেতে পেলে ত্রিলোকে এদের শক্তি ধরবে না।' ভারতের গণশক্তির এই বিরাট আত্মপ্রকাশের রূপ কল্পনা করতে পেরেছিলেন কর্মযোগী সন্ন্যাসী। বহুযুগের অবহেলার আঘাতে ভারতের সাধারণ মানুষের যোগ্যতা প্রতিভা এবং মনীষা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। ভারতের সংস্কৃতিকে নবরূপ দান করবার সুযোগ হতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত হয়ে রয়েছে ভারতের সাধারণ মানুষ। অধিকারের বৈষম্যে, শাসকগোষ্ঠীর আভিজাত্যে, বর্ণশ্রেষ্ঠের বিশেষ অধিকারে এবং আধুনিককালে ইংরাজীনবীশ এক শ্রেণীর অনুকরণ প্রিয় ঔদ্ধত্যে ভারতের সংস্কৃতি বস্তুত গোষ্ঠীবদ্ধরুচির সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যে সেই মুক্তিরও ইঙ্গিত দেখতে পাই, যার ফলে ভারতের সাধারণ মানুষই জাতির সাংস্কৃতিক সাধনার ক্ষেত্রে তার প্রতিভা নিয়োজিত করবার সুযোগ এবং অধিকার গ্রহণের পথে অগ্রসর হয়েছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এক সম্মেলনে তাঁর ভাষণে এই আক্ষেপ করেছেন যে, গ্রাম্য-পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা করে দেশের সরকার মস্ত ভুল করেছেন। গ্রাম্য-পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করে 'ব্রিটিশের স্থাপিত সুন্দর বিচার প্রথা' বিনষ্ট করবার এই প্রচেষ্টাকে তিনি নিন্দা করেছেন। ব্রিটিশ বিচার প্রথার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার না করেও বলা যায়, প্রধান বিচারপতি মহাশয় ভারতের সাধারণ মানুষের শক্তি যোগ্যতা এবং প্রতিভার ঐতিহাসিক পরিচয় বিস্মৃত হয়েছেন। বর্তমান ভারতের নিরক্ষর ও দরিদ্র সাধারণ মানুষই হলো জাতীয় যোগ্যতার প্রধান বাহক ও রক্ষক ; এবং শক্তির আধার। শুধু সুযোগের এবং অধিকারের অভাবে সে শক্তি কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। ভারতের এই প্রজাতন্ত্র ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সেই অধিকার ও সুযোগ বদ্ধদুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষেরই জীবনের জয়ে, প্রতিষ্ঠায়, অধিকারে এবং কল্যাণে ভারতের প্রজাতন্ত্র ঐতিহাসিক গরিমায় মণ্ডিত হবে। এই সংকল্পই হলো এই ছাব্বিশে জানুয়ারীর উৎসবাকুল চিত্তের সংকল্প।*

প্রজাতন্ত্রের তাৎপর্য

ভারতবর্ষ সিদ্ধান্ত করেছে, আর কিছু দিনের মধ্যেই, 'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' রূপে তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় ঘোষণা করবে।

সম্ভবত আগামী ১৫ই আগস্ট এই ঘোষণা হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘোষণা যে কত বড় পরিণামের সূচনা করবে, তার বিরাট তাৎপর্য আমাদেরই অনেকের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রজাতন্ত্র বা রিপাব্লিক রূপে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বরূপের আত্মপ্রকাশ, এর অর্থ হলো পৃথিবীর বৃহত্তম রিপাব্লিকের আবির্ভাব। বত্রিশ কোটি মানুষের নাগরিকতায় সমৃদ্ধ কোন প্রজাতন্ত্র আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে দেখা দেয়নি। এর পর দেখা দিতে চলেছে।

পৃথিবীর সভ্যতার ভূমি রূপে যে কয়টি দেশ ও জাতি আবির্ভূত হয়েছিল, ভারতবর্ষ তার অন্যতম, এবং বৃহত্তম বলতে পারা যায়। বিগত কয়েক যুগের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, সভ্যতার আদি ভূমি হিসাবে বিখ্যাত দেশগুলিই জীবনীশক্তিতে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতায় ক্ষুদ্রতর এবং দীনতর হয়ে গেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম এক প্রাচীনতম সভ্যদেশের রাষ্ট্রীয় পুনরভ্যুত্থান সফল হতে দেখা গেল। বর্তমান গ্রীস, ব্যাবিলন ও মিশর সম্পূর্ণ নতুন দেশ, তাদের অতীত চিরকালের মতই অতীত হয়ে গেছে। এসব দেশের প্রথম সংস্কৃতি এখন মাত্র ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই

[* পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে রচিত।]

সমাহিত হয়েছে, জনতার জীবনে তার কোন সাক্ষ্য নেই। একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই প্রবাহ ধর্ম অটুট হয়ে আছে। প্রাচীন সভ্যতার এক বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষ, বর্তমান যুগেই বৃহত্তম প্রজাতন্ত্ররূপে পরিণামে গ্রহণ করতে চলেছে।

ঐতিহাসিক পরিবর্তনেরও একটি নূতন নিয়মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো ভারতবর্ষ: প্রাচীনতম হয়েও আধুনিকতম হবার শক্তি, ভারতবর্ষ সমাজবিজ্ঞানেরই একটি নূতন মতবাদের বাস্তব প্রমাণ রূপে চিহ্নিত হলো।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে য়ুরোপীয় তথা পশ্চিমী সভ্যতার প্রসার এবং এশিয়ার রাজনৈতিক অবনতি অনেক মনীষার চিন্তায় এই ধরণের একটি সংস্কার সৃষ্টি করেছিল যে, পশ্চিমী সভ্যতাই বুঝি যথার্থ সভ্যতা এবং এশিয়ার সভ্যতা মিথ্যা। সভ্যতার অর্থই ভুল বুঝেছিল পশ্চিমী জগৎ। এশিয়ার সভ্যতা কয়েক হাজার বছরের চিন্তার দ্বারা গঠিত হয়েছিল। কয়েক হাজার বছর ধরে এশিয়াই পৃথিবীকে বিশিষ্ট এক ধরণের সভ্যতায় লালন করেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রভুত্বের নীতি দ্বারা গঠিত ও চালিত য়ুরোপীয় সভ্যতা মাত্র তিন চার শত বছর পৃথিবীতে প্রসারিত হয়েছে। এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সে সভ্যতার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত গলদ আছে। সে সভ্যতার বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ উভয়ের মধ্যে অনেক গুণ শক্তি ও সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও একটি মৌলিক ভ্রান্তি তাকে ভঙ্গুর করে রেখেছিল।

ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তিই ইতিহাসে সেই ইঙ্গিত, যার দ্বারা স্পষ্ট করে এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়ে গেল যে, য়ুরোপী সভ্যতার প্রাধান্য সমাপ্ত হয়ে গেল। আবার এশিয়ার জাগরণের অধ্যায় আরম্ভ হলো নতুন করে। এই জাগৃতির দীক্ষা সব চেয়ে বেশী সফল হয়েছে আধুনিক ভারতবর্ষের জীবন ও সাধনায়। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সভ্যতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন নায়কতার ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই মানুষের ইতিহাসে কতকগুলি সার্থকতার সন্ধান সহজ করে দিচ্ছে। সেইগুলি হলো বর্তমান যুগেরই কতগুলি বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পৃথিবীতে যে সব পরিবর্তন সহজসাধ্য করে তুলবে, মোটামুটিভাবে তার একটা ছোট তালিকা করা যায়।

(ক) এশিয়া ও য়ুরোপের সভ্যতার মৌলিক বিরোধ মিটে গিয়ে উভয়েরই একটি সাধারণ সমন্বয়ের সূত্রে লাভ করবে।

(খ) এশিয়ার জাগৃতি আরম্ভ হলো।

(গ) য়ুরোপ এবং এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির তারতম্য ঘুচে যাবে।

(ঘ) যুদ্ধ দ্বারা রাষ্ট্রীয় বিবাদ নিষ্পত্তির পন্থা বর্জিত হবে।

(ঙ) বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

(চ) মৈত্রীর নীতি দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলিই এক প্রকার 'এক-রাষ্ট্র' রূপে চলবার রীতি ও ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পারবে।

'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা 'বিশেষ সম্পর্ক' রেখে চলবে, ভারতবর্ষ এই সিদ্ধান্তও করেছে। কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকে এই কথাটির মধ্যে ব্রিটিশ প্রভাবের অস্তিত্ব আছে বলে সন্দেহ করেছেন। এই সন্দেহ কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষের কতিপয় ব্যক্তি এবং মস্কো বেতার ও পত্রিকাগুলির দ্বারাই প্রচারিত হয়েছে। এ ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর অভিমত হলো, ভারতবর্ষ এই সম্পর্ক দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। যে ঘটনা বস্তুত ভারতের ঐতিহাসিক জয়, সেই ঘটনাকেই কতিপয় ব্যক্তি পরাজয় বলে প্রচারের চেষ্টা করছেন। কমনওয়েলথে সম্পর্কহীন স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে যথার্থ পরিচয় থাকলে, যুদ্ধোত্তর কালের বিশ্বারাজনীতির পরিবর্তিত অবস্থার তাৎপর্য ধরতে পারলে, এবং সত্য নিষ্ঠা থাকলে,

তার পক্ষে এমন সন্দেহ ও বিভ্রমে পড়বার কোন কারণ থাকতে পারে না।

সংক্ষেপে বিষয়টিকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র 'স্বেচ্ছায়' ভারতবর্ষকে সহ-সদস্যরূপে পেতে চেয়েছে। ভারতবর্ষও 'স্বেচ্ছায়' কমন্‌ওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। একমাত্র ভারতবর্ষকেই প্রজাতন্ত্র হয়েও কমন্‌ওয়েলথে রাখতে অন্যান্য ডোমিনিয়ন সম্মত হয়েছে। অন্য কোন ডোমিনিয়নের পক্ষে এই বিশেষ অধিকার স্বীকার করার সিদ্ধান্ত লণ্ডন সম্মেলনে হয়নি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডরাজের আনুগত্য স্বীকার করবে না। ইংলণ্ডরাজ কমন্‌ওয়েলথের মাত্র প্রতীক-প্রধান হয়ে থাকবেন, কারণ কমন্‌ওয়েলথের সম্পর্কে রাজার কোন করণীয় কর্তব্য ক্ষমতা বা দায়িত্ব নেই।

কমন্‌ওয়েলথেরই কোন নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র নেই। কমন্‌ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ডোমিনিয়ন পরস্পরের প্রতি একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে বাধ্য নয়। নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী সকলেই চলবার ক্ষমতা রাখে। উদাহরণ গত মহাযুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ড (আয়ার) ডোমিনিয়ন হয়েও নিরপেক্ষ থেকে ছিল। কানাডা ডোমিনিয়ন হয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সামরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ডোমিনিয়ন ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ডোমিনিয়ন হয়েও নিরপেক্ষ থেকেছিল। ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন হয়েও পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী চুক্তি অবাধে করে চলেছে। কমন্‌ওয়েলথ সম্পর্ক এই দিক দিয়ে কোন বাধা দেয় না, বাধা দেবার অধিকারও নেই।

বর্তমান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে, তার বৈশিষ্ট্য কি? বৈশিষ্ট্য হলো, এশিয়ার সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের দাবী। প্যালেস্টাইন, ইসরাইল, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ইত্যাদি দেশের সমস্যা সম্পর্কে ভারতবর্ষ কোন দিক দিয়েই ব্রিটিশ পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। ব্রিটিশ যে দিকে ভোট দিয়েছে, ভারতবর্ষ তার বিরুদ্ধ দিকে ভোট দিয়েছে।

আর একটা বিষয় কল্পনা করা যাক। প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষ যদি কমন্‌ওয়েলথে সম্পর্ক রাখতে সম্মত না হতো, তবে কি হতো? ব্রিটেনের সঙ্গে 'চুক্তির' দ্বারা একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রচনা করার প্রয়োজন হতো। এই সব 'চুক্তি' কি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বেশী স্বাধীনতার প্রমাণ?

কদাপি নয়, বরং চুক্তির মধ্যেই বাধ্যবাধকতার চাপ থাকে বেশী।

পণ্ডিত নেহরু বলেছেন, বর্তমানে পৃথিবীতে কয়েকশত স্বাধীন রাষ্ট্র বলতে মাত্র চার পাঁচটি, এবং ভারতবর্ষ এই চার-পাঁচটির অন্যতম। যাঁরা বর্তমান যুগের নবতর পরিণামের লক্ষণগুলি বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা পণ্ডিত নেহরুর ঐ উক্তির তাৎপর্য বুঝেছেন। ভারত রাষ্ট্র বর্তমানে পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় পাঁচটি রাষ্ট্রের অন্যতম।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন, এশিয়ার নেতৃত্ব করার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষের ওপর এসে পড়েছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কোন দিক দিয়েই সীমাবদ্ধ নয়।

তাছাড়া আর একটা কথা। সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীন, এমন রাষ্ট্র পৃথিবীতে নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই বুঝে চলতে হয়। মার্কিন, রুশিয়া বা ইংলণ্ড, এর মধ্যে কেউ ইচ্ছে করলেই কিছু একটা করে উঠতে পারে না। অন্য রাষ্ট্রের সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতার ওপর নির্ভর অল্পবিস্তর সকলকেই করতে হয়। এই নির্ভরতাকে প্রভাবাধীনতা বলে না।

জাতীয় স্বার্থের কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের পক্ষে জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য যে যে বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন, সে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইংলণ্ডের সঙ্গে যদি বিশেষ সম্পর্ক ভারতবর্ষ রাখে, তার অর্থ ব্রিটিশের কাছে বিকিয়ে যাওয়া বোঝায় না। অথবা মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করলে মার্কিন ব্লকের মধ্যে আত্মসমর্পণ বোঝায় না। আসল কথা হলো, জাতির স্বার্থ,

জাতির সুবিধা এবং স্বার্থের জন্য মৈত্রীর সম্পর্ক প্রসারিত করা প্রত্যেক সুস্থ জাতির স্বভাব।

কমন্‌ওয়েলথ সম্পর্ক রেখে ভারতবর্ষ লাভ করছে সবই, অথচ ক্ষতি হয়নি কিছু। বাণিজ্যগত সুবিধার সবটুকুই ভারতবর্ষ পাবে, অথচ নিজের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতাও সম্পূর্ণ ভাবে অব্যাহত থাকবে। প্রাচীনতম সভ্য দেশে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। ইতিহাসে এ ঘটনা নতুন। যে ভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, তাও ইতিহাসে নতুন। অর্থাৎ অহিংস পন্থায় সংগ্রাম দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন, অভিনব ঐতিহাসিক ঘটনা বৈকি। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এই ঘটনা অভিনব ; শান্তিপূর্ণ ভাবে আলোচনার দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে এক বিরাট দেশ ও জাতিকে স্বরাষ্ট্র সম্পন্ন করে দেওয়া, ইতিহাসে এই ঘটনা ব্রিটিশের বৃহত্তম গৌরবের অধ্যায়। বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব, পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনাও নতুন। ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথও যে তার পুরাতন নীতি বর্জন করে নতুন হয়ে গেল। বিরাট সংখ্যক এশিয়াবাসী আজ কমন্‌ওয়েলথের মধ্যে এসেছে। পূর্বে কমন্‌ওয়েলথ ছিল শ্বেতাঙ্গের কমন্‌ওয়েলথ। সিংহল, ভারত ও পাকিস্থানকে নিয়ে ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথের শ্বেতাঙ্গত্বই বদলে গেছে। তার ওপর, প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রকেও কমন্‌ওয়েলথের সদস্য বলে স্বীকার করায় নতুন উদাহরণ দেখা দিল।

এতগুলি ঐতিহাসিক নতুন ঘটনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। এর তাৎপর্য বুঝতে কি এখনো আমাদের দেরী হবে? ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে বর্তমান যুগকেই যে নতুন রূপ গ্রহণ করার পথে নিয়ে চলেছে। নিজেদের এই মহত্ত্ব অনুভব করতে যদি কুণ্ঠিত হই, তবে ভুল হবে। জাতির ইতিহাসকে অসম্মান করা হবে।*

কৃষক মজুর ও শ্রেণীতত্ত্ব

ভারতবর্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ চলেছে। এই সম্পর্কে অনেক সঙ্ঘ সমিতি সভা ও ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। যাঁরা এই সব ইউনিয়ন ও সঙ্ঘের উদ্যোক্তা সংগঠয়িতা বা কর্মী তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করেন যে কৃষক ও শ্রমিকের জন্য এই রকম বিশিষ্ট এবং ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই আয়োজন।

ভারতবর্ষের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের এই উদ্যোগ ও সংগঠনের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই অ-কৃষক এবং অ-শ্রমিক।

যাই হোক, এই সব উদ্যোক্তাদের যদি প্রশ্ন করা যায়,—কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য এই ধরনের ভিন্ন সংগঠনের প্রয়োজন কি? সর্বসাধারণের স্বার্থ (অথবা 'মঙ্গল') প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে যদি কোন সংগঠন থেকে থাকে বা করা হয়, তার সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকেরাও সামিল হয়ে থাকলে দোষ কোথায়? কি ক্ষতি?

সচরাচর একটি কথা দিয়ে তাঁরা উত্তর দেন—শ্রেণীস্বার্থ। অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রেণীগত একটা ভিন্ন স্বার্থ আছে। সেই জন্য কৃষক ও শ্রমিক একান্তভাবে এমন কোন একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর সমস্ত আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, যার মধ্যে তাদেরই শোষক ব্যক্তি বা দল আছে। একজন শোষক-ব্যক্তির স্বার্থের প্রশ্ন আর একজন শোষিত-ব্যক্তির স্বার্থের প্রশ্ন একই সঙ্ঘের প্রকৃতির মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে না, কেননা এই উভয় 'স্বার্থ' সহযোগী নয়, প্রতিযোগীও নয়—বলা যায়, পরস্পর-বিরোধী।

কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের যুক্তি আমরা শুনলাম। এর পর, যে

[* রচনা কাল ঃ ২রা জুন, ১৯৪৯]

সকল প্রশ্ন একে একে আমাদের সম্মুখে আসে, সেগুলি আমরা বিবৃত করি। তারপর বিচার।

প্রশ্নগুলি সবই অতি সাধারণ ও প্রচলিত কতকগুলি কথা নিয়ে। শোষক কে? শোষিত কে? সমাজ কাকে বলি? শ্রেণী (class) কি?

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত প্রত্যেকটি কথার অর্থনৈতিক তাৎপর্যটাই বড়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই সর্বসাধারণের জীবনে যে অবস্থাগত স্তরভেদ ও তারতম্য রয়েছে, এগুলি তারই সংজ্ঞাবাচক শব্দ। কৃষ্টিগত কুল গোত্র বর্ণ জাত ইত্যাদি ভেদ হিসাবে এই সব পর্যায় নির্ণীত হয়নি।

শোষক কে? এই প্রশ্নকে বড় বেশী ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। অপরের শ্রমের ওপর যিনি নিজে পুষ্ট ও সম্পন্ন হয়ে ওঠেন, তিনিই শোষক। অপরের শ্রমার্জিত সম্পদ যিনি আত্মস্থ করেন তিনিই শোষক। এই হিসাবে আমরা বলি—জমিদার প্রজার শোষক, মিল-মালিক—মজুরের শোষক ইত্যাদি।

সমাজ ও রাষ্ট্রের আইনের সাহায্যেই জমিদার প্রজাকে শোষণ করেন, মিল-মালিক মজুরকে শোষণ করেন। সুতরাং, এই সঙ্গে আর একটা সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—শোষণ-ব্যবস্থা নামে একটা ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। এই ব্যবস্থারই দৈনন্দিন প্রসেস বা ক্রিয়া হিসাবে শোষক এবং শোষিত নিজ নিজ কাজ করে যায়, জীবন যাপন করে।

কৃষক এবং মজুর উভয়েই শোষিত, অতএব উভয়ে কি একই শ্রেণীর? যদি বলা যায় কৃষক ও মজুর উভয়ে একই শ্রেণীর, তবে উভয়েরই ভিন্ন সংগঠন হবার প্রয়োজন কি?

উত্তর হতে পারে—এই উভয় শ্রেণীকে শোষণের রীতি ভিন্ন রকমের। সুতরাং দুই ভিন্ন ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য দুই ভিন্ন ধরনের কর্মপন্থা নিয়ে দুই ভিন্ন সংগঠন প্রয়োজন।

এই উত্তর মেনে নেওয়া যাক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি উদাহরণ সামনে দাঁড় করাই :

মহাজনেরা শোষক। মহাজনের দ্বারা যারা শোষিত তারা খাতক। মহাজন দ্বারা খাতকের শোষণের প্রক্রিয়া ও রীতি ভিন্ন ধরনের। সুতরাং 'খাতক' ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজন নেই কেন?

কিন্তু খাতকদের মধ্যে কৃষক ও মজুর উভয়ই আছে। কৃষক একটি শ্রেণী, মজুর একটি শ্রেণী, এবং উভয়ে মিলে খাতক নামে একটি শ্রেণী—তা'হলে কি এই রকম একটা সিদ্ধান্ত করা উচিত? যদি তাই বলা হয়, তবে 'শ্রেণীর' বৈজ্ঞানিক অর্থ আর থাকে না।

এখানে একটা পাল্টা জবাবও কেউ দিতে পারেন ; খাতক-কৃষকের সমস্যা কৃষক-ইউনিয়ন বা সঙ্ঘেরই সমস্যা। খাতক-মজুরের সমস্যা মজুর-ইউনিযনেরই সমস্যা। কৃষক ও মজুরের নানা সমস্যার মধ্যে খাতকতার সমস্যাও একটি। সুতরাং এই সমস্যাকে ভিন্ন করে দেখার প্রয়োজন নেই। কৃষক সঙ্ঘ দেখবে খাতক-কৃষকের দুঃখ দূর করার পথ। মজুর সঙ্ঘে দেখবে খাতক-মজুরের দুঃখ দূর করার পথ।

আবার মেনে নেওয়া গেল, এই যুক্তি সত্য ও সঙ্গত। কিন্তু এই মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্ত আপনা আপনি সত্য হয়ে ওঠে—ভিন্ন ভিন্ন শোষণ রীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। খাতকেরা তাই একটি 'শ্রেণী' নয়। খাতকেরা হয় মজুর নয় কৃষক, অথবা অন্য কিছু।

যদি বলা হয়, যাঁরা অপরকে আর্থিক শোষণ করে তারা একটা শ্রেণী। তাহলে জমিদার মিল-মালিক এবং মহাজন সবাই এক 'শ্রেণী'তে এসে পড়ে। কিন্তু এই ভাবে বিচার করাই কি ঠিক? শোষণ-রীতির পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিচার করে শ্রেণী-স্বরূপ নির্ণয় করা ঠিক নয়?

শোষণের রীতি বা ফর্মের (form) পার্থক্যকে যদি আমরা আমল না দিই, তাহলে বলতে বাধ্য হব, শোষকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নেই। শোষক নামে একটি 'সম্প্রদায়' আছে।

হ্যাঁ, এইখানেই অনেক জটিলতা ও অস্পষ্টতা এসে ঢুকেছে। কৃষক ও মজুরের সংগঠক নেতা ও কর্মীদের লেখা, কথা ও বিবৃতির মধ্যে আমরা সচরাচর এই অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক একটা বিচার দেখতে পাই, তাঁরা একই নিশ্বাসে বলেন 'শোষক সম্প্রদায়' এবং 'শোষিত শ্রেণী'।

'শোষিত জনগণ' অথবা 'শোষিত সম্প্রদায়' কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। এইখানে যদি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করা হয়—শোষিত 'সম্প্রদায়' বলে যদি কিছু থাকে, তবে এই সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা সঙ্ঘ হোক না কেন? তিনি তখুনি উত্তর দেবেন--এই শোষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে যে!

তাঁকে আবার প্রশ্ন করুন--কি করে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হলো?

তিনি বলবেন—ভিন্ন ভিন্ন রকমের শোষণের (exploitation) ফলে ও রীতি অনুসারে।

জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে—উদাহরণ দিন।

তিনি তখনই উদাহরণ দেবেন--কৃষক ও মজুর।

প্রশ্ন করুন--তাহ'লে খাতকেরা কি? একটি ভিন্ন শ্রেণী নয়?

বেচারা কৃষকনেতা বা মজুরকর্মী তখনি তার চিন্তার অপরিচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট কুহেলিকার আড়ালে সরে পড়বে এবং উত্তর দেবে--না, খাতকেরা শ্রেণী নয়।

সুতরাং, এঁদের 'শ্রেণী'র সংজ্ঞা আমরা চেষ্টা করেও এঁদের কাছে পাই না। নিজের যুক্তিতে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে এঁরা শেষ পর্যন্ত একটা বচন মাত্র আশ্রয় করেন। প্রথমে বলবেন, জমিদার, মিল-মালিক, মহাজন--এরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। কিন্তু সেই যুক্তিতে কৃষক, মজুর ও খাতক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হলেও এঁরা তা স্বীকার করবেন না। এঁদের যুক্তি 'কৃষক ও মজুর' পর্যন্ত পৌঁছে খাতকের বেলায় পিঠটান দেয়।

তারপরেই বলবেন--শোষকেরা হলো একটি 'সম্প্রদায়', কিন্তু সেই যুক্তিতে শোষিতেরা একটি সম্প্রদায়, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না।

কেন করেন না?

করেন না এই কারণে যে, তাহ'লে শোষিত সম্প্রদায়কে নিয়েই একটি সংগঠন হতে পারে। কিষাণ আর মজুরদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংগঠনের সার্থকতা বাতিল হয়ে যায়।

এইবার সম্ভবত কোন পেশাদার মজুর-নেতা এগিয়ে এসে উত্তর দেবেন : জীবিকাগত শ্রম হিসাবেই (occupational labour) ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ গঠন করার জীবিকার ভিত্তি ও পদ্ধতি ভিন্ন, মজুরের জীবিকার ভিত্তি ও প্রয়োজন। কৃষকের পদ্ধতি ভিন্ন। তাই এই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ।

অর্থাৎ কৃষকেরা কৃষিজীবী এবং শ্রমিকেরা শ্রমজীবী।

এই ধরনেব হাস্যকর ভাষা এবং ব্যাখ্যা, আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। সমাজতন্ত্রের বিচারে, এই ধরনের শিথিল এবং লঘু এক একটি বচন নিয়েই মজুর ও কৃষকের মার্কামারা হিতৈষীরা সন্তুষ্ট আছেন। আবার অপরকে বুঝিয়ে বিজ্ঞ করে তোলারও দায়িত্ব এঁরা নিয়েছেন।

কৃষকেরা কৃষিজীবী, এর অর্থ আমরা কি বুঝবো যে কৃষকেরা শ্রমজীবী নয়? কৃষি কি শ্রম নয়? কৃষকেরা কি 'মজুর' নয়? সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রগত অর্থে কৃষক ও মজুরের পার্থক্য কি?

কোন বিজ্ঞ শ্রমিক-নেতা এখুনি একেবারে আশ্চর্য হয়ে উত্তর দেবেন—কি যে বলেন মশাই! Rent আর Wage এর পার্থক্য বোঝেন না? কৃষকরা দেয় Rent আর মজুরেরা পায় Wage। উভয়ের জীবিকার আর্থিক প্যাটার্ন ভিন্ন।

তাঁকে প্রশ্ন করি, তুলনাটা কি রকম হলো? কৃষকেরা দেয় Rent, আর মজুরেরা কি দেয় বলুন? একজন যা 'দিল' আর একজন যা 'পেল'—এই দুই ভিন্ন জিনিসকে একসঙ্গে আনছেন কেন?

তিনি নিশ্চয় উত্তর দেবেন—মজুরেরা দেয় শ্রম বা লেবার।

আমরাও এইখানে স্বীকার করি, এইবার উত্তরটা ঠিক হয়েছে। সুতরাং আমরা এইবার অনুরোধ করবো শোষিতদের মধ্যে সংগঠনের কাজ এই নীতি হিসাবেই হোক। অর্থাৎ Rent-payers' Union এবং Wage-earners' Union ; খাজনা দিয়ে যে ব্যক্তি (জমিতে) 'শ্রম' করে, এবং যে ব্যক্তি 'শ্রম' করে মজুরী পায়—এই দুই ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের গঠনে পার্থক্য আছে। সুতরাং, যদি 'শ্রেণী' বিচার করতে হয়, তবে এইভাবেই করা হোক!

কিন্তু কই, সেভাবে বিচার তো হয় না! যদি তাই হতো, তবে দেখা যেত যে, জমিতে শ্রম করে যে মজুরী পায় অর্থাৎ জমি মজুর বা ভূমিহীন কৃষক, তার স্থান হবে শ্রমিক সঙ্ঘ বা লেবার ইউনিয়নে। অপরদিকে, আমরা জানি, অকৃষি শ্রমেও রেন্ট-প্রথা আছে। যেমন একজন রিক্সা কুলি। সে রিক্সা মালিককে দৈনিক বা সাপ্তাহিক একটা নির্দিষ্ট রেন্ট দিয়ে, তারপর রিক্সা নিয়ে শ্রম করে এবং উপার্জন করে। অতএব এই রিক্সা কুলির স্থান (রেন্ট-দাতা) কৃষকদের সঙ্ঘে।

আমাদের মজুর-হিতৈষী এবং কৃষকপ্রেমিক কর্মী ও নেতার দল আবার আপত্তি তুলবেন। এবং মাত্র এই একটি যুক্তি দিয়ে আমাদের থামিয়ে দেবেন—কৃষক হলো কৃষক আর মজুর হলো মজুর। ব্যাস্, দুই ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন চাই।

আমরাও স্বীকার করবো,—হাঁ, এই যুক্তি ছাড়া তাঁদের আর কোন যুক্তি নেই। সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে বা অর্থনৈতিক প্রকৃতি বিচার করে তাঁরা কৃষক ও মজুরের সংজ্ঞা পরিষ্কার করে বুঝে নেননি। তাঁরা নিতান্ত স্থূল অর্থে কৃষক ও মজুর নামে দুই শ্রেণী ভাগ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ—(১) যারা জমিতে কায়িক শ্রম করে এবং (২) যারা জমি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কায়িক শ্রম করে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে কায়িক শ্রমের যোগাযোগ বা সম্বন্ধটা (relationship) কি ধরনের সেই দিক দিয়ে পার্থক্য নির্ণয় করে তাঁরা কৃষক ও মজুরকে বিচার করেননি।

বেশ, তাঁরা যাকে ক্ষেত্র বলছেন, সেই ক্ষেত্রেই এসে আমরা এবার সওয়াল করি।

কৃষিজীবী বা কৃষক অর্থই কি একটা শোষিত সম্প্রদায় (বা শ্রেণী)? ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ বিত্তশালী শোষক কৃষিজীবী যে আছেন, সেই বাস্তব সত্যকে এড়ানো যায় কি করে? অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, নানা রকম কৃষক আছেন। (১) যিনি নিজের জমিতে চাষবাস করে বেশ দু'পয়সা করেছেন। অর্থাৎ সচ্ছল সত্যিকারের কৃষক, (২) যিনি নিজের জমিতে চাষ করেও দুঃস্থ হয়ে আছেন, (৩) যিনি নিজের জমিতে মজুর লাগিয়ে শস্য উৎপাদন করেন, (৪) যিনি নিজের জমিকে অপরের কাছে ঠিকা বাটাই বা বর্গা দিয়ে উৎপন্ন ফসলের ভাগ গ্রহণ করেন, এবং (৫) ভূমিহীন কৃষিমজুর।

জমিদারীর প্রদেশে, অথবা রায়তবারী প্রদেশে, উভয়ত কৃষিজীবীরা এই কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত।

উক্ত ৩ নং প্রথাটি মূলত ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বা capitalist প্রথা। ৪নং প্রথাটি হলো জমিদারী বা সাবেকী য়ুরোপের ফিউডাল প্রথা। রায়তবারী প্রদেশে, যেখানে নামে জমিদার নেই, সেখানে কাজে জমিদারগিরি আছে। অর্থাৎ একজন কৃষক তার নিজস্ব জমি অপরের কাছে বর্গা বা বাটাই দেয়।

এইবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা যাক—আমাদের দেশে কৃষক সঙ্ঘগুলির মধ্যে কোন ধরনের কৃষকের স্থান? এগুলি কি কৃষক-সাধারণের সঙ্ঘ? যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে,

এর মধ্যে শোষক এবং শোষিত উভয়েই একসঙ্গে এসে ভীড় করেছে।

এবং, আমরা জানি বর্তমান কৃষক সঙ্ঘগুলি এই রকম মাত্র ভূমিজীবী লোকের সঙ্ঘ। যে-নিয়মে কৃষক-সঙ্ঘে ৪ নম্বরের কৃষক স্থান পেয়েছে, সেই নিয়মে এর মধ্যে জমিদারদেরও স্থান হতে পারে। শুধু জমিদার কেন? ৩ নম্বরের কৃষকেরা যে সঙ্ঘে আছে, সেই সঙ্ঘে তাদেরই অর্থনৈতিক মাসতুতো ভাই চা-করেরাও (Tea Planters) থাকতে পারেন।

পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে কৃষকেরাও মজুর। একদল কৃষক মাত্র কায়িক শ্রম অর্থে মজুর। আর একদল কৃষক অর্থনৈতিক অর্থে মজুর--তারা শ্রম বিক্রয় করে।

কিন্তু আর একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো--ভারতের মজুরেরাও কৃষকবর্গের মানুষ। অর্থাৎ গ্রামের মানুষ। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে ভারতের মজুরেরা সামাজিক ভাবে গ্রাম-সংস্কৃতির মানুষ। প্রকৃতিতে তারা পূর্বলিখিত কৃষক সমাজের ১ থেকে ৫ নং পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ের মানুষ। বিশেষ করে কারখানার মজুরদের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। হুইট্‌লি রিপোর্ট অর্থাৎ Royal Commission on Labour'-এর সিদ্ধান্ত ও তথ্যগুলির মধ্যে আমরা এর সমর্থন পাই। ঐ রিপোর্টের কয়েকটি কথা ও মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

(১) ভারতের শহর ও কারখানার মজুরেরা প্রধানত গ্রামের লোক। য়ুরোপের মজুরের মত তারা শহরজাত মানুষ নয়।

(২) ভারতের মজুরেরা কিছুদিনের জন্য শহরে ও কারখানায় কাজ করে। তারপর স্বগ্রামে ফিরে যায়।

(৩) মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে অথবা মনেপ্রাণে (at heart) কারখানা মজুরেরা গ্রামবাসী।

(৪) মজুরদের কিছু অংশ কৃষিজীবী।

(৫) ভারতীয় কারখানা মজুরের সামাজিক সত্তার ভিত্তি (social root) গ্রামের মধ্যেই নিহিত।

(৬) জীবিকাভ্রষ্ট গ্রাম্য কারিগর ও কৃষকেরাই অধিকাংশ শহরের কারখানার মজুর।

হুইট্‌লি রিপোর্টে আর একটি মন্তব্য আছে : Our considered opinion is that, in present circumstances, the link with the village is a distinct asset and that the general aim should be, not to undermine it, but to encourage it and as far as possible, to regularise it.

হুইট্‌লি রিপোর্টের তথ্য ও মন্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, ভারতের কারখানার ও শহরের মজুরেরা এখনো একটি 'ক্লাস' (শ্রেণী) হিসাবে পরিণত হয়নি। আজ কৃষক, এক বছর পরে কারখানার মজুর এবং চার বছর পরে আবার কৃষক বা গ্রামবাসী--এই হলো কারখানা মজুরের জীবিকা বা অর্থনৈতিক জীবনের প্রকৃতি। কারখানা মজুরের সমাজ আজও গ্রাম-সমাজ। যদি তাকে 'শ্রেণী' বলা হয়, তবে সে গ্রাম্য শ্রেণী মাত্র। তার মনস্তত্ত্ব, উৎসব, রুচি, পরিবার-প্রীতি, ভূমিস্নেহ, সমাজের সংযোগ, শেষ জীবনের আশ্রয়--সবই গ্রামের মধ্যে নিহিত। সে কৃষক-সংস্কৃতির মানুষ। ভারতের কারখানা মজুরের মধ্যে শ্রেণীবোধ আছে বলার অর্থ জোর করে একটা মূঢ়তাকে ঘোষণা করা। সে মেশিনকে ও কারখানাকে ঘৃণা করে। সে জমিকে ভালবাসে।

অতএব, কি হওয়া উচিত ছিল? উচিত ছিল মজুর সম্প্রদায়কে এবং কৃষক সম্প্রদায়কে একই সংগঠনের মধ্যে সমাবেশ করা। ভারতের কারখানা মজুরের ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক-বৈষয়িক স্বরূপ হলো তার কৃষকত্ব। সে কৃষক-সমাজের মানুষ।

কৃষক ও মজুরের মধ্যে অর্থনৈতিক লক্ষণ অনুসারে একটা স্পষ্ট পার্থক্যের দাঁড়ি টানা যায় না। বিত্তের পার্থক্য দিয়ে, কৃষ্টির পার্থক্য দিয়ে, শিক্ষার পার্থক্য দিয়ে বা অর্থনৈতিক

প্যাটার্নের পার্থক্য দিয়ে, কোন ভাবেই কৃষি ও মজুরকে দুটি বিশিষ্ট বিভাগে ভাগ করা যায় না। তা ছাড়া, যদি শুধু হাতের লাঙল দেখেই কৃষক আখ্যা দিতে হয়, তবে বহু আধুনিক জনক রাজা কৃষকের পর্যায়ে ঢুকে পড়বেন। কিম্বা হাতের হাতুড়ি দেখেই যদি মজুর চিনতে হয়, তবে বহু ময়দানবকে মজুর বলে ভুল হবে।

তা ছাড়া কয়েক কোটি ভারতবাসী আছেন, যাঁরা প্রতিদিনের জীবনেই অর্ধেক কৃষক এবং অর্ধেক মজুর।

আমরা সচরাচর একটা কথা শুনে থাকি—'চা-বাগানের শ্রমিক'। চা-বাগানের শ্রমিককে আমরা লেবারার কুলি বা মজুর বলে থাকি। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে দেখি. মজুরের সংজ্ঞা সম্বন্ধে ভুল করা হয়নি। মজুরীর বিনিময়ে কৃষিঘটিত কাজ করে, তাই চা-বাগানের শ্রমিকেরা 'মজুর' হয়েছে, 'কৃষক' হয়নি।

কিন্তু আর এক ক্ষেত্রে আমাদের ভাষার মধ্যে সংজ্ঞাগত ভুল হয়ে থাকে—'ভূমিহীন কৃষক' কথাটির মধ্যে। মজুরীর বিনিময়ে কৃষিঘটিত কাজ করে এরং, তবু এদের 'কৃষক' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে এবং কৃষক সঙ্ঘের কর্তারা এদের অভিভাবকত্ব করবার জন্য এগিয়ে আসেন।

কারখানা শ্রমিকদের সঙ্ঘেও নিতান্ত শ্রমিক ছাড়া, ফোরম্যান, টাণ্ডেল, মিস্ত্রী, সর্দার ইত্যাদি ব্যক্তিরা স্থান পায়। কারখানার সমগ্র কাজের মধ্যে এই শেষোক্ত ধরনের ব্যক্তিদের কাজ হলো শ্রমিকদের ওপর শোষণের কাজ। অর্থাৎ এদের ভূমিকা—শোষণের ভূমিকা। এরা শুধু সাপ্তাহিক বা মাসিক বেতন নিয়ে নয়, কমিশন প্রথায় এবং কন্ট্রাক্ট প্রথায় শ্রমিকদের ওপর এমন এক ধরনের প্রভুত্ব করেন, যার প্রকৃতি হলো শোষণ অর্থাৎ শ্রমিকের ন্যায়ার্জিত প্রাপ্যের একটা অংশ এঁরা আত্মসাৎ করেন। কারখানা জীবনে যাদের অর্থনৈতিক সত্তা শোষকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তারাও মজুর ইউনিয়নে স্থান পায় এবং 'একই স্বার্থের' জন্য মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে নাকি লড়াই করে!

এখানে আমরা আবার এক ধরনের শ্রেণীতত্ত্বের ব্যাখ্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়াই। অনেকে বলবেন, মজুর ইউনিয়নের নেতারা বলে থাকেন, মার্ক্সের ব্যাখ্যা তুলেও অনেকে বলে থাকেন যে--middle class বা মধ্য শ্রেণী নামে একটা শ্রেণী আছে। এই মধ্য শ্রেণীর কাজ হলো শোষণব্যবস্থার মধ্যে শোষকের পক্ষে দালালের কাজ করা। অর্থাৎ সে স্বয়ং শোষক নয়, শোষকের এজেন্ট।

যদি তাই হয়, তবে তারা শোষিত শ্রমিক সাধারণের ইউনিয়নে স্থান পায় কেন? এরা তো ভিন্ন শ্রেণীর লোক।

মধ্যশ্রেণীকে আবার অদ্ভুত একটা কথা দিয়ে প্রায়ই সংজ্ঞাত করা হয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা সম্প্রদায়।

এই সব শ্লথ সংজ্ঞা প্রমাণ করে যে শ্রেণী বা সম্প্রদায় ইত্যাদি কথাগুলির কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বক্তাদের উপলব্ধির মধ্যে নেই। কারণ—(১) মধ্যবিত্ত মাত্রই মধ্যশ্রেণীর (শোষকের এজেন্ট) কাজ করে না। (২) মধ্যশ্রেণীর বহু ব্যক্তি আছে যাঁরা বিত্ত হিসাবে শোষিতের চেয়েও নীচু।

একজন সৈনিক বা কেরানী শোষকের এজেন্ট বা মধ্যশ্রেণীর মানুষ। বিত্ত হিসাবে সে বহু মজুরের ও চাষীর চেয়ে নিকৃষ্ট এবং গরীব হতে পারে। কিন্তু তার অর্থনৈতিক ভূমিকা (Role বা Status) হলো শোষকের পক্ষে দালালি।

এইবার অনুমান করা যাক, শোষণ ব্যবস্থার কাঠামোটা এই রকমের—প্রথম শোষক শ্রেণী, মাঝখানে তাদের এজেন্ট বা মধ্যশ্রেণী এবং তারপর সবার অধম শোষিত শ্রেণী।

কিন্তু সত্যিই কি শোষণ ব্যবস্থার প্যাটার্নটা এই ধরনের তিনটি সুস্পষ্ট ডিপার্টমেন্ট বা

ক্রমিক স্তরে ভাগ করা?

না, মোটেই নয়। মধ্যশ্রেণী নামে একটা বিশিষ্ট পর্যায় আমরা দেখি না। মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই উর্ধ্বতন থেকে অধস্তন স্তর পর পর নেমে গেছে। মধ্যশ্রেণীর মানুষ স্বয়ং নিজে শোষিত ; সে তার নীচের একটা দলকে শোষণ করে। এই দল আবার তার অধস্তন দলকে শোষণ করে। এইভাবে এজেণ্ট বা মধ্যশ্রেণীর মধ্যে একটা স্তরবিন্যাস আছে। ব্যবস্থাটা ধাপে ধাপে নেমে গেছে। সর্বোচ্চ শোষক মালিক এবং সর্বনিম্ন শোষিত শ্রমিকের মাঝখানে অনেকগুলি মধ্যশ্রেণী রয়েছে। এদের ওপর শোষণ কার্যের বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। বেতন রূপে বা মুনাফার অংশ রূপে এরা 'দালালি' পেয়ে থাকে।

শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রকেই ভুল করে মধ্যশ্রেণীর মানুষ বলা হয়ে থাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক অর্থাৎ বুদ্ধিশ্রমজীবীদের মধ্যে দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক সত্তার মানুষ আছে। সমাজতত্ত্বের নিয়মে এরা দুই শ্রেণী—(ক) প্রথম হলো, যাঁরা বুদ্ধিশ্রম দিয়ে শোষকের পক্ষে দালালি করেন। এঁরা প্রকৃত মধ্যশ্রেণী (Middle class)। (খ) দ্বিতীয়, যাঁরা বুদ্ধিশ্রম দিয়ে নিছক একটা খাটুনি বা 'job' খাটেন। বুদ্ধিশ্রমকে যদি 'শ্রম' বলতে বাধা না থাকে, তবে এঁরাও শ্রমিক। দৈনিক ৮।১০ ঘণ্টা ধরাবাঁধা নিয়মে এরা খাতা লেখেন, টাইপ করেন, হিসাব রাখেন।

বুদ্ধিশ্রম এবং কায়িক শ্রমকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটি ভিন্ন বিষয় বলে মনে করা যায় কি? এই দুই শ্রমকে শোষণের রীতি নীতি ও প্রকৃতি কি ভিন্ন রকমের?

না, তা নয়। একই প্রসেস, একই পরিণাম, একই দুঃখদাহনের ও অনাচারের সৃষ্টি এবং মনুষ্যত্ব খর্ব করার আয়োজন।

যদি প্রস্তাব করা যায় যে, এক একটি জীবিকা হিসাবে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হওয়া উচিত : প্রস্তাব করার দরকার নেই, বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এই ভাবে এক একটি জীবিকার ভিত্তিতে গঠিত। যথা রিক্সাচালক ইউনিয়ন, ক্ষৌরকার ইউনিয়ন, পাচক ইউনিয়ন, ভৃত্য ইউনিয়ন, দোকান-কর্মচারী ইউনিয়ন, পোস্টাল-কেরানী ইউনিয়ন ইত্যাদি।

কিন্তু এর মধ্যে এক স্বার্থের সূত্র কোথায়? কেরানী ইউনিয়ন এবং ভৃত্য ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধের সম্পর্কটা বড়। ভৃত্যেরা কেরানীকে তাদের শোষক মনে করে। কেরানীরা মার্চেণ্ট অফিসকে তাদের শোষক মনে করে। জীবিকা হিসাবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তাই এক একটি 'শ্রেণী'গত ইউনিয়ন বলা যায় না। যদি তাই বলা হয়, তবে বলতে হবে প্রত্যেক 'জীবিকাই' এক একটি ভিন্ন শ্রেণীর ভিত্তি এবং ভারতবর্ষে তাহলে কয়েক হাজার শ্রেণী আছে।

বলা বাহুল্য সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে এই ভাবে 'শ্রেণী'কে সংজ্ঞাত করা হয়নি। এই ভাবে বললে, 'শ্রেণীর' কোন অর্থনৈতিক পরিচয় থাকে না।

ভারতবর্ষের মত পররাষ্ট্র শাসিত ঔপনিবেশিক আপনার দেশের মনুষ্যসমাজে মধ্যশ্রেণী অনেক আছে।

এখন প্রশ্ন, এই মধ্যশ্রেণীর প্রথম বর্গে কারা আছেন? ভারতীয় পুঁজিপতিরা কি মধ্যশ্রেণী? ভারতের শোষণ ব্যবস্থার প্রথম বর্গের শোষক কারা?

ভারতীয় পুঁজিপতিরা কোটিপতি হতে পারেন, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক ভূমিকাটি কি?

আমাদের অবশ্যই বলতে হয়, এঁরা মধ্যশ্রেণী।

ভারতের শোষণ ব্যবস্থার মূল গুণ ধর্ম ও প্যাটার্ন হলো সাম্রাজ্যবাদী। এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা যাঁরা চালু রাখছেন, তাঁরা সেই ভাবে ভারতের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে গড়ে

নিয়েছেন। এই State বা রাষ্ট্রিক অধিকার যাঁদের হাতে, তাঁদের মধ্যে আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের স্থান নেই। আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা ঐ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার কর্তাস্থানীয় নন। তাঁরা অনুগত আজ্ঞা-বাহক সুবিধাপ্রাপ্ত (Privileged) একটি দল, রাষ্ট্রিক কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী দাওয়া করে কতগুলি আদায় করেন মাত্র। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বড় বড় দায়িত্বগুলি এঁরা গ্রহণ করেন। এঁরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন শোষক নন। এঁরা নিছক এজেন্ট, Middle-class মাত্র। ইংলণ্ডে যে অর্থে কোন ভদ্রলোক একজন ক্যাপিটালিস্ট, এঁরা অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিপতিরা সেই অর্থে সাব-ক্যাপিটালিস্ট। ভারতবর্ষের মত পরাধীন ঔপনিবেশিক (colonial) অবস্থার দেশে প্রধান ও প্রথম শোষক হলেন তাঁরাই যাঁরা এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্তা। ভারতের 'দেশী রাজা' এবং জমিদার উভয়েই মধ্যশ্রেণী বা দালাল মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের রক্ষণাবেক্ষণে ও মুরুব্বিয়ানার আশ্রয়ে এঁদের উৎপত্তি ও স্থিতি। এঁরা অনুভব করেন যে, এঁদেরও শোষক আছে। এঁদের ওপর অন্যায় করা হয়। এঁদের ওপরও আর্থিক বা সাম্পদিক অবিচার করা হয়।

এই পর্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে আমরা যে সব বিষয় আলোচনা করলাম, তার মধ্যে একটি সত্যের ইঙ্গিত এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। এই বিষয়টিকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের প্রভাবে সমাজ ঠিক শ্রেণীগত শোষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে না। অবস্থা পরিণাম ও অবনতি আরও খারাপ এবং আরও জটিল দুঃখকর। এ হেন দেশে এক 'শ্রেণী' ঠিক আর এক 'শ্রেণীকে' শোষণ করছে—ব্যাপারটা এত স্পষ্টাস্পষ্টি ও কাটাছাঁটা নয়। এ হেন দেশের সমাজে যে ভাঙন দেখা দেয়, সে-ভাঙন ষোল-আনা ভাঙন। শ্রেণীবদ্ধতা বা শ্রেণীচেতনা নামে কোন সু-সংস্কারেব সৃষ্টির আশাও এর মধ্যে নেই। সমাজ নিতান্ত কয়েক কোটি ব্যক্তি হিসাবে (Individually) চূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখানে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির শোষক। যে নিজে শোষিত, সে-ই আবার অপরের শোষক।

বাংলা ভাষায় 'সর্বহারা' নামে একটা কাব্যিক কথা দিয়ে যে কি বোঝায়, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। এদেশে each against each—সমগ্র শোষণ ব্যবস্থা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এই ভিত্তির ওপর রয়েছে।

এবং, এদেশেরই শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘের সংগঠন ও রীতিনীতির মধ্যে এই বাস্তব ঐতিহাসিক উপলব্ধির কোন স্বীকৃতি দেখতে পাই না। উদ্যোক্তারা পশ্চিমী শাস্ত্র থেকে বেছে বেছে কতকগুলি কথা গ্রহণ করেছেন এবং পশ্চিমী আন্দোলনের পদ্ধতিগুলিকে হুবহু কেতাবী ধরনে অনুকরণ করছেন। ফলে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটা সালিশী বোর্ড মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে বিতণ্ডা করে একটু মজুরী বৃদ্ধি করিয়ে নিতে পারলেই কাজ ফুরিয়ে গেল। শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত শিক্ষা দীক্ষা প্রচারের এবং দেশ-জাতি-সমাজ বোধ জাগ্রত করায় কোন চেষ্টা শ্রমিক ও কৃষক নেতারা করেন না। নিছক একটা স্বার্থবাদের আদর্শ প্রচার করা হয়। 'শ্রেণী' বা 'সমাজ' বলতে কোন বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রতি উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধা নেই।

"But a wide colonial policy has led to the European Prolelariat party falling into such a position that the whole of society does not exist by its labour, but by the labour of the almost enslaved colonial slaves." (Lenin) ; অন্তত লেনিনের মত মনস্বীর কথায় আস্থা রেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে য়ুরোপের সমগ্র সমাজ এবং সেখানকার 'সর্বহারার' দলও আমাদের শোষক।

এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে ভারতীয় আন্দোলনের রূপ কি ধরনের হওয়া উচিত? 'শ্রেণী' বলে কোন জিনিষ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছি। আমাদের

সমাজে এখনো আমরা মার্ক্স কথিত অর্থনৈতিক 'শ্রেণী' পাইনি. জীবিকা হিসাবে এবং সম্প্রদায় হিসাবে সংগঠন হতে পারে এবং সেই ভাবেই হয়েছে। কিন্তু এই সংগঠনের মধ্যেই গলদ রয়ে গেছে। এই ধরনের সঙ্ঘ 'এক লক্ষ্য' বা 'এক স্বার্থ' প্রণোদিত হতে পারে না। এর ফল হবে—"Room after room, we hunt the house through"। খণ্ড খণ্ড ভাবে স্বার্থ রক্ষার আয়োজনে পরস্পর বিরোধের দিকটাই প্রবল হয় এবং মূল লক্ষ্য পণ্ড হয়।

আমাদের সমাজ কয়েক কোটি 'ব্যক্তি'তে পরিণত হয়েছে। শ্রেণীগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থরক্ষার মত ঐক্যবোধও নেই। জীবনের পদ্ধতিও সেই রকমের নেই। এই বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে, সকল সংগঠনের আয়োজনকে চালিত করা উচিত। আমাদের বর্তমান কৃষক মজুর ও 'জীবিকা'-গত সঙ্ঘগুলির রীতি-নীতি প্রকৃতির মধ্যে একটা গলদ রয়ে গেছে। সর্বাগ্রে এই গলদ পরিহার করে, নূতন ভাবে সংগঠনের রূপ দিতে হবে।

কবি অতুলপ্রসাদ

সঙ্গীতের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরের একটি রাস্তার নাম 'এ পি সেন রোড'। এই রাস্তাকেই বক্ষে ধারণ করে লক্ষ্ণৌ শহর তার এক শ্রদ্ধেয় ও সজ্জন নাগরিকের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে। লক্ষ্ণৌবাসীর শ্রদ্ধার আস্পদ সেই এ পি সেন আজ আর নেই, আজ থেকে আঠারো বছর আগে এক ২৬ আগস্টে লক্ষ্ণৌ-এর রাত্রি সর্বজনপ্রিয় সজ্জন ও ব্যারিস্টার শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। লক্ষ্ণৌ-এর এই প্রিয় নাগরিকের শবাধাব বহন করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমান। বুঝা যায়, বাঙালী এ পি সেনকে লক্ষ্ণৌ শহর তার চিত্তের গভীরে কি শ্রদ্ধায় কত আপন করে নিয়েছিল! বাঙালী-অবাঙালী এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লক্ষ্ণৌ-এর সকল মানুষ সমভাবে ব্যথিত হয়ে সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন, লক্ষ্ণৌ শহরেরই নাগরিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করে দিয়ে কৃতী আইনব্যবসায়ী, লিবারেল নেতা, সমাজসেবক এবং সঙ্গীতসাধক এ পি সেন নরধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন।

আজকের ২৬ আগস্টে সেই আঠারো বছর আগের শোকার্ত দিবসটিকে স্মরণ করতে গিয়ে সবচেয়ে আগে এবং সহজেই মনে পড়ে, সেদিন লক্ষ্ণৌ-এর ক্ষতির চেয়ে বেশি ক্ষতির বেদনা সহ্য করতে হয়েছিল বাঙালী অতুলপ্রসাদের বাংলা সাহিত্যকেই, বিশেষ করে বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে। 'মোদের গরব' ও 'মোদের আশা' বাংলাভাষাকে সুমধুর করার জন্য যিনি ভাব ও সুরের সাধনায় ব্রতী ছিলেন, তাঁর অভাব আজ আঠারো বছর পরে আরও বেশি করে অনুভব করা যায়। কারণ, বাংলাভাষাকে সুরান্বিত করার এবং সুরকে ভাষান্বিত করার সে প্রতিভা বাংলারই গুণীজীবনে আজ বিরলতর হয়ে এসেছে।

ঢাকা শহরে ১৮৭১ সালের ২৩ অক্টোবর অতুলপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তেরো বৎসর বয়সে পিতৃহীন হবার পর অতুলপ্রসাদ তাঁর মাতামহ শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্তের গৃহে লালিত হতে থাকেন। এই গুপ্ত পরিবার বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সুসংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার। ভগবদ্‌ভক্ত, সুকবি ও সুকণ্ঠ কালীমোহনের শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব কিশোর অতুলপ্রসাদের অন্তরে অবশ্যই সেই প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, যে প্রেরণা উত্তরকালের অতুলপ্রসাদের প্রতিভা ও ভাব-জীবনের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের ছাত্র-জীবনকাল কলকাতাতেই অতিবাহিত। ১৮৯৪ সালে বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে বাংলাদেশেই ফিরে এলেন। কিন্তু আইনব্যবসা আরম্ভ করলেন লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে।

গানের রাজ্য লক্ষ্ণৌ, এ রাজ্যের সুরময় হৃদয়টির সঙ্গে গুণী অতুলপ্রসাদের হৃদয়ের মিলন

হতে বেশি দেরী হয়নি। সঙ্গীতচর্চার উপযুক্ত সুযোগ এবং পরিবেশ অতুলপ্রসাদের প্রতিভাকেও এক সার্থক পরিণামের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। উত্তরভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী অতুলপ্রসাদের ভাব ও চিন্তার অন্তরঙ্গতা বাংলার গীতসাহিত্যেরই এক নবরূপ সৃষ্টির হেতু হয়ে ওঠে। অতুলপ্রসাদের গান বাঙালীর মন ও বাংলাভাষাকে ভাবে ও সুরে কল্লোলিত করে তোলে।

লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী অতুলপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যকে আরও নানাভাবে সেবা করেছেন। 'উত্তরা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগে এবং 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' আহ্বানের পরিকল্পনায় সাহিত্যসেবক অতুলপ্রসাদের নিষ্ঠাশীল কর্মিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশের লিবারেল সঙ্ঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। একাধিকবার জাতীয় লিবারেল তথা উদারনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির পদও গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি 'আউধ বার অ্যাসোসিয়েশনে'র সভাপতি ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করেছিলেন অতুলপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশেষ' কাব্য অতুলপ্রসাদের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। 'অতুলনীয় অতুল'কে আশীর্বাদ করে কবি লিখলেন :

"আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিক দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণধারা গিয়াছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।"

অতুলপ্রসাদের রচনা পরিমাণে বড় নয়, গুণে বড়। 'কাকলী', 'গীতিগুচ্ছ' ও 'কয়েকটি গান'—এই তিনটি পুস্তকে অতুলপ্রসাদের প্রায় সবই রচনা সঙ্কলিত হয়েছে।

"সামান্য কথন" নামে একটি কথা আছে। সম্ভবত ভারতীয় রসশাস্ত্রে ব্যবহৃত একটি কথা। কথাটির ঠিক আলঙ্কারিক অর্থ যে কি, তা জানি না। কিন্তু, অন্তত কবিতার উৎকর্ষ বিচারে এ সত্য স্বীকার করতে হয় যে, অল্প কথায় অধিকতম ভাব প্রকাশের রীতিই শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিতা। এই ধরনের সামান্য কথন কবিতার অসামান্যতাই প্রতিষ্ঠিত করে। রম্যকলার ক্ষেত্রে সরলতাই বস্তুত একটি ঐশ্বর্য। সমালোচক রাস্কিন স্থাপত্যকলার মতো একটি কঠিন অবয়বপ্রধান শিল্পেরও আকৃতিতত্ত্বের বিচারে যে সাতটি 'প্রদীপে'র (সেভেন ল্যাম্পস্ অব্ আর্কিটেক্চার) উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো সরলতা। শুধু স্থাপত্যকলায় কেন, কবিতার মতো একটি ভাষিক রম্যকলার ধ্বনি, ছন্দ, কথা ও ভাবের গঠনসৌকর্যেও সরলতাই হলো ঐশ্বর্য। নিসর্গের রূপের দিকে তাকিয়েও সহজেই উপলব্ধি করা যায়, এক সহজ ও সাবলীল ছন্দে যেন সকল বর্ণ ও গতির রূপ বিধৃত হয়ে রয়েছে। সূর্যোদয়ের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কোন জটিলতা নেই। প্রতি প্রভাতে পূর্বাকাশের এই জ্যোতির্ময় বিরাটত্ব নিজেকে প্রকাশ করে কি সরল স্বাচ্ছন্দ্যে! যে বর্ণ-সুষমার সমারোহে আকাশের রূপ পাল্টে যায়, তার ছন্দোসজ্জাও কত সরল! মহাম্বুধির তরঙ্গের আন্দোলন, গিরি নদীর ক্ষুদ্র স্রোতধারার চটুলগামিতা, পবনধূত অরণ্যের কায়াহিল্লোল, দূরাগত কালবৈশাখীর বিলাপধ্বনি, অথবা কোমলবৃন্ত এক শস্যমঞ্জরীর নৃত্যভঙ্গি--স্থির ও অস্থির এইসব রূপে তো মহিমার কোনই অভাব নেই। অথচ এরূপ রিক্ত নয়, নিরাভরণও নয়। বরং বলা যায়, এই সবই হলো পদার্থের এক পরম বৈভবের রূপ। কিন্তু এ রূপের প্রকাশরীতিতে কোথাও আত্যান্তিকতাও নেই, অস্পষ্টতা নেই, অর্থগুপ্তিও নেই।

কাব্যস্য আত্মা নিশ্চয়ই 'রীতি' নয়। কিন্তু রীতির আত্মা যে সরলতা তাতে কোনই সন্দেহ

নাই। রীতি সম্বন্ধে এইসব কথা মনে পড়ছে এই কারণে যে, অতুলপ্রসাদের কবিত্বের পরিচয় সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর রচনার রীতিগত সারল্যই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। সামান্য কথনের দ্বারা অসামান্যতা সৃষ্টি করেছেন অতুলপ্রসাদ। অক্ষরডম্বর রীতি নয়, 'বৈদগ্ধ্য ভঙ্গি ভনিতি'ও নয়। অতুলপ্রসাদ অতুলনীয় হয়েছেন তাঁর 'সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য' রীতির সারল্য গুণে। অল্পকথায় এবং সরল কথায় ভাবগূঢ়তা সৃষ্টির এমন উদাহরণ বিরল। কবিত্বের তুলনায় যে শক্তিকে 'সুদুর্লভা' বলা হয়ে থাকে, সেই শক্তি বোধহয় সামান্য কথনের দ্বারা অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টির এই শক্তি।

জানতে ইচ্ছে করে, কোথা থেকে এই শক্তি পেলেন অতুলপ্রসাদ? রীতি বা ভঙ্গির এই গুণ কেমন করে তিনি অর্জন করলেন? রীতি ও ভঙ্গির মধ্যে অন্তরের পরিচয় থাকে। সমুদ্র তরঙ্গের ভঙ্গির মধ্যেই তো সমুদ্রত্ব ফুটে ওঠে। হ্রদের জল শত আলোড়নেও ঐ ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে পারে না। সমালোচক হ্যারল্ড মন্‌রো ভারতের আলঙ্কারিক ভামহ্‌ ও দণ্ডীর মতোই বলেছেন যে, রীতিই হলো কাব্যের আত্মা ('style is the soul')। এ তত্ত্ব কবিরাই স্বীকার করতে চাইবেন না। রীতির চেয়ে নিগূঢ়তর কোন বস্তু আছে, যে বস্তু কাব্যের প্রাণবস্তু। বরং ফরাসী সমালোচক বাফোঁ'র উক্তিকেই সাধারণভাবে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়--'রীতি হলো মানুষটি' ('the style is the man')। প্রতি মানুষের চিত্তে একটি 'ভাবের ঘর' আছে। এই 'ভাবের ঘরে'র মানুষই হলো আসল মানুষ। এই ভাবের ঘর এমনিতেই তৈরি হয় না, তাকে তৈরি করতে হয়। অতুলপ্রসাদের সকল রচনার অন্তর্গত রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাই, ভক্তি দিয়ে গড়া এক ভাবের ঘরে একটি মানুষ বসে রয়েছেন। মানুষ হিসাবেও তাঁর যথার্থ পরিচয় পাই এইখানেই। এহেন মানুষ তাঁর চিত্তধর্মের সহজ আবেগে কবিতা রচনায় যে রীতি গ্রহণ করতে পারেন, সেই রীতিই গ্রহণ করেছেন অতুলপ্রসাদ। এক ঈশ্বরানুরাগী বিশ্বাসীর চিত্তের সকল আকুলতা, আবেদন, আক্ষেপ ও আনন্দ সার্থক প্রকাশ লাভ করতে পারে যে বিশেষ রীতি ও ভঙ্গির আশ্রয়ে সেই রীতিই অনুসরণ করেছেন অতুলপ্রসাদ। এখানে কবি অতুলপ্রসাদকে ভারতীয় সাধক কবিদেরই ঐতিহ্যগত আত্মীয় রূপে দেখতে পাই। ভক্তিময় ভাবনা দিয়ে নিজেকে গঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই অতুলপ্রসাদ সহজেই সেই সুদুর্লভা শক্তি লাভ করেছিলেন।

কিন্তু রীতির চেয়ে নিগূঢ়তর যে বস্তুটি কাব্যের যথার্থ প্রাণ, অতুলপ্রসাদের কাব্যে সে বস্তুটির সামান্যতা নয়, তার প্রাচুর্যই আর এক বিস্ময়ের বিষয়। কবিত্বের ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের এই কৃতিত্বের প্রধান কারণ হলো তাঁর জীবনের বিশ্বাসবাদ। কবিত্বেরও নানা রূপ আছে। শব্দালঙ্কারসর্বস্ব কবিত্বও জনপ্রিয়তা লাভ করে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। জীবন-বিদ্বেষী কবিতাও স্তাবকের করতালির অভিনন্দন লাভ করে, এমন ঘটনাও সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক দেখা গিয়েছে। বদলেয়ারও কবি ছিলেন এবং বদলেয়ারের কবিতা পড়ে হিউগো বেদনাক্ষুব্ধভাবে বলেছিলেন--'তিনি নতুন এক ভয়াল শিহরণ সৃষ্টি করেছেন' ('......he has created a new shudder')। বলা বাহুল্য, জীবনের বিরুদ্ধে নতুন 'শাডার' তথা ভয়াল শিহরণ সৃষ্টি করাই কবিত্বের লক্ষ্য নয়, লক্ষণ নয়। কবিত্বের লক্ষ্য হলো--

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক কবি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসারধূলি-জালে।

সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর মধুর করে রাখা, দু-একটি কাঁটা দূর করা, সাগরের জল ও অরণ্যের ছায়াকে আর একটুখানি নবীন আভায় রঙীন করে দেওয়াই কবিত্বের লক্ষ্য। এমন কি 'কবিতার জন্যই কবিতা' নয়। দেবী অতীতের অপর এক নাম প্রজ্ঞা। যে প্রজ্ঞা নিখিল

কল্যাণের প্রতি মমত্ববোধ উদ্বোধিত করে, সেই প্রজ্ঞারই বাণীমূর্তি হলো কবিতা। কবিতা মানুষী সত্তারই এক বন্দনামূর্তি। আজ নয়, কত হাজার বছর আগে কে জানে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জানিয়ে গিয়েছেন যে, নিছক আর্টের জন্য কোন আর্ট হতে পারে না। ন বা অরে শিল্পকামায় শিল্পং প্রিয়ং ভবতি। আর্টের তথা আত্মানস্তু কামায় শিল্পং প্রিয়ং ভবতি। কবিতার উদ্দেশ্য আছে—'আত্মস্তু কামায়', আত্মন্-এর অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে।

কবি অতুলপ্রসাদের সমগ্র রচনার রূপ এই পরম অভিপ্রায়ের বন্দনাবাণীর মতো। কবিত্বের এই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বে সমাশ্রিত অতুলপ্রসাদ তাঁর অন্তর হতে বাণী আহরণ করেছেন। সে বাণী সীমিতপ্রায় মানুষের অনন্ততামুখীন আগ্রহের বাণী। এই মর মর্ত্যের মানুষ মাত্রই নিজের অজ্ঞাতসারে অসীম হতে চাইছে। এই আকাঙ্ক্ষাই সকল কবিত্বের উৎস। এই আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ বা প্রতিহত হলে যে বেদনা আক্ষেপ ও হতাশ্বাস দেখা দেয়, তাও কবিত্ব। সকল কাব্যপ্রেরণার হেতুই হলো অনন্তের জন্য মানবীয় চিত্তের আকুলতা।

অতুলপ্রসাদের সমগ্র রচনাই এই আকুলতায় অভিষিক্ত। কবিতারও যদি 'রসেন্দ্রসুন্দর' নামে কোন রূপ কল্পনা করা যায়, তবে ভারতীয় সাধককবিদের রচিত কবিতার মতো অতুলপ্রসাদের কবিতাকেও রসেন্দ্রসুন্দর বলা যায়। রসই কবিতার প্রাণ। অতুলপ্রসাদের কবিতা তাই প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এ কবিতা সুরের স্পর্শ পেলেই যেন সুদূর এক অমর্ত্যলোকের বংশীস্বর জাগরিত করে তোলে। অতি প্রবল তার আকর্ষণ, অতি গভীর তার আবেদন। ক্ষণিকের আবেশে শ্রোতা অনুভব করে, বিশ্বব্যাপ্ত এই প্রাণের সঙ্গে সেও এক সহযাত্রী পথিকের মতো এক পরম সীমাহীনতার শান্তরসাস্পদ আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। অতুলপ্রসাদের কণ্ঠ হলো ভক্তের কণ্ঠ, অতুলপ্রসাদের কবিতার ভাষা ভক্তহৃদয়েরই তন্তু দিয়ে রচিত ভাষা।

লক্ষ্য করার বিষয়, অতুলপ্রসাদ তাঁর কবিত্ব শক্তিকে 'আর্টের জন্য আর্টে'র সমারোহ সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত করেননি। তার আর্টের উদ্দেশ্য এবং অবলম্বনও কত মহৎ! কবিত্ব প্রকাশের জন্য তিনি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ বিষয়টিকেই নির্বাচিত করেছিলেন,—এই জীবনের এক পরমার্থের সন্ধান, ঈশ্বরের জন্য আকুলতা প্রকাশ। পণ্ডিতেরাই বলেন, এই তো শ্রেষ্ঠ কবির স্বভাব ও লক্ষণ।

"We may write little things well, but never will any be justly called a great poet, unless he has treated a great subject worthily"–Landor.

বাক্‌বৈদগ্ধী প্রধানেহপি রস এবাত্র জীবিতম্—অগ্নিপুরাণের প্রচারিত এই তত্ত্বটি সমালোচক ল্যাণ্ডরের উক্তিতে প্রায় বর্ণে বর্ণে সমর্থিত হয়েছে। কবির কবিত্বের অবলম্বন, তথা রচনার বিষয়বস্তু 'সামান্য' হলে কবিত্ব সার্থক হতে পারে না, তার মধ্যে যতই বাক্‌বৈদগ্ধ্য থাকুক না কেন। 'রস' নামক কাব্যের প্রাণবস্তুটি কথাশ্রিত কোন সৃষ্টি নয়, ঐ বস্তু হলো বিষয়াশ্রিত। মহৎ বিষয়ে আশ্রিত না হলে কবিত্বও মহৎ রূপ লাভ করতে পারে না। ধন্য অতুলপ্রসাদ, তিনি মানবজীবনের মহত্তম বিষয়টিকেই তাঁর কাব্যের প্রধান অবলম্বন করেছিলেন।

কবিত্বের ক্ষেত্রে বদলেয়ারী রিয়েলিজ্‌মের কোন স্থান নেই। কবিত্বের ক্ষেত্রে আইডিয়্যালই হলো রীয়্যাল। ভাগবত সত্যই শ্রেষ্ঠ বাস্তব সত্য। অতুলপ্রসাদ মনে-প্রাণে আইডিয়্যালের উপাসক, তাই তাঁর কবিতার আবেদনও এত বাস্তব।

অতুলপ্রসাদের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। তাঁর সকল কবিতাই গায়নী রীতিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা এই রীতিরই সাক্ষ্য দান করে। সুর এসেছে আগে, পরে কবিতা। অতুলপ্রসাদের কতগুলি রচনাতে এই পদ্ধতির প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ রচনার সৃষ্টিক্রম হলো—প্রথমে ভাব, পরে সুর, তারপর ভাষা। গায়নী রীতির প্রভাবে বিশুদ্ধ কাব্যরূপের কতগুলি উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি ত্রুটি

ঘটবারও আশঙ্কা অবশ্য থাকে। ভারতীয় স্তবসাহিত্যেও দেখা যায়, কবি যেন ভাস্করের তক্ষণপদ্ধতি অনুসারে শব্দ চয়ন, কল্পনা ও রূপণা করেছেন। এর থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন সকল শিল্পের প্রাণও একটি পরম ঐক্যের সূত্রে যুক্ত হয়ে রয়েছে। সকল রম্যকলাই একটি অখণ্ড প্রাণের আধারে সংরক্ষিত, কেউ কারও পর নয়। একই ভাবমূর্তি স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে ও কবিতায় প্রতিমূর্ত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কলাগত রূপের এই পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যের কথা ছেড়ে দিই। কবিত্বের ক্ষেত্রেও একই ভাবমূর্তি বিভিন্ন রূপে প্রতিমূর্ত হতে পারে, হয়ে থাকে এবং এটাও কবিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। অতুলপ্রসাদের কবিতাবলীর এই রূপবৈচিত্র্যের পরিচয়েও বিস্ময়কর। ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত অতুলপ্রসাদ তাঁর অন্তরের আকুলতাকে যেন ভারতীয় এষণার এক একটি যুগের এক একটি ঐতিহ্যগত তীর্থে নিয়ে গিয়েছেন। কোথাও দেখা যায়, সহজের সাধক এক বাউল তাঁর একতারা হাতে নিয়ে আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন। কোথাও দেখা যায়, বিস্ময়ে আত্মহারা এক পথিক বিশ্বরহস্যের প্রতি মন্ত্রময় আরাধনার সঙ্গীত নিবেদন করছেন। হঠাৎ ভেসে আসে অপরাহ্ণের বাতাসে রাখালিয়া বাঁশির মেঠো সুর। কোথাও গাঙের মাঝির কণ্ঠ হতে উৎসারিত ভাটিয়ালীর সঙ্গে ঢেউভাঙা জলকলস্বরের রেশ। আবার দেখা যায় যেন এক নিরালায় সুফী সাধকের আকুলতা বিরহবেদনার গজল হয়ে প্রিয়ের সান্নিধ্য কামনা করছে। কখনো মনে হবে, কবীর ও মীরাবাইয়ের মতো একই ভাবের পান্থশালায় নতুন এক পথিক এসে বসেছেন। সে পান্থশালার কক্ষ মধুময় হয়ে উঠেছে ভক্তহৃদয়ের ভজন গানে। কীর্তনীয়া বাংলার মিঠা মৃদঙ্গের ধ্বনিও বাজে। রামপ্রসাদী ব্যাকুলতার সুরও শোনা যায়। অতুলপ্রসাদ এই ভারতেরই নানা যুগের সাধকচিত্তের মন্দিরে মন্দিরে অন্বেষণ করে যেন রীতি অন্বেষণ করেছেন এবং তাঁর ভাবমূর্তিকে রূপবৈচিত্র্য দান করেছেন।

ওগো নিঠুর দরদী, একি খেলছ অনুক্ষণ? সত্য সত্যই প্রেমবিধুর কোন সুফী কবির আক্ষেপ নয়। কবি অতুলপ্রসাদের ভক্তহৃদয় অভিযোগ করছে -

ডাকিলে কও না কথা
কি নিঠুর নীরবতা!

এস নিঠুর দরদী, মিছে কাঁটার ব্যথা আর কেন দাও, আমি ব্যথিত হলে তুমিই কি তা সহ্য করতে পারবে? আমি জানি, আমার আঁখি জল তোমাকে চঞ্চল করে, তাই বিশ্বাস করি, আমার এই অশ্রু বরিষণ বিফল হবে না।

কিংবা ;

প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল গো বধূ
ঘোমটাখানি খোল।
আমি আজ পরাণ মেলি দেখব বলি
তোর নয়ন সুনিটোল গো বধূ
নয়ন সুনিটোল।

কী দুঃসহ এই আঁখির পিপাসা। স্ফুট গোলাপের মতো সাকীর মুখচ্ছবি এ কোন মায়াবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে আছে। সহ্য হয় না ঐ অবগুণ্ঠন। বধূর নয়ন সুনিটোলের দৃষ্টিমদিরা পিপাসী এই দুই নয়নের পেয়ালায় ঢেলে পান করতে চাই। মরূদ্যানের নিরালায় সাধনরত কবির সাকীকেই এক নতুন মূর্তিতে দেখতে পাই অতুলপ্রসাদের কবিতার 'বধূর' রূপের মধ্যে। এ প্রকৃতির ওপর যেন একটি মায়ারূপের আবরণ রয়েছে। সে আবরণ যদি সরিয়ে দিতে পারা যায়, তবে তো দেখা যাবে, এ জীবনকে বরণ করে নেবার জন্য যে বধূ রয়েছেন বসে, এক মিলনলগ্নের প্রতীক্ষায়। যখন, মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে, তখন প্রশ্ন মনে জাগে—ওরা কি সেই শ্যামপ্রেমে অনুরঞ্জিত গোপীচিত্তের বাসনার দল? কোন যমুনার নীরে

গাগরী ভরবে বলে ওরা ধেয়ে চলেছে? কার বাঁশী শুনেছে ওরা? কবির চিত্ত মিনতি করছে—ও আকাশ বল আমারে। আমার আঁখিজল তাদের মতো আমারও এই জীবনখানি করবে কি শ্যামল? আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা খেলবে কি দিনের শেষে?

রাগাত্মিকা ভক্তির ভাব ও ভাষা সহজ আবেগে উৎসারিত হয়েছে কবিতার প্রতি পংক্তিতে! শুক্লা যামিনীর ভাষাও বুঝতে পারেন কবি। এ জ্যোৎস্নায় বেদনা রয়েছে। কারণ, 'আকাশের গ্রহ-তারা শ্যাম-ভিখারী'। শ্যামহীন যামিনীজীবন শত চাঁদের জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও তার অন্তরে যে আনন্দহীন অন্ধকার!

কিন্তু শ্যামহীন এই দুঃখের জীবন নীরব অভিমানে শুধু সহ্য করারও কোন অর্থ হয় না। যখন, 'পরাণে লেগেছে রং কালোর পরে', এবং 'বাহির করেছে পাগল মোরে' তখন ঘরে থাকা দায়। হৃদয়ের নেপথ্যে আভাসে শোনা যায়—'এস বঁধূ' বলে ডাকে মোহন সুরে'। আশা জাগে মনে, বিশ্বাস হয় মিথ্যে হবে না এ জীবনের অভিসার, যদি সব লাজ-ভয়ের বাধা তুচ্ছ করে চলে যাবার সাহস থাকে।

বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ সজল ধারাবর্ষণের হর্ষে পুলকিত হয়। সে হর্ষের ভাষা শুনতে পান কবি :

'জল বলে চল মোর সাথে চল
তোর আঁখিজল হবে না বিফল।'

আশ্বাসবাণী—হবে না বিফল। আরও এগিয়ে যেতে হবে। বসন্তের আবির্ভাবে প্রকৃতি সুন্দর হয়ে উঠেছে। কবি দেখছেন—

আনিছে সুন্দরী শূন্য গাগরী
সুখে লহে প্রেমবারি ভরি ভরি।

কবি উপলব্ধি করেছেন, ঋতুরঙ্গের এই পূর্ণতার মধ্যে যেন পূর্ণ হলো প্রেমাকুল গোপীচিত্তের সকল আকাঙ্ক্ষা। মানুষেরই জীবনদর্শনের, মহামিলনমুখী পরিণামের এক নাট্যশালার মতো এই বিশ্বপ্রকৃতিকে চিনতে পেরেছেন কবি।

কখনো শুনতে পাওয়া যায়, যেন বাংলাভূমির এক প্রান্তর প্রান্তে বটের ছায়ায় ক্ষণিকের জন্য বসেছেন এক শ্রান্ত বৈরাগী। নিজেরই যত ভুল, ফাঁকি ও অপরাধগুলিকে ধিক্কার দিয়ে গান গাইছেন—

'তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর
কোন মুখে।'
*　　*　　*
সুখের পিছে মরি ঘুরে
তাই তো রে সুখ পালায় দূরে
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ
বন্ধ মনের সিন্দুকে।

কবে খুলবে এই বন্ধ মনের সিন্দুক? দীনবন্ধুকে পেয়ে দৈন্য ঘুচবে কবে? এক বৈরাগীর প্রাণ আকুল হয়ে প্রশ্ন করছেন, অতুলপ্রসাদের কবিতার প্রশ্নে।

অভিমানী মায়ের-ছেলে রামপ্রসাদেরই প্রাণ নতুন করে অনুযোগ করছে :

আর দে দে বলব না তোরে
যা দিলি তুই কাঙালরাণী
তাইতো আবার নিলি হরে।
দুঃখ বিপদ যদি দিতে চাও মা,
দাও তবে সে বোঝা মাথার ওপর তুলে।

'যখন বোঝা ভারী হবে,

তুই নাবাবি আপন করে।'

বৈষ্ণব ভক্তের হৃদয়ের প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত করে কবি অতুলপ্রসাদও প্রশ্ন করেছেন—

হরি হে,
তুমি আমার সকল হবে কবে?

*　　　*　　　*

আমার সকল সুখে সকল দুখে
তোমার চরণ ধরবো বুকে
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই কবে।

যেন চিতোরগড়ের রণছোড়জীব মন্দির হতে সাধিকা মীরাবাঈয়ের হৃদয়ের ভাষা পাঁচশত বৎসর পরে নতুন করে সুরমধুর হয়ে ভেসে আসছে।

এস গো একা ঘরে একার সাথী
সজল নয়নে বল রব কত রাতি?
তব সঙ্গ লাগি　　আছি আমি জাগি
সরব তেয়াগী
তব চরণ লাগি আছি কান পাতি।

বিশ্বৈকবোধ সার্থক প্রকাশলাভ করেছে কবি অতুলপ্রসাদের বাণীতে—

সবারে বাসরে ভাল
নইলে (মনের) কালো ঘুচবে না রে।
আছে তোর যাহা ভাল
ফুলের মতো দে সবারে।

জীবনচর্যারই এক আদর্শ সংজ্ঞা ফুটে উঠেছে এই কবিতায়। 'ফুলের মতন' এ পৃথিবীর সকলকেই ভালোবেসে ধন্য সে জীবন।

সাধক ভক্তেরা অবশ্যই কল্পনা করে থাকেন, যার জন্য এত আকুলতা সে যদি প্রশ্ন করে —বল, কি চাও? কি চাইবেন ভক্ত? ভক্তের জীবনে এ বড় দুরূহ সঙ্কট। কবি বিল্বমঙ্গল চাইলেন—

'সদা যেন দেখু তোরে'।

ভক্তের তথা প্রতি মানুষের এই চাওয়ার বাণীর মধ্যেই তার সমগ্র জীবনবাদ নিহিত। কবি অতুলপ্রসাদের জীবনবাদের পরিচয় পাই তাঁর একটি কবিতায় এবং বিস্মিত হতে হয় ব্যারিস্টার এ পি সেন কেমন করে এবং কি করে এতবড় তত্ত্বানুভূতির অধিকারী হয়েছিলেন।

বলিব না রেখ সুখে
চাহ যদি রেখ দুখে
(শুধু) তুমি যে শিব তাহা
বুঝিতে দিও।

আর কিছু চাহি না, শুধু এই বিশ্বাস পেতে চাই যে, তুমি কল্যাণময়। কবিতার এই সামান্যকথিত একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যে মানবজীবনের পরম-চাওয়ার বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

উপনিষদ বলেছেন—সো মধুরূপ। বল্লভাচার্যের মধুরাষ্টক বলে—

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ
পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌঃ

ধৃত্যং মধুরং সখ্যম্ মধুরম্

মধুরাধিপতেরাখিলং মধুরম্।

আর শুনতে পাই মধুরূপের কল্পনায় নন্দিতচিত্ত অতুলপ্রসাদ গাইছেন ঃ

তুমি দিবসে মধুর
নিশীথে মধুর
মধুর তুমি স্বপনে।
তুমি সজনে মধুর
বিজনে মধুর
মধুর তুমি গোপনে।।

নিখিলব্যাপ্ত মধুরতার সঙ্গে সর্ববিরাজিত সেই সুন্দরকেও চিনতে বুঝতে ও অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি অতুলপ্রসাদ। প্রাচীন ভারতীয় সাধকেরই স্তব-সঙ্গীতের মতো ভাব ও ভাষার ভাস্করীয় রীতিতে যে মন্দিররূপ রচনা করেছেন অতুলপ্রসাদ, তার পরিচয় পাই ঃ

কভু নির্মল নীল প্রান্তে
কনককিরীট মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতিসুন্দর।

আবাহন করেছেন কবি ঃ

উঠ গো ভারতলক্ষ্মী ;
উঠ আদি জগদজনপূজ্যা

এই বন্দনাবাণী উচ্চারণ করে যিনি ভারতলক্ষ্মীর জাগৃতি কামনা করেছিলেন, সে কবি ভারততত্ত্বেরই এক ঐতিহাসিক পরিচয় তাঁর কবিতায় রেখে গিয়েছেন। ধর্মে মহান এবং কর্মে মহান এক ভারতবর্ষ। 'এক জাতি প্রেম বন্ধনে' এক বিরাট ও মহান ভারতের অভ্যুদয় কবির কল্পনায় রূপ লাভ করেছিল।

ধর্মভেদের লড়াই দুঃখ দিয়েছিল কবিকে। সন্ত কবীরের মতোই বাঙালী কবি অতুলপ্রসাদ ভারতবাসীকে মিলনবাদের তত্ত্ব নতুন করে শুনিয়ে গিয়েছেন ঃ

মন্দিরে মসজিদে লড়াই
প্রবেশ করে দেখরে দু'ভাই
অন্দরে যে এক জনাই।

শুধু কবিত্বই নয়, অতুলপ্রসাদ তাঁর রচনায় মানবজীবনের একটি 'শ্রেষ্ঠ বিষয়'কে ভাবরূপ দান করেছেন। আজ এই বাংলাদেশেই শোনা যায় ভোরের আলো দেখা দেবার আগে খেতের আলের ওপর দিয়ে বাঙালী চাষী গাইতে গাইতে চলেছে—

সংসারেতে উঠলে হাসি
তুই শুনিস রে ব্রজের বাঁশী
ভাবিস কিরে সবই গোকুল
সবই কালাচাঁদ?

বুঝতে পারি, কাকে বলে সেই কবিতা ও সেই গান, যে কবিতা ও যে গান একেবারে লোকমনের গভীরে গিয়ে তার আত্মার সাথী হয়ে যায়। অতুলপ্রসাদের কবিতা ও গান দেশের লোকচিত্তকে সুরে ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করেছে। অতুলপ্রসাদের গান এক ভক্তহৃদয়ের সুরময় উপহার, বাংলারই সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের এক নতুন সাক্ষ্য।

আজ থেকে আঠারো বছর আগে, এক ২৬শে আগস্টে সত্য হয়ে উঠেছিল কবি

অতুলপ্রসাদের গানের আর এক আবেদন।

কত গান তো হলো গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও?

বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া
আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথী নাহি আসিবে
এত ব্যথা কেন পাওয়াও?

ব্যথাহরণের মমতামাখা বাহু কবির আত্মাকে হাত ধরে নিয়ে চলে গেল। এক ভক্তের জীবন-সঙ্গীতের শেষ কলি শেষ হলো ২৬শে আগস্টের রাত্রিতে। দেশবাসীর সান্ত্বনা--

দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তবে জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।

রম্যরচনা

সাতপাঁচ

একটি ইংরাজী কবিতায় ওক গাছ আর জলকুসুম লিলির তুলনা আছে। লক্ষ উদয়াস্তের সাক্ষী, শতাব্দীপুষ্ট অতিকায় প্রবীণতা নিয়ে বনস্পতি ওক তার অভ্রচূড় মহিমায় সমাসীন। ওক বড়, তার কথা ও কাহিনী বড়। ক্ষীণায়ু লিলি, দিনান্তের আলোক রশ্মিতে যার শ্মশানশয্যা বাঁধা, তার কথা ছোট। এর কথার একটিমাত্র প্রসাদ, ছোট হলেও তাতে শোনার আনন্দ আছে। ক্ষণিকের ভাল লাগানোই এর একমাত্র দান। মহাকালের চক্র ঘোরে, বড় বড় ঘটনার বিক্ষেপ চলে। গুরুভার উপনিষদ আর ষড়দর্শন, পিচ্ছিল রাজনীতি ও ক্ষুরধার বিজ্ঞানের মারপ্যাঁচ চলে। সেখানে তত্ত্ব ভাষ্য আর ভণিতার ভিড়। এই বিক্ষেপের ফাঁকে ফাঁকে ছিটকে পড়ছে তত্ত্বচূর্ণ ছোট ছোট কথার কুচি। নিতান্তই সাময়িক এই ক্ষণিকের কথার মালা।—লিলির মত এর প্রাণ, শুধু যাবার আগে অবসরের কটি মুহূর্ত রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম।

পরিব্রাজক কলহংস

বাংলাদেশের পৌষ আর কলকাতার ডিসেম্বর। শীতের সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীর রূপে দেখা দিয়েছে জরার কুঞ্চন। লতায় পাতায় ফিকে হয়ে আসছে সমস্ত বছরের সঞ্চয় হরিৎপ্রাণ ক্লোরোফিল। দিগন্তে যুদ্ধ মেঘের ভ্রূকুটি। বাতাসে বারুদের গন্ধ। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ যেমন রঙ্গে ভরা, তেমনি এত বিষাদেও কলকাতার হরিষ। বড়দিন আসন্ন। সিনেমা, স্পোর্ট, সার্কাস, ঘোড়দৌড়, কার্নিভালের উদ্যমের মরশুম পড়ে গেছে। গাঁয়ের লোকও মন-উচাটন হয়ে পড়েছে। বড়দিনের কটা দিন সহরে—বিশেষ করে কলকাতায়—ঠাঁই নেবার জন্য তারাও ট্যাকের কড়ি গুণে দেখছে। ঠিক এমনি সময় কলকাতার একদল মানুষ সহর ছাড়বার তোড়জোড় করছেন—তাঁদের লক্ষ্য গাঁ আর জঙ্গল। এরা হলেন শিকার-আমোদী কলকেতে বাবুসাহেবের দল।

* * * *

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলার' রসুলপুরের নদী! আগেকার সে প্রবাহ আজ আর নাই। যেখানে আগে খাত ছিল, সেখানে এখন পলিমাটির ডাঙা। মাঝে মাঝে বড় বড় দহ আর বিল। জমিদার চৌধুরী নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন—হংস মেরে মাংস খাবে? তবে ছোট বন্দুক আর থলি ভরে ছিটেগুলি নিয়ে চটপট চলে এস। বিল বোঝাই নতুন হাঁস পড়েছে।

উত্তরে জানিয়ে দিয়েছি—মা নিষাদ। ওরাই ভারতে বড়দিনের আসল অতিথি। ওদের মেরে উদর পূর্তি করতে প্রবৃত্তি নেই। শত হোক আমরা শিবিরাজার দেশের লোক। নিজের গায়ের মাংস কেটে পরকে খাইয়েছি একদিন। তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ, এ ভারতীয় ধাতে সইবে না।

* * * *

চৌধুরী যে হাঁসের কথা লিখেছেন সেই হাঁসই হ'ল সংস্কৃত কাব্যে সুবিখ্যাত কলহংস। পক্ষিতত্ত্ব বিশারদ স্টুয়ার্ট বেকারের (Stuart Baker) মতে 'গ্রে গুজ'—সিতধূসর Anserinac হংসগোষ্ঠী। সংস্কৃত সাহিত্যে 'হংস' শব্দ অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কারণ্ডব ও সারস—এসবকেও হংসের পর্যায়ে মাঝে মাঝে ফেলা হয়েছে। ভারতীয় কবিকুল যে রক্তচঞ্চু, মৃণালতন্তুবিলাসী, পদ্মধূলি-ধূসর হংসকে অজস্র শ্লোকে বন্দনা করে গেছেন, এরাই সেই কলহংস। এরা ভারতের নেটিভ নয়। মানস সরোবর, মধ্য এশিয়া—এমনকি সুদূর সাইবেরিয়ার সোভিয়েট প্রজা এই পক্ষিকুল শীতের প্রারম্ভেই বিনা ছাড়পত্রে

ভারতে প্রবেশ করে। সমস্ত ভারতের খাল বিল হ্রদে ও নদী-সৈকতে নূতন জীবনের সমারোহ দেখা দেয়। উত্তরের মেরুবাত জর্জরিত শীতার্ত পরিমণ্ডল ছেড়ে এই কলহংসের শ্রেণী যোজন যোজন ব্যোমপথ পক্ষবিধূননে অতিক্রম করে চলে আসে। বেশ ক'টি মাস ঘরসংসার করে তারা আবার বিনা নোটিশে স্বদেশে ফিরে যায়।

এদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে যাযাবর পাখী। কিন্তু এদের বলা উচিত পরিব্রাজক পাখী। কেননা এদের একটা নির্দিষ্ট অধিষ্ঠান ভূমি, বিহারস্থল ও গৃহস্থালী রয়েছে। এদের মধ্যে যাযাবরসুলভ ভ্যাগাবণ্ড প্রবৃত্তি নেই।

*   *   *   *

কলহংসের প্রসঙ্গে 'কবিযু কালিদাসের' একটা ভুল (যদিও কবিরা নিরঙ্কুশ) তাঁর শব্দঝঙ্কার আর ছন্দোলালিত্য ভেদ করেও কল্পনাকে কাঁটার মত বিঁধে। মেরু থেকে সমুদ্র পর্যন্ত জল স্থল অন্তরীক্ষ যে কলহংসের অবাধ অস্থির জীবনের পটভূমি, সেই কলহংসকে কবি কালিদাস যক্ষের ভবন-দীর্ঘিকার মকরতশিলার সোপান শ্রেণীতে ভিড় করে বসিয়েছেন। তারা নাকি বৈদূর্য-নাল বিকচ স্বর্ণকমলের মায়া ছেড়ে মানসের দিকে ফিরবার কথা ভুলে যেত।

কাব্য ছাড়া কলহংস আমাদের গণিতশাস্ত্রেও ঢুকেছে। ভাস্করাচার্যের গণিতগ্রন্থ লীলাবতীতে এই রকম একটি অঙ্ক আছে—হে বালা, সরোবরের সমূহ মরাল সংখ্যার বর্গমূলের সাড়ে তিন গুণ হংস তীরে মন্থর গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেলিকলহরত এক জোড়া কলহংসকেও সরোবরে দেখা যাচ্ছে। বল দেখি, মরালের সংখ্যা কত?

যোগশাস্ত্রের মধ্যেও এই নিষ্কলুষ শ্বেত হংসের উপমা নেওয়া হয়েছে।—আত্মা ও মন পিণ্ডিত হলেই সমাধি অবস্থার উদ্ভব হয়। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের লয় হয় এবং হংসরূপী জীবাত্মা সোহং অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

স্পোর্ট-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ

স্পোর্ট অর্থাৎ খেলাধূলা বর্তমান সামাজিক জীবনের বড় স্থান অধিকার করে আছে, এ বিষয়ে সংশয় নেই। আধুনিক স্পোর্টের দুটো তত্ত্ব আছে, যার জন্যে এর অত আকর্ষণ। এর মধ্যে যে ব্যায়ামের আনন্দ আর সুচারু কুশলতা আছে, এ দুটি ব্যাপার সত্যই উপভোগ্য। তবে অধুনিক মনোবিজ্ঞানের দুঃখ, স্পোর্ট তার সাবেকী বুর্জোয়া হিংসুটে খোলস আজও ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তাঁরা বলেন, স্পোর্টের মধ্যে ঐ যে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ দ্বন্দ্বের ও পরপীড়নের আনন্দ, এটিই মনের উৎকর্ষের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার। প্রতিযোগিতার ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে "হিংসার চাষের"ই একটি সম্ভ্রান্ত রূপ।

তবে নিছক নির্দোষ আনন্দের সাধনার মত স্পোর্ট যে নেই তা নয়।

কাশ্মীর থেকে জনৈক খোরাসানি সদাগর বন্ধু লিখেছেন,—এই শীতে একবার এদেশের এই অঞ্চলটা ঘুরে যাও। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের ডালহ্রদ, ঝেলাম, চেনারের সারি, ব্যাগ আর বাগিচা দেখবার জন্যে তোমায় ডাকছি না। তুমি স্পোর্টসম্যান, সেই স্পোর্টের জন্যেই ডাকছি। এখানে এই সময় যদি আসতে পার, তবে তোমায় এমন এক খেলায় হাতেখড়ি দেব যার আস্বাদ উন্মাদনা আর আনন্দ জানে শুধু মেরুবাসী মানুষেরা। তুমি কল্পনা করতেও পারবে না যে, এই ভারতেও এমন খেলার ব্যবস্থা আছে।

সত্যই কল্পনা করতে পারিনি। কি এমন খেলা? দ্বিতীয় পত্রে বন্ধু খুলেই লিখলেন। খেলাটি হলো স্কিইং (skiing), স্কেটিং (skating) ও তুষার-নৌকা (Ice-boat) বিহার।

ভারতে বসেও যে এই পরমানন্দময় খেলায় যোগদান সম্ভব তা আগে জানা ছিল না। দূর উত্তরে শীতপ্রখর পামিরের মালভূমি আর ঘুমন্ত পিণ্ডারী হিমবাহ (Glacier)। কিঞ্চিন্নিম্নে উত্তর কাশ্মীরের প্রান্তরে প্রান্তরে সুকঠিন ধবল হিমানীশয্যা। প্রতি উদয় আর অস্তের সঙ্গে তুষার আস্তরণে আলোক কণিকার উৎসব—অপূর্ব বর্ণালীর বিভঙ্গ। তারই মাঝে পালতোলা তুষার নৌকায় মর্মরনিন্দিত পিচ্ছিল ভূতলের দিক থেকে দিগন্তরে পাড়ি দিয়ে ফেরা। হাঁ, একটা আকর্ষণ বটে। ঢাকুরিয়ার আহ্বান এর তুলনায় তুচ্ছ মনে হচ্ছে। লেকের রেগাটায় দাঁড় ধরবার উৎসাহ নিষ্প্রভ হয়ে আসে।

*　　*　　*　　*

যোধপুরের একজন নামী সওয়ার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ একটা ব্যঙ্গোক্তি করে বসলেন—তোমরা বাঙালীরা নিজেদের বড় ক্রীড়ামোদী জাত বলে মনে কর। বড়দিনের সময় কলকাতায় অবশ্য স্পোর্টের জোর মরশুম পড়ে। কিন্তু পোলো (Polo) খেলা—এত বড় একটা পুরুষোচিত আমুদে খেলা—এতে বাঙালীর নাম গন্ধ নেই।

কথাটা শুনতে ভাল লাগে নি। মুখের উপর কোন উত্তরও দিতে পারি নি। কিন্তু খবরাখবরে জেনেছি যে উক্ত যোধপুরী সওয়ারের অভিযোগ সত্য নয়। বাঙালী পোলো খেলোয়াড়ের অভাব নেই।

এ বিষয়ে যাঁরা বাঙালীর মধ্যে অগ্রণী, সেই মানভূম জেলার ভূস্বামিবর্গই স্পোর্টপ্রিয় সকল বাঙালীর প্রশংসার পাত্র। পোলো খেলায় মানভূমের জমিদারদের উৎসাহ যোধপুরবাসীর চেয়ে কিছু কম নয়। মানভূমের বহু জমিদার পরিবারের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর পোলো খেলোয়াড় সব আছেন। তাঁদের অনেকের নিজস্ব পোলো টীমও আছে। এ বিষয়ে মানভূম (সরকারী ভূগোলে অবশ্য বাংলার বাইরে এর চিহ্ন) বাংলার অন্যান্য জেলাকে টেক্কা দিয়ে গেছে। বাঙালীর স্পোর্টের ইতিহাসে মানভূমের এই উদ্যম যথাসম্ভ্রমে স্মরণ করার মত একটি অধ্যায়।

বিচিত্র ভারত

মহামানবের পুণ্যতীর্থ ভারত। এখানে নাকি একদিন আর্য, অনার্য, দ্রাবিড় ও চীন একদেহে লীন হয়েছিল। তা যে হয়নি, তার প্রমাণ গত আদম সুমারীতে পাওয়া গেছে। আগামী আদম সুমারীতেও 'জাত' গণনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট তথ্যের বৈচিত্র্যে উপন্যাসের রসকেও হার মানায়। বিচিত্র এই ভারতের সমাজ আর নৃতত্ত্ব। অস্পৃশ্য মুসলমানের (নফর লালবেগী প্রভৃতি) সংখ্যাই হাজার হাজার। গোখাদক 'ব্রাহ্মণ'ও (গুজরাটের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ) হবে কয়েক হাজার। আদিম মাতৃতান্ত্রিক যুগের বাহুপত্য (Polyandry) প্রথার নিদর্শন ভারতে অদ্যাপি বর্তমান। নীলগিরির টোডা সমাজে ঘরে ঘরে দ্রৌপদী—পাঁচ-ছ'টি স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করে। একেবারে প্রস্তর যুগের সভ্যতা (?) নিয়ে অগৃহী ও অকৃষক এক একটা বন্য উপজাতি দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুক ও লক্ষ লক্ষ সাধু, দরবেশ, বিবাগী ও বৈরাগী।

*　　*　　*　　*

যেমন বিচিত্র ভারতের মানব ও সমাজ, তেমনি বিচিত্র তাদের জীবিকা। কানের খোল বার করে ও দাঁতের পোকা বেছে রোজগার ও জীবন ধারণ করে কয়েক সহস্র লোক। আদম সুমারীর রিপোর্টে এমনই কত শত অদ্ভুত জীবিকার কথা পাওয়া যায়।

একটি জীবিকার কথা জানি, যা কয়েক সহস্র মানুষের অবলম্বন এবং আদম সুমারীর রিপোর্টে এর উল্লেখ পাই নি। এদের জীবিকা গালাগালি। এরা ভাড়াটে গালিবাজ। এদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। ছেলে মেয়ের বিয়েতে বৈবাহিক পক্ষকে উগ্র ও অশ্লীল গালাগালিতে জর্জরিত করার জন্যে এদের নিযুক্ত করা হয়। সাহারাণপুরে এমনি এক দরিদ্র গালিয়াল পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী দুঃখ করে বললো—দেশের লোকের আর সে রকম শাস্ত্রীয় নিষ্ঠা নেই। দক্ষিণা বড়ই নগণ্য। ঘন ঘন তেমন ডাকও পড়ে না। পেট চালানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে আজকাল।

* * * *

ইণ্ডিয়া ম্যান (India Man) না অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান? কিছুদিন আগে অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের এক সম্মেলনে প্রস্তাব উঠেছিল যে, অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কথাটা বর্জন করা উচিত। তার বদলে তারা নিজেদের ইণ্ডিয়া ম্যান নামে পরিচয় দেবে।

জাতীয়তার দিক দিয়ে এই নূতন নামকরণ সমর্থনযোগ্য। তা ছাড়া আর একটি কারণ আছে। অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এতদিন যেটুকু ছিল সেটা ছিল নৃতত্ত্বগত। অর্থাৎ বৃটিশ রক্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত শ্বেতবর্ণ। বর্তমান অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সমাজে এ বৈশিষ্ট্য দ্রুত মুছে যাচ্ছে। রীতিমত কালোচামড়া অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা কম নয়। এদের ভাষা ইংরাজী (বিকৃত)। কিন্তু শুধু এই কারণে তারা অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান বলে একটা বিশিষ্ট গোত্রগত সংজ্ঞা পাবার অধিকারী নয়। মাদ্রাজের 'কৃষ্ণনগরের' (Black Town) অধিবাসী কালোমানিকদের ভাষাও বিকৃত ইংরাজী। তারা দেশী খৃষ্টান পর্যায়ভুক্ত। আগামী আদম সুমারীতে কিভাবে অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা গ্রহণ করা হবে তা জানি না। যদি কোন কটাচামড়া ইংরাজী বুলিতে অভ্যস্ত দেশী খৃষ্টান নিজেকে অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় লিখিয়ে বসে, তবে সে ফাঁকি থেকে বাঁচবার উপায় কি? কিভাবে অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান যাচাই করা সম্ভব এবং সেন্সাসের সময় আদৌ যাচাই করার ব্যবস্থা আছে কি না জানি না।

* * * *

এক হিটলার ভক্ত (?) স্কুলের ছাত্রের চিঠির কথা মনে পড়লো ছাত্রটি জানতে চেয়েছে—ভারতে ইহুদীর সংখ্যা কত? মারোয়াড়ীদের যে 'ভারতের ইহুদী' বলা হয়, সেকথাটা কি ঠিক? শীঘ্র উত্তর চাই।

ছাত্রটির প্রশ্নের দাপটে প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল। ইচ্ছাটা কি? তাই উত্তর দেবার সাহস হয় নি। তবে খাঁটি ভারতীয় ইহুদী যে আছে, এ সংবাদ অনেকের জানা না থাকতে পারে। ভারতীয় হিন্দু, ভারতীয় মুসলমান ও ভারতীয় খৃষ্টানদের মত এরাও ষোল আনা ভারতীয়। এদের মাতৃভাষাও ভারতীয়। এরা হলো কোচিনের ইহুদী সমাজ। বহু অতীতে ভারতে একদল ইহুদী এসে বসতি স্থাপন করে। স্থানীয় অধিবাসীদিগের সঙ্গে এদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। তাদেরই বংশধর বর্তমান কোচিনের ইহুদীরা।

* * * *

আজও নিশুতি রাতে ঠগী কাহিনী শুনলে আতঙ্কে লোকে শিউরে ওঠে। এত বড় খুনের ব্যবসায়, পেশাদার খুনীর দলের কথা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আধুনিক আমেরিকার 'Ku Klux Klan' ক্রূরতায় ও দক্ষতায় ভারতের ঠগীদের কাছে তুচ্ছ। তা ছাড়া এটা জাতব্যবসার মত পুরুষানুক্রমে গ্রহণ করা হতো। কাজেই খুনবিদ্যার চূড়ান্ত উৎকর্ষ হয়েছিল এদের হাতে।

কর্ণেল স্লীম্যান (Colonel Sleeman) ঠগী রিপোর্টে একজন জাঁদরেল ঠগীনেতার বিবরণ দিয়েছেন, যাকে 'বাংলার বিভীষিকা' (Terror of Bengal) বলা হতো। এঁর নাম রামলোচন সেন। বলিষ্ঠ সুপুরুষ ভদ্রলোক, সংস্কৃতে ও ফার্সীতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও দুর্জয় সাহস—এই ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত পশ্চিম বাংলার ঠগী দল এর ইঙ্গিতে

পরিচালিত হতো। আমেরিকার বিখ্যাত দস্যু আল কাপোনের (Al Capone) সঙ্গে এর গুণগ্রামের তুলনা হতে পারে। একে ধরা পুলিস বা মিলিটারীর সাধ্য হয় নি। একদিন ম্যাজিস্ট্রেটকে ধমকাবার জন্যে সশরীরে বাংলোয় গিয়ে চড়াও করেন ও গ্রেপ্তার হন। 'দেবী মাতার' বরপুত্র সহস্র নরমেধের হোতা ঠগী রামলোচন সেনের চরম শাস্তি লাভ করে জীবনাবসান হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপরিচ্ছদ

রাষ্ট্রভাষার জন্য বড় একটা আন্দোলন হয়ে গেছে জানি। সে রকম একটা ভাষারও পত্তন হয়ে গেছে শুনেছি। স্বয়ং গান্ধীজী এবং কংগ্রেস এই রাষ্ট্রভাষা গঠনের উদ্যোক্তা।

প্রশ্ন হচ্ছিল রাষ্ট্রপরিচ্ছদ নিয়ে। রাষ্ট্রভাষার যদি এতটা প্রয়োজন থাকে, তবে রাষ্ট্রপরিচ্ছদের কি তা থাকতে পারে না? প্রশ্নকর্তা জানতে চান ভারতের রাষ্ট্রপরিচ্ছদ নিয়ে এ পর্যন্ত কোন প্রচেষ্টা হয়েছে কি না।

রাষ্ট্রপরিচ্ছদ নিয়ে প্রচেষ্টা হয়েছে। তবে সেটা সংহতভাবে হয়নি। রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে বাঙালীর পক্ষে আপত্তিটা খুব জোরেই শোনা গিয়েছিল। ও বিষয়ে কোন বাঙালী অগ্রণী হন নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাষ্ট্রপরিচ্ছদ পরিকল্পনায় সেই বাঙালী অগ্রণী। ভারতের রাষ্ট্রপরিচ্ছদের ইতিহাসকে আমরা স্টাইল বিশেষে কয়েকটি ভাগে ফেলতে পারি। কোন ক্রমবিকাশের (Evolution) নীতি ধরে এ ইতিহাস গড়ে নি। রাষ্ট্রপরিচ্ছদ ভঙ্গী হিসাবে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) রাজা রামমোহন স্টাইল, (২) স্বামী বিবেকানন্দ স্টাইল, (৩) রবীন্দ্রনাথ স্টাইল এবং (৪) কংগ্রেসী বা সুভাষচন্দ্র স্টাইল।

রাষ্ট্রপরিচ্ছদের আলোচনায় আটপৌরে পরিচ্ছদের প্রসঙ্গ অবান্তর। যখন ভারতের বিশিষ্ট কোন সুসন্তান বিদেশে প্রতিনিধি হিসাবে যান, তখন তিনি যে পোশাক পরিধান করেন, সেটাকেই তাঁর ভারতীয়তার রুচি ও আদর্শ বলে ধরে নিতে হবে। সম্ভবত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহনের একই স্টাইল ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রপরিচ্ছদের স্টাইলটিই মাঝে খুব সমাদর লাভ করে এবং প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রসমাজ এই ভঙ্গী প্রায় সর্বত্র গ্রহণ করে। স্যার রাধাকৃষ্ণণও য়ুরোপ সফরে বিবেকানন্দ ভঙ্গীতেই বেশভূষা করেন। কবি রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রপরিচ্ছদ জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। ফেজ জাতীয় টুপি আর অতি ঢিলা আলখাল্লা কারও পছন্দসই হয় নি (রামানন্দবাবু ছাড়া)।

*   *   *   *

সম্প্রতি যে স্টাইল চলেছে (কংগ্রেসী স্টাইল) অর্থাৎ গান্ধী টুপি, গলাবন্ধ আচকান আর চুড়িদার পায়জামা, তাকে সুভাষচন্দ্র স্টাইল বললে অনেকে আপত্তি তুলবেন। এটা কংগ্রেসী স্টাইল বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রই এর একটি বড় চ্যাম্পিয়ান। য়ুরোপ প্রবাসকালে তিনি সদাসর্বদা এই ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচ্ছদ পরিধান করেছেন। এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর নিষ্ঠা অত্যন্ত কম। মাঝে মাঝে কংগ্রেসী রাষ্ট্রপরিচ্ছদ ধারণ করলেও তিনি য়ুরোপ সফরকালে হ্যাট স্যুট পরে থাকতেন। তাঁর কন্যাও ভারতীয় মহিলার এত প্রিয় শাড়ির বদলে গাউন পরিধান করতে আপত্তি করেননি।

যাঁরা গোঁড়া জাতীয়তাবাদী তাঁরাও বলেন—পণ্ডিতজী স্যুট পরেছিলেন তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। তবে অন্ততপক্ষে জাতীয়তার নিদর্শন শিরোভূষাটি দেশী হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ ঐ স্যুটের ওপরে একটি গান্ধীটুপী পরলেই একটু demonstration-এর কাজ হতো বৈকি।

*   *   *   *

রাষ্ট্রপরিচ্ছদের আলোচনায় আমরা আর একজন বাঙালী মনস্বীর কথা ভুলে যাচ্ছি। তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতের মহাজাতীয়তার প্রতি অনুরাগের বশেই তাঁদের সমিতিতে রাষ্ট্রপরিচ্ছদের একটা পরিকল্পনা হলো।—পরিধানে একটি হিন্দুস্থানী পায়জামা আর সম্মুখে পাট করা একখানি সুবিলম্বিত কোঁচা। বলা বাহুল্য, এ অপরূপ পোশাকে ভূষিত হয়ে রাজপথে বের হবার দুঃসাহস সমিতির কোন সভ্যেরই হয় নি। শুধু উৎসাহী জ্যোতিরিন্দ্রনাথই কটা দিন ঐ অপূর্ব পোশাক চড়িয়ে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ালেন। পরে তাঁকেও ক্ষান্ত হতে হলো।

অদ্ভুত জলযান

এইচ জি ওয়েলস্ (H. G. Wells) সাহেবের 'পৃথিবীর ইতিহাসে' উল্লেখ আছে—সুদূর অতীতে এশিয়া আর আমেরিকা ভূখণ্ডের মধ্যে স্থলপথে মানুষের যাতায়াত ছিল। শুধু বাধা ছিল বেয়ারিং প্রণালীর অপ্রশস্ত জলময় ব্যবধান। এশিয়ার যাযাবর মানুষ এই প্রতিবন্ধক অনায়াসে অতিক্রম করে যেত। কিন্তু নৌকা গড়ার মত প্রতিভা তখনও সৃষ্টি হয়নি। অথচ সাঁতার দিয়ে এই প্রণালী পার হওয়া সম্ভব ছিল না। অতিকায় জন্তুর পাকস্থলীকে ডিঙ্গির মত ভাসিয়ে তারা পারাপার করতো।

আধুনিক উন্নত বাষ্পীয় জলযান ছাড়াও কত রকমের যে আটপৌরে জলযান আছে তার ইয়ত্তা নেই। ডিঙ্গি, ছিপ, কোশা, বজরা, পানসী, সাম্পান, গণ্ডোলা, কাটামারাণ ইত্যাদি। কিন্তু ঐ জন্তুর পাকস্থলী ভাসিয়ে সাগর পার হওয়া, এ নিছক গল্প বলেই মনে হয়।

হরিদ্বার থেকে বেড়িয়ে এসে ওয়েলস্ সাহেবের উক্তিকে আর গল্প বলে মনে হয় না। কেননা, আমাদের ভারতবর্ষেই ঐ রকম এক শ্রেণীর জলযানের ব্যবহার আজও বর্তমান। এক পাণ্ডা মশায়ের গাঁয়ের বাড়িতে অতিথি ছিলাম। নদীর ওপারে একটি হাট বসে। পাণ্ডামশায়ের চাকরেরা বাজার করতে গেল। ছাগলের চামড়ায় তৈরী বয়ার মত (বা খুব বড় ফুটবলের মত) হাওয়া দিয়ে ফাঁপান একটি ভাসমান বস্তু, আর ঠিক ঐ ধরনের একটি মোষের পাকস্থলী। জন তিন চার চাকর এই অদ্ভুত জলযান দুটিকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে নদীর খরস্রোত অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে উঠলো।

শোনা যায়, এস্কিমোরাও সীলের পাকস্থলীকে এইভাবে জলযান হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

মতিরায়ের প্রতিভা

Anniversary ও Jubilee—ইংরাজী ভাষা থেকে এই দুটি শব্দ বাংলায় অনুবাদ করে 'স্মৃতিবার্ষিকী' ও 'জয়ন্তী' করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই দুই পাশ্চাত্ত্য সামাজিক অনুষ্ঠানকে সম্প্রতি আমাদের সমাজে চালান করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছিল, গুণীজ্ঞানীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করার মত রেওয়াজ কি ভারতীয় লৌকিকতার মধ্যে নেই? পিণ্ডি দিয়ে ল্যাঠা চুকিয়ে দেওয়াই কি আমাদের সনাতন রীতি?

এই সব স্মৃত্যনুষ্ঠানের ব্যাপার পাশ্চাত্ত্য সামাজিকতার মৌলিক দান নয়। এ বিষয় আমাদেরও একটা স্বকীয় আদর্শ ছিল। এটা আমরা পেয়েছি বৈষ্ণব সংস্কৃতির সৌজন্যে। প্রত্যেক বৈষ্ণব আচার্যের, গুণীজ্ঞানী ও মনস্বীর, সাম্বৎসরিক স্মৃতিপূজার একটা প্রথা আমাদের দেশে বর্তমান। তাঁদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের তিথিতে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

তা ছাড়া আর এক ধরনের স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা আছে : এটাও বৈষ্ণব সংস্কৃতির দান। বিশিষ্ট ব্যক্তির তিরোধান তিথিতে প্রতি বৎসর মেলার অনুষ্ঠান। দেশীয় প্রথাগত এই মেলাগুলি প্রকৃতপক্ষে চিরকাল এক একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হিসাবে সমাজের সেবা করে এসেছে। রেজিস্টারী করা ও চাঁদাখেকো বড় বড় সোসাইটির সাহচর্য ও উদ্যোগ ছাড়াও আমাদের সাবেকী দেশী নিয়মে এখনও দেশের গুণীদের স্মৃতিবার্ষিকী পালন করা হয়ে থাকে। ভারতের বীঠোফেন তানসেনের স্মৃতিবার্ষিকী করার জন্যে আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয়েরা কোন সোসাইটি পত্তন করেন নি। কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না। প্রতি বৎসর তানসেনের মৃত্যুদিনে ভারতের সর্বপ্রান্ত হতে সুরকার, নর্তক, নর্তকী, বাইজী ও বাদ্যকর হাজারে হাজারে গোয়ালিয়রে সমবেত হয়ে মেলায় যোগদান করে--অতীত ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-প্রতিভাকে সম্মান প্রদর্শন করে।

* * * *

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনৈক তরুণ ও নিষ্ঠাবান অভিনেতা প্রশ্ন করেছেন--আমরা কার স্মৃতিবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করি? বাংলার সাহিত্যে, কাব্যে, রাজনীতিতে ও ধর্মে বহু মহারথীর স্মৃতিবার্ষিকী ও জয়ন্তী হয়ে থাকে। যাঁরা সাহিত্যিক, কবি, রাজনীতিক ও ধার্মিক, তাঁরা এভাবে প্রেরণা পান। বাংলা নাট্য ও রঙ্গজগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা কে? কার কাছে আমরা সবচেয়ে বেশী ঋণী?

বড় কঠিন প্রশ্ন! কাজেই ঐতিহাসিকের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই এবং তাঁরা কি বলবেন তাও আন্দাজ করা যায় অর্থাৎ--'বাংলা নাট্য ও বঙ্গের ইতিহাস হাতড়ে যে তথ্য পেয়েছি, সেইটাই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেব। বাংলা নাট্য ও রঙ্গজগতের (Stage) শেষ প্রতিভা মতি রায়। দুর্ভাগ্য আমাদের, এই প্রতিভার পরিমাপ আজও হয়নি। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান--বাংলা রঙ্গজগতের মতি রায়ের সেই স্থান। এর মধ্যে এক তিল অতি কথা নেই। আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁকে 'যাত্রাওয়ালা' নাম দিয়ে এককথায় পথে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্র সাবেকী 'যাত্রা' থেকে রুচি, টেকনিক ও শিল্পরসগুণে এক তিলও অগ্রসর হয়নি। বাংলা রঙ্গালয়গুলি বলতে গেলে বিজলী আলোকের প্রসাদে একটু বেশী ঝকঝকে সেই পুরাতন যাত্রার আসর মাত্র। এই যাত্রার সঙ্গেই একটি সার্কাসী (Circus) চটুলতা মিশিয়ে পর্দার গায়ে ফেলে বাংলা ছায়াচিত্র সৃষ্টি হয়েছে। মতি রায় প্রবর্তিত যাত্রাগানের যে সংলাপ রীতি, আবৃত্তির ভঙ্গী, বাদ্য ও গীত প্রকরণ, নাটকীয় Thrill. Climax ও Anti Climax-এর পরিবেষণ, অঙ্কবিন্যাস দৃশযোজনা ও অভিনেতার সজ্জারীতি--তা আজও বাংলা রঙ্গ ও প্রমোদালয়ের পনের আনা অবলম্বন। বাংলার অতি নগণ্য খেউড় ও তর্জাকে নিজের প্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত করে মতি রায় আধুনিক যাত্রাগানের সুশালীন উন্নতরুচি ভূমিকার রচনা করে গিয়েছেন। কতখানি প্রতিভা থাকলে তবে এ কীর্তি সম্ভব?

খুবই ক্ষোভের বিষয়, যে মহাজনের দান ভাঙিয়ে বাংলা নাট্য ও রঙ্গালয়ের আজও পরিপুষ্টি হচ্ছে--তাঁকে স্মরণ করার কর্তব্য সবাই বিস্মৃত। বাংলার অভিনেতা সমাজ তাঁদের শিল্পগুরু মতি রায়কে আজ স্মরণ করুক ; তাঁর স্মৃতিবার্ষিকীর আয়োজন হোক।

বিদ্রূপের আর্ট

আধুনিক শিক্ষিত মানুষ অপরকে বিদ্রূপ করে কথা দিয়ে, লিখে বা কার্টুন ছবি এঁকে। কিন্তু প্রাক-প্রস্তর যুগের মানুষের কথা ধরা যাক। যখন মানুষের মুখে ভাষাই সৃষ্টি হয়নি, সেই সময়ে কি করে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করা হতো?

সেই পুরাকালে বিদ্রূপের একমাত্র উপায় ছিল বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, মুখে ভেংচানো ইত্যাদি। বিদ্রূপের এই রীতি অবশ্য আজও নিশ্চিহ্ন হয়নি। নিউজীল্যাণ্ডের মাওরীদের যুদ্ধবিদ্যার মধ্যে ভীষণ ভাবে মুখ ভেংচানো অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়।

বিদ্রূপকলার এই অঙ্গভঙ্গীগত রীতিটির নিশ্চয় একদিন খুব উৎকর্ষ হয়েছিল। কালক্রমে এর মধ্যে বেশ শিল্পীজনোচিত সূক্ষ্ম রসিকতা আমদানী করা হয়। একটি উদাহরণ—'বক দেখানো'। কনুইয়ের ওপর হাতটিকে লম্বমান রেখে, কব্জি মুড়ে, হাতের চেটোটিকে অধোমুখী করে বকের একটি স্থূল অনুকৃতি গঠন করা। আর একটি খুব জনপ্রিয় প্রণালী আছে, যা 'লবডঙ্গা' নামে সচরাচর পরিচিত। এই কথাটির অর্থের একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন—কথাটি লবডঙ্গা নয়, নবডঙ্কা। ডঙ্কা শব্দের অর্থ সাপের ফণা। সুতরাং লবডঙ্গার অর্থ দাঁড়ায় নূতন ধরনের সাপের ফণা। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরার্ধ্ব ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে দেখান—এই হলো মোটামুটি লবডঙ্গার প্রকরণ।

দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্রূপকলার এই অঙ্গভঙ্গীগত রীতির মধ্যে ইতর-প্রাণীর অনুকৃতি গঠন করাই প্রধান বিষয়। তবে কেনই বা এতে মানুষ চটে আর অন্যপক্ষ হাসে—তা গবেষণার বিষয়। ডাঃ ফ্রয়েড রঙ্গ ও ব্যঙ্গতত্ত্বের (Witticism & Humour) যে বিশ্লেষণ করেছেন, তার মধ্যে এর রহস্যের মূলগত কারণের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

হুজুগে রোগ

হুজুগ ও গুজব অকারণে সর্বনাশ ডেকে আনে, কারণ গুজবের মধ্যে মিথ্যাটাই বেশী প্রচারিত হয়। গুজবের কৃপায় এই দেশে কত দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তপাত হয়ে গেছে। বিহার ভূমিকম্পের পর কিছুদিন ধরে যে গুজবের প্রকোপ চলেছিল, তার ফলে ত্রাসে ও হুড়াহুড়িতে কম লোকের অঙ্গহানি হয়নি। দু'একজন মারাও গেছে।

গুজবে রোগ সৃষ্টি করে এ এক নতুন তথ্য। সেরকম জোর গুজব হলে মহামারী সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। 'ঝিনঝিনিয়া'র কথা সম্ভবত সকলের স্মরণে আছে। এই রোগটি যেমন অকস্মাৎ একদিন আবির্ভূত হয় তেমনি অকস্মাৎ সরে পড়ে। এ রোগের রহস্য ডাক্তাররাও জানেন না। ঝিনঝিনিয়ার সংক্রামকতার একটা বিশিষ্ট রীতি ছিল। প্রত্যেক শহরের আবহাওয়া ক'দিন ধরে ঝিনঝিনিয়া সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা, গবেষণা আর হুজুগে সরগরম হয়ে থাকতো। ঠিক এই পরম লগ্নে আবির্ভূত হতো ঝিনঝিনিয়া। দেখা যেতো পথের এদিকে ওদিকে এক একটি গোবেচারা ঝিনঝিনিয়ায় খাবি খাচ্ছে, আর পথের লোকে তাকে জলে চুবিয়ে একশেষ করছে।

* * * *

কয়েক বৎসর আগে পাটনা জেলায় ঠিক এই ধরনের একটি হুজুগে রোগ দেখা দেয়—হাড়বিন্ধা রোগ। গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটে গেল—অতি ক্ষুদ্র একজাতের পোকা চামড়া ভেদ করে শরীরে ঢুকে একেবারে হাড়ে গিয়ে কামড় দেয়। ফলে জ্বর, জ্বালা, পিপাসা, ছটফটানি ও মৃত্যু। গ্রামাঞ্চল থেকে ডুলি চড়ে হাসপাতালে রোগীর আগমন আরম্ভ হলো। সে এক দৃশ্য! হাড়বিন্ধা রোগী—গায়ে জ্বর আর আশঙ্কায় অর্ধমৃত। উৎকণ্ঠায় আত্মীয়স্বজনের মুখ বিবর্ণ। এ রোগীদের দু'চারজন সত্যি সত্যি প্রাণে মারা গেল। ডাক্তার অবশ্য অনেক অনুসন্ধান করেও হাড়বিন্ধা পোকার নাগাল পাননি।

এই ধরনের রোগ Psycho-pathologyর বিচার্য। হুজুগে রোগের মত টাবু'র (Taboo) প্রকোপে লোকে মারা গেছে এমন ঘটনা পাওয়া গেছে। বর্বর আদিম জাতির মধ্যে এখনও

সুকঠোর টাবুর (নিষেধ) অনুশাসন প্রচলিত। কোন টাবু লঙ্ঘন করা ঘোর অন্যায় (মহাপাতক) এবং তাতে নিদারুণ একটা অনিষ্টপাত হবে, এই তাদের বিশ্বাস। রাজা, সর্দার বা পুরোহিতকে স্পর্শ করতে নেই, এটা তাদের একটা টাবু। দৈবাৎ ভ্রমক্রমে এই টাবু লঙ্ঘন করে অর্থাৎ রাজা বা পুরোহিতকে ছুঁয়ে ফেলাতে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণায় ছটফট করে প্রাণত্যাগ করেছে, এমন অনেক ঘটনা দেখা গেছে!

ঝিনঝিনিয়া ও হাড়বিন্ধা রোগীর আচরণের মধ্যে ঠিক এই টাবুপীড়িত অতিবিশ্বাসপ্রবণ হুজুগপুষ্ট মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতের পিকাসো

আধুনিক চিত্রকলায় যত 'ইজ্‌ম' দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে কিউবিজ্‌ম (Cubism) একটি। স্পেনীয় শিল্পী পিকাসো (Picasso) এর প্রবর্তা। ত্রিকোণমিতির প্রেক্ষায় ঋজু রেখার টানে ভাববস্তু ফুটিয়ে তোলা এই রীতির বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতির মধ্যে রেখার হিল্লোল, বলয়, বৃত্ত ও বর্তুলতার কোন সাহায্য নেওয়া হয় না। বর্তমান যুগের বহু প্রথম শ্রেণীর শিল্পী এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির উপাসক।

যদি বলা যায়, এই কিউবিস্ট রীতি পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার কোন মৌলিক প্রসাদ নয়, এটা আমাদের বাংলা দেশের প্রতিভার ফসল এবং পিকাসো ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই এদেশে সুপ্রচলিত ছিল, তা হলে আধুনিক গোঁড়া আর্টিস্ট ভ্রূকুটি করবেন। কিন্তু আমার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তাঁকে বাংলা দেশের যে কোন ঠানদির ছেলেবেলার একখানা ঢাকাই শাড়ি দেখিয়ে দেব। এই সব ঢাকাই শাড়ির ওপর তাঁতীদের হাতের যে নক্সা আছে তা আধুনিক কুশলী কিউবিস্ট শিল্পীকে লজ্জা দেবে। মির্জাপুর জেলার গাঁয়ের তৈরী একখানা গালিচাতে যে সূচীচিত্রণের কাজ দেখেছি, তার সঙ্গে কিউবিস্ট রীতির কোন পার্থক্য নেই।

দুঃখ শুধু এইটুকু, ভারতের পিকাসোর নামটি আমরা জানি না। তাহ'লে কি শাস্ত্রী মশায়ের সেই পুরানো ক্ষোভের ধুয়া তুলে বলবো—আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি? অথবা অন্যভাবে বললে হয়—দেশের কালচারের খবর রাখার বালাই কারও নেই।

রন্ধন শিল্প

সভ্যতা যাচাই করার নানারকম মান ও মাপকাঠি আছে, যথা—সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এর মধ্যে শিল্প কথাটির সংজ্ঞা বহু ব্যাপক। জীবনচর্যার প্রত্যেক প্রয়োজনকে শিল্পরসে মার্জিত করে নেওয়াই সভ্য মানুষের লক্ষণ।

একটি শিল্পের কথা জানি, যার আলোচনা খুবই বিরল অথচ এই শিল্পটি সভ্যতার একটা বড় নির্ণায়ক। রন্ধন বা সূপশিল্প—একে আর্ট হিসাবে বড় একটা গণ্য করা হয় না, অথচ ভেবে দেখতে গেলে সৌন্দর্য ও রুচিবিলাসী মানুষের পক্ষে এ আর্টের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। আমাদের শাস্ত্রোক্ত চৌষট্টি কলার মধ্যে এর স্থান আছে কি না জানি না।

জাতিতে জাতিতে অন্যান্য শিল্পের ব্যাপারে যেমন রুচিভেদ আছে, রন্ধনশিল্পে ও ভোজনের আদর্শে তাই আছে। বলতে গেলে, এই শিল্পেই সবচেয়ে বেশী বিভেদ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ চীন দেশে গেছেন, আরব দেশেও গেছেন। চীনে রবীন্দ্রনাথকে একবার আপ্যায়িত করা হয়েছিল এক হাজার বছরের পুরানো আরশুলার চাটনী দিয়ে (রবীন্দ্রনাথ

অবশ্য খাননি ও খাবার সাধ্যও ছিল না)। আবার আরব দেশের এক মরূদ্যানে বেদুইন সর্দার ভারতের কবিকে দুটি আস্ত দুম্বা ভেড়ার রোস্ট আর মণ দুই চালের পোলাও দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। এই দুই দেশের ভোজনের আদর্শ পরস্পর কতটা বিপরীত সেইটাই লক্ষ্য করার বিষয়। কিন্তু এই কারণে কি চীন আরবের তুলনায় সভ্যতায় নিকৃষ্ট? তা নয়, কারণ ঐ আরশুলার চাটনী তৈয়ারীর মধ্যে অজস্র কারুকলা ও সূক্ষ্ম সূপশিল্পের প্রমাণ আছে।

*　　*　　*　　*

ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে রন্ধন শিল্পে যে বাংলা দেশ সবচেয়ে অগ্রসর এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। নিরামিষ ভোজ্য রচনায় বাঙালী পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারিগর। বাঙালীর রন্ধন প্রক্রিয়ার যে বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ আছে তার একাংশও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নেই। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে (৪০০ বছর আগে) বাঙালী সংসারের রন্ধনকলার যে বর্ণনা পাই, তা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। আমিষ, বিশেষত মাংস রন্ধনে মুসলমানী রীতির উৎকর্ষ অবশ্য স্বীকার করতেই হয়।

মাংস রন্ধনে সেকালের বাঙালীর রসনারুচির পরিচয় চণ্ডীতে কিছু পাওয়া যায় ঃ—

মুসরী মিশ্রিত মাস
সুপ রান্ধে হিঙ্গবাস
দিয়া জিরা বাসে সুবাসিত।।

আবার মনসামঙ্গলে ঃ—

মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসির তেল।
ছাগ মাংসে কলার মূল অতি অনুপম
ডুম ডুম করি রান্ধে গাড়রের চাম।

রঙ্গিনী প্রতিধ্বনি

'ধ্বনিটীরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে'—কথাটা কি সত্য? এই উক্তি সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। স্থান বিশেষে প্রতিধ্বনির বৈচিত্র্য দেখা যায়। নিমাই সন্ন্যাসে চলে গেলে শচীমাতা গভীর রাতে গঙ্গার ধারে গিয়ে 'নিমাই' 'নিমাই' বলে কাঁদতেন। প্রতিধ্বনি উত্তর দিত—'নাই নাই নাই' (শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা)। কবি মধুসূদন প্রতিধ্বনিকে বলেছেন—'সদা রঙ্গরসে তুমি রত হে রঙ্গিনী'।

বাস্তবিক, প্রতিধ্বনির বৈচিত্র্য যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন, শুধু ব্যঙ্গই প্রতিধ্বনির কীর্তি নয়, রঙ্গই এর প্রাণ।

আমেরিকান পর্যটক ও সুসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন (Mark Twain) তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে একটি প্রতিধ্বনির উল্লেখ করেছেন। এর বৈশিষ্ট্য, একে যে ভাষাতেই প্রশ্ন করা হোক না কেন প্রত্যুত্তর দেবে জার্মান ভাষায়। এটি মার্ক টোয়েনের সাহিত্যিক রসিকতা হতে পারে অথবা অতিরঞ্জিত সত্যও হতে পারে।

কিন্তু ফ্রান্সে (ব্রিটেনীতে) সত্যই এখনও একটি উপত্যকার এক জায়গায় এই ধরনের একটি রসিক প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। পুরুষ কণ্ঠের কোন প্রশ্ন বা সম্ভাষণকে প্রতিধ্বনিটি আদৌ উত্তরদানে বাধিত করে না। শুধু বামা কণ্ঠের প্রশ্নেরই উত্তর দেয়।

*　　*　　*　　*

প্রতিধ্বনি অতি প্রাচীনকাল থেকে কবিসমাজের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে এসেছে।

অরণ্যচারী বর্বর মানুষ আজও বিমূঢ় বিস্ময়ে প্রতিধ্বনির আহ্বান শোনে। বিবিধ পূজার্চনায় ও যাদুমন্ত্রে তাকে প্রসন্ন করে।

প্রতিধ্বনির (Echo) বিষয়ে গ্রীক উপাখ্যানটি সবচেয়ে সুন্দর। তরুণী ঈকো প্যান (Pan) দেবতার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। কুপিত প্যানের অভিশাপের ফলে রাখাল ছেলেরা তরুণী ঈকোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মাটিতে পুঁতে দেয়। কিন্তু ধরিত্রী (Earth) তার গান গাইবার ক্ষমতাটুকু ফিরিয়ে দেয়। তারই জন্য ঈকো আজও অশরীরী কিন্তু অস্বরী নয়। এটী হলো ওভিড (Ovid) কথিত উপাখ্যান।

লঙ্গাস (Longus) কথিত উপাখ্যানে আছে--তরুণী ঈকো তার প্রেমাস্পদ নার্সিসাসের (Narcisus) বিরহে দিন দিন তনুক্ষীণ হয়ে, শেষে কর্পূরের মত উবে যায়। পৃথিবীতে পড়ে থাকে সমস্ত আকুলতা নিয়ে শুধু তার কণ্ঠস্বর।

* * * *

'ক্ষুধিত পাষাণে'র নায়কের মুখে সেই সুবিশাল ঐতিহাসিক প্রাসাদের রাত্রির নির্জনতায় যে অলৌকিক শ্রুতিবিভ্রমের বর্ণনা পাই সেটা প্রতিধ্বনিরই রহস্য বলে মনে হয়।—'আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম--ঝর ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জন, কোথাও বা নূপুরের নিক্বণ, কখনও বা বৃহৎ তাম্র ঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ : অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুন ঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলির গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।'

* * * *

দুঃখের বিষয় বাংলা কাব্যে প্রতিধ্বনির উল্লেখ বিরল। বাংলা কাব্যে পাই—নদীর উজান, ভাঙন, ঈশানী মেঘ, কালবৈশাখী, গোধূলি আর শুকতারা। এর কারণ বোধ হয় বাংলার ভৌগোলিক চরিত্র। বাংলার সুসমতল অবারিত মাঠ ও ক্ষেত বিচিত্রা প্রতিধ্বনির পক্ষে উপযুক্ত ঠাঁই নয়। শুধু পদ্মার মাঝিরাই জানে. তার ভাটিয়ালী গানের শেষ কলিটিকে প্রতিধ্বনি কেমন করে অপূর্ব মূর্ছনায় বাতাসে বাতাসে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রাখে।

ইটালীর রোম শহরের উপকণ্ঠে একটি প্রাচীন সমাধিস্তম্ভ আছে। এখানে এক বাচাল প্রতিধ্বনির বাসা। এইখানে বসে কেউ যদি একটি চতুর্দশপদী কবিতা আবৃত্তি করে, কিছুক্ষণ পর শোনা যাবে যে কবিতাটি তেমনি অখণ্ডভাবে সুরে, ছন্দে আদ্যোপান্ত বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

পুরীর স্বর্গদ্বারের কাছে প্রতিধ্বনিটিকে একটু বেরসিক বা অহঙ্কারীই বলতে পারা যায়। এমন শ্রুতিসুখকর নীলোর্মির কল্লোল, বেলাতটে মূর্ছিত অহোরাত্র লক্ষ ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস— কিছুই স্বর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে শুনে উপভোগ করা যায় না। নিশ্চয়ই প্রতিধ্বনিরই কোন প্রচ্ছন্ন কূটকীর্তি, যার ফলে শব্দতরঙ্গ অন্যদিকে পালিয়ে যায়। বাংলা দেশের মধ্যে সবচেয়ে রহস্যকর হলো 'বরিশাল গান'। সুন্দরবন অঞ্চলেও অনেকে এই বিনামেঘে বজ্রধ্বনির মত গুরু আরাব শুনেছেন। নিসর্গের এই খেয়ালটির রহস্যমোচন কোন বিজ্ঞানী করেছেন কি না জানি না। যতদূর মনে হয় প্রতিধ্বনিরই একটি কীর্তি।

প্রতিধ্বনির প্রসঙ্গে অজন্তা গুহা আর অজন্তা প্রসঙ্গে তিব্বতী গুহামঠের কথা মনে পড়লো।

অনেকেই বিস্ময় অনুভব করেন—অজন্তার ঐ ঘোর অন্ধকারময় গুহার ভেতর ভারতের প্রাচীন চিত্রকর ছবি আঁকতেন কি করে? তাঁরা আলোকের সাহায্য নিতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ আলো কি তেলের প্রদীপ? যদি তেলের প্রদীপই ব্যবহার করা হতো তাহলে গুহাগাত্রে আঁকা ছবিগুলির কাঁচা রঙ কি বিকৃত হয়ে যেত না? তৈল প্রদীপের কালি আর ভূসা রঙের পক্ষে মারাত্মক বস্তু। তাই সত্যই আশ্চর্য মনে হয়, প্রাচীন চিত্রকরেরা কি উপায়ে এই সব গুহা কন্দর আলোকিত করতেন।

স্পেনের আল্টামিরা গুহায় প্রস্তরযুগের মানুষের আঁকা ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ গুহাগুলিও খুব অন্ধকারময়। কিন্তু গুহার ভেতর সেই যুগের মানুষের ব্যবহৃত চর্বির বাতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। তা ছাড়া প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীরা যেসব রঙ (প্রদীপের ভূসা আর রঙীন মাটি) ব্যবহার করতো তা ছিল খুব মোটা ধরনের আর রেখাঙ্কন পদ্ধতিও ছিল স্থূল। কাজেই গুহার ভেতর তেলের প্রদীপ ব্যবহার চিত্রের বিকৃতি তেমন ঘটাতে পারেনি।

তিব্বতের মঠগুলি বেশীর ভাগই গুহাশ্রিত। তিব্বতের ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত যতকিছু সম্পদ (গ্রন্থ, চিত্র, মূর্তি, মুদ্রা প্রভৃতি) সব এই সব দুর্গম গুহার নিরন্ধ্র অন্ধকারের গর্ভে সমাহিত। গোঁড়া লামা মশায়রা এই সব সামগ্রীর তদারক করেন—দেবজ্ঞানে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা করেন।

একজন ফরাসী পর্যটক লামাদের দেশে অনেককাল কাটিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী যা লিখে গেছেন তা থেকে প্রাচীন মানুষের অত্যদ্ভুত উপায়ে গুহা আলোকিত করার একটা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁর কথাগুলি বিশ্বাস্য কিনা তা বিজ্ঞানী ও সুধীগণের বিবেচ্য।

* * * *

ফরাসী পর্যটক লিখেছেন :—মঠের বড় লামা আমায় খুব বিশ্বাস করতেন। তিনি একদিন প্রসন্ন মনে বললেন—তোমায় এবার গুহার ভেতর নিয়ে গিয়ে দেবতাদের সংসার দেখিয়ে দেব।

'গুহার ভেতর কিছুদূর অন্ধকারে দেওয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে আমরা অগ্রসর হলাম। তারপর আর যাওয়া যায় না। সে এক অদ্ভুত শব্দহীন তমসাবৃত রাজ্য। এমন সময় লামা মশায় একটি পাথর তুলে নিয়ে তাঁর হাতের একটি তামার থালায় ঢং করে একটি আঘাত দিলেন। সমস্ত গুহারাজ্যে সেই শব্দের প্রতিধ্বনির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো। তারপর আরও এক অপূর্ব দৃশ্য। প্রশস্ত গুহাপথের দশ হাত অন্তর দেওয়াল থেকে কার যেন মণিময় এক একটি চক্ষু জ্বলে উঠলো। কোনটির উগ্র সবুজ রশ্মি, কোনটির শান্ত রক্তিম দ্যুতি আর কোনটির অত্যুজ্জ্বল শ্বেত প্রভা। সমস্ত গুহা সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দেখলাম, সারি সারি ধাতুময় ও শিলাময় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি আর অজস্র শিল্পালঙ্কার সামগ্রী।

এই গুহার গায়ে গ্রথিত এক একটি রত্নখণ্ডই ঐ আলোকের উৎস। রত্নগুলি এমনিতে নিষ্প্রভ হয়ে পাথরের ফাঁদে যেন মুহ্যমান হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দতরঙ্গের স্পর্শে হঠাৎ যেন জেগে উঠে খররশ্মির হাসি বিকিরণ করতে থাকে।

জিপসি বংশ

যারা জাতিতত্ত্ব (Ethnology) আলোচনা করেন তাঁদের কাছে বড় বিস্ময়কর গবেষণার বস্তু হলো জিপসিদের (Gypsy) জীবন-কথা। হেন মহাদেশ নেই যেখানে এই ভ্রাম্যমান যাযাবর মনুষ্যগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই। অদ্ভুত এদের আচার ব্যবহার ; তার চেয়ে অদ্ভুত এদের মন। মাটির মায়া এদের বেঁধে রাখতে পারে না। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মৌসুমী বাতাসের মত এরা শুধু চলার আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। দুঃখকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়াই এদের ফিলসফি। জীবনের প্রতি দণ্ড পল থেকে এরা যতখানি সম্ভব আনন্দ নিংড়ে নেয়।

য়ুরোপ আর এশিয়া এই দুই মহাদেশই বিশেষ করে জিপসিদের লীলাভূমি। য়ুরোপের ইতিহাসে, গল্পে ও উপন্যাসে জিপসিরা অনেক রোমান্সের নায়ক ও নায়িকা। মধ্যযুগের য়ুরোপের হাটে বাজারে ও সরাইয়ে (Inn) জিপসিদের নাচ গান ও যাদুবিদ্যার কেরামতী জনসাধারণের কাছে মস্ত বড় আকর্ষণ ছিল। ভারতের বেদেরাও কম যায় না। এদেশে বেদেদের সম্বন্ধে নানা অপবাদ আছে—তারা নাকি ছেলেধরা, পিশাচসিদ্ধ, নরখাদক ও নানা গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্রে পারদর্শী।

*　　*　　*　　*

জাতিতত্ত্বের একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার এই যে, জিপসিরা আসলে হলো ভারতীয়। সমস্ত য়ুরোপ জুড়ে হাঙ্গারী, জার্মানী, ইতালী ও ইংলণ্ডে যে জিপসিরা তাদের সনাতন রীতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে—তারা ভারতের বেদে, ডোম, নট, কঞ্জর, প্রভৃতি যাযাবর সম্প্রদায়ের সমগোত্র। এটা প্রমাণিত হয়েছে জিপসিদের সামাজিক প্রথা ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়। প্যালেস্টাইনের জিপসিরা ডোম নামেই পরিচিত। ইংলণ্ডের জিপসিদের ভাষা থেকে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করা হলো যা থেকে তাদের ভারতীয়তা সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাবে। পানি (জল), ছুরি, বক্রী (ছাগল), আঁখি (চক্ষু), কালো (কৃষ্ণবর্ণ), অঙ্গুষ্ঠ (আঙুল), নুন (লবণ)। তা ছাড়া—করা, যাওয়া, আসা প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে। Dr, John Sampson ইংলণ্ড ও ওয়েলসের জিপসিদের জীবন সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও অনুসন্ধান করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে ইংরেজ জিপসিরা যে ভারতীয় জাতি সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ভিক্ষুক তৈরীর সায়েন্স

কলকাতার রাজপথে মাঝে মাঝে দেখা যায় বিশ পঁচিশ জন ভিক্ষুকের এক একটি দল চলেছে। তাদের সকলেই খোঁড়া আর এই খোঁড়ামিটা সকলেরই এক ধরনের। এরা হাঁটু টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। হাঁটবার সময়ও লাঠিভর দিয়ে পা দুটোকে যেন জোর করে টেনে টেনে ফেলে। স্বতঃই সন্দেহ হয়, এতগুলো লোকের এই হুবহু একই ধরনের অঙ্গবিকৃতি কি করে হলো।

ভিখিরী তৈরীরও যে একটা সায়েন্স আছে তা অনেকে হয়তো জানেন না। ভিখিরী ব্যবসায়ের কত রকম ভালমন্দ মার্কেট আছে তার খবর কজন রাখেন? পুলিস বিভাগের লোকেরা অবশ্য কিছু কিছু খবর জানেন।

সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ বেরিয়েছে—'পেশাদার ভিক্ষুকের ক্রূরতা'। একজন মুসলমান একটি দু বৎসরের শিশুকে কিনে ঘরে নিয়ে যায় ও হাঁটুর হাড় ভেঙে

দেয়--যাতে ভবিষ্যতে শিশুটি উপযুক্ত ভিখিরী হতে পারে। কলকাতার খোঁড়াদের যে দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলেই ঐভাবে তৈরী। ভিখিরীর আড়তদারেরা এ সব বিজ্ঞানে খুব পারদর্শী। বেশীর ভাগই অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে যোগাড় করে তারা এইভাবে তাদের অঙ্গবিকল করে দেয়। অনেকে স্বেচ্ছায় এসে আড়তে ভর্তি হয়ে ভিক্ষে ব্যবসার সুবিধার জন্য অঙ্গ বিকল করিয়ে নেয়।

*　　*　　*　　*

ভিক্ষুকেরা বেশীর ভাগই পেশাদার। কিন্তু এ রকম স্বাধীন পেশাদার ভিক্ষুক শুধু গ্রামাঞ্চলেই থাকে। বড় বড় শহর, তীর্থস্থান, মেলা ও স্টেশনে যেখানে ভিক্ষের ফলাও ব্যবসা চলে সেখানে সমস্ত ব্যাপারটি কয়েকজন মহাজনের হাতে। ভিক্ষে ব্যবসাও ধনতান্ত্রিক --মোটা ক্যাপিটাল খাটে। এসব স্থানে ভিক্ষুকেরা অধিকাংশই চাকুরীজীবী অর্থাৎ ঐ মহাজনদের অধীনে তাদের খাটতে হয়। সিংহলে বড় বড় ভিক্ষুকের আড়ত আছে যেখান থেকে কানপুর, আগ্রা, দিল্লী ও কলকাতার আড়তদারেরা মোটা টাকা দিয়ে নানা বীভৎস রকমের বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক কিনে নিয়ে আসে।

*　　*　　*　　*

একজন পুলিস কর্মচারী যিনি উড়িষ্যায় বহুদিন কর্মসূত্রে ছিলেন, তিনি কথাপ্রসঙ্গে ভিক্ষুব তৈরীর একটা অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ করেছিলেন। উড়িষ্যার এক গ্রামে তিনি একবার দুজন ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করেন। এরা ভিক্ষুক তৈরী করে চালান দিত। এদের ঘর তল্লাসী করে ইনি পনের ষোলটি হাঁড়ি বার করেন। প্রত্যেক হাঁড়িতে এক একটি ছোট ছেলেমেয়েকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। মুখ দেখে ঠাহর হয়--কারও বয়স চার, কারো পাঁচ, কারো বা আট দশ। এদের মুখের ভেতরই যা কিছু বয়সের তারতম্য--গলা থেকে পা পর্যন্ত ধড়টি সবারই এক মাপের অর্থাৎ হাঁড়ির মাপের।

প্রথাটা এই--অনাথ গোছের ছেলেপিলে ধরে নিয়ে এসে এদের অষ্ট প্রহর হাঁড়ির মধ্যে বসিয়ে রাখা হয় যাতে হাত পা বুক পেট আর সাধারণ মানুষের মত বৃদ্ধি না পেতে পারে। শুধু মুখখানাই বয়সের অনুপাতে প্রবীণ হতে থাকে। এই ধরনের বিকলাঙ্গদের নানারকম মন্ত্র স্তোত্রও শেখান হয়। বড় বড় তীর্থস্থানের আড়তে এদের চাহিদা খুব বেশী। এরা বেঁচেও থাকে অনেক দিন। পুষ্কর তীর্থে এই রকম তিন চারজন পক্ককেশ ভিখিরী দেখেছি ; বয়স তাদের ষাটের ওপর নিশ্চয়।

পশুপালিত মানুষ

আমাদের পুরাণ কাহিনীতে পড়া যায়--শিশু শকুন্তলা নাকি কোন মমতাময়ী শকুন মাতার পক্ষপুটের আশ্রয়ে লালিত হয়েছিল। রোমনগরী যিনি রচনা করেছিলেন সেই রমুলাস (Romulus) নেকড়ে পালিত মানুষ। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাঁকে নাকি একটি ডিঙিতে শুইয়ে টাইবার নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

গৃহপালিত পশু আছে, কিন্তু পশুপালিত এই রকম মানুষ বোধ হয় কল্পনা ও কিম্বদন্তীতেই পাওয়া যায়। গরিলাপালিত টার্জান--(Tarzan) এটিও উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি।

কিন্তু রমুলাসের উপাখ্যান একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নেকড়ের সম্বন্ধে বিচার করতে গেলে আমাদের ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, কেননা তার অজস্র বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। আজ পর্যন্ত যে কটি পশুপালিত মানুষ দেখা গেছে তার অধিকাংশই নেকড়ে পালিত। অথচ এই নেকড়েই হিংস্রতার জন্য বিখ্যাত।

স্যার মাকিসন তাঁর Natural History পত্রিকায় একজন নেকড়ে পালিত মানুষের কথা লিখেছেন। ১৮৫১ সালে আউধের নবাবের দুজন সেপাই গোমতী নদীর ধারে কতগুলি নেকড়ের সঙ্গে একটি বালককে জলপানরত অবস্থায় দেখতে পায় ও ধরে নিয়ে আসে। ছেলেটির নেকড়ের মতই চার পায়ে (দু হাত আর দু পা) লাফিয়ে লাফিয়ে চলা অভ্যাস ছিল। লক্ষ্ণৌয়ে বালকটিকে কিছুকাল রেখে মানুষ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় নি। অনেক চেষ্টার পর ছেলেটিব বড় জোর কুকুরের মত সামান্য বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি দেখা যায়।

* * * *

ঐ বছরের আর একটি নেকড়ে-মানুষ ধরা পড়ে। এটি জুলফিকর খাঁ নামে বাঁকীপুরের এক জমিদারের ছেলে ; ছেলেটার যখন ছয় বছর বয়স তখন তাকে এক নেকড়েনী তুলে নিয়ে যায়। নেকড়েনী তাকে চার বছর ধরে মাতৃস্নেহে লালন পালন করে। চার বছর পর ছেলেটিকে আবার উদ্ধার করা হয়। বলা বাহুল্য নেকড়েনী মা সহজে তাঁর পালিত সন্তানকে ছেড়ে দেননি। মিলিটারি বিভাগের একজন সাহেব গুলি করে নেকডেনীকে মেরে ছেলেটিকে উদ্ধার করে। সেকেন্দ্রার অনাথ আশ্রমে কিছুদিন এক নেকড়ে-মানুষকে রাখা হয়েছিল। এর বয়স চৌদ্দ বছর। ছেলেটি কোনক্রমেই মানুষের আচার ব্যবহার গ্রহণ করতে পারেনি। কাপড়চোপড় দিলেই তাকে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলত। লক্ষ্ণৌয়ে এক নেকড়ের গুহার ভেতর থেকে একজন ডাক্তার একটি ছেলেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। মেদিনীপুরের এক পাদ্রী সাহেব কয়েকটি নেকড়ে-মানুষ পেয়েছিলেন।।

পাশবিক স্নেহ মানুষের তুলনায়, নিঃস্বার্থতার গুণে যে কম নয় তার সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া গেছে করাচী চিড়িয়াখানাব এক ছাগীর ব্যবহারে। চিড়িয়াখানায় এক বাঘিনী দুটি বাচ্চা রেখে মারা যায়। বাচ্চা দুটিকে স্তনদুগ্ধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। কাজেই ঐ বাচ্চা দুটিকে এক ছাগমাতার আশ্রয়ে রাখা হয়। ছাগমাতাও অকুণ্ঠিত চিত্তে বাঘের শাবককে স্তন্য দিয়ে বাঁচায় ও বড় করে তোলে। ছাগস্তন্যভিখারী এই অসহায় বাচ্চা দুটি ভবিষ্যতে যখন শার্দূল বিক্রম লাভ করবেন তখন কিভাবে তাঁরা মাতৃঋণ শোধ করবেন তা বলা যায় না। কথামালার উপাখ্যান আমাদের মনে আছে।

ভ্রমণ

মাদাগাস্কার

ভারত মহাসাগরের বুকে যত দ্বীপ আছে, তার মধ্যে বৃহত্তম দ্বীপ মাদাগাস্কার। আফ্রিকার উপকূল থেকে কিছু দূরে মাদাগাস্কার ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ এলাকার প্রহরীর মত জেগে রয়েছে। এই দ্বীপ এতদিন ফরাসী সরকারের অধীন ছিল। মাত্র কয়েকদিন হলো বর্তমান মহাযুদ্ধের আলোড়নে পড়ে রাজধানীটি ব্রিটিশের অধীনে এসেছে। যাতে এক্সিস পক্ষের হাতে না পড়ে, সেইজন্য আগেভাগেই ব্রিটিশ শক্তি যুদ্ধনীতির দিক থেকে মাদাগাস্কারের রাজধানী অধিকার করতে বাধ্য হয়েছে। তাই মাদাগাস্কার আজ সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। মার্কো পোলো বা ভাস্কো-ডা-গামার যুগে যখন লোকে মাদাগাস্কার নামে বিরাট এক দ্বীপদেশের কথা শুনেছিল, তখনও এতটা চিন্তা তর্ক আলোচনার রব ওঠেনি। এই দ্বীপদেশের আশপাশ দিয়েই বিভিন্ন মহাদেশগামী জাহাজের যাতায়াত চলে। বাণিজ্যের দিক দিয়ে মাদাগাস্কারের গুরুত্ব যেমন, রাজনীতিক ও যুদ্ধনীতিক কারণেও তেমন।

আজ অবশ্য মাদাগাস্কারের কথা সকলের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতদিন ধরে এই দ্বীপদেশটির জীবনের কথা পৃথিবীবাসীর কাছে তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। বৃহত্তর পৃথিবীর চিন্তার আসর থেকে এই দ্বীপটি এতদিন তার নিরালা সুখ-দুঃখেই ঢাকা পড়েছিল।

দূর অতীতে, তের শতকের প্রায় শেষের দিকে পর্যটক মার্কো পোলোর জাহাজ ভেনিসের পতাকা উড়িয়ে একদিন মাদাগাস্কারের দ্বীপের কূলে এসে ভিড়লো। তার আগে মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ; তাঁর ইচ্ছে ছিল শীতের সময় যাতে সিন্ধু নদের মোহনায় পৌঁছতে পারা যায়। সিংহলের কাছাকাছি আসতে বাতাসের গতি বদলে গেল। ক্রমে ক্রমে সেই হাওয়ার পাকে পড়ে মার্কো পোলোর জাহাজ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললো। নাবিকেরা বুঝেছিল যে, আরও পুরো পাঁচটি পূর্ণিমা না কেটে গেলে বাতাসের গতি উত্তরমুখো হবে না। এমনি অবস্থায় একদিন ঠিক সূর্যাস্তের আগে তাদের চোখে পড়লো একটি দুই-মাস্তুলওয়ালা আরবী নৌকা হাল ভেঙে ও পাল ছিঁড়ে অসহায়ের মত ভেসে চলেছে ; সেই নৌকার পাটাতনের উপর পড়েছিল কয়েকজন শীর্ণ অনশন জীর্ণ অর্ধোন্মাদ আরবী সদাগর। মার্কো পোলো তাদের নিজের জাহাজে তুলে নেন। এই আরবীদের কাছেই শোনা গেল যে, তারা দক্ষিণ দিকের দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল হাতীর দাঁত কেনবার জন্য, কিন্তু হঠাৎ ঝড়ে পড়ে বাধ্য হয়ে তাদের দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে চলে আসতে হয়েছে।

এই কাহিনী শোনার পরও অনেক দিন পর্যন্ত মার্কো পোলো নিকটে বা দূরে কোন নতুন দেশের দিশা পাননি। এর পর একদিন অমাবস্যার দিনে মার্কো পোলোর জাহাজ হঠাৎ এক উপকূলে এসে ঠেকলো। সমস্ত সকাল জাহাজে বসে নাবিকেরা প্রচণ্ড রোদের জ্বালায় পুড়তে লাগলো। উপকূলে কোন জনমানবের চিহ্ন দেখা গেল না। রাত্রিবেলায় উপকূলের বনজঙ্গল থেকে বন্যপশুদের নিদারুণ চিৎকার শুনে তারা শিউরে উঠতে লাগলো। বিরাট আকারের বানর জাতীয় জীবজন্তু জাহাজের দিকে তাকিয়ে গর্জন করতে লাগলো। তারা দ্বীপের ভেতরের দিকে প্রবেশ করার একবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাহাড় জঙ্গলের দুরতিক্রম্যতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তার পরের পূর্ণিমাতে তারা উপকূলের অন্যদিকে অগ্রসর হলো।

উপকূলের বিস্তৃতি দেখে মার্কো পোলো মনে করলো যে, তারা একটি মহাদেশের সন্ধান পেয়েছে।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নানা আজগুবি কাহিনী পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লেখা আছে যে, তারা এই দ্বীপের উপকূলে এসে একদিন একটি পাখী দেখতে পান। পাখীটা নাকি আকারে তাদের জাহাজটার সমান ছিল। আর সেই পাখীটা একটা হাতীকে ঠোঁটে কামড়ে

নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আরবীদের কাছে আরও নানারকম গল্প শুনে মার্কো পোলো মনে করলো যে, একটি মহাদেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। অতএব, এর পরের বার আরও অনেক জাহাজ নিয়ে এসে এই মহাদেশটি অধিকার করতে হবে। কিন্তু মার্কো পোলো এই পরিকল্পনাকে ভবিষ্যতে কাজে দেখাতে পারেননি।

মার্কো পোলোর মৃত্যুর ২০০ বছর পরে লোরেন্সো নামক এক পর্তুগীজ জাহাজের ক্যাপ্টেন নিগ্রো বিক্রীর ব্যবসায়ের জন্য মোজাম্বিক থেকে ঘুরে লিসবনে আসে। এই ক্যাপ্টেনের কাছে আবার লোকে মাদাগাস্কার দ্বীপের কথা শুনতে পেল,—এই দ্বীপদেশের অধিবাসীরা কালো বলেই ঠিক আফ্রিকার নিগ্রোদের মত নয়। সাধারণ লোকে বানরের মাংস খায়। নদীগুলি হাঙ্গরে কুমীরে ভরা।

তারপর এক শত বছর পরে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই তাঁর প্রাসাদে অমাত্য রিচিলুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। রিচিলু রাজার সামনে একটি মানচিত্র পেতে বসেছিলেন। এই মানচিত্রটি পর্তুগাল থেকে হাতিয়ে আনা হয়েছিল। রিচিলু রাজা লুইকে বুঝিয়ে বলেন যে, ওলন্দাজ আর পর্তুগীজেরা আফ্রিকার উপকূলে বেশ প্রতিপত্তি জমিয়ে বসেছে ; কিন্তু আফ্রিকার উপকূল থেকে সামান্য দূরে এই বিরাট একটি দ্বীপদেশ আছে, তার খবর তারা একদিন জেনে থাকলেও আজ ভুলে গেছে। সুতরাং ফরাসী রাষ্ট্রশক্তির অনুকূলে এই দ্বীপটিতে একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

লুই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন এবং একটি ফরাসী কোম্পানীকে উপযুক্ত জাহাজ ও সৈন্য দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলেন।

এর পর আরও কিছুদিন কেটে যায়। ২৫০ বছর পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এক প্রত্যুষে মাদাগাস্কারের জাতীয় রাজধানী আন্তানা-নারিভো যুদ্ধদামামা আর বিউগলের ধ্বনিতে চমকে জেগে ওঠে। রাজার প্রাসাদের ওপরে ফরাসী পতাকা উড়লো, ফরাসী সেনাদল পথ দিয়ে মার্চ করে গেল।

জোসেফ সাইমন গালিয়ানি—ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ সেনাদল নিয়ে এসে রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে দাঁড়াল। ম্লানমুখ বেদনার্ত শত শত মাদাগাস্কারীয় নরনারী শিশু সাদা কাপড় পরে পথের দুপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য।

চারজন ফরাসী সৈনিক প্রাসাদের ভেতর গিয়ে আবার বিউগল ধ্বনির সঙ্গে বেরিয়ে এল। সঙ্গে স্বাধীন মাদাগাস্কারের শেষ রাজ্ঞী—বন্দিনী রাণাভালোনা।

দুঃখে মনস্তাপে বিষণ্ণ রাণী রানাভালোনা ছবির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাপ্টেন গ্যালিয়ানি ঘোষণাপত্র পড়লেন—"ফরাসী সাধারণতন্ত্রের নামে আমি এইক্ষণে ঘোষণা করিতেছি যে, রাণী রানাভালোনা অদ্য হইতে সিংহাসনচ্যুতা হইলেন। অদ্য হইতে এই দ্বীপদেশ মাদাগাস্কার ফরাসী সাধারণতন্ত্রের উপনিবেশসমূহের পর্যায়ভুক্ত হইল। রাণী রানাভালোনা এই মুহূর্তে রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। জীবৎকাল পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।"

রাণী রানাভালোনা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষের সম্মুখে। তাঁর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। এইভাবে মাদাগাস্কারের স্বাধীনতা ফ্রান্সের রাহুগ্রাসে লুপ্ত হয়ে গেল।

পৃথিবীতে যত দ্বীপ আছে তাদের আকারে মাদাগাস্কার চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বৃহত্তম দ্বীপ হলো গ্রীনল্যাণ্ড, তারপর নিউগিনি এবং বোর্ণিও। চতুর্থ হলো মাদাগাস্কার। দ্বীপটির আয়তন ২২৮,৫০০ বর্গমাইল। আফ্রিকার উপকূল থেকে এর দূরত্ব মাত্র ২৫০ মাইল। কিন্তু জলবায়ু, জীবজন্তু ও মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর দিক থেকে আফ্রিকার সঙ্গে মাদাগাস্কারের খুব সামান্যই সাদৃশ্য আছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, এই দ্বীপটি কোন

অধুনালুপ্ত মহাদেশের অবশিষ্ট মাত্র। হয়তো এককালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এই দ্বীপ যুক্ত ছিল। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, এই দ্বীপ ভারতের অংশ ছিল। এই সব ভূতাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে বলা যায় না। বহু বিভিন্ন উপজাতীয় মানুষে এই দ্বীপটি অধ্যুষিত। মোট জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ।

মাদাগাস্কারের পূর্ব-উপকূলবাসী জাতির নাম—বেতসি-মিসারাক। দৈহিক গুণে ও লক্ষণে এদের সঙ্গে যাভাবাসীদের অদ্ভুত মিল আছে।

পশ্চিম উপকূলের লোকেরা হলো—সাকালাভা। এদের দৈহিক গঠনে নিগ্রোত্বের প্রভাব খুব বেশী রকম আছে, কিন্তু এই নিগ্রোত্ব আফ্রিকার নিগ্রোত্বের মত নয়! সুপ্রাচীনকালে মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপদেশবাসী নিগ্রো জাতির একটি বংশ হয়তো এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

তা ছাড়া আছে—আন্তাকারান, আন্তানদ্রয় ওমহাফানি জাতি, এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যে আরবী লক্ষণ পরিস্ফুট।

জলবায়ুর ব্যাপারে মাদাগাস্কারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিদৃশ্য দেখা যায়। কোথাও শীতের আধিক্য, কোথাও গ্রীষ্মের। তামাতাভে বন্দরে বছরের ১৮০ দিন বর্ষা লেগে থাকে, অথচ দক্ষিণের ফোর্ট দোফিনে বন্দরে মাত্র ২৭ দিন বৃষ্টি হয়।

মাদাগাস্কারের গাছপালা একান্তভাবে তারই নিজস্ব। এই জাতীয় গাছপালা পৃথিবীর অন্য কোন অংশে দেখা যায় না। অবশ্য বর্তমানে নানা দেশে এই সব গাছপালা আমদানী করে ফলানো হয়েছে। মাদাগাস্কারের জন্তুজানোয়ারের মধ্যে একমাত্র হিংস্র হলো এর কুমীর। আর সব জন্তুরা নিরীহ। মর্কট জাতীয় 'লেমুর' লক্ষ লক্ষ দেখা যায়। ভূতাত্ত্বিকেরা মাদাগাস্কারকে যে লুপ্ত মহাদেশের অংশ মনে করেন, সেই অনুমিত মহাদেশের নাম তাই 'লেমুরিয়া' রাখা হয়েছে।

মাদাগাস্কারের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—তানানারিভে, মাজুঙ্গা, মানাকারা, তামাতাভে। মাজুঙ্গা শহরের সব কারবার আরবী আর চীনাদের হাতে। সরকারী কর্মচারীর অধিকাংশই আরবী।

এই দ্বীপদেশে ঠিক ভারতবর্ষের মত গরুর গাড়ির প্রচলন আছে। এদেশে সবচেয়ে কষ্ট পাবে নিরামিষাশী লোক। নিরামিষ খাদ্যের দাম সবচেয়ে বেশী, মাংস সবচেয়ে সস্তা। ৩৫ লক্ষ লোক আর ৫০ লক্ষ গরু নিয়ে এই দেশ। এক সের মাংস আর এক সের আলুর দাম একই পড়ে।

জীবনযাত্রায় তাড়াহুড়া কাকে বলে তা মাদাগাস্কারের লোকের অনুভবের অগম্য। কুঁড়ে কথাটাও তাই এদের মধ্যে নেই। ধীরে সুস্থে গড়িমসি করে সব কাজ করাই এদের নিয়ম।

রাজধানী তানানারিভের রূপ পর্যটকের চোখে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শহরের চারদিকে ধানক্ষেতের সবুজ সমুদ্র, পথ দিয়ে শত শত রিক্সাগাড়ি ছুটে যায়। লোকজনদের চলাফেরার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা নেই। মোটরকারের চলার জন্য এই রকম ভীড়ওয়ালা পথ মোটেই সুবিধার নয়। তার উপর সড়কগুলি আঁকা বাঁকা। তা ছাড়া চড়াই উতরাই আছে। কিন্তু এই চড়াইগুলি রিক্সাকুলীরা যেভাবে গাড়িভরা বোঝা নিয়ে একদমে দৌড়ে উঠে পড়ে তা গিয়ারগর্বী মোটরকারের পক্ষেও বিস্ময়কর। নরনারী সকলেই সাদা কাপড় পরে। রঙীন কাপড়ের চলন খুব কম। বাড়িগুলি প্রায় সবই লাল রঙের।

মাদাগাস্কারের শস্য-সম্পদ খুব বেশী আছে—ভুট্টা, কফি, কোকো, চিনি, তামাক, চাউল, লঙ্কা প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের মধ্যে—সোনা, গ্রাফাইট, নিকেল, সীসা, মাঙ্গানীজ ও পঞ্চাশ রকমের মূল্যবান পাথর। কিন্তু যতখানি সম্পদ এই মাদাগাস্কারের ভূমি থেকে আহরণ করা যেতে পারে, শ্রমিকের অভাবে তা হয় না। অধিবাসীদের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স চাপিয়ে

শাসকপক্ষ লোকের মধ্যে কর্মপ্রবণতা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু এই চেষ্টা তেমন সুফল লাভ করেনি—করতে পারেও না। বিদেশ থেকে শ্রমিক আমদানী করার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু নিগ্রো শ্রমিকদের আফ্রিকাতেই চাহিদা রয়ে গেছে। চীনা শ্রমিকেরা মাদাগাস্কারের রোদ সহ্য করতে পারে না। ইন্দোচীন থেকে আন্নামী শ্রমিকদের আনবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজধানীর আসল নাম ছিল—আন্তানানারিভো অর্থাৎ 'এক হাজার গ্রামের শহর'। ফরাসীগণ সংক্ষিপ্ত করে 'তানানারিভে' নাম রেখেছে। মাদাগাস্কর্রীয়েরা সাধারণত 'মালানগসী' নামে পরিচিত।

সিঙ্গাপুর

ভারতের সংস্কৃতি একদিন পৃথিবীর ইতিহাসে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ছিল। ভারতের রত্নেশ্বর ধনেশ্বর সাধুদের তরণী বিচিত্র শিল্প পণ্যের সম্ভার নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দেশবিদেশের ঘাটে গিয়ে ঠেকতো। রোম মোসল ও বোগদাদের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেটা ঠিক সামুদ্র বাণিজ্য ছিল না। সুদূর রোমে ভারতীয় বণিকের কাঠের জাহাজ কখনও গিয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু তার অনেক আগে সমস্ত পূর্ব সাগরের দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে—চীন জাপান পর্যন্ত ভারতের সামুদ্র বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের সেই বহির্বাণিজ্যের প্রগতি ঠিক কী ধরণের ছিল তা আজ সঠিক অনুমান করা যায় না। সেটা কি আধুনিক ধনতন্ত্রের মত শুধু সারা দুনিয়ার 'মার্কেট' সন্ধান ও প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, না অনগ্রসর দেশসমূহের নিছক প্রয়োজনের তাগিদ মেটাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে এ কথা বলা যেতে পারে যে, শিল্পবলে বলীয়ান প্রাচীন ভারতও উপনিবেশ বিস্তারে পিছিয়ে ছিল না। আমরা জানি এই ঔপনিবেশিক বিস্তারের পেছনে ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের আদর্শ। অর্ধজগৎ ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে ভক্তিপ্রণত হয়েছিল, ভারতে উদ্ভূত নরধর্মের গরিমাই তার কারণ। তবে ঐতিহাসিকের মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—ধর্ম প্রচারের জন্য উপনিবেশ বিস্তার করা হয়েছিল, না উপনিবেশ বিস্তারের জন্য ধর্মপ্রচার করা হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতীয় ঔপনিবেশিক আদর্শের মূল কথা ছিল বাণিজ্য না ধর্ম সংস্কৃতি?

যে কারণেই হোক, সমস্ত সুদূর প্রাচ্য একদিন ভারতীয় সভ্যতার উপনিবেশ ছিল। সেই বৃহত্তর ভারতের এক সমৃদ্ধ নগর সিংহপুর, আজ যাকে আমরা সিঙ্গাপুর বলি।

সেই হিন্দু সিঙ্গাপুর অনেকদিন হলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এক বছর আগে সিঙ্গাপুরের বন্দরে জাহাজ থেকে মাটিতে নেমে যাত্রীরা দেখতো—সারি সারি জাহাজের মাস্তুলের ভীড়, অন্তত বিশটি বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা তার ওপর উড়ছে। অগণ্য চীনা বজরা, সাম্পান আর মালয় জেলে নৌকা। যাত্রীরা দাঁড়িয়ে দেখতো এক একজন বৃদ্ধ জ্বলন্ত সিগারেট মুখের ভেতর পুরে নিয়ে ডুব দিয়ে টাকা পয়সা জলের ভেতর থেকে তুলে এনে দর্শকদের চমক লাগাচ্ছে। কিন্তু এখন আর সেই দৃশ্য নেই। যুদ্ধের মেঘ সিঙ্গাপুরের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বন্দরের জলে ভাসমান সারি সারি শুধু সৈন্যবাহী জাহাজ, সামরিক সরবরাহ জাহাজ আর নানা আয়তনের যুদ্ধ জাহাজ। মাথার ওপরে অবিরাম জঙ্গী বিমানের মহড়া আর গুরু গুঞ্জন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে 'নিষ্প্রদীপের' অন্ধকার কালো যবনিকার মত সমস্ত শহর বন্দরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এশিয়ার অন্যতম কর্মব্যস্ত দীপমালা শোভিত আধুনিক শহর সিঙ্গাপুরে এখন নিত্য

অমাবস্যার পালা চলেছে। মালয়ের যুদ্ধ শেষ হয়ে সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

সিঙ্গাপুর বাণিজ্যের দিক দিয়ে প্রাচ্যের একটি বিশিষ্ট শহর। টিন ও রবারের যোগানের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা সিঙ্গাপুরের দিকে চেয়ে থাকে। তাছাড়া, সিঙ্গাপুর হলো 'এশিয়ার বৃটিশের শ্রেষ্ঠ সামরিক ঘাঁটি'। ম্যানিলার শন, বর্মার সেগুন, থাইল্যাণ্ডের চাউল, ইন্দোচীনের বেত, সারাওয়াকের তেল, সারা মালয়ের রবার ও টিন—সব কিছুই প্রথমে এসে সিঙ্গাপুরের বিরাট গুদামগুলিতে ভর্তি হয়, তারপর নানাদেশে চালান হয়। সিঙ্গাপুর চৌকীদারের মত বসে আছে মালাক্কা প্রণালীর পারে। সমস্ত ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পেট্রোল, কুইনাইন, মসলা, কাফি, চা, নারকেল শাঁস জাহাজ বোঝাই হয়ে সিঙ্গাপুরের চোখের ওপর দিয়ে চলে যায়। এই দিক দিয়ে সিঙ্গাপুর পৃথিবীর অপর তিনটি শ্রেষ্ঠ 'সাগর সঙ্কটের' সমতুল্য—জিব্রাল্টার, সুয়েজ ও পানামা।

আধুনিক সিঙ্গাপুর ঃ—শহরের জনসংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ। এক শত বৎসরও পার হয়নি মালয়ের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের জলো জমির ওপর এই শহরের পত্তন হয়। প্রাচীন সিংহপুরের কিছু কিছু স্মৃতি নিদশন এখনো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক সিঙ্গাপুরে সেই প্রাচীন জীবনযাত্রা ও আধুনিকতম পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। আধুনিক সিঙ্গাপুরের বিরাট কংক্রীটের সৌধশ্রেণী, বুলেভার, রেস্তোরাঁ, মুভিগৃহ, ধাবমান অটোমোবিল—যে-কোন পাশ্চাত্য বড় শহরের সমতুল্য। সিঙ্গাপুরের এই এক চেহারা। নগরীর এই সমৃদ্ধ সজ্জার আড়ালে রয়েছে হাজার হাজার সঙ্কীর্ণ গলি আর বস্তি। লক্ষ দেশী আর বিদেশী দরিদ্রের আস্তানা। সেখানে নোংরা আলো বাতাস দরিদ্র জীবনকে আরও দুষিত করে রেখেছে।

সিঙ্গাপুরের পথে বিচিত্র মানুষের প্রবাহ। পূর্ব পশ্চিম, এশিয়া ও ইউরোপ এখানে একই সঙ্গে বিভিন্ন ধারায় গড়িয়ে চলেছে। তারা এক দেহে লীন হতে পারেনি। সিঙ্গাপুরের পথে দাঁড়িয়েই বোঝা যায় যে, এর মধ্যে কোন জাতীয়তার রূপ নেই, কোন বিশেষ সংস্কৃতির কেন্দ্র সিঙ্গাপুর নয়। এটা সদাগরের দেশ—সিঙ্গাপুর একটি উন্নত সুসভ্য ও সুদৃশ্য 'মার্কেট' মাত্র। সিঙ্গাপুরের পথের দৃশ্য অনেকটা কলকাতার মত। ঝকঝকে লিমুজিন দৌড়চ্ছে উর্দ্ধশ্বাসে, তারই পাশে টুং টুং করে চলেছে মন্থর রিক্সা। ট্রামের দল, মাথার ওপর ইলেকট্রিক তারের সঙ্গে ঝুঁটি লাগানো, বিনা লাইনে সাপের মত এঁকেবেঁকে জনারণ্য ভেদ করে চলেছে। সাইকেল ও রিক্সার ভীড়ে সিঙ্গাপুরের রাস্তাগুলি গিজ গিজ করছে। সকাল বিকেল শ্রমিকেরা এই সাইকেল ও রিক্সা চড়েই দলে দলে কারখানার দিকে ছুটে চলে। কারখানাগুলিতে সাধারণতঃ সাবান, সিগারেট, মিছরি, বিস্কুট, রবারের জুতো, ফার্নিচার তৈরী হয়। আনারস কেটে টিনের কৌটায় ভর্তি করা সিঙ্গাপুরের একটি বিশিষ্ট শ্রমশিল্প।

তা ছাড়া রয়েছে সিঙ্গাপুরী চীনে মেয়েরা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত এরা মেমসাহেব। ঠোঁটে, নখে রুজের রঙ, ছোট ছোট স্কার্ট—সিঙ্গাপুরী চীনে মেয়েরা টেনিস কিম্বা বাস্কেটবল খেলে। ক্যাবারে সঙ্গীতের সঙ্গে মোহিনী বেশে বিভোর হয়ে নাচে। লোহার জুতোপরা তোবড়া-পা কোন চীনা পিতামহী এদের কাণ্ডকারখানা দেখলে লজ্জায় মরে যেতেন। তবে সে সব ঠাকুমার দল আজ আর নেই।

সিঙ্গাপুরের প্রকৃতিতে ছয় ঋতু বার মাস নেই। এখানকার মাস বছর শুধু ক্যালেণ্ডারের পাতায়। শ্রাবণের বর্ষা, বৈশাখের খরা, অগ্রাণের কুয়াসা, মাঘের হিম, আর ফাল্গুনের নবকিশলয়ের আনন্দ সিঙ্গাপুরের জলে মাটিতে নেই। বিষুবরেখা থেকে মাত্র ৬০ মাইল উত্তরে সিঙ্গাপুর। সমস্ত বছরে থার্মোমিটারে এক আধ ডিগ্রী তাপমানের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়।

সিঙ্গাপুরে সারা বছরই গ্রীষ্ম। ফলে এইটুকু সুবিধা হয়েছে যে, অতি গরীব শ্রেণীর দেশী লোকেরা শুধু লজ্জা বাঁচিয়ে শরীরের ওপর সামান্য একটু আবরণ রেখেই দিনপাত করে।

ইউরোপীয় ও মার্কিন সাহেবেরা তাদের সুটের বোঝা নিয়ে সমস্ত দিন ঘামে ভুগে হয়রান হয়।

সিঙ্গাপুরের 'বড়বাজার' ছাড়িয়ে দূরে এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় বর্ধিষ্ণু ধনী নাগরিকদের বসতি। বড় বড় উদ্যানবাটিকা। এদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের ধনীরা থাকেন। এই সুরম্য সিঙ্গাপুর ছাড়িয়ে সামান্য কিছু দূর এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য। সাউথ ব্রিজ রোডের দুপাশ দিয়ে আর 'চীনা শহরে'র অভ্যন্তরে যে অপ্রশস্ত স্থান, তারই মধ্যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, শ্রমিক, ভিক্ষুক, বেশ্যা, ফেরিওয়ালা ও বেকার মানুষ ভেড়ার পালের মত যেন গাদা হয়ে রয়েছে। এরই চারদিকে সমস্ত দিন ও রাত সমৃদ্ধ শহরের বিপুল কর্মব্যস্ত জীবন, শিল্প ব্যবসার চাঞ্চল্য সরগরম হয়ে রয়েছে।

সিঙ্গাপুরের 'বিমান বন্দর'। সিঙ্গাপুরের জাহাজের বন্দরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসর হলো গড়ে উঠেছে এই বিরাট 'বিমান বন্দর'। সমুদ্রের ধারে এক নিম্ন ভূমিখণ্ডকে ভরাট করে ১৯৩৭ সালে 'বিমান বন্দর' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল বিমান ডাকের লণ্ডন-মেলবোর্নের পথের ডাকবাহী বিমানগুলি এখানে আশ্রয় নিত। বর্তমানে প্যান-আমেরিকান যাত্রীবাহী বিমানগুলিও কালিফোর্নিয়া থেকে এসে এখানে আশ্রয় নেয়।

ভাষা, জাতীয়তা ও ধর্ম—এই ক'টি বিষয়ের দিক থেকে দেখলে সিঙ্গাপুরকে বিচিত্র 'মহামানবের তীর্থ' বলা যেতে পারে। অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান অংশ হলো চীনারা। এরা সংখ্যায় প্রায় পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার। সিঙ্গাপুর যেদিন থেকে বড় বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে গুরুত্ব লাভ করলো, সেই দিন থেকে চীনারা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে এসে ঢুকেছে। খুচরা কাজ-কারবারের প্রায় সমস্তই তারা অধিকার করে বসে। কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ীও অনেকদিন থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে। চীনাদের মধ্যে অনেকেই লক্ষপতি। রবার, টিন ও ঔষধের ব্যবসায়ের বলেই এরা লক্ষ্মীলাভ করেছে। তবে অধিকাংশ চীনারাই শ্রমিক, দোকানী, ভৃত্য ও রিক্সাকুলি। এদের পরিশ্রমের খ্যাতি আছে। মাত্র কয়েকটি সেণ্টের বিনিময়ে এরা সমস্ত দিন ভূতের মত খাটতে পারে। চীনাদের মধ্যে আচারে বেশভূষায় ও ধর্ম উৎসবে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কারণ তারাও মহাচীনের নানা প্রদেশ থেকে এসেছে। হানের চীনা, আময়ের চীনা ও ক্যাণ্টনের চীনার মধ্যে পার্থক্য আছে। সমস্ত সিঙ্গাপুর জুড়ে হরেক রকমের চীনা দেবালয়—পূজার পদ্ধতিও হরেক রকমের।

প্রতি রাত্রে 'চীনা শহরে'র ধুলো-ধোঁয়া, গোলমাল, ভীড়, তামাসা আর গানের বিচিত্র সমারোহ ওঠে। ছোট ছোট সংকীর্ণ সর্পিল গলিগুলোর মধ্যে জুয়ার আড্ডা, হোটেল আর নাচ-গানের আসর। তা ছাড়া আছে চীনা থিয়েটার, যা দেখবার জন্য বিদেশী পর্যটকেরাও এখানে এসে ভীড় করেন।

মালয়ীদের সংখ্যা মাত্র পঁচাত্তর হাজার। এদের মধ্যে অনেকেই গ্রামাঞ্চলে থাকে। এরা সকলেই মুসলমান। এরা কেরানী ও ব্যবসায়ী, তা ছাড়া সোফারের কাজ ও মালীর কাজ এরাই সাধারণত করে থাকে।

চীনা আর মালয়ীদের পরেই আসে ভারতীয়দের সংখ্যা। ভারতীয়েরা সংখ্যায় প্রায় ষাট হাজার। ভারতীয়েরা এখানেও সম্প্রদায় হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। ভারতের নানা প্রদেশের লোক, ভাষাও তাহাদের তাই পৃথক। ভারতীয়দের বেশীর ভাগই তেজারতী মহাজনী ও কাপড়ের ব্যবসায় করে। গরীব শ্রেণীর ভারতীয়েরা দারোয়ান চৌকীদার ও মালীর কাজ নেয়।

সিঙ্গাপুরের পথে আর একটি দর্শনীয় জিনিস শিখ ট্রাফিক পুলিস। দীর্ঘ দেহ, দাড়ি আর পাগড়ী আর মিলিটারী উর্দি গায়ে চড়িয়ে শিখ পুলিস পথে পথে টহল দেয়। হিন্দু যোগী. সাধু ও বাজীকরেরা খেলা দেখিয়ে ফেরে। যোগীরা জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে,

দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে।

সিঙ্গাপুরের আর এক শ্রেণীর মানুষ হলো যাদের 'ইউরেসিয়ান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরা আমাদের দেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মত। এদের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। ওরা য়ুরোপীয় ও সিঙ্গাপুরের এসিয়াটিকদের মধ্যে বর্ণসঙ্করের ফল। সরকারী দপ্তরে ও নানা মার্চেণ্ট অফিসে কেরানীর কাজই শিক্ষিত ইউরোপীয়ানদের জীবিকা। এ ছাড়া রয়েছে-- জাপানী (এখন নেই) আরব, ইরাণী, সিংহলী, আফগান, থাই কম্বোডিয়ান, আনামাইট ও ফিলিপিনো। এই বিচিত্র মানুষের ভীড়ের মধ্য দিয়ে এক আধজন কষায় চীর পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুও চলেছে। সিঙ্গাপুরকে তাই 'Melting Part of Asia' নাম দেওয়া হয়েছে। প্রথম আদমসুমারীর সময় সিঙ্গাপুরের গলি-ঘুঁজি থেকে পুলিস এমন সব অদ্ভুত মানুষ ধরে এনেছিল যাদের ভাষা কি তারা কোন দেশের লোক, কিছুই উদ্ধার হয়নি।

য়ুরোপীয়দের সংখ্যা (সমর বিভাগ বাদ দিয়ে) চৌদ্দ হাজার। এর মধ্যে দশ হাজার ব্রিটিশ, আমেরিকানদের সংখ্যা দু'শত থেকে আড়াই শত হবে, এরা বড় বড় রপ্তানী ব্যবসা করে। তা ছাড়া ব্যাঙ্ক, বীমা ও চলচ্চিত্রের কারবারও আছে।

সিঙ্গাপুরে চাকর খুব সস্তা। একজন সাধারণ সঙ্গতির য়ুরোপীয় ভদ্রলোক কম করে চার পাঁচটি চাকর রাখেন--একজন বয়, একজন কুক, একজন ধোপানী, এরা সবই চীনা। তাছাড়া একজন মালয়ী সোফার, একজন মালয়ী মালী ও একজন ভারতীয় দারোয়ান ও চীনা নার্স। সিঙ্গাপুরী চাকরদেব আর একটি নিয়ম হলো, তারা সপরিবারে মালিকেরই গৃহসংলগ্ন একটা কুঠরীতে থাকে।

যুদ্ধের শেষ খবরে প্রকাশ এই সিঙ্গাপুরকে প্রতিপক্ষ বাহিনী ঘিরে ফেলেছে। কাজেই সিঙ্গাপুরের জীবনে এখন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। সমরায়োজন ছাড়া এখন সেখানে অন্য কোন ব্যস্ততা নেই। ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটি--পৃথিবীর বৃহত্তম নৌঘাঁটি। সমস্ত ব্রিটিশ নৌবহরকে এখানে জায়গা দিতে পারা যায়। সিঙ্গাপুরের প্রধান ডক হলো 'রাজা ষষ্ঠ জর্জ গ্রেভিং' টাইপ। প্রাচ্যে ব্রিটিশের কোন বন্দরে এরকম ডক আর নেই। বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজকে এই ডকে মেরামতের ব্যবস্থা করা যায়। তা ছাড়া একটি বিরাট ভাসমান ডক আছে। ১৯২৮ সালে ইংলণ্ড থেকে সমুদ্রপথে এই ডকটিকে ভাসিয়ে টেনে আনা হয়। জোহোর প্রণালীর প্রবেশ পথে উপকূলভাগে প্রায় ২৫ মাইল জুড়ে আঠার ইঞ্চি কামানের সারি বসানো আছে। ব্লাকাং মাতি নামক দ্বীপে বড় কামানের সারি মালাক্কা প্রণালীর প্রবেশ পথ রক্ষা করছে। বিমানধ্বংসী কামান, সার্চলাইট, জঙ্গী ও বোমারু বিমান--সিঙ্গাপুরের নানা স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পোতাশ্রয়ের জলভাগে ইস্পাতের জাল জলের গভীরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সাবমেরিন যাতে ডুব দিয়ে পার হয়ে যেতে না পারে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল দিক থেকে সেনাবাহিনী সিঙ্গাপুরে এনে মজুদ করা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যই সবচেয়ে বেশী। তা ছাড়া অস্ট্রেলিয়া সৈন্যরাও আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের ভেতর থেকে একটি বড় ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হয়েছে।

আমেরিকার কারখানা থেকে নবনির্মিত 'লকহীড' ও ব্রুস্টার টাইপের জঙ্গী বিমান আমদানী করে রাখা হয়েছে।

সিঙ্গাপুর আজ চরম পরীক্ষার সম্মুখীন। জেনারেল পাওনাল ঘোষণা করেছেন,-- 'অবিচলিত পণ ও দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সিঙ্গাপুর রক্ষা করা হবে।'

সিঙ্গাপুর প্রস্তুত হয়েছে।

বিবিধ

মনেবিজ্ঞানের আবির্ভাব

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের প্রাথমিক গবেষণা—শার্কো ও ব্রয়ারের সহযোগিতা—হিস্টিরিয়া ও অন্যান্য মানসিক বিকারের চিকিৎসার চেষ্টা—হিপ্নোটিজম্ প্রণালীর ব্যর্থতা—Catharsis বা আবেগের পরিস্ফূর্তি—সাইকো-এনালিসিসের পত্তন--অবাধ-অনুষঙ্গ প্রণালী—ইচ্ছাবৃত্তি--দমিত ইচ্ছা--অভিঘাত বা Trauma--স্মৃতি ও বিস্মৃতি—অচেতনতা বা অজ্ঞাত মনের অস্তিত্ব—বাতিকের কারণ।

ভারতের হিন্দুদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থে মনকে শরীরের অন্যতম ইন্দ্রিয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আবার অনেকে বলেছেন—মন সূক্ষ্মেন্দ্রিয় মাত্র। যেভাবেই তাঁরা বলুন না কেন, মনকে ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যেই তাঁরা ফেলেছিলেন। এই বিচার প্রাচীন হিন্দু মনস্তাত্ত্বিকের চিন্তানুশীলনের প্রখরতা প্রমাণ করিয়ে দেয়। যোগশাস্ত্রে ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে মন সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মন নিয়ে প্রাচীনদের মধ্যেও গবেষণার উৎসাহ ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে এসে দেখা যায়, ভারতীয় মনস্তত্ত্ব নিছক দার্শনিকের ধ্যানের আশ্রয় ছেড়ে ফলিত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পরীক্ষার দিকে অল্পসল্প ঝুঁকে পড়েছে। আজকের তুলনায় এই তান্ত্রিক পদ্ধতির বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দিগ্ধ হবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে; কিন্তু সেযুগে সেটা তাত্ত্বিকদের প্রগতিপরায়ণ চিন্তাবৃত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে কারণেই হোক, অন্যান্য বিষয়-বিজ্ঞানের মত মনের বিজ্ঞান উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সার্থকভাবে অগ্রসর হয়নি। অধ্যাত্মবাদ অতীন্দ্রিয়-বাদ প্রভৃতি ধর্মানুষঙ্গিক চিন্তার চাপে মন এতদিন দার্শনিকের দেওয়া নানারকম বিচিত্র সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানের সীমার বাইরে পড়েছিল। বিংশ শতকে এসে মনকে বিজ্ঞানের সূত্রে বাঁধবার আয়োজন আরম্ভ হয়। চল্লিশ বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা আমাদের সর্ববিধ আচরণের অদৃশ্য নিয়ামক--এই আড়াল-দিয়ে লুকিয়ে-চলা চটুল মনস্বরূপকে যুক্তির সূত্রে, ফরমূলার অঙ্কে ও লেবরেটরীর তৌল মাপের মধ্যে বেঁধে ফেলেছেন। মনস্তত্ত্ব এখন যথার্থ মনোবিজ্ঞানের পর্যায়ে এসে পড়েছে। এখন কিশোর অবস্থামাত্র—এর সমুখে এক সুবিপুল সম্ভাবনায় ভবিষ্যত পড়ে রয়েছে।

সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটা নতুন কথা—সাইকো-এনালিসিস (Psycho-analysis)। যাকে সোজা কথায় বলতে পারি—মনকে পরীক্ষা করার পদ্ধতি। বাঙলাভাষায় এই কথাটার তিন-চার রকম প্রতিশব্দ চালু হয়েছে : মনোবিকলন, মনোবিশ্লেষণ, মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি। সাইকো-এনালিসিস অথবা সাধারণভাবে বলতে গেলে মনোবিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্গে কীর্তিত হয়ে রয়েছে যাঁর নাম—তিনি হলেন ভিয়েনার ইহুদী ডাক্তার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মোরাভিয়ার (প্রাক্তন অস্ট্রিয়া—বর্তমান চেকোস্লোভাকিয়া) অন্তর্গত ফ্রাইবের্গ নামে ছোট একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর বয়স থেকে ভিয়েনা শহরে লালিত পালিত হন। ডারুইনের লেখা পড়ে বালক ফ্রয়েডের সন্ধিৎসা প্রবল হয়ে ওঠে। তারপর কবি গ্যটের প্রবন্ধ (প্রকৃতি) পড়ে চিকিৎসা বিদ্যা শেখবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন ও মেডিক্যল স্কুলে ভর্তি হন। ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় তিনি শারীরবিদ্যা (Physiology) এবং বিশেষ করে স্নায়ুতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। মেডিকাল গ্রেজুয়েট হবার পর (১৮৮১ সন) তিনি ভিয়েনায় জেনারেল হাসপাতালে কাজ শিখতে এবং মস্তিষ্কের গঠনতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। ১৮৮৫ সনে ফ্রয়েড বিখ্যাত চিকিৎসক শার্কোর (Charcot) গুণগ্রামে আকৃষ্ট হন। শার্কো তখন সম্মোহন প্রয়োগ করে (Hypnotism) হিস্টিরিয়া ও স্নায়বিক রোগের চিকিৎসা করছিলেন। এক বছর কাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে শার্কোর কাছে শিক্ষানবীশী করেন। তারপর ভিয়েনায় ফিরে এসে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। এই সময় থেকে ফ্রয়েড চিকিৎসক হিসাবে ব্যবসায় আরম্ভ এবং

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করেন।

শার্কোর সমসাময়িক বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা সম্মোহন-তত্ত্বকে নিছক ধাপ্পাবাজী বলে মনে করতেন। কিন্তু ফ্রয়েড সম্মোহন-তত্ত্বের ক্রিয়াকলাপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি শার্কোর কাছেই শিখলেন যে, হিপ্নোটিজ্‌ম্‌ যেমন হিস্টিরিয়া অপস্মার বা স্নায়বিক বিকার নিরাময় করতে পারে তেমনি সুস্থ লোকের মনে ঐ প্রথায় এইসব রোগের লক্ষণগুলিও সঞ্চার করা যেতে পারেন। তারপর অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের (লীবোল্ট, ব্রেনহাইম প্রভৃতি) পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে বুঝলেন যে মাত্র গূঢ় আদেশ (suggestion) দ্বারাই কোন ব্যক্তির মনে মুহ্যমান অবস্থা সৃষ্টি এবং আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যেতে পারে, এর জন্য সম্মোহন প্রয়োজনের অপরিহার্য আবশ্যকতা নেই।

ডাক্তার ফ্রয়েড ভিয়েনাতে রোগীদের স্নায়বিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য দুটি চিকিৎসা-প্রণালী গ্রহণ করেন—হিপ্নোটিজ্‌ম্‌ ও ইলেক্‌ট্রোথেরাপী। শারীরবিদ্যাবিৎ (Physiologist) চিকিৎসকেরা ফ্রয়েডের পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি তোলেন। তাঁরা শরীরের অঙ্গাবয়বের অতিরিক্ত মন নামে বিশেষ কোন দেহধর্ম বা ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করতেন না। ডাঃ ফ্রয়েড সমসাময়িক শরীরবিজ্ঞানী চিকিৎসকদের আপত্তিকে প্রশ্রয় না দিলেও, শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা রোগীর স্বাস্থ্যবিধানে একেবারেই অচল ও বিফল; আর হিপ্নোটিজ্‌ম্‌ দিয়ে যদিও সাময়িকভাবে কিছু সুফল লাভ করা যায়, কিন্তু রোগীর রোগ বরাবরের জন্য দূর হয়ে যায় না। এই ব্যর্থ প্রয়াস থেকেই ডাক্তার ফ্রয়েডের গবেষণা অপেক্ষাকৃত উন্নততর বৈজ্ঞানিক আয়োজনের দিকে চালিত হয়। এর পর তিনি যে প্রথা গ্রহণ ও প্রবর্তন করেন তারই নাম সাইকো-এনালিসিস।

ডাক্তার ফ্রয়েড প্রবর্তিত যে সাইকো-এনালিসিস প্রথা সর্বত্র খ্যাতি ও অখ্যাতি লাভ করেছে, তার মূল কাঠাম আগেই তৈরী হয়েছিল ডাক্তার জোসেফ ব্রয়ার নামে ভিয়েনাবাসী চিকিৎসকের গবেষণালব্ধ তথ্যের মধ্যে। ফ্রয়েড যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনই উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটেছিল। ব্রয়ারের কাছ থেকেই ফ্রয়েড জানতে পেরেছিলেন যে আধিগ্রস্ত রোগী যদি তার মনঃপীড়ার কথা অকপটে ও অকুণ্ঠভাবে ভাষায় প্রকাশ করে ফেলতে পারে, তবে রোগের উপশম হয়। সম্মোহন প্রয়োগ করবার পর আসলে রোগী এই কারণেই কিছুটা সুস্থতা লাভ করে। অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় রোগী জানতো না যে কী কারণে তার এই মনঃপীড়া; কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় যেন মনের কপাট খুলে যায়। সে বুঝতে পারে, কোন্‌ প্রচ্ছন্ন অতীত অভিজ্ঞতা মনের গহন থেকে তার আচরণের ও চিন্তার স্বাভাবিকতাকে উত্যক্ত করে চলেছে। ব্রয়ারের গবেষণার সূত্র ধরে এমন এক জায়গায় এসে পৌছান গেল, যেখানে রোগের সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নটা মন নিয়ে নয়, মনেরই বিশেষ একটি গুণগত রূপ অর্থাৎ স্মৃতি নিয়ে। স্নায়বিক অপচারের মূলে পাওয়া গেল স্মৃতিঘটিত ব্যাপার—অতীত অভিজ্ঞতার ব্যাপার।

আর একটু তলিয়ে দেখলে রহস্য আরও সরল হয়ে আসে। এই স্মৃতি কিসের? কোন ঘটনার স্মৃতি মনের আকাশে এই এলোমেলো অকালঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে রেখেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়—

ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে। অথবা, মনের অতল জলের আবর্তে এক মজ্জমান কামনাসুন্দরী ডাকছে—আমায় উদ্ধার কর। মনের মরুপথে কত নদী তার ধারা হারিয়েছে। কত ঢেউ উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে। এই ব্যর্থ অভীপ্সার—অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার শ্মশানে এক ইচ্ছাময়ী নেচে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে সেই স্মরণের গ্রন্থি টুটে এক একটি ইচ্ছা মুক্তির জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানীরা এই ব্যর্থ ইচ্ছার বেদনাকে একটি পরিভাষায় সংজ্ঞাত করেছেন—ট্রোমা (Trauma)। চরিতার্থতার অপেক্ষায় কোন ইচ্ছা বসে থাকে না। কাজেই উদ্ভব মাত্র বহু

ইচ্ছাকে মনের মধ্যেই চেপে দিতে হয়—চরিতার্থতার অভাবে। কাজেই যে-বাসনাকে মনে করা গেল যে তার লয় হয়ে গেছে, আসলে তা নির্বাসিত হয়েছে শুধু। ট্রোমা এই নির্বাসনের শোকের চিহ্ন।

কোন গোলমাল হতো না, যদি এই ট্রোমা বা ব্যর্থকাম বেদনাটি লোকে স্পষ্ট বুঝতে পারতো। এই শোকের কাহিনী ও শোকচিহ্ন সবই তার স্মৃতি থেকে মুছে যায়, অথচ কায়িক ও মানসিক আচরণের ভেতর সেই বিস্মৃত অভিমান বজায় থাকে।

ডাক্তার ব্রয়ারের গবেষণা এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল এবং ফ্রয়েড নিজে ভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে যেসব তথ্য আবিষ্কার করেন, তাতে তত্ত্বের দিক দিয়ে উভয়ের গবেষণা এক ভিত্তিতে মিলিত হয়। তাঁরা দুজনে মিলে (১৮৯৩ সনে) হিস্টিরিয়ার মনস্তাত্ত্বিক নির্ণয় নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

হিস্টিরিয়ার চিকিৎসা ব্যাপারে দুজনেই বুঝেছিলেন যে, রোগীর সুস্থতা লাভের প্রধান কারণ হলো—পরিস্ফূর্তি বা মনের ভেতর থেকে একটা নিরুদ্ধ আবেগসমষ্টির মুক্তি লাভ (catharsis)। হিস্টিরিয়া রোগের মূল রোগীর বর্তমান জীবনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকেই অবলম্বন করে থাকে না ; প্রধানত এটা অতীতের ব্যাপার।

হিস্টিরিয়ার মত একটা আধি বা মানসিক রোগের পরীক্ষা করতে করতে তথ্যের আবিষ্কার এইখানে সম্পূর্ণ হয়নি। বরং এর পরেই সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ঘটে। ডাক্তার ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের বুনিয়াদ বলতে গেলে এই আবিষ্কারের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

অচরিতার্থ কামনা থেকে পরবর্তী অধ্যায় হিসাবে পাওয়া গেল দমিত বাসনা, অর্থাৎ চরিতার্থতা লাভের উপায় নেই বলেই বাসনাকে দমন করে দিতে হয়। বাসনা দমিত হলো, অথচ সেটা স্মরণে থাকে না—এ কেমন ব্যাপার? আরও আশ্চর্য, বিস্মৃত হয়েও সেই বাসনার কারসাজী বন্ধ হয় না ; আচরণের ভেতর নানা ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এতক্ষণে মনের ধর্মকে খানিকটা চিনতে পারা গেল :—(১) সজ্ঞান মন ও (২) অজ্ঞান মন। সজ্ঞান মন ও তার আচরণ আমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আর একটা মন আছে যেটা আমাদের বিস্মৃত যত অতীত কাহিনী ও ইচ্ছাকে পুষে রাখে এবং আমাদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

ডাক্তার ব্রয়ার এই গবেষণাকে আর বেশী দূর টেনে নিয়ে যাননি। ফ্রয়েডের অনুসন্ধান এখানে এসে ক্ষান্ত হয়নি। কিছুদিন পরীক্ষার পর তিনি আর একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যার দ্বারা রোগীর মনের নিরুদ্ধ ইচ্ছাপুঞ্জ বা আবেগকে পরিস্ফূর্তি (catharsis) দেওয়া যায়, অথচ সম্মোহন করার প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতির নাম—Free Association বা অবাধ অনুষঙ্গ। সম্মোহন প্রথার মধ্যে ত্রুটীগুলি ফ্রয়েড আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথমত সকলকেই সম্মোহিত করা সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়ত সম্মোহন প্রথায় চিকিৎসা করে যেটুকু সুফল পাওয়া যায়, তা আদৌ স্থায়ী হয় না। কয়েকজন রোগীকে সম্মোহিত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ফ্রয়েড আর একটি উপায় ধরলেন। রোগীকে বলা হতো যে, যেসব কথা তার মনে আসছে, অকপট ভাবে এবং চাপা দেবার চেষ্টা না করে তাই বলে যাক। সব রকম দ্বিধা সংশয় কুণ্ঠা লজ্জা ভয় মন থেকে সরিয়ে ফেলে নির্বাধ উৎসের মত রোগী তার মনের প্রত্যেকটি ভাবনা বলে চলে। ডাক্তার ফ্রয়েডের মতে এই সব বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন কথাগুলি যেন মনের গহনে সুগুপ্ত সেই ইতিহাসের ছেঁড়াছেঁড়া কতগুলি পাতা। এই পাতাগুলিকে গুছিয়ে সাজাতে পারলেই কাহিনীটি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এই ভাবনার নির্বাধ অভিব্যক্তির মধ্যেই অজ্ঞাতমনের মালমসলা আপনা-আপনি ভেসে ওঠে।

কিন্তু এই সব নির্বাধ মনের কথা সত্যিই নির্বাধ নয়। অজ্ঞাত মনের সাধ ইচ্ছা কল্পনা ও বহুবিধ ভীতি কুণ্ঠা ও বিদ্বেষের প্রকোপে এইসব বাধ্যহীন কথামালা নানারূপে আত্মপ্রকাশ

করে। অজ্ঞাত আবেগের পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ অপিহিত। তাকে ব্যক্ত করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক কৌশল দরকার, তাকেই ডাক্তার ফ্রয়েড কতগুলি নিয়মাবলী দিয়ে গড়ে তুলেছেন, আর নাম দিয়েছেন—সাইকো-এনালিসিস। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, অধুনা সাইকো-এনালিসিস বলতে শুধু ফ্রয়েডীয় রীতিকেই বোঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা ও প্রতিভা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাইকো-এনালিসিস বা মনঃসমীক্ষণের প্রণালী রচনা করেছেন।

যেদিন থেকে অবাধ-অনুষঙ্গ রীতিতে ডাক্তার ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণ করে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করতে আরম্ভ করলেন, সেইদিন থেকে তাঁর কাছে এক তিমিরাপসৃত মনোরাজ্যের বিচিত্র রূপ যেন প্রকাশিত হলো। মনের গভীরে এক অগোচরের দেশে তিনি দেখলেন—অজস্র ইচ্ছার দ্বন্দ্ব, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, সমন্বয় ও সংমিশ্রণের খেলা। হিস্টিরিয়ার নিদান খুঁজতে গিয়ে তিনি সাধারণভাবে মানসিক তথা স্নায়বিক (অথবা বাতিক) এক সত্তার পরিচয় পেলেন। তিনি দেখলেন—

যাকে আমরা বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া বলি, সেটা সত্যই বিলীন ব্যাপার নয়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতা মনের হিসাবের খাতায় জমা থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে, যে-অভিজ্ঞতা প্রীতিকর নয়—সেটা ভুলে যাওয়ার জন্য একটা চেষ্টা থাকে। সেই চেষ্টা সফলও হয়। এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাকে সজ্ঞান চিন্তার মধ্যে আনতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নারাজ। অতএব দেখা গেল . ইচ্ছাবৃত্তি যদি চরিতার্থ না হয় তবে তার প্রতিক্রিয়ায় একটা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। এই অভিজ্ঞতাকে ভুলে যাবার জন্য একটা চেষ্টাবৃত্তি আছে, যার ফলে অভিজ্ঞতা বিস্মৃতির স্তরে বা অজ্ঞান মনের বন্দীশালায় নির্বাসিত হয়। কিন্তু ইচ্ছাবৃত্তি বারবার চরিতার্থ হওয়ার জন্য ব্যাকুল ভাবে সাড়া দিয়ে ওঠে—আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু একটা সজাগ চেষ্টাবৃত্তি তাকে বাধা দেয়; এই প্রতিরোধশক্তি (Resistance) ও ইচ্ছাবৃত্তির স্ফূর্তি (Impuise) দুয়ের সংঘাতে মনের বাতিক (Neurosis) অবস্থা সৃষ্টি হয়। বাতিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়—ইচ্ছা ও প্রকাশ্য উদ্দেশ্যের পারম্পর্যহীন একটা নিরর্থক আচরণ।

এই পর্যন্ত এসে ডাক্তার ফ্রয়েডের আবিষ্কারের তালিকাটি সংক্ষেপে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :—(১) সজ্ঞান মন (২) অজ্ঞান মন (৩) দমিত ইচ্ছা (৪) ইচ্ছাবৃত্তির স্ফূর্তি (৫) প্রতিরোধ শক্তি।

মনের রথী ও সারথী

মানসিক ক্রিয়াযন্ত্র বা Psychic Apparatus সহজাত মনোগুণ—মানসিকতা মানুষের একটি শক্তিরূপী আদিম বৃত্তি—পরিপার্শ্বের সঙ্গে ইদের সংঘাত—ইদ (Id) বা স্বয়ং বা প্রথম ব্যক্তিত্ব—ইগো (Ego) বা অহং বা দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব—ইদের প্রতি ইগোর শাসন—পরা ইগো (Super Ego) বা তৃতীয় ব্যক্তিত্ব বা বিবেক—সক্রিয় মনের তিনটা স্তরভেদ—চেতনতা, অচেতনতা ও অর্ধচেতনতা।

ফ্রয়েডের সঙ্গে আমরা মন দিয়েই মনকে বিচার করে চলছি ; মনই মনের মহিমা খুঁজে বার করছে। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত। তাই এই বিজ্ঞানের পথে পথে বিভ্রান্তির বিপদ ঘনিয়ে রয়েছে। অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞানের দুরূহতা এইখানে। মনই মনের গুণাগুণ যাচাই করার টেস্ট টিউব। ডাক্তার ফ্রয়েড মনের কোন বিশিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করছেন না। তিনি মানুষের প্রকৃতিতত্ত্বের পেছনে একটি অস্থূল সত্তার ক্রিয়া লক্ষ্য করে আসছেন, তার রীতি নীতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই তিনি এই আধারবিশেষকে মানসিক ক্রিয়াযন্ত্র (Psychic Apparatus) বলে অভিহিত করেছেন। ইংরাজী অ্যাপারাটাস কথাটার একটা যথার্থ দার্শনিক প্রতিশব্দ ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়—ঘট। কিন্তু মানসিক ঘট বললে

কথাটা ততটা বোধক হবে না তাই ক্রিয়াযন্ত্র বলাই সুবিধা।

একটা মানসিক ক্রিয়াযন্ত্র আমাদের আচরণের প্রেরণা যোগাচ্ছে। এই ক্রিয়াযন্ত্রের গঠন কি? ডাক্তার ফ্রয়েড এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে দর্শনের পর্যায়ে এনে ফেলেছেন। তিনি বলেন—প্রত্যেক মানবশিশু তার দেহের সহজাত একটা ছন্নছাড়া মনোগুণ নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। এই মনোগুণকে তিনি একটা শক্তিরূপী বৃত্তি (Energy) বলে মনে করেন। এই শক্তি শিশুর জীবনচর্যায় প্রধান ধাত্রী। এই শক্তির লক্ষ্য হলো শিশুর জীবনের সর্বপ্রকার আত্মপুষ্টি বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে আহরণ করা। মোট কথা এই শক্তিই হলো সহজাত আদিম ব্যক্তিত্ব। ডাক্তার ফ্রয়েড এই স্বয়ম্ভু আদিম ব্যক্তিত্বের নামকরণ করছেন—ইদ।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জীবন নিছক ইদের প্রেরণায় চালিত হবার তাগিদটা অবশ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু চলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার চারদিকের অবস্থাটা অর্থাৎ পরিপার্শ্বের (Environment) সঙ্গে ইদের ইঙ্গিতে চলবার চেষ্টা খাপ খায় না—বরং ব্যাহত হয়। পরাহত ইদ ইন্দ্রিয়গামে যে -অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করে, তারই ফলে শিশুর জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের প্রথম পাঠ হলো এই যে—বাইরের জগৎটা উদার নয় ; সেখানে শুধু নিজের গরবের বেগে চলা যায় না। তুষ্টি তৃপ্তি ও স্ফূর্তি এত সহজে সেখানে বিকোয় না। কাজেই ইদগত এই অবুঝ প্রথম ব্যক্তিত্ব যেন ঠেকে শিখে শিখে নিজেকে বিভক্ত করে দ্বিতীয় একটি বিবেচনাশীল ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে—এর নাম ইগো।

হিস্টিরিয়ার মত আরও যেসব বাতিক আচরণ ও স্মরদশার প্রকোপে মানসিক স্বাস্থ্য বিকল হয়ে যায়, তার ভেতরের রহস্য অনুসন্ধান করে ডাক্তার ফ্রয়েড দেখেছেন ইগো ও ইদের দ্বন্দ্ব। ইদ যেন সকল ইচ্ছার মূলাধার—প্রতিনিয়ত চরিতার্থতার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। আর, ইগো হলো সতর্ক সামাজিক বৃত্তি, যা হিসেব ও বিবেচনা করে চলে। ইগো ইদকে শাসিয়ে স্তব্ধ করে রাখতে চায়।

বহির্জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিঘাতের দরুন ইদের একাংশ রূপান্তরিত হয়ে ইগো নামে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করলো। এর পর ফ্রয়েড তৃতীয় ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। ইগো আবার প্রত্যক্ষ অভিঘাতের অথবা পরাভবের ফলে নিজেকে বিভক্ত করে তার একাংশকে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব বা পরা-ইগোতে (Super-Ego) রূপান্তরিত করে। সামাজিক জীবনে বিধাতা গোছের একজন প্রভু বা অভিভাবকের (সাধারণতঃ বাপ ও মা) শাসনে কিশোর ইগোকে—আরও বাধ্য সংযত ও নিয়মনিষ্ঠ হতে হয়। বিধি বিধান ও নিষেধের কীর্তি এখানে চরম হয়ে উঠেছে। এর ফলে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব বা পরা-ইগো বৃত্তি চিন্তা ও আচরণের সর্বোচ্চ ও শ্রদ্ধেয় শাসক হয়ে দাঁড়ালো। পরা-ইগোকে বলতে পারা যায়—বৃত্তির সমাজে ইনি গুরুমশায়। আরও সরল ও সংক্ষেপে বলা যায় বিবেক।

মনের ঘটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে জানা গেল যে—একটা সহজাত শক্তিরূপী বৃত্তিপুঞ্জ নিজেকে ত্রয়ীরূপে সাজিয়ে রেখেছে। ইদ-ইগো ও পরা-ইগো অর্থাৎ স্বয়ং, অহং ও বিবেক।

মনস্তত্ত্বের এই অধ্যায়টিকে আমরা মনের জুডিসিয়ারি বা বিচারক বিভাগের পরিচয় বলতে পারি। এর পর খুঁজতে হবে মনের এক্সিকিউটিভ বা কার্য-নির্বাহক বিভাগের পরিচয়।

মনের কার্য প্রথমত উপলব্ধি করা। মন নিজের যে গুণটিকে প্রসারিত করে বস্তু বা বিষয়কে উপলব্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তাকে আমরা বলতে পারি—চেতনতা (Conciousness)। চেতনতা বোধের (perception) বাহক। চেতনতার খাত দিয়েই বোধপ্রবাহ আমাদের ব্যক্তিত্বে সঞ্চারিত হচ্ছে। এই চেতনমানসের কাজ বিষয়কে গ্রহণ করে প্রত্যয় সৃষ্টি করা। চেতনা সজাগ স্মৃতির সহচর। চেতনমানসের বস্তু স্মরণের সূত্রে গাঁথা থাকে। আহ্বান মাত্র তাকে কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক নামে ও কাজে এর বিপরীত মনের

আর একটি ধর্ম বা গুণ আছে—অচেতনতা (Unconsciousness)। একে মনের তমোগুণ বলতে পারা যায়—বিস্মৃতির জঠরে লুক্কায়িত বিচিত্র ও বিরাট এক ভাবনার জগৎ। চেষ্টা করলেও (মনঃসমীক্ষণ ব্যতিরেকে) এর হদিস পাওয়া যায় না। এই দু'য়ের মাঝামাঝি একটা স্তর আছে, যাকে অর্ধচেতনতা (Fore-consciousness) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মনের এই অবস্থায় বিস্মৃত বিষয় একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায় না ; তাকে চেষ্টা করলে বোঝা যায় ; বিস্মৃতিকে স্মরণের পথে টেনে আনা যায়।

চেতনতা বা চেতন মনের কাজকে উদাহরণ দিয়ে বোঝার দরকার হয় না। তবুও ২৬শে জানুয়ারী সকাল আটটার সময় কংগ্রেস ময়দানে জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার সংকল্প ও শপথ গ্রহণ করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত ছিল। নির্দিষ্ট দিনে তাই করা হলো। বুঝে ভেবে এই সিদ্ধান্তকে স্মরণের মধ্যে সজাগ রেখে, ঠিক সময়ে সাড়া দিলাম। এই আচরণ আগাগোড়া চেতন মনের কাজ। এর মধ্যে জটিলতা, স্থিতি ও অস্পষ্টতা নেই।

অচেতনতা বা অচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের ভাল উদাহরণ হলো স্বপ্ন। আর, অর্ধচেতনতা বা অর্ধচেতন মনের কাজের নমুনা দিতে হলে আমাদের প্রাত্যহিক আচরণের কতগুলি ভ্রান্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, বাকভ্রান্তি, পরিচিত নাম ভুলে যাওয়া, লিখতে ভুল করা, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি। কোন সুপরিচিত নাম অনেক সময় স্মরণ করা যায় না, যে-অবস্থাকে বলা হয়—পেটে আসছে মুখে আসছে না। এই অবস্থাকে অর্ধচেতনতা বলা যায়।

ফ্রয়েডীয় মতে মনের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে পরিচয় সংক্ষেপে এইখানে শেষ করা যেতে পারে। এর পরে দেখতে হবে মনের কর্মকাণ্ড ; মনোলীলার মধ্যে কোন নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে কি? মনের নীতি কি মাৎস্যন্যায়েই নিষ্পন্ন হয়, না তার মধ্যেও কার্য-কারণ সঙ্গতি আছে?

মন ও মনসিজ

ইচ্ছাবৃত্তি মুখ্যতঃ কামধর্মী—কামিতা—(Sexuality) ও যৌনতা এক নয় কামের গূঢ়ার্থ—লিবিডো (Libido) বা রতি নামে কামবৃত্তির বৈজ্ঞানিক পরিচয়—লিবিডোর রীতিনীতি—শৈশব কামিতা বা শিশুমনের কামবৃত্তি—দমিত লিবিডো ও বাতিক বা মানসিক অসুস্থতা—একেবারে স্বভাবী (Normal) মানুষ কেউ নেই—সকলেই অল্পবিস্তর বাতিকগ্রস্ত।

"আমি মনসিজ—
নিখিলের নরনারী হিয়া
টেনে আনি বেদনা বন্ধনে।"

ইনি সেই পুষ্পধন্বা, পৌরাণিক কবিদের মতে যিনি অলক্ষ্যে যৌবনের বুকে এক বিহ্বল বেদনার তীর হেনে সরে পড়েন—যার ফলে ধ্যানমগ্ন মহেশ্বর চোখ মেলে পূজারিণী উমার মুখের দিকে স্মিতহাস্যে তাকান, স্নানরত ঋষিকুমারকে দেখে মুনিকন্যাদের বরাঙ্গে শিহর লাগে, বল্কল নীবিচ্যুত হয়।

ইনি মনসিজ, মন জুড়ে বসে আছেন। ডাক্তার ফ্রয়েডও এই কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বলার বিষয়ের সঙ্গে তত্ত্বের দিক দিয়ে কবিসুলভ ভাবদৃষ্টির পার্থক্য আছে। পুরাণের মনসিজ যেন বয়সের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় বসে থাকে—যৌবনোদ্‌গমের আগে তার দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু ডাক্তার ফ্রয়েড তাঁর প্রসঙ্গের আরম্ভেই বলে রেখেছেন যে, কামনার ফুল শুধু যৌবনজলতরঙ্গের টানেই ভেসে বেড়ায় না। শুধু যৌবনধন্য নরনারী নয়, অতি অপোগণ্ড মনুজ সন্তানের মন কামরহিত নয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে সদ্যোজাত মানুষের মনেও ইদ বা স্বয়ং নামে এক শক্তিরূপী ইচ্ছাবৃত্তি সঞ্চিত থাকে। কামের (sex) প্রসঙ্গে ফ্রয়েড আবার বলছেন যে—মানুষের অন্তশ্চেতনা জুড়ে এক শক্তিরূপী কামবৃত্তি বিরাজ করছে। এই কামবৃত্তি আপনাতে আপনি বাঁধা নয়—আত্মাশ্রয়ী নয়। এর জন্য বাইরে থেকে একটি আস্পদ চাই। প্রেমে প্রণয়ে এই কামবৃত্তি নিজেকে সার্থক করছে। সকল প্রণয়কলার প্রধান লক্ষ্য হলো কাম তৃপ্তি। সব ভালবাসার সার কথা হলো এই কামজ বাসনার চরিতার্থ। জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থাৎ বাষ্পে মেঘে বরফে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে, সেই এক আদি কামাবেগ লয়লা-মজনু মার্কা প্রেম থেকে শুরু করে পীড়িতের সেবা, দেশপ্রীতি, শিল্পানুরাগ, আত্মপ্রিয়তা, বাৎসল্য ও পুতুলখেলা পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে পরিব্যক্ত করে রেখেছে। এই শক্তিরূপী কামবৃত্তিকে ডাক্তার ফ্রয়েড আখ্যা দিয়েছেন—লিবিডো (Libido) বা রতি।

ইদ নামে আদি ইচ্ছাবৃত্তি বা জৈব আবেগের কথা বলা হয়েছে ; আবার রতি বা লিবিডো নামে আর একটা আদি কামবৃত্তির কথা বলা হলো। এ কি করে সম্ভব? দু'দুটো আদি একই আধারে একই প্রেরণা সৃষ্টি করে চলতে পারে কি? তা হলে 'আদি' বলার সার্থকতা কোথায়?

লিবিডো ইদ থেকে ভিন্নতর বা স্বাধীন কোন বৃত্তি নয়। লিবিডো ইদেরই ব্যঞ্জনা। ইচ্ছাকে প্রাচীনেরা কামাচারী বলেছেন। সেই উক্তি ফ্রয়েডের বিচারে সর্বাংশে সত্য বলে গৃহীত হয়েছে।

কাম সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক গণ্ডগোলের ব্যাপার ঘটে গেছে। শুধু গোঁড়া নীতিবাগীশেরা নয়—বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকেও ফ্রয়েডীয় মতবাদের কাম-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ উঠেছিল এবং এখনো আছে। ফ্রয়েড বলেছেন যে তিনি সাধ করে কাম সম্বন্ধে একটা হঠ-সিদ্ধান্ত করে বসেননি। হিস্টিরিয়ার চিকিৎসা সম্পর্কে রোগীর মনের তথ্য জানতে জানতে তিনি একেবারে গভীরে গিয়ে এই তত্ত্ব জানতে পেরেছেন। আদি জৈবিক ইচ্ছাবৃত্তি বা ইদের কোন পরাভব থেকে যে-অভিজ্ঞতার ক্ষত বা অভিঘাত (Trauma) মনের ভিতর পুঞ্জীভূত হতে থাকে, সেই সব অভিঘাতের প্রকৃতি থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে—এসবই কামাবেগের অচরিতার্থতা, স্ফূর্তির বাধা বা ব্যর্থতা থেকে সৃষ্টি। নিতান্ত অপোগণ্ড বয়স থেকে এই ট্রোমা বা অভিঘাত মনকে বিক্ষত করে আসছে। সুতরাং অপোগণ্ড বয়সেও মনের ভেতর কামাবেগ যে থাকে না, তা কি করে বলা যায়? ডাক্তার ফ্রয়েড শিশুদের আচরণ পরীক্ষা করেও তাদের মধ্যে কামাবেগের স্পষ্ট নিদর্শন পেলেন। তাছাড়া বয়স্ক মানুষের অচেতন মনের খবর নিতে গিয়ে তাদের শিশুজীবনের কামাবেগের ভালমন্দ অভিজ্ঞতার নানারকম ছাপ দেখতে পেলেন। তিনি এই অপোগণ্ড বয়সের কামাবেগের নাম দিলেন শৈশব কামিতা (Infantile Sexuality)। ফ্রয়েড বললেন, শিশুর কামকলা অস্বাভাবিক নয়, এটাই মানুষের কামবৃত্তির স্বাভাবিক রূপ।

'যৌন' কথাটা এতক্ষণ ব্যবহার করা হয়নি। ফ্রয়েড যে-ব্যাপারকে কামিতা বা কামবৃত্তি বলে অভিহিত করেছেন সেটা নিছক যৌনতা নয়। কাম চরিতার্থতার জন্য যৌন-মিলন অপরিহার্য প্রয়োজন নয়। এই কারণে, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ঠিক রাখবার জন্য তিনি লিবিডো নামে কথাটি তৈরী করে নিয়েছেন। কাম প্রেরণায় পরিপূর্ণ এই কায়মনের আচরণ বা লিবিডো-শরীর যেন আনন্দাদ্ধেব বা শুধু আনন্দের তাগিদেই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

সুস্থ ও স্বাভাবিক কামচর্যা যদি ক্ষুণ্ণ না হয় তবে চরিত্রে কখনো বাতিক বা অন্যবিধ কোন স্নায়বিক বিকার দেখা দিতে পারে না। এই উক্তি ডাক্তার ফ্রয়েড সিদ্ধান্তের মত পরীক্ষিত সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, একেবারে পরিপূর্ণ সুস্থস্নায়ু অবাতিক ও অক্ষুণ্ণস্বভাব লোক কে? ফ্রয়েড বলেন—সেরকম ষোলআনা সুস্থস্বভাব বাস্তবে দেখা যায় না। সুতরাং তাঁর বক্তব্য আর একটি সিদ্ধান্তকে সামনে টেনে আনে, অর্থাৎ—একেবারে সুস্থকাম

কোন মানুষ নেই ; অল্পবিস্তর প্রত্যেকের কামবৃত্তি পীড়িত ব্যাহত ও বিকৃত। প্রত্যেকেই বাতিক—পাগল প্রেমিক কবি সকলেই ; কেউ বেশী কেউ অল্প—এই যা তফাৎ।

পূর্ব অধ্যায়ে মানুষের মনের আধারে নিহিত ইদ নামে যে 'প্রথমজা-বেদনা' বা আদ্য ইচ্ছাবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অধিষ্ঠান হলো অচেতন মনে। লিবিডো বা রতি নামে যে কাম-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেছে তার লীলাশ্রয় উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে—ইদে এবং ইগোতে—চেতনতায় ও অচেতনতায়। কাজের বেলায় লিবিডোর আসল নীড় কিন্তু ইগোতে। শিশুর মধ্যে এই ইগো-লিবিডো সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট। শিশুর মনের সকল লিবিডো একান্তভাবে তার ইগো বা অহংএ আশ্রিত। শিশু একটি সম্পূর্ণ আত্মম্ভর ও অহংকারী জীবের নমুনা। এই বয়সে তার অন্ধ ইদপ্রেরিত আচরণ আর অহমিত আচরণে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ ইদ ও ইগো একাত্ম হয়ে আছে—তার আচরণ লিবিডোসর্বস্ব। এর পর, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিশু নিজেকে ভালবাসতে আরম্ভ করে—আত্মপ্রীতির অঙ্কুর দেখা দেয়। এই অবস্থা শেষ হয়ে, বয়ঃক্রম আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর শিশুর মনে বহির্বিষয়ের দিকে একটা অনুরাগের ভাব দেখা দেয়।

দেখা গেল, প্রবৃত্তি হিসাবে লিবিডো মানুষের ইগোকে পরিবর্তনের তিনটি ধাপ পার করে নিয়ে যায়—(১) অহমিত লিবিডো (Ego-Libido), (২) আত্মপ্রীত লিবিডো (Narcistic Libido) এবং (৩) বহির্বিষয়পরায়ণ লিবিডো (Object Libido)।

পরিণত জীবনে অথবা বয়োপ্রাপ্ত জীবনে যত কিছু অস্মার অপস্মার হিস্টিরিয়া বাতিক ও মানসিক-ব্যাধির কমবেশী প্রভাব ও নিদর্শন চরিত্রে আরোপিত হয়, তার আরম্ভ হয় লিবিডোর দোটানা কার্যক্রম থেকে। লিবিডো বাইরের কোন জাগতিক বিষয়কে নিজের সার্থকতার জন্য আস্পদ হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হতে পারে এবং হয়ে থাকে ; আবার কোন কারণে (ব্যর্থতা বা অভিরুচির তাগিদে) ফিরে ইগোমুখী হতে পারে ও হয়ে থাকে। এই টানা-পোড়েনের উৎপাতে মানুষের মানসিক চরিত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

প্রত্যেকের জীবনে অভিজ্ঞতার ঘাত প্রতিঘাত, সাড়া ও স্ফূর্তি, বেদনা ও ব্যঞ্জনা, সাধ ও সার্থকতার রূপ বিভিন্ন। কিন্তু সামাজিকভাবে দেখতে গেলে, অর্থাৎ একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের জীবনে ঘটনার সাম্য থাকাতে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও মোটামুটি সাম্য দেখা যায়। বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর প্রতিক্রিয়ার ফলে মনের মানুষ জটিল হয়ে পড়ে। নানা বাঁকাচোরা পথে লিবিডো আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে। অনেকটা জলস্রোতের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। অস্থিতি অনাশ্রয় ও গতির বাধা তার সহজ সারল্যকে কুটিল পথে পরিচালিত করে। এই ভাবে ব্যাহত লিবিডো মানুষের চরিত্রে দু'রকমের ক্ষতি সৃষ্টি করে—(১) মানসকূট (Complex) অথবা (২) অপচার (Perversion)।

মানসকূট একটি ভাবনাবিকার মাত্র এবং অপচার হলো আচরণের বিকার। আচরণের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতা লাভের অভাবেই লিবিডো মানসকূট সৃষ্টি করে। অন্য দিকে, লিবিডো অপচার বা কদাচারের (যেটা অসামাজিক) ভেতর চরিতার্থতা লাভ করে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অপচার যেখানে থাকে, মানসকূটের অস্তিত্ব সেখানে নেই। লিবিডো যেন নিজের ভীরুতায় অপচারের আশ্রয় নিতে পারে না বলেই, নিতান্ত অভিমানের বশে মনমরা হয়ে থাকে—মানসকূটের সৃষ্টি করে।

কতরকম মানসকূটই আছে, তার কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা নেই। মোটামুটি যেসব মানসকূট সচরাচর দেখা যায়, তার মধ্যে বহুশ্রুত কতগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) Sadism (সাদীয় রুচি বা নিগ্রহামোদ)—আত্মসুখের জন্য বা লিবিডোর তৃপ্তির জন্য অপরকে নিগ্রহ করার বাসনা।

এই মানসকূটের প্রকোপে পড়েই লোকে তার ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীকে কষ্ট দিতে

কসুর করে না। ট্রেনে কাটা মানুষের বীভৎস ছিন্নভিন্ন লাস দেখবার কৌতূহল চাপতে পারে না, একই সঙ্গে দৃশ্য দেখার আনন্দ ও সদয় খেদোক্তি শোনা যায়। পড়াবার সময় অনেক বাপ-মা ছেলেপিলেদের যেরকম নিষ্ঠুর ভাবে মারধর করেন—মানসিক সুস্থতা থাকলে তাঁরা কখনই তা করতে পারতেন না। রামায়ণের সীতাকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ঠেলে দেবার জন্য রামের মনে যেন সবসময়ই একটা ভালমানুষী চক্রান্ত ছিল।

(২) Masochism (আত্মনিগ্রহের রুচি)—এটা সাদীয় মনোভাবের বিপরীত ব্যাপার। নিজেকেই দুঃখে কষ্টে জর্জরিত করে তৃপ্তি পাওয়ার জন্য এক ধরনের অভিমান অনেকের মধ্যে দেখা যায়। ধর্ম কর্মের মধ্যে এই রুচি বহুভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—ব্রহ্মচর্য, কৃচ্ছ্রতপস্যা, উপবাস ; এইসব আত্মনিগ্রহের ব্যাপার—উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। সাধারণ আচরণের মধ্যেও অনেককে যেন 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়'। নিজেকে একটা পীড়নের মধ্যে নিয়ে না ফেললে তাদের যেন মতি সুস্থির হয় না। প্রণয়কলার মধ্যেও এই রুচি খুবই প্রকট। শরৎচন্দ্রের দেবদাস একটি মাসখীয় রুচির দৃষ্টান্ত। এই মিনমিনে প্রেমিক কোনদিনও তার প্রণয়িনীকে নিজের কাছে আনবার কোন চেষ্টা করলো না ; হাহুতাশ করে, নিজের ব্যক্তিত্বকে ছিন্নভিন্ন করে, লোকটা যেন নিজেকে নিঃশেষ করে দিল।

(৩) Narscism (আত্মাসক্তি)—নিজের প্রতি অনুরাগ। নিজেকে ভালবেসেই তৃপ্তি। নবোদ্ভিন্ন যৌবনে মেয়েদের মধ্যে (পুরুষের মধ্যেও) মনে মনে এক আত্মবিহার চলে।

"নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি
হাসত আপন পয়োধর হেরি"।

নায়িকা এইরকম নিজতনুরভসে মজে থাকে। নিজেই নিজের প্রেমের আস্পদ স্বরূপ হয়।

(৪) Exhibitionism (আত্মবিজ্ঞাপনের রুচি)—নিজেকে অপরের কাছে আকর্ষণের বিষয় করে তোলার জন্য যে রুচি। রসশাস্ত্রে উদ্দীপনবিভাব নামে এই ধরনের একটা রুচির উল্লেখ আছে। প্রসাধন কলার উৎপত্তি শুধু নার্সিসীয় (আত্মাসক্তি) মনোভাব থেকে নয় ; আত্মবিজ্ঞাপনের রুচিই এখানে প্রবল। পুরুষের শিভালরি (Chivalry) এই রুচির একটি দৃষ্টান্ত। কবিকেও বলতে হয়েছে :

"লোচনে হরিণগর্বমোচনে মা বিদূষয়ঃ নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়ক সপদি জীবহারকঃ কিং পুনহি গরলেন লেপিতঃ?"

মানসকূটের নাম করতে গেলে, অনেক করা যায়। ছাইভস্ম একটা বাজে জিনিসের (ইট পাথর) ওপর পর্যন্ত রতি দেখা যায় (Fetishism), যাকে আপাতঃবিচারে আমরা অকারণে মোহ বলে থাকি। এছাড়া দুটি বিশেষ মানসকূটের কথা ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন—ইদিপাস ও ইলেক্‌ট্রা (Aedepus ও Electra), গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে যাকে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের দুটি বড় স্তম্ভ বলা যায়। গ্রীক উপাখ্যান থেকে এই নাম দুটি সংগ্রহ করা হয়েছে। (১) ইদিপাস—মাতা ও পুত্রের মধ্যে একটি আসক্তিজনিত আবেগ (২) ইলেকট্রা—পিতা ও কন্যার মধ্যে আসক্তিজনিত আবেগ।

ডাক্তার ফ্রয়েডের এই দুটি মানসকূটের বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সমাজে বহু মতান্তর ও প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রেম, অনুরাগ, আসক্তি, রতি বা লিবিডো, যে নামেই বলা হোক না কেন—এই সব কামজ ভাবনার মধ্যে ফ্রয়েড কতগুলি নিয়মের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এই নিয়মগুলিই লিবিডোর পরিণামের বিধায়ক।

(ক) Inhibition বা নিরোধ। বাস্তবের কাছে ঘা খেয়ে লিবিডো এক এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে যায়। এই পয়েন্ট থেকে তাকে আর অধিকদূর অগ্রসর হতে দেওয়া হয় না। অহম্বোধ বা ইগোর শাসন এই কীর্তি করে।

(খ) Repression বা দমন। এর পর সেই লিবিডো বা রতিজ আবেগ প্রবাহকে যেন উল্টো দিকে অনেকদূর হঠিয়ে দেওয়া হয়—হয়তো অচেতন মনের কোঠা পর্যন্ত।

(গ) Fixation বা মোহবন্ধ। লিবিডো ঘা খেয়েও ঘুরে ফিরে বারবার একটি বিশেষ আস্পদের দিকে আসতে থাকে, যাকে মনের দুর্বলতা অথবা বেহায়াভাব বলতে পারা যায়। মায়ের কাছে চড়চাপড় খেয়ে শিশু যেমন কোল ছাড়তে চায় না।

(ঘ) Ambivalence বা উভবল যা দ্বন্দ্বোপেত গুণ। ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের এও এক বড় আবিষ্কার। আসক্তির মধ্যে দুই পরস্পর বিপরীত আবেগের কাজ দেখা যায়। এর মধ্যে ভালবাসা যেমন থাকে, ঘৃণা তেমনি থাকে। যাকে পাবার জন্য মনে আকুলতার সীমা নেই, তাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যও যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপতা রয়েছে।

(ঙ) Sublimation বা সুরুচিপ্রকরণ। লিবিডোর অসামাজিকতা বা কুরুচিপরায়ণতাকে মোড় ফিরিয়ে সদাচারে প্রণোদিত করা। আত্মাসক্তিপ্রবণ (Narcistic) লোক ভবিষ্যতে নিজের শরীরকে সামাজিক ভাবে ভালবাসতে গিয়ে হয়তো ব্যায়ামচর্চায় সুন্দর করে তোলে। আত্মবিজ্ঞাপনের লোভ (Exhibitionism) যার আছে, সে হয়তো সার্কাসে ঢুকে কসরৎ দেখাতে আরম্ভ করে।

মানসকূটগুলি যেমন সুষ্ঠুতর হয়ে সামাজিক মনোভাব গ্রহণ করতে পারে, তেমনি আসক্তির কদাচারগুলি (Perversion) সুষ্ঠু সামাজিক আচরণ লাভ করতে পারে। সামাজিকতায় উন্নীত এই রুচি ও আচরণ প্রকৃতিগুণে একই ; এর বহিঃপ্রকাশের রূপ ভিন্নতর হয়, এই মাত্র।

বাতিক ও সাইকো-এনালিসিস

বাতিকের গোপন কথাটা—মনের গহনে দ্বৈরথ যুদ্ধ -প্রবৃত্তি বনাম ব্যাক্তিত্ব—সব গণ্ডগোলের মূলে আছে কাম —বাতিক যেন অপমানিত কামাবেগের প্রতিশোধ—বাতিকের উপসর্গ—সাইকো-এনালিসিস।

বাতিক যেন মনের বিষ আর সাইকো-এনালিসিস হলো ওঝা ফ্রয়েডের মন্ত্রচিকিৎসা।

পূর্ব অধ্যায়ে 'বাতিক' নামে মানসিক অসুখের কিছুটা পরিচয় ও ব্যুৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে। 'বাতিক' কথাটা একটা সাধারণ নামকরণ মাত্র ; এর অর্থের পরিধির ভেতর বহু বিভিন্ন উপসর্গের শ্রেণীবিভাগ আছে। সেই সব উপসর্গের বাহ্যিক প্রকাশ রূপে ও রীতিতেই যতই পৃথক হোক না কেন, তাদের উৎপত্তির ইতিহাস এক মূলসূত্রে গ্রথিত আছে। এক কথায় বলতে পারা যায় : বাতিকের উদ্ভব দ্বন্দ্ব (conflict) থেকে।

কিসের দ্বন্দ্ব?

উত্তর নানা ভাবে দেওয়া যায়। (ক) ইগো বনাম ইদ, ইগো বনাম বাস্তব জগৎ, ইগো বনাম পরা-ইগো—মনের ভেতর এদের যেকোন দু'জনের দ্বৈরথ যুদ্ধে বাতিক অবস্থা অবশ্য সৃষ্টি করে। (খ) অথবা মনের যেকোন দু'টি ক্রিয়াশক্তির (Psychic forces) পারস্পরিক বিরোধে বাতিক অবস্থা তৈরী করতে পারে। কিম্বা ; মোটামুটি ভাবে বলা যায় (গ) অচেতন ও চেতন মনের দ্বন্দ্ব। যেভাবেই বলা যাক, বাতিক রহস্যের মূল সত্যটা অবিকল থাকে—দমিত ইচ্ছাবৃত্তির আত্মস্ফূর্তির আবেগ।

এর সঙ্গে ডাক্তার ফ্রয়েডের আর একটা মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত স্মরণে রাখা উচিত। যাকে দমিত ইচ্ছাবৃত্তি বলা হচ্ছে, সেটা নিশ্চয় কামজীবনের কোন অভিজ্ঞতা থেকে প্রসূত। এই অভিজ্ঞতা আসলে বাধাজনিত অভিমান। আদি কামাবেগের অতৃপ্তি নিরোধ ও ব্যর্থতা থেকে

অন্তশ্চেতনায় যে জটিল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, সেটাই চেতন মনের আবহাওয়াকে বাতিকের ঝড়ে অশান্ত করে তোলে।

একটি যুবকের মনে সর্বদা অপরিসরতার আতঙ্ক (Claustro-phobia) ছিল ; সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত বা বদ্ধ ঘরের ভেতর ঢুকলেই তার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হতো। রেলপথে ট্রেনে যাবার সময় কোন টানেল বা সুড়ঙ্গ পড়লেই এক কষ্টকর মানসিক উৎপাতে তার শান্তি নষ্ট হতো। ঘটনাক্রমে এই যুবকরেই যুদ্ধে ডাক্তারের কাজ নিতে হলো। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি ভূগর্ভের ভেতর এক কুঠরীতে তাকে থাকতে হতো। এই সঙ্কীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে তার দিন কেটে যেত, কিন্তু চারদিক থেকে একটা বিভীষিকা যেন তাকে চেপে রাখতো সর্বদা। স্বপ্নে দেখতো—তার মৃত্যু অবধারিত, সেই ঘোর পরিণামের মুহূর্ত ক্রমেই এগিয়ে আসছে। তারপর, স্বপ্নের মধ্যেই তার বাল্যজীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল, তার বয়স যখন চার বছর। ছেলেবেলায় এক বুড়োর বাড়িতে সে প্রায়ই যেত ; ঘরের যত ফেলে-দেওয়া বাজে জিনিস সেই বুড়োকে দিলে তার বদলে এক আধটা পেনি লাভ হতো। একদিন বুড়োর বাড়িতে যাবার সময় সরু অন্ধকারময় পথের ওপর একটা কুকুরকে বসে থাকতে দেখে সে ভয়ে চমকে ওঠে। এই ঘটনা স্বপ্নে কয়েকবার মনে পড়তেই যুবক ডাক্তারটি বুঝতে পারে যে তার এই স্থান-অপরিসরতার আতঙ্ক মূলত বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত ভীতি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই তথ্য উপলব্ধির পর ভদ্রলোকের আতঙ্ক নিরাময় হয়ে যায়।

তার আগে ভদ্রলোকের মনের অবস্থার রকমটা কি ছিল? ভদ্রলোক নিজেও জানতেন না, কেন তার মনে এই আতঙ্ক আসে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কোন কারণ বলতে পারতেন না ; অথচ আতঙ্কটা সত্য। একেই বলে বাতিক অবস্থা।

তাই এক কথায় বাতিক বলে সেরে দিলে হয় না। বাতিকের পেছনেও একটা কারণ আছে। ডাক্তার ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের গবেষণার আরম্ভ বাতিকতত্ত্ব নিয়েই। কোন আবেগকে দমিয়ে দিলেই সেটা সত্যি দমে যায় না। সেটা লুকিয়ে পড়ে মাত্র—অচেতন মনের গভীরে। অনেকটা জ্যান্ত পুঁতে ফেলবার মত ব্যাপার। তবে পুঁতে ফেলাটাই একমাত্র সত্য ; প্রোথিত বিষয়ের মৃত্যু হয় না। ঘটনা, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা ও স্মৃতি এক একটা বিশিষ্ট আবেগের পাত্রে সুরক্ষিত হয়ে যেন অচেতন মনের ভাঁড়ারে শিকেয় তোলা থাকে।

মনস্তত্ত্বে, বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায়, একটি কথার উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়—Resistance বা প্রতিরোধ। কিসের প্রতিরোধ? কে প্রতিরোধ করে? কেন করে?

সাইকো-এনালিসিস বা মনঃসমীক্ষণের মোটামুটি প্রক্রিয়া হলো—অচেতনতা থেকে এই দমিত আবেগকে মুক্ত করে দেওয়া অর্থাৎ তাকে জ্ঞানের গোচরে আনা। বাতিক রোগীকে জানতে হবে-কি কারণে তার এই বিভ্রান্তি। এই জানাটাই ওষুধের কাজ করে। সাইকো-এনালিসিস করতে গিয়ে চিকিৎসকেরা দেখেছেন যে রোগীর মনে একটা স্বভাবজ আপত্তির প্রভাব আছে, যা তার মনের কপাটে খিল এঁটে রাখতে চায়—সব কথা অকপটে প্রকাশ করতে তার দ্বিধা থাকে। চিকিৎসককে রোগীর এই প্রতিরোধবৃত্তির বেড়াকে কৌশলে অতিক্রম করে মনের আঙিনায় ঢুকতে হয়। ইগো বা অহং-এর একটা সদা-সতর্ক নৈতিক বা সামাজিক রুচির পাহারা ও শাসনের জন্যই এই প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়।

বাতিক থেকে অনেক রকম চারিত্রিক উপসর্গ দেখা দেয়। কারও মধ্যে একাধিক উপসর্গ থাকে—কারও বেশী, কারও কম। মানসকূট (Complex), আতঙ্ক (Phobia), প্রমত্ততা (Mania), মুদ্রাদোষ, অদ্ভুতদর্শন (Hallucination), খোয়াব (Phantasy), ছলদৃশ্য (Delusion), উদ্বেগ (Anxiety) ও বিমর্ষা (Melancholia) থেকে শুরু করে পাগলামি পর্যন্ত সবই বাতিকের এক একটা স্তরভেদ ও রূপভেদ মাত্র। এই সম্পর্কে আর একবার

স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে, ট্রোমা (Trauma) বা ব্যর্থ ইচ্ছাবেগের অভিঘাত থেকেও বাতিকের বীজ তৈরী হয় ; কারণ এই অভিঘাতও আবেগকে দমিয়ে দেবার ব্যাপার।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী আধুনিক সমাজব্যবস্থাকেও বাতিক আখ্যা দিয়ে থাকেন। আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকেও বাতিক ব্যাপার বলা হয়। কেন? এই সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি ও গঠন এমন এক অবস্থায় রয়েছে, যার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা নেই। সমাজের কর্মকাণ্ডকে অনেকটা দৈবাধীন বা কার্য-কারণের সঙ্গতিচ্যুত ব্যাপার বলে মনে হয়। এমন লোক আছে যিনি জানেন যে দশ টাকার কমে বাজারে কোন শাড়ি পাওয়া যায় না, তবুও স্ত্রীর ছিন্নসজ্জা দেখে পকেটে পাঁচটি টাকা নিয়ে দোকান থেকে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—যদি পাওয়া যায়। এই বিমূঢ়তাকেই মনের বাতিক অবস্থা বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, ভদ্রলোক যেন ক্ষণিকের জন্য নিজের ওপর সব সংযম হারিয়েছেন। যাকে বাস্তবে অসম্ভব ও অপ্রাপ্তব্য বলে জানছেন, তারই আশায় অস্থির হয়ে ঘুরছেন।

এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় সাইকো-এনালিসিস পদ্ধতির সামান্য একটু পরিচয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। চিকিৎসক রোগীর মনে অবাধ-অনুষঙ্গ (Free Association) প্রথার ভাবনার মুক্তি আবাহন করেন। রোগীকে অকপট ভাবে এবং অকুণ্ঠার সঙ্গে মনের কথা খুলে বলতে হয়। চিকিৎসক আবার কতগুলি কথা বেছে রাখেন (Stimulus word) ; এবং এই এক একটি কথা উচ্চারণ করে রোগীকে প্রত্যুত্তর দিতে বলেন। প্রত্যুত্তরে যা মনে আসে তাই বলে যেতে হবে, ভেবেচিন্তে বললে চলবে না। কিন্তু চিকিৎসক দেখেন যে রোগীর বক্তব্য সত্যিই দ্বিধাহীন স্রোতের মত স্বতঃপ্রবাহিত হয়ে চলে না। সে মাঝেমাঝে থেমে যায়, কথার গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়—কোথাও এসে যেন গোলমালে পড়ে যায়। এই সব লক্ষণ-পরম্পরা থেকে ও প্রত্যুত্তরের কথাগুলির নিহিতার্থ থেকে চিকিৎসকের কাছে ক্রমে ক্রমে রোগীর অচেতন মনের সুগোপন কাহিনীটির রূপ স্পষ্টতর হয়ে আসে। রোগীর মানসিক প্রতিরোধ (Resistance) ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসতে থাকে বিস্মৃতির যবনিকা দুলে ওঠে—হিয়ার-মাঝারে লুকিয়ে-রাখা সেই গোপনকে প্রকাশ করে ফেলে।

অবশ্য চিকিৎসার প্রারম্ভে রোগীর একটা এহাজার নেওয়া হয়—তার ব্যক্তিগত জীবনের বিবরণ।

সাদা কথায় সাইকো-এনালিসিসকে কথা-চিকিৎসা (Talking treatment) বলা হয়। খৃষ্টীয় ধর্মগুরুরা যজমানদের দিয়ে যেভাবে প্রায়শ্চিত করাতেন—তার স্বরূপ অনেকটা সাইকো-এনালিসিসের মত। যজমান অকপটে তার পুরোহিতের কাছে পাপ স্বীকার (Confession) করে যেত ; ফলে নাকি প্রভুর কৃপা ও মুক্তির প্রসাদ লাভ হতো। আধুনিক মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এই প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সার্থকতা ছিল বলেই প্রমাণিত হচ্ছে।

ভুল করি কেন?

সবাই ভুল করে—বাকভ্রান্তি—পরিচিত নাম ভুলে যাওয়া—লিখতে ভুল—ভুলের ভেতর দিয়ে অজ্ঞাত ও দমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ—প্রীতিকর স্মৃতির প্রকাশ লাভের চেষ্টা—অপ্রীতিকর স্মৃতিকে চাপা দেবার চেষ্টা—ভুল কখনই অনিচ্ছাকৃত হতে পারে না—ভ্রমাত্মক আচরণ বাতিকের মত ব্যাপার।

ভুল সবারি হয়। মুনিদের মতিভ্রম হয়, সীজারও ভুল করে. আদিদেব ভোলা মহেশ্বরও ভুল করেন—তখন অন্যে পরে কা কথা।

মানুষই কিন্তু একমাত্র জীব যে মননশক্তিতে বৈচিত্র্যবান আর যত ভুল হয় তারই। পশু-পক্ষীর এ বালাই নেই। যে মননশীল তারই পক্ষে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বুঝতে হবে ভুলভ্রান্তি মনঘটিত আধি বিশেষ।

মনঘটিত আধি—শুধু এই ধরনের একটা নাতিবিশদ প্রবচনের ভেতর ভ্রান্তির যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। ভ্রান্তিরহস্যের অর্থভেদ করতে ডাঃ ফ্রয়েডের মত প্রতিভাকেও বহু বৎসর গবেষণা-তৎপর হয়ে থাকতে হয়েছে। জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, আচরণগত এই অতিসাধারণ ভুল-ভ্রান্তিগুলিই হ'ল অপস্মার, বাতিক ও উন্মাদ প্রভৃতি বি-মানসিকতার পূর্বগঠন (Prototype)। গুণধর্মে উভয়ই একজাতীয়, পার্থক্য যেটুকু তা শুধু পরিমাণের তারতম্যে।

সচরাচর ঘটিত ভ্রান্তির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হ'ল বাকভ্রান্তি ; বক্তব্য ভাষার ওপর বিভ্রমের প্রকোপ যেন একটু বেশী। ভাষাস্খলন (Lapsus Linguoe) হ'ল বাকভ্রান্তির অন্যতম লক্ষণ, চলতি ভাষায় যাকে বলে--বেফাঁস বেরিয়ে পড়া কথা। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোন অফিসের এক ছোকরা কেরানী হিসাব লেখায় একটা মারাত্মক রকম ভুল করাতে বড়বাবু ব্যাপারটি উপরওয়ালার গোচরে আনতে উদ্যত হন-যেটা তিনি না করলেও পারতেন। বড়বাবুর হৃদয়হীনতায় দুঃখিত কেরানী অবশেষে চাটুবাক্যে তাঁর সঙ্কল্প টলাতে মনস্থ করলো। অনেক অনুনয় বিনয় করে কেরানী বললো,—'দেখুন বড়বাবু, এ যাত্রা আমায় মাপ করে দিন ; আমিও এর জন্য বাগে পেলে আপনার উপকার করতে ছাড়ব না।' এই কথা শোনার পর বড়বাবু আর কালবিলম্ব না করে অভিযোগপত্রটি উপরওয়ালার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কেরানীর চাকরী গেল।

বড়বাবুর এই কঠোরতায় তাঁকে নিন্দা করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাঁর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সুখ্যাতি না করে পারা যায় না। কারণ 'বাগে পেলে' উপকার করবে—কলিযুগে এমন প্রহ্লাদ বিরল। সে হয়তো বলতে চেয়েছিল 'সুযোগ পেলে' বা 'দরকার হলে', তবু এই অনভিপ্রেত 'বাগে পেলে' এসে সব আয়োজন ব্যর্থ করে দিল। বড়বাবুর বক্তব্য এই যে, ছোকরা আসলে তাঁর ওপর বৈরভাব পোষণ করে ; ইচ্ছাটা এই যে ভবিষ্যতে একবার বাগে পেলে সমুচিত প্রতিশোধ তুলবে।

মানুষের আচরণকে রূপদান করে এক একটি উদ্দেশ্যের প্রেরণা বা ইচ্ছা। ব্যবহারযন্ত্র যেন মানুষের সঙ্কল্প ও কৃতিত্বকে এক সেতুবন্ধে যুক্ত করে রেখেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখি যে ব্যবহারিক জীবনে এতটা ঋজুতা নেই বরং এর অর্থ যেন একটা অসঙ্গতির জটিলতায় অস্পষ্ট। যে সঙ্কল্পকে কোনকালে মনে ঠাঁই দিইনি সেটাই ব্যবহারের ভিতর মূর্ত হয়ে উঠলো। আবার, যে ইচ্ছাস্ফূর্তি প্রায় আসন্ন, কোন অভাবিত কুণ্ঠায় সেটা যেন প্রতিহত রয়ে গেল। একেই বলা হয় ভ্রান্তি—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অলীক হবে না যে, উক্ত কেরানী বড়বাবুর ওপর প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করতো যার প্রমাণ ঐ প্রক্ষিপ্ত 'বাগে পেলে' শব্দ দুটি। প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার অভিব্যক্তি স্থূলভাবে ভ্রান্তির এই সংজ্ঞানির্দেশ করা যেতে পারে। আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভ্রান্তির অর্থ আছে; নিয়ম, নিমিত্ত কারণও আছে।

এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন—Meyer ও Meringer প্রভৃতি—যাঁরা ভ্রান্তির ভেতর এতটা অর্থ নিগূঢ়তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এঁরা সোজাসুজি ধ্বনিতত্ত্বের বীক্ষণে বিচার করে বিষয়টির সমাধান করতে প্রস্তুত। এঁদের যুক্তিগুলি বিচারের যোগ্য। ধরুন, কোন সাহিত্যরসিক ভদ্রলোক আবৃত্তি করলেন—কোনকালে ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা বয়কী। 'বয়সী' ভ্রমদুষ্ট হয়ে 'বয়কী' রূপগ্রহণ করেছে। যুক্তি এই যে, অনুপ্রাসিত পদটির 'ক'প্রবণ

শব্দগুলির ধ্বনিসাম্যের দাপটে 'বয়সী'র 'স'কে সরে গিয়ে 'ক'কে স্থান দিতে হয়েছে। এক ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিত মন্ত্রোচ্চারণ কালে বরাবর একটা ভুল শব্দ ব্যবহার করেন—'বিষ্ণায়'। 'বিষ্ণু' শব্দের চতুর্থীরূপ যে 'বিষ্ণবে' এ জ্ঞান পণ্ডিত মশায়ের অনধিগত নয় ; কিন্তু তবুও আবৃত্তিকালে দাঁড়াতো 'বিষ্ণায়'। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মধ্যে ধ্বনিসাম্যেই সম্ভবতঃ এই ভুলের কারণ ; বিষ্ণায় হ'ল 'কৃষ্ণায়'-এর ধ্বনিগত অনুকরণ।—এই মোটামুটি এই শ্রেণীর প্রতিবাদীর যুক্তি।

ধ্বনি ও শব্দসাম্যের উপর নির্ভর করে ভাষার যে ভাঙা-গড়া ঘটলো তার ভিতর ভ্রান্তির একটা প্রকাশের ধারা মাত্র লক্ষ্য করা গেল, কিন্তু মূল কারণটি এখনো রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। বাকভ্রান্তির এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—যেখানে ধ্বনি ও শব্দগত সাম্যের চেয়ে বৈষমটাই অধিকতর প্রকট। যেমন পাটব্যবসায়ী জনৈক ভদ্রলোক সত্যই জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—'ইলিশ মাছের গাঁইট কত করে?' তাঁর জিজ্ঞাসা অবশ্য ইলিশ মাছের 'সের বা মণের' দর। এই সের বা মণ ও গাঁইট—এই শব্দগুলির ধ্বনিগত সাম্য কতটুকু? এক রেলওয়ে কর্মচারী বিশ্বনাথের মন্দিরে বেজায় 'প্যাসেঞ্জারের' ভীড় দেখেছিলেন। ইপ্সিত 'যাত্রী' কথাটির সঙ্গে 'প্যাসেঞ্জার' কথাটির বর্ণ, শব্দ ও ধ্বনিগত কোন সাম্যের নিদর্শনই নেই। স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে যে, মন বা মনোগত অভিলাষই সকল বাকভ্রান্তির গোড়ায় কাজ করছে।

দ্বিতীয় এরা নিতান্ত প্রাকৃত শ্রেণীর প্রতিবাদী, যাঁদের কাছে ভুল-ভ্রান্তিগুলি নিছক দৈবতাড়িত অপঘটনা মাত্র। সামান্য একটা বাকভ্রান্তির বড় বড় তাত্ত্বিক ভনিতাকে তাঁরা মুখ চিবে বিশ্বরূপ দেখার মত উৎকট দার্শনিকতা মনে করেন। যদি একান্তই কোন যুক্তি দেখাতে চান, তবে বলবেন—দেহমনের ক্লান্তি, অবসাদ বা অসুস্থতা ; এরাই ভ্রমের জনক। এটা কোন যুক্তিই নয়, কারণ সুস্থ ও অসুস্থ প্রত্যেক নরনারীর আচরণে এই অনর্থসেবা পরিস্ফুট। এই প্রতিযুক্তিতেও নিরস্ত না হয়ে ডাঃ ভুন্টের (Dr. Wundt) মতানুসারী প্রতিবাদীরা বলেন যে, দেহমনের অসুস্থতা ভ্রান্তির সাক্ষাৎ কারণ না হোক পরোক্ষ কারণ বটে ; অর্থাৎ এই অসুস্থতাজনিত যে অন্যমনস্কতা—তাই ভ্রমের প্রকৃত জন্মহেতু।

অন্যমনস্কতা যে ভ্রান্তির মূল কারণ হতে পাবে না তার প্রমাণ কোন বীণবাদকের সুরবিভোর আবেশ যিনি লক্ষ্য করেছেন তিনি সহজে বুঝবেন। বাদকের আঙুল বরষার ধারার মত তন্ত্রীর ওপর আঘাত হেনে চলেছে, অথচ তার মন তখন একটিমাত্র সুরের ধ্যানে নিবিষ্ট। সে নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে প্রত্যেকটি আঙুল খেলাচ্ছে না। বাজনার যান্ত্রিক বিষয়টি সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন, তবুও সুর ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রত্যেকেই এক-আধবার নিজের এই সব্যসাচীরূপ দেখেছেন ; গভীর মনোযোগের সঙ্গে হয়তো গণিতের কোন জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত অথচ তারি সঙ্গে গুনগুন ক'রে একটা প্রচলিত গানের গুঞ্জন চলেছে। গণিতের সমস্যায় নিযুক্ত মন বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত গানের ভাষায় যোগান দিয়ে যায়—ভুল হয় না।

আবার মনস্কতা সত্ত্বেও যে ভুল হয়—এটা পরীক্ষিত সত্য। শিশুপাঠ্য এক গল্পে আছে—এক বালক তার মায়ের আদেশমত হাটে কতগুলো জিনিস কিনতে চলেছে। যথা, 'পাকা পাকা বেল, সরিষার তেল, ডিমভরা কই, চিনিপাতা দই।' নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর ছেলেটির বিশ্বাসের অভাব ছিল ; কাজেই সে পথে যেতে যেতে খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে উক্ত তালিকাটি মুখস্থ ও মনস্থ করে চললো। অবশেষে দোকানীকে গিয়ে বললো,—দাও, 'পাকা পাকা তেল সরিষার বেল, ডিমভরা দই চিনিপাতা কই'। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে বালকটির এতখানি কৃচ্ছ্র মনসংন্যাস আর সতর্কতা সত্ত্বেও ভ্রান্তি ঘটে গেল। য়ুরোপের কোন সংবাদপত্রে 'Crown Prince' কথাটি ভুলক্রমে ছাপা হয় 'Clown Prince'। পরদিন পত্রিকায় এই ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সংশোধন ক'রে আবার ছাপা হয় 'Clown Prince'। ভুলের এই জেদ বা পৌনঃপুনিকতার উদাহরণ অনেকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারবেন। অতএব ভুলের

কারণ হিসাবে অন্যমনস্কতার দাবী অগ্রাহ্য।

ডাঃ ফ্রয়েডের অভিমতে এই ভাব ভাষা বা শব্দ ধ্বনিগত সাদৃশ্য এবং মনের অবসাদ, দেহের অস্বাস্থ্য ও অন্যমনস্কতা—এরা ভ্রমের মূল কারণ নয়। এরা ভ্রমের সম্ভবনাকে সহজতর করে দেয় মাত্র। প্রচ্ছন্ন কোন ইচ্ছা এই রকম প্রতিবন্ধকহীন পথে আত্মপ্রকাশ ক'রে 'কর্তব্য-ইচ্ছা'কে আক্রমণ করে—ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। একটি অভীপ্সাকে কক্ষচ্যুত ক'রে অপর একটি অভীপ্সার অবির্ভাব। ভ্রান্তির মধ্যে এইরকম একটা সঙ্ঘর্ষের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাওয়া যায়, যার একদিকে রয়েছে প্রচ্ছন্ন 'গূঢ় ইচ্ছা' আর অপরদিকে রয়েছে আশু-সম্পাদ্য 'কর্তব্যইচ্ছা'। গূঢ় ইচ্ছাই আক্রমক আর কর্তব্যইচ্ছা আক্রান্ত।

আমাদের নিত্যকৃত্য আচরণগুলি আরো বহুবিধ জটিলতর ভ্রান্তির প্রকোপে বিকৃত হয়ে যায় অথচ তার কোন নিকট হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ গূঢ় ইচ্ছাটাও এখানে অজ্ঞাত—চেতনার নেপথ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। গবেষকের কাছে এইটিই বিশেষ বিচারণীয় তথ্য।

যত জটিলতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় স্মরণভ্রান্তির মধ্যে। মণীন্দ্রবাবু একজন সুপরিচিত প্রতিবেশী অথচ কথাপ্রসঙ্গে তার নামোল্লেখের প্রয়োজন হ'লেই স্মৃতি যেন বন্ধ্যা হয়ে যায়—কিছুতেই নামটি মনে আসে না। বিশ্লেষণে ধরা পড়বে যে, অচেতনাতার সুগভীর ক্ষত সুগুপ্ত হয়ে রয়েছে ; স্বভাবতঃ আনন্দপ্রবণ ইচ্ছাটি কোনমতেই সে ক্ষতে পুনরাঘাত করতে রাজী নয়। স্মরণ-ভ্রান্তি অর্থে তা হ'লে বোঝা গেল—অভিজ্ঞতা চাপা দেবার প্রয়াস। কিন্তু এটা হয় শুধু দুঃখকর অভিজ্ঞতার বেলায়। যদি কেউ মাইকেলের একটা কাব্যাংশ আবৃত্তি করতে গিয়ে বলেন,—

"ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ মণীন্দ্র যেমতি
ধরেন আদরে ধরারে।"

এখানে 'মণীন্দ্র' কথাটি ভুল, আসল কথাটি হ'ল ফণীন্দ্র। বিশ্লেষণ করলে যেখা যাবে যে, উক্ত প্রক্ষিপ্ত 'মণীন্দ্র' কথাটি কোন বহু পুরাতন সুখস্মৃতির ভগ্নাংশ—সমগ্র পরিচয়ের শুধু আবছায়াটুকু বহন করে এনেছে। এই বাকভ্রান্তির স্মৃতিঘটিত একটি ব্যাপার—যার ভেতর সেই পুরাতন সুখকর অভিজ্ঞতার অহংপূর্বিকা দেখা যাচ্ছে। স্মরণভ্রান্তির ভেতর দুই বিপরীত পরিদৃশ্য দেখা গেল—অভিজ্ঞতাকে চাপা দেওয়া এবং অভিজ্ঞতাকে জাগিয়ে তোলা, দুইই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে—"তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। রমা-সুখ, নন্দ-সম্পদ, শ্রী-বিপদ ; যার একদিকে সুখ আর একদিকে সম্পদ তার কি বিপদকে মনে পড়ে?"

জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলা বা অযথাস্থানে রেখে আসা—এইগুলি আর এক জাতের স্মরণভ্রান্তি। কত প্রীতি উপহার, সম্মানপদক বা সখের জিনিস, যাকে লালন করতে সাবধানতার অন্ত নেই, এমন জিনিসও মানুষ হারিয়ে ফেলে। এর কারণ কি? কবি বলে দিয়েছেন,—'তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ।' ডাঃ ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তেও এই কবিকল্পনার প্রতিধ্বনি পাই—এই হারিয়ে ফেলা ব্যাপার হলো—একটা আশঙ্কিত বৃহত্তর ক্ষতি এড়াবার জন্য স্বেচ্ছায় ছোটখাট স্বার্থোৎসর্গ। এই হলো সকল 'হারানো ও নিরুদ্দেশের' মর্মকথা, অনেকটা উপনিষদের 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'র মত শোনায়।

কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সদ্যবিবাহিতা বন্ধুকন্যাকে আশীর্যোক্তি করেছিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি বিধবা হও"। কথাটা সম্ভবত নেহাৎ অজ্ঞাতসারে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মেয়েটি বিধবা হোক এই ছিল তাঁর মনের প্রকৃত ইচ্ছা, যাতে তিনি মেয়েটিকে আবার বিয়ে দিতে পারেন, তাঁর বিধবা বিবাহ প্রচারের আদর্শ চরিতার্থ করবার সুযোগ পান।

লিখন ভ্রান্তির ভেতরও এই প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার কারসাজী দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা নিরালায় বসে আনমনে হিজিবিজি লিখে চলেছে ; হঠাৎ চমকে দেখে, লেখা রয়েছে 'জগৎসিংহ'—কখন লিখলো তা সে নিজেই জানে না। এই তিলোত্তমা-জগৎসিংহ মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা বাহুল্য ; সেটা সর্বজনবিদিত তথ্য। ডাঃ ফ্রয়েড লিখন ভ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক নরহন্তা নিজেকে জীবানুতত্ত্ববিৎরূপে পরিচিত করে সরকারী জীবানুশালার অধ্যক্ষকে পত্র লেখে—'আপনাদের প্রেরিত জীবানু নিয়ে আমি লোকের ওপর পরীক্ষা করে দেখতে চাই ইত্যাদি।' তার লেখবার ইচ্ছা ছিল 'জীবজন্তুর ওপর' কিন্তু প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার প্রকোপ ভুলের বশে 'লোকের ওপর' এই সত্য কথাটি বেফাঁস লেখা হয়ে গেল। এই লিখন ভ্রান্তির ওপর নির্ভর করে পুলিস অনুসন্ধান চালায় ও অবশেষে তাকে হত্যার প্রমাণসহ ধরে ফেলে।

লিখন ভ্রান্তির মত পঠন ভ্রান্তিও পাঠ্য বস্তুকে বিকৃত ও কটুশ্রাব্য করে তোলে। একটি কৌতূককর হিন্দী গল্প আছে যে, এক ভদ্রলোক পত্র পড়লেন, কেউ তাকে লিখেছে—'আপকা লড়কা আজমীর গিয়া'। তিনি পড়লেন—'আপকা লড়কা আজ মর গিয়া'। সঙ্গে সঙ্গে পুত্রশোকে বুকফাটা চীৎকারে পাড়া মাতিয়ে তুললেন। তার পুত্র মারা যাবে, এই ধরনের একটা দুর্ভাবনা সম্ভবত ভদ্রলোকের মন সব সময় অধিকার করে থাকতো যাকে পুত্রের মৃত্যু কামনারই রূপান্তর বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

শ্রুতি ও দৃষ্টিঘটিত ভ্রান্তি এই একই কারণে ও রীতিতে নিষ্পন্ন হয়—প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার কীর্তি। ভ্রান্তির এই দৃষ্টান্তগুলির এখন দুটো গুণবিভাগ করা যায়। প্রথম বিভাগে পড়ে সেই শ্রেণীর ভ্রান্তি যার ভেতর ভুলো মানুষ সহজেই তার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাটিকে চিনে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে উৎকট শ্রেণীর ভ্রান্তিগুলি। ভ্রান্তির ভেতর যে ইচ্ছাটা প্রকট হয়ে পড়লো তার মর্মার্থ ভ্রমকারী বুঝতে অসমর্থ বা তাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। ভ্রান্তিটি যে তারই ইচ্ছাজনিত বা ইচ্ছাকৃত এ যুক্তি তাদের কাছে আদৌ বিশ্বাস্য নয়।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভ্রান্তিগুলিই বিশেষ গবেষণার বিষয় ; আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক এই তথ্যের ভূমিকার ওপর তার সুবৃহৎ কীর্তিস্তম্ভ রচনা করেছে। যেমন, এক কবির জন্মবার্ষিকী দিনে আর এক কবি বক্তৃতাক্রমে বললেন—'কবির এই পঞ্চাশত্তম মৃজন্মবার্ষিকী দিনে.....ইত্যাদি'। দেখা যাচ্ছে যে, বক্তৃতার সহজ প্রবাহে বক্তার ভাষায় 'মৃত্যুবার্ষিকী' কথাটাই এগিয়ে এসেছিল যা বক্তব্য 'জন্মবার্ষিকী'র সঙ্গে আপোষ করে দাঁড়াল 'মৃত্যুবার্ষিকী' রূপে। যশঃক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী এক কবির প্রতি আর এক কবির মনে একটা বিরুদ্ধভাব—তার মৃত্যু কামনা—লুকিয়ে থাকা আশ্চর্য নয়। এই বাকভ্রান্তিটা সেই মনোভাবের অর্ধোস্ফুট উদ্গার মাত্র। উক্ত বক্তা কিন্তু তাঁর মনে এমন কোন মনোভাব বা ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি তুললেন।

দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের অন্তর্লোক জুড়ে শত শত বাসনার কণা ক্রীড়াচঞ্চল সফরীর মত নিয়ত ছুটে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলেই সজ্ঞানকে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করে, নিত্যকর্মকে নিয়ন্ত্রিত বা বিকৃত করে। সুতরাং ভ্রান্তি হলো কতকগুলি কর্তব্য-বিষম কর্ম যা অজ্ঞানকৃত বটে কিন্তু অনিচ্ছাকৃত নয়। এই ইচ্ছাটাই শুধু অজ্ঞাত। আমরা অনেক কিছু করি বলি বা শুনি যার সঙ্গে নিকটকর্তব্যের কোন যোগসূত্র নেই—কেন করলাম তাও বুঝে উঠতে পারি না।

ভুলে থাকা নয় সেতো ভোলা
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর
দিয়েছে যে দোলা।

কবির এই উক্তির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনলব্ধ সিদ্ধান্ত প্রায় অভিন্ন. এই মনই তো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল বাসনার একমাত্র নীড়। জীবনের অপোগণ্ড দশা থেকে শুরু করে

বর্তমানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অজস্র সাধ নিগ্রহের তাড়নায় অপসৃত হয়ে এক 'অজ্ঞাত মানসভ্রূণের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করছে। এই অজ্ঞাত ইচ্ছাই 'অন্তর মাঝে বসি অহরহ' মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নেয়, নিজের কাহিনী কহে।

ভ্রান্তির মূল কারণ আবিষ্কৃত হল, এর প্রকাশের বহুবিধ ক্রম ও নিয়মের আভাস পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন, ভ্রান্তির সার্থকতা কি? জীবনচর্যার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?

এই ভ্রান্তি, যত অকাজের কাজগুলি, বলতে গেলে শত শত আনন্দের আয়োজন (Flight from the unpleasant)। ভ্রান্তি পরোক্ষভাবে কামনাপূর্তির অনুষ্ঠান--জীবনস্মৃতির বেদনাক্লিন্ন পরিচ্ছেদগুলি বাদ দিয়ে চলবার একটা কুটিল প্রচেষ্টা। শুধু অভিব্যক্তির জটিলতা এর স্বরূপের ওপর অনর্থের মুখোস চাপিয়ে দিয়েছে।

ইচ্ছাবৃত্তির ধর্মই এই--বিরস হতে রসে, আনন্দবিরল হতে আনন্দঘনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। তাই সকল ভুলভ্রান্তির কাঁটা ধন্য করে কামনার ফুল প্রতিনিয়ত ফুটে ওঠার চেষ্টা করছে।

অবরুদ্ধ অজ্ঞাত ইচ্ছার প্রতিক্রিয়ায় শুধু ভ্রান্তি কেন, তার চেয়েও নিদারুণ অনাসৃষ্টি উদ্ভূত হয়ে মানুষের চারিত্রিক জীবন বিকল করে দেয়। বাতিক জাতীয় (Neurosis) যত সব মনোব্যাধি এই ভ্রান্তিরই সমগোত্র। এইখানে এসে মিলেছে ভ্রান্তি বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত ও মনোবিকলন তত্ত্বের জন্মসূচনা। অজ্ঞাত ইচ্ছাকে জ্ঞাত করানো--সংক্ষেপত এই হল মনোবিকলন তত্ত্বের কারুমিতি, যার ফলে রোগী তার স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

অনর্থের কণ্টকারণ্যে এমনিভাবে অগোচরে একটা এত অর্থপূর্ণ তত্ত্বের অঙ্কুর পড়েছিল যা ডাঃ ফ্রয়েডের প্রতিভার স্পর্শে উদ্ভিন্ন হলো বনস্পতিরূপে--মনোবিকলন তত্ত্বে--সহস্র সন্তপ্ত পথিকের ছায়াশ্রয়রূপে।

অকাজের কাজ

ভ্রমাত্মক কাজ--বিলক্ষণ বাজে--অপঘাত- জিনিস হারিয়ে ফেলা--মুদ্রাদোষ -অবশ্যমনন বা Determinism--অতিপ্রত্যয় বা Superstition দৈবীমূর্তি দেখা ও অন্যান্য অলৌকিক দৃশ্য দেখার মনস্তাত্ত্বিক কারণ-প্রায়শ্চিত্ত বলিদান উৎসর্গ ইত্যাদি লোকাচারের রহস্য--পরকৃতীক্ষা বা Paranoia- জাতিস্মরতার ব্যাখ্যা।

কথিত আছে যে, রাজা সোলোমন পশুর ভাষা বুঝতে পারতেন। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকও কতকটা এই গৌরবের দাবী করতে পারে। তবে তাঁরা ঠিক পশুর ভাষার অর্থভেদ করেন না; মানুষের অর্থহীন ভাব ভাষা ও আচরণকে তার সকল অবোধ্যতার নির্মোক হতে মুক্ত করে তাকে একটি সত্য তাৎপর্যে বিভূষিত করতে সমর্থ হয়েছেন। মানুষ কর্মপরায়ণ জীব; তার সমগ্র জাগ্রত জীবনের চলা-বলা দেখা শোনার পেছনে রয়েছে কর্তব্যের অঙ্কুশ। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, একজন সুস্থ মানুষের একটি দিনের কর্মসূচী, খুঁটিনাটি সমেত তার আচরণের আদ্যোপান্ত ইতিহাসটি যদি আলোচনা করি, তবে বোঝা যাবে তার কাজের অর্ধাংশের ওপরই হল প্রকৃতপক্ষে অকাজ, যার সঙ্গে নিকট কর্তব্যের কোন যোগসূত্রের বালাই নেই। আপাত-দৃষ্টিতে এই সব আচরণ-গত উৎপাতগুলিকে আকস্মিক, অযথা ও নিরর্থক মনে হয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের একটা মূলসূত্র এই যে, ব্যবহারের ভেতর দৈবাৎ আকস্মিক অনর্থক বা কারণহীনভাবে কোন পরিদৃশ্য দেখা দিতে পারে না। একটা ক্ষণায়ু ক্ষুদ্রতম বুদ্বুদেরও আবির্ভাবের পেছনে থাকে জলাশয়ের অন্তস্তলব্যাপী আলোড়ন। কোন

কাজই অনভীপ্সিত (unmotivated) নয়। মুদ্রাদোষের মত অর্থহীন আচরণকেও স্বাধীন স্নায়বিক প্রেরণার (motor action) ফল মনে করবার কারণ নেই।

মানুষের এই নিত্যকৃত অকাজ বিশেষ করে এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে,—সে প্রকৃতই সদ্ধর্মশীল জীব, সে বেশীক্ষণ কপট ব্যক্তিত্বের মুখোস পরে থাকতে অক্ষম। মানুষের প্রত্যেকটি ভুল ও অকাজের মধ্যে দেখতে পাই তার সত্যস্বরূপের প্রতিষ্ঠায় সে প্রতিনিয়ত তৎপর হয়ে রয়েছে। ভাবের ঘরে চুরি করতে মানুষ তার মনের দিক থেকে সত্যিই কোন তাগিদ পায় না।

অকাজের কাজ—স্খলন, পতন, ত্রুটি—এই সব ব্যবহারিক প্রমোদগুলিকে ডাঃ ফ্রয়েড গুণকর্ম অনুসারে দুটো শ্রেণী বিভাগ করেছেন—(১) ভ্রমাত্মক কর্ম (Erroneously Carried Out Action) এবং (২) বিলক্ষণ কর্ম (Symptomatic or Chance Action)।

অসাবধানে জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা, হোঁচট বা আছাড় খাওয়া অথবা অন্যধরণের ছোটখাট কোন অপঘাত—এই সব হল সচরাচর অনুষ্ঠিত অপকর্ম বা ভ্রমাত্মক কর্মের নমুনা। এমন সর্বগুণাধার নরোত্তম আজিও জন্মায় নি, যিনি কোন প্রকার ভ্রমাত্মক কর্মবিপাকের উর্ধ্বে। বিনা উত্তেজনায় ও নেহাৎ শান্ত অপ্রমত্ত অবস্থায় ভদ্রাভদ্র জ্ঞানী-মূর্খ প্রত্যেকে ভ্রমাত্মক কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

ভ্রমাত্মক কর্মের বৈশিষ্ট্য হল যে, তারা কোন ঘটনার অজুহাত না পেলে প্রতিষ্ঠারও সুযোগ পায় না। অর্থাৎ ভ্রমাত্মক কর্মের একটা অবলম্বন চাই। মনের ভেতর যে দ্বন্দ্ব চলেছে —যে অভীপ্সাটি বড় অন্তরঙ্গ তাকেই জাহির করার প্রচেষ্টা মুখ্যত এই কর্মভ্রংশের মূল। দৃষ্টান্ত—চাকরের ওপর রাগ করে চায়ের পেয়ালাটি আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলা অনেকের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। আসলে এটা হল একটা প্রতিবাদের পদ্ধতি বা বিদ্রোহ। সুতরাং যখন রাগ না করেও হঠাৎ (?) হাত থেকে পেয়ালা পড়ে ভেঙে যায়—তখনও সেটা প্রতিবাদই—এ অনুমান অযৌক্তিক নয়। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদটা কিসের বিরুদ্ধে তা সহজে বোধগম্য হবে না, কারণ সেটা অজ্ঞাত। হলই বা অজ্ঞাত—তারই জের এখানে এসে পৌঁছেছে ব্যবহারের ওপর, হস্তধৃত পেয়ালা এই অসম্বৃত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

গ্রহশান্তি ও স্বস্ত্যয়ন—দেবতাকে বিবিধ ভোগ ও উপচারে পরিতুষ্ট করার যে সব রীতি ও অনুশাসন সভ্য বা বর্বর সব মানুষের মধ্যে অল্পাধিক বর্তমান, তার সূচনা হয়তো হয়েছিল এই ভাবেই। যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ভাগ্যবিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকে এই পেয়ালা ভাঙার মত তুচ্ছ একটা স্বার্থবলির সৃষ্টি, তা ভাষালঙ্কারে সুসংস্কৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক বিবেকবোধ, যা বস্তুত সকল প্রকার ধর্মাচরণের প্রেরণা যুগিয়ে থাকে।

আকস্মিক অপঘাতের (Accidental injury) দরুন অঙ্গহানি হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। আকস্মিকতার দোহাই কিন্তু এখানে খাটে না! অপঘাত না বলে আত্ম-অপহত্যা বলাই যুক্তিযুক্ত, কেন না আপাত-বিচারে যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, এত বড় যে কষ্টকর বিচ্যুতি, তা'ও সত্যই মানুষ স্বেচ্ছায় সেধে সৃষ্টি করে থাকে।

ক্ষণিকের উত্তেজনার প্রকোপে মানুষ আত্মহত্যা করে বসে এ কথা সত্য নয়। বরং দেখা যায়—আত্মহত্যার প্ররোচনা নির্জ্জান মনে বহুদিন ধরে প্রধূমিত হতে থাকে। যে মুহূর্তে ঘটনা সহায় হয়, সচেতন মনের দ্বিধা প্রতিবাদগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে তখন আত্মহত্যার প্রলোভ দুর্দম্য হয়ে উঠে।

আত্মহত্যা লিপ্সার মত এত নিদারুণ একটা অসামাজিক মানুসকূট (complex) বুদ্ধিজ সংস্কারের চাপে প্রচ্ছন্ন থাকতে বাধ্য হয় এবং ঘটনার সম্পূর্ণ সাহায্যের অভাবেও ছোটখাট সুযোগের ফাঁকে দেখা দেয় অপঘাতরূপে। ডাঃ ফ্রয়েডের মতে, যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে আত্মনিধনের কামনা উদ্বুদ্ধ হয়, তার মধ্যে আত্মগ্লানিকর একটা অশান্ত ক্ষোভ বর্তমান থাকে।

এই ক্ষোভজনিত উদ্ভাবনার (Phantasy) প্রতিক্রিয়ার অজ্ঞান মানসপটে যে তাগিদ সৃষ্টি হয় --তারই চূড়ান্ত প্রকাশ আত্মহত্যায়। প্লেগেরি পীড়িত দেশে 'গৃহদাহে'র সুরেশের পলায়ন ও অবশেষে প্লেগেরি কবলে তার মৃত্যুতে আমরা তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সহজ পরিণতি দেখতে পাই। যে মনোধর্ম থেকে হোঁচট খাওয়া বা পতনজনিত দুর্ঘটনায় হাত পা ভাঙা ইত্যাদি অপঘাতের উদ্ভব, তারই দান হল আধুনিক ধর্মাচরণের প্রায়শ্চিত্ত বিধান। যে কোন অনুশোচনা বা শোকের কারণ থাকলে লোকে আত্মনিগ্রহের ব্যবস্থা করে। উপবাস, বৈরাগ্য প্রভৃতি বহুবিধ কষ্টকর লৌকিক কৃচ্ছ্রাচারের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এইভাবে সম্ভব।

দুষ্মন্ত রাজার কাছে যাবার সময় শকুন্তলার হাত থেকে রাজার দেওয়া উপহার আংটিটি নদীর জলে পড়ে যায়। উক্ত আংটি ছিল শকুন্তলার পরিচয়ের বাহন। এই দুর্ঘটনার পেছনে শকুন্তলার মনের ইচ্ছা কোন কাজ করেনি এমন কথা বলা যায় না। শকুন্তলা নিশ্চয় চাইছিল ফিরে যেতে, মুনি কণ্বের ছায়াশীতল তপোবনে ; দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদের উগ্র গরিমার ওপর তার কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু কল্পনা করা যাক, যাত্রারম্ভে বা পথে শকুন্তলা পড়ে গিয়ে পা ভাঙলো। এই অপঘাত সত্যই ঘটতো তা হলে নিঃসংশয়ে বলা যেত যে, দুষ্মন্তের বিরুদ্ধে তার অন্তরে একটা প্রতিবাদ, কোন ক্রুদ্ধ, আশঙ্কা বা বেদনার ধিক্কার লুকিয়ে ছিল--যার ফলে এই অপঘাত বা আত্ম-অপহত্যা। লোকে লজ্জায় জিভে কামড় দেয়--সুতরাং আবার কখন যদি কোন লজ্জা অজ্ঞাতসারে মনে প্রবেশ করে তখন হঠাৎ হয়তো জিভে কামড় পড়ে যেতে পারে। সাধারণত এই হলো অপঘাতের টেকনিক।

ভ্রমাত্মক কর্ম মাঝে মাঝে রূপকভাবে দেখা দেয়। একে বলা হয় বিলক্ষণ কর্ম (Symptomatic or Chance Action)। ডাঃ ফ্রয়েড বিলক্ষণ কর্মের একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই মহিলা তাঁর বিবাহের দিনে ছুরি দিয়ে নখ কাটতে গিয়ে অসাবধানে হাতের আংটী পরার আঙ্গুলটি বিক্ষত করে ফেলেন। এ বিবাহে মহিলার মনে প্রচ্ছন্ন আপত্তি ছিল, এ তারই প্রমাণ। তবে প্রমাণটা একটা রূপকের আশ্রয়ে অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। যদি মহিলাটি ঠিক বিবাহলগ্নে তাঁর সান্ধ্য ভ্রমণের পোশাকটি পরিধান করে বসতেন, তবে সেটা হত ভ্রমাত্মক কর্ম--যার ভেতর তাঁর গূঢ় ইচ্ছাটা বেশ স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে রূপকের যে স্থান, অপব্যবহারের মধ্যে বিলক্ষণ কর্মের সেই স্থান। উষ্মার আবেশে কেউ যখন কারো মুণ্ডপাতের কামনা করেন, সেই সঙ্গে তিনি হয়তো তাঁর হস্তধৃত কোন বস্তু--কাগজ খড়কুটো ইত্যাদি--ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলবেন। এ প্রসঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভ্রমরের কথা উল্লেখযোগ্য। বেচারা বেড়াল মারতে গিয়ে ভুল করে নিজের মাথায় লাঠি মেরে বসলো--"ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল"। ভ্রমরের ভাঙা ভাগ্যের বেদনা প্রতীকের রূপে প্রকাশ পেল, তার কপাল ভাঙার অভিনয়ে।

মুদ্রাদোষ নামে যে উপলক্ষবিহীন আচরণ প্রত্যেকের মধ্যে দেখা যায়, তা এই বিলক্ষণ কর্মের অন্তর্গত। এমনিতে মনে হয় মুদ্রাদোষগুলির কোন উদ্দেশ্য নেই, কারণ নেই ; যেন-- "আপনার মাঝে আপনি রয়েছে বাঁধা।" কিন্তু সত্যিই কি তাই?

কেতন থেকে ভুনাগ রাজার রাণী কেসর খাঁকে হোরি খেলার আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছিলেন।

পত্র পড়ে কেসর উঠে হাসি
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙীন দেখে পাগড়ি পরে মাথে
সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।

কেসর খাঁর এই রুমাল ঝাড়া ও গোঁফে চাড়ার মত আচরণ যখন অভ্যাসগত হয়ে পড়ে, তখনই তাকে বলা হয় মুদ্রাদোষ। সুতরাং মুদ্রাদোষও unmotivated নয়—কোন অতৃপ্ত সঙ্কল্প পাকাপাকিভাবে অজ্ঞান মনে বসে গিয়ে মুদ্রাদোষের ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে স্ফূর্তি লাভ করে। অবশ্য মুদ্রাদোষগুলি এত নিখুঁত ও পরিপুষ্ট আচরণ যে, হঠাৎ মনে হয়, এগুলি যেন সকল মনায়নের সীমানার বাইরে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কবি তাঁর সহজ মনোদৃষ্টির বলে অনুভব ক'রে বলেছেন—

মর্ম মাঝে বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে।

এই মানসপ্রকৃতির নাম অবশ্য-মনন (Determinism)। মুদ্রাদোষের হেতু অন্বেষণে অবশ্য-মননের কীর্তি দেখতে পাই। সুতরাং অবশ্য-মননের বিষয় একটা ব্যাখ্যা আবশ্যক।

ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য (Free Will) নামে যে কথাটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, তার প্রকৃতই কোন অস্তিত্ব আছে কি না তাতে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য নামে সদ্বস্তু যদি কিছু থাকে, তবে তা সচেতন মন ও সংস্কারের রাজ্যে। যদি মনোগত আবেগকে 'ইচ্ছা' বলা হয়, তবে তার কোন স্বাতন্ত্র্য-গুণ থাকতে পারে না। বরং মনের ক্রিয়াকলাপের ভেতর ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যের বিপরীত ভাবটিই অর্থাৎ অবশ্য-মননের প্রতিপত্তি দেখতে পাওয়া যায়। যদি কাউকে আপন খুশী মত একটা সংখ্যা বা নাম প্রস্তাব করতে আহ্বান করা হয়, তবুও তার উত্তরটা স্বাধীন ইচ্ছার প্রমাণ দেবে না। তার উত্তর যদি হয়—২৪ সংখ্যা, তবে একটু বিশ্লেষণেই এ রহস্য ধরা পড়ে যাবে যে, উক্ত ২৪ সংখ্যাটির সঙ্গে তার কোন গূঢ় অভিলাষ সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এমনও হতে পারে যে, তার পক্ষে চব্বিশ বৎসর বয়সটি পরম কাম্য যতই চেষ্টা করুন অন্য একটা সংখ্যা স্মরণ করতে—এই চব্বিশই ফিরে ফিরে আপনার স্মরণের পথে এসে দাঁড়াবে, সেই ছাড়ালে-না ছাড়ে পুরাতন ভৃত্যের মত।

অবশ্য-মননের কূটলীলার বিষয় যা বলা হলো, সেই তথ্যের আলোকে ভাবগ্রাস (Obsession) ও বাতিকের (Neurosis) রহস্য সমাধান সহজ। মুদ্রাদোষও এই আবেশের তামসিকতায় আচ্ছন্ন—অন্ধ আচরণসমষ্টি মাত্র। "সুসংহত চিন্তাবৃত্তি, যার সঙ্গে সংজ্ঞানের কোন যোগ নেই—" ডাঃ ফ্রয়েড অবশ্য-মননের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন।

কঠোর অবশ্য-মননের প্রভাবে ভাবগ্রাস প্রখর হয়ে ওঠে এবং তখন মুদ্রাদোষ বাতিকে পরিণত হয়। "চার প্রহরে চারবার দাঁত খুঁটতে হয়। প্রত্যেকবার ১০৮টি খড়কে সদ্ব্যবহার করা হয়। যতক্ষণ না রক্তপাত হয়। মাড়ির ঘা শুকুতে পারে না।"—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের এক চরিত্রের এই শুচিতার বাতিক ভাবগ্রাসের (Obsession) চরম পরিণতির দৃষ্টান্ত। মুদ্রাদোষ ক্রমোন্নীত হয়ে বাতিকে গিয়ে পৌঁছেছে।

ভ্রমাত্মক কর্মের শেষ পর্য্যায়ে পড়ে অদ্ভুতদর্শন (Hallucination), দৈবীমূর্তি, নিশির ডাক প্রভৃতি। প্রাচীন দার্শনিকের কাছে এইসব অভিদৃশ্য ছিল প্রহেলিকা। নিজেদের বিচার-দৃষ্টির অক্ষমতার কারণে তাঁরা বিভ্রমগুলিকে অলৌকিক রহস্যের কোঠায় ঠেলে দিয়েছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণের কাছে আজ প্রহেলিকাদি বিভ্রমের অতিপ্রাকৃত রহস্যের জলুস খসে পড়ে গেছে। যেকারণে বিভ্রম সৃষ্টি হয়, তার ফ্রয়েডীয় মীমাংসা হ'ল—"বহির্যোজিত অন্তরানুভূতি"—Outward projection of inner feeling.

একান্ত নিবিষ্ট মনে চলন্ত ট্রেনে বসে বসে যখন কেবলই মনে হয়,—'বাড়ি আর কতদূর', তখন ঘূর্ণ্যমান ট্রেনের চাকার একঘেয়ে ঘট্‌ঘট্‌ শব্দও যেন ঐ কথাটির প্রতিধ্বনি ক'রে বলে—'বাড়ি আর কতদূর'। সুতরাং দেখা যায় যে, সময় সময় অভিভূত বা নিবিষ্ট মনের চিন্তাসমূহ বাইরের রূপরসগন্ধস্পর্শ ও শব্দকে আশ্রয় ক'রে বাস্তব ঘটনার ছদ্ম আকার ধারণ করে, যাকে

আমরা আবার পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করি। তন্দ্রালু অবস্থায়ও যখন পরিপার্শ্ব-বস্তুবোধ সম্পূর্ণ দূরাপসৃত হয় না, তখন বহিস্থের প্রভাব মনের ওপর অধিকার বিস্তার করে। এমন অবস্থায় তন্দ্রার বিষয়বস্তু বাস্তবের সাহায্য নিয়ে রূপায়িত হ'তে থাকে। তন্দ্রালু ব্যক্তির পাশে বসে কেউ হয়তো একটি হিন্দী গজল গাইছেন, আর তন্দ্রালু তার আবছা নিদ্রাবেশে শুনছেন একটি বাংলা কীর্তন। আফিমের মৌতাতে মশগুল কমলাকান্তের কানে বেড়ালের ম্যাঁও শব্দটা ডিউক অব ওয়েলিংটনের সকাতর আফিম প্রার্থনার মত শুনিয়েছিল। মনেরই অনুভূতি বহিস্থকে অবলম্বন ক'রে এইসব ঘটনাপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, যার অসারতা ধরে ফেলা ইন্দ্রিয়গ্রামের সাধ্যায়ত্ত নয়। 'ক্ষুধিত পাষাণের' নায়ক খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভি জলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মত চকিতে দেখতে পেত। কখনও বা তরুণী ইরাণীর ছায়া এসে মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে দর্পণে মিলিয়ে যেত। বিল্বমঙ্গলে সর্পে রজ্জুভ্রম ও ম্যাকবেথের রক্তাক্ত ছুরিকা দর্শন আদর্শ বিভ্রমের দৃষ্টান্ত। বিল্বমঙ্গল ও ম্যাকবেথের বৈচিত্র্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী সর্বজনপীড়িত—তারই সঙ্গে বিচার করে দেখলে projectionএর বিস্ময়কর সুঘটনপটিয়সী কীর্তি বোধগম্য হবে।

ভ্রমাত্মক কর্মে বৈজ্ঞানিক আলোচনা কতভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে, কত অজ্ঞাত রহস্যের হদিস পাওয়া গেছে, তার অনেক পরিচয় আমরা পেলাম। এই মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলনীর শেষ ও শ্রেষ্ঠ ফল—অতিপ্রত্যয়ের (Superstition) উৎস আবিষ্কার।

অতিপ্রত্যয় ও অলৌকিকতাবাদ, এই দুই মনোদৃষ্টি এক কাঞ্চনসন্ধিতে যুক্ত হয়ে রয়েছে—একে অপরকে পরিপুষ্ট করেছে। শুভযাত্রার প্রাক্কালে হোঁচট খেলে একটু থেমে যেতে হয়—এ একটি অতিপ্রত্যয়। একে কোন কু বা সুসংস্কার বলা চলে না। সংস্কার হ'ল যুক্তিসাপেক্ষ এবং সংজ্ঞানগত—বুদ্ধি তার প্রসূতি। অতিপ্রত্যয় হ'ল যুক্তি-নিরপেক্ষ একটি প্রেরণা থেকে উদ্ভূত—মনের অন্তস্তলে রয়েছে তার শিকড়।

ডাঃ ফ্রয়েড পরকৃতীক্ষা (Paranoia) নামক চিন্তাভঙ্গীর তুলনা এনে অতিপ্রত্যয়ের রহস্য নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন। পরকৃতীক্ষা এক প্রকারের মনোব্যাধি। 'সন্দেহবায়ু' নামে আখ্যাত চিন্তাবিকারের সঙ্গে পরকৃতীক্ষার সাদৃশ্য আছে। পরকৃতীক্ষক সর্বদা শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে আছেন অপরের ব্যবহার ও মতিগতির ওপর। এর মনে সর্বদা সমালোচনার তুফান চলেছে। কেন লোকটি তার দিকে ওভাবে তাকিয়ে রয়েছে, গরুটা গাছের গায়ে এমন করে শিং ঘসছে কেন? স্বভাবী (Normal) লোকের মন এইসব অতি নগণ্য ব্যাপারে মোটেই আলোড়িত হয় না। কিন্তু পরকৃতীক্ষকের কাছে এসব অত্যন্ত ও অতিরিক্ত অর্থপূর্ণ। সে এর ভেতর থেকে বড় বড় সিদ্ধান্ত টেনে বার করে। যে লোকটা তাকিয়ে রয়েছে, সে নিশ্চয় এখনি টাকা ধার চাইবে—পরকৃতীক্ষক তার কৃচ্ছ্র মননতার বলে এই রকম একটা সহজ বিশ্বাস লাভ করে। পরকৃতীক্ষা-রোগীর মানসিকতার মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অজ্ঞান মনের প্রচণ্ড আবেগ সমষ্টি কিভাবে তার সজ্ঞান মনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। অপর ব্যক্তি বা বস্তুর খুঁটিনাটি আচরণের মধ্যে সে যে-উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে, সেই উদ্দেশ্যটিই আসলে লুকিয়ে রয়েছে তারই মনের মধ্যে অভীপ্সারূপে।

মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যতীত কোন ব্যবহারিক স্খলন অসম্ভব। কিন্তু যে-ইচ্ছার সংঘাত মানসিক দ্বন্দ্বের জনক তা মনের অগোচর। এই অজ্ঞানতা অলক্ষ্যে ব্যক্তিসত্তাকে পীড়িত করে ; ক্রমে এই দাবী এসে বর্তায় সজ্ঞানের উপর। এই অজ্ঞাত মনের বাসনাপুঞ্জের তাড়নায় চেতনমন বা সংজ্ঞান একটি বিশিষ্ট চিন্তার পথ ধরে অগ্রসর হয়। এই চিন্তার লক্ষ্য হল এমন কতকগুলি প্রত্যয় সৃষ্টি করা যা মনের ক্ষোভ ও ক্ষুধা শান্তি করে। এই হল অতিপ্রত্যয়ের সৃষ্টিক্রম। একে

সজ্ঞান কর্তৃক অজ্ঞানকে উৎকোচদান বলা যেতে পারে। দেবতা, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পরলোক, অমরতা প্রভৃতি মতবাদের ভিন্নার্থ বলতে গেলে অবদমিত ইচ্ছার তুষ্টির জন্য সজ্ঞান চিন্তায় আহৃত বিবিধ ও বিচিত্র উপঢৌকন। পুরাণ কাহিনী ও রূপকথায় সৃষ্টির মূলে এই অজ্ঞান মনের উদ্ভট কল্পনাবিলাসের আবেদন রয়েছে। মানুষের বাস্তব-পীড়িত রুদ্ধ আবেগপুঞ্জের মুক্তিপ্রয়াস, যার প্রেরণায় সে সৃষ্টি করেছে এই সব কল্পরাজ্য—তার 'সব পেয়েছির দেশ'। শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের বিভীষিকা চিত্ত পরিমণ্ডলে যে-ছায়াপাত করেছে তারই তাড়নায় সচেতন মন গড়ে তুলেছে তার জরামৃত্যুহীন স্বর্গ, অমৃত ও অনন্তযৌবন। সুতরাং অতিপ্রত্যয়ের মূলে রয়েছে (ব্যবহারিক প্রমাদ বিধায়ক দ্বন্দ্বশীল ইচ্ছাসমষ্টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে) "অজ্ঞাত জ্ঞান" ও "জ্ঞাত অজ্ঞানতা" (conscious ignorance এবং unconscious knowledge)।

অনেকে সফল-স্বপ্ন, চিন্তা-দৌত্য জাতিস্মরতা ও বিস্ময়কর সহ-সংঘটন (coincidence) প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতিকতার কাহিনী শুনেছেন। এই সেদিনও দিল্লীতে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল শান্তিদেবী নামে এক জাতিস্মর বালিকাকে নিয়ে। সে নাকি তার পূর্ব জন্মের পিতামাতা ও দেশের সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিল এবং অনুসন্ধানে (?) সেসব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। দূর প্রবাসে পুত্র হঠাৎ পীড়িত হলো—এদিকে কোন সংবাদ আসার পূর্বেই মায়ের মন শঙ্কায় ভার হয়ে রইল—এ ঘটনাকেও অনেকে লক্ষ্য করেছেন।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত রহস্য কি আছে? রামবাবুর কথা ভাবছেন, হঠাৎ রামবাবু দেখা দিলেন—এ ঘটনাকে তো কেউ অলৌকিক শক্তির লীলা মনে করে অপার্থিব পুলকে শিউরে ওঠেন না। এসব ব্যাপার নিছক কাকতালীয় সম্পাত মাত্র। কেন না স্বপ্ন তো আসলে মনেরই সাধ সঙ্কল্পের অনিরুদ্ধ বিক্রীড়া। এই আংশিক ও আকস্মিক সফলতার পিছনে কোন অতিপ্রাকৃত বিধানের কল্পনা করা অমার্জ্জনীয় মূঢ়তা। স্বপ্ন যতটুকু সফল হয়, তার হাজার গুণ হয় বিফল।

জাতিস্মরতাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অলৌকিক। কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখে যাচাই করলে এর সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে যায়। এর মূলে রয়েছে এমন কোন গুপ্ত ও অজ্ঞাত উদ্ভাবনা, যা হঠাৎ সদৃশ ঘটনার প্রমুখাৎ একটা পূর্ব পরিচয়ের অনুভূতি (Deja Vu) মনে জাগিয়ে তোলে—'পুরাতন সেই গীতি সে যেন আমারি স্মৃতি'। কালিদাসের—'জননান্তরানি সৌহৃদানি'র অনুভূতিও এই শ্রেণীর পূর্বসঞ্চিত উদ্ভাবনাপুঞ্জের সঙ্গে অনুরূপ ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফল। অজ্ঞাত স্বপ্নস্মৃতিও মাঝে মাঝে ঘটনাশ্রয়ী হয়ে পূর্ব-পরিচয় বা জাতিস্মরতা সৃষ্টি করে।—

"মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে।"

এক একটা ঘটনা যেমন বিস্মৃত স্মৃতিকে পরিচয় করিয়ে দেয়, অজ্ঞাত স্মৃতিও তেমনি অকস্মাৎ বিলসিত হয়ে ঘটনাকে এমন অন্তরঙ্গ রঙে রাঙিয়ে দেয়, মনে হয়, এই ঘটনাটি নতুন নয়—এ পূর্বাভিজ্ঞাত ও পরিচিত। স্মৃতি ও ঘটনা এইভাবে পরস্পর স্থান বিনিময় করে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষকে ধাঁধিয়ে দেয়। "আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল ; তাই এত মধুর বোধ হইল।" বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা এই সত্যকে সায় দিচ্ছে—ঘটনা যেমন পূর্বস্মৃতিবোধ জাগিয়ে তোলে, স্মৃতিও তেমনি পূর্বঘটনাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আবার সস্তায় আস্থা-বিলাসী অতি-প্রত্যয়ীর (superstitious) কথা আসবে। অতিপ্রত্যয়ীর লক্ষণ এই যে, সে তার প্রত্যেক ভ্রমাত্মক কর্মকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলে ধরে নেয়, যদিও ব্যাপারটা মূলত সম্পূর্ণ আন্তরিক। তার বিচারের প্রণালী উল্টো রকমের। সে মনে করে ঘটনা প্রথম—তারপর চিন্তা করে। মনের গুপ্ত ইচ্ছার কারসাজীতে সে হোঁচট

খেয়েছে, কিন্তু সে এই হোঁচট খাওয়াকে স্বপ্রধান ঘটনা মনে করে এবং তারপর তার কারণ স্বরূপ এক একটা প্রত্যয় বা সংস্কার দাঁড় করায়।

পরকৃতীক্ষার (paranoia) মত মানসিকতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিভাবে সচেতন মন অচেতন মনের দাসত্ব করে। ডাঃ ফ্রয়েড একে অজ্ঞাত-জ্ঞান (unconscious knowledge) বলেছেন। সময় সময় স্বাধ্যায় ও অনুশীলনের বলে মনকে ধ্যানস্থ বা ভাববিষ্ট করা সম্ভব, এই ধ্যানস্থ অবস্থার পরাকাষ্ঠা যোগী সাধকের 'তুরীয়' বা সদোপলব্ধির অবস্থা নামে প্রখ্যাত। এই তথাকথিত 'তুরীয়' অবস্থাকে ডাঃ ফ্রয়েড তাঁর নিজ পদ্ধতিতে বিচার করে বলেছেন—(dim perception of the unconscious)—সাধকের সম্মুখে ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার লক্ষ বাসনা বিলসিত অজ্ঞাত মনের কল্পলোক—তার অনুভূতিকে টেনে নিয়ে যায় কোন 'মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে, চেতনা প্রত্যুষে।'

আধুনিক মনোবিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে যে পরিণতি গ্রহণ করবে, ডাঃ ফ্রয়েড সে সম্বন্ধে যে-বাণী ঘোষণা করেছেন তা বিশ্বাসী লোকের আস্তিক্য বুদ্ধিকে আঘাত করবে নিশ্চয়, কিন্তু বিজ্ঞানেরও একটা মর্যাদার দাবী আছে এবং সেই হেতু ডাঃ ফ্রয়েডের অভিমত তাদের পক্ষেও নিষ্ঠার সঙ্গে বিচার্য। আধুনিক বিজ্ঞান আজ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে নব নবতর আবিষ্কারের আনন্দে এবং সুধী বিজ্ঞানী মহলে এই আশা ক্রমপুষ্ট হয়ে উঠেছে—আজকের যে তত্ত্ব অধ্যাত্মবিদ্যা (Metaphysics) নামে পরিচিত, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে ; তাকে পরাবিদ্যার মহিমা ঘুচিয়ে ফেলে বিজ্ঞানের রূঢ় স্পর্শে অচিরে অভিমনো বিদ্যায় (Metapsychology) পরিণত হতে হবে।

স্বপ্নাধ্যায়

স্বপ্ন—স্বপ্নে অজ্ঞাত ইচ্ছার সাড়া ও চরিতার্থতা—স্বপ্নরাজ্যের প্রহরী বা সেন্সরের কাজ স্বপ্নের দুই স্বরূপ—নিহিত বিষয় (Latent Content) ও প্রকট বিষয় (Manifest Content)—প্রতীক (Symbol)—স্বপ্নের অর্থ আছে—স্বপ্নের বিশ্লেষণ সম্ভব—কংসের স্বপ্ন—স্বপ্নের প্রকরণ (Dream Formation)—স্বপ্নে বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—কতগুলি সাধারণ স্বপ্নের নমুনা (Typical Dreams)।

তুলসীদাস বলেছেন—সপনে রঙ্ক নাকপতি হোই। স্বপ্নে কাঙালও স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র হয়ে যায়। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে, এরকম লোকও আছে শোনা যায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের মনের সব আবেগগুলিই তৃপ্তিপ্রয়াসী। সামাজিক জীবনের বাস্তবতাবোধ প্রহরীর মত (censor) অনেক আবেগকে ঘাড়ে ধরে বসিয়ে দেয় বলেই, জাগ্রত জীবনে তারা চুপ করে থাকে। কিন্তু প্রতি দিনান্তে এমন একটি সুলগ্ন আসে যখন এই সামাজিক বাস্তবতা বোধ [যাকে ইগোর শাসন বলুন বা প্রতিরোধ (resistance) বলুন] প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে দমিত বাসনার কুঞ্জে কুঞ্জে সাড়া পড়ে যায়—অচেতন মনের রাজ্যে দিনের আলো জাগে।

ঘুম ও স্বপ্নের কথা বলা হচ্ছে। ঘুমের কোলে শুধু মানুষের কর্মক্লান্ত দেহটাই ঢলে পড়ে না, মনের এই নীতিবাগীশ পাহারাওয়ালাও (censor) ঢলে পড়ে। কিন্তু নিদ্রিত মানুষের মনে সেন্সর একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না।

স্বপ্ন মানুষের জীবনে সত্যই এক বিচিত্র কুহক। অযুত বাসনার রেণুজাল দিয়ে তৈরী মনের অতলের এক দ্বিতীয় বরুণালয়। বোধব্যাপ্ত অথচ বস্তুকায়াহীন। বস্তুজগতের মতই এখানে মমতা তেমনি কোমল, চুম্বন তেমনি মিষ্টি, হিংসা তেমনি শাণিত, বিরহ অপমান

তেমনি জ্বালাকর। ঘুমন্ত মানুষের অসহায় মুখচ্ছবি দেখে কে বুঝবে যে, তার মনের ভেতর তখন এক প্রকাণ্ড ইতিহাস সাড়া দিয়ে উঠে নতুন ভাবে আপনাকে কীর্তিত করে চলেছে?

অচেতনতায় প্রোথিত দমিত ইচ্ছা স্বপ্নে সার্থকতা লাভের চেষ্টা করে। স্বপ্নের ঘটনা এই ইচ্ছাবৃত্তির চাঞ্চল্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। স্বপ্নের প্রকৃতির মধ্যে ডাক্তার ফ্রয়েড কতগুলি নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।

স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার দু'টি স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। (১) যাকে বলা হয়—প্রকট বিষয় (Manifest Content) ও (২) নিহিত বিষয় (Latent Content)। কাহিনী সাধারণত সাম্প্রতিক কোন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী গড়ে ওঠে। স্বপ্নের এদিকটা বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না। তিন দিন একটানা ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফেরার পর প্রথম যে ঘুম আসে, তার মধ্যে ট্রেনঘটিত কোন পরিদৃশ্য থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট এই ট্রেনঘটিত পরিদৃশ্যগুলির অর্থ (Latent Content) আরও গভীরে গিয়ে পেতে হবে। এই পরিদৃশ্যগুলিকে অবলম্বন করে যেসব আবেগ ও ইচ্ছার পরিস্ফূর্তির চেষ্টা দেখা যাবে, তাকেই স্বপ্নের নিহিত বিষয় বলা হয়।

স্বপ্নের প্রকৃতিকে নাটকীয় বলা চলতে পারে ; তবে এই নাটক খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ছদ্মরূপে ব্যক্ত। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি আসল সত্য নয় ; তারা প্রতীক (Symbol) মাত্র। স্বপ্নের রজ্জু, ঠিক রজ্জু নয়—আসলে সেটা হয়তো সাপ। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন এই ভাবে অজস্র প্রতীকের আশ্রয়ে অবরুদ্ধ আবেগকে নাটকীয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তৃপ্ত করবার চেষ্টা করে।

ডাক্তার ফ্রয়েড স্বপ্নকে অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়কে মনঃসমীক্ষণের কাজে লাগিয়েছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যার মধ্যেই অচেতন মনের পরিচয় উদঘাটিত হয়, কেননা স্বপ্ন অচেতন মনে দমিত যত আবেগের আত্মপ্রকাশের নাটকীয় কীর্তি মাত্র। সুতরাং স্বপ্নবিশ্লেষণ মনোবিশ্লেষণেরই একটা সহযোগী অধ্যায়। বয়স্ক মানুষের স্বপ্নেও শৈশব অভিজ্ঞতার বহু অভিমান চরিতার্থতার জন্য নানা ছদ্মবেশে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ায়। শিশুর স্বপ্নে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্কজনিত (ইদিপাস প্রভৃতি) আবেগগুলিই সবচেয়ে প্রখর ও স্পষ্ট। শিশুর স্বপ্ন প্রতীকের ধার ধারে না। আদিম বর্বর মানুষের বা আধুনিক কালের অসভ্য জংলী মানুষের স্বপ্নের রীতিনীতি শিশুর স্বপ্নের মত জটিলতাহীন। রূপকথা, উপকথা এমন কি পুরাণ-কথা নামে যেসব লোকসাহিত্য আছে তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূলত সেগুলি যেন জাতির গোষ্ঠীগত স্বপ্ন। পরী-হুরী স্বর্গ, দেবদূত, ড্রাগন, পক্ষীরাজ ঘোড়া, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী প্রভৃতি বিচিত্র প্রতীকের অত্যদ্ভুত কীর্তি ও অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টার যত কাহিনী যেন দমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ—অচেতন মনের সাধ।

ডাক্তার ফ্রয়েড স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটা অর্থপূর্ণ কথা বলেছেন। বাতিক মানুষের মানসিক আচরণ বা চিন্তা আর সুস্থ মানুষের স্বপ্ন গুণে ধর্মে একই। এই সিদ্ধান্তের ফলে মানুষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচরণগুলিকে (শিল্প সাহিত্য নৃতত্ত্ব প্রভৃতি) সাইকো-এনালিসিস প্রথায় বিচার করার প্রয়োজন বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন। এটাও স্বপ্নের নিহিত অর্থ (Latent Content) উদ্ধার করার মত ব্যাপার। সাইকো-এনালিসিসের প্রয়োগে শিল্প-সাহিত্যের একটি গূঢ় স্বরূপের পরিচয় আমরা পেতে আরম্ভ করেছি, যা অন্য ভাবে জানবার উপায় ছিল না।

রাজা কংস বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অন্তিম ঘনিয়ে আসছে। একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখলেন ; সকাল বেলা পাত্রমিত্র পণ্ডিত ও পুরোহিতদের ডেকে এনে সেই স্বপ্নের বিবরণ শোনালেন।—

"এক লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী অতিবৃদ্ধা কৃষ্ণবর্ণা রমণী যেন আমার নগর মধ্যে নৃত্য করিতেছে। এক মুক্তকেশী ছিন্ননাসা বিধবা মহাশূদ্রী যেন আমার সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করিতেছে ও আমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এক দিব্যস্ত্রী মহারুষ্টা হইয়া পূর্ণকুম্ভ ভগ্ন

করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গারবৃষ্টি, ভস্মবৃষ্টি ও রক্তবৃষ্টি হইতেছে। এক সতী রমণী আমার ভবন হইতে নির্গতা হইলেন ; তাহার পরিধান পীতবস্ত্র, অঙ্গ শ্বেতচন্দন চর্চিত ; গলদেশে মালতী মালা ও হস্তে ক্রীড়াকমল।"--ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

রাজা কংসের মনের দ্বন্দ্ব প্রতীকের আশ্রয়ে যে স্বপ্নচ্ছবি সৃষ্টি করেছে--তার ব্যক্ত অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রতীকগুলি খুবই স্পষ্ট এবং অর্থ সরল। কিন্তু এর গূঢ় অর্থ বোঝা সহজে সম্ভব নয়। ডাক্তার ফ্রয়েড স্বপ্নে এই গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু এই পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে তিনি সুস্থ ও অসুস্থ বহু নরনারীর স্বপ্ন গভীর ও বিস্তৃত ভাবে পর্যালোচনা করে স্বপ্নের রীতিনীতি জেনে নিয়েছেন। স্বপ্নের এই ব্যাকরণের ওপর তিনি তার বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে দাঁড় করিয়েছেন।

স্বপ্ন মাত্রই ইচ্ছাবৃত্তির চরিতার্থতা (Wish Fulfilment) অন্যভাবে বলা যায়, স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছাবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে।

প্রশ্ন ওঠে, রাজা কংস স্বপ্নে যে সব দৃশ্য দেখলেন--সেগুলি কি তিনি সত্যই কামনা করেন? স্বপ্নে দেখা এই নিদারুণ পরিণামের মধ্যে তাঁর ইচ্ছাবৃত্তি কিভাবে চরিতার্থতা লাভ করতে পারে? যে দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষে ঘুমের ঘোরে আঁৎকে উঠছে, সেটাই তার মনের সাধ --এরকম অনুমান উদ্ভট শোনায় না কি?

এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, স্বপ্নের দুটি অর্থ আছে-- প্রকট অর্থ ও নিহিত অর্থ। এখানে উত্তর দিতে গিয়ে--সেই কথা আবার ডবল করে বলতে হয়। স্বপ্নের প্রকট ও নিহিত অর্থ--অর্থের এই দুই বিভাগকে ডাক্তার ফ্রয়েড আর একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন--স্বপ্নের (১) ঘটনাংশ (Dream Content) ও (২) ভাবনাংশ (Thought Content)। স্বপ্নের এই ভাবনাংশকে যখন ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই প্রমাণিত হয় যে স্বপ্নের আসল কথাটি হলো ইচ্ছাবৃত্তির চরিতার্থতা। সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন--উভয় ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত সত্য।

স্বপ্নের ছদ্মবেশ। ঈশপের গল্পের শেয়াল যখন নাগালের বাইরের আঙুর নিজের ভোগে আনতে পারলো না, তখন তাকে বলতে হলো--নিশ্চয় আঙুরগুলি টক। এই মনস্তত্ত্বের বিশেষ একটা রহস্য রয়েছে। শেয়াল নিজেই তার নিজের ইচ্ছাটাকে একটা যুক্তি সৃষ্টি করে চাপা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীর ভাষায় বলতে পারা যায়--ইচ্ছার দমন (repression)। আঙুরকে টক অনুমান করে নিয়ে আঙুরকে পাওয়ার ইচ্ছাটাকে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

স্বপ্নের মধ্যেও ইচ্ছা বৃত্তিগুলিকে পরিস্ফূর্তির পথে এইরকম দমনের প্রকোপ সইতে হয়। দমনের ফলে স্বপ্ন সরল না হয়ে, জটিল বিকৃত সংক্ষিপ্ত প্রতীকীও ছদ্মবেণী হয়ে পড়ে। 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন'--কবির রচনার এই ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের মত স্বপ্নের ঘটনা মাঝে মাঝে স্বপ্নের ভাবনাগত ইচ্ছার বিপরীত রূপ গ্রহণ করে। তাই স্বপ্নের ব্যক্ত অর্থে অর্থাৎ ঘটনাংশে যদি ভালবাসার ব্যাপার দেখা যায় নিহিত অর্থে বা ভাবনাংশে সেটা হয়তো ঘৃণার ব্যাপার।

এই দমন ব্যাপারকেই স্বপ্নরাজ্যের সেন্সরশিপ (censorship) বলা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বপ্নের ঘটনা সৃষ্টি বা রূপ বা প্রকরণের (dream formation) পেছনে কাজ করছে দুটি শক্তি। একটি হলো চকিতার্থতা-প্রয়াসী ইচ্ছার আকুতি ও দ্বিতীয়টি হলো শাসনশীল সেন্সর, ইচ্ছাকে স্বাভাবিক রূপে ফুটে উঠতে দেয় না।

দুঃস্বপ্ন সম্বন্ধে এখন একটা সত্য কথা বলা যায়। যেসব অপ্রীতিকর বা ক্লেশকর ঘটনা স্বপ্নে দেখা যায়, আসলে সেগুলি এক একটা অপ্রীতিকর আবরণ মাত্র। এই আবরণের আড়ালে সত্যিকারের ইচ্ছাবৃত্তি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা চরিতার্থতা লাভ করে চলেছে। সেন্সর ইচ্ছাবৃত্তির স্পর্ধাকে বাধা দেয় বলেই, ইচ্ছাবৃত্তিকে যেন একটা ভূয়া দীনতার সাজ পরে

নিজের কাজ হাঁসিল করে নেয়।

তাই ডাক্তার ফ্রয়েড বলেন যে প্রত্যেকটি স্বপ্নের অর্থ আছে। কংসের দুঃস্বপ্নের নিগূঢ় অর্থটি তাহ'লে কি হতে পারে? এই স্বপ্নের ভেতর তাঁর কোন ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করেছে?

উত্তরে, সোজা কথায় বলতে পারা যায়—বাঁচবার ইচ্ছা। ধ্বংস আসন্ন ও অমোঘ জেনে রাজা কংসের মন আতঙ্কে কাতর হয়ে রয়েছে। তৈলমর্দন ও আলিঙ্গন—এই দুটি ঘটনার মূল স্বপ্নের ভাবনাংশে খুঁজতে গেলে তার অর্থ দাঁড়ায় :

তৈলমর্দন = লালিত ও সেবিত হবার ইচ্ছা। হীনতেজ শরীরকে পুনর্বার শক্তিশালিতায় উন্নীত করার ইচ্ছা।

আলিঙ্গন = সমর্থন সাহায্য ও অভয় লাভের ইচ্ছা। বিপদ থেকে আত্মরক্ষার কামনা। আশ্বাস লাভ। সন্ধি-স্থাপনের ইচ্ছা।

কংসের স্বপ্নের শেষ দৃশ্যে আছে—'এক সুসজ্জিতা রমণী তাঁর ভবন হতে বের হয়ে চলে গেলেন।' কৃষ্ণের হাতে অবধারিত মৃত্যুর পরিণাম থেকে পরিত্রাণের জন্য ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়তো স্বপ্নের ভেতর এই ঘটনার রূপক সৃষ্টি করেছে।

স্বপ্নের মধ্যে সেন্সর কিভাবে কাজ করে, তার সুন্দর একটি উদাহরণ দেওয়া যায় পুরাণে কথিত একটি উপাখ্যান থেকে—উষা ও অনিরুদ্ধের স্বপ্ন-সমাগম।

"অনিরুদ্ধ একদিন স্বপ্নাবস্থায় বিকসিত কুসুমপূর্ণ উদ্যানে সুগন্ধি পুষ্পশয্যায় শয়ানা এক যুবতীকে (উষা) দর্শন করিলেন। অনিরুদ্ধ সেই কামিনীকে মধুর বাক্যে কহিলেন : সুন্দরি ! আমি রতিপুত্র শৃঙ্গারবিশারদ অনিরুদ্ধ। অতএব আমাকে ভজনা কর। সেই লজ্জিতা কামিনী বস্ত্রাঞ্চলে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ঈষৎ বিলোকন করিতে করিতে বলিলেন : যদি আপনি এতই ব্যাকুল হইয়া থাকেন তবে নিজের যোগ্যাকে বিবাহ করিতেছেন না কেন? যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎপিতা বাণের নিকট প্রার্থনা করুন। সুন্দরী এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন এবং অনিরুদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

স্বপ্নে অনিরুদ্ধের কামলিপ্সা অবাধ ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছিল ; আচরণের বৈধতা বোধ প্রথমে ছিল না; কিন্তু তার পরেই দেখা গেল, উষার উত্তরের মধ্যে সামাজিক শালীনতার প্রহরী (সেন্সর) যেন বৈধতার প্রশ্ন সম্বন্ধে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

স্বপ্নের ভেতর যেসব ইচ্ছা স্ফূর্তি লাভের জন্য চেষ্টিত হয়, বৈজ্ঞানিক স্বপ্নব্যাখ্যাতা তার মুখোস খুলে ফেলে তাকে চিনে নিতে পারে। চেনবার পর আর একটা তত্ত্ব ধরা পড়ে যায় ; এই ইচ্ছার অনেকখানিই শৈশব জীবনের অভিজ্ঞতার দান। তখন বোঝা যায়, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে সরে যায়নি ; তারা মনের ভেতরে দানা বেঁধে আছে। স্বপ্নের ভেতর শৈশব স্মৃতি যেন সুপ্তি ছেড়ে উঠে বসে।

স্বপ্নের প্রকট বিষয় (Manifest Content) সচরাচর সাম্প্রতিক কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে তৈরী হয়। ফুটবল ম্যাচে বাঙালী টীম গোরা খেলোয়াড়ের দলকে হারিয়ে দিল : দুদিন আগে হয়তো ময়দানে এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে আসা হয়েছে। সেই খেলা দেখার স্নায়বিক উত্তেজনা স্বভাবত নিদ্রিত অবস্থায়—স্বপ্নের ভেতর, ফুটবল ম্যাচের দৃশ্য অবতারণা করতে পারে। স্বপ্নের প্রকট বিষয় সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকেই অবলম্বন করে। কিন্তু স্বপ্নের নিহিত বিষয় (Latent Content বা dream-thought) হয়তো দূর অতীতের কোন অভিজ্ঞতা। এমন কি অপোগণ্ড শৈশবের অভিজ্ঞতা, তথা, ইচ্ছাবৃত্তির ব্যাপার হতে পারে।

একদল বৈজ্ঞানিক ছিলেন—যাঁরা বলতেন যে, বিশেষ বিশেষ দৈহিক অবস্থায় (Somatic Condition) বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন সৃষ্টি হয়। পেটভরে ঝালরান্না মাংস খেয়ে যদি শোয়া যায়, তবে নাকি নির্ঘাত দৌড়দৌড়ির স্বপ্ন দেখতে হবে।

এঁদের কথা মেনে নিলেও কিন্তু স্বপ্নতত্ত্বের মূল সত্যটির হানি হয় না ; অর্থাৎ ইচ্ছাবৃত্তির চরিতার্থতার কথা। এই দৌড়দৌড়ির ব্যাপারের প্রকট অর্থে যাই হোক, দেখা যাবে যে নিহিত অর্থে কোন না কোন ইচ্ছা নিজেকে স্ফূর্ত করার চেষ্টা করছে। ঘুমোবার সময় একটা হাত যদি বেকায়দায় দুমড়ে থাকে, তবে স্বপ্নে পক্ষাঘাত রোগ হওয়ার দৃশ্য দেখা অসম্ভব নয়। স্বপ্নের মধ্যেই ডাক্তার এসে হয়তো বলবেন—কই হাতটা দেখি? ডাক্তারের নির্দেশ মত হাত দেখাতে গিয়ে হয়তো (স্নায়ুর সাড়া লেগে) হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবে। তখন হাতটা টেনে সোজা করে নেওয়া সম্ভব হবে। দেখা যাচ্ছে, হাত টেনে নেওয়ার ইচ্ছাটাই স্বপ্নের মধ্যে খুব ভদ্রভাবে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পর পর ঘটনা তৈরী করে নিয়ে চলেছে।

ব্যক্তিবিশেষে জীবনের অভিজ্ঞতার তারতম্য আছে। তাই তাদের স্বপ্নেরও প্রকৃতির তারতম্য দেখা যায়। ডাক্তার ফ্রয়েড কতগুলি সাধারণ স্বপ্নের (বা স্বপ্নের টাইপ) তালিকা তৈরী করেছেন।

(১) স্বপ্নে নিজেকে উলঙ্গ দেখে বিব্রত হওয়া।

এই স্বপ্নের ভেতর শৈশব অভিজ্ঞতার সঞ্চরণ দেখা যায়। পরিচ্ছদ যেন বয়োপ্রাপ্ত জীবনে এক লজ্জা ও শালীনতার বোঝাবিশেষ। শিশু-অবস্থায় এই সুরুচিশাসনের বালাই ছিল না ; সে-এক মুক্ত ও অবাধ ব্যক্তিত্বের জীবন। পরবর্তী জীবনের স্বপ্নের ভেতর সেই আকাঙ্ক্ষা বিমূর্ত হয়ে ওঠে। তবে স্বপ্নে উলঙ্গতার জন্য বিব্রত বোধের উদ্রেক হয় কেন? এটা সেন্সরের কীর্তি। স্বপ্নেও সামাজিক প্রহরী যেন ছিছি করে ওঠে।

(২) প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন।

এই ধরনের ঘটনায় স্বপ্নদ্রষ্টা দু'রকম ব্যবহার করে—হয় স্বপ্নের মধ্যেই দুঃখে কান্নাকাটি ক'রে অভিভূত হয়, নয় অবিচল থাকে। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি স্বয়ং স্বপ্নে প্রিয়জনের মৃত্যু দেখে দুঃখিত না হয়, তবে বুঝতে হবে সেটা ভিন্নতর কোন ইচ্ছার ব্যাপার। সচরাচর স্বপ্নে এরকম আচরণ কেউ করে না ; কাজেই এটা সাধারণ স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে প্রিয়জনের মৃত্যুতে সকলেই সাধারণত কেঁদে থাকে। ডাক্তার ফ্রয়েড বলেন, এই স্বপ্ন প্রিয়জনের মৃত্যুকামনার স্বপ্ন। কথাটা শুনলে একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয়। যার ক্ষণিক অদর্শনে মন আকুল হয়ে ওঠে, যার বিরহে জীবন শূন্য মনে হয়—স্বপ্নে তারই মৃত্যু কামনা করা কখনও সত্য হতে পারে কি?

ডাক্তার ফ্রয়েডের এই অভিমতটি খুব সাবধানে বুঝতে হবে। স্বপ্নে বাপ মা ভাই বা বোনদের কারও মৃত্যু দেখলে সরাসরি এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে স্বপ্নদ্রষ্টা তখনই তার এমন স্নেহভাজন মানুষটির মৃত্যু কামনা করছে। স্বপ্নতত্ত্ব এতটা কখনো বলে না। আসল কথাটা হলো, স্বপ্নদ্রষ্টা তার শিশুজীবনে কোন না কোন সময়ে বাপ-মা-ভাই-বোনের কারও মৃত্যু কামনা করেছিল। সেই দমিত শৈশব কামনার পরিস্ফূর্তি স্বপ্নে মাঝে মাঝে ঘটে যায়। এই ব্যাখ্যাতেও প্রতিবাদীর মধ্যে অনেকে সন্তুষ্ট হবেন না। তাঁরা বলবেন, যে-শিশু বাপ মা ভাইবোনের আদরে লালিত হয় ও কোল থেকে নামিয়ে দিলে কাঁদতে থাকে, যে-শিশু অহরহ প্রিয়জনের সঙ্গ কামনা করে—সেই বা কেন প্রিয়জনের মৃত্যু কামনা করবে?

ফ্রয়েডের উত্তর : ভেবে দেখতে হবে যে শিশুর ধারণায় মৃত্যু ব্যাপারটা কি? শিশু মৃত্যুর তত্ত্ব কিই বা বোঝে? মৃত্যু যে জীবনের শূন্যময় সমাপ্তি বা চিরদিনের বিদায়—এত সব দার্শনিক বিচার শিশুর মনের ঘটে নেই। তাই শিশু যখন তার ইচ্ছাবৃত্তির পরিপূরণে কোন রকম বাধা পায়, তখনই সেই বাধার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে (বয়স্ক ভাই বোন বা বাপ মা) দূরে সরিয়ে দেবার কামনা করে। শিশুর মন সরলভাবেই যেন তার সাধের পথে কাঁটা সেই শাসক প্রিয়জনকে 'দূরমপসর' বলে ধিক্কার দিয়ে ওঠে। শিশু বয়সে পিঠাপিঠি ভাই-ভাই বা বোন-বোনের মধ্যে নানাকারণে ক্ষণে ক্ষণে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। শিশুরা একেবারে ষোল-আনা আত্মাদরপরায়ণ। তাই তার আত্ম-ইচ্ছার পরিতৃপ্তির পথে কোন ব্যক্তি

বা ব্যক্তিত্বের বাধাকে তারা মন দিয়ে মেনে নিতে পারে না। তাকে সরিয়ে দিতে চায়। শৈশবে বিদ্বিষ্ট হয়ে এইভাবে প্রিয়জনকে মাঝে মাঝে 'দূরে সরিয়ে দেওয়ার' আকাঙ্ক্ষা বয়োপ্রাপ্ত মানসের স্বপ্নে মৃত্যু কামনার রূপ পরিগ্রহ করে।

(৩) পরীক্ষার স্বপ্ন।

ডাক্তার ফ্রয়েড রসিকতা করে এই স্বপ্নকে নাম দিয়েছেন—ম্যাট্রিকুলেশন স্বপ্ন। পরীক্ষায় পাস করে যাবার অনেকদিন পরেও পরিণত বয়সে অনেকে পরীক্ষার স্বপ্ন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। পরীক্ষা আসন্ন, পড়া অসম্পূর্ণ, সময় কম ইত্যাদি নানারকম ব্যাপার মিলে স্বপ্নের মধ্যে একটা তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

এই ধরনের স্বপ্নের রহস্য ভেদ করে ডাক্তার ফ্রয়েড বলেছেন যে, জীবনে যখনি কোন একটা দায়িত্ব এসে চাপে—কোন কর্তব্য সম্পাদনার তাগিদ আসে অথচ সামর্থ্য সম্বন্ধে সংশয় থাকে, তখনই লোকে পরীক্ষার স্বপ্ন দেখে। এই উদ্বেগ যেন ছেলেবেলার কর্তব্যচ্যুতির শাস্তির স্মৃতি। আসন্ন কর্তব্য পালনের আগে প্রস্তুতি সম্বন্ধে উপেক্ষা বা ত্রুটি থাকলে স্বপ্নে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আতঙ্ক বুড়োবয়সেও রীতিমত কষ্ট দিয়ে থাকে।

স্বপ্ন-গঠনে কারিগরী

স্বপ্নের বৃত্ত ও কেন্দ্র—সেন্সরের বিবিধ কূটকীর্তি—সংক্ষেপণ বা condensation—অপসারণ বা Displacement—স্বপ্নের বৃত্তান্তে ও স্বপ্নমূলের মধ্যে আবেগের গূঢ়তা বিনিময়—ভাবনা-বিষয়ের ছদ্মবেশী কীর্তি—পরশুরামের স্বপ্ন—স্বপ্নে 'প্রতীক' অর্থে কি বোঝায়?—স্বপ্নে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির চাক্ষুষ প্রতিচ্ছবিতে (visual) পরিণতি—প্রত্যাগতি বা Regression—স্বপ্নে শৈশব অভিজ্ঞতার বোধচ্ছবির পুনরাবির্ভাব—স্বপ্নের রাগ-বিষয় (Affect)—স্বপ্ন কি কখনো সফল হয়?

স্বপ্ন বিশ্লেষণের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট কাঁটাছাঁটা পদ্ধতি ডাক্তার ফ্রয়েড দিতে পারেননি। স্বপ্ন একটি অতি জটিল মানসিক সংগঠন। স্বপ্নালু মানস-প্রকৃতির কতগুলি সাধারণ গুণধর্ম জানা থাকলে যে কোন স্বপ্নের তাৎপর্য কিছু-না-কিছু উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়।

শব্দতত্ত্বের ব্যাকরণ বিচারে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে সন্ধি সমাস তদ্ধিতের প্রত্যয়ে শব্দের নানারকম ভাঙাগড়া চলে। স্বপ্নের গঠনও এই রকম নানা হেতুর জন্য নানাভাবে নিষ্পন্ন হয়।

(১) সংক্ষেপণ বা condensation। স্বপ্নের ভাবনাংশ হয়তো খুবই বিস্তৃত, কিন্তু ঘটনাংশ সাঙ্কেতিক (সর্টহ্যাণ্ড) লেখার মত খুবই ঘনীভূত আকারে দেখা দিতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের ঘটনা বেশ বিস্তৃত ও বহুকালস্থায়ী বলে মনে হলো। কিন্তু জেগে উঠেই স্বপ্নটি যদি আদ্যোপান্ত মনে পড়ে, তখন দেখা যাবে যে কাহিনী বা ঘটনাটি খুবই ছোট। মনে হবে, যেন স্বপ্নের অনেক কিছু ভুলে যাওয়া হয়েছে। বিশ্লেষণ করার ফলে যখন ভাবনাংশ ধরা পড়ে তখন দেখা যায় যে, সেটা সত্যিই ঐ রকম সংক্ষিপ্ত—ঘটনাংশের একটি নির্যাসিত রূপ। স্বপ্নের ঘটনাকে স্বপ্নমূল ইচ্ছাটির (Dream-wish) বিশদ কীর্তি বলা যায়। কিন্তু ঘটনার প্রত্যেকটি বিষয় মূল-ইচ্ছার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। ঘটনার মধ্যে অনেক অতিরঞ্জন, অনেক অবান্তর বিষয় প্রশ্রয় পায়। স্বপ্নের নিহিতার্থে বা ভাবনাংশের মধ্যে এইসব অবান্তর দৃশ্য ও বিষয়গুলির কোন তাৎপর্য নেই।

এই সিদ্ধান্ত থেকে, আর একটি নূতন সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

(২) অপসারণ বা Displacement। সম্পূর্ণ স্বপ্নচক্রের কেন্দ্রটি যেন অন্য কোথাও বা একটু দূরে সরে রয়েছে। কেননা, স্বপ্নের ঘটনাবৃত্ত এমন সব ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গড়ে

উঠেছে যেটা স্বপ্নের ভাবনাংশ (বা সত্যিকারের কেন্দ্রীয় সত্য) নয়।

স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের এই এক অদ্ভুত রহস্য। বোঝা যাচ্ছে যে এর পেছনে একটা তীব্র মানসবৃত্তির খেলা চলেছে। কিন্তু স্বপ্ন যেন গূঢ় মানসবৃত্তির দাবীগুলিকে উপেক্ষা ক'রে আজেবাজে ঘটনা দিয়ে তার কাহিনী তৈরী করে। এই অপসারণ (বা Displacement) আসলে স্থান বদলের (transference) ব্যাপার। কিসের অপসারণ? কারা পরস্পর স্থান বদল করে?

ফ্রয়েড বলেন : মানসবৃত্তি স্বপ্নে ঘটনার দাবী করে। ঠিক কথা, গুরু বা গূঢ় মানসবৃত্তি স্বপ্নে গূঢ় বা গুরু ঘটনা দাবী করবে--এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তা হয় না। বরং কতগুলি লঘু ঘটনা স্বপ্ন-বৃত্তান্তে স্থান লাভ করে বসে। অর্থাৎ লঘু মানসবৃত্তিটাই প্রাধান্য পায়। ব্যাপারটাকে বলা যায়--ক্ষুদ্রের প্রভূত্ব।

আগেই ডাক্তার ফ্রয়েডের মারফত আমরা জেনেছি যে, স্বপ্নের স্বাভাবিক পরিণতিকে বিকৃত করে দেয় সেন্সর! সুতরাং এই পর্যন্ত এসে, স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের পেছনে যে দুই কারিগরের কেরামতীর পরিচয় পাওয়া গেল—তাদেরও সেন্সরের আজ্ঞাবাহক ভৃত্য বলা উচিত। স্বপ্নের সংক্ষেপণ ও অপসারণ—এই দুই ক্রিয়ার কর্তা হলেন সেন্সর।

স্বপ্নবৃত্তান্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সঙ্গে আমরা এইবার একটা ধারণা স্পষ্ট করে নিতে পারি।—স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক খোসা ছাড়িয়ে ফেলার পর আসল অর্থের শাঁসটুকু দেখা দেয়। একটি অন্তঃসারের চারদিকে নানা অবান্তর আবরণ জড়িয়ে যেন স্বপ্নবৃত্তান্তটি গড়া। পালটিয়ে বলা যায় ; স্বপ্নবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে আসল ভাবিত স্বপ্নে পরিণত হয়। কিন্তু তার আগে, স্বপ্নের উপকরণগুলির (ঘটনাবলী) আবেগ-স্ফূর্তি অপসৃত হয় : ফলে স্বপ্ন যেন নতুন করে তার উপযোগী উপকরণ যাচাই-বাছাই (transvaluation) করে নেয়। স্বপ্নে এই যে ভাবনার অদল-বদল হলো তাকে নিছক বিচ্ছিন্নতা বলা যাবে না। ভাবনা তার প্রাথমিক সংস্থানের সঙ্গে এক অনুষঙ্গের (Association) সূত্রে যোজিত থাকে।

আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় : স্বপ্নের ভাবনাংশ (যাকে স্বাপ্নাধার বলা যেতে পারে) থেকে এক একটা আবেগ বিচ্ছুরিত হচ্ছে—সুষুপ্তিলোকের তমিস্রার মধ্যে যেন তারা আকুল হয়ে অভিসারে বার হয়েছে। তারা চায় অভীপ্সিতের সঙ্গে নিগূঢ় মিলন—চায় তৃপ্তি। তাই স্বপ্নের মধ্যে আবেগগুলি সরাসরি একটা সুস্পষ্ট তৃপ্তি ও সম্ভোগের কাহিনী রচনা করবার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু স্বপ্নপুরীর দ্বারপাল সেন্সর কাহিনীর ভেতর আবেগগুলিকে এরকম বে-আব্রু হয়ে আত্মচরিতার্থতা লাভ করতে দিতে রাজী নয়। অগত্যা স্বপ্ন এমন একটা কারসাজি করে বসে যার তুলনা হয় না। স্বপ্ন কামুফ্লাজের আশ্রয় নেয়।

তৃপ্তিপ্রয়াসী এইসব গূঢ় ও তীব্র আবেগগুলি সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে যায়। যোদ্ধারা যেন বীরসাজ খুলে ফেলে। তার বদলে দেখা দেয় নতুন কতগুলি আবেগ—নিরীহ ও দীনহীন, তাদের উদ্দেশ্য তথৈবচ। সেন্সর এদের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলে না। উপমা দিয়ে বলতে হয়, সেন্সর যেন স্বপ্নদুর্গের তোরণ-দ্বারে দাঁড়িয়ে আবেগগুলিকে নিরস্ত্র করে নিয়ে তবে তাদের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয় ; আবেগগুলির গা থেকে গূঢ় উদ্দেশ্যমুখীন স্ফূর্তিকে নামিয়ে ফেলে দেওয়া হয় (displacement of Psychic Intensity)। ফলে যেন স্বপ্নবৃত্তান্তে কতগুলি নতুন লঘুস্ফূর্তির আবেগ স্থান পেল। স্বপ্নের বৃত্তান্তের সঙ্গে মূলভাবনাটির কোন সাদৃশ্য রইল না।

জামদগ্ন্য রাম (পরশুরাম) পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন। সসৈন্যে অভিযানে বার হয়ে পরশুরাম নর্মদা নদীর তীরে এক বৃক্ষমূলে নিদ্রাযাপন করেছিলেন। রাত্রির শেষ যামে স্বপ্ন দেখলেন : "তিনি হস্তী অশ্ব পর্বত অট্টালিকা বৃষ কিম্বা ফলবান বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। কৃমিগণ তাহাকে ভোজন করিতেছে, তজ্জন্য তিনি রোদন

করিতেছেন। আবার দেখিলেন, গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। দেখিলেন, সর্বাঙ্গে যেন বিষ্ঠা মূত্র পূয লাগিয়াছে। উৎকৃষ্ট বীণাযন্ত্র বাজাইতেছেন। বকশ্রেণী ও হংসশ্রেণী উড়িতেছে। দেখিলেন, দধি, লাজ, ঘৃত, মধু, জীবিত মৎস্য, ময়ূর, সরোবর, সিংহ, সুরভিগাভী সম্মুখে রহিয়াছে। কখনো বা অগম্যা স্ত্রী-সংসর্গ করিতেছেন। তিনি পীতবর্ণের পক্ষী ও মনুষ্যগণের মাংস হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিতেছেন...।"

ব্যাখ্যাতার কাছে পরশুরামের স্বপ্ন একটি টাইপ-বিশেষ। স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের অনেক আইন-কানুন এই স্বপ্নের ভেতর আবিষ্কার করা যেতে পারে।

পরশুরামের স্বপ্নমূলে যে-ভাবনাটি সার্থকতার জন্য আবেগ বিস্তার করছে—তাকে (সুবিধার খাতিরে অনুমান করে নেওয়া যাক) বলতে পারি, এক ক্ষত্রিয়হীন ও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করা। তাই স্বপ্নে মনের আবেগ হয়তো এক দৌড়ে গিয়ে সিংহাসনে উঠে বসতে চায়। কিন্তু সেন্সর জানে যে বাস্তবে সেটা কত দুরূহ—কত কঠিন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে তবে সেটা সম্ভব হতে পারে। তাই সেন্সর এই 'সিংহাসন-বিলাসী' তীব্র আবেগকে স্বপ্নের বৃত্তান্তে স্থান দিতে আপত্তি করে। আবেগের তীব্রতা তখনি ঘুচে যায়। আবেগগুলি তারপর যেন নিরীহের মত সামান্য সব দাবী নিয়ে (হাতী-চড়া, ঘোড়ায়-চড়া, গাছে-চড়া ইত্যাদি) স্বপ্নবৃত্তান্তের ভেতর ঢুকে পড়ে। সেন্সর আর বাধা দেয় না। কেননা দাবীটা খুবই নগণ্য। স্বপ্নবৃত্তান্তের পরিণত রূপে দেখা যাচ্ছে যে স্বপ্নমূল ভাবনার সঙ্গে তার কোন ঘটনা-সাদৃশ্য নেই। তবু পরোক্ষভাবে এই নগণ্য লঘু ঘটনাগুলি (হাতী-চড়া ইত্যাদি) মূল ইচ্ছার সঙ্গে একটি অনুষঙ্গ রক্ষা করে চলেছে। পরশুরামের প্রতিষ্ঠা উচ্চাসনেই রয়েছে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে এইবার প্রতীকের কথা না বলে নিলে আর চলে না। কেউ কেউ বলতে পারেন, যে স্বপ্নে পরশুরামের হাতী-চড়া ব্যাপারটা সিংহাসন-চড়ার প্রতীক মাত্র। হতে পারে ; কিন্তু হাতী-চড়া ব্যাপারটা স্বপ্ন-নির্বিশেষে সিংহাসন-চড়ার (বা আধিপত্য লাভ) রূপক প্রকাশ বা প্রতীক নয় ; স্বপ্ন-বিশেষে হাতী-চড়ার দৃশ্য বন্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার হতে পারে ; কিন্তু ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে যাকে প্রতীক বলে, তার মূল স্বরূপ সাধারণত সর্বক্ষেত্রে এক। ফ্রয়েড এইভাবে প্রতীকের একটি তালিকা সৃষ্টি করেছেন।

উদাহরণ : স্বপ্নে জাহাজের মাস্তুল পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। প্রতীকের তাৎপর্য সম্বন্ধে আর একটু প্রণিধানের প্রয়োজন আছে। ব্যাখ্যার সময় স্বপ্ন-দেখা কোন বস্তুকে প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে সেটা সেখানে আদৌ প্রতীক হিসাবে কাজ করছে কি না। জাহাজের মাস্তুল প্রতীক হিসাবে অবশ্য সব সময়ই একই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু স্বপ্নবিশেষে জাহাজের মাস্তুল শুধু বস্তুগত অর্থ জ্ঞাপন করতে পারে। কাজেই স্বপ্নের ব্যাকরণের বস্তু কোথায় প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটা ব্যাখ্যাতা তাঁর বিচার দিয়ে বুঝে নেবেন। যেখানে বস্তু প্রতীক হিসাবে কাজ করছে না, সেখানে বস্তুর বস্তুগত অর্থ ধরে নিয়েই ব্যাখ্যায় অগ্রসর হতে হবে।

কামকলার বিষয় ও বস্তুগুলি সহজেই স্বপ্নে প্রতীকী রূপ গ্রহণ করে। প্রতীক হিসাবে কাম-প্রতীকগুলিই (sexual symbol) বেশী স্পষ্ট ও সার্থক।

স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের মধ্যে আমরা মূলত সেন্সরের প্রতিরোধ কার্যের খেলা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া আরও দুটি শক্তির প্রক্রিয়া বা প্রবণতা দেখা গেল—সংক্ষেপণ (Condensation) ও অপসারণ (Displacement)। এর পর গুরুত্বের দিক দিয়ে আরও দুটি শক্তির প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় :

(ক) ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে মূর্তি বা রূপ গ্রহণ করার জন্য একটা প্রবণতা (বা Representability)। একটা শব্দগত উপকরণ স্বপ্নে শব্দত্ব নিয়ে দেখা দিল না ; দেখা দিল দৃশ্যে চিত্রিত হয়ে (Pictorial)। কোন মামলাবাজ স্বপ্নে দেখলো যে, পথের ওপর বসে সে মোকদ্দমার নথী ঘাঁটছে। এই স্বপ্নকে তর্জমা করলে স্বপ্নার্থ দাঁড়ায় -মোকদ্দমায় হেরে যাওয়া।

'আমুককে পথে বসিয়ে দিয়েছে'—এই পদটির অনুগত অর্থ হলো হেরে যাওয়া, নিরুপায় হওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া ইত্যাদি। স্বপ্নের মধ্যে 'পথে-বসা'র শব্দগত প্রকাশ শ্রুতিচ্ছবি সৃষ্টি করেনি—করেছে চাক্ষুষ (Visual) দৃশ্য। স্বপ্নে পথে-বসে পড়ার ব্যাপারকে চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

(খ) স্বপ্নের বাহ্যিক গঠন দুর্বোধ্যতা পরিহার করে চলবার চেষ্টা পায়। এটা অবশ্য সাধারণ সত্য নয়।

স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের রীতিনীতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বরাবর দেখে আসছি যে স্বপ্নের ভাব-বিষয় ও বৃত্তান্ত-বিষয়ের মধ্যে রূপগত একটা পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করার অর্থই হলো স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের (Dream-work) নির্ণয়। আমরা দেখেছি যে স্বপ্নের ভাববিষয়ের শব্দগত উপকরণ চাক্ষুষ প্রতিচ্ছবিতে বিমূর্ত হয়। এখানে এসে স্বপ্ন-প্রকৃতির আর একটি নতুন তত্ত্বের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যাগতি বা Regression-এর কথা এসে পড়লো।

(৩) প্রত্যাগতি Regression। অজ্ঞাত মন থেকে আবেগীভূত ইচ্ছা সজ্ঞান (জাগ্রত) মনে যখন প্রকাশ লাভের চেষ্টা করে, তখন এই মানসিক ক্রিয়াকে আমরা 'গতি' (Progress) আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু এর উল্টো ব্যাপার হলে, অর্থাৎ সজ্ঞান জাগ্রত মনের (চেতন) চিন্তা যদি অচেতনতার দিকে ধাওয়া করে, তবে তাকে প্রত্যাগতি (Regressive) অবশ্যই বলতে হয়। সুতরাং, সে হিসাবে স্বপ্নের ধর্ম গতিশীল নয় ; বলতে হয়—প্রত্যাগতিশীল। জাগ্রত অবস্থাতেও যখন কোন বিষয়ে স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন চলতে থাকে, তখন মনোযন্ত্রটির কাজ করার কায়দা আমরা লক্ষ্য করেছি : ভাবনা-বিষয় থেকে যেন একটা সাড়ার তার মনের স্তরের পর স্তর ভেদ করে ভেতরের দিকে (পশ্চাতে-অতীতে) চলে যেতে থাকে। শেষে যেন একটা স্টেশনে এসে থামে। এই স্টেশন হলো উক্ত ভাবনা-বিষয়ের প্রাক্তন উপাদানসমূহের স্মৃতিচিহ্ন। যে কাঁচামাল থেকে ভাবনা-বিষয়ের (Ideational content) সৃষ্টি হয়েছিল—এই প্রত্ন-মানসিক অনুসন্ধানে যেন তার নিদর্শন উদ্ধার করা হলো। কিন্তু জাগ্রত চিন্তার সীমানা এর বেশী নয়। আরও পিছনের দিকে যাবার ক্ষমতা তার নেই।

কিন্তু স্বপ্নে? স্বপ্নেতে মনের কলে যে সাড়া জেগে ওঠে, তার কাজ আরও অন্তর্ভেদী। চিন্তার অভিযান শুধু স্মৃতিচ্ছবির স্টেশন পর্যন্ত এসে থেমে যায় না। এহ বাহ্য। স্বপ্নচর চিন্তা আরও গভীরে চলে যায়, দূর অতীত-জীবনের এক ঝাপসা অনুভবের দেশে ; সেদেশের রূপ শুধু কতগুলি বোধচ্ছবি (Perceptual Image) দিয়ে তৈরী কাঁচা হাতে গড়া এক অপোগণ্ড শিল্পীর কীর্তি। মানুষের শৈশব একদিন মনের গহনে এই পারাবারের তীরে শুধু বালু নিয়ে খেলা করে গিয়েছে। সেখানে বুদ্ধির সূর্য দেখা দেয়নি, সংস্কারের চাঁদের আলো ছিল না—এক আদিম জৈব বোধ দিয়ে সেদেশের বন নদী পাহাড় গড়া রয়েছে। কর্ণের কথার মধ্যে তার পরিচয় কিছুটা ফুটে উঠেছে—

গেছ মোরে লয়ে
কোন মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনা প্রত্যূষে। পুরাতন সত্য সম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্তে মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।

বাগানে গাছের ঝোপের আড়াল থেকে এক অদৃশ্য পাখীর শিষ বয়স্ক মানুষের কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে একটা বোধচ্ছবি জাগ্রত করে। কিন্তু একে ঠিক বোধচ্ছবি

বলা উচিত নয়—এটা ভাবচ্ছবি। সবুজ পত্রগুচ্ছের মাঝে একটি শ্যামা পাখীকে সে তার মনের ভেতরেই অনুভবের মধ্যে দেখতে পায়। কিন্তু শিশুবয়সে কখনই এই ভাবচ্ছবি সম্ভব হতো না। ভাবচ্ছবি গড়বার মত এতখানি মানসিক উপকরণ সে-সময়ে ছিল না। পাখীর শিষ শুনে ইন্দ্রিয়ের সাড়ার ফলে তখন একটা বোধচ্ছবি তৈরী হতো শুধু। সেই বিস্মৃত শৈশব অভিজ্ঞতার বোধচ্ছবি আজকের পরিণত ভাবচ্ছবিরই যেন ভ্রূণমূর্তি। স্বপ্নের চিন্তায় ভাবনা-বিষয় বিশিষ্ট হয়ে এই প্রাক্তন বোধচ্ছবিকে জাগ্রত করে। এই ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রত্যাগতি (Regression) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

স্বপ্নে পাওয়া শৈশবের এই বোধচ্ছবির মধ্যে ডাক্তার ফ্রয়েড (এবং আরও অনেকে) মানুষ জাতির শৈশবের ইতিবৃত্ত খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন এই বোধচ্ছবিগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারলে সমস্ত মানুষ জাতির জীবনের অতি প্রাচীন ইতিহাসের রূপ জানতে পারা যাবে।

(৪) স্বপ্নের রাগ-বিষয় (বা প্রভাব বা Affect)। স্বপ্নে দেখা গেল—ঘরে ডাকাত পড়েছে, সর্বস্ব লুট করে নিচ্ছে, ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। মনোবিজ্ঞানী বলবেন, এক্ষেত্রে স্বপ্নের ডাকাত তো সত্যিকারের ডাকাত নয় ; বাস্তবতার রক্তমাংস দিয়ে এই ডাকাতের শরীর তৈরী নয়। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার ভয়টা বাস্তব, সত্যিই তার বুক ভয়ে দুরুদুরু করে কাঁপছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর, ডাকাতেরা হয়তো স্বপ্নের সঙ্গেই উপে যাবে ; কিন্তু মনের ত্রাস তখনো কিছুক্ষণ বুক কাঁপতে থাকবে।

ফ্রয়েড বলছেন—ঘরে ডাকাত পড়েছে, এই স্বপ্ন দেখে যদি স্বপ্নদ্রষ্টা লজ্জা পেতে থাকে, তাহ'লেও বলতে হবে—লজ্জাটা মিথ্যা নয়। বরং লজ্জাই একমাত্র বাস্তব সত্য। অনেক সময় লোকে স্বপ্নের ভেতর খুবই করুণ ও বেদনাকর দৃশ্য দেখে, তবু অনুভূতির দিক দিয়ে নির্বিকার ও অবিচল থাকে। সেই করুণ দৃশ্যটা যেন তার মনের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করলো না। দৃষ্ট বিষয় থেকে কোন অনুরাগ বা বিরাগ মনের ওপর সঞ্চারিত হলো না। এ কি করে সম্ভব? জাগ্রত অবস্থায় কোন দৃশ্যকে এইভাবে ভাগ করে দেখা সম্ভব হয় না। করুণ দৃশ্য দেখলে করুণ ভাবের উদ্রেক করবে, হাস্যকর দৃশ্য দেখলে হাসি আসবে নিশ্চয়। কিন্তু স্বপ্নেতে বিষয় যেন মাঝে মাঝে প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। কেন?

উত্তর : স্বপ্নে বৃত্তান্তগুলির গূঢ় মানসিক আবেগ (বা Psychic Intensity) বিচ্যুত হয়। প্রসঙ্গক্রমে স্বপ্নগঠনে এই কারিগরীর কথা আগেই কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। অপসারণ (বা displacement) প্রক্রিয়ার কারণ বর্ণনার মধ্যে আমরা কাহিনীর এই ধরনের আবেগচ্যুতির ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। স্বপ্নে যেন কাহিনীর পায়ের নূপুর উদ্দাম হয়ে উঠলো, অথচ তার রুনুঝুনু রম্যনিনাদ শোনা গেল না—এরকম ব্যাপারও লক্ষ্য করা গেছে। অপসারণ প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে এক্ষেত্রেও বলা যায় যে, দৃশ্যটা করুণ বটে, কিন্তু তার করুণতাটুকু যেন খসে গেছে।

ডাক্তার ফ্রয়েড আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন : তা নয় হলো, কিন্তু এর ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় কেন? স্বপ্নেতে কেউ কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল, কিন্তু দেখা যায় কাহিনীর ভেতর আদৌ কাঁদবার মত কোন ঘটনাই নেই।

স্বপ্নব্যাখ্যাতার আসল কাজ হলো স্বপ্নের নিহিত (latent) বিষয় উদ্ধার করা। স্বপ্নমূল (ভাবনা-বিষয়ে বা নিহিত বিষয়ে) পৌঁছতে পারলে দেখা যাবে যে, সেখানে স্বপ্নের রাগ-বিষয় অক্ষুণ্ণ আছে। অপসারণ ব্যাপারে স্বপ্নের ভাবনা-বিষয় (Ideational content) স্বপ্নবৃত্তান্তে (প্রকট বিষয়ে) প্রবেশ করার সময় রূপান্তরিত হয়। আলোচ্য স্বপ্নের রূপান্তরের মধ্যে মূল রাগ-বিষয়টি (Affect) কিন্তু পরিবর্তিত হয়নি। সে স্বপ্নমূলে যেমনটি ছিল বৃত্তান্তেও সেই ভাবে ও রূপে ঢুকে পড়েছে—রাগ-বিষয় অবিকৃত আছে।

স্বপ্নের বৃত্তান্তের সঙ্গে রাগ-বিষয়ের এই বেখাপ্পা সম্বন্ধ এইবার বুঝতে পারা যায়। ঘরে ডাকাত পড়েছে—স্বপ্নের এই বৃত্তান্তের মধ্যে ভীত হবাব কারণ রয়েছে, লজ্জিত হবার কিছু নেই। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা যদি সত্যিই লজ্জিত হয়, তবে বুঝতে হবে যে কাহিনীটির ভাবনাংশে (Latent বা thought-content) লজ্জিত হবার একটা মূল কাহিনী লুকিয়ে আছে। বৃত্তান্তে বদলি হবার সময় কাহিনীর ঘটনা-রূপ ভিন্ন রকমের হয়ে গেছে, কিন্তু রাগ-বিষয়টি অবিকৃত রয়ে গেছে।

দৃশ্য-বিষয় (Conceptual Content) ও রাগ-বিষয়ের (Affectual Content) মধ্যে বিসদৃশ্যতা বা অসঙ্গতির রহস্য হলো এই। সেন্সরের রক্তচক্ষুর শাসনের দাপটে কাহিনী ডিগবাজি খেয়ে ভোল ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু মূল রাগ-বিষয় সেই শাসনের ধার ধারে না। সেন্সরকে উপেক্ষা করে রাগের ঢেঁকি বৃত্তান্তের স্বর্গে এসেও তার স্বভাবের নিয়মে ধান ভানতে থাকে। স্বপ্নের-মূল ভাবনাংশে হয়তো ব্যাপারটা নিজের বিয়ের কাহিনী ছিল, তার জন্য লজ্জা পাওয়ার কারণ ছিল। কিন্তু ভাবনাংশ বৃত্তান্তে বদলি হবার সময় সেন্সরের প্রকোপে বিকৃত হয়ে বা ছদ্মবেশ নিয়ে ঘরে-ডাকাত-পড়া'র কাহিনী গ্রহণ করেছে। তবু দেখা গেল, মূল ভাবনাংশের রাগ-বিষয়টি (অর্থাৎ লজ্জার ভাবটি) রূপান্তরিত হয়নি।

কিন্তু এটা আংশিক সত্য মাত্র ; সেন্সর স্বপ্নের মূল ভাবনাংশের লজ্জার ভাবটিকে নিরীহ মনে করে বৃত্তান্তে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। সেন্সর যদি বিরুদ্ধে থাকতো, তবে লজ্জার ভাবটিকে অর্থাৎ রাগ-বিষয়টিকেও রূপ বদলাতে হতো। এটা সেন্সরের পরীক্ষাকে এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করার নমুনা নয়। সেন্সর ঐ রাগ-বিষয়টি আপত্তিজনক মনে করেনি, তাই বাধা না দিয়ে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে।

এইবার ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তটিকে সংক্ষেপে বলে নিতে পারা যায় : স্বপ্নবৃত্তান্তে যখনই যে ধরনের রাগ-বিষয় (শোক হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি) দেখা যায়, স্বপ্নের ভাবনাংশে অবিকল সেই রাগ-বিষয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

এইখানেই চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেল মনে করলে ভুল হবে। রাগ-বিষয়ের সম্পর্কে আরও জানবার আছে।

ঐ সিদ্ধান্তকে পালটিয়ে যদি বলা যায় : স্বপ্নের ভাবনাংশে যে যে রাগ-বিষয় থাকবে, সেটাও বৃত্তান্তে অবশ্য দেখা দেবে। ডাক্তার ফ্রয়েড বলেছেন : না, এরকম সিদ্ধান্ত করা যায় না। স্বপ্নের ভাবনাংশ সব সময় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৃত্তান্তে অবিকল ভাবে প্রবেশ লাভ করবে এমন কোন নিয়ম নেই। এমন স্বপ্নও দেখা যায় যে, যার বৃত্তান্ত থেকে কোন রাগ-বিষয় উৎসারিত হয় না (Indifferent Dream) । এই ধরনের স্বপ্নগুলির যেন ভালমন্দ কোন স্বাদই নেই।

এক্ষেত্রে বললে হয়, স্বপ্নমূলের রাগ-বিষয় যেন সেন্সরের প্রকোপে চাপা পড়ে গিয়েছে।

স্বপ্নগঙ্গার একেবারে গোমুখীতে গিয়ে আমরা কি দেখতে পাই? অজস্র নিরুদ্ধ চিন্তা মুক্তি পেয়ে যেন এক তৃপ্তি-আকুল ইচ্ছার স্রোত সৃষ্টি করছে। এই ইচ্ছার পথে পথে সেন্সরের উপল-বন্ধুর বাধা। ইচ্ছার স্রোত নানা বাঁকাচোরা পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইচ্ছার প্রসূতি চিন্তাগুলির রূপও একেবারে শুদ্ধাদ্বৈত নয়। প্রত্যেক অজ্ঞাত চিন্তার সঙ্গে বিপরীত-ধর্ম বৃত্তিও যুক্ত হয়ে থাকে (Contradictory counter-part)। ফলে, স্বপ্নের মূল ভাবনার কেন্দ্রে অজ্ঞাত চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে নানারকম বিরোধিতার দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া চলে। একটি অজ্ঞাত ইচ্ছার অপরটির ওপর জোর ফলিয়ে দমিয়ে দিতে চায় ; কেননা প্রত্যেক অজ্ঞাত ইচ্ছার লক্ষ্য এক নয়। একটি অজ্ঞাত ইচ্ছা হয়তো অভিমানের ভেতর দিয়ে সার্থক হতে চায় ; সেই সঙ্গে আর একটি অজ্ঞাত ইচ্ছা অহংকারের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতার জন্য এগিয়ে আসে। ফলে অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি চরিতার্থতার পথে পরস্পরকে বাধা দিতে থাকে—নিরোধ করে। এর

মোটামুটি ফল দাঁড়ায়—রাগবিষয়ের কাটাকুটি হয়ে গিয়ে (অভিমান—> <—অহঙ্কার) শূন্যত্বপ্রাপ্তি অথবা নিরোধ।

ডাক্তার ফ্রয়েড আর একটা কথা বলে নিয়েছেন। নিরোধের ফলে রাগ-বিষয় মাঝে মাঝে বিপরীত রূপে প্রকাশ লাভ করতে পারে (Inversion)। সামাজিক নীতিতত্ত্বে 'ভণ্ডামি' নামে আচরণের প্রকৃতি ও গঠন যে ধরনের, রাগ-বিষয়ের বিপরীত রূপ গ্রহণও সেই রকম। 'হাসি মুখে ছুরি মারা' কথাটার মধ্যে রাগ-বিষয়ের এই বিপরীত রূপ ধরনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ছুরি মারার সময় মনোভাবের উগ্র নিষ্ঠুরতার বাহ্যিক প্রকাশ উল্টে গিয়ে উজ্জ্বল হাসিতে দেখা দিয়েছে।

লোকে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্ন দেখে ; আবার এমন ব্যাপারও দেখা যায় যে, স্বপ্নই যেন ঘুম ভেঙে দিচ্ছে। যাকে বলে—স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা। একবার ঘুম ভেঙে যাবার পর স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করা নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হয়। স্বপ্নের সব ঘটনা স্মরণে আসতে চায় না।

কোন কোন লোক আছেন—যাঁরা বলেন যে, স্বপ্ন দেখেন না। তাঁরা নাকি নিরেট একখানি স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমিয়ে নেন।

এই দুই শ্রেণীর বক্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে স্বপ্নের বিবরণ জাগ্রত চিন্তায় স্মরণ করা সহজসাধ্য কাজ নয়। যাঁরা স্বপ্নবৃত্তান্ত একেবারে ভুলে যান, তাঁরাই বলেন যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেননি। যাঁরা স্বপ্ন স্মরণ করতে পারেন, তাঁদেরও বক্তব্যে গোলমাল থাকে। স্বপ্নের বৃত্তান্ত আগাগোড়া সবই মনে আছে—অনেকে নিজের সম্বন্ধে এই রকম অভিমত ব্যক্ত করেন। এটাও ভুল। আসল কথা হলো, জাগ্রত চিন্তায় স্বপ্নের স্মৃতি আদ্যোপান্ত চিত্রিত করা যায় না। স্বপ্নের অনেক দৃশ্য ও ঘটনা জাগ্রত চিন্তায় স্মরণ-সাধনায় উহ্য থেকে যায়।

ফ্রয়েড বলেন, স্বপ্নবৃত্তান্তকে জাগ্রত চিন্তার স্মরণ থেকে মুছে ফেলার এই কীর্তি হলো সেন্সরের। সেন্সরের শাসনবিধানে জাগ্রত চিন্তা যেন একটি নিষিদ্ধ এলাকা—স্বপ্নের কোন জীবের পক্ষে সেখানে ইচ্ছামত প্রবেশের অনুমোদন নেই।

কিন্তু স্বপ্ন ব্যাখ্যাতার কাজই হলো পতিতোদ্ধার ; সেন্সরের সব প্রতিরোধের আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিয়ে বিস্মৃত বৃত্তান্তকে আবার স্মরণের পথে টেনে আনা। তাই দেখা গেছে যে প্রথমে ভুলে গেলে চেষ্টা করে স্বপ্নকে হুবহু স্মরণ করা যায়। ব্যাখ্যাতার প্রয়োজন মূল স্বপ্নের ভাবনাংশ নিয়ে। ব্যাখ্যাতাকে এখানে অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিকের মত মানসগর্ভের সমাহিত তত্ত্বকে উদ্ধার করতে হয়।

গল্প আছে, এক রোমান সম্রাট তাঁর জনৈক প্রজাকে প্রাণদণ্ড দান করেন। বেচারা প্রজা স্বপ্ন দেখেছিল যে, সে সম্রাটকে হত্যা করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ঐ রোমান সম্রাটের বিচারকে কখনই সমর্থন করবে না। কেননা, স্বপ্নতত্ত্ব এত ঋজু সরল ও স্পষ্ট নয়। স্বপ্নে হত্যা করার নিহিত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হতে পারে।

প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতেরা সকলেই স্বপ্নতত্ত্বের অর্থ নিয়ে চিন্তা করেছেন। সফল স্বপ্ন ও বিফল স্বপ্ন নামে দুটো শ্রেণীভেদ করবার চেষ্টা প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিকদের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়।

নিদ্রায়াং নিশ্চলীভূতে চিত্তেইভীষ্টং প্রবিশ্য যৎ।
ভাব্যং সূচয়তি স্বপ্নঃ সদ্যঃ প্রত্যক্ষতো যতঃ।।

'নিদ্রাকালে চিত্তের নিশ্চল অবস্থায় অভীষ্ট প্রবেশ করে'—প্রাচীন মতের এই প্রথম অংশটুকু বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। কিন্তু পরের অংশটুকু, অর্থাৎ—'সেই অভীষ্ট ভবিষ্যৎ সূচনা করে, তাহা সদ্য এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ' ; এই উক্তির মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধি নেই। স্বপ্নের মধ্যে অতীতের পরিচয় রেকর্ড করা হয়েছে। স্বপ্ন মানসিক চরিত্রের ঐতিহ্যের পুষ্টি। ফ্রয়েড বলেন—স্বপ্নে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত একেবারে যে নেই ; তা নয়। অথচ তিনি বিশেষ জোর দিয়ে

বলেছেন যে, মনের জগতের সত্য (Psychic Reality) আর বাস্তব জগতের সত্য (Material Reality), দুই ভিন্ন বিষয়।

ডাক্তার ফ্রয়েডের এই বক্তব্যের অর্থ বিশেষ প্রণিধান করে বুঝতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবে তৈরী মানসিক চরিত্রের একটা বর্তমান অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। যদি বর্তমানকে বোঝা যায়, তবে তার ভবিষ্যৎ পরিণামের একটু আভাষ ইঙ্গিতও অনুমান করা সম্ভব। ডাক্তার ফ্রয়েডের নথি থেকে, একটি মেয়ের বিয়ের আংটী হারিয়ে ফেলার স্বপ্ন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্লেষণে বোঝা গেল যে, মেয়েটি তার স্বামীর স্বামিত্বের ওপর প্রসন্ন নয়। মেয়েটির গোপন ইচ্ছা এই বিয়েকে অস্বীকার করতে চায়। বাস্তবে দেখা গেল, ক'বছর পরেই তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো। সুতরাং বলতে ইচ্ছা করে, স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিল।

কিন্তু ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন পাওয়া কঠিন। উক্ত উদাহরণে স্বপ্নে ও বাস্তবে একটা কাকতলীয় মিল হয়েছে মাত্র। ফ্রয়েডের বিচারের সূত্র ধরে বলা যায় যে, স্বামীর প্রতি একটা বিরুদ্ধ মনোভাব যখন অজ্ঞাত মনে দমিত অবস্থায় রয়েছে, তখন সে মনোভাব অজ্ঞাত মনের ভেতরেই সার্থক হবে অর্থাৎ সে বিবাহবিচ্ছেদের স্বপ্ন দেখবে।

সুতরাং স্বপ্নের ঘটনার মধ্যে যে ভবিষ্যৎ সূচিত হয়—সেটা স্বপ্নেরই ভবিষ্যৎ। বাস্তবে স্বপ্ন সফল হয় না।

আসক্তি ও আসঙ্গ

কামপ্রবৃত্তির গঠন—কামাস্পদের প্রয়োজন—অপচার (Perversion) কাকে বলে- ব্যক্তিকে ও অপচারে পার্থক্য—শিশুর কামকলার ইতিকথা—ইদিপাস উপাখ্যান—ইলেক্‌ট্রা উপাখ্যান—বয়স্ক জীবনে কামপ্রবৃত্তির শিশুয়ালি (Infantilism)

পৃথিবীর কবিরা অনেকদিন আগে থেকেই মুস্কিলে পড়ে গেছেন; তাঁরা বুঝেছেন যে, কাব্যের নায়ক নায়িকাদের পীরিতির রীতি কোন শাসন সংযত করে রাখা একরকম অসাধ্য ব্যাপার। 'প্রীত না মানে জাত কুজাত'—এই একটা একগুঁয়ে সত্যের দক্ষিণা ঝড় তাঁদের সাজানো প্রেমের বাগানে অনেক নিষিদ্ধ অনুরাগের ফুল ফুটিয়েছে, আবার অনেক বিহিত মিলনের কুঞ্জশোভা নষ্ট করে দিয়েছে। ডাক্তার ফ্রয়েডও একই তত্ত্বের আবৃত্তি করেছেন আরও গভীরে এসে—কামাবেগের নিছক দৈহিক আচরণের তথ্যে এসে। তিনি বলেন, কামবেগ বা যৌনপ্রবৃত্তির (Sexual Instinct) রীতিও ঐ ধরনের ; তার চরিতার্থতাব জন্য অবশ্য একটা আস্পদ দরকার, কিন্তু তার জন্য জাত-কুজাতের বিচার তো নেই-ই--সম বা বিষম কারণশরীরী, ইতর প্রাণী, জড় বস্তু অথবা নিজের দেহ, এর মধ্যে যে-কোন একটি তার রমণ-বিষয় (Sexual Object) হয়ে উঠতে পারে। মানুষের বিবিধ ও বিদ্‌ঘুটে যত কামঘটিত অপচারের (Perversion) ইতিবৃত্ত পরীক্ষা করে তিনি বুঝেছেন যে যৌনাবেগ চরিতার্থতার জন্য নর-নারী মাত্রই তার বিপরীত কারণ-শরীরীকে আস্পদ হিসাবে গ্রহণ করে, একথা লোকময় সত্য নয়। অনেকের আচরণ ও মনোবৃত্তির মধ্যে সম-কামিতার (Homo-Sexuality) উপসর্গ দেখা যায়। লৌকিক রুচিতে বা অমার্জনীয় এমন অনেক কামাপচার কোন কোন ব্যক্তিকে গর্হিত অপরাধ-সেবার মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। পশু-সংসর্গ পর্যন্ত মানুষের কামাপচারের কবল থেকে রেহাই পায় না। অসঙ্গ-সঙ্গমের (বা Masturbation) প্রকোপ বয়স বিশেষে দেখা যায় এবং কোন কোন লোকের অভ্যাসে স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে বহু বুদ্ধিমান অপচারী বদমাস তাদের কদর্য যৌনচর্চাকে একটা বিকৃত ধার্মিকতার ভড়ং দিয়ে গুরু বা সিদ্ধ সাধক সেজে থাকে এবং তারই সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রবৃত্তির বিক্ষেপ তুষ্ট করে। অপচারীদের মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করে ফ্রয়েড দেখতে পেয়েছেন যে, রমণেপ্সা চরিতার্থ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন আস্পদ নেই। একটু বেশী প্রশয় নিয়ে বলা যায়--মানসিকতা বুঝে যে কোন বস্তু লোকের কামাস্পদের স্থান গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে--আস্পদবিশেষের মধ্যে নিহিত কোন গুণ নেই, যা কামভাবের উদ্রেক করে। কামাবেগ আস্পদ-নির্ভর নয়--আস্পদনিরপেক্ষ বলা যায়। কামাবেগ স্বতঃ উৎসারিত হয়ে তার নিজের খেয়ালে কোন বিষয়কে (নর-নারী, জীব,বস্তু ইত্যাদি) শৃঙ্গার-সহচর হিসাবে বেছে নেয়। সিদ্ধান্ত হলো : কামাবেগ একটি আস্পদনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি।

আর একটা প্রমাণ আছে। যারা সামাজিক আচরণে অস্বভাবী (Abnormal) তারা সকলেই কামপ্রবৃত্তিতে অস্বভাবী। কিন্তু এমন অনেক লোক দেখা গেছে যে, তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে কাম-মানসিক জীবনে (গোপনে) অত্যন্ত বিকৃতরুচি কিন্তু বাহ্যত দশজনের সঙ্গে মেলামেশায় ও আচরণে আর সকলেরই মত স্বাভাবিক। শিক্ষা দীক্ষা ও কৃষ্টির দিক দিয়ে কারও চেয়ে হীন না হয়েও, কামুক জীবনে যেন তাঁরা ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রেখে চলেন না। বোঝা যাচ্ছে, কামের আস্পদ কামরীতির বড় কথা নয়। কাম যেন এক স্বপ্রধান প্রবৃত্তিবান সত্তা। কোন নীল শাড়ির মধ্যে এমন কোন শক্তি লুকিয়ে থাকে না, যা দেখা মাত্র মনকে নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলে যাবে। মন নিজের গুণে তাকে আপন করে নিয়ে আঁচলে বাঁধা পড়ে।

ডাক্তার ফ্রয়েড তারপর প্রমাণ করেছেন যে কামাবেগ তুষ্ট করার জন্য সর্বথা জননাঙ্গ ব্যবহারের প্রয়োজন না হতে পারে। অপচারীদের ক্রিয়াকলাপ থেকেই তিনি এইসব প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। অন্যতর যে কোন একটি ইন্দ্রিয় রতিসুখের সাড়া যোগাতে পারে এবং অপচারী মানুষের তাতেই তৃপ্তি চরম হয়ে ওঠে। দক্ষস্মৃতিতে অষ্টবিধ মৈথুনের তালিকা দেওয়া হয়েছে :

স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্
সংকল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ।।

তত্ত্বের দিক দিয়ে ফ্রয়েডের অভিমত মোটামুটি এই স্মৃতিবচনের সঙ্গে মিলে যায়। যৌন সংস্রব না রেখেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কীর্তির ফলে একই ধরনের প্রসন্নতা অনেক অপচারী লাভ করে থাকে। কেউ শুধু দেখেই সুখী (Voyer বা দৃষ্টিরমণ), কেউ বা একটুখানি পরশের কাঙালি শুধু (Toucher বা স্পর্শ-রমণ) আবার এমন কেউ আছেন যিনি শুধু চুম্বনের মাঝেই হারিয়ে যেতে জানেন। অর্থাৎ দর্শন চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি যেসব গৌণ আচরণ কামের নর্মানুষঙ্গ মাত্র--যাদের কাজ যৌনাসঙ্গকে আয়োজনে উদ্বোধিত করা, তারাই মাঝপথে দাঁড়িয়ে নিজেরাই মুখ্য পরিণাম হয়ে ওঠে।

এতদুর এসে ফ্রয়েড দুটি পদ্ধতি লক্ষ্য করলেন : (১) অপচারীদের কামপ্রবৃত্তি জননাঙ্গের ওপর নিষ্ঠা রেখে চলে না। তারা সদসৎ অবয়ব বিচার করে চলে না (দৃষ্টান্ত সমকামিতা)। (২) পূর্ণাঙ্গ যৌন-সংস্রবের বালাই না রেখে ইন্দ্রিয়জ গৌণ সাড়াগুলির মধ্যেই তাদের রতিসুখ লাভ হয়।

প্রবৃত্তির চর্চায় স্বাভাবিক মানুষ ও অপচারীদের মানসিকতার মধ্যে গুণগত আসল পার্থক্য কোথায়? ঘৃণা লজ্জা ভয়--এই তিন বাধাকে অপচারীরা অতিক্রম করতে পারে, রুচিবান মানুষ পারে না। যেসব আচরণের জন্য অপচারীদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান লোলুপ হয়ে রয়েছে, সভ্যভব্য মানুষের কাছে সেসব আচরণ ন্যক্কারজনক। স্বাভাবিক সুস্থকাম মানুষের প্রবৃত্তির উৎপাত এই সব 'প্রতিরোধের' (ঘৃণা লজ্জা) শাসনে সুসংযত থাকে।

অপচারীদের কীর্তিকলাপ পরীক্ষা করে ডাক্তার ফ্রয়েড কাম প্রবৃত্তি সম্বন্ধেই নির্বিশেষ

একটা সিদ্ধান্ত করেছেন : কামপ্রবৃত্তি একটা অবিভাজ্য ঐকিক আবেগ নয়। বহুবিধ উপ-আবেগের সমন্বয়ে এর প্রকৃতি গঠিত। অপচারের ব্যাপারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই সমন্বিত কামপ্রবৃত্তি তার ভিন্ন ভিন্ন উপ-আবেগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উদাহরণ : দৃষ্টিহ্লাদ (বা Scoptophilia) নামে একটা মানসিক তথা আচরণিক রোগ আছে। এই অস্বভাব আচরণকে দৃষ্টি রমণ (Voyer) বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, চোখে-দেখা রূপের পুলকাবেগ আপনাতেই নিঃশেষ নয়। এই পুলক কামপ্রবৃত্তির একটা দিক পরিপুষ্ট করে। কামপ্রবৃত্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় যৌনাসঙ্গে। কিন্তু দৃষ্টি-রমণ অপচারের মধ্যে ব্রাউনিং-এর স্ট্যাচু ও বাস্টের মত শুধু তাকিয়ে থাকাটাই আবেগের পরাকাষ্ঠা। আনুষঙ্গিকটাই পরিণাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বলা যায়, কামপ্রবৃত্তি ভাগভাগ হয়ে গিয়ে অপচার সৃষ্টি করে।

বাতিকদের মনঃসমীক্ষণ করে ফ্রয়েড সবারই মধ্যে এক কামবিপর্যয়ের ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। সকল বাতিকের গোড়ায় একটা কামঘটিত গলদ অবশ্য লুকিয়ে আছে। বাতিকদের বা অন্যান্য আধিগ্রস্ত লোকের আচরণকে অপচারীদের বিকারের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং উভয়ের একটা ব্যাকরণের মিলও লক্ষ্য করা যায়। বাতিক ও অপচারীদের বিকারের মধ্যে পার্থক্যটা প্রণিধানের যোগ্য বাতিকের বিকার অপচারীদের মত আচরণ সার্থক নয়। বাতিকের ক্ষোভ মাত্র কতগুলি লক্ষণ (Symptom) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাতিকের এই বিলক্ষণ কর্মগুলি প্রকারান্তরে কামাচার মাত্র।

অপচারীরা এক হিসাবে সফলকাম, কিন্তু বাতিকেরা বিফল তপস্যায় ক্লিষ্ট হয়ে গেছে; সামাজিক রুচি ও সংস্কারের প্রতিরোধের দুর্গের মধ্যে তাদের প্রবল প্রবৃত্তির দল বন্দী।

কামপ্রবৃত্তির গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি খুবই দরকারী প্রসঙ্গের অবতারণা এইবার করা যেতে পারে ঃ প্রবৃত্তির শিশুয়ালি (Infantilism)।

শিশু-বয়সে কামপ্রবৃত্তি যেরূপ দেখা দেয়, তার সঙ্গে পরিণত বয়সের অপচারের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়, অপচারের মানসিক শিকড় শিশু-জীবনের মাটিতে আশ্রিত রয়েছে। সেই অপোগণ্ড কামপ্রবৃত্তিগুলি যেন বড় হয়েও বুড়ো হয় না। প্রবীণ বয়সেও প্রবৃত্তির ছেলেমানুষী দুরন্তপনা ও নষ্টামি মিটে যায় না।

শিশুদের কামচর্যার রীতিনীতি ডাক্তার ফ্রয়েড বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করেছেন। ফলে দেখা গেছে যে শিশুদের কামুকতা বুড়ো অপচারীদের (Pervert) মত। সম-কামিতা, আত্মরতি, বস্তুরতি থেকে শুরু করে মূত্র-পুরীষ সেবা পর্যন্ত—শিশু নামে এই ক্ষুদ্র বর্বরের কোন আসক্তি না আছে? এমন কি বিনা কারণে পিঁপড়ে বা ফড়িং ধরে চটকে মেরে ফেলার নিছক সাদীয় কীর্তি একেবারে দুধে শিশুর আচরণেই দেখা যায়। ফ্রয়েড বলেন, এসবই শিশুর কামকলা (বা কামের শিশুয়ালি) মাত্র। শিশুর মনে জননাঙ্গের সম্বন্ধে বিশিষ্টবোধ জাগ্রত হয় অনেক পরে। কিন্তু তার আগে থেকেই তার কামচর্চার অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। হাতের বুড়ো আঙুল চোষা থেকে আরম্ভ করে মলবেগ চেপে রাখা পর্যন্ত সবই কামকলার শৈশব পাঠ।

তাহ'লে কি সিদ্ধান্ত এই করতে হয়, এই অপচারীসুলভ উন্মার্গ কামপ্রবৃত্তিটি মানুষের জন্মার্জিত? ফ্রয়েড বলেন—হাঁ, কামের অপচারীতাই স্বাভাবিক (Normal) সত্য। সামাজিক নীতিতত্ত্বে যাকে আমরা স্বভাব-সঙ্গত বলি সেটাই আসলে স্বভাব-বিরুদ্ধ। সভ্য জীবনে নানাবিধ লৌকিক রুচির শাসন (Resistance) সেই অপচারবিলাসী জন্মগত বা সহজাত প্রবৃত্তিকে সংস্কৃত (বিকল্পে বিকৃত) করে রাখে।

শিশুর কামাচারের প্রথম স্বৈরতার দশা শেষ হয়ে আসে তখন, যখন সে তার প্রথম প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে চিনতে পারে। শিশুর মন তার কাঁচা মনের আবেগ দিয়ে প্রথম যাদের আত্মীয় বলে চিনতে পারে. তারা হলো শিশুর বাপ ও মা। শিশুর মনে সামাজিক সম্পর্কের বোধ প্রথম উন্মেষ লাভ করে মা-বাপের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে, জৈবমোহে অনুপ্রাণিত এক

দম্পতির বাৎসল্যে অভিষিক্ত লালনসাধনার মধ্যে।

শিশুর কামাবেগ এই সময় ব্যক্তি বিশেষে আরোপিত হয়। এই ভাবে আস্পদলাভের পর শিশুর প্রবৃত্তি বিশিষ্ট একটি ছাঁচে ঢালাই হতে থাকে। এই শৈশব কামগঠন ভবিষ্যৎ জীবনে অন্তরে অন্তরে অটুট থাকে এবং চরিতার্থতার জন্য দাবী জানালে বাস্তবের বিরুদ্ধ সংঘাতে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বের প্রভাব চরিত্রের ওপর প্রতিফলিত হয়।

ডাক্তার ফ্রয়েড শিশুর এই নবরূপে রূপায়িত কাম-মানসিক আবেগকে দুটি বিশিষ্ট ভাবে ভাগ করেছেন :

(১) ইদিপাস (Ædipus)—'সুতমাতা পরস্পরে, প্রথমে যে প্রেম করে', তারই আবেগগ্রন্থির নাম হলো ইদিপাস মানসকূট। এই প্রসঙ্গে ইদিপাস নামটিব ব্যাখ্যার জন্য গ্রীসীয় উপাখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে।

থীবীসের রাজা লাইয়াসের ছেলের নাম ইদিপাস। রাণী বা ইদিপাসের মাতার নাম জোকাস্টা। ইদিপাস ভূমিষ্ঠ হবার আগেই রাজা দৈববাণী শুনেছিলেন যে, তাঁরই ছেলে তাঁকে হত্যা করবে। ইদিপাস জন্মলাভ করা মাত্র তাকে দূরস্থানে ফেলে দেওয়া হয়। করিন্থের রাজা সেই সদ্যোজাত ও অজ্ঞাতকুলশীল পরিত্যক্ত শিশুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে পালন করেন। বড় হয়ে ইদিপাসের সঙ্গে একদিন পথে রাজা লাইয়াসের মুখোমুখি দেখা ও কোন কারণে কলহের সূত্রপাত হয়। ফলে দুজনের মধ্যে মারামারি হয় এবং রাজা লাইয়াস নিহত হন। ইদিপাস তখন থীবীস নগরে প্রবেশ করেন এবং রাণী জোকাস্টাকে বিয়ে করে রাজসিংহাসন অধিকার করেন। জোকাস্টার গর্ভে ইদিপাসের দুটি পুত্র এবং দুটি কন্যা হয়। ইদিপাস পরে জানতে পারে যে সে ঘটনাচক্রে নিজের গর্ভধারিণীকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করে বসেছে। এর পরেই ইদিপাসের জীবনের ট্রাজেডি আরম্ভ হয়। [সোফোক্লিস কথিত উপাখ্যান]

উপাখ্যানের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, কেন ফ্রয়েড 'ইদিপাস' নামটিকে মাতা-পুত্র আসক্তির পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

(২) ইলেক্‌ট্রা (Elcctra) বা পিতা-কন্যার পরস্পর আসক্তি : এই নামটিও সোফোক্লিস বর্ণিত উপাখ্যান থেকে নেওয়া।

আগামেমন্‌নের মেয়ের নাম ইলেক্‌ট্রা, পত্নীর নাম ক্লাইটিমনেস্ট্রা। আগামেমনন পত্নীর হাতে নিহত হন। মেয়ে ইলেক্‌ট্রা তখন তার সহোদর ভাই ওরেস্টিসকে দিয়ে মাতা ক্লাইটিমনেস্ট্রাকে হত্যা করিয়ে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এই ঘটনার যে-মর্মার্থ ডাক্তার ফ্রয়েডকে সমর্থন করে সেটা হলো—পিতার প্রতি কন্যার অনুরাগ, যার প্রেরণায় মাতাকে হত্যা করতেও দ্বিধা হয় না।

উক্ত দুই উপাখ্যানের মধ্যে পিতা ছেলের কাছে এবং মা মেয়ের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বর্ণিত হয়েছে। কিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা? ডাক্তার ফ্রয়েড উত্তরে বলবেন,—আসক্তির আস্পদ নিয়ে। শিশু পুত্রের কাছে মাতাই তার সকল কামনার আস্পদ এবং পিতা যেন প্রতিদ্বন্দ্বী। কন্যার কাছে পিতাই অনুরাগের প্রধান আস্পদ, মাতা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিনী। এই অভিমত যুক্তিতে উত্তীর্ণ হলে, আর একটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই করতে হয়। অর্থাৎ শিশুবয়স থেকে ছেলে বাপের বিরুদ্ধে এবং মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব নিয়ে বড় হতে থাকে। শৈশবে এই অনুরাগ শিশুর কামজ স্ফূর্তির ভেতরেই সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে অর্থাৎ বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে মূল কামজ অনুরাগ অজ্ঞাত মনের ভেতরেই চাপা থাকে, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ নানা আচরণে নিষ্পন্ন হয়। নরনারীর মানসিক ও চারিত্রিক গঠনে এই দুই মানসকূটের ক্রিয়া বরাবর লক্ষ্য করা যায়। হিস্টিরিয়া-রোগীর মন বিশ্লেষণ করে যেসব দমিত আবেগের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়, দেখা গেছে যে তার মধ্যে ইদিপাস ও ইলেক্‌ট্রার প্রকোপ খুব বেশী।

রঙ্গভরা মন

হাসি পায় কেন—রঙ্গরসের (Wit) নমুনা—রঙ্গ-ভঙ্গী ও রঙ্গ-ভাবনা—রঙ্গবিষয়ের গঠনে মনের প্রক্রিয়া--স্বপ্ন ও রঙ্গ গঠনগত সাদৃশ—মানসশক্তির ব্যয়সংক্ষেপ (Economy in psychic expenditure) উইট হিউমার ও কমিক--রঙ্গকলায় শিশুয়ালি (Infantilism)--সভ্যতা ও রঙ্গকলা--রঙ্গ ও আনন্দবোধ।

—আমরা খাসা আছি!

—তার প্রমাণ?

--'হাস্য পেলেই হাসি,

আর নৃত্য পেলেই নাচি।'

কবি ডি-এল রায় খাসা থাকবার একটা হদিস দিয়ে তাঁর দায় খালাস করে দিয়েছেন। কিন্তু হাস্যকে পাই কোথা থেকে? সে তো পথেঘাটে ছড়িয়ে পড়ে নেই। অনেক সাধনায় তাকে পেতে হয়। হাসি পাওয়া জীবনের এক পরম পাওয়া। হাসি যেন এক এক ঝলক তৃষ্ণার জল, ক্লিষ্ট মনের মানুষ ক্ষণে ক্ষণে চুমুক দিয়ে, আশ মিটিয়ে পান করে তৃপ্ত হয়।

হাসি একটা শারীর আচরণ ; কিন্তু তার পেছনে আছে একটি রসোপেত আবেগের স্ফূর্তি। ডাক্তার ফ্রয়েডকে তাঁক মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় রঙ্গরসেব (Wit) প্রসঙ্গ আনতে হয়েছে। আমাদের জানতে হবে, ফ্রয়েড রঙ্গরস তথা হাস্যতত্ত্বের মধ্যে মনস্তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক নির্ণয় খুঁজে পেলেন।

প্রথমে ভাষাগত উদাহরণ ধরা যাক। ভাষার মধ্যে নানারকম শব্দগত প্রক্ষেপ ও মিশ্রণের কারুকার্য দেখা যায়, যার ফলে (কানে শুনে বা পড়ে) মনে রঙ্গরসের সঞ্চার করে।

(১) মানভূম জেলার এক গেঁয়ো জমিদারের ছেলে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়তো। গাঁয়ের স্কুল ছেড়ে শহরের কলেজে ঢুকেই সে হঠাৎ সাহেব ব'নে যায়। তার গায়ের রং ছিল ঘোর কালো ; সাহেবী পোশাকে সেজে, মুখে পুরু করে স্নো-পাউডার ঘসে, সুগন্ধ-লোশন দিয়ে চুল পাট করে আর রুমালে এসেন্স চুবিয়ে ছেলেটি ক্লাসে আসতো। বাংলা ক্লাসে একদিন পণ্ডিত মশাইকে ছেলেটি তার সরল কৌতূহলের বশেই প্রশ্ন করেছিল--পণ্ডিত মশাই, 'ছুঁচো' শব্দের ভাল বাংলা কি?

পণ্ডিত মশাই উত্তর দিলেন।—সুগন্ধনকুল!

(২) প্রশ্ন : কম্ বলবন্তং ন বাধতে শীতম্?

উত্তর : কম্বলবন্তং ন বাধতে শীতম্।

অথবা—

প্রশ্ন : পৃথিবীটা কার বশ?

উত্তর : পৃথিবী টাকার বশ।

(৩) প্রশ্ন : নারায়ণ নামে পত্রিকাটির কী উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তর : চিত্ত রঞ্জনের উদ্দেশ্য।

(৪) 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর!'

যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর!!

(৫) প্রশ্ন : গীতায় ঈশ্বরবাদ আছে?

উত্তর : হাঁ, ঈশ্বর বাদ আছে। (রসরাজ অমৃতলাল)

(৬) অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে কাছে ডাকিয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন—'আপনাকে আমি দণ্ড দেব।

শুনে রায় মশায় ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরক্ষণেই রায় মহাশয়ের দিকে একটি লাঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন,—'এই নিন, আপনার দণ্ডটি ভুল করে ফেলে গিয়েছিলেন।'

ওপরের উদাহরণগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে রঙ্গরসের কিছু-না-কিছু উপাদান আছে। এর মধ্যে ভাষা ও শব্দগত ভাব এবং অর্থের প্রত্যয় লক্ষ্য করলে আমরা রঙ্গরসতত্ত্বের একটা প্রাথমিক ব্যাকরণ দাঁড় করাতে পারি।

স্বপ্নের ভাবনা ও বৃত্তান্তের গঠনতন্ত্র এবং বাতিক মানুষের চিন্তার রীতিনীতির সঙ্গে রঙ্গ-রসের ব্যাকরণেরও সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথম উদাহরণটি ধরা যাক—'সুগন্ধনকুল'। শব্দটি উচ্চারিত হবার পূর্বক্ষণে পণ্ডিতমশায়ের মনে দু'টি কথা একই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল—সুগন্ধ + গন্ধনকুল। ছাত্রটীর সুগন্ধি বিলাস পণ্ডিতমশাই ভাল চক্ষে দেখতেন না। তাই তার ওপর প্রসন্নও ছিলেন না। এদিকে 'ছুঁচো' শব্দটির একটি সাধু প্রতিশব্দ হলো—গন্ধনকুল। এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ পণ্ডিতমশায়ের ভাবনায় সংক্ষিপ্ত হয়ে (দ্রঃ condensation) 'সুগন্ধনকুল' হয়ে পড়েছে। নতুন কথাটার ভেতরে একটা নতুন অর্থ পরিস্ফুট ; এবং পণ্ডিতমশায়ের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাটিও পরিস্ফুট। তিনি একটা সংক্ষিপ্ত আলঙ্কারিক উপায়ে ছাত্রটিকে 'ছুঁচো' বলে বিদ্রূপ করতে চাইছেন। উভয় শব্দের মধ্যে 'গন্ধ' কথাটি আছে ; কিন্তু তার মধ্যে একটি অপসারিত (দ্রঃ Displacement) হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত রয়েছে।—কোন্ বলবানকে শীতে কাতর করে না? কম্বলবানকে করে না। অথবা—পৃথিবীটা কার বশ? উত্তর, টাকার বশ। এর মধ্যেও দেখা যায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত দুটি আস্ত শব্দের অংশবিশেষ জোড়া লেগে নতুন অর্থ তৈরী করে উত্তর দিচ্ছে। আবার দেখা যায়—আস্ত শব্দ দু'ভাগ হয়ে বিপরীত অর্থ জ্ঞাপন করে। যেমন, রসরাজ অমৃতলালের উক্তি—গীতায় ঈশ্বর বাদ আছে। ঈশ্বরবাদ কথাটি শুধু বিভক্ত হয়েছে, তা নয় ; পরন্তু বিপরীত অর্থও প্রকাশ করছে (Inversion)।

রঙ্গরসে দ্ব্যর্থ-বোধক (Ambiguity) একটি বহুপ্রচলিত অলংকার। 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত' পংক্তিটির দুই অর্থ সকলেই জানেন। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর জিজ্ঞাসার উত্তরে অন্নপূর্ণা যে-ভাষায় স্বামীর পরিচয় জানিয়ে দিলেন, তার মধ্যে দ্ব্যর্থ-বোধ এবং ব্যাজরূপের (Inversion) এক বিস্ময়কর কাব্যিক সৃষ্টি।

বাকী উদাহরণগুলির মধ্যেও রঙ্গরসের গঠনতন্ত্রের একই নিয়ম আবিষ্কার করা যায়।

অর্থহীনতা (Nonsense) রঙ্গরস সৃষ্টির পক্ষে আর একটা বড় সহায়। মৃদঙ্গীরা বাজনার সময় যেসব বোল ছাড়েন, সেগুলি শুনলে অনেক সময় হাসি পায়। বোলের ভাষায় কোন অর্থ নেই, কিন্তু ভাবার্থ আছে (অর্থাৎ বাজনার তাল-মান ইত্যাদি)। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে অর্থহীনতার আড়ম্বর খুবই বেশী দেখা যায়। মহাবীর হনুমান তার লাঙ্গুলটিকে যোজনব্যাপী বিস্তার সাধন করলেন ; পৌরাণিক লেখকও এই ভাবে উদ্ভট ননসেন্সের সাহায্যে রঙ্গরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। গুলিখোরদের গল্পের একমাত্র মজা হলো এই চরম অর্থহীনতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় একবার একটা স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে শুনলেন, একটি ছাত্র 'বৃন্দাবন' কথাটীকে 'বিন্দ্রাবন' উচ্চারণ করছে।

ভূদেব স্কুলের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেদের কোন বই পড়ানো হচ্চে?

শিক্ষক।—দ্রিতীয় ভাগ।

ভূদেব বললেন।—ব্রেশ!

এই ঘটনার মধ্যে রঙ্গরস জমে উঠেছে বিকৃতি (Distortion) ও অর্থহীনতার মধ্যে।

বিদ্রূপসাহিত্যে বিশেষ একধরনের রঙ্গরসের আধিক্য দেখা যায়। এর টেকনিক হলো বিপরীত অর্থের সাহায্যে বিষয়কে ধিক্কার দেওয়া। উদাহরণ—'For Brutus was an honorable man'। লক্ষ্ণৌবাসী ভদ্রলোক তাঁর ক্লাসিক সৌজন্যের খাতিরে অতিথির সমুখে পানের ডিবা এগিয়ে দিয়ে বিনয়বচনে অনুরোধ করেন—অনুগ্রহ করে একটু তক্‌লিফ করুন। ভদ্রলোক পান খাইয়ে অতিথিকে তুষ্ট করতে চান, কিন্তু ভাষায় কষ্ট (তক্‌লিফ) দিতে

চাইছেন। ভাষার এই রঙ্গরসিকতা সৌজন্যকে রসিত করেছে।

সর্বস্বান্ত রায়ত যখন অত্যাচারী জমিদারকে বলে,—সবই আপনার দয়া হুজুর! মিথ্যে দেনার দায়ে মামলা করেছেন, ভিটেমাটি ক্রোক করেছেন, হালের গরুকে সেঁকো খাইয়ে মেরেছেন, ক্ষেতের আল ভেঙে দিয়েছেন; আপনার 'দয়ার' শেষ নেই হুজুর।

'দয়া' কথাটি ব্যবহার করে (দয়ার বিপরীত) প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

রঙ্গকস কখনো কখনো রূপকভাবে গড়ে ওঠে। মোটামুটি বিশ্লেষণ করলে, রঙ্গরসের গঠন ও স্বপ্নের মধ্যে একই নিয়মের খেলা দেখতে পাওয়া যায়।

এর পর প্রশ্ন আসে, রঙ্গ দেখে শুনে হাসি পায় কেন?

রঙ্গবিষয়ের কাহিনীগত বা চিন্তাগত অর্থ (Thought Content) বুঝেই কি আমরা হেসে ফেলি? ডাক্তার ফ্রয়েড বলেছেন : আসল ব্যাপার তা নয়। তা হ'লে, কাহিনীটি সাধারণ প্রাঞ্জল রঙ্গহীন গদ্যে বললেই লোকে অর্থটি আরও সহজে বুঝতে পারতো এবং হাসতো। বলতে হয়, রঙ্গকথার টেকনিক বা অন্বয় বা প্রকাশভঙ্গী হলো শ্রোতার হাসির আসল কারণ।

কিন্তু আর একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত মাত্র সরল রঙ্গকথার (Harmless Wit) বেলায় খাটে। কিন্তু ডাক্তার ফ্রয়েড দেখেছেন যে রঙ্গবিষয় সর্বক্ষেত্রে সরল কথার কথা নয়। বহু রঙ্গবিষয়ের মধ্যে একটা গূঢ়ার্থ-প্রবণতা আছে (Tendency Wit)। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রঙ্গকথার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে চটুলতা বিচিত্রতা বা অভিনবত্বের বিশেষ কোন আস্বাদ পাওয়া যায় না। এই রঙ্গকথার চিন্তাগত অর্থ বা ভাবনাংশটিই (Thought Content) চমকপ্রদ। 'হরিরে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়'—এই পদটির প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেই চমক লাগাবার মত বা রস সৃষ্টি করার মত ব্যাপার সামান্যই রয়েছে। কিন্তু অর্থটা ওজনে বেশ ভারি। কেউ হয়তো বললো।--পাখির ঘুম ভাঙলে সূর্য ওঠে। এই কথার মধ্যে যা-কিছু রঙ্গরস আছে, সেটা ভাবার্থগত অংশের মধ্যেই আছে ; অর্থাৎ বক্তার মূঢ়তাটাই এখানে উপভোগ্য এবং এই মূঢ়তা সমস্ত পদটির ভাবার্থ দিয়েই প্রমাণিত হয়। পদটির প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কোনই রসকষ নেই—কথার কোন কারুকার্য নেই। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, এখানে রঙ্গরস নিছক টেকনিক বা প্রকাশভঙ্গীকেই আশ্রয় করে নেই। রঙ্গকথার ভাবনাংশ বা উদ্দেশ্যেও (বা Tendency) রস সৃষ্টির সহায়তা করে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থগূঢ় রঙ্গ-কথার উদাহরণ সাহিত্য রচনার ভঙ্গী থেকে অনেক পাওয়া যায়।

এখন সিদ্ধান্ত করা যায়—মাত্র রঙ্গ-কথাটির মধ্যে রস সৃষ্টির কোন শক্তি নেই। রসের স্ফূর্তি আসছে দুটি আধার থেকে :

(১) রঙ্গ-ভঙ্গী (Wit technique)

(২) রঙ্গ-ভাবনা (Wit tendency)

রঙ্গকথা শুনে হাসি পায় বা মনের মধ্যে একটা রসাবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোন একটা চরিতার্থতার (Gratification) ব্যাপার শ্রোতার মনের মধ্যে ঘটছে।

হাঁ, একটা কিছু চরিতার্থ আছে, যা অন্যভাবে হবার উপায় ছিল না। কার্টুন শিল্পীরা দেশের একজন পদস্থ ও প্রতাপশালী ব্যক্তির ব্যঙ্গচিত্র এঁকে থাকেন। কার্টুনের মধ্যে একটা রূপক পরিবেশ সৃষ্টি করে অনেক বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় ; এই মনের ভাব অন্য কোন উপায়ে (গান গেয়ে বা সরল গদ্যে) প্রকাশ করলে মানহানির দায়ে পড়ার ভয় আছে। কার্টুন শিল্পী ছবির মধ্যে সেই ভয়কে (যাকে একটা বাধা বা Inhibition বলা যায়) কৌশলে অতিক্রম করতে পারেন। রঙ্গকলার পদ্ধতিও এই রকম। একটা মানসিক নিষেধ বা প্রতিবন্ধককে ফাঁকিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। রঙ্গকলার মধ্যে এই চেষ্টা সফল হয়—যার ফলে চরিতার্থতা বোধ জাগ্রত হয়, মন খুশীতে ভরে ওঠে।

রঙ্গরসের স্পর্শে মনে হাসিখুশীর যে আবির্ভাব হলো, তাতে মনের যন্ত্রে নিশ্চয় একটা

আলোড়ন হয়ে গেল বুঝতে হবে। রঙ্গরসের সাড়ায় মনের এই ক্রিয়াটি এইবার আমরা লক্ষ্য করবো। আগেই বলা হয়েছে যে—মনের একটা নিরোধ শক্তিকে (Inhibition) অতিক্রম করে ইচ্ছা স্ফূর্তি লাভ করে। এই ইচ্ছা প্রায়ত অজ্ঞাত ইচ্ছা। এখনি সোজাসুজি 'অজ্ঞাত-ইচ্ছার স্ফূর্তি' না ব'লে মনোযন্ত্রের কাজটা আগে বুঝে নেওয়া যাক। ডাক্তার ফ্রয়েড এই কাজকে বলেছেন—'মানসশক্তির ব্যয়সংক্ষেপ' (Economy in psychic expenditure)। নিরোধশক্তির একটি মানসিক মূলধন আছে। অবাধ্য স্ফূর্তিপ্রয়াসী ইচ্ছাকে চেপে রাখতে হলে, এই মূলধনের কিছুটা খরচ হয়। রঙ্গরসের ব্যাপারে ইচ্ছার স্ফূর্তিকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য যতটা নিরোধ প্রয়োজন, মানসিক মূলধন থেকে ততখানি সাহায্য আসে না। এই কার্পণ্যের সুযোগেই ইচ্ছা রঙ্গ-বিষয়ের রূপ স্ফূর্তি লাভ করে।

আর এক ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক। আমরা জানি, যুক্তি-বিচার মানুষের চিন্তায় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে। অপোগণ্ড বয়সে বা ভূমিষ্ঠ হবার সময় কেউ যুক্তির টিকি মাথায় নিয়ে দেখা দেয়নি। শৈশবের চিন্তা ও ধারণায় বহু মূঢ়তা বাসা বেঁধে থাকতো। সেই মূঢ়তার ভোঁতামূর্তিকে বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি ও যুক্তির ছুরি দিয়ে কেটেকুটে পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা জ্ঞান, সত্য, বা বাস্তবতাবোধ লাভ করেছি। ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানে উপমাটা অন্যভাবে দেওয়া হয় : শৈশবের ভ্রান্ত ধারণা বা মূঢ়তাকে আমরা বড় হয়ে যুক্তিলব্ধ বোধের জোরে চাপা দিয়েছি। যুক্তির এই চাপা-দেওয়া কাজকেই 'নিরোধ' বলা যায়। ভাঁড়ামি নামে রঙ্গকলার মধ্যে নাকাল হওয়া বা মূঢ়তার অভিনয় থাকে। রঙ্গকলার অন্যান্য নমুনার মধ্যেও মূঢ়তার অভিব্যক্তি দেখা যায়। এক কথায় বলতে হয়, দমিত মূঢ়তা নিরোধকে ফাঁকি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই পরিদৃশ্য নিজের মধ্যে বা অপরের মারফৎ উপভোগ করে রঙ্গরসের আস্বাদ লাভ হয়। এই চরিতার্থতার দৈহিক প্রতিচ্ছবি হাসির রূপে ফুটে ওঠে।

ইংরাজী 'উইট' (Wit) কথাটির প্রয়োগ আমরা এপর্য্যন্ত রঙ্গরস নির্বিশেষে করে এসেছি। ক্যারিকেচার, হরবোলা, বিদ্‌ঘুটে মুখোস পরা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ধাঁধার উত্তর, ভাঁড়ামি, ইয়ার্কি প্রভৃতি যতরকম হাসবার আয়োজন আছে, ফ্রয়েড তার মধ্যে গুণ অনুসারে প্রধান তিনটি রঙ্গ-বিষয়ের বিভাগ করেছেন :—(১) উইট (Wit) (২) কমিক (Comic) এবং (৩) হিউমার (Homour)। প্রত্যেক রঙ্গ-বিষয়ের মধ্যে একটা গূঢ়মানসিক শক্তির কার্পণ্য দেখা যায়।

(ক) উইট—নিরোধের (Inhibition) চাপ লঘু করে বা এড়িয়ে বা কম খরচ করিয়ে যে অজ্ঞাত ভাবনা আত্মপ্রকাশ লাভ ও রঙ্গরস সৃষ্টি করে।

(খ) কমিক—চিন্তার (Thought) চাপ লঘু করে বা এড়িয়ে যে অজ্ঞাত ভাবনার আত্মপ্রকাশ রঙ্গরস সৃষ্টি করে।

(গ) হিউমার—অনুভূতি (Feeling) চাপ বা প্রাবল্যকে লঘু করে যে অজ্ঞাত ভাবনার আত্মপ্রকাশ রঙ্গরস সৃষ্টি করে।

এতক্ষণে আমরা একটা সাদা কথার বৈজ্ঞানিক অর্থ বুঝতে পারি। যাকে বলি—'মনকে হাল্কা করা।' হাসলে নাকি মন হাল্কা হয়। ফ্রয়েড সাহেব এই মন হাল্কা হওয়ার ব্যাপারকেই—গূঢ়মানসিক শক্তির ব্যয়সংক্ষেপ (বা Economy in Psychic Expenditure) বলেছেন।

রঙ্গকলা ও হাস্যতত্ত্বের সম্পর্কে যতটুকু বোঝা গেল, তাতে সাধারণ আচরণের ভুলভ্রান্তির সঙ্গে একটা তুলনা চলে। ভ্রমাত্মক আচরণের মধ্যে অজ্ঞাত ইচ্ছা নানা ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্নের মধ্যেও তাই। রঙ্গকলার ক্ষেত্রে এসেও দেখা যাচ্ছে একই ব্যাপার।

পার্থক্য এক জায়গায় আছে। রঙ্গকলার মধ্যে অজ্ঞাত ইচ্ছা স্ফূর্ত হয়ে শুধু আনন্দরস (Pleasure) জাগ্রত করে ; অন্য কোন ভাব বা রস জাগ্রত করে না। রঙ্গকলা সভ্যমানুষের মনোযন্ত্রের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। রঙ্গকলার মধ্যে একজনের অজ্ঞাত ইচ্ছার স্ফূর্তি আর পাঁচ জনের মনে পরিবেশন করা যায়। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে অজ্ঞাত ইচ্ছা সামাজিকতা রক্ষা

করা চলে। স্বপ্নের এই রস-সংক্রামক গুণ নেই।

বর্বর মানুষের কাছে রঙ্গরসের প্রয়োজন ছিল না। প্রাচীন বন্য বর্বর মানুষ অথবা আধুনিক ক্ষুদ্র মনুষ্যশিশু—এই দু'জনের মধ্যে কারো মনে রসিকতার বালাই নেই। মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, নিরোধও সেই হারে বেড়ে যাচ্ছে। রঙ্গকলার প্রয়োজনও সেই হারে বেড়ে চলেছে।

রঙ্গকলা অনুশীলনের মধ্যে আমরা নিজেদেরই হারিয়ে যাওয়া মনকে খুঁজে বেড়াই। শিশু বয়সে মনের কাজ সহজে সরল ভাবে সারা হতো। সেসময় মনকে হাল্কা করার কোন প্রয়োজন ছিল না ; কারণ মন নিজেই হাল্কা ছিল। কিন্তু বয়োন্নতির ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপর নানা প্রতিক্রিয়ায় চাপ পড়তে থাকে। মনের স্প্রিংগুলি যেন ভারের চাপে বসে যেতে থাকে। যে-আচরণের সাড়া মনের এই চাপ হাল্কা করে—তারই প্রতিসাড়া হলো মনে আনন্দরসের (Pleasure) অনুভব।

মনকে হাল্কা করার জন্য আমরা হাসি। এই মন এক-দু হাজার বছর পরে কেমনতর হয়ে যাবে জানি না। তখন আমাদের মুখের হাসিটিই কেমন হয়ে যাবে কে জানে!

টোটেম ও টাবু

গোষ্ঠীদেবতা টোটেম—আদিমতা থেকে বর্বরতায়—সমাজগঠনে প্রথম প্রয়াস—পৃথিবীর প্রথম আইন টাবু-টাবু-শাসনে বর্বরের মানসিক প্রতিক্রিয়া—বর্বরের ও বাতিকের মানসিক গঠনের সাদৃশ্য—টোটেমতন্ত্র ও সভ্যতার বিবর্তন—ইদিপাস ও টোটেম-রহস্য।

অসভ্য জাতিদের মধ্যে বংশ বা গোষ্ঠীর নামকরণ হয় টোটেমের (Totem) নামানুসারে। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন টোটেম। টোটেম কথাটি রেড-ইণ্ডিয়ানদের ভাষা। সাধারণত কোন জন্তু বা গাছকে বংশের টোটেম রূপের কল্পনা করে নেওয়া হয়। টোটেম হলেন বংশের কল্পিত আদিপুরুষ (বা আদিজীব বা আদিপিতা)। চলতি কথায় টোটেমকে বংশদেবতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের মধ্যে গোষ্ঠীগুলির টোটেম হলো কাঙ্গারু এমু ইত্যাদি।

টোটেম-জীব পরম শ্রদ্ধাস্পদ জীব। তাকে হত্যা করা নিষেধ।

আদিম মানুষের কল্পনায় টোটেমের আবির্ভাব প্রথম সমাজ-গঠনের সূচনা করেছিল। এক টোটেম—এক গোষ্ঠী, এই ছিল নিয়ম। টোটেমের নামে আদিম মানুষের গোত্র-পরিচয় তৈরী হলো ; আদিম মানুষ সামাজিকতার সাধনার প্রথম ধাপে পা দিল। এইখানে বর্বর যুগের আরম্ভ।

টোটেমতন্ত্রের দ্বিতীয় বিধান হলো—সগোত্র বিবাহ (অর্থাৎ নরনারীর দৈহিক মিলন) নিষেধ। এক-টোটেমী গোষ্ঠীর মধ্যে কোন নর-নারীর যৌন-সংসর্গ দূষণীয় অপরাধ বলে সাব্যস্ত হলো। টোটেমতন্ত্রেই প্রথম দেখা গেল যে, মানুষ একটা পাশব প্রথা পরিহার করার চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ আত্মীয়াসক্তি (Incest) নিষিদ্ধ হচ্ছে। অন্য ভাবে বলা যায় একশোণিত (Consanguinous) বিবাহ নিষিদ্ধ হলো।

মানুষের সামাজিক ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে (১) প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো—টোটেম জীব হত্যার বিরুদ্ধে। (২) দ্বিতীয় নিষেধ প্রথম রিপুর ওপর—আত্মীয়াসক্তির বিরুদ্ধে।

এই নিষেধকেই টাবু (Taboo) বলা হয়। এই কথাটাও বর্বরদের—পলিনেসীয় অসভ্যদের ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। শোনা যায় ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে ও অথর্ব বেদে 'টাবু' কথাটি আছে। টাবুর তাৎপর্য হলো—'সভয় শ্রদ্ধা'। 'এটা করতে নেই, ওটা ছুঁতে নেই—

করলে খারাপ হয়'—এই ধরনের এক একটা টাবু (নিষেধ) হলো বর্বর সমাজের পিনাল কোড ; অথবা মানবসমাজের প্রাচীনতম স্মার্ত বিধান।

নবজাত শিশু, রজস্বলা নারী, মৃত স্বজনের শব ইত্যাদি বিষয়ে টাবু-জনিত অশৌচ পালনের রীতি আধুনিক অনুষ্ঠান নয়—বর্বর যুগ থেকেই এইসব প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এই সবের মধ্যে একটা 'স্পর্শদোষ' রয়েছে। একদিন কোন প্রয়োজনের খাতিরে বা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই টাবু জারি করা হয়েছিল এবং তার অন্যথা হলে শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই উদ্দেশ্যটা লোকে ভুলে গেল, প্রয়োজনও হয়তো আর ছিল না। তবু টাবু আচরণের মধ্যে নিরর্থক ভাবে বর্তিয়ে রইল।

এখন টাবুর প্রকৃতি বিচার করে নিতে পারা যায় : টাবুর উদ্দেশ্য অজ্ঞাত—অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদ নেই। তবু তাকে কায়মনে পালন করা হচ্ছে, অথচ পালন না করলে (অথবা লঙ্ঘন করলে) কোন শাস্তি পাবার ভয়ও নেই। তবে বাধা কোথায়? সকলের অলক্ষ্যে আঁতুড় ঘরের শিশুকে ছুঁলে কেউ নিন্দে করতে আসবে না, কোন চৌকিদার গ্রেপ্তার করবে না। তবু দ্বিধা ও বাধা।

বাধা রয়েছে মনের ভেতর। যাকে ছুঁতে নেই, (টাবু) তাকে ছোঁয়া হলো। মনের ভেতর থেকেই একটা অশুচিতাবোধের শাসন ধিক্কার দিয়ে ওঠে। টাবু অমান্য করতে গেলে এই ভিতর-মনের শাসনই সাবধান করে দেয়। এই নিষেধ-ধার্মিক মনের পুলিসকে বলা যায়—'বিবেকবোধ'। টাবু চর্চার ভেতর দিয়েই মানুষের মনে প্রথম বিবেক জাগ্রত হয়েছে।

ছুঁতে নেই—এই নিষেধ মনের স্বাভাবিক স্পর্শাসক্তি বা ছোঁয়ার ইচ্ছাকে দমিয়ে দিল। সুতরাং টাবুর মধ্যে দমনের (Repression) কাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই দমিত আবেগ অজ্ঞাত মনে গিয়ে বাসা বাঁধলো। ফলে এই দাঁড়ালো যে, টাবুর প্রতি বর্বর মানুষের একটা দ্বন্দ্বোপেত (দুই পরস্পর-বিপরীত) মনোভাব (Ambivalence) তৈরী হলো। অজ্ঞাত মনের ইচ্ছার আবেগ টাবুকে অমান্য করতে চায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিবেক-বোধ, বা ভয় বা মানসিক বাধা (Resistance) টাবুকে মান্য করে চলতে বলে। এই দ্বন্দ্বোপেত মনোভাবের দরুন টাবুর প্রতি একই সঙ্গে দুই বিপরীত গুণ আরোপ করা হয়। যে বস্তু একদিকে পবিত্র, আর একদিক দিয়ে সেটাই অপবিত্র। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো টাবুশাসিত মনের পরবর্তী পরিবর্তন। 'টাবু অমান্য করতে ভয় হয়—তাই সর্বদা ভয় হয় কখন টাবু অমান্য করে ফেলি'। এই ধরনের একটা উদ্বেগ বর্বর মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে বসলো।

টাবুর বিচার এই পর্যন্ত নিয়ে এসে এইবার একজন বাতিককে এনে তুলনা করা হোক। একজন উদ্বেগ-বাতিক (Compulsion বা Anxiety Neurotic) হলেই তুলনাটা ভাল জমবে। টাবুপীড়িত বর্বর এবং আধুনিক বাতিক—উভয়ের মানসিক প্রকৃতি মিলে যাচ্ছে।

বাতিকের অকাজের কাজের মধ্যে তার মনে দ্বন্দ্ব (অজ্ঞাত ইচ্ছা বনাম ইগোর প্রতিরোধ) যেন ছদ্মভাবে কীর্তিত হয়। তাতে যেন মনের ভার (Tension) লাঘব হয়। একেই মনস্তাত্ত্বিক প্রায়শ্চিত্ত বলা যেতে পারে। টাবুপীড়িত বর্বরও নানারকম কৃচ্ছ্র ব্রতাচার (Ceremonial) পালন করে তার মনের দ্বন্দ্বকে হাল্কা করে নেয়।

বর্বর মানুষের কল্পিত আদিপিতা টোটেমের গুণ ও গঠন যে রকম—সমাজের পরবর্তী সভ্যতার অধ্যায়ে সেই একই গুণ ও গঠন নিয়ে নতুন নতুন টোটেম দেখা দিয়েছে। পরিবারের পিতা, সর্দার, রাজা, ধর্মগুরু, ভগবান এরা সবাই যেন এক একটি সভ্যতার টোটেম। ধর্মাচারের যত সব যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিদ্যা, নীতিতত্ত্ব, শাস্তিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, পশুবলি, কৃচ্ছ্রাচার, দানাদি, পূণ্যকর্ম, সবার গোড়ার কথা টোটেম ও টোটেমের নামে দিব্যি দেওয়া যত সব টাবুর বিধান। আদিমতা থেকে সভ্যতার উত্থানের ইতিহাস যেন

মনোবৃত্তির ইতিহাস। আজও ক্ষুদ্র শিশুর ও প্রবীণ ব্যক্তিকের মনের গতি প্রকৃতি ও পরিণতির মধ্যে সেই ইতিহাস বিনা অক্ষরে লেখা রয়েছে।

তত্ত্বের উপসংহারে ডাক্তার ফ্রয়েড আবার ইদিপাসের কথা এনে ফেলেছেন। ইদিপাসের জীবনে দুটি কলঙ্ক লেগেছিল—(১) পিতৃহত্যা ও (২) মাতার প্রতি আসক্তি। টোটেম তন্ত্রের প্রথম দুটি টাবুর বিধান হলো—(১) আদিপিতা টোটেমজীবকে হত্যা করো না ও (২) আত্মীয়াসক্তি হয়ো না।

ইদিপাস মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই যেন টোটেমতন্ত্রের অভিযান আরম্ভ হয়েছিল। ডাক্তার ফ্রয়েডের মতে সায় দিয়ে সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, আদিম সমাজ ছিল এক ইদিপাসীয় অরাজকতার যুগ। টোটেম ও টাবু সেই অরাজকতাকে শান্ত করে নিয়ে এল সংযতাচার বর্বর যুগ। সেই মনগড়া পথেই দেখা দিয়েছে আধুনিক সভ্যসমাজের ইতিহাস।

মনস্তত্ত্বের শেষকথা

'ইচ্ছা'র নতুন সংজ্ঞা—আনন্দতত্ত্ব (Pleasure Principle)—অবিরতি বা Cathexis—ইরোস ধর্ম (Eros) বা বাঁচবার আবেগ—তানাটোস (Thanatos) বা মরবার আবেগ—উভয়ের দ্বন্দ্বে সভ্যতার সৃষ্টি স্থিতি পরিণতি—ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদ—ফ্রয়েডের রচিত পুস্তকাবলী।

উপনিষদের ঋষিরা বলতেন—আকাশে যদি আনন্দ না থাকতো, তবে কে তাকে চাইতো! ডাক্তার ফ্রয়েডও ইচ্ছাবৃত্তির হেতু খুঁজতে গিয়ে আনন্দতত্ত্বে গিয়ে পৌঁছেছেন।

একটা উদ্দেশ্যমুখী আবেগ বাস্তবের বিরুদ্ধতার জন্য সার্থক হতে পারলো না। এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা (যোগশাস্ত্রের দৌর্মনস্য) থেকে অপ্রীতি ও ক্লেশের উদ্ভব হলো। অপ্রীতিকর চিন্তাকে ভুলে যাবার একটা চেষ্টা থাকে। স্মৃতি এই ক্লেশমূলক চিন্তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। অর্থাৎ চিন্তাটা অজ্ঞাত মনে গিয়ে চাপা পড়ে থাকে। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, চিন্তাটা বিস্মৃত হয়ে যায়। এই দমিত ও অচরিতার্থ আবেগই 'ইচ্ছা'য় (Wish) পরিণত হয় ; 'ইচ্ছা'র অন্য নাম আনন্দমূল বা (Pleasure Principle)। এই ইচ্ছাই আবার ফিরে সর্বপ্রকার চিন্তার মধ্যে চরিতার্থতার পথ খোঁজে, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এক কথায় যথার্থ আনন্দ আহরণের চেষ্টায় থাকে। ইচ্ছার চরিতার্থতাই হলো আনন্দ।

ডাক্তার ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় শেষাশেষি প্রতিপাদ্য রূপে যেসব বিষয় ধরেছিলেন ও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন—সে-আলোচনা দার্শনিকতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। তিনি বললেন, মানুষের মানসলীলার সকল প্রেরণা যোগাচ্ছে যে সহজাত বা জন্মগত শক্তিরূপী বৃত্তি (Instinctive Energy), তারও পেছনে রয়েছে যেন এক পরাৎপরা প্রাণ-পরিচর্যার বৃত্তি বা বেঁচে থাকার প্রয়াস (Urge to live)। কোন আস্পদকে (নিজেকে বা অপরকে বা কোন ভাব আদর্শ আন্দোলন খেয়াল ইত্যাদি) আশ্রয় করে এই প্রাণ-পরিচর্যার বৃত্তি আবেগ-স্ফূর্তির রূপে (Emotional Expression) সার্থক হয়। এই আস্পদাশ্রয়ী আবেগস্ফূর্তিকে অবিরতি (বা Cathexis) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[মূল গ্রীক কথাটি হলো Cathexo অর্থাৎ I occupy ; 'আমি দখল করলাম' এই সার্থক আনন্দবোধ বা স্ফূর্তি। 'অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগত্মা গর্দ্ধঃ' অর্থাৎ বিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্তের লোভকে অবিরতি বলে (পাতঞ্জল ভাষ্য)।]

ভাব আদর্শ ইত্যাদি আস্পদ বা বিষয়গুলি মননশীল জীবনের অবলম্বন—যার জন্য এবং যাকে নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার এই চিরন্তন সদ্ধর্মকে ডাক্তার ফ্রয়েড ইরোস

(Eros) ধর্ম নামে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু—'চিত্তনদী নাম উভয়তোবাহিনী।' চিত্তনদীর স্রোত দুই দিকেই প্রবাহিত হয়। ডাক্তার ফ্রয়েডও বলেছেন যে শুধু বাঁচবার প্রয়াস নয়, একটা মরবার বা আত্মবিনাশের প্রয়াস (Death urge) একই সঙ্গে রয়েছে ও কাজ করে চলেছে—চিরন্তন তানাটোস (Thanatos) ধর্ম।

বাঁচবার প্রয়াস ও মরবার প্রয়াস—(ইরোস বনাম তানাটোস) মূল প্রবৃত্তিরূপী এই দুই প্রয়াসের দ্বন্দ্ব মানুষের মনের ভেতর দিয়ে কাজ করে সভ্যতাকে তৈরী করেছে ও টেনে নিয়ে চলেছে। ডাক্তার ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তাঁর মনস্তত্ত্ব শেষ করেছেন।

১৯৩৯ সালে ফ্রয়েড সাহেব ইংলণ্ডে মারা গেছেন। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বকে সমগ্রভাবে পৃথিবীর সুধীসমাজ স্বীকার করে না। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতা সম্বন্ধে বহু সংশয়ের অবকাশ রয়ে গেছে। ফ্রয়েডের সতীর্থ এডলার (Adler) ও ইয়ুং (Jung) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা তাঁর কোন কোন অভিমতের সপক্ষে নিজেদের যুক্তির অনুমোদন না পেয়ে অন্যভাবে মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পাভলভ (Pavlov) ঘরানার আচরণবাদী (Behaviourist) মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার কাঠামোটাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। ফ্রয়েডের সঙ্গে পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তে কোন মিল নেই। বর্তমানে আমেরিকার ওয়াটসন (Watson) এবং সোভিয়েট রুশের বাক্‌তেরফ (Bacterof) মনস্তত্ত্বকে এক নতুন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ডাক্তার ফ্রয়েডের সবচেয়ে বড় দান হলো—অচেতন মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ ও বিবরণ।

[ডাক্তার ফ্রয়েডের রচনা ঃ Studies in Hysteria, Papers on Hysteria, Three Contributions to the Theory of Sex, Orgin and Devlopment of Psycho-Analysis, History of Psycho-Analytical Movement, General Introduction to Psycho-Aanalysis, Psychopathology of Everyday Life, Totem & Taboo, Group Psychology and the Analysis of Ego, The Interpretation of Dreams, Wit and its relation to the Unconscious, The Ego and the Id, Beyond the Pleasure Principle, Reflections on War and Death, Leonardo da Vinci...ইত্যাদি]

কফন

মুন্সী প্রেমচাঁদ

ঝুপড়ির মত কুঁড়ে ঘরটার দোরের সুমুখে আগুনের ধুনিটা প্রায় নিভে এসেছে। তারই সামনে বাপ বেটা দু'জনে চুপচাপ বসেছিল। ঘরের ভেতর ছেলের বৌ প্রসব বেদনায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছিল—হাত-পা ছুঁড়ছিল। ছেলের বৌ বুধিয়া - যুবতী। থেকে থেকে তার মুখ থেকে এমন করুণ আর্তস্বর ডুকরে উঠছিল যে, শুনে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থমকে যাচ্ছিল। শীতের রাত, প্রকৃতি স্তব্ধতায় ডুবে রয়েছে, সমস্ত গাঁ-টা অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

ঘিসু বলল—মনে হচ্ছে, ও আর বাঁচবে না। সমস্ত দিনটা তো দৌড়তেই শেষ হ'ল। যা একবার দেখে আয়।

মাধব রেগে গিয়ে বলল—যদি মরবার হয়, তবে তাড়াতাড়ি মরে না কেন? দেখে এসে কি আর হবে?

—তুই তো বড় নির্মম রে! সমস্ত বছর যার সঙ্গে এত সুখে আরামে সংসার করলি, তারি সঙ্গে এত অকৃতজ্ঞতা?

—কিন্তু, ওর এই লাফঝাঁপ, আর হাত-পা ছোঁড়া, আর আমার চক্ষে সহ্য হয় না।

এরা জাতে চামার। গাঁ-জুড়ে এদের বদনাম। ঘিসু একদিন কাজ করে তো তিন দিন আরামে কুঁড়ে মেরে বসে থাকে। মাধব এত বড় ফাঁকিবাজ কাজের কুঁড়ে ছিল যে, আধ ঘণ্টা কাজ করে তো এক ঘণ্টা কাবার করে দিত কল্কে ফুঁকে। এজন্যেই এদের কেউ কাজ দিত না। ঘরে একমুঠো খাবার দানাকণা যদি রইল তো সেদিন তাদের পায় কে? তাদের যেন সেদিন কেউ দিব্যি দিয়ে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। দুচার দিন অনাহারের জ্বালায় পেটে যখন আগুন লাগতো তখনই তারা একবার বের হ'ত অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায়। ঘিসু গাছে চড়ে শুকনো ডালপালা ভেঙে আনতো, মাধব সেগুলি বেচে আসতো বাজারে গিয়ে। এর পর যতদিন একটা পয়সাও ঘরে থাকত, ততদিন দুজনে এদিক ওদিক চষে বেড়াতো ভবঘুরের মত। আবার যখন নিরন্নতা বুভুক্ষা সামনে এসে দাঁড়াতো, তখন আবার লকড়ি ভাঙার চেষ্টা হত, কাজকর্মের ফিকির পড়তো।

গাঁয়ে কাজের অভাব ছিল না। কিষাণদের গাঁ—খাটিয়ে লোকের জন্যে সেখানে পঞ্চাশ রকমের কাজ রয়েছে। কিন্তু এদের লোকে কাজের জন্য ডাকতো কখন? দুজনের মজুরীতে একজনের মত কাজ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মত মনমেজাজ যখন থাকতো, আর এ ছাড়া যখন উপায়ান্তর থাকতো না, তখনই শুধু এদের দু'জনকে কাজে আহ্বান করা হত নইলে নয়।

এরা দুজন যদি সাধু-সন্ন্যাসী হত, তাহলে আর এদের চেষ্টা করে সন্তোষ, ধৈর্য, আর সংযম লাভের সাধনা করবার কোন প্রয়োজনই হত না। এটা তো এদের প্রকৃতির মধ্যেই ছিল। বিচিত্র এদের দুজনের জীবন। ঘরে দুচারটে মেটে বাসনপত্র ছাড়া সম্পত্তি বলে আর কিছু ছিল না। ছেড়া ন্যাতা ন্যাকড়া দিয়ে দেহের নগ্নতাটুকু চাপা দিয়ে এরা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল। সংসারের সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত। মাথায় ধার-কর্জের বোঝা। গাল খেতো, মারও খেতো, কিন্তু তাতে কিছুই আক্কেল ফুটতো না এদের। দেনা শোধের কোন আশাই ছিল না এদের ; লোকে এ সত্য জেনে শুনেও কিছু না কিছু ধার দিয়েও দিত। মটর আলুর ফসলের সময় পরের খেত থেকে মটর আলু ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে এসে এরা ভেজে পুড়িয়ে খেয়ে নিত। কখনও কখনও পাঁচ-দশটা আখ উপড়ে এনে রাত্রিবেলা বসে বসে চুষে শেষ করতো।

বুড়ো ঘিসু এই আকাশ বৃত্তি করেই পরমায়ুর ষাটটি বৎসর পার করে দিয়েছে। মাধবও সুপুত্রের মত বাপেরই পদচিহ্ন ধরে চলছে। বলতে গেলে, সে বাপের নাম আরও উজ্জ্বল করছে।

এখন পর্যন্ত এরা ধুনির সামনে বসে আলু পোড়াচ্ছিল। কারু ক্ষেত থেকে খুঁড়ে নিয়ে আসা হয়েছে আলুগুলি। ঘিসুর স্ত্রীর দেহান্ত হয়েছে। সে আজ অনেক দিনের কথা। গেল বছর বিয়ে হয়েছে মাধবের।

মাধবের বৌ—যেদিন থেকে এই মেয়েটি এদের সংসারে এসেছে সেদিন থেকে এদের জীবনযাত্রার চেহারা—পারিবারিক রূপ ফিরে গেছে।

যাঁতা পিষে বা ঘাস কেটে বুধিয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একসের আটার মত পয়সার ব্যবস্থা করেই নিত। এই দুই হতভাগার পেটের নরক ভরবার ব্যবস্থা সেই করতো। যেদিন থেকে সে এসেছে, এ দুজন হয়ে উঠেছে আরও কুঁড়ে, আরও আয়েসী। এমন কি, যাকে বলে এদের বেশ পায়াভারি হয়ে উঠতে লাগলো। কেউ কোন কাজের জন্য ডাকলে বেশ নির্ব্যাজ ভাব দেখিয়ে দু'গুণ মজুরী হেঁকে বসতো।

এই মেয়েটিই আজ প্রসব বেদনায় মরতে বসেছে। আর এরা দু'জন বোধহয় এই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, মরেই যাক এখনি। একটু আরামে শোয়া যায় তাহলে।

ঘিসু একটা পোড়া আলু বের করে খোসা ছাড়িয়ে বললো—কি দশা হল ওর? যা একবার দেখে তো আয় শাকচুন্নী ভর করেছে, তা ছাড়া আর কি হতে পারে? এখানে তো ওঝারাও এক টাকা হেঁকে বসে।

মাধবের মনে মনে আশঙ্কা ছিল, ঘরের ভেতর সে গেছে কি ঘিসু আলুগুলোর প্রায় সবটা সাফ করে দেবে, সে বললো—আমার ভেতরে যেতে ভয় করছে।

—আরে ভয় কিসের, আমি তো এখানেই রয়েছি।

—তবে তুমিই গিয়ে দেখ না।

—আমার বউ যখন মারা গেল, আমি তিনদিন ওর কাছ থেকে নড়িনি। আর এক কথা, আমি ভেতরে গেলে বউ কি লজ্জা পাবে না? যার কখন মুখ দেখিনি, আজ তার আদুড় শরীর দেখবো? ওর তো এখন নিজের শরীরের হুঁস পর্যন্ত নেই। আমাকে দেখলে ইচ্ছেমত হাত-পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে বাধা পাবে।

—আমি ভাবছি, ছেলেপিলে যদি একটা কিছু হয়েই যায়, তাহলে উপায়? সেঁঠ, গুড়, তেল—কিছুই যে ঘরে নেই।

—সব এসে যাবে ভগবান যদি দেন। আজ যারা একটি পয়সা দিচ্ছে না, কাল তারা ডেকে নিয়ে টাকা দেবে। আমার নটি ছেলে হয়েছিল। কোন দিনই ঘরে কিছু ছিল না, কিন্তু ভগবান কোন না কোন রকমে দায় উদ্ধার করেই দিলেন।

যে সমাজে দিনরাত খাটিয়ে লোকের অবস্থা এদের দশা থেকে বড় কিছু উন্নত নয়, যে সমাজে তাদেরই অবস্থা কিষানদের দুর্বলতাকে ভাঙিয়ে লাভ করবার কায়দা জানে, সে সমাজ থেকে এই ধরনের মনোবৃত্তিই সৃষ্টি হবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি তো একথা বলবো যে, ঘিসু কিষাণদের চেয়ে আরও বিচারবান ছিল। এই কারণেই সে বিচারবিহীন গবেট কিষাণদের সহকর্মী না হয়ে ইতর আড্ডাবাজদের দলে ভিড়ে ছিল। তবে হ্যাঁ, ওর মধ্যে এমন শক্তি ছিল না যে, সে আড্ডাধারীদেরও নিয়ম আর নীতি পালন করে চলতে পারে। এজন্যেই এই আড্ডাবাজমণ্ডলীর অন্য সকলে গাঁয়ের হোমরাচোমরা বা মোড়ল হয়ে বসেছিল, কিন্তু এদের দুজনের কপালে জুটতো সমস্ত গাঁয়ের লোকের চোখ-রাঙানি। তবু মনে মনে এদের একটা সন্তোষ অবশ্য ছিল, দশা হ'লই বা খারাপ, কিষাণদের মত তো আর গতরভাঙা মেহন্নত করতে হয় না। আর এই চাষাগুলোর সরলতা আর নিরীহতার সুযোগ ভাঙিয়ে তাদের মতন তো কেউ আর বাগিয়ে নিতে পারে না।

দুজনেই ঝলসানো আলুগুলি বের করে গরম গরম খেতে শুরু করে দিল। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি। এতটুকু সবুর ছিল না যে আলুগুলোকে ঠাণ্ডা হতে দেয়। বার কয়েক

দুজনের জিভ পুড়ে গেল, খোসা ছাড়াবার পর আলুগুলো বাইরে থেকে ছুঁয়ে তেমন গরম মনে হচ্ছিল না। কিন্তু দাঁতের কামড় পড়েছে কি ভেতরের গরম শাঁস জিভ, তালু ও গলা প্রায় পুড়িয়ে দিচ্ছিল। এমন জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে রাখার চেয়ে স্রেফ গিলে ভেতরে চালিয়ে দেওয়াই মঙ্গল। কেননা, সেখানে একে ঠাণ্ডা করবার মত সুপ্রচুর উপকরণ মজুত আছে। এই জন্যই দুজনে চটপট গিলে যাচ্ছিল ; যদিও এই চেষ্টার ফলে তাদের দুচোখ বেয়ে ঝরছিল অশ্রুর নির্ঝর।

ঘিসুর মনে পড়লো, ঠাকুর মশায়ের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যাবার ঘটনাটা। কুড়ি বছর আগে সে এই বরযাত্রীর সঙ্গে গিয়েছিল। সেই নেমন্তন্নে যে তৃপ্তি সে পেয়েছিল, সেটা তার জীবনের একটি স্মরণীয় কাহিনী। এখনও সে স্মৃতি সজীব হয়ে রয়েছে। ঘিসু বললে সে ভোজনের কথা ভুলতে পারি না। তারপর ও-রকমের পেটপুরে খাওয়া আর পাইনি কখনও। কনেপক্ষ সকলকেই পেটভরে লুচি খাইয়েছিল—সব্বাইকে! ছেলে, বুড়ো সকলকেই লুচি খাইয়েছিল—খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি। চাটনী, রায়তা, তিন রকমের শাক, একটা ঝোলভরা তরকারী, দই মেঠাই—কী স্বাদ যে পেয়েছিলাম সে ভোজনে, সে কি আর বলবো! সে এক ঢালাও ব্যাপার—তার মধ্যে নেইফেই কিছু ছিল না। যে যা চাও, যতখানি চাও! সকলে এমন খাওয়া খেল যে, শেষে জল খেতে আর কেউ পারেনি। পরিবেশনকারীরা পাতে ঢেলে দিচ্ছে গরম গরম গোলগোল সুগন্ধি কচুরী। বারণ করছি—আর চাই না, চাই না, হাত দিয়ে পাত ঢেকে আছি ; কিন্তু তারা দিয়েই চলেছে। এর পর সবাই যখন আচমন সেরে উঠেছি, তখন পান এলাচও দেওয়া হল। কিন্তু পান নেবার মত কি অবস্থা আমার ছিল তখন? সোজা দাঁড়াতেই পারছিলাম না। চটপট গিয়ে নিজের কম্বল পেতে গড়িয়ে পড়লাম। এমনই দরাজ দিল্ ছিল ঠাকুর মশাইয়ের।

মাধব মনে মনেই এই পদার্থগুলোর আস্বাদ উপভোগ করে বললে—এখন আর আমাদের কেউ এমন ভোজ খাওয়ায় না।

—এখন কে আর খাওয়াবে? সে যুগই ছিল অন্য রকমের। এখন তো সবাই সস্তা খোঁজে। সাদি বিয়েতে খরচ করে না, ক্রিয়াকর্মে খরচ করে না। এই তো ব্যাপার। তাইতো বলি, গরীবের মাল মেরে মেরে জমা করে রাখবি কোথায়? জমা করতে তো কামাই নেই কারু! হাঁ, যত সস্তা ঐ খরচের বেলায়!

—তুমি কুড়িটা লুচি নিশ্চয়ই খেয়েছিলে?

—কুড়ির চেয়ে বেশী খেয়েছিলাম।

—আমি পঞ্চাশটা খেয়ে ফেলতে পারি।

—পঞ্চাশের কম আমিও খাইনি। তেমনি হট্টাকাট্টা ছিলাম তো! তুই তো আমার অর্ধেকও ন'স।

আলু খাওয়ার পর দুজনে জল খেল। তারপর সেখানেই, ধুনীর সামনে পেটে পা গুঁজে ধুতির কোঁচা গায়ে লেপটে দুজনে শুয়ে পড়লো। বড় বড় দুটো অজগর যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইলো।

বুধিয়া এখনও কাতরাচ্ছে।

(২)

সকালে মাধব ঘরের ভেতর গিয়ে দেখে, বুধিয়া ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার মুখের ওপর মাছি ভন্ ভন্ করছে। পাথরের মত নিশ্চল চোখের তারা দুটো উল্টে গেছে। সমস্ত শরীর ধুলোমাখা, বুধিয়ার পেটের ছেলে পেটেই মরে গেছে।

মাধব ঘিসুর কাছে ফিরে এল। দুজনে বুকে ঘুসি মেরে চীৎকার করে সুরু করলো—হায়,

হায়! প্রতিবেশীরা কান্নাকাটি শুনে দৌড়ে এল। সনাতন নিয়মে তারা এ অভাগা দুজনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

কিন্তু বেশী কান্নাকাটির অবসর নেই। কফন আর লক্ড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরের মধ্যে পয়সাকড়ির বালাই তো তেমনই নিশ্চিহ্ন, চিলের বাসায় যেমন মাংসের কুচি।

কাঁদতে কাঁদতে বাপ বেটায় গাঁয়ের জমিদারের কাছে এল। জমিদার মশায় এদের দুজনের চেহারা দেখলেই জ্বলে যেতেন। নিজের হাতে পিট্টিও দিয়েছিলেন দু'একবার—চুরি করবার জন্যে, আর কাজে না আসার জন্যেও। জমিদার মশায় বললেন—কি রে ঘিসুয়া, কাঁদছিস কেন? তোর যে আজকাল টিকিটিরও দেখা নেই। মনে হচ্ছে, এ গাঁয়ে আর থাকবার ইচ্ছে নেই তোদের।

ঘিসু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, জলভরা চোখে বললে—সরকার, বড় বিপদে পড়েছি। মাধবের ঘরণী রাত্রে শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত রাত ছটফট করেছে সরকার! আমরা দুজনে ওর শিয়রে বসে রইলাম। যা সাধ্যি ওষুধপত্র করলাম। তবু সে আমাদের দাগা দিয়ে চলে গেল। খাবার সময় একটা রুটি এগিয়ে দেবে এমন কেউ আর সংসারে রইল না মালিক। একেবারে ফতুর হয়ে গেছি সরকার, সংসার উজাড় হয়ে গেছে। আপনার গোলাম আমরা ; এখন আপনি ছাড়া ওর শেষ কাজের ব্যবস্থা আর কে করে দেবে সরকার। আমার হাতে যা কিছু ছিল, সবই ওষুধপত্রে শেষ হয়ে গেছে। এখন হুজুরের যদি দয়া হয়, তবে ওর চিতার খরচের ব্যবস্থাটা হয়। আপনি ছাড়া কার দরজায় যাই?

জমিদার মশায় দু'টাকা সাহায্য দিয়েছেন, গাঁয়ের অর্থ কালো কম্বলকে রং করা। মনে এল, বলে দেন—যা দূর হ। ডাকলেও যেখানে আসা হয় না, সেখানে গরজে পড়ে আজ খোসামোদ করতে এসেছে। হারামখোর কোথাকার! বদমাস!

কিন্তু এটা রাগ করবার বা শাস্তি দেবার উপযুক্ত সময় নয়। মনের ভেতর গজগজ ক'রে দুটো টাকা বের করে জমিদার মশায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু সান্ত্বনার একটি শব্দও তাঁর মুখ থেকে বের হল না। ওদের দিকে তাকিয়েও একবার দেখলেন না, যেন মাথাব একটা বোঝা নেমে গেল।

জমিদার সাহেব দুই টাকা সাহায্য দিয়েছেন। গাঁয়ের বেনিয়া মহাজনেরা আর কোন সাহসে আপত্তি করে? ঘিসু জমিদার মশায়ের নাম করে ঢোল পেটাতে জানে। কেউ দু'আনা, কেউ চার আনা। এক ঘণ্টার মধ্যে ঘিসু পাঁচটি টাকা জমা করে ফেললো। কেউ কিছু আনাজ দিয়ে দিল, কেউ লক্ড়ি। ঠিক দুপুরের সময় ঘিসু আর মাধব চললো বাজারে—কফন কেনবার জন্যে। এদিকে অন্য সকলে বাঁশ কাটতে লেগে গেল।

(৩)

বাজারে পৌঁছে ঘিসু বললো—ওকে পোড়াবার মত লক্ড়ি তো হয়ে গেছে ; কি বলিস মাধব?

—হাঁ, লক্ড়ি অনেক হয়েছে। এখন কফন চাই।

—তবে চল, একটা বাজে হালকা রকমের কফন কিনে নিই।

—হ্যাঁ, আর কি? লাস উঠতে উঠতে রাত হয়ে যাবে। রাত্রি বেলা আর কে কফন দেখছে!

—কি বিদঘুটে নিয়ম রে বাবা। বেঁচে থাকতে গায়ে দিতে ন্যাকড়াও জোটেনি যার, আজ মরে যাবার পর তার জন্যে কফন চাই!

—লাসের সঙ্গে কফন তো পুড়েই যায়।

—আর কি থাকে? এই পাঁচটি টাকাই যদি আগে পাওয়া যেত তবে ওষুধপত্র কিছু হতো।

এরা পরস্পরের মনের কথাটি আঁচ করছিল। বাজারে ঘুরে বেড়ালো এদিক ওদিক। কখনো অমুক বাজাজের দোকানে যায়, কখনো অমুক শেঠের দোকানে। রকমারি কাপড় দেখে রেশমী অথবা সূতী ; কিন্তু কোনটিই পছন্দসই হয় না। এই ভাবেই সন্ধ্যা হয়ে গেল।

তারপর কে জানে কোন দৈবী প্রেরণার টানে এরা পৌঁছে গেল এক শুঁড়িখানার কাছে। যেন একটা অবধার্য ব্যবস্থা মত এরা সোজা গিয়ে ঢুকলো সেই মধুশালার—সেই শুঁড়িখানার অন্দরে। দুজনে কিছুক্ষণ একটু বেখাপ্পা অস্বস্তিকর অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর, ঘিসু শুঁড়িখানার গদির সামনে গিয়ে হাঁকলো—সাহুজী, আমাকেও এক বোতল দাও তো।

এরপর কিছু চাট আনা হলো। মাছ ভাজা আনানো হলো। দুজনে বারান্দায় বসে পরম শান্তিতে বোতল ঢেলে মদ খেয়ে চললো।

প্রথমে দু'এক গেলাস ঢকঢক করে তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করলো দুজনে। পাতলা নেশার আমেজ ধরলো শুধু।

ঘিসু বললো,—লাসে কফন দিলে কি ফল হয়? শেষে পুড়েই তো যায়। কিছু সঙ্গে আর যায় না।

যেন সে নিজের নিষ্পাপতার জন্য দেবতাদের সাক্ষী মানছে। মাধব আকাশের দিকে চোখ দুটো তুলে বললো—এটা দুনিয়ার রীতি, নইলে লোকে ব্রাহ্মণকে হাজার হাজার টাকা দান করে ফেলে কেন? কে দেখতে গেছে, পরলোকে সেগুলি ফিরে পাওয়া যায় কিনা?

—বড়লোকের টাকা আছে, তারা ফুঁকে উড়িয়ে দেয়, আমার ফুঁকে উড়িয়ে দেবার কি আছে?

—কিন্তু লোককে উত্তর কি দেবে? লোকে জিজ্ঞাসা করবে না, কফন কোথায়?

ঘিসু হাসলো—ওরে, বলে দেব কোমরের ট্যাঁক থেকে টাকা খসে পড়ে গেছে। অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাওয়া যায়নি, লোকে তো বিশ্বাস করবে না জানি ; কিন্তু ওরাই আবার কফন কেনার টাকা দেবে।

এই অভাবিত সৌভাগ্যের আবির্ভাবে মাধবও হেসে ফেললো। বললো,—বড় ভাল ছিল বেচারী। মরেছে, মরেও খুব খাইয়ে দাইয়ে গেল!

আধ বোতলের বেশী পার হয়ে গেছে। ঘিসু দু'সের লুচি আনলো।

কবিতাগুচ্ছ

কেন এ দিনশেষে, এলে মোর বাহুপাশে
এখন বাঁধন ছিঁড়িব বল কোন পরাণে।
যদি আমার এ আঙিনায়
কভু কি জোছনায়
গাহে ঘুমচোরা পাখী কুসুম বনে।
কেন বেদন জাগালে মিছে, নীল নয়নে।

অজানা দিনে একেলা ক্ষণে
পড়বে মনে তোমায় প্রিয়ে।
অশোককুঞ্জে জাগায়ে মুকুল
আসবে জানি নূপুর পায়ে।।

আনিও সাথে হেম বিজুরীর
রূপলেখারই ছন্দধারা,
মারিও মুখে কনকচাঁপার
চূর্ণ পরাগ গন্ধভরা,
মহুয়া মাধুর্যে করিও সিক্ত
রক্ত অধর কিশলয়ে।।
প্রিয়ে তব তনু করো ফুলধনু
ধরো মাধবীর হাত
এই ক্ষণিকের বাসরের ঘরে
যেন ফাল্গুনী জাগে রাত
নয়ন নীলে স্বপ্ন ঘনাবে কবরী শিথিল
দখিন বায়ে।।

*　　*　　*

আমারই　বিদায় ব্যথা (কি প্রিয়) বাজিবে তোমারে
খসিয়া　পড়ে যে তারা, কে কাঁদে তাহারি তরে?

*　　*　　*

সুখের　দিনে কেঁদ না প্রিয়, বেদনা মিছে ডেক না এনে
তোমার　আমার মিলন রাখী, করো না মলিন অকারণে।
আজি যে ব্যথায় কাঁদে বনতল
দাও এলাইয়া মেঘ কুন্তল
করিও কোমল পথের শিলায়
তোমার প্রেমের বরষা বানে।।

*　　*　　*

চেয়ো　নাক ফিরে ওগো পথিক সুজন,
আমারই　দুখের ভিটা, (আর) ব্যথার কাঁটাবন।

*　　*　　*

কেন　এলে পরদেশী পিয়া বিদায় ক্ষণে
যদি　কাঁদাবে বলে জান, নিধুর মনে।

—